"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"
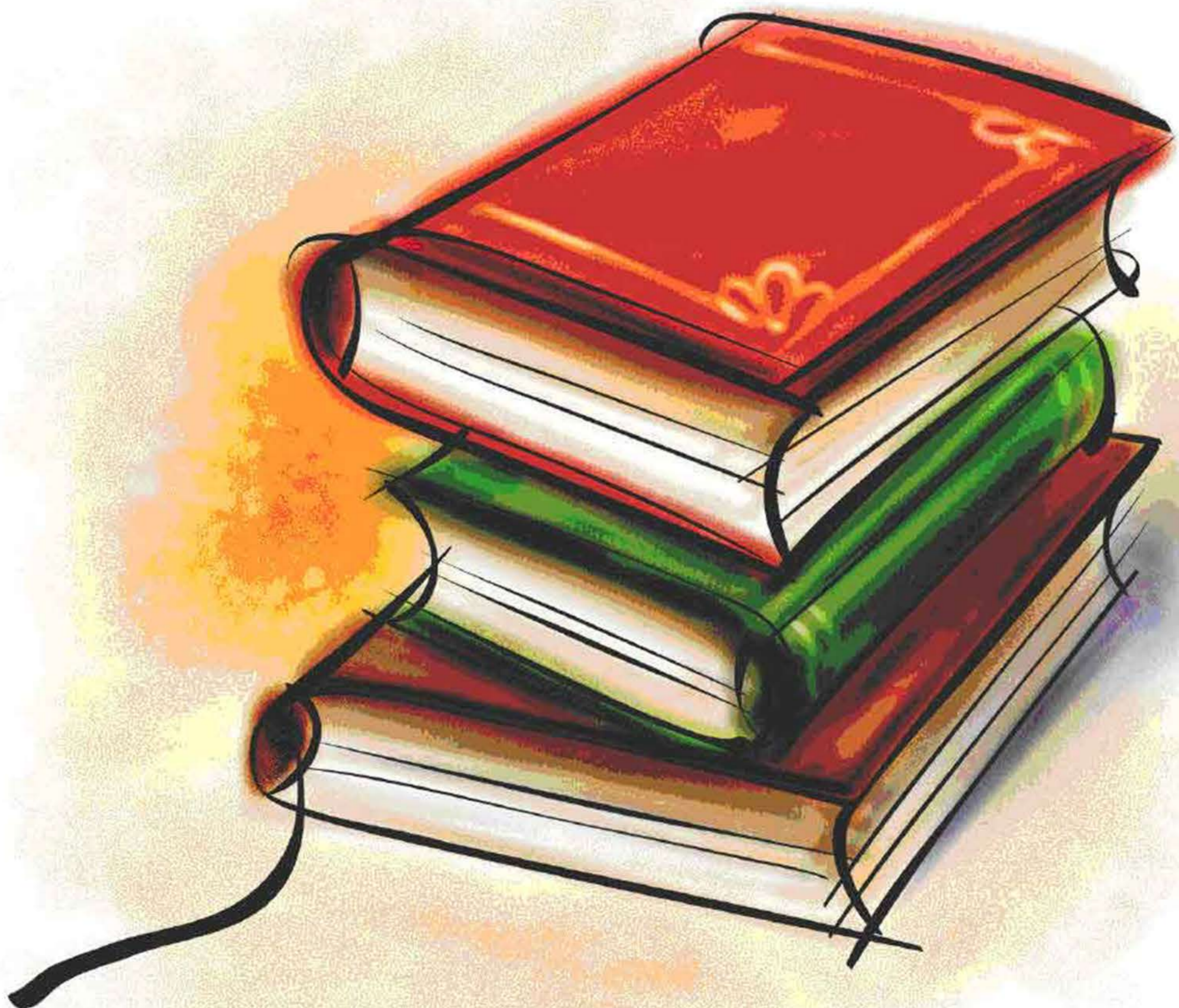
মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

দ্বিতীয় বর্ষ

১৩৩৯ সাল

প্রতিষ্ঠাত্রী

শ্রীলীলাবতী নাগ এম্-এ

সম্পাদিকা

শ্রীবীণাপাণি রায় এম

কার্য্যালয়—২ নেং ওয়ার

সিক সডাক—৫৲]
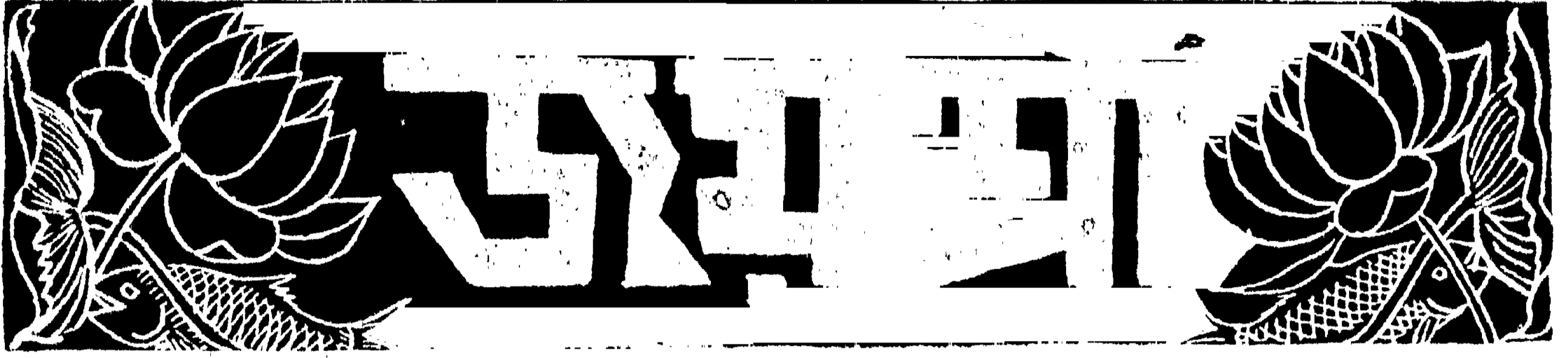
দ্বিতীয় বর্ষ	কার্ত্তিক, ১৩৩৯	সপ্তম সংখ্যা

স্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রীকল্যাণী দেবী

দুঃখ যে কেন মানুষের জীবনের সহিত নিবিড় বন্ধনে বাঁধা, তাহা যে বিধাতার বিধান, তিনিই কেবল বলিতে পারেন। দুঃখ নহিলে সুখের যথার্থ উপলব্ধি করিতে, মৃত্যু নহিলে জীবনের যথার্থ মূল্য দিতে আমরা অক্ষম বলিয়াই বুঝি তাঁহার সুখের পর দুঃখ, ও দুঃখের পর সুখের এ ব্যবস্থা। মৃত্যুর মধ্যেই ভগবানের সান্নিধ্য উপভোগ করিবার আনন্দটুকু পাওয়া যায়, আবার সংসারের মোহে পড়িয়া আমরা দুঃখ ভুলিয়া যাই, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দটুকুকেও হারাই। যাঁহারা সেই আনন্দটুকুকে জীবনে ধরিয়া রাখিতে পারেন, তাঁরাই ধন্য। রাজকুমার শাক্যসিংহ যৌবনে দুঃখের বিশ্বরূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, জন্ম-জরা মৃত্যু-প্রপীড়িত সংসারে সুখের আলেয়া দেখিয়া ভুলিতে পারেন নাই, তাই "সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং" এই সত্যের উপর বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। সংসারে যে সুখ নাই, একথা তিনি বলেন নাই; তবে সুখ ক্ষণিক ও অনিশ্চিত, তাই বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির উপদেশ দিয়া যান্।

যে দেবীর স্বর্গারোহণে আজ আমরা শোকাতুরা, যাঁহার স্নেহময়ীমূর্ত্তি আর আমরা দেখিতে পাইব না, তাঁহার জন্ম ১২৬৩ সনে, ১৪ই ভাদ্র, জন্মাষ্টমী তিথিতে, (ইংরাজি ১৮৫৬ খৃঃ, ২৮শে আগষ্ট) গত ১৯ শে আষাঢ়, ১৩৩৯ সনে, (ইংরাজী ৩রা জুলাই, ১৯৩২ খৃঃ) অমাবস্যা তিথিতে, রবিবার বেলা ১০ ঘটিকার সময়, মৃত্যু আসিয়া তাঁহার জীবনপ্রদীপকে চিরনির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছে। পরিণত বয়সে পুত্র-কন্যা পৌত্র-পৌত্রী রাখিয়া অনিবার্য্য

মরণকে বরণ করিয়া লওয়া সাংসারিক হিসাবে সুখের হইলেও, স্বর্ণকুমারীর বিচ্ছেদ শুধু আত্মীয়-স্বজনের নহে, বাংলার বুকেও শেলের ন্যায় বাজিবে। শেষ বিদায়ের সময় পৃথিবীও তাঁহার বিচ্ছেদে যেন সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বারিবর্ষণ করিল।

স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম, শুধু বাংলাদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে, এমনকি পাশ্চাত্য-প্রদেশেও অপরিচিত নহে। ইনি কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম কন্যা। ইঁহার কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীযুক্তা বর্ণকুমারী দেবী, ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অদ্যাপি বর্ত্তমান; পঞ্চদশ ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে অন্যান্য সকলে পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যেও কয়েকজনের নাম সাহিত্য-জগতে ও সঙ্গীত-রাজ্যে সুপরিচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আদর্শে, বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রিয় "মেজদাদা" সত্যেন্দ্রনাথের উৎসাহে ও সাহায্যে স্বর্ণকুমারীর জীবন নূতন আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল। শৈশব হইতেই বিদ্যার প্রতি অনুরাগ থাকায়, ইনি গৃহশিক্ষকের নিকট বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিক্ষার পর, তাঁহার স্বামী ৺জানকীনাথ ঘোষালের নিকট ইংরাজি শিক্ষা করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর লিখিত সাহিত্য-স্রোত পুস্তকে দেখিতে পাই যে "আমাদের অন্তঃপুরে সেকালেও লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞঠাকুর পাঁজিপুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা শুভ্রবসনা গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল, অতএব বাংলা ভাল জানিতেন, ইহা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল। কথকতা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা না-ও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেবদেবীর বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন।" এই বৈষ্ণবীটি অন্তঃপুরে বাংলা পড়াইতেন, তাহার পর কিছুদিন একটী মিশনারী মহিলা ইংরাজি পড়াইতেন, এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় সংস্কৃত পড়াইতেন। তাঁহার মেজ্‌দাদা (হেমেন্দ্রনাথ) মেঘনাদবধ প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া মেয়েদের জ্ঞানস্পৃহা বলবতী দেখিয়া, ইংরাজি হইতে ভাল ভাল গল্প অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন। অল্পদিন পরেই দেখা গেল স্বর্ণকুমারী ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন; তিনি তখনও নিতান্ত বালিকা ও অবিবাহিতা। মহর্ষির অন্তঃপুরে শুধু যে লেখাপড়ার চর্চ্চা হইত তাহা নহে, অনেকেই সূক্ষ্ম সূচী কার্য্য এবং মাটী ও সোলার নানারূপ খেলনা প্রভৃতি নির্ম্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অবসরকালে অন্তঃপুর-কক্ষে সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যারও চর্চ্চা চলিত; সাধারণতঃ বৈষ্ণবী, কীর্ত্তনী, ও নর্ত্তকীদিগের নিকট, ও যাত্রাভিনয় দেখিয়া, অন্তঃপুর-বাসিনীরা গীতশিক্ষা করিতেন। অনেকেই তখন খুব সুন্দরভাবে গীতাভিনয় করিতে পারিতেন।

বিবাহের পরেও স্বামী জানকীনাথের বিলাত যাত্রার পরে, স্বর্ণকুমারী ভ্রাতাদিগের সহিত সাহিত্য-চর্চ্চায় যোগদান করিতেন, তাঁহারাও ভগ্নীকে যোগ্য সঙ্গীরূপেই পাইয়াছিলেন। সাহিত্য-জীবনে স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামীও কম উৎসাহ দান করেন নাই; তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "বাস্তবিক স্বামীর উৎসাহ না পাইলে জীবনে এতদূর উন্নতি করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।" তখনকার দিনে সমাজে মেয়েদের অল্পবয়সে বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায়, স্বর্ণকুমারীর একাদশ বর্ষ বয়সেই কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র জানকীনাথ ঘোষালের সহিত বিবাহ হয়। শৈশব হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত স্বর্ণকুমারী অসামান্য রূপলাবণ্যময়ী ছিলেন। উপরন্তু তিনি মৃদুভাষিণী ছিলেন—কখনও তাঁহাকে কাঁহারও প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। কাহারও ব্যবহারে ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হইলে তিনি নীরব থাকিতেন, কিংবা মিষ্টমুখে মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করিতেন মাত্র, রাগ করিতেন না।

পরকে আপন করিয়া লইবারও তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল—শেষ জীবন পর্য্যন্ত সঙ্গীতজ্ঞ অনেক যুবককেই তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ ও যত্ন করিতেন; তাঁহার ভৃত্যেরাও তাঁহার সন্তানের ন্যায় ছিল। ইঁহার স্বামীও মিষ্টভাষী, সদালাপী, সরল ও নির্ভীক ছিলেন। ইনিই কংগ্রেসের বিখ্যাত কর্ম্মী ৺ জানকীনাথ ঘোষাল। নদীয়া জিলায় এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে ইঁহার জন্ম। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের আরম্ভ হইতে ১৯১২ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত, তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী হইতে জানা যায়, যুবক গান্ধী জানকীনাথের প্রতি এত শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন যে, কংগ্রেস অফিস হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় প্রত্যহ নিজহস্তে তাঁহাকে কোট পরাইয়া দিতেন। জানকীনাথের প্রভাবে মহর্ষির অন্তঃপুর বিলাতী আস্‌বাবপত্র-শূন্য হয় ও এই পরিবারে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মহর্ষি সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই লোকের ধারণা, কিন্তু তিনি পুত্রদের ইচ্ছায় বাধা দিতেন না। বিলাতের অন্ধ অনুকরণ—যথা গাউন পরা বা নাচের মজলিসে স্ত্রীপুরুষের একসঙ্গে নৃত্যের তিনি বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ যখন স্ত্রীকে বড়লাট ভবনে লইয়া যান, কিম্বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন সস্ত্রীক অশ্বারোহণে প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখন প্রতিবেশীরা আপত্তি করিলেও তিনি আপত্তি করেন নাই। পারিবারিক উপাসনান্তে উপদেশের দ্বারা দোষসংশোধন করাই ছিল তাঁহার পদ্ধতি। প্রথমে বিলাতে ও তৎপরে বোম্বাই প্রদেশে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশা দেখিয়া সত্যেন্দ্রনাথের ধারণা হইল যে, অবরোধ প্রথা মুসলমান রীতি অনুযায়ী একান্ত কুপ্রথা মাত্র। সেইজন্য বোম্বাই যাত্রাকালে স্ত্রীকে ঢাকা পাল্কী করিয়া জাহাজ ঘাট পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে বাধ্য হইলেও, সেখানে গিয়া অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক পর্দ্দা একেবারেই তুলিয়া দেন। স্বর্ণকুমারীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার মধ্যে অর্দ্ধশতাব্দীরও পূর্ব্বে বোম্বাই সহরে মধ্যমা ভ্রাতৃ-বধূর সহিত অবরোধ প্রথা ত্যাগ ও নব্য ধরণে জামা কাপড়

পরার পথ প্রদর্শন করা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে ঠাকুরবাড়ীতে এত অধিক পর্দ্দা ছিল যে, পুরস্ত্রীগণকে ঘেরা টোপ ঢাকা পাল্কীতে গঙ্গাস্নানে যাইতে হইত, ও পাল্কী শুদ্ধ গঙ্গাজলে ডুবাইয়া আনা হইত। সেকালে মেয়েদের গাড়ীচড়াও বিষম লজ্জার কথা ছিল,—আর এখন মেয়েরা ট্রামে বাসে চড়িতে, স্কুল কলেজে পড়িতে, সভাসমিতিতে যোগ দিতে, এমন কি রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত হইতেও পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অতি তরুণ বয়সেই স্বর্ণকুমারী স্বামীর সহিত রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান ও ১৮৮৯ খৃঃ বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের যে পঞ্চম অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রতিনিধিরূপে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আর যে দুইটী বঙ্গমহিলা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ৺কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও ৺বসন্তকুমারী দাস।

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা"

একথা আজ অক্ষরে অক্ষরে ধ্রুবসত্য হইতে চলিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের অসম সাহসিকতার জন্য তাঁহাকে তৎকালীন জনসমাজে অনেক অপ্রিয় মন্তব্য সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহারই ফলে আজ স্বদেশের ভগ্নীগণ স্বাধীনা এবং দেশময় আজ নারী-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তবে সেকালে স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-খ্যাতিতে দেশবাসীর চক্ষে স্ত্রীশিক্ষার যে একটি অতি পবিত্র মাধুর্য্যপূর্ণ শুভ্রমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাহিত্য-সাধনায় স্বর্ণকুমারীর ক্লান্তি ছিল না। সাহিত্যের ভাণ্ডারে তিনি যে অফুরন্ত দান করিয়া গিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে এখানে সব কয়টির নাম করিব না। কারণ শিক্ষিত বঙ্গ-সমাজ তাঁহার পুস্তকের সহিত সুপরিচিত। ইনিই বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ঔপন্যাসিক ও বোধ হয় বাঙ্গলা মাসিকপত্রের সর্ব্বপ্রথম সম্পাদিকা। ইঁহার আঠার বৎসর বয়সে রচিত প্রথম উপন্যাস "দীপ-নির্ব্বাণ" ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ "পৃথিবী" সেকালে সর্ব্বজন-প্রশংসিত হইয়াছিল। ১২৮৭ সনে স্বর্ণকুমারী বঙ্গ-ভাষায় সর্ব্বপ্রথম "গাথা" রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথও গাথা-রচনায় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদানুসরণ করিয়াছেন। "কাহাকে" ও "ফুলের মালা" নামক তাঁহার দুইখানি পুস্তক ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। "Short Stories" নামক একটী পুস্তক ও "Princess Kalyani" নামক জার্ম্মাণ ভাষায় অনুদিত একটী পুস্তক কয়েক বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে। Short Stories এর কয়েকটী গল্প তেলেগু ভাষায় অনুদিত ও দিল্লী, বোম্বাই,আজমীর প্রভৃতি স্থানে তাঁহার রচিত Fatal Garland ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার নূতন বাঙ্গলা পুস্তকের মধ্যে "দিব্য-কমল" "বিচিত্রা" "স্বপ্নবাণী" "মিলন" "রাত্রি" ও "সাহিত্য-স্রোতের" নাম সকলে হয়ত জানেন না। ১৮৭৭ খৃঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতী পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই স্বর্ণকুমারীর নানারচনায় ভারতীর পৃষ্ঠা পূর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠভ্রাতারা ইহার সম্পাদনের ভার উপযুক্তা ভগিনী স্বর্ণকুমারীর

হস্তে অর্পণ করেন। তাহার পর বহুবৎসর ধরিয়া তিনি কিরূপ দক্ষতার সহিত ইহার পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাও শিক্ষিত সমাজে অবিদিত নহে।

স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলাদেশের Theosophical Societyর মহিলা বিভাগের সভানেত্রী ছিলেন। কেবলমাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি ১৯৩০ সালে ভবানীপুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া, এই বয়সেও সেই বিরাট সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করেন, ইহা কম কার্য্যদক্ষতার পরিচয় নহে। এই উপলক্ষে লিখিত তাঁহার অভিভাষণ পাঠে সমাজের রীতিনীতির পরিবর্ত্তনের কথা, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের কথা, সবই সংক্ষেপে জানিতে পারা যায়। বাঙ্গলা-সাহিত্যে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার নিদর্শনস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৬ সালে তাঁহাকে "জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক" প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত শেষ পুস্তক "সাহিত্য-স্রোত" এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের I. A.এর পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি "সাহিত্য-স্রোতের" দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় রত ছিলেন। কিছুকাল হইতেই স্বহস্তে লিখিতে পারিতেন না, তথাপি অন্যের সাহায্যে নিজের বক্তব্য লিখাইয়া বাণীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন।

কেবল সাহিত্য-সাধনায় নহে, সমাজ-সংস্কার ও স্বদেশী-প্রচারেও স্বর্ণকুমারী মহিলা-সমাজে অগ্রণী ছিলেন। ১৮৮৬ সালে নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা, জাতীয় ভাবের উদ্রেক, ও জাতীয় শিল্পকলা বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ইনি "সখি-সমিতি" স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে প্রতিবৎসর একটী শিল্পমেলাও হইত। ১৯০৬ খৃঃ তাঁহার প্রথমা কন্যা ৺ হিরণ্ময়ী দেবী অসহায়া হিন্দু নারীদের, বিশেষতঃ বিধবাদিগকে সৎপথে থাকিয়া জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিধবা শিল্পাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাত্রীর স্মৃতিরক্ষার্থে ইহার নাম এখন "হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্পাশ্রম" দেওয়া হইয়াছে। স্বর্ণকুমারী দেবী শেষ পর্য্যন্ত এই আশ্রমের সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। স্বর্ণকুমারীর সমস্ত পুস্তকের স্বত্বাধিকার ও দুইটি বৃত্তির জন্য ২৫০০৲ টাকা, তিনি এই আশ্রমকে দিয়া গিয়াছেন।

স্বর্ণকুমারীর প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ী তাঁহার অল্পবয়সেই জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্ময়ী অত্যন্ত পিতৃ-মাতৃ ভক্ত ছিলেন। সাত বৎসর পূর্ব্বে, ১৯২৫ সালে, পরসেবা-কল্পে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সেই সময়েও স্বর্ণকুমারীকে অশ্রুপাত করিতে দেখি নাই; শুধু বলিয়াছিলেন, "আমি ত ওর 'মা' ছিলাম না, ঐই আমার 'মা' ছিল।" স্বর্ণকুমারীর অসাধারণ সহ্যগুণ ছিল। হিরণ্ময়ীর পর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ও কন্যা সরলা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠা কন্যা উর্ম্মিলা অতি অল্পবয়সেই পরলোক গমন করেন; প্রৌঢ় বয়সে উর্ম্মিলার মৃত্যুতে যে শোকের আরম্ভ হয়, বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত স্বামী, প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ী, জ্যেষ্ঠ জামাতা ৺ ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় (মিঃ পি মুখার্জ্জি, আই, ই, এস্) ও কনিষ্ঠ জামাতা রামভুজ দত্ত-চৌধুরীর অকালমৃত্যুতে সেই শোকের রেশ বাড়িয়াই

চলিযাছিল। এই সকল শোক হৃদযে গভীর ভাবে আঘাত করিলেও, তিনি নীরবে সকল আঘাত সহ্য করিযা নিজেকে বাণীর সেবায নিযুক্ত রাখেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ সিভিলিযান; বহুকালাবধি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে কার্য্য করিযা শাসন-পরিষদের মেম্বর নিযুক্ত হযেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিযা ইনি দেশে ফিরিযা মাতার সহিত বাস করিতেছিলেন। কন্যা সরলাদেবী মাতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদরা হিরণ্মযীর শিক্ষায অনুপ্রাণিত হইযা এখনও সাহিত্য সেবা ও স্বদেশ-সেবায নিযুক্ত।

১৯১২ খৃ, ২রা মে স্বর্ণকুমারীর স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে পর তাঁহার বিষযাদি পরিচালনার ভার তাঁহার উপরই পড়ে, কারণ একমাত্র পুত্র জ্যোৎস্নানাথের কর্ম্মস্থান তখন বোম্বাই প্রদেশে ছিল। এ সকল বিষযকর্ম্মও তিনি [illegible] বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন।

দেবী স্বর্ণকুমারী [illegible] বযঃক্রমে এই নশ্বরদেহ ত্যাগ করিযা অনন্তধামে চলিয়া গিযাছেন। আত্মার স্বরূপ [illegible] দেহের দুঃখে লোকে সন্তপ্ত হয না, আত্মা অচ্ছেদ্য অক্লেদ্য, অজর, অমর ও [illegible]। তাহার সেই অমর আত্মার প্রতি যেন আমরা চিরশ্রদ্ধান্বিত থাকি।
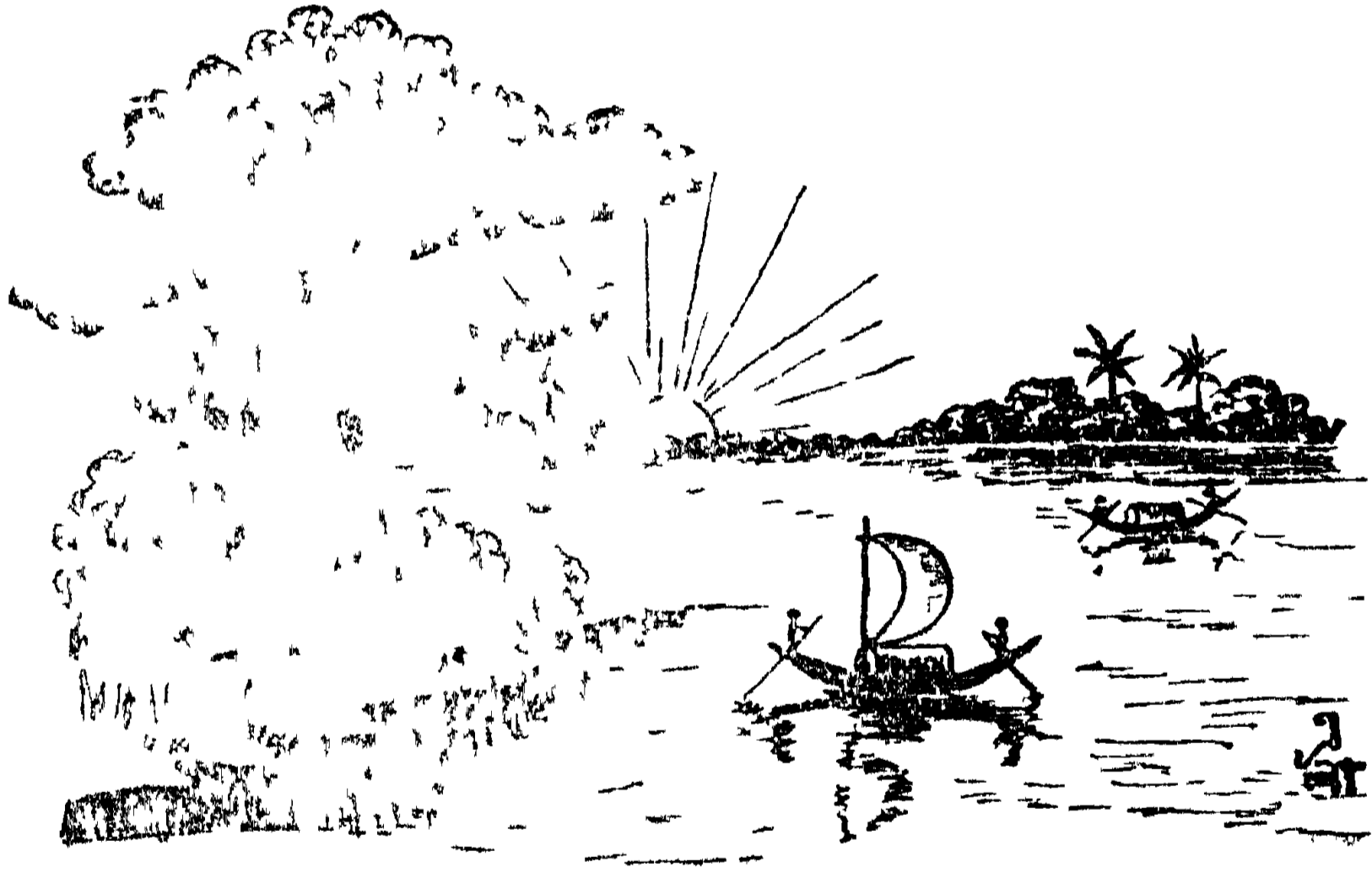
মার্গারেট্ স্যাঙ্গার—জন্মশাসনের প্রধান প্রচারক ও গুরু

শ্রীকমলা মুখার্জ্জি

মিসেস মার্গারেট্ স্যাঙ্গারকে (Mrs. Margaret Sanger) একদিন আমি বলেছিলাম, "আপনি নানা দেশে এত "জন্মশাসন" প্রচার কর্ছেন—একবার আমার স্বদেশী বোনেদের দুটো কথা ব'লে কিছু উপদেশ দিন্ না; আমি মেয়েদের কাগজে আপনার উপদেশ বাণী লিখে পাঠাব।" তার উত্তরে তিনি তাড়াতাড়ি একখানা পুরোণ কাগজ এনে আমার হাতে দিলেন ও বড় আবেগ ভরে বল্লেন—"বড় সুখের কথা যে তোমাদের দেশের মেয়েদের কাছে আমি কিছু বল্তে পারব, কিন্তু আমার বলার মত নতুন কিছুই নেই। এই বিজ্ঞাপন খানা ১৯১৬ সালে লিখেছিলাম, আমার মনে হয় যে ওটা তখনও যেমন সত্য ছিল, আজও তাই আছে, এবং শুধু এটা আমেরিকা বা ইউরোপের মেয়েদের জন্যেই নয়—সব দেশেই প্রয়োগ করা যায়। যে দেশে হোক, যে সমাজে হোক, যদি কোনও মেয়ে তার স্বাস্থ্যের জন্য অথবা তার অবস্থার জন্য, বা অন্য কোনও কারণের জন্য যদি সন্তান বা বহু সন্তান না চায়, আমার এই নিবেদন তাদের সবার কাছেই সমান ভাবে প্রয়োগ করা যায়।" সেই নিবেদনটীর অনুবাদ আমি এখানে দিচ্ছি।

মিসেস্ মার্গারেট স্যাঙ্গার

জননীগণ।

তোমরা কি বহু সন্তান পালনে সমর্থ? তোমরা কি আরো সন্তান চাও? যদি তা না চাও, তবে কেন হয়?

মেরোনা, জীবন দিওনা, কিন্তু সময় থাকতে নিরাপদ উপায়ে বন্ধ কর। এটা সম্ভব, আমরা বলে দেব। তোমার বন্ধুদের ব'লো, তোমার প্রতিবেশীদের ব'লো, সব মেয়েদের ব'লো।

আমাদের সুদক্ষ নার্সদের কাছে এ'লে উপযুক্ত অনুসন্ধান পাবে; প্রকৃত আবশ্যক হ'লে যে কোনও মা এর সন্ধান পেতে পারেন। এস, আমরা তোমাদের জীবনব্যাপী এ ঘোর সমস্যার মীমাংসা করবার জন্যে সাদরে আহ্বান করছি।"

১৯১৬ সালে ১৬ই মে উপরের এই কথা ক'টী বিজ্ঞাপনে লিখে নিউইয়র্কের দরিদ্র পাড়ার মেয়েদের কাছে বিলি করা হয়। এক সপ্তাহ না যেতেই প্রায় পাঁচ শতের উপর মায়েরা অনুসন্ধানে আসে। এই দলের মধ্যে একজন পুলিশ গোয়েন্দা মেয়ে ও মা সেজে এসেছিল; সে তার মিথ্যা দুঃখ-পূর্ণ কাহিনী ব'লে নার্সদের কাছে আবেদন করে এবং প্রয়োজন মত উপদেশ নিয়ে চলে যায়। মিনিট দশেক পরে সে পাঁচ জন পুলিশ নিয়ে আবার ফিরে আসে এবং যে তিন জন মেয়ে জন্মশাসন সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এই তিন জনের একজন অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মী হ'লেন মিসেস্ মার্গারেট্ স্যাঙ্গার। যদিও পরে এঁকে ছেড়ে দেয় তবু এঁকে অনেক বার এই কাজের জন্য পুলিশের অতিথি হ'তে হয়েছে।

পুলিশের গ্রেপ্তারে ভয় পাওয়া দূরে থাক্, মিসেস্ স্যাঙ্গারের কাজ ও তার উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল। সমাজ, স্ত্রী জাতির ওপর যে অত্যাচার করছে, তা বলাটাও যখন পুলিশে দূষণীয় মনে করে, মিসেস্ স্যাঙ্গার মনে করলেন যে যতদিন সমস্ত স্ত্রীজাতিকে না জাগাতে পারবেন, ততদিন পুলিশের অত্যাচার ও কমবেনা, সমাজের অত্যাচারও ফুরোবেনা। কাজেই পুলিশ থেকে অব্যাহতি পেয়েই কাজ আরও বাড়িয়ে দিলেন।

যদিও মিসেস্ স্যাঙ্গার কয়েক বছর থেকেই সমাজের সঙ্গে ও আইনের সঙ্গে জন্মশাসন নিয়ে লড়াই করছিলেন, তবু কিন্তু এতোদিন কেউ একে তেমন বেশী হানিকর মনে করেনি। কিন্তু এ ঘটনার পর থেকে দেশময় হৈ চৈ পড়ে গেল। জনসাধারণে বুঝ্তে পারল, এ নারী নির্ভীক। নারীজাতির মঙ্গলের জন্যে এ নারী কোন ভয়কে ভয়, কোন বিপদকেই বিপদ বলে গ্রাহ্য ক'রবে না। যদি তাকে একলাই জীবনব্যাপী ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, তবু সে কোন মতে থাম্বে না। হতভাগ্য নারীদের ন্যায্য পাওনা অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে প্রতিদিন তাদের এমন নিষ্ঠুর ভাবে যমের দুয়ারে ঠেলে দিলে যে, কোন দেশের কোন সমাজের মঙ্গল হ'তে পারে না, এটা অনেকে বুঝ্লেও কেউ পুরানো সমাজের বিরুদ্ধে, এতকালের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, বা আইনের বিরুদ্ধে যে'তে রাজী হলেন না। যারা সমাজকে ও সমাজের রীতি-নীতিকে কায়মনে মেনে চলেন তারা ভাব্লেন, সর্ব্বনাশ! একি হ'চ্ছে? ইচ্ছানুযায়ী সন্তান উৎপাদন করা বা না করা? ছি,ছি, এমন নিন্দনীয় কাজ ক'রলে সমাজে মুখ দেখাব কি করে? যারা ধার্ম্মিক, অর্থাৎ যারা ভাবেন যে সমাজের যা-কিছু আছে সবই ভাল, যা-কিছু নূতন তা সবই সমাজ-দ্রোহী, তারা বল্লেন—খবরদার, অমন কাজটী ক'রোনা। দেশ উচ্ছন্নে যাবে, সংসার ছারখার হ'য়ে যাবে, মেয়েদের দায়িত্ব ক'মে উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে যাবে। জন্ম দেওয়া না দেওয়া ভগবানের ইচ্ছা, তিনি

যাকে যত বেশী দেবেন তিনি তত বেশী ভগবানের কৃপাপাত্রী, এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রলে আমরা মহা নরকের পাতকী হব। আবার অনেকে বল্লেন, এ অসম্ভব! এ অশ্লীলতা এলে দেশে নৈতিক অবনতির আর শেষ থাকবে না! মেয়েরা দায়িত্বহীন হ'য়ে যথেচ্ছ ব্যবহারে দেশের মহা হানি করবে। তারপর যদি আবার যুদ্ধ বাধে তবে আমরা লড়াই করব কি করে? সৈন্য পাব কোথায়? শত্রুকে খুন করবে কে? সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! এ রকম চিন্তা ও মহাপাপের "প্রোপাগাণ্ডা" দেশের বিশেষ ক্ষতিকারক। থামাও এদের, এরা পাগল। অথচ যাদের জন্য এত আন্দোলন, সেই ভুক্তভোগী মায়েরাও যে প্রথম প্রথম মিসেস্ স্যাঙ্গারকে সমর্থন কর্ছিলেন তা যেন কেউ মনে না করেন। তাদের মতামত থাকলেও তা প্রকাশ করবার মত সাহস ছিল না। সমাজের ভয়ে, ধর্ম্মের ভয়ে, অনেকে প্রকাশ্যে না বল্লেও নীরবে এই পথপ্রদর্শিকা নারীকে আদর্শ মেনে নিলেন; তাঁর উপদেশ পাওয়ার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠ্লেন।

বাংলা দেশে মিসেস্ স্যাঙ্গারের নাম কতখানি পরিচিত তা আমার জানা নেই। তবে আমাদের দেশের লোক সংখ্যা যেমন বেড়ে যাচ্ছে এবং কন্যাদায় যখন আর সব দায়ের ওপরে উঠেছে, মনে হয় যে, এঁর নাম অনেকে জান্লেও কম লোকেই এঁর কথামত কাজ করেন। এই মঙ্গলময়ী নারী যে আদর্শকে লক্ষ্য ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছেন সে অতি উচ্চ। তাঁর জীবন খুব আয়াসের নয়, অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট ও ত্যাগে পরিপূর্ণ; শুধু তাই নয়, ভেবে দেখ্তে গেলে মনে হয় যেন ওঁর জীবন একখানা জ্বলন্ত নাটক! নিজের আদর্শকে চোখের সাম্নে রেখে ইনি লোকের কাছে বহু উপহাস—নির্য্যাতন, দুঃখ, কষ্ট সহ্য ক'রেছেন। যাদের দরিদ্রতার শেষ নেই তাদের জন্য, যাদের ভগ্ন স্বাস্থ্য তাদের জন্য, যারা বহু সন্তানের মা হ'য়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে, ইনি তাদের জন্যে এত সহ্য করেছেন; তাদের দুঃখময় জীবনের কথা ভেবে বহুবার হাসিমুখে কারাগার বরণ ক'রে নিয়েছেন।

এই আলোক-প্রদর্শিকা নারীর নাম ও তাঁর মহৎ কাজের কথা, পাশ্চাত্য জগতে জানে না এমন লোক খুব কমই আছে। ধনী, দরিদ্র শোকগ্রস্ত, সকলের কাছে শুধু যে ইনি পরিচিত তা নয়, এ যুগে ইনি যে এক যুগান্তর এনেছেন এটাও অনেকে মনে প্রাণে স্বীকার করেন। অনেকে যা চাইত, কিন্তু সে উপায় জান্ত না। কেমন করে ইচ্ছামত সন্তানের মা হওয়া যায় অথবা না হওয়া যায়, ইনি সেই উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন।

বিয়ের আগে মিসেস্ স্যাঙ্গার একজন বিশেষ সুদক্ষ নার্স ছিলেন। সুখে দাম্পত্য-জীবন ভোগ করে ও তিনটী সুন্দর ও বলিষ্ঠ সন্তানের মা হ'য়ে তিনি আবার তাঁর নার্সের কাজে মনযোগ দিলেন। বহু হাঁসপাতাল ও "ওয়েল্ ফেয়ার এজেন্সির" (Welfare agencies) সংস্পর্শে আসার দরুণ ইনি নিউইয়র্কের দরিদ্র পাড়ার দরিদ্রদের সংস্পর্শে আসেন। দরিদ্র মায়ের বহু সংখ্যক অপগণ্ড শিশু—মায়ের অকালমৃত্যু ইত্যাদি তাঁর করুণ হৃদয়ে এক ভীষণ প্রলয় সৃষ্টি করে। ইনি ঠিক বুঝ্তে পারলেন যে, সংসারে মায়েদের এত দুঃখ কষ্ট, অনাহার, অনশন, অকালমৃত্যুর

প্রকৃত গলদ কোথায়, এবং কি ভাবে এই জীবন-মরণ সমস্যার মীমাংসা করে এদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান যায়। তাই এইখানে এই দরিদ্র পাড়াতেই মিসেস্ স্যাঙ্গার তাঁর মহৎ কাজ সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করেন। লোকের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, আইনের বিরুদ্ধে ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, ইনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন—কামান বন্দুক দিয়ে নয়, লাঠি ছোরা দিয়েও নয়—কাগজে কলমে ও বক্তৃতায়।

জনকোলাহল পূর্ণ নিউইয়র্কের লোকগুলো কত কি কাজে ব্যস্ত—কেউ টাকা টাকা ক'রছে, কেউ বড় বড় বাড়ী তৈরী ক'রছে আর কেউ বা ভোগ বিলাসে ডুবে আছে। কিন্তু একটী মাত্র সমস্যাই মিসেস্ স্যাঙ্গারের সারা মন জুড়ে ছিল। প্রতিদিন এই যে কত অনাহারক্লিষ্ট বিপদ্‌গ্রস্ত অধিকার ক'রে নারী অকালে প্রাণ হারাচ্ছে, কত সংসার ছারখার হয়ে যাচ্ছে, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কি করে, কি উপায়ে? ভগবান, তোমার রাজ্যে এ অবিচার কেন? চিরদিনই কি পুরুষেরা নিজেদের স্বার্থ বজায় রেখে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, নারীকে নরকের ভয় দেখিয়ে অন্ধকারে রেখে দেবে? নারীরা কি চিরদিনই নীরবে সকল দুঃখ সহ্য ক'রে সংসারে একটা ভারবাহী কেনা হয়ে অসহ্য দুঃখ কষ্টকে নিজের প্রাপ্য পাওনা বলে মেনে নেবে? অসময়ে মা হ'তে গিয়ে প্রাণ দেবে—না মুখ ফুটে বল্‌বে "আমিই আমার দেহের মালিক, আমার স্বাস্থ্যে অবস্থাতে ও বাসনাতে যেমন কুলোয়, যতদিন অন্তর যে ক'টী সন্তান আমি চাই, আমি কেবল সেই ক'টী সন্তানের জননী হব—তার একটীও বেশী নয়। যে ক'টী সন্তানকে স্বেচ্ছায় জগতে আন্‌ব, আহারে, স্নেহে, যত্নে যে ক'টীকে বলিষ্ঠ ও সক্ষম কর্‌তে পারব, সে ক'টীই চাই, তার বেশী নয়।" এতে ভয় নাই, আনন্দ আছে, দুঃখ নাই সুখ আছে, এতে নারীর হৃদয় মাতৃত্বের গরিমায় ভ'রে ওঠে, পারিবারিক জীবন সুখময় হয়, সংসারে শান্তি আসে। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে এ জাগরণের সাড়া আস্‌তে পারে কেবল শিক্ষার ভেতর দিয়ে—তাই প্রকৃত শিক্ষা-প্রচার কাজই হ'ল এ জাগরণের প্রধান ও প্রথম কাজ।

মিসেস্ স্যাঙ্গার তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটী বেশ একটু উজ্জ্বলতর ক'রে বড় আবেগভরে বল্লেন, "আমরা কি ভেবে দেখি, বহু সন্তানের মা হতে গিয়ে কত মায়ের অকালমৃত্যুতে কত সন্তান আশ্রয়হীন, স্নেহহীন, গৃহহীন হয়ে নানা শিশু-আশ্রমে যাচ্ছে? কত সন্তান অযত্নে, অখাদ্যে প্রাণ হারাচ্ছে, কত শিশু ছয় সাত বৎসর বয়সে নিজের জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? অভাবের তীব্র তাড়নায় শিশুর দল নানা প্রতিষ্ঠান ("ইন্‌ষ্টিটিউশান্") এ ছড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে আমি নিজে একটী পরিবার দেখেছি—কুৎসিৎ ব্যারামে মায়ের মাথা খারাপ হয়ে পাগলা গারদে গেল—চারটী অপগণ্ড শিশু নিয়ে বাপ হতাশায় পূর্ণ। আর একটী পরিবারে, স্বামী মাতাল, স্ত্রী ছয় বছরে চারটী সন্তানের জননী, আবার গর্ভবতী, অথচ ভগ্নস্বাস্থ্য; কেঁদে বল্লে, আর এভাবে জীবন চল্‌তে পারে না তাই সন্তান যাতে না হয় তারই বিপদজনক চেষ্টা কর্‌ছি; পরিণাম বেচারীর পঁচিশ বছরে অকালমৃত্যু। সহায়হীন শিশুর দল মায়ের শোকে কাঁদে আর কাঁদে, শেষটা স্থান হোল শিশু-আশ্রমে।

দুঃখ, দারিদ্র্য, অপরিষ্কার বাড়ীঘর, অশিক্ষা, কুশিক্ষা নিয়ে এই হতভাগ্য নরনারীর জীবন কি চিরদিনের জন্য অন্ধকারে ঘিরে থাকবে ? না, না, এ হ'তে পারে না, কখনোই হ'তে পারে না, কিছুতেই হ'তে পারে না। নারীর এ জীবনব্যাপী সমস্যার একটা মীমাংসা নিশ্চয়ই আছে এবং সেটা এইখানে—এই দরিদ্র পাড়াতেই আরম্ভ করতে হবে। মিসেস্ স্যাঙ্গার বল্লেন, "সেদিন আমার চোখের সাম্নে সমস্ত আলো নিবে একটা ভীষণ অন্ধকার এসে দাঁড়াল—তারপর সেই অন্ধকার যেন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে গেল—আমি ঠিক বুঝতে পারলাম আমার এই কর্ম্মজীবন এই নূতন দিনে জগতের সঙ্গে প্রথম আরম্ভ হল।" আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখ্লাম, আমার মনে হ'ল যেন সমাজের অত্যাচার, অবিচার মনে করে যেন তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে, আবার বহু হতভাগ্য নারীর কথা ভেবে যেন পরমুহূর্ত্তে চোখে জল ভরে আস্ছে। চেয়ারে একটু ভাল করে হেলান দিয়ে বসে উনি আবার বলতে লাগ্লেন "সেই দিন থেকে আমি ঠিক করলাম যে, এই অনিচ্ছাকৃত, অযাচিত জন্মদান বন্ধ করতে হবে। লজ্জাকে দূরে ঠেলে ফেলে অনেক দুঃখ, বাধা, বিঘ্ন-বিপদকে মাথা পেতে নিতে হবে। সমগ্র নারীজাতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং নির্ভীক ভাবে বলতে হবে, আমেরিকাবাসী নারীগণ! তোমরা জাগ, সমস্ত নারী-জগতকে জাগাও। নারীকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাও—শিশুকে মাতৃহীন হ'তে দিয়োনা। নারীকে অনিচ্ছাকৃত, অযাচিত, বহু সন্তানের মা হতে দিয়ে তাকে মৃত্যুর দ্বারে ঠেলে দিওনা—উপায় আছে। এই দরিদ্র নারীদের দুঃখময় জীবন, মা ও সন্তানের অকালমৃত্যুর হৃদয়বিদারক কথা আমি মুক্তকণ্ঠে সকলকে শোনাব, সকলকে শুনতে হবে, ভাবতে হবে, মান্তে হবে। তার দাম যত লাগে লাগুক, কোন লোক্সান নাই।"

মনের এই অবস্থা নিয়ে যখন মিসেস্ স্যাঙ্গার আমেরিকার "ফেমিনিষ্ট'দের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন তাঁদের সকলের কাছ থেকেই তিনি বিশেষ উৎসাহ ও সহানুভূতি পান। এই আগ্রহ, উৎসাহ ও সহানুভূতি পেয়েই তিনি ফ্রান্সে গেলেন। ফ্রান্সে যাওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, ও দেশে কিছুকাল থেকে ফরাসীদের "Family limitations" সম্বন্ধে খুব ভাল করে শিখে আস্বেন। এক বছর ফরাসী দেশে থেকে বহু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রে কিন্তু সম্পূর্ণ সফলতা লাভ না করে তিনি আমেরিকায় ফিরে আসেন; এবং কয়েকটী বিজ্ঞ আমেরিকান ডাক্তারের কাছে উপদেশ নেন।

তারপরে তিনি কাগজে কলমে ও বক্তৃতায় খুব প্রচার আরম্ভ ক'রলেন—সারা দেশময় এক ভীষণ হৈ হৈ পড়ে গেল। এই "ধর্ম্মবিরুদ্ধ গর্হিত কাজের" কথা জানতে কারো বাকী রইল না। বড় বড় ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিতরা ও একদল গোঁড়ারা চীৎকার করে বল্লেন, "এইবারে আমরা রসাতলে যেতে ব'সেছি; মেয়েরা বাড়ীঘর, সংসার-ধর্ম্ম কিছুই আর মানবে না, আনবে কেবল উচ্ছৃঙ্খলতা। ধর্ম্ম-সমাজ, মানুষের যা কিছু শ্রেয় ও প্রেয় সবই এই ব্যভিচারে ডুবে যাবে।" নানা দলের নানা মত হ'লেও একদল মিসেস্ স্যাঙ্গারের উপদেশ ও ঐকান্তিকতা দেবতার আশীর্ব্বাদ ব'লে মেনে নিল। একবার এই জন্মশাসন প্রচার কার্য্যে ইনি যখন গ্রেপ্তার হ'লেন ও পুলিশের গাড়ী এসে যখন ওঁকে ধরে

নিয়ে যাচ্ছে, তখন একটী দরিদ্র নারী গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চেঁচিয়ে কেঁদে ব'লেছিল, "ওগো, তোমরা ওঁকে নিয়োনা, ওঁকে ছেড়ে দাও আমার দরকার—আমি ব্যাধিগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত উনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন।" এই গ্রেপ্তারে ইনি একমাস কারাগারে বন্দী ছিলেন। মিসেস্ স্যাঙ্গারের অনেক বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁকে এ সময়ে এ পথ থেকে নিরস্ত হতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কোটি কোটি নারীর অকালমৃত্যুর তুলনায় তাঁর কারাগার বরণ বা জীবন বিসর্জ্জন কতটুকু? দুঃখী মায়েদের অনাহার-ক্লিষ্ট মুখ, ব্যাধিগ্রস্ত দেহ, ক্ষুধিত শিশুর করুণ কান্নাই সবচেয়ে তাঁর প্রাণে আঘাত করল। আমেরিকার "লজ্জাহীনা" ও "অবাধ্য" মেয়ে কোন বাধা বিঘ্নকে না মেনে আপনাকে দরিদ্র মেয়েদের ভেতর—বিপদগ্রস্ত নারীদের ভেতর বিলিয়ে দিলেন।

আমেরিকার মত আধুনিক দেশেও জন্মশাসন (Birth control) সম্বন্ধে প্রচার করা বা উপদেশ দেওয়া এখনও বে-আইনি। মিসেস্ স্যাঙ্গারের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এটাকে এখনও আইন-সঙ্গত (legalise) করা সম্ভব হয় নাই। ইনি চেষ্টা কর্‌ছেন, কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে আইন পাশ ক'রতে—যাতে ডাক্তারেরা আবশ্যক মত বিপদ-গ্রস্ত মেয়েদের সম্পূর্ণ বিপদহীন বৈজ্ঞানিক ওষুধ ও উপদেশ দিয়ে তাদের বিপজ্জনক ওষুধ ও আরও বিপদ-জনক ভ্রূণ-হত্যার হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন পর্য্যন্ত এ আইন পাশ হয়নি, ফলে এই হচ্ছে যে প্রতি বছর ভ্রূণ-হত্যায় (abortion) বহুনারী প্রাণ হারাচ্ছে। সমাজ এ সব দেখেও চোখ ফিরিয়ে নেবে, কথা ব'লবে না, তবু সময় মত ভাল উপদেশ দিতে দেবে না। অদ্ভুত আইন! সন্তান হ'তে মা প্রাণ দিতে পারে, তবু ডাক্তার উপদেশ দিতে পারবে না যে অসময়ে সন্তানের মা হ'য়ো না; উপদেশ দিলে আইনতঃ পুলিশ ডাক্তারকে গ্রেপ্তার কর্‌তে পারে। মিসেস্ স্যাঙ্গারের চেষ্টা, যাতে ডাক্তার বিনা বাধায় এ উপদেশ দিতে পারে। ভ্রূণহত্যা করা নয়—এমন উপায়ের উপদেশ দেওয়া যাতে ইচ্ছানুযায়ী সন্তান হতে পারবে অথচ মায়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হবে না।

মিসেস্ স্যাঙ্গারের অক্লান্ত পরিশ্রমে, চেষ্টায়, সাহসে, সহানুভূতিতে আজ কত সংসার সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে, কত নরনারী প্রতিদিন তাঁর কত দীর্ঘায়ু কামনা ক'রছে, ভাব্‌লে ভক্তি ও ভালবাসায় তাঁর কাছে মাথা নত হয়। কত দুর্ভাগিনী নারীর জীবন এই প্রচার কার্য্যে বেঁচে গেছে ভাব্‌লে অবাক্ হ'তে হয়। এই কাজ যদি আইন-সঙ্গত হ'ত, সমাজে এত নিন্দনীয় না হ'ত, তাহ'লে আরও কত সুখের কত আনন্দের ছবি ঘরে ঘরে দেখা যেত। নারীজাতি যেদিন তার নারীত্ব ও মাতৃত্ব বজায় রেখে জীবনের কর্ত্তব্য ক'রে যেতে পারবে, সেদিন আর আইন নিয়ে মারামারি ক'রতে হবে না—নারীর অকালমৃত্যুও হবে না—ভ্রূণ-হত্যার বন্যাও বইবে না।

মিসেস্ স্যাঙ্গারের কাছে শেষে যখন আমি বিদায় চাইলাম, তখন তিনি আমাকে বিশেষ ক'রে বল্লেন—"ভারতবর্ষের মেয়েদের ব'লো, আমি তাদের সব রকম আন্দোলনের ও সদনুষ্ঠানের খবর রাখি, এবং তাদের সব কাজেই আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।"

কুয়াশা

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

ক্লান্ত পূর্ণিমার নিশি ধরণীর পর
হানে তার স্নিগ্ধ আলো, অরণ্য মর্ম্মর
বাতাসে ধ্বনিত হয় দূরে যায় দেখা
আকাশ মিশেছে যেথা সেথা বন রেখা,
ক্ষুদ্র তরু গুল্ম মেলি ঊর্দ্ধ পানে চায়,
কুসুমে কুসুমে ঘেরা মালতী লতায়
চতুর্দ্দিকে গন্ধ ঢালে। বাজে নৃত্যধ্বনি,
সে কোন্ গহন হতে আসে নির্ঝরিণী
সমুখের পথ দিয়ে বুঝি থেকে থেকে
বাতাসের স্পর্শ লাগি বেদনা-চঞ্চল
ক্ষুব্ধ ঊর্ম্মি ঊর্দ্ধে ওঠে তারি কলরোল
মুগ্ধ করে বনভূমি। মোর মনে পড়ে
যে কথা বলিতে গিয়া বলি নাই ঘরে,
যে পথে চলিব ভাবি দেখিনু সে পথ
আড়াল করেছে এক বিশাল পর্ব্বত,
যে কথার যে পথের হয়েছিল শেষ
আমি নই পূর্ণিমার আলোতে অশেষ,
সেই পথ দেখি দূরে শঙ্কা নাহি গণি
পর্ব্বত ভেদিয়া আজ এলো নির্ঝরিণী
নৃত্য করে ঊর্ম্মিরাজি। বনে লাগে দোল
অরণ্য মর্ম্মর আর জল-কল্লোল
বাতাসে বাতাসে বাজে নীলাম্বর খানি
মেলে তার মুগ্ধ দৃষ্টি। তখন কি জানি
এই মত্ত নৃত্য শেষে জল যাবে নেবে
এই পূর্ণিমার আলো রজনীর প্রেমে
চিরকাল নাহি মুগ্ধ রবে। শুধু মন মাঝে
এ অমৃত কল-ধ্বনি ডাক আনিয়াছে

সিক্ত তট প্রান্ত দিয়া যেতে হবে দূরে
নূতন পথের পাশে নূতন বন্ধুরে
আজিকে নিকটে পেতে হবে। সেই প্রিয়া
নীরব নয়নখানি নেবে বুলাইয়া
পথশ্রম-ক্লান্ত মুখে। মধুর সরস
অরুণ প্রভাতালোকে প্রথম পরশ।
অশান্ত হৃদয় খানি ঊর্দ্ধ পানে জাগে
চঞ্চল চরণে আজ ক্লান্তি নাহি লাগে,
পদে পদে পথ পরে বাজে পদধ্বনি
সাথে মোর নৃত্যশীলা ছোটে নির্ঝরিণী,
বক্ষে কার স্পর্শ বাজে বলি ভালবাসা,
কে আমারে ঊর্দ্ধে টানে তাই ছোটে আশা
বৃক্ষ শাখে জাগে পক্ষী ডাকে আত্মহারা
সম্মুখের আকাশেতে হাসে শুকতারা,
দীর্ঘ পথ হয় শেষ চেয়ে দেখি দূরে
মুকুলিত বৃক্ষতলে নূতন বন্ধুরে,
কুসুমে কুসুমে তার ঢাকিয়াছে দেহ;
গুণ্ঠন খুলিলে আর রবে না সন্দেহ—
সুনীল অম্বর হতে এ ধরণী তলে
পড়িয়াছে ঊষা আলো ঘন কালো জলে
পরিহাস হাসি সম। তখনি সহসা
মর্ম্মে পড়ি হানে মোর কে সুতীব্র কশা,
চকিতে গুণ্ঠন খানি খুলে দেখি হায়
জোছনা আলোকে আর মালতী লতায়
সে মোর রাতের মায়া। কোথায় রে পথ,
সমুখে অচল সেই বিশাল পর্ব্বত?
সিক্ত চিত্ততটপাশে কাঁদে ক্ষুব্ধ আশা,
আকাশে কাটিয়া আসে রাতের কুয়াশা।

গোলক ধাঁধাঁ

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

১০

টেবিলের কাছে বসিয়া শান্তা একখানা চিঠি পড়িতেছিল। অতসী লিখিয়াছে—আজ একবার তাহাদের ওখানে যাইতেই হইবে। অনেকদিন শান্তা যায় নাই, তাহার সঙ্গে অনেক গল্প জমা হইয়া আছে। তা ছাড়া অতসী দুএকদিন পরে দার্জ্জিলিং বেড়াইতে যাইবে, মাস দুই সেখানে থাকিবার কথা। সুতরাং ইহার মধ্যে একদিন দেখা না হইলেই নয়। অতসী তাহার জন্য 'কার' পাঠাইয়া দিবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু ব্যারিষ্টার মহাশয়ের অপরিহার্য্য প্রয়োজন বশতঃ সেখানা বিকাল বেলা খালি পাওয়া যাইবে না, কাজেই সে শান্তাকে স্বয়ং আসিতে অনুরোধ জানাইতেছে। মোটের উপর শেষকথা এই যে, যেমন করিয়াই হউক, আজ তাহার আসা চাই-ই, নহিলে অতসী ভয়ানক রাগ করিবে।

চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরিতে পুরিতে শান্তা দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যকাম। পরণে তার পাৎলা ফিন্‌ফিনে পরিষ্কার একখানি সরুপেড়ে ধুতি, গায়ে ধব্‌ধবে শাদা পাঞ্জাবী, প্রত্যেকটি ভাঁজ যেন সদ্য খোলা হইয়াছে, গলার বোতামটাও খোলা। আধুনিক কায়দা-কানুনের কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নাই। শান্তা যখনই তাহাকে দেখে, আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে, সর্ব্বক্ষণ বেশভূষায় এমন পারিপাট্য ছেলেটি কেমন করিয়া বজায় রাখে?

সত্যকাম সুষমার উদ্দেশ্যে যাইতেছিল। শান্তা দরজার কাছাকাছি হইতেই, তাহার গতিমন্থর হইল, সত্যকাম ঘুরিয়া দাঁড়াইল; মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, গেজেট এনেছি, দেখবেন?

শান্তা দেখিল, সত্যকামের হাতে একতাড়া কাগজ।

উৎসুক হইয়া বলিল, "কই, দেখি!" নিজের পরীক্ষা উত্তরণের সংবাদ বহুপূর্ব্বেই শান্তার জানা ছিল, তবু পরীক্ষার্থীর গেজেটের উপর বিষম লোভ।

সত্যকাম ঘরে ঢুকিল। টেবিলের উপর গেজেট নামাইতেই শান্তা সর্ব্বাগ্রে খুঁজিয়া বাহির করিল ইংরাজী অনার্সের তালিকা। অতসী প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করিয়াছে—করিবে যে তাহা শান্তা আগে হইতেই জানে—তবে একেবারে নীচে। ঠিক তাহার নামের নীচেই দ্বিতীয়শ্রেণীর প্রথমস্থানে যে নামটি চোখে পড়িল, তাহার তলায় আঙুল দিয়া শান্তা সত্যকামের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "এ আপনি, না?"

সত্যকাম হাসিল।

শান্তা দেখিয়া চলিল। আর সত্য টেবিলের গায়ে ঠেস্ দিয়া একটু হেলান ভাবে দাঁড়াইয়া চারিদিকে ছড়ানো এলোমেলো বইগুলির মধ্যে আঙুল নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

সত্যকাম স্বভাবতঃ বাক্‌পটু। মনের ভিতরটা অত্যন্ত সরস, সুতরাং উর্ব্বর; কাজেই তাহাতে কথার অঙ্কুর ডালপালা সমেত গজাইয়া উঠিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না, একটিবার বীজ পড়িলেই হইল। কিন্তু শান্তার সম্মুখে আসিয়া সে অদ্ভুতভাবে বাক্যহীন হইয়া পড়ে, কারণ শান্তা নিজে বড় কম কথা কয়। তাহাকে দেখিলেই সত্যকাম অনুভব করে, সে যেন বড় বেশী দূরে। বাস্তবিক পক্ষে, শান্তা যে কথা বলিলে উত্তর দেয় না অথবা সত্যকামের সান্নিধ্য হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া চলে, তাহা নয়। সত্য স্বয়ংও এ অপবাদ তাহাকে দিতে পারে না। যে কয়টা কথা শান্তা এ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে বলিয়াছে, সত্য শুনিয়া শুনিয়া দেখিয়াছে তাহার বোধ হয় প্রত্যেকটি হাসিমুখে—কোথাও রূঢ়তা, অহঙ্কার অথবা সঙ্কোচ প্রকাশিত হয় নাই। তবু কেন যে তাহাকে এত গম্ভীর ও আয়ত্তের বাহিরে মনে হয়, সত্যকাম বুঝিতে পারে না। শান্তা সাধিয়া কখনও তাহার সহিত কথা বলে নাই—তেমন প্রয়োজনই বা হইয়াছে কই? এবং প্রয়োজন না হইলে শুধু গল্পের খাতিরে গল্প করিবার মত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও তাহার সঙ্গে শান্তার হয় নাই। কিন্তু কেন যে হয় নাই, তাহাই সত্যকামের কাছে ভাবিবার বিষয়। শান্তার সঙ্গে কথা বলিতে হইলে চিন্তা করিয়া প্রসঙ্গ আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সত্যকাম অগ্রসর হইয়া তাহার সহিত কথার অবতারণা করিবে, তবে তাহার তরফ হইতে প্রত্যুত্তর মিলিবে। এ রকম করিয়া কাঁহাতক পারা যায়? মাঝে মাঝে ইহাতে সত্যকামের অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে। কিন্তু বাদ দিতেও পারে না, শান্তার ঐ বিশেষত্বটুকুর জন্যই। এ যাবৎ যেখানেই যাহাদের সঙ্গে সে মিলিত হইয়াছে, আপনার প্রাণপূর্ণ গতিবেগে সকলকে ভাসাইয়া লইতে দেরী হয় নাই। এইখানে বাধা পাইয়া নদী-স্রোতের মতই তাহার মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত্ত জাগিয়া উঠিতেছে। সহজে যদি নিজের পথে বহিয়া যাইতে পারিত, তবে সত্যকামের মনে শান্তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবার কোনও সম্ভাবনা হয়ত ছিল না। কিন্তু কার্য্যতঃ এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, শান্তার প্রতিই লক্ষ্য পড়ে তার সবচেয়ে বেশী। নিজের সঙ্গে তাহার প্রভেদ এত অধিক যে, সত্যকাম বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে।

খানিক পরে সত্য বলিল, "আপনি ফিলজফি অনার্স নিলেন কেন? খুব ভালো লাগে বুঝি?"

"হ্যাঁ—খুব।"

"আমার কিন্তু মোটেই না।"

শান্তা একটু হাসিল।

একটু পরে আবার সত্যকাম জিজ্ঞাসা করে, "এম্-এ পড়বেন?"

শান্তা বলিল, "না—হবে না।"

"কেন?"

কাকাবাবু অথবা মা, কেহই যে তাহাকে ইউনিভার্সিটীতে গিয়া পড়িতে দিতে সম্মত নহেন তাহা শান্তা জানে। কেন—তাহাও জানে। এমন করিয়া তাহার পড়াশুনায় বাধা পড়াতে তাহার মনের মধ্যে ক্ষোভ রহিয়াছে প্রচণ্ড। কিন্তু গুরুজনদিগের এই প্রাচীনোচিত সঙ্কীর্ণতাকে লোকের কাছে প্রচার করিয়া ফিরিতে তাহার সাধ নাই—অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। সে বলিল, "এমনিই।"

কথা আর বেশীদূর অগ্রসর হইল না।

বিকালবেলা সেদিন শান্তা সকাল সকাল হাতমুখ ধোওয়া শেষ করিল। প্রিয়লালবাবু কলেজ হইতে ফিরিলেই তাঁহার কাছে অতসীর আহ্বান পত্রের কথা বিবৃত করিয়া তাঁহার সহিত রওনা হইবে। অতসী কি কি বই চাহিয়াছে, সেগুলি আলমারী হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গুছাইয়া রাখিল। চুল বাঁধিয়া কাপড়চোপড় নামাইয়া একবার ইন্দুমতীর কাছে বসিয়া বলিল, "আজ বোধ হয় ফির্‌তে একটু রাত হবে মা।" ইন্দুমতী বলিলেন, "তা হোক্, কখন ফিরবি কাকাবাবুকে বলে দিস্।"

কিন্তু প্রিয়বাবু এখনও ফিরিতেছে না যে! অন্যান্যদিন চারিটার বেশী কিছুতেই হয় না, আজ সাড়ে চারিটাও বাজিয়া গিয়াছে। যেখানে অতি আশা সেখানে ভোজন নষ্টই হয়—শাস্ত্রের বচন। শান্তা মনে করিল, তাহার ভাগ্যেও বুঝি আজ তাই। খানিকক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সুষমার কাছে গিয়া বলিল, "কাকীমা, কাকাবাবু আজ এত দেরী কর্‌চেন কেন বল তো?"

"আজ ওঁদের প্রফেসার্‌স্ য়ুনিয়ান না-কি একটা আছে যে!"

উৎকণ্ঠিত হইয়া শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরতে কত দেরী হবে জানো?"

"সন্ধ্যে নাগাৎ ফিরবেন বোধ করি।—কেন রে?"

শান্তা বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ!"

সুষমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল্ তো?"

"বাঃ, অতসীর ওখানে যেতে হবে যে আমার! কাকাবাবু না এলে কে নিয়ে যাবে?—" সুষমার মনে পড়িয়া গেল, "ও-হো! তাইত!"

সন্ধ্যার সময় কলেজের পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরিলে আবার যে তৎক্ষণাৎ প্রিয়বাবুকে কাজে পাঠানো সেটা বড়ই অসঙ্গত হইবে। ব্যাপারটিও এমন অত্যাবশ্যক কিছুই নয়। এজন্য তাঁহাকে বিরক্ত করিতে শান্তার সঙ্কোচও হইবে, সাহসেও কুলাইবে না। সে একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। না গেলে অতসী সত্যই রাগ করিবে, ইহাও ভাবিবার কথা। অতসী তো বোঝে না, তাহার মত শান্তার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দ গতি নাই—তাহাকে সব কিছুর জন্যই অন্যের মুখাপেক্ষা হইয়া থাকিতে হয়।

ক্ষুণ্ণমনে শান্তা বলিল, "কি করব তা'হলে, বল না কাকিমা?"

"আর একটু অপেক্ষা করে দেখ ভাই, আমি দেখ্‌ছি উনি না নিয়ে যেতে পারলে আর কি বন্দোবস্ত করা যায়।"

শান্তা কতক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রায় হতাশ হইয়া ছাদে চলিল। রেলিংয়ে ভর করিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কাকাবাবু কখন আসেন। আসিলেও আজ আর যাইবার বেশী আশা নাই। রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া, মোটর ট্রাম কত ছুটিতেছে—একটা কিছু আশ্রয় করিয়া সে সোজা-সুজি চলিয়া গেলেই তো পারিত। এত হাঙ্গামা কেন? অনর্থক কেন যে মানুষ এত অসুবিধার সৃষ্টি করিতে ভালবাসে! না যাইতে পারিলে তাহার এবং অতসীর মনস্তাপ, অথচ লইয়া যাইতে হইলে কাকাবাবুর বৃথা পরিশ্রম।

পিছন হইতে সত্যকাম কথা কহিল, "ইন্‌টেরাপ্‌ট্‌ কর্ত্তে পারি?"

বিশেষ চমকিত না হইয়া ধীরে পশ্চাৎ ফিরিয়া শান্তা বলিল, "কেন?"

সত্যকাম একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। থতমত খাইয়া বলিল, "না—কিছু নয়। এমনি।"

শান্তা একটুখানি হাসিয়া আবার আগের মত রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইল।

সঙ্কোচ ও ক্ষোভে সত্যকামের মনটা যেন একটু কেমন করিয়া উঠিল। করিবার কথাও। অন্য কেহ যদি তাহার উপস্থিতিকে এমন করিয়া অবহেলা করিত, তাহা হইলে হয় আপনার সহজ চাঞ্চল্যের অপ্রতিহত গতিতে মুহূর্ত্তমধ্যে সে তাহাকে জয় করিয়া লইত, নয় ত অসন্তুষ্ট ও অপমানিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিত। কিন্তু শান্তার কথা স্বতন্ত্র! শান্তার নির্লিপ্ত ব্যবহার তাহার অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, এ যে ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা নয়, অন্ততঃ এটুকু সত্যকাম বুঝিতে পারে। তাই সান্ত্বনা।

একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে বলিল, "কেউ আসবেন নাকি? কারো জন্য 'ওয়েট' কর্চ্ছেন মনে হচ্ছে?"

"দেখচি কাকাবাবু আসেন কিনা। আমার এক ফ্রেণ্ডের বাড়ী যাওয়ার দরকার ছিল, কাকাবাবু এলে পরে যাওয়ার ব্যবস্থা করব।"

"মিস্ চৌধুরী বুঝি?

হাসিয়া শান্তা বলিল, "কি করে জানলেন?

সত্য হাসিয়া উত্তর করিল, "চোখ কাণ বুদ্ধি সবই একটু একটু আছে, তাই!"

রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া শান্তা উদ্‌গ্রীব, পরে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল।—"নাঃ আজ আর হবে না। ভারি মুস্কিলেই: পড়লাম দেখ্‌চি।"

সত্যকাম বলিল, "খুব দরকার বুঝি।"

"দরকার—হ্যাঁ।—একরকম দরকারই ছিল বটে।"

"চলুন না, আমি দিয়ে আস্‌তে পারি। অবশ্যি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।—"

শান্তা বিপদে পড়িল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না—আমার আমার আর আপত্তি কি—তবে—থাক্, আপনি মিছিমিছি আবার কি কর্ত্তে যাবেন?"

"থাক্ তবে।"

সত্যকামের ছোট্ট এই কথাটুকুর ভঙ্গীতে একটা খোঁচা ছিল, শান্তার মনে গিয়া তাহা বিঁধিতে দেরী হইল না। ব্যস্ত হইয়া সে বলিল, "আমার তেমন বেশী জরুরী দরকার নেই সত্যি।"

আসল কথা শান্তা জানে। প্রিয়বাবু কখনই তাহাকে এত অল্পদিনের পরিচয়ে সত্যকামের মত অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে একাকী কোথাও যাইতে দিতে রাজি নহেন। সে যদি সত্যকামকে পথপ্রদর্শক করিয়া এখন অতসীর বাড়ী চলিয়া যায়, তাহা হইলে প্রিয়বাবু তাহার মুখের সাম্‌নে কিছু ভর্ৎসনা করিবেন অথবা উপদেশ দিবেন তাহা আদৌ নয়। কিন্তু তাহার আচরণ সম্বন্ধে প্রিয়বাবুর মনের মধ্যে যে বিন্দুমাত্র সংশয় অথবা বিরূপতা লুকাইয়া থাকিবে, ইহা শান্তার দুঃসহ। তাহাতে তাহারও অপমান, বেচারী সত্যকামেরও অপমান। সুতরাং উপায় নাই!

সত্যকাম আর কোনও কথা কহিল না—চুপ করিয়া রহিল। মনের মধ্যে ভারি রাগ হইতেছিল। বাল্যকাল হইতে অতি আদরে প্রতিপালিত সে সহজেই বড় অভিমানী—কাহারও এতটুকু অনাদর বা উপেক্ষা সহিতে পারে না। এই মেয়েটি কি বলিয়া তাহাকে অবহেলা দেখাইতে সাহস পাইল? অবিশ্বাস করিল? কথাগুলি বারবার মনের মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পঞ্চাশ রকমের তাৎপর্য্য ব্যখ্যা করিয়া সত্য তিল জমাইতে জমাইতে তাল গড়িতে বসিয়া গেল।

কতক্ষণ রেলিংএর নীচের উঁচু জায়গাটা পায়ের চটি দিয়া ঘষিতে ঘষিতে খানিকটা চুণ সুড়কি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বলিল, "আমরা আর মানুষ নই, না?"

এইটুকু ক্ষুদ্র ব্যাপারের প্রত্যাখ্যানের মধ্যে সত্যকামের মনুষ্যত্বের এমন কী অবমাননা ঘটিল, শান্তা অর্দ্ধেক বুঝিল, অর্দ্ধেক বুঝিল না। বুঝিল এইটুকু যে, এই প্রত্যাখ্যানের মূলে প্রিয়লালবাবুর পক্ষে যাহা কারণ সেই মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে যে কোনও সুসভ্য মানুষের পক্ষেই অপমানকর হয়, অন্ততঃ তাহার নিজের পক্ষে তো! সত্যকামও যদি সেই অপমান অনুভব করিয়া থাকে তাহা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত নয়। কিন্তু বুঝিতে পারিল না এই যে, সত্যকামের মত চঞ্চল ও লঘুস্বভাব তরুণটি এতখানি তলাইয়া দেখিল কি করিয়া, এবং তলাইয়া দেখিবার প্রয়োজনই বা কি ছিল।

সত্যকে ভুলাইবার চেষ্টায় শান্তা হাসিয়া বলিল, "খুব বেশী রকম মানুষ ব'লেই তো

আপনাদের অনর্থক কষ্ট দিতে লজ্জা করে। আমার তো এমন কিছু দরকার নেই। বন্ধুর বাড়ীতে যাচ্ছি—বুঝ্‌তেই পারেন—"

অন্যমনস্কভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়া সত্য বলিল, "ওই প্রিয়বাবু আস্‌ছেন।—যান, এবার যেতে পারবেন।"

১১

কতকগুলি চিঠিপত্র, কাগজ, নামের তালিকা ইত্যাদি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে অতসী বলিল, "নাও, এবারে কিছুদিনের মত কাজ কর্ম্মের ভার তুমি বুঝে নাও, আমি পালাই।"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "ফন্দি মন্দ নয়। নিজে উদ্যোগ করে কাজ আরম্ভ ক'রে শেষে বেচারী আমাকে ফাঁপরে ফেলা কেন?"

"আ—ভারী তো দুটো মাস। তুই ভাই সত্যি একদম ফাঁকি দিয়ে দিয়েই নেতৃত্ব কর্‌ছিস্‌।"

"ফাঁকি দিতে পারলে কে ছাড়ে বল্‌?'

অতসী বলিল, "না সত্যি। তুই মোটে যেন গা করছিস্‌ না কেন, বল্‌ত?"

"সত্যি কথা বলব, অতসী? আমার প্রথমদিন থেকেই এসবের মধ্যে ঢোক্‌বার তেমন আগ্রহ ছিল না। রাগ করিস্‌নি ভাই।"

"তবে তোকে ঢুকতে কে বলেচে শুনি?"

হাসিয়া শান্তা উত্তর করিল, "তুমিই।"

"কক্ষণো না!"

"সত্যি বল্‌ছি!—তুই এ শক্তি-মন্দিরের সেক্রেটারী হয়েছিস্‌ না জান্‌লে আসতামই না। তুই যে কাজটা হাতে নিয়েছিস্‌ সেটা যে নিশ্চয় ভালোই হবে এবিষয়ে কোনও সংশয় নেই বলেই এলাম।"

কৃত্রিম অবিশ্বাস দেখাইয়া অতসী বলিল, "আ—হা হা!—তাহলে এই ভালো কাজটার জন্যে দরদ দিয়ে খাটছিস্‌ না কেন শুনি?"

অতসীর মুখের দিকে চাহিয়া শান্তা এবার বলিল, "প্রাণ দিয়ে খাটতে ইচ্ছে করে তার জন্যে, যার দ্বারা মনোমত ফল পাব আশা হয়। তুই তো জানিস, আমি চাই মানব-জীবনের আমূল সংস্কার। চারদিকে দেশজুড়ে, জগৎ জুড়ে অনবরত যে দুঃখের হাহাকার শুন্‌ছি, একেই যদি নির্ম্মূল কর্ত্তে না পারি, তবে কোন্‌ কাজে কি লাভ? এই যে শক্তি-মন্দিরের কাজে আমরা যোগ দিয়েছি, এতে কি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে বলে তোর মনে হয়?"

অতসী বলিল, "গোড়াতেই অত-বড় আশা করাটা তোর অন্যায় ভাই। যতটুকু করা যায় সেই লাভ। আমরা কত বড়ই বা মানুষ—একেবারে একদিনেই পৃথিবী শুদ্ধ ওলট্‌পালট্ করা কি আমাদের কাজ? যদি শক্তি ততটা থাকে তো একদিন হবেই।"

"সে কথা আমিও অস্বীকার করিনে। শুধু ছোট কাজ কেন—সবার চোখের আড়ালে অজানা থেকে কাজ কর্ত্তেও আমার আপত্তি নেই। পৃথিবীকে আনন্দ দিতে নাই-ই পারলাম, যদি শুধু একটি মাত্র মানুষকেও যথার্থ আনন্দের স্পর্শ অথবা সন্ধান দিয়ে যেতে পারি, তাতেই আমার জীবন ধন্য মনে করব। কিন্তু আমি বলতে চাই কি জানিস্? সত্যিকার সুখেই—চিরন্তন আনন্দের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে হলে যে পথের দরকার, আমাদের এই কাজ কি সে পথে চল্‌ছে? তা যদি না হয়, তবে অনর্থক কেন এর পেছনে সময় আর পরিশ্রম ব্যয় করি?"

অতসী তাহার সহিত ঐক্যমত স্বীকার করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "আনন্দের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে হলে কোন্ পথটা উপযুক্ত তুই ঠাউরেছিস্ বল্‌ তো?"

"সেইখানেই তো খট্‌কা। বুঝতে কিছুই পারছি না, কেবল ক্রমাগত বুঝবার চেষ্টাই করছি।"

"চেষ্টা কর্ত্তে কর্ত্তেই যদি জীবনটা সারা হয়ে যায়, তবে কাজ কর্‌বি কবে ভাই?"

শান্তা বলিল, "তাহলে কাজ করাই হবে না!

হাল ছাড়িয়া দিয়া অতসী বলিল, "তবে দেখছি তোর এর মধ্যে আসাই ভুল হয়েছে! কেন এলি ভাই?"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "ঐ যে বল্লাম!—নারে, আরো একটা কারণ ছিল। অপরেশ বাবু নেহাৎ অপরিচিত এক ভদ্রলোক হয়ে যে-রকম পীড়াপীড়ি আরম্ভ কর্‌লেন, তাঁকে ফেরাতে বড্ড লজ্জা করল! কাজটা আমার মত ও পথের পক্ষে খুব অনুকূল না হলেও বিগর্হিত যখন নয়ই, তখন সেটা প্রত্যাখ্যান করে অনর্থক একটি লোককে অপ্রীত করি কেন?"

অতসী বলিল, "তবু যা হোক্!"

চেয়ারের হাতলের উপর দিয়া অনাবৃত সুগোল বাহুখানি এলাইয়া দিয়া সে একটু হেলিয়া বসিল।

মুহূর্ত্ত কয়েক জানালা দিয়া বাহিরের দিকে আনমনে চাহিয়া থাকিয়া শান্তা বলিল, "সে যাক্‌গে।—তুই এ ক'মাসে অনেক অনেক নাকি ছবি এঁকেছিস্, আমাকে দেখাস্‌নি তো?"

"আজকে সব দেখাব'খন। তোকে না দেখালে আমার আর্টের তারিফ্ করবে কে?"

স্মিতমুখে শান্তা উত্তর করিল, "তাই তো!"

"জানিস্ আমার এ ক'দিনে আরো কত বিদ্যে বেড়ে গেছে?"

"কি রকম?"

অতসী উঠিয়া গিয়া ঘরের উত্তর পাশের কাচের কবাট লাগানো আলমারী খুলিয়া বাহির করিয়া আনিল খান দুই মখমলের আস্তরণ। শান্তা সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া ভাঁজ খুলিয়া ফেলিল—সোণার সুতায় আঁকা পদ্মবনের কোণ ঘেঁসিয়া প্রকাণ্ড রাজহংসী। বাস্তবিক শিল্পকারিণীর নিপুণতা আছে স্বীকার করিতেই হইবে। রঙের বৈচিত্র্য নাই, অথচ আলো-ছায়ার রেখাগুলি কেমন জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শান্তা প্রশংসাভরে বলিল, "বা—বা!"

অতসী বলিল, "আর একটা কি করব জানিস্?—মনে নেই, সেবার আর্ট গ্যালারীতে একটা ছবি দেখেছিলাম—সেই যে মাটিতে মুখ লুকিয়ে কাঁদ্‌ছে এক পূজারিণী, পাশে পড়ে রয়েছে ছিন্ন বীণা?"

শান্তা কৌতুক করিয়া বলিল, "বেজায় রকম কবিত্ব হবে দেখ্‌চি!"

অতসী হাসিল। সেলাইগুলি আবার ভাঁজ করিয়া যথাস্থানে বিন্যস্ত করিতে করিতে বলিল, "সব চেয়ে বেশী কবিত্ব যেটাতে, সেটা তোকে প্রেজেন্ট্ করব ঠিক্ করেছি—তোর বিয়েতে।"

শান্তা হাসিল, "তা মন্দ কি?"

কি ভাবিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই বিয়ে করবি অতসী?"

কৌতুকহাস্যে সে উত্তর দিল, "নিশ্চয়!"

"সত্যি!"

"কেন নয়?"

পরিহাস ছাড়িয়া দিয়া আন্তরিকভাবে শান্তা বলিল, "বিয়ে কর্‌লে তোর আদর্শের বিকাশের পক্ষে কোনও বাধা হবে ব'লে মনে হয় না?"

"বাধা!—কেন ভাই?" অতসী বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল, "পৃথিবীতে যত কিছু বড় কাজ দেখ্‌চি সবই কি বিবাহিত লোকেই সাধারণত কর্‌ছে না?"

"বিবাহিত লোকে কর্‌ছে বটে, কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীলোকে কর্‌ছে কিনা দেখতে হবে!"

অতসী বলিল, "তার মানে হচ্ছে—এখন পর্য্যন্ত বড় বড় কাজের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা এমনিতেই কম, কাজে কাজেই বিবাহিতের সংখ্যা আরও কম। তবু তো দেখাতে পারি মাদাম কুরী বিবাহিত, উভয়ভারতী মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী।"

শান্তা চুপ করিয়া ভাবিল—"আমার মনে হয়, ওঁদের 'একসেপ্‌সন মেরিট্।' এরকমটা আমরা আশা কর্ত্তেই পারি না। আমি তো বলি, মেয়েদের মধ্যে যে পুরুষের সমান প্রতিভার বিকাশ প্রায় দেখাই যায় না, তার কারণ—বিয়ে কর্‌লেই মেয়েদের মস্তিষ্ক চর্চ্চার পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধা পড়ে, অথচ সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিয়ে প্রায় সবাই করে। খুব

সাধারণ দুএকটা কথা কল্পনা করেই দেখনা—'কাণ্ট' তাঁর দার্শনিক উপলব্ধিতে পাগলের মত ঘরছাড়া উদাসভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারেন ক্ষতি নেই, কিন্তু ঘরে যদি তাঁর গিন্নী থাকেন এক 'রেজিমেণ্ট' ছেলেপুলে নিয়ে, তবে তাঁকে তো আর অমন উদাসিনী সাজলে চল্‌বে না। 'আইনষ্টাইন্' দরজা ভেজিয়ে নিরালা ঘরে নিজের গণিত-গবেষণার বিপ্লবতরঙ্গে যখন দিশেহারা হয়ে থাকেন, তাঁর স্ত্রীকে তখন তো লক্ষ্মী বৌটি সেজে গৃহস্থালীর বন্দোবস্তে মন দিতে হয়—স্বামী তাঁর বিজ্ঞান-মন্দির থেকে উঠে এসে কি খাবেন। এ নইলে তো সর্ব্বনাশ!" একটু হাসিয়া বলিল, "আমার খুব বিশ্বাস, এর অভাবেই 'আইন্‌স্টাইন্' তাঁর প্রথমা গণিতজ্ঞা স্ত্রীকে বর্‌দাস্ত কর্‌তে পার্‌লেন না।"

অতসী ঠিক উপযুক্ত প্রতিবাদ হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না। তবু অবিলম্বে চট্ করিয়া বলিল, "ইচ্ছে থাক্‌লে অর্থাৎ মনের জোর থাকলে কোনও কিছুতেই আটকায় না। মেয়েদের উচিত বিবাহিত জীবনে তাদের 'রাইট্ অ্যাসার্ট' করা।"

"মনের জোর থাক্‌লে সব বাধাই অতিক্রম করা যায় যদি, তবে বিয়ের প্রলোভনটাই বা কেন যাবে না ভাই? আমার কিন্তু মনে হয়, বিয়ে করে দশগণ্ডা সন্তান-সন্ততি নিয়ে তারপরে মনের জোর খাটাতে গিয়ে তাদের দায়িত্বের প্রতি অবহেলা দেখানোর চেয়ে গোড়াতেই থামা ভালো।—বিয়ে না করাতে কোনো ক্ষতি হয় বলতে পারিস্?"

নিজের আন্তরিক বিশ্বাসের জন্যই না তর্কে জয়লাভ করিবার খাতিরে, না শান্তাকে চটাইবার লোভে বলা শক্ত, অতসী একটু হাসিয়া বলিল, "বিয়ে করাটা মেয়েদের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম যে, না করে উপায় কি?'

কথাটা শান্তার আদৌ ভাল লাগিল না। চেয়ারে নাড়িয়া একেবারে সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি তুই বিশ্বাস করিস্, অতসী?"

অতসী আবার হাসিল, "না বিশ্বাস করে কি করব বল্? বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা যা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, তার ওপরে কথা কইলে লোকে পাগল বল্‌বে যে!—আচ্ছা, হ্যাভেলক্-এলিসের 'সাইকলজি অব সেক্‌স্' পড়েছিস্ তুই?"

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া শান্তা বলিল, "না পড়িনি—পড়বার প্রবৃত্তিও হয়নি কোনকালে! কী এক জঘন্য অপমান ও ঘৃণার অনুভূতিতে তাহার মন তিক্ত হইয়া উঠিল—শরীর শুদ্ধ যেন শিহরিয়া উঠিতে চায়। একথা আজ সে নূতন শোনে নাই, কিন্তু ইহার আলোচনা স্পষ্টভাবে এই প্রথম। ইহার যথার্থ স্বরূপ তাহার কাছে আজ যেন নির্ল্লজ্জভাবে প্রকট হইয়া পড়িল। প্রচলিত এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটিকে সে কোনোমতেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে চায় না। ইহা যে সমস্ত নারীজাতির অপমান! আর সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিলেও এই একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য যে তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিবে! প্রাচীন শাস্ত্রকার বলিয়াছিলেন—

নারী নরকের দ্বার; আজ বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য বৈজ্ঞানিকও প্রমাণ করিবেন তাহাই !! নিষ্ফল ক্রোধে ও ক্ষোভে শান্তার কপালের শিরা যেন দপ্ দপ্ করিতে লাগিল।—এ যদি সত্যই হয়, তবে কোন্ নির্ম্মম বিধাতার ক্রূর ইতিহাস এ? পাপপুণ্যের বিচার-বিশিষ্ট প্রতিভা দিয়া, সুখদুঃখের অনুভূতি-প্রবণ হৃদয় দিয়া, অনন্তজ্ঞান ও অনন্তশক্তির সূক্ষ্ম উপলব্ধিময় আত্মা দিয়া—সকলের উপরে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন বিকট দৈহিক লালসার আলোড়নকে—যে তাহার কুহক কালিমার স্পর্শে আর সকল প্রেরণা লুপ্ত করিয়া দিবে? ইহা যে ধারণারও অতীত !!

অতসী অবাক্ হইয়া দেখিল, শান্তার চক্ষু দিয়া যেন স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রাইয়া পড়ে পড়ে। সে হাসিয়া বলিল, "এত এক্‌সাইটেড্ হলি কেন ভাই? এ তো অস্বীকার করবারও জো নেই, স্বীকার কর্‌লেও নতুনত্ব কিছু হয় না—চিরকালের জানা কথা।'

মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া যথাসম্ভব নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া শান্তা বলিল, "ভাব্‌ছিলাম চিরকালের জানা কথা বলেই একে মান্‌তে হবে কিনা। আমি বুঝতেই পারি না, পুরুষ দেহের ওপর যতটা সংযম কর্ত্তে পারে, নারী কোথায় কোন্ যুগে তার চেয়ে কম সংযম দেখিয়েছে।"

অতসী বলিল, "অবস্থার ফেরে পড়ে অনেক জায়গাতেই মেয়েদের আরও বেশী সংযম পালন কর্ত্তে হয়েছে, সত্যি। কিন্তু সায়েন্‌টিস্‌ট্‌রা কি বলেন জানিস্ তো—ওটা নাকি মেয়েদের শারীরধর্ম্মের একেবারে বিরুদ্ধ, ওতে ভেতরে ভেতরে অনেক ক্ষতি হয়।"

শান্তার মন আবার কঠোর হইয়া উঠিল। বিদ্বেষপূর্ণ অবজ্ঞার স্বরে বলিয়া উঠিল, "ও পুরুষের মনগড়া সায়ান্স্! লেবরেটারীতে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের দেহমন বিশ্লেষণ করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু বাইরে থেকে দার্শনিক ছবি নিয়ে যতদূর দেখেছি চিরকাল সব জীবের মধ্যে পুরুষ মাত্রেরই ঐ প্রবৃত্তিটা প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়ে আস্‌ছে। অস্বীকার কর্ত্তে পারিস্ অতসী?"

অতসী হাসিয়া বলিল, "আমি অস্বীকার কর্ত্তে যাব, আমার কি দায় বল্?"

শান্তা চুপ্ করিল। বলিয়া বুঝাইবার অথবা প্রমাণ করিবার সাধ্যও তাহার নাই। তাহার প্রয়োজনই বা কি? অন্যে যাহা খুসী মনে করুক্, সে নিজে কখনও বিশ্বাস করে না, করিতে পারে না।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের চয়নিকায় নারী

শ্রীকমলা সেন

হাড্‌সন (Hudson) এক জায়গায় বলিয়াছেন—বাগানে একটি ফুল ফুটিয়াছে, মালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, উহা কি? সে উত্তরে বলিবে, "লিলি।" কবিকে সেই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিবেন 'বাগানের রাণী।' আবার বৈজ্ঞানিক তাহার উত্তর দিবেন, 'উহা হেক্সা-হেড্রোমনো-জিনিয়া শ্রেণীর।' ইহাতেই দেখা যায় ফুলের একটা দিক আছে যাহা বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন রেখাপাত করে, অর্থাৎ যাহার মনের ধারা যেরূপ ফুল তাহার নিকট সেইরূপেই ধরা দেয়; নারীর নারীত্বও তেমনি।

ফুলের নিজস্ব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আছে, কিন্তু তাহা বিভিন্ন নিয়োগ-কর্ত্তার হাতে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। যে ব্যক্তি বিলাসী সে ফুলকে টেবিলে ফুলদানীতে রক্ষা করিয়া নিজে আনন্দ পায়, পরকেও আনন্দ দেয়। সে জানে গৃহ সাজাইবার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তাহা ফুলের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ফুলের আঘ্রাণ নিঃশেষে চুরি করিয়া লইয়া তাহা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, সে জানে ফুলরে আদর ততদিন যতদিন তার রূপ রস আছে, যখন সে আর ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারেনা তখন তাহাকে বুকের আসন হইতে নামাইয়া পায়ের নীচে ধূলায় স্থান দেওয়াই শ্রেয় মনে করে। যে কবি সে দূর হইতে ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়, প্রয়োজনের জন্য তাহাকে স্থানচ্যুত করেনা। আর ফুলের ভিতর সত্য বস্তু যদি কিছু পায় তবে তাহা জগদ্বাসীর নিকটে প্রচার করে; তাই ওয়ার্ডস্বার্থের কলম হইতে বাহির হইয়াছে—

"To me the meanest flower that blows can give
The thoughts that do often lie too deep for tears"

যে ভক্ত সে ফুলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃজন-কৌশল আর বিস্ময়ে মাথা নত করে; তাই ফুলকে সে দেবতার পূজায় ব্যবহার করে। নারীও ঠিক ফুলের মত! প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই মনুষ্যত্ব আছে, কেহ মনের সৎবৃত্তিগুলি চরিত্রের মধ্য দিয়া বিকশিত করিয়া আপনাকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলে, কাহারও হৃদয় অসৎবৃত্তি সৎবৃত্তির টুটি চাপিয়া ধরিয়া আপনার প্রভাব বিস্তার করে; সৎবৃত্তি ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে। সে সুপ্ত বৃত্তিকে জাগরিত করিয়া তুলিতে হইলে কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে হয়,

"এ দৈন্য মাঝারে কবি
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।"

পাপীকে ডাকিয়া বলিতে হইবে তোমার ভিতরে অতুল মহিমা, তুমি অন্ধ, তাহা এতদিন দেখ নাই, মুহূর্ত্তে সে সচকিত হইয়া আপনার ভিতরে শক্তি খুঁজিয়া পাইবে তখন সে অন্তর প্রদীপখানি সাবধানে জ্বালাইয়া সত্যের সন্ধানে বাহির হইবে। এমনি একটি ভাব রবীন্দ্র নাথ "পতিতা"তে ফুটাইয়াছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির ধ্যান ভাঙ্গাইয়া আনিবার জন্য কয়েকজন পতিতাকে পাঠান হইয়াছিল। তাহারাও হাস্য-পরিহাসে ছলনায় মুনিকে ফাঁদে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু প্রথম রমণী-দরশনমুগ্ধ ঋষিকুমার যখন দেবতার জন্য রচিত শ্লোকটি তাহাদের একজন পতিতার চরণে উপহার দিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিলেন :—

"আনন্দময়ী মূরতি তোমার
কোন দেব তুমি আনিলে দিবা
তোমার পরশ অমৃত সরস
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"—

তখন তাহার ভিতরে নারীর মহিমা বিজয় ভেরী বাজাইয়া উঠিল; তাহার হৃদয়ের এক দিক্ অপর একটা দিককে ভৎ'সনা করিল। জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া, কুমারীর প্রীতি তাহার ভিতরে যাহা এতদিন গোপন ছিল সেই সুপ্ত ভাবগুলি একে একে জাগিয়া উঠিল, সে উপলব্ধি করিল :—

"মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি
তখন শুনেছি বহু চাটু কথা
শুনিনি এমন সত্যবাণী।"

তাহার ভিতরে যে দেবতা ছিল তাহাকে এতদিন কেহই চিনিতে পারে নাই,

"ঋষির বালক পুলকে তাহারে
পূজিলা প্রথম পূজার ফুলে।"

সে পতিতা-সুলভ আবেশ বিলাস ছলনার পাশ হইতে ঋষিকুমারকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল, নিজের নারীজীবন এতদিনে সে সার্থক মনে করিল, সে গাহিল :—

"তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া রবে
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।"

"রাত্রে ও প্রভাতে" কবিতাতেও এই ভাবটি বেশ পরিস্ফুট। মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে নারীকে আবেশভরে দেখা হইয়াছে, তাই নারী সকল সোহাগ সহিয়াছে, কিন্তু শান্ত

উষার নির্জ্জন নদীতীরে যখন নারীকে সম্ভ্রমের সহিত দেখা যায় তখন তাহার মঙ্গলময়ী মুর্ত্তি বিকশিত হইয়া উঠে।

তারপর কবি নারীকে বিজয়িনী রূপে জগত সমক্ষে ধরিলেন। সে মুর্ত্তি দেখিয়া অনঙ্গদেব পুষ্পধনু পুষ্পশর-ভার সেই বিজয়িনীর পদপ্রান্তে সমস্তই সমর্পণ করিলেন। তখন—

"নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।"

কিন্তু ইহারই বিপরীত ছবি তিনি আঁকিয়াছেন "কল্যাণী"তে। "কল্যাণী" ও "বিজয়িনীর" সমাবেশ হইয়াছে "দুই নারী"তে।

"একজনা—উর্ব্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনা রাজ্যে রাণী
স্বর্গের অপ্সরী—
অন্য জনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তারে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।"

একজন তপোভঙ্গ করে, অন্যজন অনন্তের পূজার মন্দিরে ফিরাইয়া আনে। কবির বীণা নারীর বিচিত্র-রূপ ঘিরিয়া নানা সুরে নানা ছন্দে বাজিয়া চলিয়াছে। কখনও গম্ভীর ধ্রুপদে নারীর বন্দনাগানে বাজিয়াছে, কখনও নারীর রূপ-লাবণ্য-বর্ণনা খেয়ালের চালে চলিয়াছে। কখনও নারীর প্রণয়-সঙ্গীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাগিণীতে গ্রথিত হইয়া ধরা দিয়াছে, আবার কখনও তাহার বিলাস-ভঙ্গিমা চঞ্চল ঠুংরির তালে তালে পা ফেলিয়া যাত্রা করিয়াছে। নারীত্বের এই দুইদিক ছাড়াও নারীর বিভিন্ন রূপ কবি দেখাইয়াছেন, বধূ, উর্ব্বশী, দিদি, নারীর উক্তি, জন্মকথা, কেন মধুর প্রভৃতি কবিতায়।

মাতৃহারা ছোট ভাইয়ের জননী রূপে দিদির যে চিত্রখানি পাই তাহা রমণীয়। ঘাটে দিদি বাসন মাজিতেছে—ছোট ভাই ইঁটের পাঁজার উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে; তারপর কর্ম্মশেষে শিশুর হাত ধরিয়া পথ চলার দৃশ্যটী উপভোগ্য।

"নারীর উক্তি"তে প্রণয়ীর প্রতি ক্ষুব্ধ অভিমান, অবিশ্বাস বিষাদ ও সন্দেহে পরিণত হইয়াছে, তাই তাহার মুখে আমরা শুনিতে পাই:—

"অপবিত্র ও কর পরশ"
তাহার সাথে হৃদয় নাই।

সে যাহাকে চায় তাহাকে সমগ্রভাবে পাইতে চায়, মুহূর্ত্তের অবহেলা সে সহিতে পারেনা। সে চায় সর্ব্বজয়ী হইয়া থাকিতে। ইহার উত্তর কবি দিয়াছেন,

"সমগ্র মানব তুই পেতে চাস্
একি দুঃসাহস।
কি আছে বা তোর
কি পারিবি দিতে
আছে কি অনন্ত প্রেম ?"

আবার লিখিয়াছেন,

"আকাঙ্খার ধন নহে আত্মা মানবের"।

গ্রাম্য বালিকা বধূ হইয়া সহরে আসিল। পাষাণ-কায়া রাজধানী দেখিয়া দেখিয়া কেবলই তাহার সুদূর গ্রামখানির কথা মনে পড়ে "দীঘির কালো জলে যেখানে সাঁঝের আলো জ্বলে, সেখানে জল্‌কে যাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। আমাদের দেশে বধূর প্রতি সকলের ব্যবহার সামান্য কয়েকটী কথায় কেমন সুন্দর বধুর উক্তিতে তিনি ফুটাইয়াছেন—

"ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি
পরখ্‌ করে সবে, করেনা স্নেহ।

বধূর জন্য ব্যথার ব্যথী কেহ নাই। পুরাতনের মোহ অতীতের স্নেহ তাহার চোখে জল ঝরায় কিন্তু সেখানে চোখের জল বুঝিবার কেহ নাই। গভীর ব্যথা নিজের মনে গুমরিয়া মরে—প্রকাশ করিবার ভাষা নাই—

"খুলিতে নারি মন শুনিতে পাছে
হেথায় বৃথা কাঁদা দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে"।

সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি না থাকিলে মানুষ এমন করিয়া মানুষের হৃদয়ের কথা টানিয়া বাহির করিতে পারেনা। বাস্তবিক উপলব্ধি না থাকিলে শুধু জ্ঞানের সাহায্যে ভাবকে এমন রূপ দেওয়া যায় না। এমন দিনে নীট্‌শের (Nietzsche) একটা লাইন মনে পড়ে—

"It not the intellect or strength but the duration of the sentiment that makes a man great" শিশুর কবিতাগুলিতে মায়ের অন্তরের যে ছবি দেখিতে পাই তাহা অন্যত্র দুর্লভ। মা খোকাকে জন্মকথা শুনাইতেছেন—

"যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে।"

আবার তাহাকে হারাইবার ভয়ে অস্থির হইয়া বলিতেছেন—

"হারাই হারাই ভয় গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে চাই
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে"।

পৃথিবীর বিচিত্র লীলাখেলা এতকাল যে নারীর কাছে রহস্যময় ছিল, খোকার জন্মের পর জননীর কাছে সব দিবালোকের মত পরিষ্কার হইল। খোকার হাতে খেলনা দিয়া খোকাকে নাচাইয়া জননী বুঝিতে পারেন, পৃথিবীর এত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের উৎস কোথায়।

তারপর আর এক নারী সৃষ্টি করিয়া কবি লিখিলেন,

"নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী"

সে নারী কোনও সম্পর্কের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। সে প্রতিদিন গৃহকর্ম্মে রত থাকেনা, বধূর মত লাজুক সে নয়। এই "উর্ব্বশী"তে তিনি নারীকে তিন ভাবে দেখাইয়াছেন,—লক্ষ্মীরূপে, সৌন্দর্য্যরূপে এবং স্বর্গের অপ্সরী রূপে—

কবি লিখিলেন,

"আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে"

তখন নারীর লক্ষ্মীরূপ আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।

কবি আবার লিখিলেন,

"যুগযুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী"

আমরা নারীকে সৌন্দর্য্যরূপে দেখিলাম।

তারপর তিনি অপ্সরীরূপে আঁকিলেন—

"সুর-সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল হিল্লোল উর্ব্বশী।"

শাপভ্রষ্টা উর্ব্বশীর বিদায় কালে পুরুষের মনোভাবকে তিনি ভাষায় মূর্ত্তি দিলেন,

"তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
কার চির বিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে।"

কোন এক উদীয়মান কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—নারীত্বের সত্যকার রূপটি কি? উত্তরের দিকে তাঁহার মনে যে ইঙ্গিত আছে তাহারও আভাষ দিয়াছেন। সমুদ্রকে মন্থন করিয়া পীড়নে তাহাকে অস্থির করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা জীবন ও মরণ—বিষ ও অমৃত। কিন্তু তবু সে সমুদ্র তেমনি সমুদ্র থাকে—তাহার গহন ও গভীর, ভীষণ ও শান্ত, অসীম ও সুন্দর প্রকৃতির কোথাও কোনও দাগ নাই এবং কোনও কিছুর বিচ্যুতি ও বিশৃঙ্খলা নাই। এইরূপ একখানি ছবি আমরা পাই "কল্যাণী"তে; নারীর সকল মূর্ত্তি আঁকিয়াও কবির তৃপ্তি হইল না। তখন তিনি চাহিলেন এমন

আঁকিতে যাহার পদতলে জগদ্বাসী শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিবে; কীট্‌স ও সাইক্ (Keats ও Psyche), বন্দনা গাহিয়াছেন, কিন্তু তাহাও মনকে যেন এমন সমগ্রভাবে স্পর্শ করে না। কবি হৃদয়ের শ্রদ্ধা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া লিখিলেন;

"দেবি, তুমি স্বর্গের ঈশ্বরী সমস্ত সংসারের মঙ্গল সাধন করিবার জন্যই তুমি আছ; তোমার শ্রান্তি নাই, জরা নাই, সর্ব্বকালে সর্ব্ব ঋতুতে আলো তোমাকে ঘিরিয়া বিরাজ করে। যে পথিক সংসারের প্রতি উদাসীন সে-ও তোমার কল্যাণ হস্তের পরশে সজীব ঘরখানি দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। যাহার জীবন দুঃখ বেদনা সহিয়া সহিয়া অর্থহীন হইয়াছে, তোমার ভালবাসা তাহাকে প্রাণবন্ত করে, তাহার জীবনের উপর মায়া বাড়ায়।

তাই কবি শেষ অর্ঘ্য কল্যাণীর চরণতলে রাখিয়া গাহিলেন,

"আমার কাব্য-কুঞ্জবনে
গান ফুটানো সমীরণে
কত যে ফুল কত আকুল
মুকুল খসে পড়ে
সর্ব্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।"
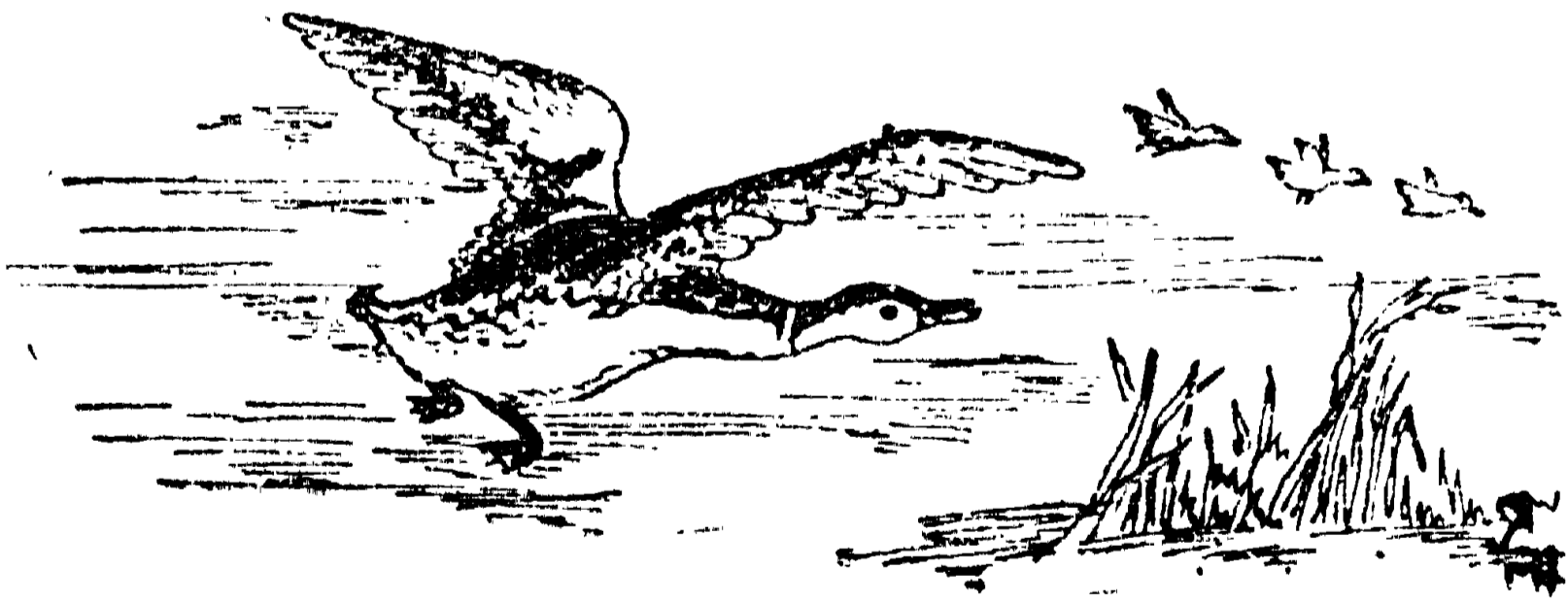
গান

(ভাটিয়ালী)

শ্রীবেলা দেবী

নদীর বানে গেল ভেসে আমার আঁধার ঘর
আমি কাঁদিনা তার লাগি!
মন ভাসায়ে নিয়ে গেছে অচিন গাঁয়ের পর
তার তরে গো ফিরি বিরাগী ॥
এই, নদীর বুকে চলেছি ভেসে আপন মনের ভুলে,
কভু, দেখা পাই যদি গো তার কাজ্‌লা নদীর কূলে,
কাঁদন আমার ফিরে বেড়ায় দূরে বালুর চর,
ঘুমের চোখে মন যে থাকে জাগি ॥'
আমার, চোখের ঘুম যে হরে নিল তারি চোখের জলে
দুখের তরী চল্‌বে ভেসে আমার মরণ হ'লে,
বুকের মাঝে কাঁদে সদাই মনরে তালাস কর,—
সে জন,—কেগো আমার দুখের ভাগী ॥
চরে আবার বাঁধলাম বাসা অনেক দুঃখেরে
ভাঙা মন আর লাগেনা জোড়া বুঝাই কাহারে,
একূলে হায় পেলাম নারে সে যে কেমনতর,
আমি কেন হ'লাম অনুরাগী ॥

সোণার কাঠি—রূপার কাঠি

শ্রীমতী——দেবী

তারপর যেমন হয়—, এক নিমেষে শাঁখা-সিঁদুর শাড়ী-চুড়ী থেকে, গৃহিণীপনা ঘরকন্না থেকে, সুপ্রিয়ার মা সন্ন্যাস—বা থানে, নিরাভরণে, রিক্ততায়, অত্যন্ত বিমূঢ়ভাবে প্রমোশন পেলেন ;— আর ছেলে-মেয়েরা বাবার পৌণে চারশো টাকা মাইনে, তার জন্য স্বচ্ছল অবস্থা, দিন-যাত্রার নির্ব্বিঘ্ন শান্তি থেকে 'কি করে কি হবে', 'কি হ'লে কি হয়—', 'কি করা যায়' ইত্যাকার নানা সমস্যায় গড়িয়ে পড়ে অনেক রকম গবেষণা করতে লাগল।

ফলে সোজা এবং সহজ একটীমাত্র উপায়ে বাড়ীখানি ভাড়া দিয়ে বাবার আফিসের সময় টুকু তুলে নিয়ে কলকাতার বাস উঠিয়ে তারক সুদূর অম্বালায় তার কাজে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর্‌লে।

শোকের সময় শোক সমস্যা—ভাবনা-চিন্তা নানাবিধ ব্যাপার সকলের মনটাকে এমন করে জুড়ে রাখলে যে, তার মধ্যেও মনের একতলায় অন্ধকার ঘরের কোণে গভীর মনের ভেতরে, সুপ্রিয়ার মার যে একটুখানি উদ্বেগ ভেতরে ফুটছিল, সেকথা না তিনি প্রকাশ্যে ও বাড়ীর গৃহিণীর কাছে বলতে পারলেন, না তাঁরা কিছু আশ্বাস দিলেন।

সবাই জান্‌লেন, এত বড় একটা ঘটনা—ইন্দ্রচন্দ্র-পাত বাড়ীর কর্ত্তার যাওয়া, এতে ওকথা কোনো পক্ষেরই প্রকাশ্যে বলবার নয়, এবং অন্তরে জানা রইল তার নিশ্চয়তা।

শুধু মাস ছয়েকের জন্যে সুপ্রিয়া বোর্ডিংএ থেকে গেল, প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে বলে। সে ও অজিত লেখাপড়া ভালবাসে-তাই।

পরিচয়

সহজ সময়ে যে আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য—হয়ত অসম্ভব থাকে, বিপদের দিনে সঙ্কটের সময়ে সেটা এতই স্বাভাবিক আর স্বাভাবিক ভাবে বাড়তে থাকে যে আগে ভাবাও যায়নি মনে হয়।

সুপ্রিয়ার আর সুপ্রিয়াদের বাড়ীর সঙ্গে অজিতের মেলামেশা তেমনি ক'রে সহজ হ'য়ে উঠেছিল কখন, তা ওরা জানতে পারে নি।

রমা আসত—সমস্ত সন্ধ্যে থেকে রাত্রি অবধি থাকত। অজিতও নানা কাজের ভারে, শ্রাদ্ধের পরামর্শ যুক্তিতে, আয়-ব্যয় আলোচনায় নানা বিষয়ে যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। কাজেই দুঃখের মাঝেও ঐ পরিবারটীর মনে অজিতের ঐ ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতাটা আশ্বাস স্বরূপই মনে হয়েছিল ;—যেন কোনো সম্পর্কের পূর্ব্বাভাষ স্বরূপই।

তাই সুপ্রিয়াও মনে মনে আশ্বাস ভরসা পেতে তাকে সহজেই গ্রহণ করতে বাধা হয় নি।

তার ওপর রমা আসে।

তরুণ বয়সের শোক বা বিয়োগ অথবা সন্তানদের কাছে পিতৃমাতৃ বিয়োগের বেদনা মনে বাজলেও, ততখানি গম্ভীর গভীর করে তোলে না।

রমা এসে তার মত বয়সের পক্ষে যেমন সম্ভব তেমনি সান্ত্বনা দিয়েছে, সুপ্রিয়াও কথা ক'য়েছে, এক আধ বার হেসেও ফেলেছে।

শুধু মা— ; তিনি সুমুখে না থাকলে ওরা অন্য কথা কয়, হাসেও।

এমনি করে শ্রাদ্ধ কাজকর্ম্ম সব সারা হল, সুপ্রিয়ার বোর্ডিং বাসের দিন ঘনিয়ে এল, আর সুপ্রিয়া অজিতের মনে নিজেদের অজ্ঞাতেই নব ঘনিষ্ঠতার নূতন পরিচয়ের মোহ সঞ্চিত হ'ল ; তার জন্য অভাব বোধ আবার তা' বন্ধ হওয়ার আসন্ন সম্ভাবনা জন্য বেদনা বোধ তা-ও।

কারণে অকারণে সুপ্রিয়ার চোখ ক্ষণে ক্ষণে সজল হ'য়ে ওঠে। মাকে দাদাকে ছাড়তে হবে। বাবা নেই—আরও হয়ত কি ; অজিতের তা' চোখ এড়ায় না।

যত যাবার দিন ঘনিয়ে আসে, অজিতের যেন সান্ত্বনা দেবার, যেন আপনার জনের মতন করে কিছু বল্‌বার ইচ্ছে মনকে পেয়ে বসে।

যাবার আগের দিনে সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন একটা আধ অন্ধকার ঘরের কোনে ব'সে এক গাদা বাক্স পেঁট্‌রা সুট্‌কেসের মাঝে—সুপ্রিয়া জিনিষপত্র গোছগাছ তোলাপাড়া করে।

বৌদি রান্নাঘরে। দাদা মায়ের সঙ্গে কি কথায় ব্যস্ত অন্যত্র।

বাক্সের পর বাক্স সারাদিন ধরে হয়ত ক'দিন ধ'রেই গোছানো চলেছে। কিন্তু কারো যেন হাতে ক্ষিপ্রতা নেই, কাপড়চোপড় সাজিয়ে তোলার যেন সঙ্গতি নেই। হঠাৎ মেয়ের হাতে বাবার কোট-টা ধুতিটা পাঞ্জাবীটা নয়ত ফতুয়া কি রুমাল এসে পড়ে, নয়ত মার হাতে সেই রকমের কিছু জিনিষ পড়ে, আর সমস্ত করা কাজ অগোছ হয়ে যায় ; সমস্ত সাজানো ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ে। মা মুখটা ফিরিয়ে চোখ মোছেন, মেয়েও মুখ নীচু করে কি গোছ করতে কি গুছিয়ে তোলে, কেবলি চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে। এমনি ক'রেই কদিন গোছগাছ সমাধা হচ্ছে।

কাল যাওয়া,—আজ আর শেষ না করলেই নয়।

সুপ্রিয়া অন্য মনে সব গুছিয়ে তুল্‌ছিল—বাবার গুলো সব আলাদা করে, যেন অসাড় বেদনায় মনে হয় কোথায় কোথায় সেগুলোকে নির্ব্বাণ দিচ্ছে। মার ভাল কাপড় শাড়ী ইত্যাদিও কি ভেবে তারি সঙ্গে তোলে।

ওর চোখ আবার ঝাপ্‌সা হ'য়ে ওঠে। মাকে অন্য রকম দেখ্‌ছে, কিন্তু মার ঐ সব ? —ও মাও যেন আজ মৃত, আর পৃথিবীতে নেই।—দুই মৃতের জিনিষের তাই একই আশ্রয় ঠিক করে!

অন্যমনে ঘরে আলো ও জ্বালেনি, মাথা নিচু ক'রে আর অন্ধকারেই গোছাচ্ছে।

ঘরে ঢুক্‌ল রমা, তারপর অজিত।

'ওমা, তুই এখানে! আলোটাও জ্বালিস্ নি? অন্ধকারে কি করছিস্ একলাটী—'

রমা আলোটা জেলে দিলে। অতর্কিত আলোতে তাড়াতাড়ি মুখটা নিচু করে সুপ্রিয়া চোখ মুছে নিলে। রমা বুঝতে পারলো। একটু চুপ করে তারপর এগিয়ে এলো, বল্লে, 'দে, আমিও গোছাই—'

অজিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার বল্লে, 'আমাকে দিয়ে বুঝি ও কাজটী করানো যায় না? দাও না আমিও গোছাই, খুব শিগ্গীর হবে দেখ না।'

রমা হেসে ফেল্লে, 'রক্ষে কর। তোমার গোছে কাজ নেই, যে তোমার নিজের ঘর ক'রে রাখ। উনি আবার আমাদের গোছাবেন।' সুপ্রিয়াও একটু হাসলে, 'না, আমরাই নিচ্ছি এক্ষুনি করে, আপনি বসুন।'

একটী বাক্সের ওপর অজিতের আসন নির্দ্দেশ করে দিলে। 'তা'হলে তোমাদের কালই যাওয়া ঠিক?' একটু থেমে অজিত বল্লে, 'কটার গাড়ী?'

'বিকেল পাঁচটায়।—কালই ঠিক হ'ল।'

'তুমি তাহ'লে কাল সকালে যাবে?'

'না, আমি মাদের সঙ্গে যাবার সময় নেমে যাব, নয়ত ষ্টেশন থেকে ফিরে এসে'—সুপ্রিয়ার গলা ভারি হয়ে উঠল।

'ষ্টেশনে গেলে ফিরে আসতে বড় মন কেমন করবে', রমা বন্ধুকে বল্লে।

সবাই চুপ করেই রইল।

রাত্রি বাড়তে থাকে। আলো-ছায়া কুয়াসা ঘেরা কলকাতায় ওরা আজকের মতন কোনোদিন আর একঘরে বসবে কিনা কে জানে। সুপ্রিয়াই বা আর কদিন আছে। ওর পরীক্ষার পরে ও এখানে সেখানে। অজিত সব গোছ করা দেখে আর ভাবে। ওরা দুজনে একটার পর একটা গুছিয়ে সাজিয়ে সরিয়ে সরিয়ে রাখে। শেষ হ'য়ে এলো সব।

অজিত বল্লে, 'আজকের রাত্রিটাই আর তোমরা আছ।'

কথার উত্তর দিতেও যেন মনটা মুচড়ে ওঠে।

সুপ্রিয়া শুধু বল্লে 'হ্যাঁ'।

রমা বল্লে, 'কেন ওতো রইল দাদা। আমার সঙ্গে দেখা হবে স্কুলে।'

অজিত শুধু 'হ্যাঁ' বল্লে।

রাত্রি গভীর হ'য়ে এলো। রমা উঠ্‌ল। 'যাই তোর মার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

অজিত চুপ করে বসে রইল।

সঙ্গীতের পর সাহিত্য স্থান পাইয়াছে। সাহিত্য-চর্চ্চা বহুভাবে হইয়া থাকে, ও প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ইহাতে যোগ দিয়া থাকে। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক উল্লিখিত বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য-সমিতি আছে। এই সকল সমিতির মাসিক অধিবেশন হয় ও বিদ্যার্থী স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া থাকে। এই সকল সাহিত্য-সভায় সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। ছাত্রবৃন্দ তাহাদের সম্পাদক সহকারী সম্পাদক নিজেরাই নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে।

তাহার পর কলাবিদ্যা স্থান পাইয়াছে। কলা-বিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতন নব নব প্রতিভাবান্ শিল্পী সৃষ্টি করিতেছে। তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু তরুণ শিল্পী ভারতের নানা স্থানে উচ্চপদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও পাশ্চাত্য জগতেও প্রভূত যশ অর্জ্জন করিতেছেন। শিশু-বিভাগ, লাইব্রেরী, কলাভবন প্রভৃতি প্রধান প্রধান আবাসগুলি এই সকল শিল্পীর সুনিপুণ তুলিকার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। তাহারা অদ্যাপি শিল্পীদের সাক্ষী স্বরূপ সগর্ব্বে দণ্ডায়মান আছে।

নৃত্যও শিক্ষার একটী অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। উন্মুক্ত প্রান্তরে শিশুদের নৃত্য যে শুধু আনন্দ-দায়ক তাহাই নহে, উহা দেহ ও মনের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। কবি কেবল ছাত্রদের মনের উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হন্ নাই, যাহাতে তাহাদের শারীরিক উন্নতি হয়, তাহার দিকেও দৃষ্টি আছে। ছাত্রদিগকে যুযুৎসু শিক্ষা দিবার জন্য তিনি জাপানী-বীর অধ্যাপক ট্যাগ্নাগাকিকে আনাইয়াছিলেন।

কবি বস্তুতঃ ছাত্রদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করিয়াছেন। ছাত্রেরা যখন নিয়ম লঙ্ঘন করে, তখন তাহারা নিজেরাই শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। প্রত্যেক ছাত্রেরই স্ব স্ব মতামতকে উপেক্ষা করা হয় না। তাহাদেরও যে একটী দাবী আছে তাহা এই স্থানে স্বীকার করা হয়। এই স্থানে ছাত্রদের প্রতি দমননীতি প্রয়োগ করা হয় না। দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের উপরই অর্পিত হইয়াছে;—যেমন প্রধান শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার অন্যান্য শিক্ষকগণের উপর ন্যস্ত আছে। প্রত্যেক বৎসর শিক্ষকগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে প্রধান শিক্ষক মনোনীত করিয়া থাকেন: সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর জিনিষ এই যে, আশ্রমস্থ সকল ছাত্র ছাত্রীগণ যেন এক পরিবারভুক্ত এই ভাবটী এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর নিহিত আছে।

নারী-শিক্ষা সমিতি

[বিদ্যাসাগর বাণীভবনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে পঠিত]

শ্রীঅবলা বসু

সমবেত সহৃদয় বন্ধুগণ,

নারী-শিক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে আমি আজিকার এই পুণ্য অনুষ্ঠানে আপনাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। আপনাদিগের সমবেত প্রার্থনায় ও আশীর্ব্বাদে বিদ্যাসাগর বাণীভবনের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের এই শুভ-সূচনা জয়যুক্ত হউক।

আজ ১৩ বৎসর হইল নারীজাতিকে স্নেহময়ী জননী এবং সুনিপুণা ও সেবাপরায়ণা আদর্শ গৃহিণী, তথা সকল কর্ম্মে ও সাধনায় সর্ব্বথা সমাজ ও দেশের কল্যাণকারিণী হইবার উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে নারী-শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বাংলায় আড়াই কোটি স্ত্রী-লোকের মধ্যে বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বালিকার সংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ হইলেও তন্মধ্যে ৩০ লক্ষের উপর বালিকাই অ আ, ক, খ ইত্যাদি শিখিবার কোন সুযোগ পায় না। এই নিমিত্ত সমিতির তত্ত্বাবধানে আজ অবধি কলিকাতায় ও বাহিরে বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৫০টি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫ হাজার বালিকা শিক্ষালাভ করিয়া বাহির হইয়াছে।
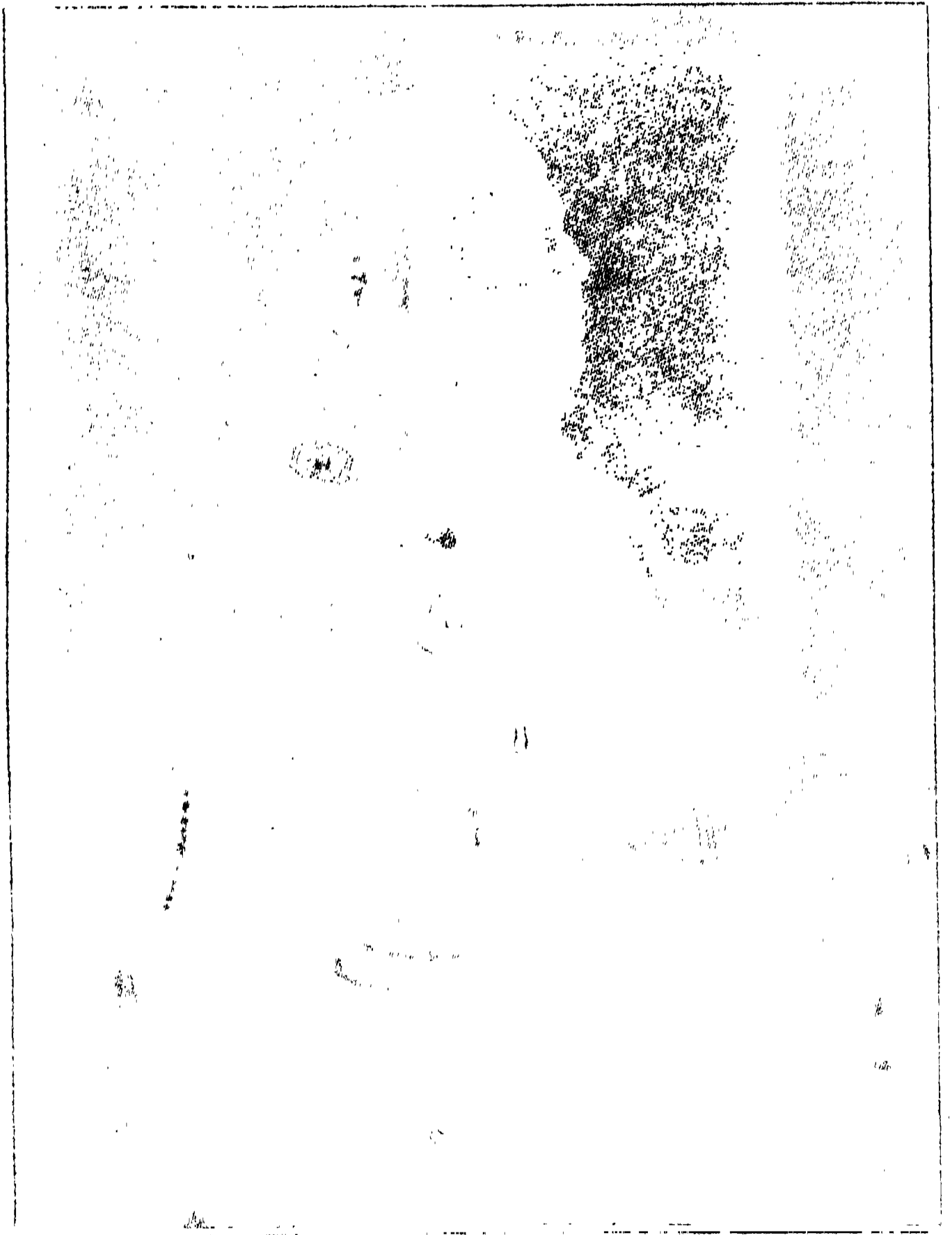
শ্রীযুক্তা অবলা বসু

বালিকা-বিদ্যালয় সমূহের পরিচালনা উপলক্ষে যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবই স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রধান অন্তরায় বলিয়া অনুভূত হইলে অল্পবয়স্কা হিন্দু বিধবাদিগকে সাহিত্য ও শিল্প-কলাদি শিক্ষা দিয়া শিক্ষয়িত্রী হইবার ও তৎসঙ্গে স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বিগত ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর-বাণীভবন নামক বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বিধবা ছাত্রীগণ স্ব স্ব ব্যক্তিগত আচার নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুনিয়মে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। অধঃপতিত এই বাংলাদেশে ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা ৪॥০ লক্ষের উপর হিন্দুবিধবা অপরের গলগ্রহ হইয়া গৃহের ও সমাজের ভারস্বরূপ দুঃখময় জীবন যাপন করেন। এই শোচনীয় অশিক্ষা, হীনতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে জাতি কখনও সুস্থ ও সবলকায় হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই নারী-শিক্ষা সমিতি উক্ত দৈন্য ও কলঙ্ক মোচনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত শতাধিক বিধবা বাণীভবনে শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষকতায়, আর্ত্তসেবায় এবং চারু ও কারু-শিল্পের পারদর্শিতায় স্বাবলম্বী হইয়া স্বীয় পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

সকল বিধবা কিন্তু শিক্ষকতার কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন না, অথচ নানারূপ গৃহ-শিল্পের অনুশীলন করিয়া নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, এই নিমিত্ত, এবং দেশের বর্ত্তমান এই অর্থসঙ্কটের দিনে অনেক গৃহস্থঘরের কন্যা ও বধূ সংসারের অবস্থা কথঞ্চিৎ স্বচ্ছল করিবার অভিপ্রায়ে বাণীভবনে দৈনিক ছাত্রী হিসাবে বয়ন, সূচীশিল্প, তাঁত, আসন তৈরী এবং রং করা ও পাড় ছাপার কাজ প্রভৃতি কিছু কিছু গৃহশিল্প হাতেকলমে শিখিতে ইচ্ছুক হওয়ায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সমিতির অন্তর্গত মহিলা শিল্পভবনের প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে বর্ত্তমানে অন্ততঃ ৮০টী ছাত্রী স্ব স্ব রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিবিধ গৃহশিল্পে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। শিল্পভবনের প্রতিষ্ঠাবধি ছাত্রীরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল দ্রব্য তৈরী করিয়াছেন, তাহা বিক্রয়ে এ পর্য্যন্ত মোট প্রায় ১০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। সহরে ও গ্রামে যাঁহারা শিল্পের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে মালমশলা যোগাড় করিয়া দেওয়া ও তাঁহাদের তৈরী জিনিষ বিক্রয় করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে আজ এক বৎসর যাবৎ সমিতির অন্তর্গত এক সমবায় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশে কুটীরশিল্পের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সত্য সত্যই করিতে হইলে নারী-শিক্ষা সমিতি শিল্পভবনের কর্ম্মী ও ছাত্রীগণের সংযোগে যে পথে চলিতেছেন, সেই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে।

শুধু খেয়াল বা কল্পনার আশ্রয়ে নহে, কর্ম্মে ও বাস্তব অনুষ্ঠানে নারী-শিক্ষা সমিতি ধীরে ধীরে যে সত্যে ও মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, আজ দেশবাসীর সমক্ষে তাহাই উপস্থাপিত করা হইতেছে। ধীরে, অতি ধীরে, সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া বাণীভবনের যাত্রিগণ আজ কত দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ১০ বৎসর পূর্ব্বে বাণীভবন প্রতিষ্ঠার দিনে কিন্তু এ অবস্থা ছিলনা; তখন দশটি মাত্র বিধবার উপযোগী বাসস্থান ও অন্যান্য ব্যবস্থা থাকিলেও দুটি মাত্র বিধবাকে লইয়া সেই শান্ত, নীরব উদ্বোধন-ঊষায় বাণীভবনের সূত্রপাত হয়। অবস্থার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভবনে

ক্রমে ১৫, ২০, ৩০ ও ৪০টি বিধবার থাকিবার ব্যবস্থা হয়; বর্ত্তমানে ৫০টি বিধবা বাণীভবনে শিক্ষা ও আশ্রয় পাইতেছেন। আশা করা যায় যে, নবগৃহ নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ভবনে অন্ততঃ ৭০টি ছাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হইবে, আর বাণীভবনের প্রস্তাবিত সম্পূর্ণ বাটী নির্ম্মিত হইলে তখন অন্ততঃ ১৫০টি মেয়ে একযোগে আশ্রমে অবস্থান করিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন, ও সেই সময় হয়ত ঠিক এখনকার মত আর স্থানাভাবে ভর্ত্তি হইবার অনেক সাগ্রহ অশ্রুসিক্ত ব্যাকুল আবেদন অগ্রাহ্য করিতে হইবে না।

ধীরে ধীরে আপনাদিগের স্নেহপুষ্ট বিদ্যাসাগর বাণীভবন ক্রমবিকাশ ও বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এ সত্যটি উপলব্ধি করিয়া আজিকার এই পুণ্য অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আপনারা সকলেই পরিতৃপ্ত ও আহ্লাদিত হইবেন সন্দেহ নাই। যাঁহাদিগের সহানুভূতি ও উৎসাহের ফলে নারী-শিক্ষা সমিতির এই প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও কার্য্যপ্রসার, সেই সকল সহৃদয় দেশবাসীর উদারতা ও বদান্যতার কথা উল্লেখ করিয়াই আমার এই বিবৃতি শেষ করিব। প্রতিষ্ঠাবধি সমিতি এ পর্য্যন্ত মোট ৩,০০,০০০৲ সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে চাঁদায় ও এককালীন দানে মোট ১,০০,৫০০৲, গভর্ণমেণ্ট গ্র্যাণ্টে প্রায় ১,৪০,০০০৲, কর্পোরেসন গ্র্যাণ্টে ২১,৫০০৲, ও ন্যাশনেল ফণ্ড সোসাইটীর দানে ৫,৫০০৲ আয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রয়েল কলিকাতা টার্ফ ক্লাব ও ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন, প্রত্যেকে প্রতিবৎসর সমিতির সাহায্যে ৩০০৲ টাকার উপর দান করিয়া থাকেন। রোনাল্ডশে মেমোরিয়াল ফণ্ডের ট্রাষ্টিগণ নবাব শ্রীযুক্ত কে, জি, এম্, ফারোকি বাহাদুরের পরামর্শমতে তাঁহাদের উদ্বৃত্ত ফাণ্ড হইতে ৩০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ সমিতির হস্তে প্রদান করিয়াছেন। উপরি উক্ত সমগ্র আয়ের মধ্যে বিল্ডিং ফণ্ডে এপর্য্যন্ত আমরা মাত্র ৩০,০০০৲ যোগাড় করিতে পারিয়াছি। আজিকার এই শুভ ভিত্তি স্থাপনোৎসবে একান্ত কৃতজ্ঞতার সহিত আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে বিল্ডিং ফণ্ডের এই ৩০,০০০৲ টাকার মধ্যে ২৫,০০০৲ টাকা শ্রদ্ধেয়া স্বর্গগতা হরিমতি দত্তের দান। তিনি সমিতিকে আরও ১০,০০০৲ টাকা দিয়া মোট ৩৫,০০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্তা সুশীলা চন্দ্র ৫.০০০৲ টাকা, শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা মল্লিক ১,০০০৲ টাকা ও স্বর্গীয়া কুসুমকুমারী দেবী তাঁহার সমগ্র জীবনের বিন্দু বিন্দু করিয়া সঞ্চিত ৫০০৲ টাকা দান করিয়া স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী বিদ্যাসাগর বাণীভবনের নিঃস্ব বিধবাগণের বস্ত্রক্রয়ের জন্য এ পর্য্যন্ত মোট ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন, ও মাতৃসুলভ স্নেহের সহিত বলিয়া রাখিয়াছেন, বাণীভবনের অসহায়া বিধবাগণের বস্ত্রের প্রয়োজন হইলেই যেন তাঁহাকে জানান হয়। ইহা ছাড়া সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রায় ৩,০০০৲ টাকা ও সহকারী সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ২,৫০০৲ টাকা, লালগোলার মহারাজা রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ১,০০০৲ টাকা, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ও স্বর্গীয় স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্র,

প্রত্যেকে ৭০০৲ টাকা, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ও স্বর্গীয় ডাঃ চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর, প্রত্যেকে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। অন্যান্য বহু দাতা ও পৃষ্ঠপোষকের দানের মধ্যে স্বর্গীয় কানাইলাল সেন মহাশয়ের নগদ ১,০০০৲ টাকা ও ১০,০০০৲ টাকা মূল্যের ভূমি দান ও নাম-প্রচারে অনিচ্ছুক জনৈক উদার হৃদয় ব্যক্তির একাদিক্রমে ১৩ মাস ব্যাপী মাসিক ৩০০৲ টাকা হিসাবে মোট প্রায় ৪,০০০৲ টাকার দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু আজ যে এই সমিতি তাহার নিজস্ব ভবনে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে, তাহা কলিকাতা কর্পোরেশনের সভ্যবৃন্দের সহৃদয়তার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। কর্পোরেশন বার্ষিক নামমাত্র ১৲ টাকা খাজনায় আমাদিগকে এক বিঘা সোয়া ছয় কাঠা পরিমাণ বিস্তৃত ভূমি ব্যবহারের স্থায়ী অধিকার দান করিয়া সমগ্র বাংলার নারীসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সমিতির নবগৃহের যে পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহাতে মোট প্রায় ১,২৫,০০০৲ টাকা প্রয়োজন হইবে। তন্মধ্যে বর্ত্তমানে আংশিক যে পরিমাণ কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কিঞ্চিদূর্দ্ধ ৫০,০০০৲ টাকা ব্যয় করিবার কথা। মেসার্স নদীয়া ইঞ্জিনিয়ারীং কোম্পানী বর্ত্তমান এই গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, আর মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোম্পানী বিনা পারিশ্রমিকে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য পরিদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া আপনারা সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

আপনাদিগের স্নেহপুষ্ট তের বৎসরের শিশু আপনাদেরই সহৃদয়তায় ও সমবেত চেষ্টায় আজ বুঝি মাথা গুঁজিবার মত আপনার একটি গৃহ খুঁজিয়া পাইল। বৎসরের পর বৎসর অনাথা অশ্রুমতী কত বিধবা কত শান্তি ও সুখের আশায়, কত শুভ কর্ম্মপ্রেরণায় এখানে আসিয়া সমবেত হইবে! আমার মনে হয়, আজিকার এই শুভ ভিত্তি স্থাপনায় ঐ সকল অনাগতা অনাথাদিগের তপ্ত অশ্রু মুছাইবার ও সেবাপরায়ণা কর্ম্মকুশলা নারীগণের বিবিধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সফল ও জয়যুক্ত হইয়া রহিল! বিদ্যাসাগর বাণীভবনের নবগৃহের এই ভিত্তি যে কল্যাণময়ী রমণীর পুণ্যস্পর্শ লাভ করিতেছে তাঁহার গৃহে বাণী ও লক্ষ্মী একত্রে মিলিতা হইয়া আছেন। ঈশ্বর করুন, আমাদিগের বাণীভবনেও বিদ্যা, শ্রী ও সম্পদ চিরদিন একত্রে বর্দ্ধিত হউক। মাননীয়া শ্রীযুক্তা যাদুমতি মুখার্জ্জি মহোদয়ার স্থাপিত বিদ্যাসাগর বাণীভবনের ভিত্তি সুদৃঢ় হউক, ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত সৌধ গগনস্পর্শী হউক, এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য বাংলার সুদূর পল্লী অবধি প্রসারিত হউক, দেশহিতৈষী নরনারী মাত্রেরই স্নেহদৃষ্টি ইহার উপর নিপতিত হউক!

প্রাচীন ভারতে নারী

শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী

স্বামী-নির্ব্বাচনে স্বাধিকার

শিক্ষার অভাবই মূঢ় শ্রদ্ধার জন্ম দেয়। কিন্তু আর্য্যনারীর ছিল দেহ ও মনের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ। তাই দেখি তিনি স্বভাবতই বিবাহ বিষয়ে নিজের রুচি অনুযায়ী চলেছেন। তিনি রীতিমত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং সুশিক্ষার বলে পতি অর্জ্জন করেন, নতুবা এই পরম গুরু পদার্থটি অকস্মাৎ তাঁর উপর ভর করেন না। আর তিনি মনের মত যুবা পতিকেই আকর্ষণ করেন। অথর্ব্ব বেদ(১) বলেছেন, ব্রহ্মচর্য্যের (২) বলে কন্যা যুবা পতি লাভ করেন—'ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং'। কন্যার আত্মকর্ত্তৃত্বেই পতি লাভ হয়—তিনি নিষ্ক্রিয় থাকেন আর হিতৈষীর দল তাঁর জন্য পতি দেবতা সংগ্রহ ক'রে আনেন এমন নয়। নানা আনন্দ উৎসবে অবাধ যাতায়াত(৩) থাকায়, যুবক ও কুমারীগণের পরস্পর পরিচয়ের সুযোগ হ'য়ে থাকে আর সে সময় মাতা স্বীয় কন্যাকে বুদ্ধি ও প্রণালী বাৎলে দিয়ে থাকেন(৪)। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে(৫) পাই—'কত মেয়েরা ঐশ্বর্য্যে খুসী হন, আবার এমনও মার্জ্জিতমনা অনেকেই আছেন যাঁরা নিজের মনোমত পতিলাভে যত্নবতী হন।' মুয়র সাহেব (৬) বলেন—বৈদিক যুগে অন্ততঃ কিছু কালের জন্যও, স্বামী-নির্ব্বাচনে নারীর স্বাধিকার ছিল একথা কি এই ঋক্ থেকে আমরা অনুমান কত্তে পারিনে? অথর্ব্ববেদ (৭) 'সমানমনস্ক' বরলাভের জন্য মন্ত্র রচনা করেছেন। ঋগ্বেদ (৮) বিধবাকে নিজ কামনা অনুরূপ দ্বিতীয় বর গ্রহণে অনুরোধ করেছেন। ভাবী দম্পতির সাক্ষাৎ দেহ-মনের মধ্যে না খুঁজে সুন্দর জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের মধ্যে তাঁদের কল্পিত মিলের সন্ধান বৈদিকযুগে কেউ করেন নি। সেই স্বনির্ব্বাচন-সুলভ যুগে জায়াপতির মনের একান্ত মিল আদর্শ মিলনের উপমারূপে ব্যবহার হওয়ার প্রসিদ্ধি লাভ

(১) অথর্ব্ব—১১, ৩, ৭, ১৮। (২) ব্রহ্ম বেদঃ তদধ্যয়নার্থং আচরণীয়ং কর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য—সায়নভাষ্য—অথর্ব্ব, ১১, ৩, ৭, ১৭। (৩) ঋগ্বেদ—৪, ৫৮, ৮। (৪) Kaegi—The Rigveda—Introduction. (৫) ঋ—১০, ২৭, ১২। (৬) Muir, Original S. T.—Vol. V., P. 458. (৭) অথর্ব্ব—২, ৬, ৩৬, ১—'বরেষু সমনেষু'। (৮) ঋ—১০, ১৮, ৭। এমন কি যমী তাঁর ভ্রাতা যমকে বিব্রত করায় যম বল্‌ছেন, 'তুমি আমায় ছেড়ে অন্য কাউকে বেছে নাও—অন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ'—ঋ—১০, ১০, ১০।

অনুরাগমূলক বিবাহ

করেছিল। যজ্ঞকার্য্যে হোতা ও অধ্বর্যুর মধ্যে সর্ব্বপ্রকার একভাবকে (১) বলা হয়েছে এক বয়সী ও এক ঘরে বাস করে এমন দম্পতির মত—দ্বৌ সবয়সা সমানযোনৌ দম্পতীব (২)।

যথা প্রয়োজন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় ও সুশিক্ষিত অন্তঃকরণ নিয়ে পুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশায় (৩) প্রণয়ের সুযোগও যেমন ছিল, অপব্যবহার তেমনই হ'তে পার্ত্তো না। অন্যদিকে বিবাহ বিষয়ে নিজের চিন্তা নিজে করায় গুরুজনেরাও অসহিষ্ণু হওয়ার কারণ পেতেন না। সর্ব্বোপরি ছিল শিক্ষার উৎকর্ষে লজ্জাশীলতার মধ্যে একটি সাবলীল সারল্যের স্বচ্ছন্দ সঞ্চার। বহুকাল পরে শিক্ষালোপের ফলে দ্বিধাবিজড়িত ও সংস্কাররুদ্ধ লজ্জাবোধ এলো—তার চেয়ে হয়ত একান্ত অজ্ঞতায় অনেক মঙ্গল ছিল। নিজের আকাঙ্ক্ষা ও অভিরুচি প্রকাশ কর্ত্তে বৈদিক নারীর কোন কুণ্ঠাই দেখা যায় না। সোমের উপাখ্যানটি (৪) চমৎকার।

পিতা প্রজাপতির কাছে কন্যা সীতা-সাবিত্রী তাঁর প্রেমের কাহিনী সসম্ভ্রমে অথচ অসঙ্কোচে বল্‌ছেন—আমি ভালবাসি সোমকে আর সোম ভালবাসেন শ্রদ্ধাকে; এর বিহিত করুন পিতা। বর্ত্তমান লজ্জাশীলতার আদর্শকে এ প্রগল্‌ভতা ব্যথা দিলেও প্রজাপতি সস্নেহে কন্যার ললাটে একটি মন্ত্রপূত সুগন্ধি প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন ও সোমের কাছে যেতে বল্লেন। এবারে সোম সাবিত্রীকে সমাদরে আগিয়ে নিলেন, সম্প্রদানে অঙ্গীকার-বদ্ধ হলেন ও হাতে কি পুঁথি আছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সাবিত্রীকে তাঁর হাতের বেদগ্রন্থ তিনখানি দিলেন। শেষোক্ত ঘটনায় রসিক ঋষি উপাখ্যানের শেষে একটি নীতি-উপদেশ দেওয়ার লোভ সম্বরণ কর্ত্তে পারেন নি—এই থেকেই চলিত হ'লো মেয়েরা তাঁদের আলিঙ্গনাদির মূল্য চেয়ে থাকেন।

জীবন-সঙ্গীকে প্রেমের স্বাধীন সুরে আহ্বান করায় নারীত্বের নিবিড়তম ও প্রাথমিকতম আনন্দ। মাতৃত্ব ইত্যাদি নারীর যতই বড় ভাব হোক্‌, তবু প্রাসঙ্গিক ফল মাত্র। রামায়ণের সীতা হেন শান্ত মেয়েও পতিপ্রেমের উল্লাসে বল্‌ছেন—

ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥ ২।৫

স্বাধীন প্রণয়ের উজ্জ্বল প্রভায় সুবিশাল মহাভারতের (৫) প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তর উদ্ভাসিত। দময়ন্তী ও সাবিত্রী সর্ব্বসাধারণের সুগভীর শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন। এঁদের স্বাধীন প্রেমের কাহিনী ইউরোপীয় মনকেও পুলকিত করেছে। হিন্দুগণ আজও বিবাহের কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন—

---

(১) 'সমান বয়স্ক', 'সমান সামর্থ্য', 'সমান প্রয়োজন নিষ্পত্তি……তদেব পরস্পরং শরীরং মিশ্রয়িতুমিচ্ছতঃ। সায়নভাষ্য—ঋগ্বেদ—১, ১৪৪, ৩।

(২) ঋগ্বেদ—১, ১৪৪, ৪। (৩) বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র—১, ২, ৩, ২৩—ব্রহ্মচারীর বিনা প্রয়োজনে রমণী সম্ভাষণ নিষেধ। (৪) তৈত্তিরীয় ব্রাঃ—২, ৩, ১০, ১।

(৫) সুভদ্রার প্রণয় এমন কি হিড়িম্বার প্রণয়ও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'দময়ন্তী যথা নলে', 'সাবিত্রী সমান হও'। এঁরা উভয়েই যে শক্তি ও আনন্দের বিকশিত পরিণতি লাভ করেছেন পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রেমই তার উৎস। বিচার করে বোঝা যায় প্রণয়-মূলক বিবাহের জন্যই এঁরা যুগ-যুগ ব্যাপী মহিমান্বিত আদর্শ হওয়ার সার্থকতা অর্জ্জন করেছেন। দ্রৌপদীও কিছু কম বিস্ময়ের কারণ নন। কর্ণকে লক্ষ্যভেদে অগ্রসর দেখে সুশোভন অথচ দৃপ্ত ভঙ্গীতে তিনি অভিভাবকগণের প্রতিজ্ঞা অস্বীকার ক'রে বল্লেন, সুতপুত্রকে তিনি গ্রহণ কর্ব্বেন না। ভ্রাতা বাসুকীকে জরৎকারু পরিষ্কার বল্লেন, রমণী বিয়ে করে প্রেমের তাগিদে কিংবা কর্ত্তব্যের খাতিরে। গার্গ্যা মুনিকন্যা শেষ পর্য্যন্ত কুমারীই র'য়ে গেলেন, যেহেতু—আত্মনঃ সদৃশং সা তু ভর্ত্তারং নান্বপশ্যত।

ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ব্যবস্থা

ব্রাহ্মণ সভ্যতার সান্ধ্যযুগেও এই স্বাধীনতার সুর সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয় নি।* মুহুর্মুহু মূর্চ্ছার ক্ষণিক অবকাশে এই সুরের রেশ স্মৃতির শাসনকালেও শুনতে পাওয়া যায়। ললিতবিস্তার পাঠে জানা যায় বুদ্ধদেব অভিলাষ করেছিলেন কবিতা-রচনায় সিদ্ধহস্তা, নানা সদ্গুণসমন্বিতা ও ধর্ম্মসূত্রে সুপণ্ডিতা কুমারী বিবাহ করবেন।[1] স্মৃতি প্রচার কচ্চেন—'নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনম্'—কন্যাকে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়ে পিতা তার বিয়ে দেবেন না। ধর্ম্মশাস্ত্র যে বিবাহের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করেন, তার নাম 'ব্রাহ্ম বিবাহ।'[2] বর ও কন্যা ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবেন। শিক্ষাকালে স্ত্রী-পুরুষের অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সংযম-রক্ষার আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক নানা উপায়ে চরিত্রের সবলতা রক্ষা হ'তো। একটি নিয়মে দেখা যায় ব্রহ্মচারীর উত্তম বসন-পরিধান ও দন্তধাবন নিষেধ; বোধ করি রমণীর কাছ থেকে অতি আত্মীয়তায় উৎসাহ না পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই নিয়ম। বিদ্যালাভ শেষ হ'লে ব্রহ্মচারী পত্নী-গ্রহণ-কামনায় কন্যাকে প্রার্থনা করবেন। কন্যার পিতা অনুমোদন ক'রে উভয়ের বিবাহ দেবেন।[3] বরের পিতারও অনুজ্ঞা আবশ্যক। শেষের অংশ, পিতা মাতার মত বাদ দিয়ে শুধু শেষটুকু রাখলে পরিশেষে দাঁড়ায় অভিজ্ঞ লোকের হিসেবী বুদ্ধির ব্যবসাদারী ঘটনা। এখনও দেখা যায় ছেলে বা মেয়ে কোন পক্ষই

* আপস্তম্ব, বৌধায়নাদি প্রণীত গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র প্রভৃতি ও পরবর্ত্তী মনু, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি প্রভৃতি। এগুলি সমাজ, গৃহ ও ব্যক্তিগত সদাচার বিষয়ক ধর্ম্মের বিধি ও নিষেধ মান্য করার ফল ও অমান্য করার সাজা ইত্যাদি। হিন্দু ধর্ম্মের এটি ব্যবহারিক বা ফৌজদারী বিভাগ বলা চলে। আত্মা ও ঈশ্বর বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ব্যক্তিগত সাধনা দর্শনশাস্ত্রের বিষয়।

১। ললিত বিস্তার—ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্করণ, ১৮২ পৃঃ।

২। আপস্তম্বগৃহ্য—১, ২, ৭, ১১।

৩। ঋ, বে—১০, ৮৫, ২৩; বৌধায়ন—১, ২, ২০, ২; মনু কিন্তু বলেন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ ক'রে কন্যা দান—৩, ২৭।

৪। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বিশেষ প্রশংসনীয়; কন্যা হরণ ক'রে বিয়ে করাও খুব গৌরবের।

৫। অনেকটা আরম্ভ হয় 'প্রাজাপত্য' মতে—মনু ৩, ৩০ - শেষ হয় 'আসুর' মতে—মনু, ৩, ৩১।

একটু শিক্ষিত হ'লে তাদের নিজ মত খুব সহজে উপেক্ষা করা যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্র* বরকন্যা বিচারপূর্ব্বক শোভন সংযোগের কথা বলেছেন এবং গুণহীন বরে সমর্পণ না ক'রে বরং ঋতুমতী অবস্থায় কন্যাকে অনূঢ়া (১) রাখাই সঙ্গত মনে করেছেন। গৌতম বলেন (২) তিনবার ঋতু হওয়ার পর পিতৃদত্ত অলঙ্কার উপহার দিয়ে কন্যা স্বেচ্ছায় স্বামী গ্রহণ করবেন। বশিষ্ঠ (৩) বলেন, ঋতুর তিন বৎসর পর আর অপেক্ষা না ক'রে কন্যা নিজেই সমতুল্য পতিবরণ করবেন। মনু (৪) বলেন, ঋতুর তিন বৎসরের মধ্যে বাপ মা যদি গুণবান্ বরে কন্যার বিয়ে না দেন, তবে পরে কন্যা স্বাধীন ভাবে স্বয়ম্বরা হবেন; এ বর-কন্যা কারুর স্বেচ্ছা-বিবাহের দোষ হয় না। তবুও সূত্র যুগের সুদূর অতীত কালেই নারীর স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে রূঢ় শাসনের সূত্রপাত হয়েছে। বৌধায়ন (৫) বলেচেন—নারীর স্বাধীনতা নেই। এ বিষয়ে এই প্রচলিত মত—কুমারী কালে কন্যা পিতার, বিবাহান্তে যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন; কোন বয়সেই নারী স্বাধীনতার উপযুক্তা নন্। মনু (৬) বেশ সদম্ভেই সে কথা বলেছেন—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'। পরবর্ত্তী (৭) স্মৃতিকারগণও এ কথার নানাভাবে পুনরাবৃত্তি করেছেন। শাসনের হুঙ্কার ও অমর্য্যাদার নিষ্পেষণের অবকাশ ক্বচিৎ কৃপাবর্ষণে নারীর অসহায় অবস্থার বেদনাকে আরো করুণ ক'রে অতি দ্রুত তাকে স্বপ্নাবিষ্ট জড়তায় সমাচ্ছন্ন করা হয়েছে।

যৌবন-বিবাহ

অধ্যয়নব্রতের সঙ্গে বিবাহ বিষয়ে নিজ অভিমত গঠন করতে আর্য্যনারীর ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করাই স্বাভাবিক। অথর্ববেদের দুটি মন্ত্রে[৮] বিবাহের বয়স বেশ সহজেই অনুমান হয়—'হে অর্য্যমান দেব! এই কন্যা অপরা কন্যাগণের বিবাহ-উৎসবে গিয়ে গিয়ে বিরক্ত হয়েছেন, এবারে অন্যা রমণীগণ এঁর বিবাহে অবশ্য আসুন। হে ধাতর্! এই কন্যাকে মনের মত একটি স্বামী দাও।' এ মন্ত্র যেন ছবি। বেশ দেখা যাচ্ছে—অপরের বিবাহদর্শনে আত্মগ্লানি আসবার মত যৌন চেতনা হয়েছে এমন বয়সী এক কন্যা এই অবস্থায় অনেক বার ফিরে এসে দীর্ঘনিশ্বাসে দর্পণ মলিন ক'রে, নিজ দেহশ্রীর প্রতি মমতাপূর্ণ অবসন্ন দৃষ্টিতে একে একে উৎসবের সাজসজ্জা উন্মোচন কচ্চেন আর যেন অকস্মাৎ ঈপ্সিত দয়িতের আশায়

---

* আপস্তম্ব গৃহ—১, ৩, ১৮ ও ১৯—শিক্ষিত বরে সম্প্রদানের কথাও আছে; মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—৮, ৪৭, 'দেয়া বরায় বিদুষে'।

১। মনু—৯, ৮৯। ২। গৌতম—১৮, ২০। ৩। বশিষ্ঠ—১৭, ৬৭-৬৮, 'পতিং বিন্দেৎ তুল্যম্'। ৪। মনু—৯, ৯০-৯১; ঋ, বে—১ ১১৬, ১—সায়নভাষ্যে স্বয়ংবর বিবাহের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। কাব্য-সাহিত্যের মত ধর্ম্ম-সাহিত্যে স্বয়ংবরের তেমন ঘটা নেই; প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই স্বয়ংবর চলিত। ৫। বৌধায়ন—২, ২, ৩, ৪৪-৪৫। ৬। মনু—৯, ৩। ৭। বিষ্ণু—২৫, ১৩; বশিষ্ঠ—৫, ১-২। ৮। অথর্ব্ব—৬, ৬০, ২—৩।

চঞ্চল হ'য়ে উঠছেন। কিন্তু কল্পনার প্রয়োজন নেই। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা বশ করার মন্ত্রে (১) ভাবী বর অতি স্পষ্ট বর্ণনা কচ্চেন—'কন্যানাং বিশ্বরূপাণাং'; সায়ন ভাষ্যে অর্থ দেওয়া আছে—অনুপম ভাবে পরিস্ফুট সমুদয় অঙ্গ এমন অনূঢ়া কন্যা। অন্য মন্ত্র(২) বলছেন—'হে কামিনি! আমার দেহ, আমার পাদদ্বয়, আমার অক্ষিদ্বয়, আমার প্রতি অঙ্গ তুমি বাঞ্ছা কর; আমার বাহু ও হৃদয়ে তুমি আলিঙ্গিতা হও! তোমার চাহনির নিষ্ঠুর মায়া ও কেশরাশির বিলাসভঙ্গীতে আমার চিত্ত কামাগ্নিতে উষ্ণ হ'য়ে উঠছে।' কন্যাও (৩) স্বীয় বিকশিত যৌবনের সামর্থ্যে প্রার্থনা করেছেন—'আমার চিন্তা এই পুরুষের হৃদয়ে কামনার জ্বালা আনুক।' 'অল্প বয়সী বালা'র সংশ্রবে এই দৈহিক উন্মাদনা সম্ভব নয়। ঋষি-রমণী ঘোষা (৪) বলছেন, আমাতে এখন নারী লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে ও বর এসেছেন এবারে আমায় বিয়ে কত্তে। সুবিখ্যাত 'সূর্য্যসূক্তে' আরো সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ সূক্তের নবম ঋকের ভাষ্যে সায়ন বল্‌ছেন—'পতিং কাময়মানাং পর্য্যাপ্ত-যৌবনামিত্যর্থঃ'। দ্বাবিংশ ঋকে বিশ্বাবসুকে বলা হয়েছে, তিনি এই বিবাহের কন্যার প্রতি লোভ ছেড়ে 'অপরা নিতম্ববতী অনূঢ়া কন্যা'র কাছে যান। বর কন্যাকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন—'অবিলম্বে তুমি আমার গৃহে আধিপত্য কর', 'তুমি আমার গৃহস্থালীর কর্ত্রী হও', 'সপ্রেমে তুমি আমার প্রণয়পূর্ণ আলিঙ্গনের প্রতিদান দাও' (৮), 'তুমি আমার পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা সকলের মধ্যে—'সাম্রাজ্ঞী ভব'—গৌরবে বিরাজ কর' (৯)। বালিকার প্রতি এ সবের প্রয়োগে কি অবস্থা দাঁড়ায় রবীন্দ্রকাব্যে নব্য স্বামীর কবিত্বের উচ্ছ্বাসের প্রত্যুত্তরে বালিকা-বধূর টোপা কুল খাওয়ার প্রাহসনিক উল্লেখে আমরা তা জানি। প্রকৃতই তখন—জীবন-সঙ্গিনীর কামনায় পতি-পত্নী গ্রহণ কত্তেন—রমণী তাঁর হৃদয়ে হৃদয় মেলাতেন আর ধর্ম্মকার্য্যে হাতে হাত মেলাতেন। পুলকিত-দৃষ্টি শ্বশুর-শাশুড়ীর চোখের সাম্‌নে ফুর্‌ফুর্‌ ক'রে বৌ গৃহকার্য্যে দশজনের ভাব পরিতৃপ্ত কর্‌বেন আর কালেজি ছাত্র-স্বামী পত্র-মারফৎ প্রণয় কর্‌বেন, এ ব্যবস্থার জন্য বৌ আন্‌বার রীতি ছিল না। অবশ্য ক্রমশঃ আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও অনেকাংশে বাল্যবিবাহ বর্ত্তমানের এই অবস্থার জন্য দায়ী। বৈদিক যুগে স্বামী স্বতঃসিদ্ধ পাতিব্রত্যের নিশ্চিন্ত ভরসায় থাকতে পেতেন না। বিয়ের আগে ভাবী বধূর মন পাওয়ার প্রার্থনা অনেক দেখা যায়—'কামনার জ্বালায় উত্তপ্ত হৃদয়ে, হে কামিনি, আবেগ-তপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠে তুমি এসো; তুমি এসো মধুর প্রণয়-সম্ভাষণ কণ্ঠে নিয়ে, অহঙ্কার সরিয়ে ফেলে, কেবলমাত্র আমার হ'য়ে (১০)।' বিয়ের পরেও প্রার্থনা চলেছে—'আমাদের উভয়ের আঁখি মধুমতী হোক্‌,

১। অথর্ব্ব—২, ৩০, ৪। ২। অথর্ব্ব—৬, ৯, ১-২ ৩। ঠিক পরের মন্ত্রেই, পুত্র জন্মের ব্যাপার—'পুত্রস্য বেদনং'—বর্ণনা আছে। ৩। অ, বে—৬, ৩০, ২। ৪। ঋ, বে—১০, ৪০, ৬। ৫। বিবাহ মন্ত্র—১০, ৮৫ সূক্ত। ৬। ঋ—১০, ৮৫, ২৬। ৭। ঋ—১০, ৮৫, ২৭। ৮। ঋ—১০, ৮৫, ৩৬। ৯। ঋ—১০, ৮৫, ৪৬। ১০। অ, বে—৩, ২৫, ৪।

মুখ শান্তি অনুলেপিত হোক্, তোমার হৃদয়ের মধ্যে আমায় রেখে দাও, আমাদের দুজনার মন নিতান্ত এক হোক' (১)। অযত্নলব্ধা বিমূঢ়া বালিকাকে সতীত্বের অর্ডিনান্স শাসনে নয়, স্বাধীন-চিন্তা যুবতী-হৃদয়কে প্রবল প্রণয়ঝঙ্কারে অনুরণিত করা হ'তো।

বেদ যৌবন-পূজার যুগ

বালিকা-বিবাহের প্রশ্নই ওঠেনা প্রাচীন যুগে। বৈদিক যুগের মন্ত্রই ছিল—যৌবনে দাও রাজটীকা। ইন্দ্র হলেন, ঋষিদের যুবা সখা (২); শুধু তাই নয়, তাঁদের সুন্দরী কন্যাগণেরও সখা। (৩) অগ্নি পরম যুবা (৪) এবং কুমারীগণের জার ও স্ত্রীগণের পতি (৫)। অশ্বিন্ দেব-যুগলও সুন্দর যুবা ব'লে কীর্ত্তিত হয়েছেন। ঋষিগণও যুবা হ'তেই চান—মধুচ্ছন্দা নিজেকে নবীন ঋষি ব'লে ঘোষণা কচ্চেন। যুবতী রোদসী দেবীকে যুবার দল (৬) রথে বসিয়ে সম্বর্দ্ধনা কচ্চেন। ঊষা যুবতী (৭) যেহেতু পুরুষের মনে কামনা জাগিয়ে দেন। কুমারীর সঙ্গে তুলনায় ঊষার যে অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনা হয়েছে তা থেকেই বৈদিকযুগে কত বয়স অবধি অবিবাহিতা থাকতো তার অতি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। পরিপূর্ণশ্রী অঙ্গের সকল মাধুরীই এই চিত্রে রয়েছে। তিনি স্বীয় রূপে উল্লসিতা এবং যৌবনসমাগমে উজ্জ্বল ও হাস্যময়ী, অধিকন্তু তাঁর বক্ষে এমন শোভার সমাবেশ হয়েছে যা' ক্ষণে ক্ষণে ব্যক্ত ক'রে তিনি আনন্দ পান (৮)। তাঁর লাবণ্য-বিষয়ে কেমন একটি স্নিগ্ধ আত্মপ্রত্যয় এসেছে এ সংবাদও ঋষি দিতে ভোলেন নি। 'ঊষা' (৯) যেন পুলকিতা মাতা কর্ত্তৃক সুসজ্জিতা কন্যা, যিনি নবীন রূপের জয়গর্ব্বে প্রতি ভঙ্গীতে প্রকাশ কচ্চেন দর্শককে যাদের দৃষ্টি মুগ্ধ ও হৃদয় আনত করায় নিজের শক্তি তিনি বেশই জানেন।'

যৌবন-বিবাহে ধর্ম্ম-শাস্ত্র

ধর্ম্মশাস্ত্র নানা বিভিন্ন যুগের রচনা। এক যুগের হ'লেও দেশে দেশে এমন কি গ্রামে গ্রামে (১০) আচারের পার্থক্য হেতু আচার্য্যগণের মতভেদে সমাচ্ছন্ন। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের কাছে একমত আশা করা যায় না। মনুর 'স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর অধীন' (১১) ইত্যাদি রচনাকেই কিন্তু যৌবন বিবাহের এক বিশেষ প্রমাণ মনে করা যেতে পারে। বশিষ্ঠ ধর্ম্ম-সূত্রে (১২) অতি স্পষ্ট আদেশ আছে—গুরুগৃহ থেকে 'সমাবর্ত্তন' ক'রে কোনো বিদ্যার্থী যখন গার্হস্থ্য

১। অ, বে—৭, ৩৬। ২। ঋ— ৬, ৪৫, ১। ৩। ঋ—১, ৩০, ১১। ৪। ঋ—১, ৩৬, ১৫। ৫। ঋ—১, ৬৬, ৪—জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাং। ৬। ঋ—১, ১৬৭, ৬। ৭। ঋ—১, ১১৭, ৭—সায়ন ভা—কীদৃশী সা। যুবতিঃ। যাবয়িত্রী ফলানাং পুরুষৈঃ পাপয়িত্রী। ৮। ঋ—১, ১২৩, ১০—যথালোকে প্রগল্‌ভা যোষিৎ··· প্রিয়তমস্য পুরতঃ···· ঈষদ্ধসনং কুর্ব্বতী বক্ষসোপলক্ষিতানি গোপ্যানি বাহুমূলস্তনাদীনি আবিষ্করোতি তথা ত্বমপীত্যর্থঃ- সায়নভাষ্য।

৯। ঋ—১, ১২৩, ১১। ১০। আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র—১, ৭, ১। ১১। মনু—৫, ১৪৮; বশিষ্ঠ—৫, ২; অন্যান্য সকলের এই মত। ১২। বশিষ্ঠ—৮, ১।

ধর্ম্মে ইচ্ছুক হবেন তখন তিনি অন্যের অভুক্তা যুবতী রমণী গ্রহণ করবেন। অধুনা বরপক্ষ আত্মসম্মান নিয়ে বেজায় ব্যস্ত কিন্তু প্রাচীন যুগে বরকে কন্যার পিতার নিকট কন্যা প্রার্থনা কর্ত্তে হ'ত (১)। 'বর' শব্দ 'বৃ' ধাতু (woo) বরণ করা, এবং 'কন্যা' শব্দ 'কম্' ধাতু (covet) কামনা করা, এই ভাব থেকে এসেচে। বর স্বয়ং কন্যা দেখে ও ভাবী শ্বশুরের কাছে আবেদন ক'রে আস্‌তেন, পরে আবার বন্ধুবান্ধবকেও পাঠাতেন (২)। বরের জ্ঞাতার্থে শাস্ত্রকার (৩) সুদীর্ঘ তালিকা দিয়ে কেমন কন্যা প্রার্থনা করা সমীচিত হবেনা সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তালিকার দু' একটি নমুনা এই—যে কন্যা বেশী আত্মীয়গণের কড়া নজরে আছেন, যে কন্যা বড় বেশী সুশ্রী, যে কন্যার বেশী সুন্দরী কনিষ্ঠা ভগ্নী আছেন, ইত্যাদি। যাহোক্, কন্যার পিতামাতার সুবিধার জন্য স্মৃতিকারগণ (৪) বিধান দিয়েছেন, যদি উৎকৃষ্ট বর পাওয়া যায়, তবে অপ্রাপ্তবয়স্কাকেও—অপ্রাপ্তামপি—বিবাহ দেওয়া ভাল। এ বাক্যের স্পষ্ট নির্দ্দেশ, সাধারণতঃ প্রাপ্তযৌবনাকেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য তবে বিশেষ সুযোগ মিল্‌লে ব্যতিক্রম করা উচিত। 'অপ্রাপ্তামপি' কথাটির মেধাতিথি ভাষ্য অতি প্রাঞ্জল— 'অযোগ্যামপি কামবশত্বেন বালাম্ অপ্রাপ্তং কৌমারং বয়ঃ'—উদ্ভিন্নযৌবনা না হওয়ায় কাম সম্বন্ধে ব্যর্থ। অবশ্য নব্য (যৌনবিজ্ঞান) (৫) বলেন, সন্তান ধারণ সামর্থ্যের বহু আগেই প্রকৃতির প্রসাদে নারী সম্ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করার শক্তি ও কৌশল আয়ত্ত করেন। আয়ুর্ব্বেদ কিন্তু সাবধান কচ্চেন যেন ষোল বছরের আগে মেয়েদের জননী হ'তে না হয়। ওদিকে বিবাহের মন্ত্র প্রজনন ব্যাপারের বহুল আকাঙ্ক্ষার গুঞ্জরণে এবং পত্নীসম্ভোগের মন্ত্র (৬) পত্নীকে 'তীক্ষ্ণ ধারে উপপতি-ছেদনসমর্থা' হ'তে বলায় যৌন চিন্তার উষ্ণ বায়ুমণ্ডল যুবক বরের মনকে ঘিরে রাখে।

বিবাহকালে পাণি-পীড়ন ও ধ্রুবতারা-দর্শনে (৭) চিরস্থির প্রেমের অঙ্গীকার (৮) সমাপ্ত হ'লে তখন থেকে তিন রাত সংযম। তারপর কন্যাকে বরের বাড়ী আনা হয়। তখন চতুর্থ দিবসে (৯) যৌন পরিচয় সংঘটিত হয়, আবার ঋতুর আগেও সে পরিচয় নিষেধ ; কাজেই বিবাহের বয়স অনুমানের বেশ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কামসূত্রে চতুর্থ রাত্রের শয়ন-ধর্ম্মপালনকালে বিচিত্র অদ্ভুত কৌশলে পত্নীকে রতিরঙ্গে উত্তেজিত করার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেটি বালিকার সংশ্রবে সম্ভব নয়। তবু যদি বালিকা-বিবাহ দ্বারা গার্হস্থ্য জীবনের সূচনা কর্ত্তে আদেশ হয় আর বালিকা বধূ যদি তাঁর স্বামীকে

১। সবিতার দুহিতা সূর্য্যাকে সকল দেবতাই অভিলাষ ক'রে বল্লেন, আমরা আদিত্য অবধি দৌড়বো ও যিনি জয়লাভ করবেন সূর্য্যা তাঁরই হবে—ঋ—১, ১১৬, ১৭। ২। আপস্তম্ব গৃহ্য—২, ৪, ১৩। ৩। আপস্তম্ব—১, ৩, ১১। ৪। মনু—৯, ৮৮। ৫। Metchnikoff—'Nature of Man.' ৬। হিরণ্যকেশী গৃহ্য সূত্র—১, ৭, ২৪, ৫। ৭। গোভিল—২, ৩। ৮। এ সময়ে স্বামীর নাম করেন দেখা যায়। ৯। গোভিল—২, ৫, ৭.৮ ; "চতুর্থী কর্ম্ম"—এই সম্পর্কে অথর্ব্ববেদের ৭, ৩৬, ৩৭, শ্লোকে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের গাত্র অনুলেপন করেন ও স্ত্রী তাঁর বসন দ্বারা স্বামীকে আচ্ছাদন করেন।

মনঃক্ষুণ্ণ না করেন, তাঁর নিজের ভাবী যৌবন যারপর নাই ক্ষুণ্ণ হয়, আর তখন হয়ত বা গৃহপতিও অনুশোচনাই করেন। পুরাণ অনেকের অতিমান্য; স্বয়ং পুরাণই (১) কলিযুগের দুর্ঘটনার তালিকায় বল্‌ছেন—এই যুগে অনেক বালিকা ষোল বছরের আগেই সন্তান ধারণ করবেন। কলিপূর্ব্ব যুগে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে এ কথা খুবই মূল্যবান্ তথ্য।

যৌবন ধর্ম্ম

প্রাকৃতিক নিয়মে যৌন লালসায় প্রবৃত্তি। পুরুষের প্রাণ-ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তির জন্যই এর প্রয়োজন। আর তরুণ বয়সেই এর সার্থকতা। নারীর সম্বন্ধে কৌটিল্যের বচন আছে—অসম্ভোগো জরা স্ত্রীণাং(২)। গরুড় পুরাণে (৩) ও রামায়ণে (৪) ও এ ভাবের সমর্থন আছে। ম্রিয়মাণতা-নাশক বলেই অথর্ব্ববেদে (৫) কামদেবতাকে 'সবল ও জবরদস্ত অভিভাবক' বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে (৬) দেখা যায় নিবৃত্তির ব্যর্থতায় ক্লিষ্ট হ'য়ে কৃচ্ছ্রসাধনরত ঋষিদম্পতি 'জয়-যুক্ত সুরত সংগ্রামে' প্রবৃত্ত হয়েছেন। বর্ত্তমান যুগেও একথা স্বীকৃত হয়েছে (৭) যে যৌন সংশ্রবের চাঞ্চল্য ও পরিতৃপ্তি সমর্থ বয়সে (adult years) দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য দান করে আর সন্তান-কামনার সঙ্গে এই আনন্দোচ্ছ্বাসের যোগ নেই। তাই অনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের খাতিরে সুনির্দ্দিষ্ট যৌবনের মায়া অনেক আচার্য্যই এড়াতে পারেন নি। কেহ (৮) বুদ্ধি পরিণত হওয়ার আগে বিয়ে করেন। কেহ (৯) নারী-লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্ত্তে বলেন। কেহ (১০) বলেন—'প্রবৃত্তে রজসি' ঋতু আরম্ভ হ'লে বিবাহ কর্ত্তব্য। কেহ (১১) বলেন, তিন বার ঋতু হ'য়ে গেলে তারপর কন্যা বিবাহযোগ্যা হন, যেহেতু প্রথম তিন ঋতু (১২) দেবগণের ভোগ্য—প্রথম ঋতুঅন্তে সোম পতি, দ্বিতীয় গন্ধর্ব্ব, তৃতীয় অগ্নি, মানুষ চতুর্থ পতি। বাৎস্যায়ন বলেন, 'স্তনীং উদ্বহেৎ' আর কাত্যায়ন 'অজাতব্যঞ্জনা' (১৩) কন্যার বিবাহ অনুমোদন করেন না। মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে যে 'লক্ষণান্বিতা' অর্থে কেবল 'শুভ লক্ষণযুক্তা' উপদেশ করা হয়েচে, সংবর্ত্ত ঐ কথাটির অর্থ গ্রহণে অনেকটা বেশী এগিয়ে বলেচেন—'লক্ষণৈশ্চ সমন্বিতাং'। নারীত্বব্যঞ্জক বিশেষ লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়েছে এমন কন্যাকেই বিবাহ কর্ব্বে—সংবর্ত্ত* এই ভাবেই বুঝিয়েছেন ও এ বিষয়ে তিনি কাত্যায়নের সঙ্গে একমত। মনু (১৪) যদিচ দ্বিজগণকে বার বৎসরের কন্যাকে বিবাহে আদেশ করেছেন এবং স্বামীর বয়সের সঙ্গে পার্থক্য রাখবার আবশ্যকবোধে প্রয়োজন মত আট বৎসরের বালিকা-বিবাহও (১৫) অনুমোদন

১। বায়ু পুরাণ—৫৮ অধ্যায়। ২। Freud বলেন—half-suppressed sex instinct থেকে anxiety hysteria হয়। ৩। গ পুঃ—১১৫, ১০। ৪। রামায়ণ ৪, ৫, ৯। ৫। অ, বে—১, ২, ৭। ৬। ঋ, বে—১৭৯—অগস্ত্য ও লোপমুদ্রা। ৭। H. G. Well's—Work, Wealth & Happiness of Mankind. ৮। মহানির্ব্বাণ—৮, ১০৭। ৯। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা। ১০। নারদ সংহিতা। ১১। সংবর্ত্ত। ১২। ঋ—১০, ৮৫, ৪০। ১৩। কাত্যায়ন সংহিতা—২৮, ৪।—ব্যঞ্জনা অর্থ—রোম, রজঃ, কুচ। ১৪। মনু—৯, ৯৪। * সংবর্ত্ত বলেছেন—রোম দর্শন সংপ্রাপ্তে সোমোহভুংক্তেহথ কন্যাকাং। রজো দৃষ্ট্বা তু গন্ধর্ব্বঃ কুচো দৃষ্টাতু পাবকঃ॥ তারপর কন্যা পতিভুক্তা হওয়ার যোগ্যা হন। ১৫। পরাশর—১০ বৎসর।

করেচেন, মেধাতিথি ভাষ্য 'যবীয়সী কন্যা বোঢ়ব্যা'—যুবতী কুমারী বিবাহ কর্ত্তব্য—এই তাৎপর্য্যই প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন এই শ্লোকে মনু মহারাজ বিবাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন বয়সের কড়াকড়ি অভিপ্রায় করেন নি, স্বামী স্ত্রীর বয়সের ব্যবধানের (১) একটা মোটামুটি ধারণা দিয়াছেন মাত্র।

ধর্ম্মশাস্ত্রে বাল্য-বিবাহ-আদেশের কারণ

তবুও উল্লিখিত কয়েকটি মতামত বাদে (২) ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই বালিকা বিবাহের আদেশ দেখতে পাওয়া যায়। ঋতুই (৩) এ আদেশের মূল কারণ। রমণীর ঋতু ব্যর্থ হ'তে দেওয়া কিছুতেই চলে না এই আদর্শ থেকে সন্তানকামী আর্য্যশাস্ত্রকারগণ বালিকা-বিবাহবিধানে উৎসুক ছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধের পর থেকে ক্ষত্রিয় রাজত্ব হীনবীর্য্য হ'ল এবং ক্রমে আর্য্য সমাজে শিথিলতা আস্‌তে লাগলো। কাজেই উচ্চবর্ণের সামাজিক রীতিনীতির প্রচার আবশ্যক হলো। আপস্তম্ব তদীয় গৃহ্যসূত্রে নিজের যুগকে 'অবর' বলেছেন ও দুঃখ করেছেন এ যুগে ঋষি আর জন্মায়না ও পাপ বেড়েই চলেছে। তার আরো পরে হয় বৌদ্ধ, নয় শূদ্র, নয় বৈদেশিক রাজত্ব চলেছে আবার তাতেও ঘন ঘন পরিবর্ত্তন। এ অবস্থায় আবার মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য গৃহসূত্র গুলির সংস্কার ক'রে স্মৃতি সংহিতা রচনা হয়েছে। বেদের প্রাথমিক যুগেই মুষ্টিমেয় আর্য্য বহু অনার্য্যের সঙ্গে লড়্‌তে গিয়ে বীরপুত্রের বৃদ্ধিতে পরম উৎসাহী ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের যুগেও চাহিদা কমে নি। তাই দেখা যায় অধুনা-প্রচলিত সতীত্বের আদর্শ বিপর্য্যস্ত ক'রেও নিয়োগ প্রভৃতি উপায়ে পুত্র-প্রজননের বহুল ব্যবস্থা হ'য়েছিল। স্ত্রীলোকের মন এ অবস্থার অনুগামী করার জন্য মাতৃত্বই নারীর প্রধান আদর্শ ব'লে প্রচার করা হয়েছিল। পাতিব্রত্যের যে প্রশংসা সেও প্রধানতঃ গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যেই নতুবা প্রেমের নিজস্ব মহিমার বন্দনা ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে শাস্ত্রের মর্ম্ম এই দাঁড়ালো—পুত্রের প্রয়োজনে সতী স্ত্রী অন্য পুরুষ সম্ভোগ কর্ব্বেন কিন্তু প্রেমের জন্য (৪) তেমন আদৌ চল্‌বে না। মাতৃত্ব নারীর মন কেমন পেয়ে বসেছিল তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেয়া যাক্, দ্রৌপদী বল্‌ছেন—'যুধিষ্ঠিরকে মুক্ত হ'তে হবে যাতে ক'রে আমার পুত্রকে কেউ দাসের পুত্র বল্‌তে না পায়'। ঋতু বিফল হাওয়ার আশঙ্কা নিবারণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র (৫) বলেছেন, বিবাহের পূর্ব্বে যতবার ঋতু অকাজে যাবে ততবার কন্যার পিতামাতা ভ্রূণহত্যার পাপগ্রস্ত হবেন। প্রাচীনতম শাস্ত্রকার গৌতম (৬) বলেন—'প্রদানম্ প্রাগ্ ঋতোঃ' ঋতুর পূর্ব্বে সম্প্রদান কর্ত্তব্য। তৎপরবর্ত্তী বশিষ্ঠ (৭) বলেন, পিতা নগ্নিকা (৮) অবস্থায় কন্যাকে বিবাহ দেবেন। গোভিল (৯) এবং হিরণ্যকেশী (১০)

১। আপস্তম্ব গৃহ্য—১, ৩, ১১। ২। যদিচ Bhandarkar—History of Child Marriage—P. 153—বলেন আশ্বলায়ন প্রভৃতির আমলে 'marriages after puberty were a matter of course.' ৩। মনু—৩, ৪৫—৫০। ৪। বশিষ্ঠ—১৭, ৬১—নিযুক্ত পুরুষ সম্ভোগকালেও নিযুক্তা স্ত্রীকে প্রণয় ব্যবহারে আকর্ষণ কর্ত্তে পারে না। ৫। বশিষ্ঠ—১৭, ৭১; গৌতম—১৮, ২৩। ৬। গৌতম—১৮, ২১। ৭। বশিষ্ঠ—১৭, ৭০। ৮। নগ্নিকা—রজোদর্শন ও স্তনোদ্গমের পূর্ব্বে। ৯। গোভিল—৩, ৪, ৬। ১০। হিরণ্যকেশী—১, ৬, ১৯, ২।

এবং অনেকেই এই মত সমর্থন করেন। তবে ঋতুর পর মোটের উপর তিন বৎসর (১) পর্য্যন্ত এঁরা দয়া করে সময় (grace) দিয়েছেন। ঋতুর গুরুত্ব সম্বন্ধে বহু নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। ঋতুস্নানান্তে পত্নীকে যে পুরুষ সঙ্গ দান না করেন রামায়ণ (২) তাঁকে 'দুস্টাত্মন্' বলেছেন। গরুড় পুরাণ, (৩) মার্কণ্ডের পুরাণ (৪) পরাশর সংহিতা (৫) ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র (৬) প্রভৃতি ঋতু গমন না করা অতি গর্হিত পাপ মনে করেন। এমন কি, অভিমন্যু-শোকে (৭) অধীরা সুভদ্রা দেবী বিলাপ কচ্চেন হে পুত্র, ঋতুস্নাতা পত্নীকে নিরাশ না করায় যে পুণ্য, সে সদ্গতি তুমিও যেন পাও।' ঋতুস্নানান্তে পত্নী 'ঋতুং দেহি' ব'লে ব্যাকুল আলিঙ্গনে স্বামীকে ঋতুরক্ষায় আহ্বান করেন। ঋতুপালন-কামনায় নারীর চাঞ্চল্যের স্ফীত প্রবাহ বিবাহ-সম্বন্ধের বাধা অবলীলা ক্রমে ভেঙে বেরিয়ে যায়। শর্ম্মিষ্ঠা (৮) রাজা যযাতিকে প্রবল অনুনয়ে আকর্ষণ কচ্চেন—রাজন্, আপনি সখী দেবযানীর স্বামী; সখীর আর নিজের স্বামী একই। ঋতুঅন্তে প্রার্থনা করি আপনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন......রূপসী শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দর কুমার লাভ কল্লে'ন। ধৌম্যপত্নী (৯) স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর এক লাজুক শিষ্যকে ঋতুপালনে বাধ্য কল্লেন। নারদ (১০) বলেছেন—বর বিদেশে থাকলে তিনবার ঋতু ব্যর্থ হওয়ার পর পত্নী আর অপেক্ষা না ক'রে পুনর্ব্বিবাহ করবেন। হৃদয়বান্ স্বামী বিদেশে গিয়ে পত্নীর ঋতুপালন-চিন্তায় বিব্রত হ'তেন দেখা যায়। রাজা উপরিচর শীকারকালে রাণীর ঋতু অবসান স্মরণ ক'রে পত্রপুটে স্বীয় বীর্য্য এক বাজপক্ষীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, অন্য পক্ষী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় উক্ত অমোঘ বীর্য্যের যমুনা-জলে পতনফলে সত্যবতীর জন্ম হয়।

রস সাহিত্যের যুগে নারী

ঋতুচিন্তা-সর্ব্বস্ব দেহবিলাসী বিবাহ-বিধানকে এক প্রকার জড়বাদ বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। মহাভারতে ও শকুন্তলা, রত্নাবলী, বাসবদত্তা প্রভৃতি কাব্য-সাহিত্যে হৃদয়বিলাসী আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাচুর্য্য। এ দুয়ের অনবদ্য মিলন ছিল বৈদিক যুগে। ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে ঋতু সম্বন্ধীয় অপব্যয়ের অতিভয়বশতঃ যৌবনসমাগমে সূক্ষ্ম প্রণয়-বেদনার নিগূঢ় মাধুর্য্য থেকে নারী বঞ্চিতা হ'লেন। তাতে যদিচ কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সুস্থির গতি লাভ হ'লো কিন্তু প্রেমোন্মাদনার অপূর্ব্ব আবেদন অজ্ঞাত থাকায় প্রাণের রসোচ্ছল নৃত্যলীলায় প্রকৃতি দেবীর সখীত্বলাভের আনন্দ রইলো না। তবে অধুনা যে অতি বাল্যে প্রণয়-চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে সে বোধ হয় রোমাঞ্চকর প্রণয়ের সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপী অক্লান্ত ব্যবহারের ক্রম-পরিণতি (evolution) প্রসূত। পূর্ব্বে যা' ছিল উৎকর্ষের বিষয়-বিবর্ত্তন প্রসাদে আজ তা

১। যথা; বশিষ্ঠ—১৭, ৬৮; বিষ্ণু—২৪, ৪০। ২। রামায়ণ—২, ৭৫, ৫২। ৩। গঃ পু—৪, ৪০। ৪। মার্ক-পু—১৬শ অধ্যায়। ৫। পরাশর—৪, ১২। ৬। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র—৭, ২৮—৩৬। ৭। মহাভারত—৭, ৭৮। ৮। মহাভারত—১, ৮২। ৯। মহাভারত—১, ৩, ৪২। ১০। নারদ সংহিতা—১২, ১৪।

সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) এলাকায়। অতএব স্কুলের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদি দোষগুণবিজড়িত আদিরসের মৃদুমন্দ ঊর্ম্মিলীলা ক্রমে অবৈধ যৌন-লালসার উত্তালতরঙ্গে পরিণত হওয়ায় বাল্য-অপরাধের বিচারপতি মহাশয় (১) অতটা বিচলিত হয়েছেন। বিনা-বিবাহে বাল্য প্রেমের সঙ্গে তুলনায় বিনাপ্রেমের বাল্য-বিবাহ ভাল কি মন্দ সে তর্ক ছেড়ে কি ছিল, কতটুকু ছিল আর সেটুকু কেনই বা ছিল সেই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে দেখা যায় পূর্ব্বে প্রণয়-লীলা যৌবনের অপেক্ষা রাখ্‌তো। মার্ক প্যাটিসনের সমালোচনা সৌজন্যে যখন জান্‌তে পাই, গুজ্‌বেরীর ছোট জঙ্গলে বড় বড় বালিকাদের সঙ্গে মিল্‌টন্ খেলা ভালবাস্‌তেন, তখন সন্দেহ থাক্‌বার কথা নয় স্নিগ্ধ ছায়াবেষ্টিত মৃদুতর আনন্দেও কিছু বয়োবৃদ্ধিসম্পন্না বালিকা বাঞ্ছনীয়া। আর প্রতিঘাতসমর্থা যুবতীর তীক্ষ্ণ কিরণ সম্পাতেই উষ্ণতর ক্রীড়াচাপল্য জেগে ওঠে। কৃষ্ণ-প্রণয়িনী গোপকামিনীগণ (২) সকলেই যৌবন প্রপীড়িতা এবং অসীম কামনার দাহে (৩) তাঁদের সসীম হৃদয় নিদারুণ সন্তপ্ত। স্বয়ং কৃষ্ণও দেবত্ব-গৌরবে বয়সের প্রাকৃতিক নিয়ম উপহাস ক'রে 'তেজীয়ান্ ও অগ্নির মত সর্ব্বভুক' (৪)। রতিকান্তের প্রসাদপুষ্ট যৌবনোদ্গমে কাব্যসাহিত্যের কুমারী নায়িকা মাত্রেরই (৫) প্রতি অবয়ব এমনই পরিস্ফুট যে তার লালিত্য বিশ্লেষণে পুরুষের মুগ্ধ-মন্থর-দৃষ্টি ত্যাগের বিনা ক্লেশে অঙ্গ থেকে অঙ্গান্তরে যেতে পারে না। তবুও বয়স্থা বলে তারা কেহ-ই বেহায়া নন। তরুণীর লাজমাধুরীর অরুণ আভায় কাব্য-যুগ বিভাসিত। অধুনা লাজনম্রা নব-বধূর যে আরক্তিম আলোয় আমাদের কল্পনা আকৃষ্ট করে তাতে প্রাণের আভা নেই। বৈদিক যুগে স্বামীর কাছে এতটা লজ্জার সমাদর ছিল না, বরং এবিষয়ে কিঞ্চিৎ লজ্জাহীনতার প্রশংসাই শোনা যায়। বেদে উষাকে আদর করে লজ্জাহীনা বলা হয়েছে। তবে গুরুজনসকাশে প্রাচীন যুগের আর্য্যবধূগণ ব্রীড়াবনতা হ'তেন। ঋগ্বেদীয় সাহিত্যে (৬) বধূর লজ্জাশীলতার সুমধুর নিদর্শনের একটি সুকুমার রেখাচিত্র অঙ্কিত আছে—'তদ্‌বৈবাদ স্নুষা শ্বশুরাল্লজ্জমানা নীলিয়মানা'—যেন একটি নববধূ শ্বশুরকে দেখে লজ্জায় তাঁর কান্ত তনু মোহন ছন্দের নবীন আবর্ত্তনে অবনমিত কল্লেন। কুমারসম্ভববর্ণিতা পার্ব্বতী সর্ব্বাঙ্গে উল্লসিত যৌবনসজ্জার ও সুচারু ভঙ্গীর উজ্জ্বল আদর্শ। গৌরবান্বিত পিতা হিমালয়ের হাত ধ'রে গৌরী বেড়াচ্চেন এমন সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল উপস্থিত। দেবর্ষিগণের সঙ্গে পিতা নানা আলাপনে ব্যাপৃত আর কন্যা সকৌতুকে শুনে যাচ্চেন। কথায় কথায় যখন মহাদেবের সাথে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হ'লো তখন পিতার অঙ্গুলিবন্ধন থেকে পার্ব্বতীর হাত শিথিল হ'য়ে এলো, তাঁর স্বচ্ছন্দচারী দৃষ্টি নিজ ভীরু-হৃদয়ের অন্বেষণে আনতা হলো এবং তিনি আনমনে অবশ করে সন্নিবেশিত লীলাকমলের (৭) পাপড়ি-গণনায় নিমগ্না হ'লেন।

১। Ben Lindsey—Revolt of Modern Youth. ২। ভাগবত—১০, ২৯, ১২ পরীক্ষিত বল্‌চেন। ৩। G. R. Browning :—Love way Infinite passion and the pain of finite hearts that yearn. ৪। ভাগবত—১০, ৩৩, ৩০—শুকদেব বল্‌ছেন। ৫। দৃষ্টান্ত—কুমারসম্ভব—১, ৩১—৪০; ৩, ৫৪—৫৫; রঘুবংশ—৬, ৩৬ ও ৮৩। ৬। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩, ১২, ১১। ৭। 'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী'—কুমারসম্ভবম্। "উপাসনা"

আসিবেনা আর

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

চলিয়া গিয়াছে সেতো আসিবেনা আর
বিনিময়ে রেখে গেছে শুধু হাহাকার,
তাহার বিয়োগ ব্যথা
নয়নের অশ্রু গাথা,
হৃদয়ের হৃদয়েতে চির সিক্ততার।
সে সুন্দর মুখ ছবি,
তরুণ প্রভাত রবি
সুকুমার কচিমুখ ভোলা নাহি যায়;
সোণার বরণ তার
প্রতি অঙ্গ সুষমার,
কমণীয় দেহ কান্তি নগন শোভায়;
রূপের তরঙ্গ তুলে,
উঠে পড়ে' দুলে দুলে,
হাঁটি হাঁটি পা, পা, আনন্দ লীলায়।
পরিজন হাস্য ভরে,
দাঁড়াইয়া থরে থরে
নিরখিত মুগ্ধ নেত্রে সে ছবি তোমার,
প্রথমে শ্রীমুখে যবে,
কাকলী ফুটিল সবে,
সেই আধ আধ বাণী গীত অমরার;
তরলিত সে সঙ্গীতে,
হিল্লোল বহিত চিতে,
নব আশা নব সাধ উপজিত তায়,
শিশুর পবিত্র মুখে,
'মা' 'মা' রব শুনি সুখে,
নবীন ব্রহ্মাণ্ড যেন সৃজন ধরায়॥

অকস্মাৎ এক নিশি
প্রলয়ে ছাইল দিশি
তুলি দিয়া চারিদিকে ক্রন্দনের রব,
কি গভীর বেদনায়,
হৃদি মরুভূমি প্রায়,
ধূ ধূ বালুকার মত চলে গেছে সব ;
একটি বরষ স্মৃতি
আসিত স্মরণে নিতি,
ঝরিয়া পড়িছে অশ্রু নীরব ধারায়।
বিশ্বে প্রকাশিতে আর,
সেদিনের সমাচার,
বলিবার নাহি ভাষা, বলিব কাহায় ?
অসময়ে 'চারুচন্দ্র' অস্তমিত হায় !
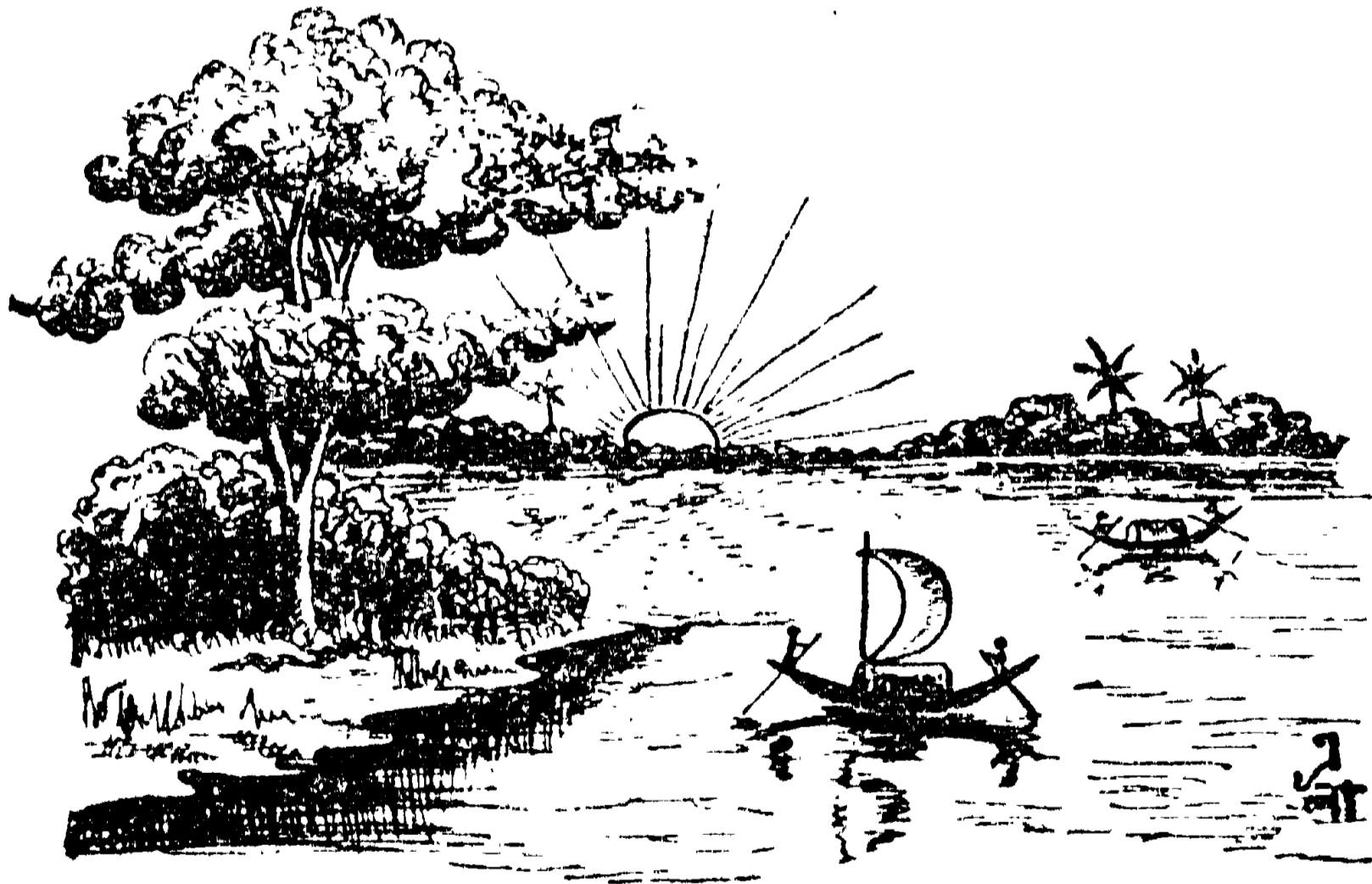
উপেক্ষিতা

শ্রীপুষ্পলতা দে

(১)

"অশ্রু!"

"যাই—" বলিয়া একটী বালিকা ত্রস্তে বাহির হইয়া আসিল।

"ছিপটা কই নিলি রে? আজ মাছ ধর্‌তে যাবি না নাকি?

অশ্রু ভয়ে ভয়ে কহিল—"কাল বাড়ী ফির্‌তে দেরী হয়েছিল বলে মা বড় বকেছিল।"

কুমার জানিত অশ্রু তাহার সহিত মাছ ধরিতে যাইবার লোভ ত্যাগ করিতে পারিবে না, তাই কৃত্রিম ঔদাস্যের সহিত কহিল—'তবে আর কি হবে? মনে করেছিলাম দুজনে...বেশ একলাই যাই।'

কুমার চলিয়া যায় দেখিয়া অশ্রু ব্যাকুল হইয়া কহিল—'একটু দাঁড়াও কুমারদা, আমি দেখে আসি মা কি কচ্ছেন! এতক্ষণে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন; পালিও না তুমি'—বলিয়া অশ্রু চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরেই অশ্রু ছিপহস্তে বাহির হইয়া আসিল। উচ্ছ্বসিত হাসি সামলাইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—'মা ভয়ানক ঘুমুচ্ছেন কুমারদা! কি রকম নাক ডাক্‌ছে জান? হিঃ হিঃ, মা কিচ্ছু জান্‌তে পার্‌বে না হিঃ হিঃ।' অশ্রু হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িল।

তারপর তাহারা গাঁয়ের কাঁটাবন ছাড়াইয়া, বাঁশবন পিছনে ফেলিয়া, পুরাণো কালের রায়দীঘির ভাঙ্গা ঘাটের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল।

দু'জনে পাশাপাশি ছিপহস্তে মাছ ধরিতে বসিল।

কিছুক্ষণ পরে কুমার হটাৎ প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা বাঁদরী, আমি যখন বড় হয়ে সহরে পড়তে যাব তখন তুই কি কর্‌বি? আমার জন্যে মন কেমন করবে তোর?"

অশ্রু তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে বলিল—"হ্যাঁ-ভয়ানক মন কেমন করবে কুমারদা। তুমি যেও না।"

'যেতে ত আমার ইচ্ছে নেই, কিন্তু না গেলে পড়ব কেমন ক'রে? কলেজে পড়লে কত বিদ্যে হয়:জানিস্:? ওই আমাদের নরেনদা' ত কলেজে পড়ে দেখেছিস্ কত বুদ্ধি! সকলে ওকে কত ভয় করে। আমাকেও কর্‌বে!'

'না কুমারদা-তাহলে তোমার কাছে আমি যাব না। নরেনদাকে আমার ভাল লাগে না—

'তোর জন্যে আমি অনেক জিনিষ আনব, অশ্রু।'

'না কুমারদা তুমি যেও না। তুমিও তাহলে নরেনদা'র মত হ'য়ে যাবে।' নরেনদার প্রতি অশ্রু অত্যন্ত বিমুখ ছিল, তাহার ধারণা কলেজে পড়িলে সকলেই নরেনদার মত রাগী এবং গম্ভীর হয় এবং ছোটদের মারে।

'তুমি যেও না কুমারদা, তাহলে আমাকে মার্‌বে।'

কুমার দেখিল অশ্রুর চোখদুটা যেন ছলছল করিতেছে, তাহার বালকচিত্তেও কেমন একটা ধাক্কা লাগিল। হটাৎ অশ্রুর হাতটা ধরিয়া সে বলিল—'না অশ্রু, তোকে কি আমি মারতে পারি? কিন্তু তুইও আমার সঙ্গে যাবি কিনা বল্‌? একলা যেতে আমারও মন কেমন কর্‌বে।'

মুহূর্ত্ত মধ্যে অশ্রু লাফাইয়া উঠিল—"আমিও তোমার সঙ্গে যাব কুমা—" বলিতে তাহার দৃষ্টি পড়িল কুমারের 'ফাৎনার' উপর। সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কুমারদা চো-প্‌"।

আর বলিতে হইল না কুমার ক্রোধে অন্ধ হইয়া চীৎকার করিল—"পোড়ারমুখি! দেখ ত কি করলি? অমন ষাঁড়ের মত চেঁচালি ব'লেই ত মাছ পালাল। হাস্‌ছিস্‌ রাক্ষুসী? দাঁড়া তোর হাসা আমি বার কচ্ছি"—বলিয়া কুমার ছিপটা 'সপাৎ' করিয়া সজোরে 'রাক্ষুসী'র পৃষ্ঠে বসাইয়া দিল।

অশ্রুর লাগিয়াছিল খুবই, কিন্তু নিজের মান রক্ষা করিতে সে গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতিদিনই তাহাদের এইরূপ মারামারি হইত, কিন্তু সন্ধি হইতেও বেশীক্ষণ লাগিত না।

একটী শিশুকন্যা লইয়া যখন চারুশীলা বিধবা হন, তখন হইতেই কুমারের জননীর সহিত তাঁহার সখ্যতা হয়, সে প্রীতিবন্ধন এখনও সেইরূপ অটুট রহিয়াছে।

দুঃখ এবং অশ্রুর মধ্যে কন্যাকে পাইয়াছিলেন বলিয়া চারুশীলা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—"অশ্রুকণা।"

ছোট হইতেই কুমার ও অশ্রু খেলার সাথী। তাহাদের আরও সাথী ছিল বটে, কিন্তু তাহারা দুজনে দুজনকে একটু বেশী পছন্দ করিত। এজন্য দলের সকলের নিকট ঈর্ষা বিদ্রূপও সহ্য করিতে হইত।

(২)

তিন বৎসর পর। অশ্রু এখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা। সে আর এখন চঞ্চলা, চপলা, ক্রীড়ারতা নাই, বরং একটু অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। চিন্তাশীলা, সংযতবাক্‌, নতমুখী কিশোরী।

সে গৌরাঙ্গী নয়, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। সর্ব্বাঙ্গে একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা, বর্ষণসিক্ত দুর্ব্বাদলের ন্যায় মনোরম। বড় সুন্দর তাহার বড় বড় কালো চোখ দুটী। সে আয়ত চক্ষের দৃষ্টি বড় সরল, বড় মধুর।

অশ্রু জল আনিতে ঘড়া লইয়া ঘাটে চলিয়াছে। রায়দীঘির এ ঘাটটা প্রায় নির্জ্জন, সেজন্য অশ্রু এখানেই আসে। সে জলে পা ডুবাইয়া বসিয়া রহিল। আজ তাহার মনটা বড় বিষণ্ণ। দুদিন হইল, সে কুমারের দেখা পায় নাই। কিন্তু কেন? দেখা না পাইলে মন খারাপ হইয়া যায় কেন? কই কুমার ত তাহার জন্য ব্যগ্র নহে, তবে সেই বা কেন তাহার জন্য ভাবিয়া মরে? না-সে আর ভাবিবে না, কুমার ত তাহার কেহ নয়। তবে কেন? কিন্তু কুমার তাহার কেহ নহে, এ কথা মনে করিলেও যে ব্যথা লাগে।

কখন যে সন্ধ্যারাণীর ধূসর অঞ্চলচ্ছায়ে সমস্ত আবছা হইয়া গিয়াছে, অশ্রু তাহা জানিতেও পারে নাই। বিমনা অশ্রু দেখিতে পাইল না, জলে মানুষের ছায়া পড়িল এবং পরক্ষণেই কে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিল।

অশ্রু চম্‌কিয়া উঠিল—"কে?" কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্পর্শে বুঝিতে পারিয়া বলিল—"চোখ ছাড় লাগ্‌ছে।"

কুমার চোখ ছাড়িয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল—"অন্ধকারে ঘাটে একলা কি করছিলে অশ্রু?" অশ্রু কথা কহিল না, নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

"অশ্রু!" তথাপি অশ্রু কথা কহিল না। কুমার জানিত অশ্রু স্বভাবতঃই কম কথা বলে এবং অভিমান হইলে সে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া যায়।

"ও কাণি?" অশ্রুকে রাগাইতে হইলে কুমার ঐ নামে ডাকিত। এবারও উত্তর না পাইয়া কুমার অশ্রুর হাত ধরিয়া সস্নেহে কহিল—"রাগ হয়েছে কণা?"

অশ্রু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"রাগ আর করব কার ওপর?"

"ওঃ বুঝেছি অভিমান হয়েছে দুদিন আসিনি বলে! সত্যি বলছি ভাই, একটুও সময় পাইনি। ভাল কথা, আমি ফাষ্ট ডিভিসনে পাশ করেছি যে।"

অন্ধকারে অশ্রুর মুখ দেখা গেল না, তাহা না হইলে কুমার দেখিতে পাইত যে-মুখখানি এতক্ষণ অভিমানে অন্ধকার ছিল, তাহাই এখন আনন্দে গর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অশ্রু নিঃশব্দে কুমারের হাতের উপর একটু চাপ দিল। পাশ করিয়াছে বলিয়া কুমার অনেকের নিকটেই কলকণ্ঠে সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছে, কিন্তু এই স্নেহময়ী বালিকার নির্ব্বাক অভিনন্দনে সে অধিক আন্তরিকতার পরিচয় পাইল।

'অশ্রু, আমার উপর রাগ করো না, কথা বলো। আর ক'দিনই বা আছি?'

অশ্রুর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সে শঙ্কিত হইয়া কহিল—'কেন কোথায় যাবে?'

'পাশ করেছি, এবার কলেজে পড়্‌তে হবে না?'

'যেতেই হবে?'

'কণা, তুমি কি চাও আমি মুখ্যু হয়ে থাকি ?'

'ছিঃ ছিঃ—ওকি কথা কুমারদা ? তুমি বিদ্বান হলে, বড় হলে আমার কত আনন্দ বল ত ? কিন্তু তুমি নরেনদা'র মত হয়ো না।'

কুমার এইবার বুঝিল, অশ্রুর ব্যথা কোথায়। সে হাসিয়া অশ্রুর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—'না কণা, তোর ভয় নেই। আমি নরেনদা'র মত হবো না।'

কখন অজ্ঞাতসারে অশ্রুর মাথাটা কুমারের কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই।

কুমারের কলিকাতা যাত্রা স্থির হইয়া গিয়াছে। সে অশ্রুর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছে।

'তবে সত্যিই যাচ্ছ ?' বলিয়া অশ্রু ব্যাকুলচক্ষে কুমারের পানে চাহিল।

কুমার কিছু বলিতে পারিল না, ব্যথিতনেত্রে কেবল চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ কেহ কিছু বলিতে পারিল না, নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। সেই ক্রীড়াচঞ্চল, লঘুচিত্ত কুমারও এখন একটু গম্ভীর হইয়াছে।

'অশ্রু, আমায় ভুলে যাবে না ত ?' বলিয়া কুমার অশ্রুর হাতটা ধরিল।

অশ্রু কিছু বলিতে পারিল না, কেবল তাহার বড় বড় চোখদুটী হইতে জল পড়িতে লাগিল।

'ছিঃ কণা, কেঁদ না, আমি তোমায় দুঃখ দেবার জন্যে এ কথা বলিনি।'

অশ্রু অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে চুপি চুপি বলিল—'আবার কবে আস্‌বে ?'

'গরমের ছুটীতে।'

'সে ত অ-নে-ক দিন।'

কুমার একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—'কণা, তুমি এ রকম কর্‌লে আমি যাই কি ক'রে বল ত ? তুমি এখন বড় হয়েছ ; কেঁদ না লক্ষ্মীটি !'

অশ্রু ঘাড় নাড়িয়া তাহার মৌন সম্মতি জানাইল।

'তবে যাই ?' অশ্রু তাহার বড় বড় চোখদুটী তুলিয়া কুমারের পানে চাহিল। কুমার সে ম্লান ছবি দেখিয়া বড় ব্যথা পাইল ; সরিয়া আসিয়া তাহার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া বলিল—'পাগ্‌লি !'

কুমার চলিয়া গেলে অশ্রু লুকাইয়া বড় কান্না কাঁদিল।

(৩)

সেদিন অশ্রু কোথায় যাইতেছিল, হঠাৎ আঁচলে টান পড়িতেই পিছনে চাহিয়া দেখিল—নরেন্দ্র।

'কোথা যাচ্ছিলে অশ্রু ?'

অশ্রু একেই নরেন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাহার উপর আজিকার অভদ্র ব্যবহারে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। সে নরেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর দিল না।

'চল না অশ্রু একটু গল্প করি'—বলিয়া নরেন্দ্র অশ্রুর হাতটা ধরিবার উপক্রম করিতেই, অশ্রু পিছাইয়া গিয়া তীব্র কটুকণ্ঠে কহিল—"খবরদার, আমার গায়ে হাত দিও না।'

'কেন কুমারের সঙ্গে ত দিব্যি—'

অশ্রু আরক্ত মুখে বলিল—'এখুনি এখান থেকে চলে যাও।' বলিয়া নিজেই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

ইহার দুদিন পরে ঘাটে যাইবার পথে, হঠাৎ কে আসিয়া পিছন হইতে অশ্রুকে জড়াইয়া ধরিল।

অশ্রু সক্রোধে নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে লইতে, ভীষণ একটা কিছু বলিবার উদ্দেশে মুখ ফিরাইতে সবিস্ময়ে দেখিল—সহাস্যমুখ কুমার!

অশ্রু কুমারের এই অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারে বিস্মিতা হইলেও আশ্বস্তা হইয়া বলিল—'তুমি? কি ভয়ই দেখিয়েছিলে কুমারদা।'

'তুমি কি মনে করেছিলে, কে একটা ছোঁড়া—'

অশ্রু লজ্জায় রাঙা হইয়া অস্ফুটে কহিল—'যাওঃ—'

'এই যাই—' বলিয়া কুমার ফিরিতেই, অশ্রু বিস্মিতকণ্ঠে কহিল—'এখনি চলে যাচ্ছ? এই ত এলে।'

'কি করি তুমি যেতে বল্লে!'

অশ্রু এইবার হাসিয়া ফেলিল।—'ওঃ তাই। কিন্তু এত বাধ্য কবে থেকে হলে কুমারদা?'

'কবে থেকে? অত হিসেব করে বল্‌তে পারব না ত! চল্, আমাদের সেই পুরানো জায়গায় গিয়ে বসি।'

অশ্রু হাসিমুখে বলিল—'চল।'

কুমার অশ্রুর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—'রোগা হয়ে গেছ কেন কণা?'

'কি জানি?'

'আমার জন্যে মন কেমন করত?

অন্য সময় হইলে অশ্রু বলিত—'হ্যাঁ।' কিন্তু আজ আর লজ্জায় সে কথা বলিতে পারিল না। ঘুরাইয়া বলিল—'তোমার করত?'

সাদরে অশ্রুর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কুমার বলিল—'করত না? সব সময় মনে হ'ত কখন তোমার কাছে আস্‌ব! সত্যি কণা, তোকে ছেড়ে যেতে একটুও ইচ্ছে হয় না।'

অশ্রু একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

কুমার অনুযোগের স্বরে বলিল—'হ্যাঁরে বাদ্‌রী! তুই এত গম্ভীর হয়ে পড়েছিস্‌ কেন বল্‌ত? যেন কত বুড়ী! আমার চেয়েও যেন বড় হয়ে গেছিস্‌? কি ভাবিস্‌ এত?'

'আমার বড় ভয় হয়, তুমি যদি আমায় ভুলে যাও!'

'কেন?'

'তোমার বিশ্বাস হয় আমি তোমায় ভুল্‌তে পারি?'

'না।'

'তবে? কিন্তু আমি জিজ্ঞেস্‌ কচ্ছি, আমি যদি তোমায় ভুলেই যাই, তাতে তোমার ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি?' অশ্রু নিজেও ভাবিয়া পাইল না কি ক্ষতি—তবু·········

(৪)

আরও তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কুমার ইহার মধ্যে দু'একবার দেশে আসিলেও অশ্রুর সহিত একবারের বেশী দেখা হয় নাই। বোধ হয় দেখা করিবার আর তেমন আবশ্যক নাই। তাহাদের কলেজের ছাত্রী উজ্জ্বলার উজ্জ্বলরূপই এখন তাহার ধ্যানের বস্তু।

সেদিন কলেজের পর উজ্জ্বলা বাড়ী ফিরিতেছিল, এমন সময় কুমার আসিয়া বলিল—'মিস্‌ ঘোষ, কাল বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

'কেন?'

'আমি কাল বাড়ী যাচ্ছি।'

'কালই?'

'হঁ্যা।'

'তাহলে আসুন না আমার গাড়ীতে।'

'না, না, সে কি?'

'সে কিছু নয়, আসুন আপনি।'

কুমার সঙ্কুচিত ভাবে গাড়ীতে উঠিলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

"কুমারবাবু, হঠাৎ কাল বাড়ী যাচ্ছেন যে?"

"মা-বাবা আর সেখানে থাক্‌বেন না, সেইজন্য তাঁদের আন্‌তে যাচ্ছি।"

"কদিন পরে ফির্‌বেন?" বলিয়া উজ্জ্বলা কুমারের একটু নিকটে সরিয়া গেল।

"দু'তিনদিন পরেই ফির্‌ব।" গাড়ীর ঝাঁকানিতে উজ্জ্বলার অঙ্গ তাহার অঙ্গে ঠেকিতেই কুমারের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

"বেশী দেরী কর্‌বেন না যেন কুমারবাবু।"

আনন্দে কুমারের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। তথাপি সে অজ্ঞতার ভান করিয়া বলিল—"কেন, তাতে আপনার কি ?"

"আমার কি ?" বলিয়া উজ্জ্বলা মধুর অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করিল। হটাৎ কুমারের সব গোলমাল হইয়া গেল। সে খপ্ করিয়া উজ্জ্বলার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া ডাকিল—'উজ্জ্বলা !'

আর একটা অব্যর্থ কটাক্ষ করিয়া উজ্জ্বলা বলিল—'কি বলছ ?'

'না কিছু না, এই যে আমার মেসের সামনে এসে পড়েছি, ড্রাইভার থামাও—'নমস্কার' বলিয়া একটা বাড়ীকে মেস কল্পনা করিয়া লইয়া কুমার দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এদিকে অশ্রু বড় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া চারুশীলা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। কালো মেয়েকে কেহই লইতে চাহে না। অর্থও নাই কন্যার শুভ্রবর্ণও নাই। চারুশীলা উদ্বেগে আশঙ্কায় আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু অশ্রু বিবাহের কথা উঠিলেই মায়ের পায়ে পড়িয়া কাঁদে—'দোহাই মা, আমার বিয়ে দিও না।'

কুমারের জননী সখীর উদ্বেগ আশঙ্কা দেখিয়া অশ্রুকে লইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কুমারের পিতাও অশ্রুকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। পুকুরধার দিয়া কুমার বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, হটাৎ কানে গেল অদূরে কে ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। সে সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু পুনরায় সেই কাতর ক্রন্দন কানে যাইতেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। স্বর লক্ষ্য করিয়া নিকটে যাইতে দেখিল শরবিদ্ধ পশুর ন্যায় একটী তরুণী অবক্ত্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। একটু পরেই কানে গেল—'সে আমায় ভুলেছে জানি, কিন্তু আমি ত মরে গেলেও ভুল্‌তে পারব না।'

কুমারের মুখের উপর কে যেন অতর্কিতে কশাঘাত করিল, তার সমস্ত মুখখানা বেদনায় বিবর্ণ বিকৃত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিকটে গিয়া ভগ্নকণ্ঠে ডাকিল 'অশ্রু !'

অশ্রু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া পড়িয়া পরক্ষণেই উপুড় হইয়া পড়িল।

অশ্রুর পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া কুমার ডাকিল—'কণা !'

একের প্রেমে যেখানে কপটতা নাই, অন্যের প্রেমে সেখানে এতটুকু অপূর্ণতা থাকিলে তা ধরা পড়িয়া যায়।

'আমায় ক্ষমা কর অশ্রু !'

অব্যক্ত বেদনায় অশ্রুর শরীরটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

কুমার অশ্রুকে জোর করিয়া উঠাইয়া বসাইয়া তাহার দুইহাত ধরিয়া বলিল—'কি ব'ল্লে—তোমায় আমি ভুলে গেছি কণা ?'

অশ্রু এ কথার কি উত্তর দিবে? আজ দীর্ঘ তিন বৎসর কুমার কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের প্রতি পলে পলে যে কুমারের অবহেলা তাহার অন্তরকে দলিত মথিত করিয়া তুলিয়াছে। যে সুন্দর তরুমূলে সে একদিন তার প্রাণের সমস্ত ভালবাসা নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল আজ তারই প্রতিটী শুষ্ক শাখা যে অশ্রুর সকল ভালবাসাকে উপেক্ষা করিতেছে।

কিছুক্ষণ পর অশ্রু শান্ত হইয়া বলিল—'কবে এসেছ?'

'পরশু।'

'জ্যাঠামশায়দের কবে নিয়ে যাবে?'

'কাল।'

বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পর অশ্রু একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে বলিল—'এই বোধ হয় আমাদের শেষ দেখা?'

'না না আমি আবার আস্‌ব, তোমায় আমি—'

"না এলেও আমার অভিযোগ কর্‌বার অধিকার ত নেই।"

'কে বল্লে নেই অশ্রু? তুমি যে আমার মাথার মণি—' কুমার অশ্রুকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। অশ্রু কুমারের বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলনা নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

হঠাৎ কুমারের কি মনে হইল সে ধীরে ধীরে নত হইয়া অশ্রুর অশ্রুসিক্ত ওষ্ঠাধরের উপর নিজ কম্পিত ওষ্ঠাধর রাখিল।

জীবনে এই প্রথম স্পর্শ অশ্রু শিহরিয়া উঠিল।

(৫)

কুমার সম্প্রতি ডাক্তারী পাশ করিয়াছে। উজ্জ্বলা এখনও পড়িতেছে। তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বন্ধুমহলে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিতেছে, এমন কি অনেকে কুমারকে ঈর্ষা করে।

লেকের ধারে বেঞ্চের উপর বসিয়া একটী তরুণ জলের পানে চাহিয়া ছিল—আজ তাহার হৃদয়ে দ্বন্দ্বের ঝড় বহিতেছে। সে দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল।

এই সময় সেখানে একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। একটী তরুণী গাড়ী হইতে নামিয়া সেই বেঞ্চের কাছে আসিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া, পরক্ষণেই নত হইয়া মধুরকণ্ঠে ডাকিল—"কুমার!"

কুমার চমকিয়া মুখ তুলিয়া বলিল—'উজ্জ্বলা, কখন এলে?

"এইমাত্র; তুমি অন্যমনস্ক ছিলে তাই জানতে পারনি।" তারপর কুমারের পার্শ্বে বসিয়া তাহার হাতের উপর নিজের হাত রাখিয়া বলিল—"তোমার কি হ'য়েছে?"

"কই কিছু তো হয়নি! আচ্ছা উজ্জ্বলা—"

'কি?'

'তুমি আমায় সত্যি ভালবাস, না মাত্র—'

মধুর কটাক্ষে কুমারকে বিহ্বল করিয়া উজ্জ্বলা বলিল—'তা' কি আজও জান না কুমার?'

'আমায় পেলে তুমি সত্যি সুখী হ'তে পারবে কি? তুমি ধনীকন্যা আমি গরীব—'

'আঃ, কি যে বকো—' বলিয়া উজ্জ্বলা কুমারের কণ্ঠবেষ্টন করিল।

* * * *

বাসর ঘরে উজ্জ্বলা গান গাহিতেছিল। হটাৎ কুমারের কাণে গেল—'চারুর মেয়ের বিয়ে ত এক জায়গায় ঠিক ছিল হঠাৎ ছেলের মত ঘুরে গেল, সে অন্য জায়গায় বিয়ে কর্‌লে। চারু এতে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। অন্য জায়গায় সম্বন্ধও হয়েছিল, কিন্তু মেয়েও আর কিছুতেই বিয়ে কর্‌লে না। চারু ত আর বেশীদিন বাঁচবে না তারপর মেয়েটার কি দশা হ'বে? আহা, মেয়েটা বড় ভাল।"

কিসের তীব্র সন্দেহে কুমার বেদনায় নীলবর্ণ হইয়া গেল। থাকিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল—'মেয়েটির নাম কি?'

'অত মনে নেই বাপু, বোধহয় অশ্রু।'

কুমারের চোখের সম্মুখে উৎসবের সমস্ত আলো যেন এক মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল। চোখের সুমুখে ভাসিতে লাগিল কেবল একখানি বড় করুণ মুখের ছবি!

উজ্জ্বলাকে লইয়া কুমার কিন্তু কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছিল না। যে প্রেম একদিন সে আকাশের পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে, আজ মাটীর ঘরে সে যে এতটুকু চলিতে পারে না। উজ্জ্বলাকে সে যতই নিকটে পাইতেছিল ততই অশ্রুর সহিত তাহার প্রভেদ কতখানি তাহা বুঝিতেছিল। উজ্জ্বলার বাক্যে ব্যবহারে সব কিছুর মধ্যেই যেন কোথাকার অপূর্ণতা আসিয়া জমা হইতেছিল। প্রতিপদে সে যেন অশ্রুর অভাব অনুভব করিতেছিল।

উজ্জ্বলাও এখানে থাকিতে চাহিত না, অধিকাংশ সময়েই সে পিত্রালয়ে থাকিত। শ্বশুর শাশুড়ীকে ও সে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। এই সব দেখিয়া কুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিত—এ কি করিলাম? কি করিতে কি হইল? যাহাকে আমি স্বেচ্ছায় কণ্ঠমালা করিয়াছিলাম সেই এখন ফাঁসির রজ্জু হইয়া আমার নিঃশ্বাস রোধ করিতেছে। কেন পিতা জোর করিয়া অশ্রুর সহিত বিবাহ দেন নাই? সত্যই অশ্রুর শান্ত, সংযত, মধুর চরিত্রের সহিত কি উজ্জ্বলার চপল, উচ্ছৃঙ্খল, লঘুচরিত্রের তুলনা হইতে পারে?

উজ্জ্বলার তীব্ররূপ চোখে লাগে, মোহ আনে, কিন্তু অশ্রুর স্নিগ্ধরূপ হৃদয়ের মাঝে দাগ কাটিয়া বসিয়া যায়।

উজ্জ্বলা আকাশ-প্রদীপ শুধু ক্ষনিকের মোহ আনে, কিন্তু অশ্রু তার তুলসী তলার মাটীর প্রদীপ, ঘরে আনিলে চারিদিক আলো করিয়া তুলে।

কুমারের মুখের সে চিরপ্রফুল্ল হাসিটীও যেন শুকাইয়া গিয়াছে।

উজ্জ্বলা কি একটা পড়িতেছিল, কুমার ডাকিল—'উজলি।'

পড়িতে পড়িতেই উজ্জ্বলা উত্তর দিল—'কি ?' 'একটা কথা আছে শোন।'

বিরক্ত হইয়া উজ্জ্বলা বলিল—'একটা কথা ত চিরকালই শুনছি। কি তোমার কথা ?'

কুমারের মুখখানা মলিন হইয়া গেল বলিল—'মার বয়স ত হচ্ছে, তাঁকে সংসারের কাজে সাহায্য কর না কেন ? এটা তোমার কর্ত্তব্য উজ্জ্বলা। আর কোন কাজ নাই বা করলে, তাঁর কাছে কাছে থাক্‌লেও তিনি কত খুসী হন।

"কোন জন্মে ও সব কাজ করা আমার অভ্যাস নেই সে আমি পারব না। আমার মা আমায় কখন ও সব কাজ কর্‌তে দিতেন না। আমিত ঝি নই যে—"

অত্যন্ত ব্যথাভরা ম্লান হাসি হাসিয়া কুমার বলিল 'তোমাকে এ কথা বলা আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি ভুল বুঝেছিলাম, যাক্‌ গে কাল আমি ডাঃ রায়ের সঙ্গে 'টুরে' এ যাচ্ছি।'

'তোমার যাওয়া আসার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ?' "আমি মনে করতুম সম্বন্ধ আছে। তা তুমিই যখন নিজে সে অধিকারের দাবী ছেড়ে দিচ্ছ তখন আমারও আপত্তি নেই। সে কথা থাক্‌, তুমি এখানে থাকবে ত ?"

"আমি এখানে থাকব ?' এমন ভাবে উজ্জ্বলা কথাগুলি বলিল—যেন মনে হইল কুমারের অনুপস্থিতিতে তাহার এখানে বাস করা একেবারে অসম্ভব।

'কেন থাক্‌তে পার না ?'

'মাগো, এখানে মানুষে থাকে ? এখানে কেবল ঘোম্‌টা দিয়ে ঝি চাকরের কাজ কর্‌তে হয়। আগে কি জান্‌তাম এমন বাড়ীতে আমায়—'

'তা'হলে কি করতে উজ্জ্বলা ? কিন্তু আমিত তোমায় জোর করে এখানে আনিনি ? তুমি, সমস্ত জেনে স্বেচ্ছায় এসেছ উজ্জ্বলা। আমি এত বড় স্বার্থপর নই, যে কারু-র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার'।

"আচ্ছা গো আচ্ছা, তুমি খুব সাধু পুরুষ—কিন্তু আমি বাবার কাছে চলে যাব। সেখানে মিঃ সেন, অঞ্জনা সকলে আসে; সত্যি ওরা কি সুখী, আমি কেবল—'

'তুমি সুখী হওনি উজ্জ্বলা ?'

'খেতে আর শুতে পেলেই বুঝি মানুষ সুখী হয় ? কোন একটা amusement নেই, একদিন সিনেমাএ পর্য্যন্ত নিয়ে যাওনি।'

"কেন তুমি কি সিনেমা দেখ্‌তে পাও না ?

'পাব না কেন? ওখানে গেলে মিঃ বোসের সঙ্গে কি মিঃ সেনের সঙ্গে ত প্রায়ই দেখতে যাই। মিঃ সেন আমায়—

কুমার বাধা দিয়া বলিল—"থাম উজ্জ্বলা, এত রাত্রে মিঃ সেনের গুণগান আরম্ভ করলে আর যাই হোক, আমার সুনিদ্রা হবে না। তা' তুমি তোমার বাবার কাছেই যেও, মিঃ সেন আছেন সেখানে। আর আমার কথা—আমার ফেরবার কোন ঠিক নেই।'

"সেই ভেবে ভেবে আমার ত ঘুম হচ্ছে না।"

কুমারের মুখের উপর মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে নীরবে ছাতে চলিয়া গেল।

আকাশের তারার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আজ হটাৎ তাহার আর একজনের ব্যথিত ম্লান দুটী চোখ মনে পড়িয়া গেল—সে মুখখানি মনে পড়িতেই তাহার চোখদুটা জ্বালা করিয়া উঠিল।

অশ্রু, তুমি আজ কোথায়? কুমার দুইহাতে বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে কুমার উজ্জ্বলার সহিত দেখা না করিয়াই চলিয়া গেল। ইহাতে উজ্জ্বলার গর্ব্বোদ্ধত চিত্ত আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই মিঃ সেনের কথা মনে পড়াতে মনটা কোমল হইয়া গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যায় 'সিনেমা হাউসে' একটী বক্সে বসিয়া মিঃ সেন উজ্জ্বলার হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিলেন—'উজ্‌লী আমার!'

(৬)

ডাঃ রায় তাঁহার প্রিয় ছাত্র ডাঃ মিত্রের সহিত গ্রাম্য হাঁসপাতাল পরিদর্শনে আসিয়াছেন। ডাঃ রায় গম্ভীর মুখে সব করিয়া যাইতেছেন কিন্তু মিত্র অল্পবয়স্ক যুবক, রোগী দেখিতে দেখিতে তাহার ম্লান মুখ খানি আরও বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এই সময়ে একজন ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—'স্যার, 'female word' এ একটী রোগীর অবস্থা বড় খারাপ। যদি দয়া করে—'

'চলুন'—বলিয়া ডাক্তার রায় অগ্রসর হইলেন।

রোগিণী তীব্র যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। ডাঃ রায় তাহাকে সযত্নে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলে রোগিণীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া ডাঃ মিত্র তাহাকে দেখিতে পান নাই। তিনি অগ্রসর হইয়া ডাঃ রায়ের পিছনে গিয়া দাঁড়াইতেই অকস্মাৎ যেন ভূত দেখিয়া পিছাইয়া গেলেন। তাহার মুখখানা একেবারে নীলবর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত শরীরটা একেবারে পাথরের মত শক্ত নড়িবারও যেন শক্তি নাই।

"একি ডাঃ মিত্র, আপনার কি হ'য়েছে?"

"কিছুতো নয়—" বলিয়া ডাঃ মিত্র জোর করিয়া মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া রোগিণীর নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। ডাঃ রায় একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছাত্রের পানে চাহিয়া সহজকণ্ঠে কহিলেন—"কুমার, ইনি কি তোমার পরিচিতা ?"

কুমার আনতমুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল—'হ্যাঁ স্যার।' আমি এখুনি একে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই।"

"বেশ। কিন্তু ইনি তোমার কে তা' জান্‌লে এঁরা"—কুমারের মুখে মুহূর্ত্তের জন্য একটা ছায়া ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল সে স্পষ্টস্বরে বলিল—"অন্য পরিচয়ের দরকার নেই—আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যাব এতে কারো আপত্তি থাক্‌তে পারে না।"

কুমার সেইদিনই রোগিণীকে মেডিকেল কলেজের কটেজ ওয়ার্ডে লইয়া আসিল।

* * * * *

রোগিণী চোখ মেলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"আমি কোথায় ?"

নার্শ বলিল—"আপনি কলকাতায়।"

রোগিণী ততোধিক বিস্মিতা হইয়া কহিল—"কে আমায় আন্‌লে ?"

"আপনার স্বামী, ডাঃ কুমার মিত্র।"

অশ্রু সর্পাহতের ন্যায় শিহরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

কুমারের ইঙ্গিতে নার্শ উঠিয়া যাইতে, সে ধীরে ধীরে অশ্রুর পার্শ্বে বসিয়া স্নেহ-কোমলকণ্ঠে ডাকিল—"অশ্রু!"

অশ্রু চোখ মেলিয়া বিহ্বলচক্ষে চাহিয়া রহিল।

সস্নেহে অশ্রুর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কুমার বলিল—"চিন্‌তে পারছ না আমায় ?"

অশ্রু এইবার হাসিল। সে হাসিতে প্রকাশ পাইল—তোমায় চিনিব না ?

"তুমি আমায় এখানে এনেছ ?"

"হ্যাঁ, শুধু এখানেই আনিনি, আমার কাছে ফিরিয়ে এনেছি। একবার তোমায় হারিয়ে আমার যা' ক্ষতি হয়ে গেছে আবার তোমায় হারিয়ে আমি সে ক্ষতি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

অশ্রু বড় মধুর হাসিয়া বলিল 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌তাম—যেন শেষ সময়ে তোমার দেখা পাই। আমার সে সাধ পূর্ণ হয়েছে, আর আমার কোন দুঃখ নেই।"

"ও কথা ব'লো না অশ্রু, তুমি ভাল হয়ে উঠ্‌বে, আবার আমার ঘরে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা কর্‌ব, তুমি আমার বুকখানা চিরদিনের জন্যে ভেঙ্গে দিয়ে যেও না কণা।"

"কি কর্‌ব উপায় নেই। আমায় স্ত্রী বলে স্বীকার করেছ এই আমার আশাতীত সৌভাগ্য, এর বেশী লোভ কর্‌ব না।"

"লোভ নয় অশ্রু এতো তোমার অধিকার। তুমি আমার লক্ষ্মী, তোমায় অবহেলা করে-ছিলাম বলেই আমার এই দশা, আমি আজ লক্ষ্মীছাড়া।"

অশ্রু শ্রান্ত হইয়া চোখ বুঁজিল। কুমার অশ্রুর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল—সে অশ্রুর প্রতি যেরূপ হৃদয়হীন ব্যবহার করিয়াছিল, সেজন্য অশ্রু ত তাহার উপর তেমন অভিমান করে নাই। সে মুখে অভিযোগ, অনুযোগ বা তিরস্কারের চিহ্নও নাই, বরং তাহারই জন্য এখনও কি পবিত্র বুকভরা ভালবাসা! চোখের দৃষ্টি এখনও তেমনি প্রেমস্নিগ্ধ তেমনি ক্ষমাব্যঞ্জক!

অশ্রু চোখ চাহিয়া বলিল—"অনেকক্ষণ একভাবে বসে আছ, শোও গে যাও।"

"না অশ্রু, জীবনে যে পাপ করেছি তার একটু প্রায়শ্চিত্ত করি।"

"আচ্ছা, তুমি বারবার ও কথা বল্‌ছ কেন? কি করেছ তুমি যার জন্যে—"

"তুমি ত জান না অশ্রু, এই বুকের মধ্যে কি রকম আগুণ জ্বল্‌ছে। আমি আত্মগ্লানির বিষে নীলকণ্ঠ হয়ে আছি। তুমি আমায় রক্ষা কর কণা, এ তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।"

অশ্রু তার বেদনা বিস্ফারিত চোখ দুটি কুমারের পানে মেলিয়া ধরিল; সে চাহনীর মধ্য দিয়া যেন সমস্ত জগতের দুঃখ ঝরিয়া পড়িতেছিল। অশ্রু জড়িত কণ্ঠে বলিল—"বড় দেরী করে ফেলেছ, আর আমায় মরণের কূল থেকে ফেরাতে পারবে না। এবার আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও।"

কুমারের চক্ষু অশ্রু ভারাবনত হইয়া পড়িল। সে বলিল—জান অশ্রু, বাবাকে আস্‌বার জন্যে খবর দিয়েছি। তিনি তোমায় কি ভালইবাসেন অশ্রু! তোমাকে অবহেলা করেছিলাম বলে আমি তাঁর স্নেহ হারিয়েছি। আচ্ছা কণা, সত্যি বল ত আমি তোমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়েছি—তোমার সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার মূল আমি, তবু কি আমার উপর তোমার ঘৃণা হয় না তবু কি আমায় সেই রকম ভালবাসো?"

অশ্রুর মুখের উপর বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে ক্লিষ্টস্বরে বলিল—'কি পাগলের মত বক্‌ছ? কে বল্লে তুমি আমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়েছ? আর যদিই বা আমায় ব্যথা দিয়ে থাক সেই ব্যথাই আমার কাছে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিল। তুমি আমায় ত্যাগ করেছ বলে কেন দুঃখ পাচ্ছ? তুমি আমায় ত্যাগ কর্‌তে চাইলেও যে ত্যাগ কর্‌তে পার না, এই বিশ্বাস আমার আছে বলেই না তোমার উপর অভিমান কর্‌তে পারি না। এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন, তোমার আমার বন্ধন যে চির-অচ্ছেদ্য। আমাদের মধ্যে আর কেউ এলে ভয় পেও না, সে নিজেই আপনা থেকে সরে যাবে। তুমি যে আমার, তোমাকে আমার কাছ থেকে কেউ দূরে সরিয়ে নিতে পার্‌বে না।'

'অশ্রু, অশ্রু, আমায় ক্ষমা করো'—কুমার আর সহিতে পারিল না, অশ্রুর শীর্ণ বুকের উপর মাথা রাখিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অশ্রুর দেহ তখন যন্ত্রণায় আকুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, তবু তাহার মৃত্যু-নীল ওষ্ঠে বড় মৃদু, বড় মধুর হাসি ফুটাইয়া কহিল—'ছিঃ কেঁদ না, আমার একটা শেষ সাধ পূর্ণ করবে ?'

'বল কণা ?'

অশ্রু একবারও দ্বিধা করিল না বলিল—'আমার সীঁথের সিঁদুর দিয়ে দাও।'

কুমার উদ্গত অশ্রু রোধ করিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। অশ্রুর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কুমার যখন অশ্রুর শুভ্র সীমন্ত সিন্দূর-রঞ্জিত করিয়া গলায় একছড়া ফুলের মালা পরাইয়া দিল, তখন তাহার যন্ত্রণাক্লিস্ট মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে ইঙ্গিতে পদধূলি চাহিল।

তখন কুমারের চোখে একফোঁটা জল ছিল না, সে নিঃশব্দে সমস্ত করিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার সব সাধ পূর্ণ হয়েছে ত কণা ?'

অশ্রু ঈষৎ ঘাড় নাড়িল, তারপর অন্তিম হাসি হাসিয়া বহু চেষ্টায় বলিল—'আ-বা-র-দেখা-হ-বে—' ক্রমেই সব স্থির হইয়া আসিতে লাগিল।

'অশ্রু, আমার অশ্রু, আমায় ফেলে কোথায় যাও—' বলিয়া কুমার উন্মত্তের ন্যায় তার ব্যগ্রব্যাকুল বাহু দিয়া অশ্রুর ক্ষীণ দেহলতা জড়াইয়া ধরিয়া, অশ্রুর মৃত্যু-শীতল ওষ্ঠে নিজ ওষ্ঠাধর প্রচণ্ড আবেগে চাপিয়া ধরিল।
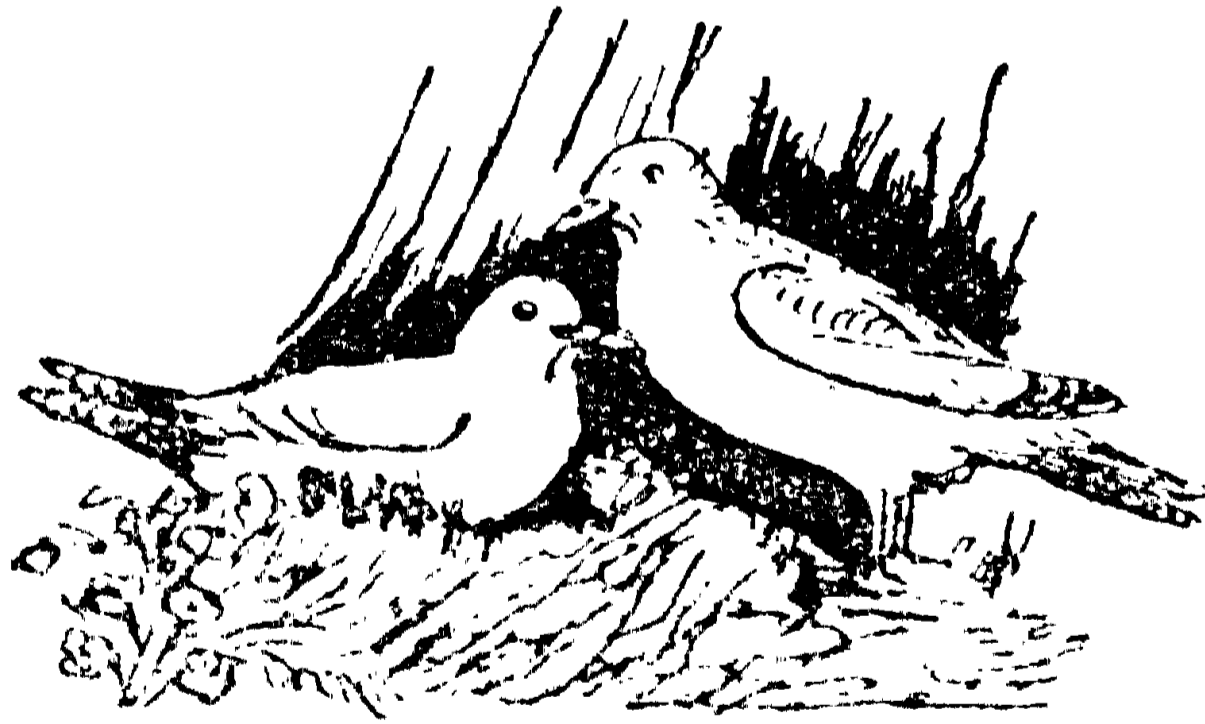
ন্যুট হ্যমসুনের 'হাঙ্গার' (Hunger)

শ্রীসুলতা কর

নরওয়েজিয়ান্ লেখক ন্যুট হ্যম্‌সুনের এই বইখানি পাশ্চাত্য সমাজে এমন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, বর্ত্তমান জগতের নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে এমন একটা প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলেছে যে সমগ্র বিশ্বের উন্মুখ আগ্রহকে আকর্ষণ করে, এই বইখানি আজ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হয়েছে।

সমস্ত বইখানি ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদী জগতের নিদারুণ বিভীষিকার ছবি। ধনীর বিলাসলীলার অন্তরালে দরিদ্রের ক্ষুধার কি অসহ্য জ্বালাই যে আত্মগোপন করে থাকে, ন্যুট হামসুন (হাঙ্গার) বুভুক্ষুতে তারই সামান্য পরিচয় দিয়েছেন।

ক্ষুধা কেমন করে যে দেহ, মন, আত্মাকে অধিকার করে মানুষকে ধাপে ধাপে নামিয়ে নিয়ে চলে, তারই একটা সম্পূর্ণ পরিচয় পাই আমরা হাঙ্গার এ।

বার্ণার্ডশর মত ন্যুট হ্যমসুন ও সাম্রাজ্যবাদকে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর নায়কের প্রতি উক্তি, প্রতি চিন্তা প্রাণহীন ধনীসমাজকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছে।

হাঙ্গার এর নায়ক এক বুভুক্ষু, কর্ম্মহীন, ভদ্রবংশীয় আত্মমর্য্যাদাশীল যুবক। সে তার ক্ষুধার তীব্রতা প্রশমিত করবার জন্যে প্রাণপনে ব্যর্থ চেস্টা কর্‌ছে। সারা বইখানিতে এই সামান্য ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নেই, কিন্তু এইটুকু আশ্রয় ক'রেই লেখকের লেখনী যে অপরূপ রূপসৃষ্টি করেছে, তারই রসমাধুর্য্যে বিশ্বের গুনীবৃন্দ মুগ্ধ হয়েছেন।

প্রাণের স্পন্দনে তাঁর সৃষ্টি সজীব হয়েছে। লেখক তাঁর নায়কের দৈনন্দিন জীবনের উপরের যবনিকা অপসারিত করে কতকগুলি দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। তাঁর নায়কের জীবনের দিনগুলি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, তাইতে আমরা দেখি যে হয়ত বা সৌভাগ্যের দিনে খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে মাসের মধ্যে কিছুদিন পর্য্যন্ত তার ভাগ্যে খাদ্যও জুটে যাচ্ছে, কিন্তু এদিন তার স্থায়ী হচ্ছে না। দীর্ঘদিনের উপবাসী যুবকের বিকল মস্তিষ্কের অধিকাংশ রচনাই বিকৃত ও অস্বভাবাবিক হওয়ার জন্য সম্পাদকের পরিহাস অর্জ্জন করে পরিত্যক্ত হচ্ছে।

ঘরে তার চিম্‌নী নেই। বরফের মত কন্‌কনে ঘরে শতচ্ছিন্ন পুরাণো কম্বল বিছিয়ে, ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট্ কর্‌তে কর্‌তে রাত্রি কাট্‌ছে। তবু সেই গৃহবাসের সুখ কয়দিনই বা তার স্থায়ী হচ্ছে? বহুদিন ধরে বাড়ীভাড়া ও খাদ্যের দাম বাকী পড়াতে বাড়ীওয়ালী (land-lady)

সকল অতিথির সাম্‌নে কুকুরের মত যখন তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, তখন আত্মমর্য্যাদাশীল যুবক একটীমাত্র ওয়েস্টকোট বিক্রী করে সেই টাকায় বাড়ীভাড়া শোধ করে, দুরন্ত শীতের দিনে পার্কের ভিজা ঘাসের উপর কম্বল বিছিয়ে রাত্রি কাটাচ্ছে। দুইদিনের উপবাসে পৃথিবী তার পায়ের তলায় টল্‌ছে, মস্তিষ্কে নানা উদ্ভট চিন্তা ঘুর্‌ছে, তপ্ত চোখের জল মাটীতে ঝরে পড়্‌ছে। তখন পকেটের ভিতর থেকে কাগজ বার করে সে চিবুচ্ছে, নিজের মুখের লালা দিয়ে পেটের জ্বালা থামাবার চেষ্টা কর্‌ছে, কিন্তু কিছুতেই সে দাহ মিট্‌ছে না।

সামনের দোকানে সজ্জিত জানলায় সুমিষ্ট কেক সাজান রয়েছে, মাংসের গন্ধে বাতাস ভ'রে উঠেছে;—যুবক একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে আছে, সাধ্য নাই যে একটুক্‌রা মুখে দেয়।

এম্‌নি করেই তার জীবনের দিন কাট্‌ছে, কিন্তু আত্ম-মর্য্যাদা তাকে সকলের কাছে হাত পাত্‌তে দিচ্ছে না, আত্মসম্ভ্রম তাকে চুরী করার প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত কর্‌ছে, মর্য্যাদাশীল জীবন যাপন করবার আকাঙ্খা তার জীবনকে আরো দুর্ব্বিহ আরো দুঃসহ করে তুল্‌ছে।

আত্ম-সম্ভ্রম তার জীবনকে কতখানি দুঃসহ করে তুলেছে, লেখক তার কতকগুলি দৃশ্য দেখিয়েছেন, আমরা দেখ্‌ছি—রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে সে হতভাগ্য মাংসওয়ালার কাছে মাংস চাইছে, সে বল্‌ছে—"ভাই আমার কুকুরের জন্য একটুক্‌রা মাংস দেবে, বেশী নয় মাত্র একটুক্‌রা।" কিন্তু তখনও তার উপবাসী জিহ্বা একথা উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌ছে না যে আমাকে দাও।

এম্‌নি করে ক্ষুধার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে যুবকের দেহ ও মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ছে—ভগবানের বিরুদ্ধে, মানুষের বিরুদ্ধে, স্বার্থপর সমাজের বিরুদ্ধে। তখন তার মুখ দিয়ে লেখক যে উক্তি প্রচার করেছেন, তার যে চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন, তারই তীব্র আঘাতে সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজে একটা প্রচণ্ড অনুভূতি জেগে উঠেছে।

নুট হামস্থনের নায়ক ভগবানের অস্তিত্বকে উপহাস করেছে, মানুষকে ঘৃণা করেছে, আর সমাজকে অভিশাপে দগ্ধ করেছে।

তাঁর নায়ক সদা সর্ব্বদা এই এক প্রশ্নই জাগিয়ে তুলেছে যে 'তার এত দুর্ভাগ্য কেন?'

সে অলস নয়, সে পাপী নয়, সে তার জীবনের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়ে পরিশ্রম কর্‌ছে, তবু তার খাদ্য জুট্‌বে না কেন?

লেখক প্রবঞ্চিত বুভুক্ষু অসহায় জনগণের এই মর্ম্মান্তিক প্রশ্নটুকু রূপেরসে উজ্জ্বল করে পাশ্চাত্য সমাজের সাম্‌নে খাড়া করেছেন, উত্তর তাঁর একান্তই প্রার্থনীয়।

প্রতীচ্যের এই সমস্যা কি প্রাচ্যেরও একান্ত নিজস্ব নয়?

নুট হাম্‌স্থনের নায়ককে কি আমরা আমাদের ভারতের ঘরে ঘরে প্রতিদিনের প্রতিবেশী রূপে দেখ্‌তে পাই না?
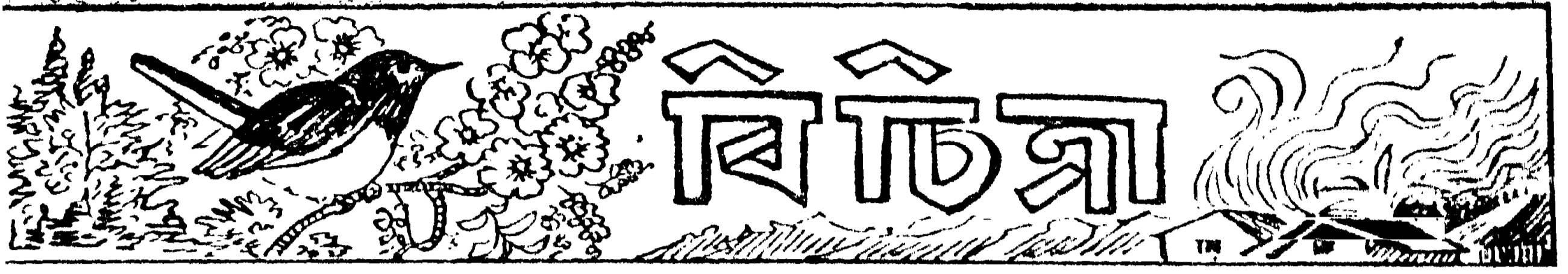
বাঙালী মহিলা-খেলোয়াড়

বাংলা দেশের মাটী উর্ব্বরা। এদেশের জল-হাওয়ারও একটা গুণ আছে যে, এদেশে কিছুই অসম্ভব নহে। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে যুগে কোন বাঙালীর মেয়ের প্রকাশ্য সার্কাস রিংএ অবতীর্ণ হইয়া খেলা দেখান নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল। বঙ্গদেশ সে অভাবও পূরণ করিয়াছে। সার্কাস্ জগতে সে গৌরবের পাত্রী প্রথম বাঙালী মহিলা খেলোয়াড় শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী। ইহার পূর্ব্বে অপর কোন বাঙ্গালীর মেয়ে সার্কাস খেলায় যোগ দিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। শুধু যোগদান করা নহে, সুশীলা সুন্দরীর কৃতিত্ব তাহার অদ্ভুত শারীরিক শক্তির ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। কেহ কেহ বলেন, সুশীলা সুন্দরী সমগ্র ভারতের মধ্যে হিংস্র ব্যাঘ্রের খেলা দেখাইতে সর্ব্বপ্রথম মেয়ে খেলোয়াড়। অবশ্য মহারাষ্ট্র দেশীয় বহু মহিলা বহুদিন হইতে সার্কাস্ খেলায় অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছেন; কিন্তু বন্য ব্যাঘ্র লইয়া প্রকাশ্য সার্কাস্ দেখাইয়া কেহ যশস্বিনী হইতে পারে নাই। শ্রীমতী সুশীলা কলিকাতার সোনাগাছি অঞ্চলের অধিবাসিনী। সুশীলার দুই পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র হীরেন্দ্রনাথ নিউ বেঙ্গল সার্কাসের পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী।

—ব্যবসা ও বাণিজ্য

পরলোকে নগেন্দ্রবালা

ধান্যকুড়িয়ার প্রাতঃস্মরণীয় দানবীর স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্লভ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র নাথ বল্লভ এম্, এল, সি মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী নগেন্দ্র বালা দাসী গত ১৩ই ভাদ্র সোমবার ৪১ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি একদিকে যেমন পরোপকারপরায়ণ ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই সৌজন্য, বিনয় ও মিষ্টালাপাদি দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতেন। অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা বিধবার প্রতিপালন, নানারূপ সাহায্য দ্বারা কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির দায়-মোচন, দরিদ্র-নারায়ণগণকে অন্নপ্রদান, ভিখারীর অভাব-মোচন, ঔষধ. পথ্য ও পরিচর্য্যাদি দ্বারা রোগীর রোগ মোচন, বিদ্যাশিক্ষার্থে ছাত্রগণকে সাহায্য প্রদান, বালক বালিকাগণকে হিন্দু ধর্ম্মোচিত সুশিক্ষা প্রদান প্রভৃতি হিতকর কার্য্যসমূহ তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচারের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগিনী ছিলেন—পল্লীস্থ রমণীগণকে লইয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম্মকথার আলোচনা করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী লোকের পত্নী হইয়াও তিনি নিতান্ত নিরহঙ্কার ও নিরভিমান ছিলেন। তাঁহার নিজের সন্তানাদি না থাকিলেও তিনি অনেকেরই জননী ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে অনেকেই মাতৃহারা হইল। তিনি ধান্যকুড়িয়া গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাইয়া সকলের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু নিজ গ্রামে ইঁহার স্মরণার্থ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য ১০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

—প্রবাসী

নারী মেরু-অভিযানকারী

মিসেস্ অলিভ্ মার চ্যাপ্‌ম্যান্ নামে একটী মহিলা কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তর মেরু সন্নিহিত ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড প্রদেশ ভ্রমণ করে এসেচেন। তিনি ঐ প্রদেশে শীতকালে গিয়েছিলেন। আজ পর্য্যন্ত খুব কম য়ুরোপীয়ই তাঁর মত অত ঠাণ্ডার সময় ওদেশে গেছেন। শ্রীমতী চ্যাপ্‌ম্যান্ একজন প্রসিদ্ধ অভিযান-কারিণী তো বটেই উপরন্তু তিনি একজন পাকা চিত্রশিল্পী। তিনি ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবার উদ্দেশ্যেই সেই দারুণ শীতের মধ্যে একাকী ঐ তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশের মধ্যে দীর্ঘ ছয় শো মাইল পথ ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি যখন ঐ অভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন, সে সময়ে ওখানকার উত্তাপের পরিমাণ ছিল শূন্য ডিগ্রীর চেয়েও ত্রিশ ডিগ্রী নীচে।

তিনি বলেন, আমার এই যাত্রার সময় সেখানকার পথিপার্শ্বস্থ প্রত্যেক কুটীরবাসী লোক আমার দুঃসাহস দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছে। আবার তার ওপর যখন তারা আমার মুখ থেকে শুনলে যে আমি একজন ইংরাজ মহিলা এবং একাকী এই ভ্রমণে বেরিয়েছি, তখন তাদের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেছলো। কারণ সে সময় সেখানকার সেই দারুণ ঠাণ্ডায় ওদেশের অধিবাসীরা পর্য্যন্ত বাইরে বেরুতে রীতিমত ভয় পেতো। যাই হোক্ আমি কিন্তু এই অভিযানে যথেষ্ট আনন্দই লাভ করেছিলুম। ঐ ভ্রমণের সময় মিসেস্ চ্যাপ্‌ম্যান্ যখন এক পর্ব্বতের কাছে গেছ্‌লেন, তখন একজন স্থানীয় ল্যাপ্ তাঁকে দাঁড় করিয়ে এক গান শুনিয়েছিল। তিনি ওদেশের ভাষা জান্‌তেন না, তবু তাঁকে গান শুনতে হোল। শেষে একজন দোভাষী তাঁকে বুঝিয়ে ছিলেন যে, ঐ লোকটী তাঁকে যে গান শোনালে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে তাঁর রূপে গুণে এতখানি মুগ্ধ হয়েছে যে তিনি যদি তাঁকে বিবাহ করেন তো সে কৃতার্থ হয়ে যায়। সে লোকটি দরিদ্র নয়, ওখানকার হিসাবে রীতিমতই ধনী। তার এক হাজার হরিণ আছে, এবং তিনি, তাকে বিবাহ করলে তার হরিণের ওপর তাঁরও সমান অধিকার জন্মে যাবে। মিসেস্ চ্যাপ্‌ম্যান্ সেই দোভাষীর মারফৎ তাকে ধন্যবাদের সঙ্গে তাঁর অসম্মতি জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। —বিচিত্রা

পুরুষ বনাম নারী

সম্প্রতি বিলাতে মিস্ আইভী রাসেল্ নামে একটী চব্বিশ বছরের মেয়ে যে দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা লক্ষ্য করবার বিষয়। ইনি বিলাতের এ্যামেচার্ ভারত্তোলন সমিতি প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উক্ত সমিতিতে নারী-সভ্য গ্রহণ করা হয় না ব'লে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রহণ করতে রাজী হননি। কিন্তু শ্রীমতী রাসেল্ বলেন, যে রীতিমত শিক্ষিতা হ'লে মেয়েরাও যে ভারোত্তলন বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে তিনি তা প্রমাণ করবেনই। তিনি অনায়াসে ৩১০ পাউণ্ড ওজনের ভার তুলতে পারেন, অথচ যে ভদ্রলোকটির কাছে তিনি ঐ বিদ্যাটী শিখেছেন তিনি তা নড়াতেও পারেন না। তিনি ১৫০ পাউণ্ড ভার বহন করে এমন কতকগুলি শক্ত শক্ত কসরৎ দেখাতে পারেন, যা তাঁর আয়তন এবং ওজনের কোন পুরুষ মাত্র ১৩৫ পাউণ্ডের বেশী ভার বহন করে দেখাতে পারে না। —বিচিত্রা

অসাধারণ স্মরণশক্তি

মিস মিনি কুইন্স (Minnie Quince) ব'লে ডাবলিনের একটী উনিশ বছরের মেয়ে ষ্টেনোগ্রাফার (Stenographer) সম্প্রতি আর একরকমের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা আবার আরো চমৎকার। এই

মেয়েটী মাত্র ছ' সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং ইটালীয়ান, এই তিনটী কঠিন ভাষার অতি কঠিন কঠিন পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর এই আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে ডাবলিনের বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিকরা পর্য্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছেন। মিস্ কুইন্স বলেন যে, তিনি একটী কাজে দোভাষী (Interpreter) প্রয়োজন হবে জেনে এবং আর বেশী সময় না থাকায়, তাড়াতাড়ি ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনটী নতুন ভাষা শিখে নিয়েছেন। এত অল্প সময়ে তিনি কি করে ঐ ভাষা তিনটী আয়ত্ত করলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, যে কোন বইয়ের সব কয়টী পাতায় যদি তিনি একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন তো তার প্রত্যেক শব্দটী পর্য্যন্ত তাঁর মনে থাকে। সুতরাং ঐ ভাষায় গ্রামার এবং আনুষঙ্গিক নিয়মকানুন সম্বন্ধীয় বইগুলি একবার পড়ে নেওয়ার ফলেই, ঐ ভাষাগুলি তাঁর আয়ত্ত হ'য়ে গেছ্‌লো। তিনি বলেন যে বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ নিয়ে তাঁর একটু মুস্কিল বেধেছিল, কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞের কাছে একবার শুনে নেওয়ার ফলে তাঁর সে অসুবিধাও দূর হয়ে গেছ্‌লো। —বিচিত্রা

বৃহত্তম জাহাজ

সম্প্রতি ফ্রান্সের নাজারার নামক স্থানের "পেনহোট শিপ্ইয়ার্ড"এ একটী জাহাজ তৈয়ার হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত জাহাজ্ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যে উহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইবে। উহা বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত হইবে এবং ৭০ হাজার টনের উপর ওজন বহন করিতে পারিবে। জাহাজটী দৈর্ঘ্যে ১০২০ ফুট, প্রস্থে ১১৭ ফুট ও জল হইতে মাস্তলের মাথা পর্য্যন্ত উচ্চতায় ২০২ ফুট হইবে। ৭৫ কোটী ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ ৩ কোটী ডলার তুলিবার জন্য ইহাতে ২১৩২ জন আরোহী লওয়া যাইতে পারিবে। এই জাহাজের মধ্যে রাস্তা, বেড়াইবার ও খেলিবার স্থান, দোকান বাজার, নানারূপ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, এমন কি বল নাচের জন্য সুদৃশ্য সুন্দর মেঝেও থাকিবে। মোট কথা ইহাকে একটী ছোট খাট সহর বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। —বণিক

নূতন পক্ষহীন উড্ডীয়মান নৌকা

আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে একখানি ক্ষুদ্র বিলাস তরণী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার বাহিরের দিকে কোন দাঁড় নাই। পিছনে এমন ভাবে একটী চক্র খাটানো আছে—যাহা আরোহীরা ভিতর হইতেই চালাইয়া নৌকাখানিকে যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে চালিত করিতে পারে। উপরে নানা বর্ণে রঞ্জিত একটা আচ্ছাদন তুলিবার এবং নামাইবার ব্যবস্থা আছে, উহার সাহায্যে আরোহীরা রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। দেখিলে মনে হয় নৌকাখানা জলের উপর দিয়া যেন উড়িয়া যাইতেছে। —বণিক

গ্রন্থকারগণের আয়

এড্‌গার ওয়ালেস (Edger Wallace) খ্যাতিলাভ করার পর মৃত্যু পর্য্যন্ত দশ লক্ষ পাউণ্ড আয় করিয়াছেন। নোয়েল কাওয়ার্ড (Noel Coward) গত চারি বৎসর যাবৎ প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করিয়া আসিতেছেন।

সুভাষ ও সেনগুপ্তের কথা চিন্তা কর

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিবৃতি

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ফ্রী প্রেসের মারফতে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন—এতদিন পর্য্যন্ত মহাত্মাজীর উপবাস ও উহার গুরুতর পরিণতি সম্বন্ধেই সকলের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল, উহা স্বাভাবিক।

বর্ত্তমানে আমাদের প্রিয় সুভাষচন্দ্র ও সেনগুপ্তের বিষয় চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। একজনের দুইটী ফুসফুসই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং অন্যজনের রক্তের চাপ অস্বাভাবিক রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুনঃপুনঃ কারারুদ্ধ হওয়াতে এবং বন্দী অবস্থায় থাকাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এবং রোগের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানবতার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেওয়া উচিত, যাহাতে তাঁহারা উৎপীড়নমূলক ও অবসাদ-জনক কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া আরোগ্যলাভ করিতে পারেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় শক্তিশালী গবর্ণমেন্ট এই কাজ করিলে উহাতে তাঁহাদের সম্মানের হানি হইবে না, বরং ন্যায় বিচার ও উদারতা দেখাইবার ফলে জনসাধারণের কাছে তাঁহাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে।

জীবিত ও মৃত সাময়িক পত্রের তালিকা

জীবিত পত্র—

	নাম	প্রথম প্রকাশ কাল	সম্পাদক
১।	সমাচার দর্পণ	১৮১৯ (১৮১৮)	জে, সি, মার্শম্যান
২।	সমাচার চন্দ্রিকা	১৮২২	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩।	জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১	রামচন্দ্র মিত্র
৪।	সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	১৮৩৫	উদয়চন্দ্র আঢ্য
৫।	সংবাদ প্রভাকর	১৮৩৬	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
৬।	সম্বাদ সৌদামিনী	১৮৩৮	শ্রীনাথ রায়
৭।	সম্বাদ ভাস্কর	১৮৩৯	
৮।	বঙ্গদূত	,,	রাজনারায়ণ সেন
৯।	সম্বাদ রসরাজ	,,	কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
১০।	সংবাদ অরুণোদয়	,,	জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মৃত পত্র—

	সাপ্তাহিকঃ—			সম্পাদক
১।	সম্বাদ কৌমুদী	...	...	রাজা রামমোহন রায়
২।	সম্বাদ তিমির নাশক	...	...	কৃষ্ণমোহন দাস
৩।	সম্বাদ সুধাকর	...	...	প্রেমচাঁদ রায়
৪।	সম্বাদ রত্নাকর	...	...	ব্রজমোহন সিংহ
৫।	সম্বাদ রত্নাবলী	...	...	জগন্নাথ মল্লিক
৬।	সম্বাদ সার সংগ্রহ	...	...	বেণীমাধব দে
৭।	অনুবাদিকা	...	...	প্রসন্নকুমার ঠাকুর
৮।	সমাচার সভারাজেন্দ্র	...	...	মৌলবী আলিমোল্লা
৯।	সম্বাদ সুধাসিন্ধু	...	...	কালীশঙ্কর দত্ত
১০।	সম্বাদ গুণাকর	...	...	গিরীশচন্দ্র বসু

			সম্পাদক
সাপ্তাহিক			
১১। সম্বাদ মৃত্যুঞ্জয়ী	...	...	পার্ব্বতীচরণ দাস
১২। দিবাকর	...	...	গঙ্গানারায়ণ বসু
মাসিক :—			
১৩। বিজ্ঞান সেবধি	...	..	এম, ডাব্লিউ উলিষ্টন ও গঙ্গানারায়ণ সেন
১৪। জ্ঞানোদয়	...	...	রামচন্দ্র মিত্র
১৫। জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ	...	...	রসিককৃষ্ণ মল্লিক
১৬। পশ্বাবলী	...	...	রামচন্দ্র মিত্র।

—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ব্যয়

কাউন্সিলে প্রশ্ন উঠিলে হোম সেক্রেটারী বলেন, গত আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় উভয় পক্ষে সবশুদ্ধ ১৬,৫৪,০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ১২,৬৮,০০০ এবং অপর পক্ষে ৩১,১২৬ টাকা মাত্র। আলোচ্য বর্ষে আগষ্টের শেষ পর্য্যন্ত ব্যয়ের পরিমাপ করা হইয়াছে ১,৭৫,৬০০ টাকা।

লণ্ডনে শাড়ী বিক্রয়

লণ্ডনে হাজার হাজার দরজা জানালাতে এক প্রকার শাদা সাড়ী, কোনটী দুই দিকে সরু পাড় দেওয়া, কোনটী গোলাপী, কোনটী নীল, নানা বিচিত্র বর্ণের পরদা বহু লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার কারণ আবিষ্কার করিতে হইলে সুদূর ভারতে সন্ধান করিতে হইত - কিন্তু 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' এ বিষয়ে তাহাদের বিস্ময় দূর করিয়াছে। উহা বলিতেছে--'ভারতবর্ষ আমাদের তৈয়ারী কাপড় প্রভৃতি বয়কট করিবার ফলে বহু কাপড় মজুত হইয়া ছিল। ইতিমধ্যে সহরের এক দোকানদার ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে প্রচুর পরিমাণে শাড়ী, বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে। শাড়ীগুলির রং পাকা এবং খুব টেঁকসই বলিয়া সুন্দর পর্দ্দা হইতেছে। মনে হইতেছে, পরবর্ত্তী গ্রীষ্মে ইংলণ্ডের সমুদ্রোপকূলে স্ত্রীলোক এবং শিশু দেখা যাইবে যাহারা ভারতের জন্য প্রস্তুত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সমুদ্র তীরের বৈচিত্র্য বাড়াইতেছে।"

একজন বিক্রেতা বলিয়াছে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে ২০০,০০০ খানা শাড়ী বিক্রয় করিয়াছে।

দোটানা

শ্রীসম্প্রীতি দেবী

পথের থেকে ডাক এসেছে ছেড়ে যেতে ঘর
ঘরের মাঝে প্রীতির বাঁধন স্নেহ মায়ার ডোর,
ডাক দিয়ে সে পথিক চলে
কি সুগভীর বাণী বলে,
"ঘরের বাধা ঠেল্‌তে হবে পথ যে সাথী তোর,
সত্য পাবি পথ চলাতেই" কি সে ভাষার জোর !

ঘর আমারে ভালবেসে বাঁধ্‌চে বাহু দিয়ে
স্নেহ ভরে কইছে কথা প্রীতি-মনটি নিয়ে।
পথের কথা ভাবি যখন
সেই যে তখন হয়রে আপন
ছাড়তে ঘরের প্রীতি আবার আঁখিতে বয় লোর,
বাঁধন তাহার স্নেহয় ভরা দুটি বাহুর ডোর।

পথের পথিক ডাক দিয়ে যায় পথের বাঁকের থেকে
তাহার ডাকে অবুঝ আমার প্রাণ ওঠে গো জেগে,
ডেকে বলি—"যাব আমি—"
পথিক পথেই দাঁড়ায় থামি,
ঘরের কাছে বিদায় নিতে চাইলে মুখে ওর
দেখি তাহার বিদায় দিতে চোখ যে জলে ভোর !

বিদায় নেওয়া হয় না ত' আর প্রাণ যে কেঁপে ওঠে
স্নেহ, মায়া-প্রীতির বাধা কতই এসে জোটে,
পথিকরে কই চোখ ঢেকে—"ভাই,
যাও গো তুমি, যেতে না চাই।"
পথিক কহে একটু হেসে—"বাধায় কি তোর ভয়
বাধা ঠেলেই চল্‌তে হবে তবেই হবে জয়।"
পথের ডাকে প্রাণটী জাগায়
ঘরের ডাকে বক্ষ কাঁপায়
দুই ডাকেরি দোটানাতে মনে লাগে ঘোর
কোন ডাকটি সত্য তাহাই ভাবি নিরন্তর।

নব্য-রাশিয়ায় দৈনন্দিন জীবন

শ্রীজ্যোৎস্না চন্দ

যাহারা হাতে খাটিয়া খায় তাহারা প্রত্যেক দিন একসের পরিমাণ রুটী পায় এবং দশদিনের মধ্যে তিনবার করিয়া প্রত্যেকে দেড় ছটাক পরিমাণ মতন মাংসও পাইতে পারে। মাসে একবার করিয়া এক ছটাকের কিছু বেশী মাখনও তাহারা পায়। তাহা ছাড়া সময়ে সময়ে দেড়সের চিনি, দশটি ডিম এবং সেরখানেক পিষ্টক, প্রত্যেকে পাইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে মাসে তিনবার করিয়া রুটীর পরিবর্ত্তে প্রত্যেক শ্রমজীবী ময়দাও পাইতে পারে এবং প্রত্যেকে দুইসের পরিমাণ ডাল ইত্যাদি শস্য দাবী করিতে পারে।

শিশুদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাহারাই শুধু দুধ পাইতে পারে। পরিণত বয়স্ক লোকেরা যে রসদ পাইয়া থাকে তাহাতো শিশুদের প্রাপ্য বটেই, অধিকন্তু প্রত্যেক শিশুর দৈনিক আধসের দুধ ও মাসে এক ছটাকের ঊর্দ্ধে মাখন বরাদ্দ আছে। যাহারা মস্তিষ্ক চালনার কাজ করে, যথা সরকারী কর্ম্মচারী, কেরাণী ব্যবসায়ী প্রভৃতি, তাহারা শ্রমজীবীদের হইতে কম খাদ্য পাইয়া থাকে। এই ব্যবস্থার মূলে হইয়াছে সোভিয়েটের মূলনীতি, যে শ্রমজীবীরাই দেশের মেরুদণ্ড এবং তাহাদেরই অধিক খাদ্যের ও পুষ্টির প্রয়োজন। সে যাহাই হৌক্, যাহারা মাথা খাটাইয়া রোজগার করে তাহারা একসের রুটীর পরিবর্ত্তে আধসের এবং দুইসের শস্যের পরিবর্ত্তে একসের পরিমাণ পায়। মাখনের পরিমাণও এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। সরকার চালিত দোকানগুলিতে ভীড়ের জন্য ঢুকিবার উপায় নাই। মুস্কিল হইয়াছে এই যে, যত রসদের চিট্ লোকেদের দেওয়া হয় সে পরিমাণ মাংস, ডিম, মাখন ইত্যাদিরও যোগাড় নাই। জিনিষ-পত্রের দামও কম নয়। একসের মাখনের দাম প্রায় ৮৲ টাকা। মাংস আরো অল্প মূল্য; অন্ততঃ আমি যখন সে দেশে ছিলাম তখনকার দাম এই ধরণেরই ছিল।

রাশিয়ানেরা যত দরিদ্র এবং মিতাহারই হৌক্, তিন দিনে একবার একটু মাংস ও ডিমের গন্ধ ও ছোট একচামচ মাখন কখনই তাহাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ফলে হইয়াছে এই যে, কি শ্রমজবী, কি কর্ম্মচারী, প্রত্যেকে তাহার আয়ের সারাংশ সরকার-চালিত দোকানগুলির বাহিরে জিনিষ-পত্র কেনায় ব্যয় করিয়া থাকে। সেখানেও জিনিসপত্রের দাম অতি সাংঘাতিক। তাহার কারণ হইয়াছে এই যে লোকেরা যে পরিমাণ জিনিষ দাবী করে, সেই পরিমাণ জিনিষের সংস্থান নাই। মাখনের দাম সের প্রতি প্রায় পনর টাকা, দশটি ডিমের দাম প্রায় পাঁচ টাকা।

তবে মস্কোবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তির আর একটা উপায় আছে; তাহারা সরকার-চালিত ভোজনাগারে যাইয়া আহার করিতে পারে এবং সেখানকার দাম সব নির্দ্দিষ্ট।

বিদেশীর পক্ষে সরকারী হোটেলে খাইতে যাওয়া খুব রুচিবিরুদ্ধ নয়, তবে সুস্বাদু আহার্য্য পাওয়া গেলেও তাহা অতি মহার্ঘ। বিদেশীদের জন্য তিনটি হোটেল নির্দ্দিষ্ট আছে। নানাশ্রেণীর খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানে আছে। একটি হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজনে বেশ ভাল সুরুয়া, মাংস, রুটী, মাখন ও নানা রকম সব্‌জী দিয়া থাকে, তাহার দাম প্রায় দশ টাকা, প্রাতরাশের-সময় দুইটী ডিম, রুটী, মাখন ও কফি পাওয়া যায় তাহার নির্দ্দিষ্ট দাম প্রায় ৪৷৷০ টাকা। নৈশভোজনে ১৫৲ ২০৲ টাকার বেশী লাগিবার কথা নয়। খাওয়া দাওয়া অবশ্য ক্ষুধার উপর নির্ভর করে, মোটের উপর সারাদিনের খাওয়াতে ৩০৲ টাকার বেশী লাগিতে পারে না।

বিদেশীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হোটেলগুলিতে দেশের লোকেরা খাইবার অনুমতি পাইলেও, তাহাদের সে সংস্থান নাই। তাহাদের নিজেদের জন্য হাজার হাজার খাইবার জায়গা আছে। আমি নিজে এরকম পাঁচটী জায়গা দেখিয়া আসিয়াছি। খাইতে বসিবার পূর্ব্বে তহবিলদারের নিকট হইতে চেক্‌ কিনিয়া লইয়া বসিতে হয়। প্রত্যেক স্থানেই দেখিলাম কুড়ি হইতে পঞ্চাশ জন লোক তহবিলদারের কাছে যাইবার জন্য সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোন টেবিলেই স্থান নাই। আমি শেষে অতি কষ্টে একটা টেবিলে একটু জায়গা করিয়া লইলাম; আমি সুরুয়া, নোনা মাছ, আলু, শশা ও চা'র জন্য কেক্‌ পাইয়াছিলাম। সেদিন মাংসের কোন আয়োজন ছিলনা। সুরুয়া, বিশুদ্ধ গরম জল তাহাতে যৎসামান্য কফিসিদ্ধ। আলুগুলি মাখন বা চর্ব্বির লেশ শূন্য, মাছও উচ্চ জাতীয় ছিল না। আর রুটী যাহা পাইয়াছিলাম তাহা পরিমাণে প্রচুর হইলেও কৃষ্ণবর্ণ ও অল্পাস্বাদযুক্ত। যাহারা আহার করিতেছিল তাহাদের আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি, নোংরা টেবিলসজ্জা ও বাসনপত্রে দুর্গন্ধের আবহাওয়া, তাহাদের আহারে অরুচি জন্মাইতে পারে না। খাওয়ার দাম পড়িয়াছিল প্রায় তের আনা।

সেখানে শুনিলাম, কারখানা অঞ্চলে মুটে মজুরদের জন্য যে সকল খাইবার যায়গা আছে তাহাদের অবস্থা উচ্চতর। সহরের শেষ সীমানায় আমি সেইরূপ একটী খাইবার জায়গায়ও একদিন গিয়াছিলাম। খাওয়া একই ধরণের দেখিলাম। রাস্তায় বাহির হইতেই রক্ত পতাকাসহ একদল লোক গান গাহিয়া যাইতেছে দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে। গানের উদ্দেশ্য অবশ্য পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের পক্ষে মত-বিস্তার।

আমি কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া দোকানপাট গুলিও লক্ষ্য করিয়াছি। জিনিষপত্র-বিরল জানালাগুলি ধূলিবহুল, কিন্তু সর্ব্বত্রই লেনিনের প্রতিমূর্ত্তি ও ষ্টালিনের ছবির ছড়াছড়ি। দোকানগুলি দেখিলে কোন পরিত্যক্ত নগরীর কথা মনে পড়ে। কিন্তু

ঐ সকল শূন্য দোকানের সারির মাঝখান দিয়া জনস্রোত দিবারাত্র বহিয়া চলিয়াছে, দেখিলে কেমন সৃষ্টিছাড়া বলিয়া ধারণা হয়।

শুধু কয়েকটি দোকান একেবারে শূন্য বলিয়া নজরে পড়িল না। কোথাও কোথাও মাছ ধরিবার সরঞ্জাম, কোথাও বা সঙ্গীত যন্ত্রাদি—দেখিলে মনে হয়, সহরের বাসিন্দরা বুঝি ক্রীড়া এবং সঙ্গীত ছাড়া কিছুই জানে না অথবা চাহে না। কিন্তু আসল কথা হইয়াছে এই যে, কিনিবার উপযোগী আর কোন দ্রব্যের সংস্থানই সেখানে নাই।

আমি বিশেষ করিয়া মস্কো-জীবনের এই দিক্‌টার প্রতি ঝোঁক দিয়াছি এই জন্য যে, একদিনের জন্যও মস্কোতে গিয়া বাস করিলে এইটাই প্রথম দৃষ্টিপথে পড়িতে বাধ্য। কোন পুরাতন বাজারে গেলে, হাজার হাজার লোকের ভীড় নব্য ও প্রাচীন উভয় সমাজের লোকেরই সমাবেশ দেখিয়া কোন পার্থক্য বুঝিবার উপায় নাই। সকল শ্রেণীর লোকই যেন ভগ্ন-দশাপ্রাপ্ত। যত বেচিবার লোক তাহা হইতে অনেক বেশী কিনিবার লোক। জিনিষপত্রের অগ্নিমূল্যই সে কাহিনীর পরিচয় দেয়। কোথাও হয়তো একজন বৃদ্ধলোক একজোড়া ব্যবহৃত চটিজুতা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখে পড়িতেই দশ পনেরো জন লোক সাগ্রহে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইতে হইলে কনুই চালান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ভীষণ কথা-কাটাকাটি, মিনতি, গালাগালিবর্ষণ সবই চলিয়াছে। তারপর সম্ভবতঃ জীর্ণ জুতাজোড়া টাকা পাঁচিশে বিক্রি হইয়া গেল।

মস্কোবাসীদের দুর্দ্দশার কথা আরো অনেক বলিতে পারি। এক একটি ঘরে বহু লোক ভীড় করিয়া বাস করে, এক একটি পরিবারে একটি কোঠার বেশী পায় না। কখনো কখনো দুই তিনটি পরিবারও একটি ঘর দখল করিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল বিবরণ হইতে সমগ্র দেশ সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিবে তাহা ভ্রমাত্মক না হইয়া পারে না। কারণ রাশিয়া একটি বৃহৎ দেশ, এবং সর্ব্বত্রই এক অবস্থা বা ব্যবস্থা নয়। যে সকল অঞ্চলে শ্রমশিল্পের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, আধুনিক প্রণালীতে কলকারখানা তৈয়ারী হইতেছে এবং খনি খননের কাজ অবিশ্রান্তভাবে চলিয়াছে, হাজার হাজার লোকেরা চাষবাস করিতেছে, সেখানে লোকেরা এমন, অভাবক্লিষ্ট নয় এবং তাহাদের খাইবার-পরিবারও অভাব নাই। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাই উল্লেখ করিলাম। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নবসৃষ্টির উদ্দেশে কি বিপুল প্রচেষ্টা! লক্ষ্য করিবার প্রধান বিষয় হইয়াছে এই যে, সেখানে বেকারসমস্যা অজানিত! প্রত্যেকেরই কোন না কোন কাজ করিবার আছে ও প্রত্যেকে তাহা করিতেছে। দেশের চারিদিকে যে বিরাট কাজ চলিয়াছে, দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার তাহাতে সহযোগ-একেলা করিয়া কেহ ব্যথা পায় না। দুঃখ সকলের ভাগেই সমভাবে পড়িয়াছে। তবে, দুঃখ যদিও পায় আশা করিবার সাহসও তাহারা রাখে।

পরিশেষে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, প্রথম দর্শনে মনে হয় যে পঞ্চবার্ষিক সংকল্প বুঝি ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে; দেশের লোকের বাহ্যিক চেহারা তাহাই যেন প্রমাণ করে বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু এই বিরাট সংকল্প সমগ্রজাতির জন্য যে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতেছে, তাহাতে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। এই পঞ্চবার্ষিক সংকল্প সোভিয়েট-শাসিত দেশের পক্ষে এক বৃহৎ সঞ্চয় ভাণ্ডার। যাহারা আজ এক জোড়া জুতা হইতেও বঞ্চিত হইতেছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্যই কলকারখানা পলকে পলকে গড়িয়া উঠিতেছে। অনাহার, অনশন, ও শত কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া রাশিয়াকে সর্ব্বতোভাবে মহীয়ান্ ও গরীয়ান্ করিয়া তুলিবার জন্যই বুঝি এই সঙ্কল্পের উদ্ভব।
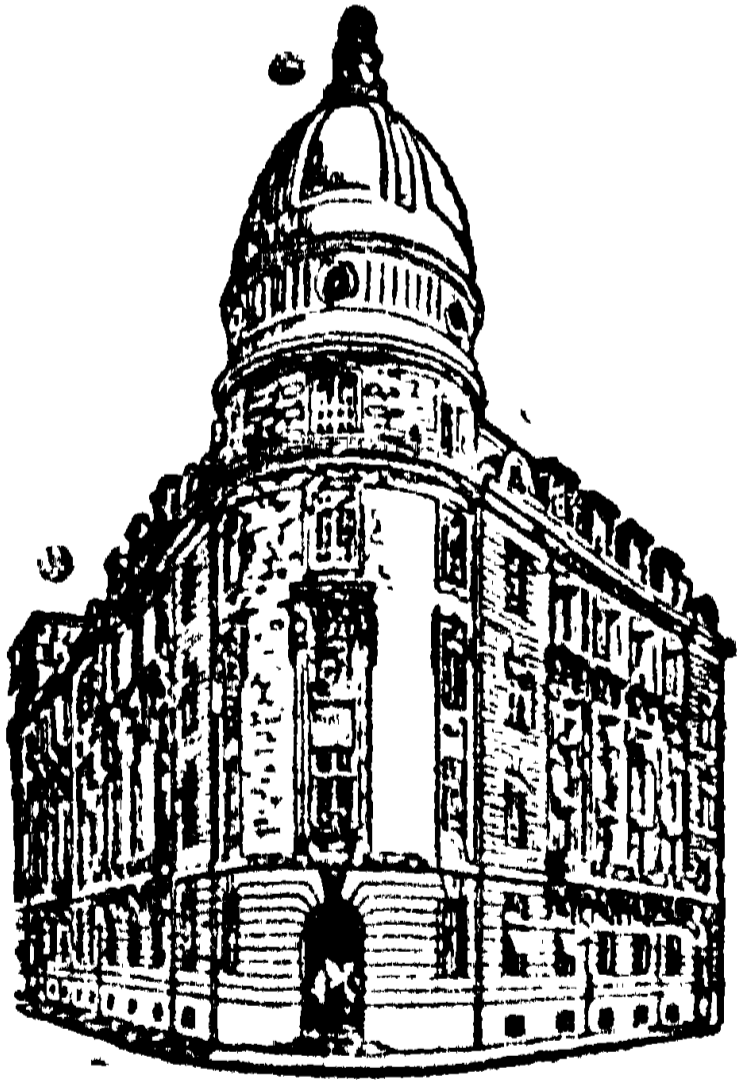
ইংরাজী হইতে অনূদিত

পথের শেষে

শ্রীশ্রেয়সী দেবী

পথে চলিয়াছি—একা চলিতে একটু ভয় হয়, সঙ্গী খুঁজি। একজন চাই যার উপর একান্ত নির্ভর করিতে পারি, মনের নিভৃত-তলে এ আকাঙ্ক্ষা জাগে। কিন্তু অভিমানে মনে করি, আমি কাহারো সাহায্য চাই না। সেই একান্ত নির্ভরের পাত্র যে তাকে খুঁজি না, তাকে জানিতেও চাই না, মনের কোণেও তাকে ভাবি না;—আমি একাই পথে চলি; চলিতে চলিতে মনকে আকর্ষণ করে এমন অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। মনে হয় তাহার সঙ্গ চাহি, তাহাকে চোখে চোখে রাখি, তাহার ধ্যান ধারণা কি জানিতে চাই; মনে হয় অভিনব—আমাকে আরও আকর্ষণ করে। তার কথা তার আলাপ আমাকে মুগ্ধ করে; তার হাসি, চাহনি আমাকে পুলকিত করে—মনে হয় ইহাকেই জীবন ভরিয়া চাহিয়াছি। কিন্তু কিছু দূরে চলিবার পর দেখি তার পথ ভিন্ন, গম্য স্থানও তার ভিন্ন; তাহার সহিত আমার ধারণার দৃশ্যতঃ একটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মূলতঃ প্রভেদটা প্রখর। সে আমাকে চাহে নাই, পথের শ্রান্তি বিনোদনের জন্য একটা সঙ্গীর প্রয়োজন তার ছিল, তার বেশী নয়; শিষ্টাচারের সহানুভূতি তার মিষ্টভাষণের মধ্যে ছিল—তাকেই অন্তরের বেদনার অনুভূতি বলিয়া ভুল করিয়াছি—সে গেলে একটু অবসাদ বোধ করিয়াছি। মনে হইয়াছে সবটা জীবন বুঝি বিস্বাদ হইয়া থাকিবে। আবার একেলা চলি—আবার পথিক আসে পরম কৌতুকে, আমার সঙ্গ নেয়, তেমনি মনোরম তার হাসি, আলাপ আর চাহনির ছন্দ; আমাকে আবার দোলা দেয়, মনে হয় ইহার সঙ্গেই সারা পথ হাসি গল্পে আমোদে কৌতুকে কাটাইয়াছি—এ যেন চির-পরিচিত, আমার অন্তরের অজানা লোকের পরিচয় বহন করিয়া আনিয়াছে। অন্তরের সত্যকার যোগ অনুভব করি, সে চায় আমি তাহাকে তাহার পথে অনুসরণ করি। সে আমাকে প্রশংসা করে, আমি উচ্ছ্বসিত হই, তার প্রশংসার দৃষ্টিকে আমি অন্তর দিয়া অভিনন্দন করিতে চাই; নয়নে আনন্দের হিল্লোল ছুটে। আমি অভিভূত হই। পথিপার্শ্বে অপরিচিত আশ্রয়ে দুদণ্ড বিশ্রাম করি। আবেগের প্রবাহ ক্রমে প্রশমিত হয়, অন্তরকে বুঝিবার প্রয়াস করি। তাহার পথে যাইতে সঙ্কোচ আসে, অভিমান আহত হয়; তাহাকে নির্ভর করিয়া আরাম হয় না, অন্তর উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তাহার পথে, তাহার সহিত বন্ধুর যাইবার সংকল্প দুর্বল হয়; তাহাকে সাথী করিয়া জীবন সার্থক হইবে এ চিন্তায় অন্তর সায়

দেয় না। তাহাকে অনুসরণ: করিতে বিরত হই; সে ব্যথা পায়, অভিমান করে—আবার তার সঙ্গ নিবার অভিলাষ হয়, কিন্তু পা সরে না। তার পথে সে চলিয়া যায়, আমি দাঁড়াইয়া থাকি। একটু অনুভবের আভাষ আসে কে যেন আমার অন্তর্য্যামী এই আশ্রয়ের বাহিরে থাকিয়া একান্ত দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। কোন বিক্ষোভ তার নাই; দৃষ্টিতে তার বিরক্তি বা অভিমান নাই—বিপথে চলিয়াছে দেখিয়াও উৎকণ্ঠার কোন প্রকাশ নাই; ঈষৎ হাসির রেখায় যেন অধর তার বিস্ফারিত। ভরসা পাই—নিজকে সংযত করি আবার আমার পথে আমি চলি—একা, নিতান্ত একা। পথের বন্ধুর সহিত হাসি-গল্প, আমোদ-কৌতুক চলে, নিতান্ত উৎসব-উচ্ছ্বাস সম্ভবপর হয়, কিন্তু তার উপর একান্ত নির্ভরতা তো আসে না।

যাকে সব দিয়া নির্ভর করিতে পারি তাহাকে তো পাই না; তাকে খুঁজি অন্তরে বাহিরে, চারিদিকে চাই, তাহাকে পাইনা; একান্ত মনে তাহাকে ডাকি; আমার কাতরতা দেখিয়াও তার দয়া হয় না। মনকে ভুলাইবার জন্য আবার বন্ধু খুঁজি, পথে চলিতেই আবার বন্ধু জোটে কিন্তু এবার ভয়ে ভয়ে মিশি। নূতন বন্ধুর সহিত আবার হাসি, আবার নূতন আমোদে নিমজ্জিত হই; কিন্তু অন্তরে খুঁজি তাঁহাকে যিনি আমার সকল ভার অকুণ্ঠিত কিন্তু দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন। বন্ধু তাঁর পথে চলিয়া যায় আমিও চলি, পরীক্ষার দিনে তাঁর হাসির আলোক পতিত হয়, আমি আশ্বস্ত হই। পথের শেষে তাঁর সহিত দেখা হয় তেমনি নির্ব্বাক্ স্থির, শান্ত, বিরক্তিলেশহীন, উদাসীন। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—'আমি যে সারা পথ তোমার সাথে। আমার সঙ্গেই যে তুমি চলেছ, তোমার সব ভার যে আমার—। আমার পথে আমি এসেছি— এ তো তোমারি পথ;—আমার পথে তুমি তো যেতে না—আমাদের পথ যে অভিন্ন—যত দূর যাও সেই এক পথ—সেই তুমি আর আমি। পথের শেষে বন্ধুরা যখন বিদায় নিয়েছে, যে যার পথে চলে গিয়েছে, তুমি যখন রিক্তা, নির্ভর তোমার তখনি এসেছে। এই নির্ভর আজ তোমাকে আমার সাথে এক ক'রে দিয়েছে। আজ তোমার শক্তি বিকশিত হ'য়েছে, তুমি নির্ভয়ে এখন আরো অগ্রসর হও।"

আবার তাঁহাকে হারায়ে ফেলি—সারাজীবন যে আমাকে রক্ষা করে, যাহাকে নির্ভর করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই আবার তাঁহাকে খুঁজি,—আবার তাঁহাকে ডাকি—'হে মোর অন্তর্য্যামী হে মোর প্রভু, হে মোর স্বামী, জীবন ভরিয়া যে ব্যথা তোমাকে দিয়াছি, তাহা দিয়া আমার হৃদয় ভরিয়া তোল।'

অলক্ষ্যে তোমার পথে আমাকে টানিয়া লও—আমার প্রাণের নিবেদন, শ্রদ্ধার একান্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

খেয়া-শেষে

শ্রীঅনিমা বসু

নিবে গেছে উৎসবের আলো
থেমে গেল হাসি কোলাহল,
চলে গেল যাহা কিছু ভালো
মোর তরে রাখি আঁখি জল।
যাহারা আসিয়াছিল সাথে
খেলা শেষে চলে গেছে তারা,
আমি শুধু অজানার পথে
পড়ে আছি একা সাথী-হারা।
উৎসবে মাতিয়াছিনু যবে
ভুলে গেছি আপনার কথা,
আজি আর কেহ নাহি ভবে
বহি শুধু বুক ভরা ব্যথা।
কে কোথায় আছ আপনার
জ্বালো জ্বালো আলোকের রেখা,
প্রেমময় দয়িত আমার—
একবার দেবে কি গো দেখা?

মৃগমদ

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

৮

হপ্তা খানেক হইল অরুণিমার জ্বর। বিছানায় সে শুইয়া আছে, বিশুষ্ক ম্লান মুখ। লাইলাকের উপর হেলিওট্রোপের ডোরা কাটা একখানি রাগ্ গায়। রুক্ষ চুলগুলি বালিসের উপর দিয়া মেলিয়া দিয়া আভা একটা চিরুণী দিয়া ধীরে ধীরে তাহা আঁচ্ড়াইতেছে।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অরুণিমা বলিল, 'হয়েছে রে তোর?'

চুল গোছ করিয়া বেণী করিতে করিতে আভা বলে, 'এই হোল বলে। বিরক্ত লাগ্ছে?'

অরুণিমা চুপ্ করিয়া থাকে। আভা ক্ষিপ্র অঙ্গুলিতে বেণী রচনা শেষ করিয়া সম্মুখে আসিয়া বসে, অরুণার শীর্ণ হাতখানি কোলের উপর উঠাইয়া লয়।

অরুণিমা বলে, 'একটা গান গা।'

'কি গাইব বল্।'

'যা তোর খুসী।'

'কীর্ত্তন গাইব?'

'গঙ্গা যাত্রার কি সময় হোল?'

'দূর্', বলিয়া আভা দুটি আঙ্গুল দিয়া অরুণিমার গালে টোকা মারে। আবার জিজ্ঞাসা করে, 'মাল্সী গাই তবে?'

'না।'

'জাতীয় সঙ্গীত?'

'না।'

'প্রাকৃতিক।'

'তা-ও না।'

'নবানুরাগের?'

'শুন্তে চাই নে।'

'তবে নৈরাশ্যের?'

'জানি না কিসের। সেদিনকার ঐ নতুন গানটা গা।'

আভা একটু হাসিয়া গান ধরিল—

(পূরবী)

তিমিরে ডুবিল চন্দ্রমা
আঁধার বনতলে জ্যোছ্‌না মরছিল
ভুবনে ছেয়ে এল ম্লানিমা।
রজনী কাঁদি তার তরে
শ্বসিয়া ওঠে হাহাকারে
নীহারে আঁখি জল ঝরে
বিষাদে ভরে গেল গরিমা।

গান শেষ করিয়া আভা বলে, 'দূর ছাই এ কি গান, মন যেন অন্ধকার হ'য়ে গেল। শোন্ আরেকটা গান গাই।'

(পরজ)

কৌন মোহে মোহনিয়া
ঘুমে মোহল তুয়া
নয়নে নয়ন তুহেঁ কৈসে মিলায়ল,
কৌন পিয়াস ভাই প্রাণে পরবেশল
যৈচন পুষ্পণ জিয়া
কৈসে পল্‌মে ছিন্ লিয়া।

মুদিত নয়নে অরুণা নীরবে অবস্থান করে। আভা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে, 'তোর মনের গোপন কথাটি আমায় বল্‌না খুলে।' বাতাসে দোল্‌ খাওয়া পল্লবের মত অরুণিমা চঞ্চল হইয়া ওঠে। হাসিয়া বলে, 'মনের কথার কি অন্ত আছে? নদীর মত কল্লোলে নিরবধি সে চলেছে। ঢেউ ওঠে আর পড়ে কেবল।'

অরুণিমার পাংশু মুখে তবু একটুখানি লালিমা দেখা দেয়। আভা হাসে বলে, 'চোর কিন্তু ধরে ফেল্লুম।' 'যাঃ', বলিয়া অরুণিমা আভার কোলে মুখ লুকায়। আভা তাহার কাণ ধরিয়া টানিয়া বলে, 'আমার কাছে লুকোস্—আমি কিন্তু প্রথম থেকেই জানি। কি তুই চাস্, কিসের জন্য ছট্‌ফট্ করিস্, দুয়োরের দিকে কাণ পেতে থাকিস্ কি জন্যে, চম্‌কে উঠিস্ আবার মাঝে মাঝে।'

অরুণিমা আধ অশ্রু আধ হাসির ভিতর অস্পষ্ট স্বরে বলে, 'তুই ভারী পাজি হয়েছিস্?'

আভা হাসে, বলে, 'তা ত বটেই। কিন্তু শোন্।'

'কি, বল।'

'ডুবই যদি দিস্, সাগরে দিস্। ডোবায় ডুবে অগৌরবের মরণ মরিস্ নে।'

অরুণিমা নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়া থাকে। অবশেষে বলে, 'ডোবাই যে—সাগর নয় বুঝ্‌ব কি করে?'

'তোর মনের হতাশা কি তোকে বলে না তা?'

'বুঝি না ভাই! মনের মায়া কে-ই বা বোঝে বল্‌। কিন্তু মেজদাদাকে ত আমি চিনি খানিকটা। গিরি ঝর্ণার মত ও চপল অশান্ত মুখর। পাথরে পাথরে ঘূর্ণি লেগে ওর মনের স্রোতে ফেনিয়ে উঠ্‌ছে দিনরাত। স্বচ্ছ খরধার অগভীর জলের তলায় উপলের রাশি সোনার রঙ্গে ঝক্‌মক্ করে। কলস্বরে চারিদিকে জাগে। কিন্তু এ সেই তলতল্‌ ছল্‌ছল্‌ গভীর অতল জল যমুনা নয় গো, যে ডেকে বলে—

'যদি গাহন করিতে চাহ এস নেমে এসো হেথা
নীলাম্বরে কিবা কাজ তীরে ফেলে
এস আজ গহন তলে, ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে—
স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর নাহি তল নাহি তীর,—'

'ঝাঁপ দিবি কি পাথরে মাথা ঠুকে যাবে।'

নীচে প্রসূনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল সে কাহার সঙ্গে উচ্চহাস্যে কথা বলিতেছে! প্রসূনের আগমন প্রতীক্ষায় তাহার সমস্ত মনটা অধীর চাঞ্চল্যে পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু প্রসূন আসিল না। নদীর উপর দিয়া জাহাজ চলিয়া গেলে বড় বড় ঢেউগুলা তটে আঘাত করিয়া মিলাইয়া যাইতে থাকে—তেমনি তাহার বুকের ভিতর আলোড়নের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল, এবং একটা গভীর গূঢ় দীর্ঘ নিঃশ্বাস উদগত হইয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

অরুণিমা বলিল, 'আচ্ছা আভা, বল্‌তে পারিস্‌?'

'কি?'

'মানুষ যখন মনে করে সে কিছুই চাইছে না, তখন—'

'তখন সে দারুণ আত্ম-প্রতারণা করে।'

'আত্ম-প্রতারণা করে?'

'নিশ্চয়!'

'কি রকম ক'রে? মন সর্ব্বসাক্ষী—মন যা জানে না—'

'তাও ঘটে। সুতরাং মনের সর্ব্বসাক্ষিত্ব প্রতিপন্ন হয় না—মন সাক্ষী প্রত্যক্ষের রাজ্যে। প্রভাতের আলো যেমন গিরি শিখরাগ্রে প্রতিফলিত হয়, আর তার সমস্ত কলেবরটা মেঘের ভিতর মিশে থাকে—তেমনি মানুষের জাগ্রত চৈতন্যের উপরই শুধু তার বুদ্ধির আলো পড়ে—সুপ্ত-চৈতন্যের সমস্তটা সানুদেশ দুর্জ্ঞেয়তার ভিতর ঢাকা থাকে।'

'মনের যেটুকু অংশ বোঝা যায়—বোঝা যায় না তার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং কেউ

যদি তোকে বলে সে কিছু চায় না—তখন ঠিক্ জানবি,—সে নিজকে অসম্ভব মহত্বের ফাঁকি দিয়ে ভুলোচ্ছে।'

'কি 'শকিং' কথা তুই বল্‌ছিস্!'

'রিয়েলিটি চিরকালই 'শকিং'। ভিক্ষার দায়ে ভগবান ভিখারী—মানুষ কি ছার! সে মুখে বলে কিছু চায় না—মনে মনে সে চারগুণ চায়!'

'তুইও পাবি বলে দিয়েছিলি?'

'নিশ্চয়—মালা পরিয়েছিলুম তার হাতে মালা পরব বলে।'

'সে মালা যদি সত্যিকারের না হোত?'

'নিজের ভিতর যদি সত্য থাকে, তবে সে মালা সত্য হয় একদিন।'

'এমনও ত দেখা যায় মাঝে মাঝে যে কিছু না পেয়েও সব দিয়েছে।'

'দু একজন সে রকম দেখা যায় বটে—কিন্তু ঐ কিছু না পাওয়ার দুঃখ তাদের বাজ-পড়া অশথের মত ঝল্‌সে দেয়। সংসার তাদের কাছে মিথ্যা হয়ে যায়—শূন্য হয়ে যায়। তারা উদাসীন নয় ত সন্ন্যাসী হয়ে দাঁড়ায়।'

'সে আর মন্দ কি!'

'হ'বি না কি তবে সন্ন্যাসী?'

'ক্ষতি কি তাতে?'

'ধেৎ! হাত যদি পাত্‌তে হয় তবে যে দিতে পারে তার দরজায়ই দাঁড়ানো ভাল—যার দেবার মত ধন নাই, বা দেওয়ার সামর্থ্যও নাই—তার কাছে ভিখ্‌মাঙতে যাওয়া মান খোয়ানো। উদসীন কি সন্ন্যাসীই যদি হ'তে হয়—তবে ভগবানের নামেই হওয়া ভাল,—দুঃখও সার্থক, ত্যাগও সার্থক।'

নীচে প্রসূন আর দুই তিনটী ছেলের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। অরুর মনে হইল প্রসূন যেন তাহার বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া গেল। সে র‍্যাগ্‌টা গায় টানিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, আভা নীরবে ব্যজন করিতে লাগিল।

(৯)

এগারো বার দিন হইয়া গিয়াছে তবু অরুর জ্বর ছাড়ে নাই। আভা তাহাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছে। মাথার কাছে সে বসিয়া বাতাস দিতেছে।

অরুণিমা চোখ মেলিয়া বলিল, 'আভা, লক্ষ্মীটি, তোর বাতাস কর্ত্তে হবে না—মাথাও টিপতে হবে না—একটা গান গা।'

'কি গান গাইব? (হাসিয়া) ব্রহ্ম সঙ্গীত—কীর্ত্তন?'

'গঙ্গা-যাত্রার সময় কি হয়েছে?'

'মোটেই না। মাল্‌সী গাইব ?'

'না।'

দরজার বাহির হইতে অনুপম জিজ্ঞাসা করে, 'আসব ?'

আভা বলে, 'আসুন।'

'অনুপম ঘরে ঢুকিয়া শয্যায় শায়িতা অরুণিমার দিকে বিস্ময়ে তাকায়। বলে 'একি, কবে থেকে অসুখ ?'

আভা বলে, 'দিন সাতেক হবে।'

অরুণিমা বলে, 'এ-দিক্ পানে এলে ত জান্‌বেন! কতদিন পরে এলেন বলুন দেখি! বসুন ঐ চেয়ারটাতে। না বল্লে হয়ত লজ্জায় বসবেনই না।'

দু চার কথার পরে আভা কর্ম্মান্তরে চলিয়া যায়। অরুণিমা বলে, 'কি রকম ভয়ে ভয়ে আপনি 'আস্‌ব' জিজ্ঞাসা করেন!'

'নির্ভয়ে পারি না, কাজেই ভয়ে ভয়ে বলি। সব সময়ে 'হাঁ' না ও ত বলতে পারেন!'

'হাঁ এর বদলে না কর্‌লে বেঁচে যান, না দুঃখিত হন ?'

'নিস্ফলতা যে আকারেই আসুক না কেন, কিছু না কিছু পীড়াদায়ক হয়ই।'

'স্বীকার কর্চ্ছেন তবে ?'

অনুপম হাসে। আভার পরিত্যক্ত পাখা খানি হাতে লইয়া বলে, 'বাতাস দেবো ?'

'দিন্। ঐ বেদানা কটা ছাড়িয়ে দিন্ ত আগে। রোগের সময় স্বার্থপরতা খুব মিষ্টি লাগে। লোকের ওপর জুলুম কর্ব্বার বেশ ফ্রি লাইসেন্স পাওয়া যায় তখন।'

'আপনার এ কথা কয়টি 'মার্ক টোয়েনের' রুগীর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়।'

'তাই নাকি ? আমি কিন্তু মার্ক টোয়েন পড়িনি।'

'কাল নিয়ে আস্‌ব বই খানা, আপনাকে পড়ে শোনাব।'

'আস্‌বেন তা'হলে কাল ?'

অনুপম হাসিয়া বলে, 'যদি অনুমতি দেন্।'

অরুণিমা হাসে, বলে, 'ওটুকু ছাড়্‌বেন না তবু।'

অনুপম এক মনে বাতাস দিতে থাকে।

অরুণিমা বলে, 'কখন ও রোগে ভুগেছেন ?'

'তা ভুগেছি বৈ কি!'

'দীর্ঘকাল ?'

'দীর্ঘকাল।'

'তাহ'লে আপনি বুঝ্‌বেন, রোগের সময় মানুষের কী সহজে আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে—গুরুর উপদেশ, বেদপাঠ কঠোর তপস্যা কিছুতেই যা নাকি ঘটতে চায় না।'

'কথাটা কিন্তু বুঝ্‌লুম না।'

'বুঝলেন না, ঐ সময় আপ্‌না হ'তেই হৃদয়ঙ্গম হয়—এই যে আমার এই আমি—লক্ষ বন্ধনে যাকে আবদ্ধ দেখ্‌তে পাচ্ছি—জগৎ সংসারের কোনো বন্ধনেই সে বদ্ধ নয়, সে নিঃসঙ্গ, একাকী, সম্পর্ক বিরহিত, হয়ত অজর অমর ও।'

অনুপম হাসিতে থাকে বলে, 'তা কতকটা নিবিষ্ট থাকে, ততক্ষণ অন্তর্মুখী হ'বার অবকাশ পায় না। বহির্জগৎ বৈচিত্রের আকর্ষণে মনকে নিজের দিকে টেনে রাখে—বাঁধা পুকুরের মত চারিদিকে থাকে তার ক্ষুদ্রতার আবেস্টন, তুচ্ছতার সীমা। বস্তুর সেই সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে জেগে উঠা মনের বিস্তীর্ণ পাখায় ঠোক্কর লাগে—তখন সে অসীমের সন্ধানে মাটি ছেড়ে আকাশে ডানা মেলে।'

যে আত্মবিস্মৃতির ক্ষণে অনুপম অবাধে আত্ম প্রকাশ করে, সেই বিরল দুর্লভ ক্ষণটি তাহার গ্রন্থি-বিরল বচনের জালে ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া অরুণিমার মুখে কৌতুক ও আনন্দে মেশানো একটু খানি হাসি ফোটে। পাছে কিছু বলিলে অনুপম সহসা সজাগ হইয়া তাহার দুর্ভেদ্য মৌন গাম্ভীর্য্যে আপনাকে সম্বৃত করিয়া লয়, এ জন্য যে কথা বলিতে চায় তাহা বলিতে গিয়াও ফিরাইয়া লইয়া চুপ করিয়া থাকে।

কতক্ষণ পরে আপ্‌নিই জিজ্ঞাসা করে,'নির্ঝরের তলায় উৎসের মত বটে তার কারণ ও আছে। মন কতক্ষণ বাইরের দিকে—আচ্ছা বলতে পারেন, জীবনের স্রোতে যারা আকাশমূলীর মত ভেসে চলে, তাদের লাভ বেশী না যারা তল পর্য্যন্ত ডুবে মূল শুদ্ধ হাৎড়ে টেনে আনে,—তাদের?' 'এত বলা শক্ত।'

'আমার মনে হয়, যারা স্রোতে ভেসে চলে, তাদের সাঁতার কেটে পার হবার ক্লেশ ভোগ কর্ত্তে হয় না একথা যেমনি ঠিক্‌, আবার এও ঠিক্‌ যে জল স্রোত তাদের যে দিকে টেনে নিয়ে যায়, অসহায় ভাবে সেই দিকে ভেসে যায়—কোনো নির্দ্দিষ্ট কূলে তারা পৌঁছায় না।'

'তবেই ত বিপদ! জলের উপর পদ্ম ফোটে অপরূপ মনোহরণ রূপ তার, কিন্তু নীচে তার কণ্টকিত মৃণাল। মানুষের জীবন যেন ঠিক্‌ নদীর মত। ওপরে আলোর জল ঝল্‌ মল্‌ করে, আকাশের রং লাগে, ঢেউ উঠতে থাকে পড়তে থাকে, জোয়ার ভাটা হয়—কিন্তু জলের নীচে নিঃসীম নীরবতা অনন্ত অন্ধকারের বিভীষিকা!'

অরুণিমার কথার ভিতর তাহার নিগূঢ় চিন্তার ধারাটিকে অনুপম ব্যগ্র হইয়া ধরিবার চেষ্টা করে। জীবন সরোবরের অন্ধকার তলায় নামিয়া কোন্ পদ্ম সে তুলিতে অভিলাষী হইয়াছিল, এবং তাহার কমল-কোমল অঙ্গুলি কোন্ কণ্টকে ক্ষত হইয়াছে,—বারবার সে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে।

অনুপমকে নীরব দেখিয়া অরুণিমা বলে, 'আপনি মাঝে মাঝে এমন চুপ করে থাকেন—আত্মস্থ হয়ে কি যে ভাবেন! শুন্‌তেও পান্ না।' অনুপম লজ্জিত হইয়া বলে, 'না, আমি ঠিক শুন্‌ছি ত!'

'পরীক্ষা নেব, কি শুনেছেন!'

'নিন্' বলিয়া অনুপম হাসে।

'আপনাকে দেখ্‌ছি এতদিন থেকে, কিন্তু আপনাকে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। শামুকের মত খোলার ভিতর আপনি যেন আপনাকে আবৃত করে রেখেছেন। ভগবান যাকে শামুক করে গড়েছেন, তার মাছ হয়ে সাঁতার দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা'—বলিয়া অনুপম চুপ করিয়া থাকে। সহসা মনে পড়ে সে আসিয়াছিল প্রসূনের সঙ্গে দেখা করিতে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার নামোল্লেখও সে করে নাই। মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে, 'প্রসূন কোথায় তার সঙ্গে ত দেখা হোল না?' এখানে আসার তাহার মুখ্য হেতু প্রসূন, এই কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। অরুণিমা বলে, 'প্রসূন বাবু চৌধুরীদের সঙ্গে মুসৌরি গেছেন—জানেন না বুঝি?'

অনুপম বিস্মিত হইয়া বলে, 'মুসৌরি গেছে? কবে?' 'দিন তিনেক হোল।'

অনুপম চুপ করিয়া থাকে। যে প্রশ্নটা তাহার মনে ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে আপনার অজ্ঞাতসারে ও পাছে তাহার একটু আভাস অরুণিমার কাছে প্রকাশ পায়, এই ভয়ে সে অতিরিক্ত মাত্রায় আড়ষ্ট হইয়া থাকে।

অরুণিমা বলে, 'আপনি খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, নয়?'

কথাটা অনুপম স্বীকার করিবে না অস্বীকার করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া কোনো উত্তরই দেয় না।

অরুণিমা কতক্ষণ পরে নিজের মনেই বলে, 'সহজে আমরা বুঝি! অথচ এই ভুল বোঝাটা বারণ করার জন্য কত নীতি, কত উপদেশ, কত মহাজনের বাণী, কত ম্যাক্সিম, কত মটো শিখি যে তার অন্ত নেই। কিন্তু মন সে জালে আটকায় না, রুই কত্‌লার মত জলে ঘায়েল করে কখন ফস্‌কে যায় তার ঠিক নেই।' অনুপমের বক্ষ স্পন্দিত হইতে থাকে। অরুণিমার অকপটে ব্যক্ত এই কথা কয়টির মধ্যে যে গভীর বিশ্বস্ততার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে, তাহা তাহার মনের অযত্ন রক্ষিত সব প্রতিবন্ধক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ করিয়া তাহার অবস্থাটা হয় সেই অনিপুণ মাঝির মত, যে তীরের সঙ্গে নৌকা বাঁধিতে গিয়া তরঙ্গ তাড়নে মাঝ দরিয়ায় গিয়া পড়ে।

প্রসূণের কথায় একটা অবলম্বন সে খুঁজিয়া পায় এবং তাহার ভয় সন্ত্রস্ত মন তাহাকে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরে। বলে 'মুস্কিল হচ্ছে কি জানেন যা আমরা ভুল মনে করি—তাই যে ভুল নয় তার সম্বন্ধে ও তো কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।'

অরুণিমা বিষণ্ন হাসি হাসে।

অনুপম বলে, 'প্রসূণ এখন চলে যাওয়াতে আমি খুবই আশ্চর্য্য হয়েছি কিন্তু ও ঐ রকম খেয়ালী তালভোলা লোক মন ঘোরে ওর কল্পলোকে, ব্যবহারিক জগতের কথা ও ভুলে যায়।' বলিয়াই আবার কথাটা যথোপযুক্ত হইল না ভাবিয়া লজ্জিত হইয়া ওঠে।

অরুণিমা বলে, 'কবির মনের মানস,—হাওয়ায় উড়ে চলে, মর্ত্তের মাটিতে সে অচল হয়ে থাকে না।'

নীরার কথাটা দুজনেরই মনে মনে জাগে কিন্তু সাহস করিয়া কেহই নামটা উচ্চারণ করে না।

কতক্ষণ পরে অরুণিমা বলে, 'প্রসূন বাবুর সঙ্গে আপনার অনেক দিনের আলাপ নয়?

অনুপম ঈষদ্ধাস্যে বলে, 'সন তারিখ দিয়ে যদি পরিচয়ের পরিমাণ কর্ত্তে হয় তবে অবশ্য বল্‌তেই হয় ওর সঙ্গে আমার বহুদিনের চেনা। ফার্ষ্ট্‌ ইয়ারে উঠেই ওর সঙ্গে আলাপ, কিন্তু আমাদের পুরুষদের চেনা হচ্ছে বৈঠক খানার আসরের চেনা। ওতে কিন্তু অন্দর মহলের সীমানার বাইরে তার স্থান। পোষাকী কাপড় চোপড়ের মত মনের থাকে সেখানে পোষাকী চেহারা, কৃত্রিম রূপের কাছে অকৃত্রিম আসল রূপটি থাকে ঢাকা। কাজেই বাইরের আলাপে আসল মানুষটিকে কতটা চিনি— তা বলা শক্ত। হয়ত কিছুই চিনি না।'

নিঃস্তব্ধ ঘরের ভিতর অরুণিমার দীর্ঘশ্বাস পতনের অস্পষ্ট শব্দটি শুনিতে পাওয়া যায় অনুপম ব্যথিত মনে প্রসূনের কথা ভাবিতে থাকে।

ক্রমশঃ
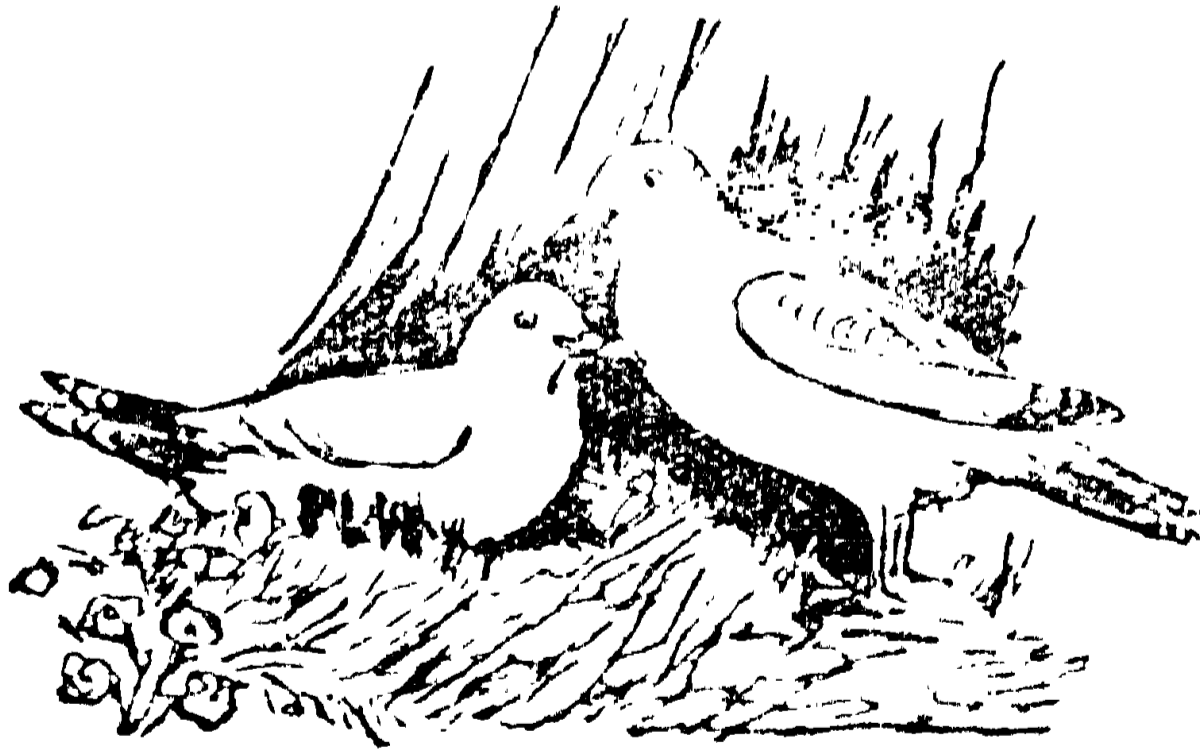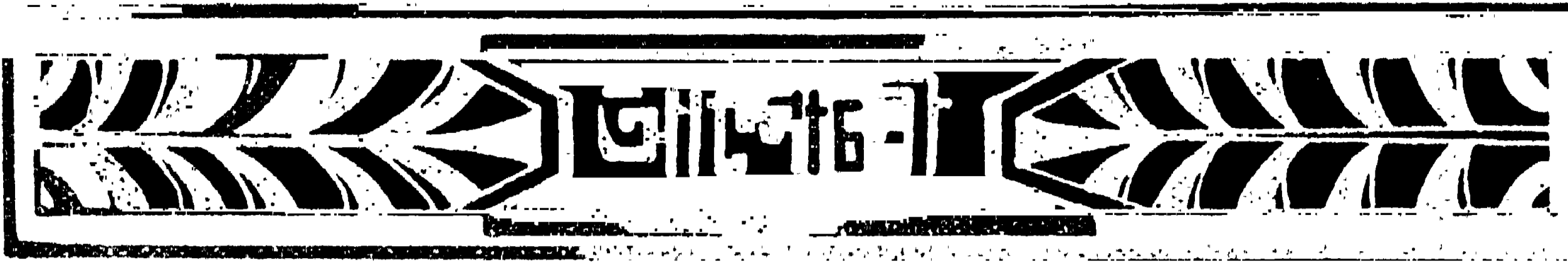
বিজয়ার অভিবাদন

শারদীয়া পূজা হইয়া গেল। সুখে হউক দুঃখে হউক ভাঙ্গা মণ্ডপে পূজার আয়োজন নিয়ম রক্ষা মাত্র। তবু তাহার জন্য যে প্রতীক্ষা, উৎসবের আনন্দ অনুভব করিবার প্রয়াস তাহা শেষ হইয়া গেল বিসর্জ্জনের সাথে। যাঁহারা সুখে দুঃখে আমাদের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, নানা দুর্য্যোগ অশান্তি ঝড় ঝাপ্টার মধ্যেও এই নব প্রচেষ্টা, আমাদের জয়শ্রীকে বাঁচাইয়া রাখিতে সাহায্য করিয়াছেন, যাঁহাদের সহানুভূতি জয়শ্রীকে নব জীবন দান করিয়াছে, তাঁহাদের সকলকে আমাদের বিজয়ার অভিবাদন জানাইতেছি। আমরা আশা করি, জয়শ্রীর প্রত্যেক গ্রাহিকা, লেখিকা ও বিজ্ঞাপনদাতৃগণের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহানুভূতি চিরদিনই পাইব।

মহাত্মার অনশন ও অনুন্নত সমাজের সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিষ্পত্তি

সমবেত প্রচেষ্টার ফলে অনুন্নত সমাজের সহিত হিন্দু সমাজের সন্তোষজনক রফা হইয়া গিয়াছে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে কতকগুলি আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া প্রধান মন্ত্রী গোলমাল নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছিলেন, পুণাচুক্তির ফলে তাহা প্রবর্ত্তিত হইল। তবে এ কথা তিনি বলিয়াছেন যে এই ব্যবস্থাও সাময়িক ভাবে করা হইল। যে ভাবে এই আসন নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবৃতি দেওয়া হইল :—

মান্দ্রাজ—৩০, বোম্বাই ও সিন্ধু প্রদেশ—১৫, পঞ্জাব ৮, বিহার ও উড়িষ্যা—১৮, মধ্য প্রদেশ—২০, আসাম—৭, বাঙ্গলা ৩০, যুক্ত প্রদেশ ২০, মোট ১৪৮।

পৃথক নির্ব্বাচন হইলে বৃহৎ হিন্দু সমাজের মূলে ঘা পড়িত এবং আভ্যন্তরিক সাম্প্রদায়িক সমস্যা, যাহা হিন্দু সমাজে এখন পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই, তাহাই হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে পঙ্গু ও দুর্ব্বল করিত, তাই মহাত্মা অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে অবশ্য সুফল ফলিয়াছে সত্য—নির্ব্বাচন পৃথক না হইয়া যুক্ত ভাবে হইতে পারিবে এবং সকল প্রদেশেই অনুন্নত সমাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আসন থাকিবে। তাহা হইলেও ইহার মধ্যেও বিভেদ রহিয়াই গেল। হিন্দু এক মহাজাতিরূপে যাহাতে গড়িয়া উঠিতে পারে তাহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, এবং তাহার জন্য সমবেত শক্তি ও ঐকান্তিক চেষ্টা নিয়োগ করা প্রয়োজন। একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না, হিন্দুস্থান ভিন্ন হিন্দুর অন্যত্র গতি নাই, বন্ধু নাই, সহায় নাই, কেবলমাত্র হিন্দুকেই হিন্দুজাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। শক্তি, সাহস, বলবীর্য্য সংহত করিয়া, দুর্য্যোগ দুঃখ-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। এরূপ স্থলে অর্দ্ধেক জাতিকে অনুন্নত বলিয়া অনাচরণীয় আখ্যা দিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়া নিজেরাই হীনবীর্য্য হইয়া যাইতেছি, এ বিষয়ে অবিলম্বে দৃষ্টি না দিলে আরও হীনবল হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা।

অবনত শ্রেণী—"অবনতশ্রেণী" নামেই রহিয়া গেল কেবলমাত্র যদি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কোনদিন করায়ত্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বকার ব্যবস্থা হইতে আর একটু বেশী পরিমাণ সুবিধা পাইবে—এইমাত্র!

এ বিষয় বাঙ্গলা হইতে অন্য প্রদেশ—বিশেষ করিয়া মাদ্রাজে অবনত শ্রেণীর সমস্যা অত্যন্ত জটিল। কিন্তু কেন বোঝা গেল না, বাঙ্গলা এবং মাদ্রাজকে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সমান সংখ্যক আসন দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর হইতে অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে, এবং কতক পরিমাণে তাহার সুফলও দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে বাঙ্গলা দেশে এবং ভারতের সর্ব্বত্রই মন্দিরের দ্বার অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে—নানা স্থানে তাহাদের সহিত একত্রে পংক্তি ভোজন প্রভৃতি করা হইয়াছে। ইহা যে আশার কথা তাহাতে সন্দেহ নাই—তাহা হইলেও মনে হয়, যে আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা আজ সমগ্র দেশময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা যেন কেবলমাত্র দুদিনের হুজুগে পর্য্যবসিত না হইয়া চিরদিনের ব্যবধান উচ্ছেদ-কল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে।

বঙ্গদেশে সৈন্য সমাবেশ ও অর্ডিনান্স আইন

বাঙ্গলা দেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দমনের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা, অর্ডিনান্সকে আইনে পরিণত করা প্রভৃতি সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সরকারী কর্ম্মচারী হত্যা, রাজনৈতিক চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অরাজকতামূলক অপরাধের প্রশমন হইল না দেখিয়া বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে বাঙ্গলাদেশের মধ্যে ছয়টী জেলাতে সৈন্যদল রাখিার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অন্য সর্ব্বত্র ভারতীয় সেনাদল থাকিবে, কেবলমাত্র ঢাকার জন্য বৃটিশ সৈন্য থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন থাকে তাহা বুঝিয়া ইহাদের রাখা হইবে—অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইহারা নিরীহ সহরবাসিগণের প্রতিবেশী হইল।

যাহারা প্রকৃত অপরাধী তাহাদের শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ কাহারও নাই, তবে একথা লইয়া বহুবার আলোচনা হইয়া গিয়াছে যে এক বিপ্লব দমনের জন্য অন্য পক্ষও সেই দমন-নীতির আশ্রয় লইলে সাময়িক ভাবে দেশবাসিগণ উপদ্রুত নিপীড়িত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত অশান্তির মূলোচ্ছেদ হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। অন্য সকল পন্থা ব্যর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত সৈন্য সমাবেশ দ্বারা আরও ব্যাপক ভাবে দমনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না। জনসাধারণের ভীতি উৎপাদন ভিন্ন ইহাও যে কতদূর কার্য্যকরী হইবে তাহা বলা যায় না।

যাহারা এইরূপ অশান্তির সৃষ্টি করে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থাতেই করে,—কোন একটী ঘটনার প্রকাশই তাহাদের অস্তিত্বকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কাজেই সর্ব্বত্রই দেখা যায়, যাহা হইবার তাহা হইয়া গেলে তাহার পর প্রয়োজন হয় যাহারা প্রতিকার করিবে তাহাদের। কিন্তু সত্যই কি ইহাতে কিছু প্রতিকার হয়? ইহা অপেক্ষা যদি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা প্রশমনের গঠনমূলক ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে হয়তো অল্পায়াসে এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। প্রথম কথা দেশের সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি এবং দেশে অবিলম্বে দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করা। আর একটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইল দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও বেকার সমস্যার সমাধান। এ বিষয়ে দেশের চিন্তাশীল মনীষীদের সতর্কবাণী বহুবার উচ্চারিত হইয়াছে। সেদিনও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই প্রকার যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত ব্যবস্থার কথাই এই সঙ্কটময় অবস্থা হইতে মুক্তির একমাত্র পন্থা বলিয়া স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন।

কাজেই অশান্তি অরাজকতা দূর করিতে হইলে কেবলমাত্র দমন ও ভীতি-প্রদর্শন নীতি দ্বারা সব সময় সুফল নাও ফলিতে পারে, এবং সময় থাকিতে এ বিষয় চিন্তা করিলে, ও

সেই অনুযায়ী সুচিন্তিত প্রণালীতে কার্য্য করিলে নানারূপ অপ্রীতিজনক অবস্থা হইতে দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষই রক্ষা পাইতে পারে।

বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিয়োগ

সময় বিশেষে পক্ষপাতিত্ব যে কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে দেখিলে দুঃখ হয়। বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলারের ভ্রাতুষ্পুত্র সাহেদ সুরাবর্দ্দি বাগীশ্বরী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। এ সকল অপ্রীতিকর বিষয় লইয়া আলোচনা সর্ব্বক্ষেত্রে শোভন নয় ইচ্ছাও করে না, তবু দু একটী কথা এ বিষয় উল্লেখ করিবার আছে। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষীয় শিল্প-কলা, প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্যই উক্ত অধ্যাপক নিয়োগ। সুরাবর্দ্দী সাহেবের যে সকল গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গেল সেগুলি সম্বন্ধে যোগ্যতা থাকা যথেষ্ট শক্তির কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোনটাই বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া মনে হইল না। দ্বিতীয় কথা, যাঁহার এতো গুণ আছে গুণের যোগ্য মর্য্যাদা আমাদের দেশে এখনও দেওয়া হয় বলিয়া মনে হয় না। সামান্য একটা অধ্যাপক পদের জন্য, অসত্যের আশ্রয় লওয়া কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত পত্র না দেখিলে এ কথা বিশ্বাস করিতে সাহস হইত না। এই পদের জন্য যোগ্যতর ও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অমনোনীত করিয়া সাহেদ সুরাবর্দ্দীকে অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশেই অপ্রীতিজনক ও অবাঞ্ছনীয় হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন

গত আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনের নিজ গৃহ নির্ম্মাণের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে মাননীয়া শ্রীযুক্তা অবলা বসুর একখানি রিপোর্ট আমরা পাইয়াছি, স্থানান্তরে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের বিধবাদের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়—শিক্ষার অভাব ও অজ্ঞতা, তাহাদের আত্মনির্ভরশীল হইতে, অর্থোপার্জ্জনের উপায় হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। ফলতঃ দিনের পর দিন অসহায় পরনির্ভরশীল বিধবাদের সংখ্যা বাড়িয়া সমাজকে ভারগ্রস্ত করিয়া তোলে মাত্র। তাহাদের এই অবস্থা অনুভব করিয়া শ্রীযুক্তা বসু মহাশয় যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে আমাদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমরা আশা করি, বাণী-ভবন দিন দিন উন্নত হইয়া উঠিয়া বাংলার সুদূর পল্লী পর্য্যন্ত তাহার কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত ও বিস্তৃত করিয়া তুলুক। এইরূপ সমাজ-হিতকর ও নারী জাতির উন্নতি বিষয়ক যত অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, ততই মঙ্গল।

বাংলাদেশের গ্রামের হাইস্কুলে বালক বালিকাদের একত্র অধ্যয়ন ব্যবস্থা (Co-Education)

নানাকারণে এবং বিশেষ করিয়া প্রয়োজনের জন্যই মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপক ভাবে করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। সহরগুলি এ বিষয় আশানুরূপ না হইলেও খানিকটা পরিমাণে এ অভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। যদিও গাড়ীতে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকায় দরিদ্র পিতামাতা অনেকেই ইচ্ছা ও প্রয়োজন সত্ত্বেও কন্যাকে পড়াইতে সক্ষম হন না। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলার পল্লীগ্রামে প্রকৃত অভাব রহিয়া গিয়াছে, যাহা দূর করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই ও হইতেছে না।

কোন গ্রামে মেয়েদের জন্য পৃথক হাই স্কুল বা এম্-ই স্কুল বর্ত্তমানে করা ও চালানো সম্ভব নয়। ইহার মস্ত বড় অন্তরায়, বোধ হয় প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, হইতেছে দারিদ্র্য। কাজেই ছেলেদের

স্কুলে ও ছেলেদের সঙ্গে একত্র পড়িবার ব্যবস্থা না করিলে গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার আর কোন উপায় নাই। যদি ইহাতে কিছু গরল উঠে তাহা সমাজ নীলকণ্ঠের মত হজম করিতে পারিবে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে অমৃত উঠিবে তাহা বাংলার প্রত্যেকটী গৃহকে শান্তি ও জ্ঞানের কেন্দ্র করিয়া তুলিবে, বাংলার সমাজ প্রাণবান্ হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ গ্রামের ছেলেমেয়েদেব পরস্পরের মধ্যে বাল্যকাল হইতেই একটী অতি-পরিচয়ের সহজ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, সহুরে ছেলেমেয়েদের মতন তাহারা পরস্পর অপরিচিত নয়, কাজেই সেখানে নীতিবাদীদের আশঙ্কা বা আতঙ্কের সম্ভাবনা খুবই কম বলিতে হইবে।

ইহার প্রয়োজনীয়তা গ্রামের প্রত্যেক পিতামাতা অনুভব করেন। সেইজন্য কোন কোন স্থলে মেয়েরা ছেলেদের স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া কৃতিত্ব দেখাইতেছে। সে-সব স্কুলের ক্লাশে মেয়েদের পৃথক আসন নির্দ্দিষ্ট আছে। নীচের ক্লাশে বিশেষতঃ পাঠশালায় ছেলেমেয়েরা অনেকস্থলেই বহুকাল হইতে একত্রই পড়িয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে লোকে সাহস করিয়া উঁচুক্লাশে মেয়েদের এরূপভাবে পড়াইতে পারিতেছে না। এইজন্য সর্ব্বত্র প্রবল আন্দোলন আবশ্যক। এ বিষয়ে আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, এবং আশা করি, চেষ্টা করিলে সর্ব্বত্র মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাইবে। নূতন সেসন আসিতেছে। এখন হইতেই এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

আন্দামানের নূতন যাত্রী

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখিতে পাইলাম যে, বঙ্গদেশ হইতে শীঘ্রই আরও সত্তরজন রাজনৈতিক বন্দীকে আন্দামানে প্রেরণ করা হইবে, সেইসঙ্গে শ্রীমতী বীণা দাসও আছেন। আশাকরি, একথা ভিত্তিহীন, এবং বিশ্বাস করিতে না হইলেই আন্তরিক আনন্দের কারণ হইবে। বাংলাদেশে জেলের অভাব নাই, এবং যেখানে যেমন ভাবে ইচ্ছা রাখিবার ব্যবস্থারও ত্রুটী নাই। তাহা সত্বেও একটী অসহায় মেয়েকে এমন ভাবে সুদূর আন্দামানে প্রেরণ না করিলে গভর্ণমেণ্ট কি যে বিপন্ন হইবেন আমরা তাহা বুঝিলাম না। আন্দামানে যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাদের, যাহারা বৈপ্লবিক অপরাধে দণ্ডিত। বাংলাদেশে এরূপ অপরাধের জন্য মাত্র তিনটী মেয়ে দণ্ডিত হইয়াছে। এতো অল্পসংখ্যক মেয়েকে নির্ব্বাসন দিবার ব্যবস্থা যে সুবিচারের কার্য্য হইবে না তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আজিকার এই সভ্যতার যুগে অন্ততঃ যে কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই তরুণী ভদ্রনারীদের প্রতি মনুষ্য-সুলভ ব্যবহার আশা করা যায় না কি?

বাংলার নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য আবেদন

কিছুদিন হইল কলিকাতার এ্যালবার্ট হলে শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবীর নেতৃত্বে একটী সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, বংলার অসুস্থ নেতাদের বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্ত জে, এম সেনগুপ্ত ও ও শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসুর অবিলম্বে মুক্তির জন্য আবেদন করা। সভানেত্রী মহাশয়া সুন্দর সংক্ষিপ্ত একটী বক্তৃতায় এই প্রস্তাব করেন যে, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থাকিয়া যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র আরোগ্যলাভ করেন সরকার বাহাদুর তাহার ব্যবস্থা করুন, এই মর্ম্মে আবেদন করা হোক। বাংলার এই নেতৃদ্বয়ের সঙ্কটময় পীড়ার সময় গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীর এই আকুল আহ্বান উপেক্ষা করিবেন না, আমরা ইহাই আশা করি। এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটু বক্তব্য এই যে, অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দী যাহাদের অসুস্থতার সংবাদ প্রাত্যহিক সংবাদপত্র খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, চিকিৎসার জন্য তাহাদের মুক্তি দেওয়া সরকারের উচিত বলিয়া মনে করি।

লক্ষ্ণৌয়ে মুস্লিম সম্মিলন—

লক্ষ্ণৌয়ে সর্ব্বদল মুস্লিম-সম্মেলনের সন্তোষজনক ভাবে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সকল দলের সমর্থন যোগ্য ও গ্রহণীয় মীমাংসা এখনও হয় নাই, যুক্ত-নির্ব্বাচনে শিখদের অতিরিক্ত সদস্য পদলাভের দাবী খুব প্রবল। তাহা হইলেও তাঁহারা একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় স্বীকৃত হইতে সম্মত আছেন এবং অন্যান্য প্রস্তাবও আলোচনার মধ্যে রহিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সম্মেলন সম্পর্কে মহাত্মাজীর মুক্তি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তাঁহার মুক্তি ভিন্ন কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নয়, এজন্য মৌলানা সৌকতআলি বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মুক্তির জন্য আবেদন করিয়াছেন।

এই মীমাংসা সম্পর্কে তাঁহারা যাহাতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনা করিবার পূর্ণ সুবিধা পাইতে পারেন, সেইহেতু মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে 'তার' করিবার জন্য ভারত লীগের পক্ষ হইতে মি. বার্টাণ্ড রাসেল এবং মিঃ হ্যারল্ড ল্যাস্কি, সাপ্রু ও জয়াকরের নিকট এই মর্ম্মে তার করিয়াছেন—"মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যদি আপনাদের অনুরোধ রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আপনারা লণ্ডন বৈঠকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করিবেন।" মুসলমান নেতৃবৃন্দ সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছেন যে, অন্যান্য দাবী যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে পৃথক নির্ব্বাচনের জন্য দাবী করা হইবে না। মহাত্মার মুক্তি এখন অন্য সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিবে। কাজেই সরকার বাহাদুর দেশবাসীর আবেদন রক্ষা করিলে সকল দিক রক্ষা পাইবে।

পরলোকে শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণকমল ও গোলাপলাল

গতমাসে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর পরলোকে গমন করিয়াছেন, এবং তাহার পর সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও গোলাপলাল ঘোষের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা সকলেই বহুকাল দেশ ও দশের সেবা করিয়া পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। রিপন কলেজের অধ্যক্ষ অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগরের ছাত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। গোলাপলাল ঘোষের নাম অমৃতবাজারের সঙ্গে চিরদিনের জন্য সংশ্লিষ্ট থাকিবে। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতে শ্যামসুন্দর ভারতের নব জাগরণে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্যামসুন্দর শ্রীঅরবিন্দের সহকর্ম্মী ছিলেন এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে কোনদিন সুবিধাবাদকে স্থান দেন নাই। ভারতের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্টে দৃঢ় বিশ্বাসী—তাহার কৃষ্টি ও সমাজ গঠনে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় অবিচলিত নিষ্ঠা তাঁহার ছিল, পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবার প্রয়াসকে তিনি কোন দিন সমর্থন করেন নাই। সাংবাদিক হিসাবেও তিনি এই মতবাদই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ হইতে কোন কারণে কোন অবস্থাতেই তিনি তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই—সংবাদপত্র সেবীদের ভিতরেও শ্যামসুন্দর বরাবর অগ্রগণ্য এবং প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়া ছিলেন। স্বদেশী যুগে 'যুগান্তর' 'সন্ধ্যা' ও 'প্রতিবাসী' এবং পরবর্ত্তীকালে 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা তাঁহার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

Printed & Published by Bibhabati Sen, 23 Wyer Street, Wari, from Wari Printing Works, Dacca.

সূচীপত্র

সূচীপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ	অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯	অষ্টম সংখ্যা

অন্তরতম

শ্রীমমতা মিত্র

যার তরে মন কাঁদে অনুখণ
সেই যে গো নাই পাশে,
স্মৃতির মাঝারে রয়েছে সে বেঁচে,
নিশীথ স্বপনে আসে।
এমনি করিয়া কাটে দিন দুখে,
বুকের মাণিক নাহি পাই বুকে,
ব্যাকুলতা যে গো বেড়ে ওঠে মোর
তাহারে পাবার আশে।

চোখের আড়াল হ'য়ে গেছে সে যে
পাই নাক' খুঁজে আর,
তীব্র বেদনা বক্ষ-বীণায়
তোলে শুধু ঝঙ্কার।
বাহিরে কেবলি খুঁজিয়া বেড়াই,
যত চাই তারে ততই হারাই,
ব্যর্থতা যে গো নিবিড় করিয়া
বাজে বুকে বারবার।

বাহিরে সে আজ দূরে গেছে চ'লে
হ'য়ে গেছে পর সম,
আঁখি আর তারে না পায় দেখিতে,
মনে সে এসেছে মম।
অজানিত রসে সুগভীর ক'রে
হৃদয় আমার দিয়েছে সে ভরে,
অন্তর আজ পরশ ক'রেছে
মোর অন্তরতম।

মাঝারি

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

কোন লেখার সঙ্গে অন্য লেখার তুলনা করতে গেলে লোকে বলে, 'ওর লেখা থার্ডরেট' কিংবা তার চেয়ে ও নিরেশ। কিন্তু লেখকের সংখ্যা দেশে কম নেই এবং লেখিকারও। আর আমরা পড়িও প্রায় বৈশ্বানরের মতনই। যারই একটু পড়বার ঝোঁক আছে সে শ্রীমতীদের আর শ্রীমানদের আর অমর প্রতিভাবানদের লেখা সবই পড়ে, আর তা পড়ার ঝোঁকেই পড়ে, তা প্রথম শ্রেণীর বা চতুর্থ শ্রেণীর যা-ই হোক-ভাল লাগুক বা না লাগুক।

বড়-বড়দের কথা বা শ্রীযুক্তদের কথা আমার আলোচ্য নয়। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের লেখা—আর আমরা কেমন লিখি।

আজকালকার দিনে পুরুষরা লেখেন বটে, কিন্তু আমাদের যত সম্মান তেমন তাঁদের নয়। আমাদের অবশ্য লেখার কেউ দাম বড় একটা দেয় না, দরও বাজারে কাঞ্চন মূল্যে তেমন নয়, কিন্তু মহিলা সংখ্যা বলে যে একটী ক'রে সংখ্যা বেরোয় (অবশ্য ছোট মাসিকের) তা' প্রায় পূজার সংখ্যার মত বিকায়। তাতে নাই যে কি আর আছে যে কি, তা' বলা যায় না। কেউ একখানি কিনে দেখলেই বুঝবেন।

কিন্তু তবু মেয়েদের লেখা আজ অবধি মধ্যম শ্রেণীর পুরুষদের লেখার মতও হ'ল না, উৎকৃষ্টতর সাহিত্য বলেও সাহিত্যের একদিক অধিকার করল না, উৎকৃষ্টতম বা সর্ব্বোত্তম পর্য্যায়ে ত নয়ই।

কেউ হয়ত বলবেন, বা ভাববেন, মেয়েদের বিদ্যাবুদ্ধি উৎকর্ষের কোনো সুযোগ নেই বা দেখাশোনার কোনো ক্ষেত্র নেই, কি অবকাশ নেই, এমনিতর নানাকথা। কিন্তু লেখার দিক দিয়ে যা' আমরা পড়ি আর পড়তে ভালবাসি, তাতে গলদঘর্ম্ম হবার মতন পাণ্ডিত্য-ওয়ালা বই-ই পড়ি আর পড়তে ভালবাসি, এটী সত্য নয়। নিতান্ত ঘরোয়া সাদাসিদে সমস্যা থাক বা না থাক, ভাল সুন্দর গল্প বা লেখা পড়তে সবাই ভালবাসেন। নাই বা তাতে বড় বড় তত্ত্ব কথা বা সমস্যার কথা রইল। আর এই ধরণের গল্প লিখতে যে খুব বেশী পাণ্ডিত্যের দরকার আছে তাও বোধ হয় নয়।

কিন্তু প্রতিদিন ধরে যাঁরা সবাই লিখছেন, লেখার চর্চ্চা করছেন তাঁদের হাত দিয়ে যা' বেরুলো আর বেরোয়, তা ঐ ওঁদের তৃতীয় শ্রেণীর অনুকরণ। আদর্শ হিসেবেও—এমনিও। নকল বলতে কেউ যেন মনে না করেন এসবই তুলে নেওয়া। এ তা নয়, এ হচ্ছে সেই শ্রেণীর আদর্শ আর ধরণকে আয়ত্ব করে লেখা।

আর তা' মাসিকপত্রের পাতা ভরাবার জন্য, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বা প্রচারের জন্য, আরও হয় ত সহৃদয়তার জন্যও, হয়ত বা সুলভও — তা' সকলেই নেন; আর সমালোচনাও হয় না।

অতি নির্দ্দোষ অতি সাধারণ নীতিবাক্য অনুসারে আমরা লিখি। তাতে পাপপুণ্য, তার পরাজয় সুখদুঃখের চক্রবৎ পরিবর্ত্তন, নারীত্বের সর্ব্বতোমুখী আদর্শ, শাস্ত্রোল্লিখিত স্বামী স্ত্রীর, প্রথম ভাগের মা ও ছেলের আদর্শ সবই থাকে। ওই একই মালমশলায় কেউ বা একটু ভাল করে লেখেন, কেউ বা একটু খারাপ। থাকে শুধু—প্রতিভার পরিচয় কিংবা লেখার ঐশ্বর্য্য রূপ।

আমাদের নীতিধর্ম্ম নতুনরূপে দৃপ্ত হয়ে ওঠে না, প্রতিভার আলোয় ঝল্‌সে ওঠে না। আর আমাদের অনীতি অন্যায় আমাদের জাতেরই একটা শ্রেণী বিশেষে চিরজীবী হয়ে থাকলে তার সমালোচনা করে নিন্দা করে, বিশেষ করেও তার সম্বন্ধে বলবার মত কিছুই লিখতে পারি না। নিজেদের জাতের অত বড় গ্লানি লজ্জার বিষয়, তাকে যারা বাঁচিয়ে রাখতে চায় সমাজের একপাশে পয়ঃনালীর মতন, তার সম্পর্কেও মেয়েরা কিছুই বলবার মতন বলেন না।

যেন, চিরকাল পুরুষরা যেমন তাদের হতে বলেছেন, তেমনি তারা হয়েছে। তেমনি ওরা যা' লেখেন, যা' পছন্দ করেন তারই অতি একঘেয়ে বাজে মক্‌স আমরা সবাই মিলে করছি আর তারই বাহবা নিয়ে মশ্‌গুল হয়ে আছি।

এক-একবার মনে হয় সৃষ্টি না হোক ভাল আলোচনা বা প্রবন্ধ লেখাও যদি দেখতাম! যুক্তিতে শাণিত, ভাষায় দৃপ্ত, ভাবে উজ্জ্বল, জ্ঞানে চিন্তাশীলতায় সমৃদ্ধ লেখা। প্রবন্ধ বা আলোচনী * জাতীয় লেখার প্রয়োজন যেমন আছে, উপাদানও কম নেই তার। তাই বা কই?

শুধু লেখার মতন কাব্য হিসেবে লেখা তা-ও বিশিষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দেয় নি। কবিতা খুব গভীর ভাবসমৃদ্ধ অথবা নতুন নতুন ছন্দরূপযুক্ত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন তা' মাঝে মাঝে একটা আধটা যা চোখে পড়ে পুরুষদের লেখাতেই, রবীন্দ্রনাথের কাব্যবীথিকায় হোক কিংবা একটু নতুনতর ধরণ নিয়েই হোক, মেয়েদের ভাব যদি গভীর হয়, মধুর হয়, তো, ছন্দে রূপের অভাব থাকে। ছন্দ যদি সুন্দর হয়ত, তাতে দীপ্তি থাকেনা।

তবু আমরা লিখি দিনের পর দিন, সময় নেই অসময় নেই, সাধনা নেই, তপস্যা নেই, লিখে যাই। তাতে রূপ থাক না থাক, ঔৎকর্ষ্য থাক না থাক, পুরুষরা যেমন

* মেয়েদের মধ্যে তেমন লেখা তেমন প্রবন্ধ শুধু লেখেন বঙ্গনারী।

লিখেছেন, তারই মতন, তারই নকল তারই ব্যক্তিত্বহীন অতি সাধারণ পুনরাবৃত্তি করে চলি। যাতে তাঁদের আঁকা মেয়েরা না মানুষ না পুতুল, না মাছ না সাপ, আর তার পুরুষরাও আমাদের জানা কারুর মতন নয়, অজানা কারুর মতন নয়, ঠিক ঐ ওঁদের লেখা—পুরুষ চরিত্রের অদ্ভুত বাজে অনুকরণ।

মেয়েরা বলেন 'শিব গড়তে বানর গড়া।' নিজেরা সমস্ত সাহিত্যটাকে নিয়ে, নিজেদের ক্ষমতাকে নিয়ে, যশোলিপ্সাকে নিয়ে, নিজেদের চেষ্টা সাধনাকে নিয়ে প্রতিদিনই সেই শিব গড়তে বানর গড়ছেন!

স্বীকার করতে অবশ্য ভাল লাগে না, আমরা পারি না। কিন্তু সাধনাই বা নেই কেন? সৃষ্টির মত কিছু যদি সৃষ্টি করতে না পারেন, সত্যকে ভয় করেন, তপস্যাতে অলস হ'ন, সাধনার চেষ্টা না থাকে, তাহলে আমাদের মনে করতে হবে, আমাদের নিজস্ব কিছু নেই!

গুরুভার লঘুভার রাশিকৃত গ্রন্থে ঘর ভরে ওঠে। অনেক রকম বিষয় তার; কিন্তু এমন একটা লেখা নেই যা' পড়লে বলতে ইচ্ছে হয়—'বাঃ, এই জিনিষটা এমন করে আগে তো কেউ লেখেন নি, এই প্রথম।'

'নন্দিনীর' মত লেখা গল্প যদি কোনো মেয়ে লিখতেন! তাদেরই ঘরের আশ-পাশের কথা, তাদেরই সুখদুঃখের অতি-স্পষ্ট কাহিনী যাতে প্রচণ্ড পাণ্ডিত্য, প্রচুর সমস্যার কথা নেই, বিলিতী মনোবিজ্ঞানের কপ্‌চানো বিশিষ্ট তত্ত্বকথা নেই।

এক-এক সময় মনে হয় যদি ভাল করে মেয়েলী ধরণের লেখা দেখতাম। খাঁটী মেয়েলী ধরণে আমাদেরই ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা, দ্বন্দ্ব-দুঃখ, বিবাদ-বেদনা, মোহ-মমতা ফুটিয়ে তোলা কি এত শক্ত? এখন আমরা যা' লিখি তাতে করুণরস বীভৎস রসের রূপ ধরে, মধুর রস অত্যন্ত জোলো ফিকে খেলো জিনিষ, রুদ্ররস প্রচণ্ড বক্তৃতা ছাড়া কিছুই নয়।

অথচ কথার গাঁথনী বাঁধনী মেয়েদের বেশ আছে, পুরুষরা তাঁদের সাহিত্য রচনায় সেটা দেখান তাও দেখি। কিন্তু মেয়েরা নিজে লেখবার সময় যেন বই দেখে দেখে লেখেন। মনে হয়, যেন মনের ভেতর একরকম আদর্শ কপিবুক আছে তারই রীতি-পদ্ধতি অনুসারে আমরা লিখি।

গত যুগে যে-সব সমস্যা নারীরা লিখে গেছেন, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি এবং শ্রীমতী নিরুপমা দেবী (দিদি-রচয়িত্রী) প্রমুখদের কথা নয়, আমি এযুগের আমাদের কথাই বলছি! কেননা তাঁদের যুগের পর সেই যুগের পরবর্ত্তী পুরুষ লেখকদের মধ্যে নতুন শক্তিশালী লেখক ও কবি অনেকে জন্মেছেন, আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের সেই যুগের মেয়েদের পর আজো সেই সাধনাহীন, বিশেষত্বহীন, তপস্যাহীন, নিশ্চেষ্ট অবসর-চর্চ্চায় ডুবে

আছি। অথচ তঁাদের যুগের চেয়ে জ্ঞান লাভের ও শিক্ষার সুযোগ আমরা ঢের বেশী পেয়েছি, একথা অস্বীকার করার জো নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের পর রবীন্দ্রনাথের যুগেও অনেক লেখক জন্মেছেন যাঁরা নিজেদের বিশেষত্ব নিয়ে এক একটা দিক নিয়ে তাঁরা লিখে গেছেন এবং লিখছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, ললিতকুমার, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি ছিলেন, আর আছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম। এঁরা বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এসে দাঁড়িয়েছেন, একেবারে অন্যদিক দিয়ে। আর সাধারণ কবি, লেখক, গল্প-কথা-লেখক তো অসংখ্য যাঁদের লেখা গতানুগতিকতা ছাড়িয়ে বিশিষ্ট পথই ধরেছে অবশ্য নিজের আদর্শে। কিন্তু 'দিন আগত ঐ'র মত বলতে ইচ্ছে করে, মেয়েরা কই? সৃষ্টির মত সৃষ্টি নিয়ে, নতুন উজ্জ্বল দীপ্ত নক্ষত্রের মত তাঁরা কই?

আমাদের লেখা কি 'মাঝারি' আশ্রয় করেই বেঁচে থাক্‌বে? সাহিত্যের খেলার আঙিনায় আমরা যেন সকলেই একপাশে গুটীকতক ওঁদের হাতে-গড়া সাজানো খেলনা নিয়ে পুতুল খেলা খেল্‌ছি, আর নিশ্চিন্ত হয়ে আছি মনে মনে, আমাদের কেউ কিছু বলে না, খেলা করতে দেয়!
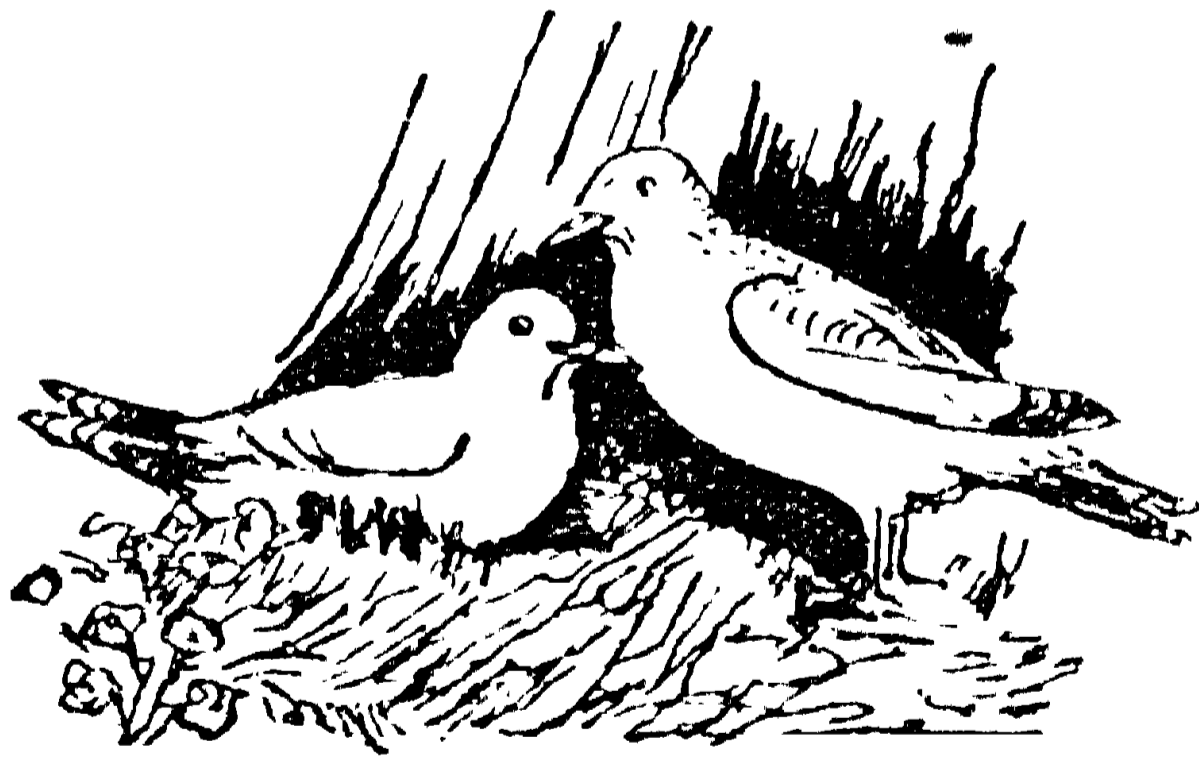
শুভদৃষ্টি

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী সরকার

১

আসাম মেল ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই অগ্নিরথের ভিতরে আবদ্ধ যাত্রীর দল। কত তাহার বৈচিত্র্য, কত জাতি, কত ভাষা, কত পরিচ্ছদ, কত বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া কয়েকটি ঘণ্টার জন্য সকলে একত্র হইয়াছে, কেহ কাহাকেও জানিতে উৎসুক নয়, এই দুদণ্ডের সান্নিধ্যের মূল্যও কেহ দেয় না, আপনার পথে আপনি চলিয়া যায়, মনের উপর কোনও ছাপ থাকে না। এমনি দশজনের একজন হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা কামরায় মণিকাও চলিয়াছিল। বয়স সাতাশ হইবে, দীর্ঘ একহারা গড়ন, বর্ণ স্নিগ্ধ, মুখের সবটা পরিদৃশ্যমান নহে। যেটুকু দৃষ্টিতে পড়ে, সুগঠিত চিবুক, উন্নত নাসিকা, দূরনিবদ্ধ দৃষ্টির উপর আঁখিপল্লবের দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্মরাজির ছায়া। গাঢ় সবুজ পাড়ের একখানা ধূসর বর্ণের শাড়ী তাহার দেহ বেস্টন করিয়া আছে, অঞ্চলপ্রান্ত মাথার উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া গাঢ় সবুজ রংয়েরই একটি ব্লাউজে আবদ্ধ হইয়াছে। গাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া তাহার দৃষ্টি বাধাহীন গতির গভীর আনন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই রেল-গাড়ীতে পথচলার আনন্দে একটা মত্ততা আছে, যাহা মনের অন্তস্তলে নাড়া দিয়া মনকে পাগল করিয়া তোলে। ঘরের কোণে বসিয়া মানুষের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে, সংসারের গোলমাল মনকে সঙ্কুচিত করিয়া আনে, ক্ষুদ্রশক্তি মানবের ক্ষুদ্র রচনার মধ্যে থাকিয়া প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে, মণিকার মন তাই দৃষ্টির ভিতর দিয়া বিরাট পুরুষের মহতীসৃষ্টির গভীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। শরতের মাধুর্য্যের মধ্যে মণিকা এমন একটা গভীর ভাবের সন্ধান পায় যাহা সে ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না, শুধু দৃষ্টিতে তাহা স্বপ্নের আবেশে নিবিড় হইয়া প্রকাশিত হইতে চায়। শরৎশেষের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি সোণালি-আভা-মাখা সবুজ ধানের দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেতের উপর পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল, ধীর বাতাসের স্পর্শে তাহাদের বুকে ঢেউ উঠিতেছিল, মণিকার স্বপ্নমাখা আঁখিতারাও সেই সঙ্গে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল, সেই বাতাসের স্পর্শ তাহারও বুকে দোলা দিল।

কামরার অপর দিকের বেঞ্চিতে আর একজন মানুষ অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া তাহারই দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া আছে, মণিকা সম্বন্ধে সচেতন কিনা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সে মণিকার ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল তাহা সেই জানে, তবে তাহার উন্নত ললাটে একটা গভীর বিষাদের ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় বেদনায় ম্লান হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় দূরের ঘন সবুজ বনানীর অন্তরাল হইতে "সারাব্রিজে"র শুভ্র

বর্ণ অল্প অল্প প্রতিভাত হইতে লাগিল। মণিকা মাথাটা জানালা দিয়া একেবারেই বাহির করিয়া দিল, সূর্য্যরশ্মি তখন রক্তিম হইয়া আসিয়াছে। পদ্মার উন্মত্ত জলস্রোত কোথা হইতে আসিয়া কোন্ উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছে? দুইটা ভৌগোলিক ব্যাখ্যায় তো মন তৃপ্ত হয় না। পদ্মার স্রোতে এই ব্যাকুল উদ্দামতা কে দিল? কেন দিল? কোন্ দুর্লভের জন্য পদ্মার এই সর্ব্বনাশী লোভ? কোন্ পরমলাভের আশায় মানুষের জীবনব্যাপী সাধনার ঐশ্বর্য্যকীর্ত্তি সে ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে? পদ্মার বুকে অস্তগামী ভাস্করের রক্তরাগ ঢালা, যেন রক্তস্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, এই রক্তস্রোতের মধ্যেই সর্ব্বগ্রাসী কীর্ত্তিনাশার সত্যকারের রূপ? কত যুগ-যুগান্ত হইতে সে ছুটিয়া চলিয়াছে, কাহারও ক্রন্দনে থামিয়া দাঁড়ায় নাই। কত গ্রাম, কত জনপদ, কত ঐশ্বর্যের খেলা, বুকভরা আশার জীবনব্যাপী সাধনার কত নিদর্শন, পদ্মার এক দণ্ডের প্রলয়নাচনে সব শেষ। কিছু নাই,—কেহ নাই,—আছে শুধু যা গেছে, যাহারা গেছে,— আসন্ন সন্ধ্যায় নদীর বুকে তাহাদের হৃদয় রক্তের রক্তিমাভাস—আর আছে কীর্ত্তিনাশার উচ্ছ্বসিত অট্টহাস্য!—মণিকার সমস্ত বুক একটা গভীর অনুভূতিতে দুলিতে লাগিল। ঐ কীর্ত্তিনাশা! আজ তাহার বুকের উপরে বিজ্ঞানের কীর্ত্তি বিরাজিত, নশ্বর মানুষ তাহার বুকের উপর দিয়া হেলায় চলিয়া যায়, কিন্তু হঠাৎ মণিকার মনে হইল—যদি এই মুহূর্ত্তে কীর্ত্তিনাশার ধ্বংসের নৃত্য সুরু হয়, যদি প্রত্যেকটি ঢেউ তাহার দুর্জ্জয় শক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে? বিজ্ঞানের বড় কীর্ত্তি এই সেতু মানবশক্তির পরিচয়, কিন্তু পদ্মার গতিভঙ্গিমায় কার ইঙ্গিত? কীর্ত্তিনাশায় কিসের খেলা? কোন্ রুদ্রদেবতার লীলায়িত নর্ত্তন?—মণিকা স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, তাহার দেহের মধ্যে একটা শিহরণ খেলিয়া গেল। ঘন বাবলার বনের অন্তরালে পদ্মার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্য প্রায় হারাইয়া গিয়াছে, সেতুও আর দেখা যায় না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মণিকা এবার ভিতরের দিকে মাথা ফিরাইল।

যে লোকটি এতক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়াছিল, মণিকা একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই তাহার যেন চেতনা হইল। নিজেকে সংবরণ করিয়া সোজা হইয়া জানালার দিকে ফিরিয়া বসিল। মণিকা আরও কতক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আবার বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, অস্তগামী সূর্য্যের সহিত তাহার উদাস দৃষ্টি পশ্চিমের সীমান্ত রেখায় মিশিয়া গেল।

একটা ষ্টেশন। ভীড় গোলমাল, বহুবিধ বৈচিত্র্যের একত্র সমাবেশ। মানুষের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিবার জিনিষের অভাব নাই, তবু মণিকার দৃষ্টি নির্লিপ্ত। এমন সময় তাহার বিপরীত দিকের দরজায় পুরুষকণ্ঠে কথা শোনা গেল—"এই যে সমর! এদিকে কোথায় চলেছ?" ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর হইল, "কে? বিনয়? চলেছি আসাম অঞ্চলে। তুমিও যাত্রী দেখ্‌ছি—কোথায়?" বিনয় বলিল, "তেজপুর। তুমি কতদূর?" বলিতে বলিতে বিছানা বাক্স ইত্যাদি লইয়া সেই কামরাতেই উঠিয়া সমরের পাশে বসিয়া বলিল, "এক্‌লাই?"

সমর একটু হাসিল, জবাব কিছু দিল না। বিনয়ের দৃষ্টি কামরার অপর প্রান্তে উপবিষ্টা মণিকার দিকে পড়িল। একটু তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিনয় দ্বিধার সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "সমর, তোমার কেউ সঙ্গিনী ?" সমর অন্যমনস্ক মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সঙ্গিনী যে তাতো দেখতেই পাচ্ছ, ট্রেণ-সঙ্গিনী।" আর কিছু সে বলিল না।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "আলাপ করেছ ?"

সমর হাসিয়া উত্তর করিল, "তুমি হলে কর্ত্তে বোধ হয়, কিন্তু আমাকে তো জান।"

বিনয় বলিল, "জানিনা আবার! চিরটা কাল একলা কাটালে, আহাম্মক!"

কথাবার্ত্তা অতি মৃদুস্বরেই চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, বাহিরের দৃশ্যাবলীর উপর কৃষ্ণ যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে। মণিকা জানালার কাঠের উপর মাথা নামাইয়া দিল। ক্লান্তি, কি তন্দ্রা, কি চিন্তা কোনটা যে মণিকার দেহে অবসন্নতা আনিয়া দিল তাহা বলা কঠিন, কিন্তু অবসন্ন যে সে হইয়াছে তাহা নিশ্চয়। প্রায় আধঘণ্টা একই অবস্থায় থাকিয়া সে মাথা তুলিল, তাহার পার্শ্বে একখানা বই পড়িয়াছিল, সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। সমর একবার তাহার আনত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর শুইয়া পড়িল। বিনয় গম্ভীর নয়—কথা না বলিয়া সে থাকিতে পারে না, অন্যে চুপ করিয়া থাকিলে তাহার অস্বস্তি হয়। তাই সমরকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, "ওরে সমর, এ রকম মৌনাবলম্বন করলে আমার যে অবস্থা কাহিল।"

সমর উত্তর করিল, "তোমাকে কথা বল্‌তে তো কেউ বারণ করছে না—বল না।"

বিনয় হঠাৎ কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিল, "কি বল, আলাপ করি ?"

সমর বলিল, "সে তোমার ইচ্ছা এবং সাহস।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিনয় হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, "বেজায় গরম! পাখাটা খুলে দিই।"

পাখা চালাইয়া অতি নম্রস্বরে মণিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি পাচ্ছেন্ তো ?"

মণিকা বই হইতে মুখ তুলিয়া একবার বিনয়ের দিকে চাহিল, তারপর ধীরস্বরে বলিল "পাচ্ছি।" বিনয় এ সুযোগ ছাড়িল না জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কতদূর যাচ্ছেন ?"

উত্তর হইল, "গৌহাটি।"

গাড়ী পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে থামিল। ষ্টেশন কলকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। বিনয় ও সমর তাহাদের জিনিষ-পত্র গুছাইতে গুছাইতে মণিকা তাহার ছোট বিছানা ও সুটকেস কুলির মাথায় চাপাইয়া বইখানা ও একটি ছোট ব্যাগ হাতে করিয়া গাড়ী বদলের জন্য নামিয়া পড়িল। দরজার পাশেই সমর দাঁড়াইয়াছিল, মণিকা যখন তাহার পাশ দিয়া ধীর পদে যাইতেছিল সমরের সমস্ত দেহ একবার কাঁপিয়া উঠিল, প্রাণমনের একাগ্রতা দিয়া মণিকার দেহে নিজের দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।

২

ব্রহ্মপুত্রের গা' বাহিয়া কামাখ্যা পাহাড় একেবারে খাড়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। নদের দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি শান্ত-গম্ভীর। বুকের মধ্যে সে কত ঘূর্ণাবর্ত্ত লুকাইয়া রাখিয়াছে বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই, ধীর নিস্তরঙ্গ প্রবাহ আত্মসমাহিত হইয়া অনন্তের উদ্দেশে চলিয়াছে। কামাখ্যার শিখরাগ্রে ভুবনেশ্বরীর মন্দির। মন্দিরের চত্বরের বাইরে একটু নীচে বৃহৎ এক শিলাখণ্ডের উপরে ব্রহ্মপুত্রেরই প্রতিচ্ছবির ন্যায় মণিকা বসিয়াছিল। তাহার সহিত আর একটি তরুণী, দুই জনেই নিস্তব্ধ হইয়া আছে, সম্মুখের দিকে তাহাদের দৃষ্টি প্রসারিত। ইচ্ছা করিয়া যে তাহারা চুপ করিয়া আছে তাহা নয়, বাক্য তাহাদের হারাইয়া গিয়াছে। সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে, যে দৃশ্য দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া আরও বহুদূরে প্রসারিত হইয়া আছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়, যে গভীর অনুভূতি এই দৃশ্য মানুষের মনে জাগাইয়া তোলে, মানব-ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে গেলে সে সৌন্দর্য্যের মহিমাকে খর্ব্ব করা হয়, তাই তাহারা চুপ করিয়া আছে। তাহাদের দৃষ্টি একবার কামাখ্যার পদপ্রান্ত-প্রবাহিত শুভ্র জলরাশির দিকে নিবদ্ধ হইল। দৃষ্টি প্রথমে যেখানে তাহাকে দেখিতে পায়, সেখানে সাদায় সবুজে মেশামেশি, তাহার পর বারিরাশি যেন পথ করিয়া দুই উপকূলের পর্ব্বতখচিত দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর শ্যামল করিয়া, শাখা উপশাখা বিস্তার করিয়া পর্ব্বতের অন্তরালে হারাইয়া গিয়াছে। তাহার বুকের মধ্য হইতে উমানন্দ, উর্ব্বশী, আড়াল পাহাড় বালকের ক্রোড়া-পর্ব্বতের ন্যায় জাগিয়া আছে, পরপারে অশ্বক্রান্ত শিশুর খেলাঘরের মত প্রতীয়মান, সম্মুখে ঘন সবুজ বনস্থলীর মধ্যে নবগ্রহ পাহাড়ের কোলে গৌহাটি সহর যেন কোনও শিল্পীর নির্ম্মিত একখানি চিত্র। দক্ষিণে আসামের বহুদূর-বিস্তৃত পর্ব্বতমালা। গহন বনে আচ্ছাদিত গাঢ় শ্যামল পর্ব্বতশ্রেণী ধীরে সবুজ হইতে নীলে, নীল হইতে ধূসরে পরিণত হইয়া আকাশের কোলে মিলাইয়া গিয়াছে, একটির পর একটি করিয়া অনন্ত প্রসারিত, অগণিত পর্ব্বত শিখর, যেন সমুদ্রের তরঙ্গমালা স্তব্ধ, স্থির, গম্ভীর।

মণিকা একবার বাম হইতে দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহার পর পদতলে চাহিল। যে শিলাখণ্ডের উপরে তাহারা বসিয়াছিল, সেখান হইতে সোজা নীচে নামিয়া পাহাড় একেবারে ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। সেদিকে চাহিয়া মাথা ঘুরিয়া ওঠে, একবার যদি পা ফস্‌কাইয়া যায় একেবারে ব্রহ্মপুত্রের অতল গহ্বরে! মণিকা সঙ্গিনীকে একটু ঠেলিয়া বহুক্ষণ পরে কথা কহিল, "সতী, একবার ভাল করে নীচে তাকিয়ে দেখ্।"

সতী সেদিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, "ও বাবা! যদি কোনও রকমে একটু বেকায়দায় পা পড়ে তবেই গেছি। চল্ ভাই আর একটু উঠে সরে বসি।" মণিকা বলিল, "এতো ভয়? আমি তো প্রথমে বসেই এ দেখেছিলাম।"

সতী উঠিবার আয়োজন করিয়া বলিল, "সেই দশটায় এসেছি বেলা যে শেষ হ'তে চল্‌ল, এখন ফেরা যাক্।"

মণিকা বলিল, "এক্ষুণি ? এ ছেড়ে তোর যেতে ইচ্ছে করে ? জন্মজন্মান্তর এইখানে এইভাবে বসে থাকা যায়। তাই মহাপুরুষরা এমনই জায়গায় তীর্থ ক'রেছিলেন, সংসারের গোলমাল ভুলতে আর চেষ্টা ক'রতে হয় না।"—

সতী বাধা দিয়া বলিল, "নে—তোর কবিত্ব রাখ! সংসার ভোলবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, তবে তোর খাতিরে না হয় আর একটু বসি।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "আমারই বলার ভুল হ'য়েছিল। তোর নূতন সংসার, প্রাণের উচ্ছ্বাস কানায় কানায় ভরা! সংসার ভুল্‌তে যাবি কোন্ দুঃখে—ষাট্! আরও সংসারের সারটি কামাখ্যায় উঠ্‌তেই পায়ের ব্যথায় যখন পাণ্ডাঠাকুরের আশ্রমে তোর জন্যে হাঁ করে আছেন।" সতী একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "না ভাই মণি, ঠাট্টা করিস্‌নে। তুই না হয় অভিমানে সন্ন্যাসিনী হ'য়ে আছিস্ তা ব'লে"—

মণিকা গম্ভীর হইয়া বলিল, "অভিমান ? ছিঃ, কার উপর অভিমান ? আর সন্ন্যাসিনী কোথায় ? দিব্যি সেজে গুজে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি।"

সতী বলিল, "আচ্ছা, সত্যি বল্‌তো মণি, তুই শ্বশুরঘর স্বামী সব ছেড়ে এলি একি অভিমান নয় ? বড় বেশী অভিমান কি হয়নি ?"

মণিকা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। যেখানে তাহারা বসিয়াছিল সেই শিলাখণ্ডের আড়ালে একটু উপরে আর একজন মানুষ আরও আগে হইতে আসিয়া বসিয়াছিল, চতুর্দ্দিকের সৌন্দর্য্যনির্ঝরে অভিষিক্ত হইয়াও তাহার সমস্ত চেতনা মণিকার প্রত্যেকটি ভঙ্গিতে কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতেছিল। সে সময় সতীর প্রশ্ন শুনিয়া উত্তরের অপেক্ষায় তাহার সমস্ত শক্তি উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, এইবার তাহার সংশয় মিটিবে! কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরভাবে মণিকা উত্তর করিল, "অভিমান কি দশ বছর থাকেরে সতী ? তোর স্বামীর উপর অভিমান ক'রে দশ বছর এমন ক'রে কাটাতে পারিস্ ?"

এমন একটা অসম্ভব কল্পনায় সতীর হাসি পাইল, তাই সে কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে চলে এলি কেন ? তারা তো ভদ্রলোক, মারধর তো ক'রত না, তবে এলি কেন ? সব ভাল ক'রে জানিনা, বল্ না ভাই ?"

মণিকা বলিল, "আবার সেই পুরাণো কাসুন্দি ঘাঁটা! তা শোন্। ভদ্রলোক তাঁরা নিশ্চয়ই—ভয়ানক ভদ্রলোক! 'ভদ্রলোকত্ব' যে মানুষের কতবড় ছলনার পরিচয় হ'তে পারে—তা সেখানে গিয়ে বুঝেছিলাম। গায়ে তারা কোনও দিন মারে নি বটে, সেখানে যদি থেকেও যেতাম, তা হ'লে সে রকম কিছু হত না। কিন্তু মারটা কি শুধু গায়েই লাগে রে ? আগে আমি মানুষ, তারপরে তো বৌ! দেখলাম তাদের আদেশে ভাল বৌ হ'তে হ'লে ভেতরের 'মানুষ'কে মারতে হয়। ভদ্রতার মুখোসের আড়ালে তাদের এই 'মানুষ'কে মারবার যে নিষ্ঠুর প্রচেষ্টা, মনের উপর সেই

আঘাত সে যে সব চেয়ে বড় মার ভাই, সে যে মরণ"। সতী বাধা দিয়া বলিল, "তোর বর কি তোকে ভালবাসত না, আদর করত না, ব'লতে চাস ?" মণিকা বলিল, "ভালবাসা কি রকম জিনিষ জানি না, তবে আদর আমাকে নিশ্চয়ই তিনি ক'রতেন খুব বেশীই। তরুণী মেয়েকে অধিকারে পেয়ে পুরুষ আদর করে না, একি হয় ?" সতী বলিল "তবে এলি কেন ?"

মণিকার কণ্ঠে ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল, "এই দেহটার আদরেই মনের তৃষ্ণা যদি মিট্‌ত, তবে আর দুঃখ কি ছিল ? কিন্তু আমি তো শুধু দেহ নই। জানিস্ সতী, বিয়ের পর এক বছর তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। স্বামীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ট হবার সুবিধা আমার ছিল না। রাতে পাঁচ ছ' ঘণ্টার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তো। দিনের বেলায় তাঁকে কোনদিনই পাইনি, শাশুড়ীর কড়া নজর ছিল বৌ বা ছেলেকে একেবারে গিলেই ফেলে! দিনের বেলা স্বামীর কাছে আমার বিষয়ে কি খবর যেত তা জানি না, তবে রাতের পাঁচ ছ' ঘণ্টার মধ্যে ঘুম ও এই দেহটার আদর-আহ্লাদের ফাঁকে রোজই এক প্রস্থ উপদেশ শুনতাম, স্বামীর মায়ের স্থান নাকি দেবতাদের অনেক উপরে। ননদ স্বামীর বোন, সুতরাং তিনিও দেবতাদের পর্য্যায়, তাঁদের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাও অবহেলা করলে ভবিষ্যতে দুঃখের কোঠা পূর্ণ হবেই—ইত্যাদি। চুপ ক'রে শুনে যেতেম। বয়স তো আর কম ছিল না, সতেরো! রোজই শুন্‌তে শুন্‌তে একদিন আমি বল্লাম—"দেখ আমাকে রোজই যে বল, তার কি দরকার ? ভক্তি-শ্রদ্ধা কাকে কি করা উচিত তা আমিও তো একটু বুঝি।" এই অতি সামান্য প্রতিবাদও তাঁর সইল না, প্রায় জ্বলে উঠে বল্লেন, 'বোঝ ছাই! দু'পাতা ইংরেজী প'ড়ে গুরুজনদের অপমান করতেও তোমাদের ঠেকে না।' বোকার মত তাকিয়ে বল্লাম, 'সেকি ? অপমান করি কাকে ?' উত্তর হ'লো, 'জানোনা কিছু ? ন্যাকামি! আমার মায়ের কোনও কথা তুমি শোন ? কিছু বল্‌লে মুখের উপর জবাব দেও না যে পারবে না ?' বিস্ময় আরও বেড়ে গেলো, অবাক হ'য়ে বল্লাম, 'ভুল শুনেছ! তিনি যখন আমাকে দিয়ে মিছে কথা বলাতে চান, অন্যায় কাজ করাতে চান, শুধু তখনই তাতে আপত্তি করি।' তাঁর আদরের এই দেহটার থেকে অনেক খানি দূরে সরে গিয়ে তিনি বিতৃষ্ণার সঙ্গে বল্লেন, 'আবার আমার মায়ের নিন্দা ? যা করেছ তারই যে মার্জ্জনা নাই। আরও বাড়াচ্ছ ? মায়ের কাছে গিয়ে মাপ চাইবে।" মোহের প্রভাব বড়, বেশী তাই তখনও আমার মনে আকর্ষণ ছিল। তাঁকে খুসী করবার জন্য বল্‌লাম, 'রাগ করো না, দোষ যদি করে থাকি মাপ চাইব।' পরদিন দুপুরেই শাশুড়ীকে গিয়ে বল্লাম, 'মা, আপনাকে আমি কি বলে অপমান করেছি তা বুঝতে তো পারিনি, বুঝিয়ে দিন, আর অন্যায় যদি করে থাকি তো মাপ করুন।' শাশুড়ী কিছুক্ষণ বিকৃত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, 'ওমা এমন বউ এনেছিলাম, ছেলের সামনে আমার অপমান করে যায়।' আমি তো হতভম্ব।

ছেলে কোথায় ছিলেন, দৌড়ে এসে মায়ের পায়ের কাছে বসে পড়ে প্রায় মায়ের দুঃখে কাঁদতে আরম্ভ করেন আর কি ? মায়ের নাকিসুর আরও বেড়ে গেল। ছেলে অতি গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকিয়ে, মায়ের পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন, 'দেখো, যার জন্য আমার মায়ের চোখের জল পড়বে, তাকে আমি আপন ভাবতে পারি না। একথা তুমি মনে রেখো আমিই তোমাকে এনেছিলাম, তারই জন্য মায়ের আমার এই একবছর অনেক সইতে হলো, অনেক চোখের জল পড়ল। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে বিন্দু বিন্দু রক্ত খরচ করে ক'রতে হবে। একথা মনে রেখে আমাদের একটু রেহাই দেবার চেষ্টা করো!' মাতৃভক্ত অতি ভদ্রলোক আমার স্বামী অতি শান্ত স্বরেই কথাগুলো বল্‌লেন, আমিও শান্তভাবে তা মেনে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। আসতে আসতে শুনতে পেলাম, নাকিসুরেরর পরিবর্ত্তে খুব মিহিসুরে দরদ ঢেলে শাশুড়ী বল্‌ছেন, 'আহা বাবা, অমন কড়া করে কেন বল্‌লি ?' ছেলে দৃঢ়স্বরে বল্লেন, 'না মা তোমাকে যে দুঃখ দেয়, তোমাকে যে ছোট মনে করে, তার ক্ষমা আমার কাছে নেই।' কল্পনার চোখে শাশুড়ীর হিংসার পরিতৃপ্তির হাসি দেখতে পেলাম। দুচারদিন পরে বাপের বাড়ী আসবার সময় স্বামীকে বল্লাম, 'রেহাই দিতে ব'লেছিলে—চল্লাম।' চোখে ত জল ছিল না, মুখেও হাসি নি। আমার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন, 'অন্যায় করেছিলে শাসন করেছি, তাতে রাগ হ'য়েছে ?' তেমনি ভাবেই বল্লাম, 'না।' স্বামী বোধ হয় একটু থতমত খেয়ে বল্লেন, 'আচ্ছা, রাগ পড়ে গেলেই এসো, দেরী করো না।' বলে আমাকে নিজের দিকে টান্‌বার চেষ্টা করলেন। আমি আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম, বল্লাম, 'রাগ আমি করিনি। তবে এখানে আসবার দরকারও তো দেখছি না। একটা কথা বলে যাই—মা, মা হলেও মানুষ—দুর্ব্বলতা তারও দিকে থাকা বিচিত্র নয়। আর স্ত্রী পরের মেয়ে হ'লেও মানুষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষার আদর্শ তারও থাকতে পারে। আবার যখন বিয়ে করবে এই কথাটা মনে রেখে তার বিচার ক'রো।' এই কথা ব'লেই চলে এলাম, স্বামী কাঁদ্‌লেন কিনা দেখে আসি নি।"

সতী জিজ্ঞাসা করিল, "আর নিতে চায় নি ?" মণিকা বলিল, "চেয়েছেন বই কি ? তবে আমি স্পষ্টই লিখে দিয়েছিলাম যে,—যে আমাকে নেবার দরুণ তাঁকে বিন্দু বিন্দু রক্ত খরচ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, সে আমি এতবড় নির্ল্লজ্জ নই যে, আবার সেখানে ফিরে যাব। তারপর থেকে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে আরম্ভ করেছিলেন, ফিরিয়ে দিয়েছি। চেষ্টা করে এম-এ অবধি পাশ করে নিলাম, এখন যা রোজগার করি তাতেই বাকী জীবনটা কেটে যাবে, কি বলিস্ ?"

সতী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুই ভারী নিষ্ঠুর। কিছুদিন পরে ফিরে গেলেই পারতিস্ সব ঠিক হয়ে যেত।"

মণিকা বলিল, "ভুল কথা! ফিরে গেলে ভাবত যে আমার ওদের আশ্রয় ছাড়া আর গতি নেই। স্বভাবও ওদের যা তাই থাকত। জানিস্ তো ওরা বিয়ে করে নেয় 'মায়ের দাসী,'—আর যে দৃষ্টিতে বিয়ের সময় প্রথম দেখে, সেটা 'শুভদৃষ্টি' নয় কামদৃষ্টি। সতী বাধা দিয়া বলিল, "থাম্ থাম্। আজও তোর স্বামীকে পেতে ইচ্ছা করে কিনা ঠিক করে বল্ তো?"

মণিকা অসঙ্কোচে বলিল, "করে বৈ কি। কিন্তু সে কেবল দৈহিক আকর্ষণ নয়—সে তো পাশবিক আকর্ষণ। দুটি পেটের ভাতের জন্যও নয়—সে তো ভিখারীর বুভুক্ষা। তাঁকে আমার পেতে ইচ্ছা করে মন প্রাণ বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে, তার আগে নয়। পরস্পরের দৃষ্টি যেদিন দৈহিক সুখের আশায় নয়, সংসারের জগতের কল্যাণের আশায় পরস্পরের সহায়তা আকাঙ্ক্ষা করে মিল্‌বে তাঁকে সে দিনই চাই। যে দিন তিনি আমাকে দাসী অথবা কামিনী রম বলে মনে না করে, তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতার পথে প্রকৃত বন্ধু ব'লে বিশ্বাস করবেন, তখনই তাঁকে আমি চাইব। তার আগে নয়।"

সতী জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর আর সমরবাবুকে দেখেছিস্?"

মণিকা বলিল, "কেন বল্ তো?"

সতী বলিল, "দেখা যদি হয় কি করিস্?"

মণিকা উত্তর করিল, "দেখা তো রাস্তাঘাটে কত লোকের সঙ্গেই হয়। কি আর করি?"

সতী বলিল, "সে তো কত সব অচেনা।"

মণিকা বলিল, "যতদিন আমার আকাঙ্ক্ষিত পরিচয় তাঁর মধ্যে না পাব তিনিও অচেনারই মত থাকবেন।" সতী উঠিতে উঠিতে বলিল, "তোর সবই আজগুবি বাপু! ও আমরা বুঝি না, চল্ নামতে সুরু করি এবার।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "যা তুই—তোর 'তিনি' ব'সে মিনিট গুন্‌ছেন। আমি আর একটু বসি।" সতী চলিয়া গেল।

৩

অতীত ইতিহাসের উপর, অতীতের তিক্ত ব্যথিত অনুভূতির উপর মণিকা দৃঢ়হস্তে একখানি ভারী যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল। তাহার তরুণ অন্তর অতীত স্মৃতি লইয়া ভবিষ্যতের কল্পনার স্বর্গ গড়িয়া তুলিবার জন্য বহুদিন বহুবার প্রলুব্ধ করিয়াছে, অনেক চেষ্টায় মণিকা সে প্রলোভন দমন করিয়াছে। অনেক করিয়া মনকে বুঝাইয়াছে, পুরুষের ভালবাসাই জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ নয়, সংসারে আনন্দের আরও জিনিষ আছে। গৃহকোণের আবর্জ্জনার মধ্যে নিজকে নিমগ্ন করিয়া রাখার চাইতে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে কর্ম্মের উন্মাদনায় মাতিয়া থাকায় বড় সার্থকতা। বাহিরের দিকে নিজের ভালবাসা প্রসারিত করিয়া, সকলের

আশীর্ব্বাদ পাইয়া স্বামীর ভালবাসার অভাব সে ভুলিবে, তবু তাহার মন মাঝে মাঝে হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে, একটি বিশেষ পুরুষের সহায়তার আকাঙ্ক্ষা আজও তাহার হয়, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার ভক্তের অভাব নাই, তবু অনেক দিন আগেকার একখানি তরুণ মুখচ্ছবি তাহার সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। যদি তিনি অবুঝ না হইতেন, যদি সহজ বুদ্ধিতে তিনি সব গ্রহণ করিতেন! মা-বোন নিজের বলিয়াই তাঁরা নিষ্পাপ নির্দ্দোষ, বধূ পরের মেয়ে তাই ভিতর বাহির তাহার ত্রুটিতে ভরা। এ কোন্ যুক্তি! বধূর প্রতিবাদেরও অধিকার নাই, দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব করাও তাহার অন্যায়? সে যন্ত্রমাত্র সংসারের কাজের—আর স্বামীর কামের—ছিঃ! অতি সুন্দর শিক্ষিত স্বামী তাহার—তবু তিনি এত অন্ধ! সংস্কার তাঁহাকে এমনি যাদু করিয়াছে! ধিক্কারের সঙ্গে তীব্র বেদনায় তাহার মন ভরিয়া উঠিত। সে যে বড় আশা করিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া যাত্রা সুরু করিয়াছিল, কোথায় পড়িয়া রহিল তাহার কল্পনার স্বর্গ আদর্শ সংসার—আদর্শ জীবন-সহচর—আর কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে সে!

সতীর কথায় অনেকদিন পরে মণিকার অন্তরের পর্দ্দা সরিয়া গেল। অনেক আশার অনেক ভালবাসার মুখখানি তাহার মনের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। দশ বছর আগে তিনি যেমন ছিলেন, এখনও কি তেমনই আছেন? গৌহাটি আসিবার পথে ট্রেণে সে যাহাকে দেখিয়াছিল, তাহার কথা মনে জাগিয়া উঠিল। তাঁহারও নাম সমর। তাঁহার মুখের সঙ্গে তার চেনা মুখের সাদৃশ্যও তো আছে, ইনিই কি 'তিনি!' কই তিনি তো চিনিলেন না? মনে পড়িয়া গেল সেই ভদ্রলোকের তাহারই দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টির গভীর বেদনা। তবে?—যাক্। যাহা গিয়াছে তাহা লইয়া এ বিতর্ক কেন? সে বেশ আছে! তাহার জীবনে ধর্ম্মসাধনার পথে—তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চ্চার পথে—তাহার সাংসারিক ক্ষুদ্র সুখদুঃখের পথ চলায় বন্ধু তাহার মিলিল না, একলাই সে চলিবে, মন্দ কি?

সম্মুখের অনন্ত-প্রসারিত মহাশিল্পীর শিল্পরচনার দিকে মণিকার দৃষ্টি আত্মবিস্মৃতের মত নিবদ্ধ হইয়া গেল। দূরদূরান্তরের রহস্য গায়ে মাখিয়া মৃদু বাতাসের স্পর্শ তাহার চোখে মুখে লাগিয়া তাহাকে আবেশে অভিভূত করিয়া দিল।

সমরের সমস্ত দেহ বার বার কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ট্রেণে বসিয়া সে মণিকাকে চিনিয়াছিল তবু একটু সংশয় ছিল, কি জানি যদি ভুল হয়। আজ সংশয় তাহার কাটিয়া গিয়াছে। দৃষ্টি তাহার এক নূতন রাজ্যে খুলিয়া গেল। নারীকে সে যে-রূপে জানিত তাহা ছাড়াও যে তাহার আর একরূপ থাকিতে পারে, তাহা সে আজ যেন প্রথম বুঝিল। সঙ্কীর্ণতার বাহিরে নারী যদি বৃহৎ ক্ষেত্রে জাগিতে চাহে, সে মনে করিত তাহাকে স্বেচ্ছাচার, সংসারের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বধূ যদি চলিতে না চায়, অন্যায় যদি নির্দ্দেশ করে, সে

ভাবিত তাহাকে ঔদ্ধত্য—সেই মাপকাঠিতেই সমর মণিকার বিচার করিয়া শাস্তি দিয়া তাহাকে নিজেদের সংসারের সমস্তরে টানিয়া আনিতে চাহিয়াছিল। মণিকা সে শাস্তি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ায় নাই। সমর রেহাই চাহিয়াছিল—মণিকা তাহাকে রেহাই দিয়া গিয়াছে, ক্রন্দনে, কলহে তাহার নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করে নাই। নারীর দৃঢ়তার, আত্ম-সম্মানবোধের, নারীর একটা মহিমময় রূপ তাহার সম্মুখে জাগিয়া উঠিল। আজ তাহার মণিকা তাহার এতো কাছে, কিন্তু এতো দূরে! প্রাণের স্পর্শ, শ্রদ্ধা সমর তাহাকে দেয় নাই, তাই দেহের স্পর্শ হইতেও মণিকা নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই ব্যবধান ঘোচে নাকি? মণিকাকে কি সে বুঝাইতে পারিবে না, নারীত্বের সম্মান সে বুঝিয়াছে? একান্ত নিজস্ব মণিকা! বিবাহের দাবীতে নয়, প্রাণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দাবীতে আজ আবার সমর তাহাকে ফিরিয়া চাহিবে। সমর উঠিয়া দাড়াইল। কামাখ্যার শিখরে, ভুবনেশ্বরীর পার্শ্বে পার্ব্বত্য বৃক্ষরাজির ছায়ায় শিলাখণ্ডের উপর মূর্ত্তিরই ন্যায় স্থির অকম্প মণিকা স্বপ্নাবিষ্টের মত বসিয়া আছে। সমর অতৃপ্ত নয়নে খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া ধীর কণ্ঠে ডাকিল, "মণিকা, মণি—"

প্রস্তরমূর্ত্তি যেন প্রাণস্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। ধীরে মণিকা তাহার মাথা ঘুরাইয়া পশ্চাৎবর্ত্তীর দিকে চাহিল, একবার চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠিল, পরেই শান্তদৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া আনতমুখে বলিল "আপনি? ট্রেণে দেখেছিলাম?" সমর ব্যাকুল হইয়া উঠিল, মণিকা কি তাহাকে চেনে নাই? রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ ট্রেণে দেখেছিলে—আর—আর—কখনও দেখনি?"

মণিকা স্থির নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, দৃষ্টি সমরের মুখ হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

সমর আবার ডাকিল, "মণিকা।"

শান্তকণ্ঠে মণিকা বলিল, "বলুন।"

সমর ব্যথিতস্বরে বলিল, "কি ভাবছ?"

"ভাবে তো মানুষ কতই"—বলিয়া মণিকা স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

সমর আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না, মণিকার হাত দৃঢ়হস্তে ধরিয়া ফেলিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল, "মণিকা, আর চ'লে যেও না।" মণিকার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, প্রলোভন বড় তীব্র। তবু স্থির কণ্ঠে বলিল, "আবার কেন? রেহাই চেয়েছিলেন, সে তো দিয়েছি।"

সমর কহিল, "সে কথার কি ক্ষমা নেই মণি?" মণিকার হাত সে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিল।

মণিকা বলিল, "কে ক্ষমা করবে? মানুষের ক্ষমার কোনও মূল্য নেই—ক্ষমা করেন ভগবান্।"

সমর ব্যাকুল হইয়া বলিল, "সে কবে?

"যেদিন মানুষ তার নিজের ভুল প্রাণে প্রাণে অনুভব করে। ছাড়ুন, আমি এবার যাই"—বলিয়া মণিকা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল।

সমর ছাড়িল না, তাহার আরও একহাত চাপিয়া ধরিয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িয়া মণিকাকে কাছে টানিয়া আনিয়া, মৃদু করুণ হাসিয়া বলিল, 'তবে আর আমার ভয় নেই মণি, ভগবান্ আমাকে ক্ষমা করেছেন। তুমি আমাকে আর একবার বিশ্বাস কর—আর ঠক্‌বে না'—শেষের কথাগুলি মিনতির মত শুনাইল।

মণিকার দূরনিবদ্ধ উদাস দৃষ্টি নব আলোকসম্পাতে চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল, বহুদিন বিলুপ্ত মৃদুহাসি তাহার দৃঢ় শান্ত মুখশ্রীতে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য মাখাইয়া দিল, সে সমরের ব্যাকুল অনুতপ্ত মুখের দিকে তাহার চোখ ফিরাইয়া আনিল। সে মুখে পূর্ব্বের তাচ্ছিল্য ও দম্ভের লেশ আর নাই, আছে কেবল বেদনার ছায়া, সশ্রদ্ধ ভালবাসার শান্ত আভাস। তাহাকে গ্রহণ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

সমর ব্যগ্র হইয়া আবার বলিল, "বল মণি, একবার বল, আমাকে বিশ্বাস করলে।"

মণিকার গভীর দৃষ্টি গভীরতর হইয়া সমরের ব্যাকুল অনুরাগদীপ্ত দৃষ্টিতে মিলিত হইল। ধীরে মণিকার মাথাটি সময়ের কোলে নুইয়া পড়িল। উদ্গত অশ্রুবেগে সমরের চোখদুটি তখন ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে।

অহঙ্কার

শ্রীজয়শ্রী দেবী

তোমারে বেসেছি ভালো সে আমার শ্রেষ্ঠ অহঙ্কার
তোমারে বাসিব ভালো, এর বেশী ছিলনা আমার
আর কিছু চাহিবার মতো! এ জীবনে একখানি মুখ
আমরণ জেগে রবে ভরি মোর সব দুঃখ সুখ।
আমার স্বপন ভরি, ভরি মোর সর্ব্ব দেহ মন
পরশ ঘিরিয়া রবে; জীবনের আনন্দ বেদন
সঁপিব তোমার পায়ে, সাজাইয়া নিত্য পুষ্পাঞ্জলি
শুধু এতটুকু আশা তুমি তাহা নিবে বঁধু তুলি।

অভিভাষণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

"আসিবে সে দিন, আসিবে" বলিয়া বাংলার কবি যেদিনের মঙ্গলময় আবাহনী গাহিয়াছিলেন, সে দিন আজ আগত প্রায়। ইহা অতীতের কাহিনী নহে, অনাগতের কল্পনা নহে, বাস্তব সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমানের জাগ্রত অনুভূতি। অদূর অতীতের সেই বহুবিশ্বস্ত আশ্বাসের মহাবাণীকে পরিবর্ত্তিত করিয়া আজ আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—

"এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন, এসেছে সে দিন এসেছে।"

এসেছে সে দিন? সত্যই কি সে দিন এসেছে? কিন্তু কই সে দিন এসেছে? কি আমরা পেয়েছি? স্বরাজ? স্বাধীনতা? না, কিছু না। কই, কিছুই তো এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই! তবে "আসিবে" না বলিয়া "এসেছে" বলিতেছি কেন? এখনও তো আমরা আমাদের দাবী অনুযায়ী কিছুই পাই নাই! ভারতের ধনাধ্যক্ষতা, ভারতবাসীর সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতির সমস্ত অধিকার, ভারতীয়ের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ সকলই তো আজ পর্য্যন্ত সেই বৈদেশিক শাসকবর্গেরই হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে; শত শত ভারত-সন্তান তো আজও স্বদেশ-সেবার তুচ্ছতম প্রচেষ্টা করিয়া বিদেশী শাসকের শাসনযন্ত্র-তলে ঘৃণ্য অপরাধীর মতই নির্ব্বিচারে নিষ্পিষ্ট, কোথাও অ-বিচারে অন্তরীণে আবদ্ধ। স্বদেশীর শত শত ব্যাকুল আবেদন নিবেদনেও তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই; ভয় মৈত্রী কিছুই তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। দেশ আজও সেই অজ্ঞতার অজ্ঞানের অন্ধতমসায় সমাচ্ছন্ন, দারিদ্র্যের দুর্ব্বিসহ দুঃখদৈন্যে জর্জ্জরিত। অসংখ্য, অসংখ্য নিরক্ষর নীতিজ্ঞানহীন দুঃস্থ নর-নারী নরপশুর মতই নির্ব্বিরোধে সমাজ বক্ষে বিচরণ করিয়া ফিরিতে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে না। ধনী দরিদ্রের ভেদ, পর্ব্বত মেরুর মতই প্রবলতর হইয়া রহিয়াছে। নারীধর্ষণ, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধ, হত্যা, চৌর্য্য, অন্নাভাব—এ সমস্তই তো যথাপূর্ব্ব অপ্রতিবিধেয়রূপেই বর্ত্তমান—এমন কি প্রবর্দ্ধমানরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিত। এ সব তবে কিসের জন্য রহিয়া গেল যদি ভারতের চির-আকাঙ্ক্ষিত, যুগ-প্রতীক্ষিত, বহুপ্রার্থিত সেই শুভদিন আসিয়া থাকিবে? এই কি সেই কল্পনায় রচিত, স্বপ্নে গঠিত শুভদিন, যাহার জন্য ভারতবাসী পথ চাহিয়া বসিয়া আছে?

না, এ সে দিন নহে। তৃষাতুর চাতকেরা, ক্ষুধাতুর কৃষকেরা বারিধারার আশাপথ চাহিয়া থাকে, মেঘ যখন দেখা দেয় তখনই তাহারা জানিতে পারে এসেছে 'সেদিন এসেছে'—যে দিন তাদের তৃষিত তাপিত দেহ-মন নব বারিবর্ষণের সরসরসে অভিষিক্ত, তৃপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু মেঘ আসে ঈশানের রুদ্র রূপ ধরিয়া, সঙ্গে আনে তাঁর প্রলয়-ডমরুর বাদ্য, বজ্র

বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝাবাত। তৃষিতকে. ইহার বেগ বহিতে হয়, তবে সে তার তৃষ্ণার জল-রূপ ফল-লাভ করে,—তবু সে জানে, মেঘ দেখা দিলেই সে আপনা হইতে বুঝিতে পারে সেদিন এসেছে!'

অমাবস্যার পরেই শুক্ল পক্ষে অমল জ্যোৎস্না উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। অমাবস্যার অমানিশা যখন অস্ত হয়, তখনই আমরা জানিতে পারি পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র ক্রম পরিণতিতে পূর্ণতর হইতেছেন, সেদিন এসেছে!

আজ আমাদের চিরআকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল না হইলেও আমাদের সাক্ষাতে এমন একটি সুদিন দেখা দিয়াছে যেদিনে আমরা পরিপূর্ণরূপে আশা করিতে পারি, এর পর হইতে আমাদের পথ সুগম এবং যাত্রা সফল হইয়া উঠিতে বাকি থাকিবে না। আজিকার এ ঊষা নব জাগরণের, নবীন সূর্য্যোদয়ে সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় দিবাগমনের সূচনা। ভোরের আলোয় যেমন আমরা দিবাগমন জানিতে পারিয়া বলিয়া থাকি, দিন এসেছ, এ-ও আজ তেমনই করিয়া আমাদের দিয়া বলাইয়া লইতেছে, 'এসেছ সেদিন এসেছ। ওগো পুরবাসি! ওগো জাতি-ধর্ম্ম-ভেদনীতি-বিবর্জ্জিত ভারতবাসি! এসো এসো, বরণডালা তো তোমাদের হাতেই আছে, আমায় বরণ করিয়া লও, আমি এসেছি—তোমাদের আবাহন-মন্ত্রে সঞ্জীবিত, পুনরুজ্জীবিত হইয়া দীর্ঘনিশার অবসানে আবার অরুণরাগদীপ্ত তরুণমূর্ত্তিতে তোমাদের কাছে এসেছি।

অনেক দুঃখের নিশা প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, আজ আর তাকে যেন আমরা ব্যর্থ না করি, এই সূর্য্যকরোজ্জ্বল শুভদিনকে আমরা যেন বৃথা অপব্যয়িত হইতে না দিই, নরনারীর চিরন্তন অধিকার অনধিকারের দম্ভ ও দাবী জাতিধর্ম্মের সনাতন বিদ্বেষ ও বিরাগ, উচ্চনীচের অপমান ও অভিমান, এ সমস্তকেই আজ এই সুপ্রভাতে বর্জ্জন করিয়া দিয়া অর্জ্জন করিতে হইবে সমবেতভাবে সকলকার নিকট হইতেই সকল তুচ্ছ সংস্কারমুক্ত সহানুভূতি ও সমানুভূতি। কর্ম্মের রথ জগন্নাথের রথের মতই সমবেত শক্তির সহায়তা ব্যতীত চলিতে পারে না, এ সত্য আজ কাহারও অবিদিত নাই। আজ অন্তরের সঙ্গে কবির ভাষাকে প্রত্যেকের প্রাণের ভাষায় পরিণত করিয়া বলিতে হইবে,—

'নিজের শত ক্ষত, শতেক ক্ষতি, ভুলিতে হবে আজ
সবারে স্মরি
সকল সুখসাধ যশের মোহ চলিতে হবে নিজে
দলিত করি।'

আজিকার এ শুভদিনে দেশমাতৃকার সন্ততিবর্গ, তাঁর পুত্র এবং কন্যা সমান স্থান গ্রহণ করিতে আসিয়াছে, না আসিলে চলিবেনা বলিয়াই আসিয়াছে। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবীর দিক দিয়া নয়, নারী পুরুষের সহযাত্রিণী, সহকারিণী বলিয়াই এ আগমন। আমাদের শাস্ত্রমতে স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। যদি শাস্ত্র মানি, এ আজ তাঁদের অনিবার্য্য। এর ফলে

গৃহের বর্ত্তমান শান্তি হয়ত অনেকের মতে অনেকখানি ব্যাহত হইয়েছে, হয়ত আরও হইবে, কিন্তু ওগো সুপ্তোত্থিত নরনারী উপায় তো নাই! যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহী, মৈত্রেয়ী তখন গৃহিনী; যাজ্ঞবল্ক্য যখন তপস্বী, মৈত্রেয়ী তখন বৃথা ধনের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন কি? রাজার মেয়ে সতী শ্মশানবাসিনী, আর জনক-দুলালী সীতা যে বনবাস করিয়াছিলেন, সেও তো তাঁদের পতিপ্রেমেই। পুরুষকে যদি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে হয়, স্ত্রী কেমন করিয়া অবরোধ নিবাসে আত্মসুখসম্ভোগে নিরতা রহিবেন, এ তো ভারত-নারীর আদর্শ নয়! আজ ভারতনারী তাঁর আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া নিজেদের নারী-মর্য্যাদার সম্মানরক্ষা করিতে পারিয়াছেন, যে ক'জনই পারিয়াছেন তা'র জন্য আমরা সম্মানিত।

সত্যবস্তু কোনদিনই চাপা থাকে না। আজ হোক্, কাল হোক্, একদিন এই জাতীয় জাগরণ যে বহুব্যাপী, বহুব্যাপক হইবেই তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ যাঁহারা ক্ষুদ্রস্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া ইহার প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, যাঁহারা আত্মসুখ-সম্ভোগে ব্যাপৃত রহিয়া ইহার সহিত নির্লিপ্ত রহিয়াছেন, একদিন তাঁহারাও তাঁহাদের স্বার্থ ভুলিবেন, নির্লিপ্ততা পরিহার করিবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

এই জাগরণের অগ্রদূত যাঁহারা তাঁহাদের এখন একমাত্র কর্ত্তব্য নিষ্কাম ভাবে সকলপ্রকার স্বার্থচেষ্টা পরিহার পূর্ব্বক এই মহা-জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে জিয়াইয়া রাখা। এর জন্য মানীকে মান ছাড়িতে হইবে, ধনীকে ধন দিতে হইবে, প্রভুত্বপ্রিয়কে নম্র হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতা ও প্রভুত্বগর্ব্ব এই দুইটি সর্পবিষে পুরুষ-প্রতিষ্ঠানগুলি বিষজর্জ্জরিত হইয়া উঠিতেছে,—বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে। আমাদের মেয়েদের মধ্যে এই দুটি বিষক্রিয়া যাহাতে হইতে না পারে তার জন্য যথাসাধ্য সাবধান হইতে হইবে। মৈত্রী ও প্রীতি দ্বারা সম্মিলন ঘটে, ঔদ্ধত্য ও বিদ্বেষে বিচ্ছেদ বাড়ায় মাত্র! পুরুষসঙ্ঘের অতীত ও বর্ত্তমান দৃষ্টান্ত হইতে আমরা যেন এইটুকু শিক্ষালাভ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে পারি, তাহাতে আমাদের কার্য্য তাঁহাদের মত বহুবিড়ম্বিত ও বহুবিলম্বিত না হইয়া আশুফলপ্রসূ হইতে পারিবে এবং তার ফলে অনেককেই আকর্ষণ করিতে পারিবে। যার শক্তি আপনাতে আপনি অটলস্থির, দৃঢ়সঞ্চিত, সেই অন্যকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

বহু ভাগ্যফলে, ভারতের বহু-যুগযুগান্তব্যাপী অতীত সাধনের ফলে আজ আবার আমাদের সাক্ষাতে প্রাচীন ভারতের ত্যাগপূত নিষ্কামমন্ত্রে মন্ত্র-সিদ্ধ শুচি শুদ্ধ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ক্ষুদ্রস্বার্থ, হীন দলাদলি, অধিকার বহির্ভূত অপ্রয়োজনীয়, অথবা তোমার বলবুদ্ধি ধারণার অতীত গূঢ় সাধনা ও সূক্ষ্মবোধে অনুভূত কোটী কোটী মানববৃন্দের চিরাচরিত সমাজ-সংস্কারে ধৃষ্টভাবে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ না করিয়া, সমস্ত জাতির বন্ধন-রজ্জুকে শ্লথ করিবার জন্য, তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করো, এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যেমন, নারী-পুরুষ সমস্যাও তেমনই; সকল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই এই জাতীয় যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জ্জিত হোক, শুধু আজ সমস্বরে চাও স্বাধীন

ভারত, শুধু গাও স্বাধীনতার জয়গান, নারী-পুরুষের সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার ইত্যাদির কলহ-কাকলী ডুবাইয়া দিয়া জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যোগ্যতমের অধিকার, যে অধিকার বিশ্বনিয়ন্তার নিজ হস্তের দান তাকেই স্বীকার করিয়া লও। আর সকলকেই সমচিত্তে দেশের একমাত্র নেতাকে, যাঁকে সমস্ত সভ্যজগৎ তোমার দেশের নেতা বলিয়া সম্মান দান করিতে কার্পণ্য করে নাই, কুণ্ঠিত হয় নাই, তাঁর কাছে নত হও।

বগুড়া রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর পতাকা-উত্তোলন সভায় মহিলাগণের উদ্দেশ্যে পঠিত।

তরী

শ্রীজ্যোৎস্নাময়ী দত্ত

আজ প্রভাতে আমার তরী,
বাঁধন খুলে
আপন ভুলে
ছুটলো সাগর পানে।

জানিনা আজ কিসের তরে,
এমনি করে,
আবেগ ভরে,
ছুট্‌লো গো কার টানে।

কোন্ কুলেতে ভিড়বে তরী?
ঠিকানা নাই
আমি যে চাই,
বাইতে তারি সাথে।

ওগো তরি! দাঁড়াও ক্ষণেক,
বাঁধন টুটে
আমিও ছুটে,
যাইগো তোমার সনে।

পূজার ছুটির একদিন

শ্রীসুপ্রভা দাস

সেবার পূজোর ছুটিতে —ষ্ট্রীটের ছাত্রী-নিবাস খোলা-ই ছিল। কারণ আর কিছুই নয়, সারা বছরের ফাঁকিটাকে আরেকটা বৃহত্তর ফাঁকি দিয়ে ঢাকবার প্রচেষ্টায় কয়েকজন জেদ্ ধ'রে ব'স্‌লো, এবার হোষ্টেল খোলা রাখ্‌তেই হবে। তাই হোল, সাত আট জনকে নিয়ে প্রকাণ্ড ছাত্রী-নিবাস খোলা রইল।

সেদিন খাবার টেবিলে ব'সে শুভা প্রস্তাব ক'রলে, একদিন কাছাকাছি কোন এক গ্রামে বেড়াতে যাওয়া যাক্। শুভা পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশের ছাত্রী, উপরন্তু মেয়েদের ভিতরে তার ভক্তের সংখ্যাও কম নয়, তাই আবলম্বে তার প্রস্তাব অনুমোদিত হোল। সবাই মিলে ঠিক ক'রলে, পরের দিন সকালেই যে ট্রেণ ছাড়ে, সেটা ধ'রে যাওয়া হবে।

শুভা ও তার তিন ভক্ত—মায়া, সাবিত্রী ও যুঁই—এদের ছুটোছুটি দেখে মনে হ'য়েছিল এরা যেন কোন্ বিয়ের বরযাত্রী! ঘড়িতে য়্যালার্ম্ দেওয়া হোল যাতে ভোর সাড়ে চারটায় সকলের ঘুম ভাঙ্গে; আর সেই য়্যালার্ম্ বাজ্‌লো সাড়ে পাঁচটায়। আধঘণ্টার ভিতরে একরকম ঊর্দ্ধশ্বাসেই বেরিয়ে পড়া গেল, তবে দুঃখের বিষয় তাড়াতাড়িতে মায়ার দামী রিষ্টওয়াচটা হাত থেকে প'ড়ে একটু জখম হ'য়ে রইল।

—রোডে গিয়ে বাসের জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটির দেখা পাওয়া গেল। মেয়েদের ভিতরে মায়া-ই ছিল সবচাইতে কর্ম্মকুশল, তাই ষ্টেশনে নেমে টিকিট কেনার ভার তার ওপরেই দেওয়া হ'য়েছিল। সে দুটো টাকা বার ক'রে দিলে, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের মধ্যে একটি "অচল" হ'য়ে ফিরে এল। টিকিটের পর্ব্ব কোনও রকমে চুকিয়ে দিয়ে ট্রেণ ধর্‌বার জন্য সবাই ব্যস্ত হ'য়ে এগিয়ে চল্‌লো—চেকার ব'লে দিল "Hurry up!" "Hurry up!"—আর "Hurry up!" ততক্ষণে সবুজ নিশান উড়তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের সাম্‌নে দিয়ে হুস্ হুস্ ক'রে ট্রেণখানা অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

পরের ট্রেণ ছাড়্‌লো প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর। ···ষ্টেশনে নাম্‌বার কথা; সেখানে নেমে চোখে প'ড়্‌লো একটা শিউলি গাছ—তার তলা ছেয়ে গেছে শাদা ফুলে—সেই অনাদৃত ফুলগুলি কুড়োতে কুড়োতে শুভার মুখ দিয়ে হঠাৎ একটা গানের লাইন বেরিয়ে গেল—

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,
এমন ভুল কেমন ভুল?

ঠিক্ সেই সময়টাতে মায়া তাকে ধমক্ দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"কবিদা, (শুভাকে সবাই 'কবিদা' ব'লে ডাকে) ঢের হ'য়েছে, এখন তোমার কবিত্ব রেখে পথ চলো।"

গ্রামের উঁচু নীচু সরু রাস্তা ধ'রে চারটি প্রাণী চলেছে ; তাদের দু'ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত—যতদূর চোখ যায় গাঢ় শ্যামলিমা ভিন্ন আর কিছুই চোখে পড়ে না। অন্তবিহীন তার রূপ, অসীম তার ঐশ্বর্য্য। অতি দূরে দূরে তাল, সুপারি, নারকেল গাছের সারি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দাবীও যে কারুর চাইতে কম নয়, আকাশের নিবিড় নীলিমা, প্রভাত ও সন্ধ্যাসূর্য্যের অরুণচ্ছটা সবার আগে তাদের-ই আনন্দ দান ক'রে এসেছে, এই কথাটা পান্থজনকে জানিয়ে দেবার জন্য তাদের কী আন্তরিক প্রয়াস!

মায়া ও সাবিত্রী এক একবার চোখ বুলিয়ে আশে-পাশের সব কিছু দেখে নিচ্ছে—যেমন ক'রে ফাইনাল একজামিন এর দিন হলে ঢোক্‌বার ঘণ্টা পড়ার আগে 'নোটের' পাতা উল্টে দেখে নেয়—আর তার পরমুহূর্ত্তেই সুরু ক'রছে অর্থনীতির কূট প্রশ্নের মীমাংসা—জয়েণ্ট ইলেক্‌টরেট্ এর দোষগুণ বিচার। ট্রেণে থাক্‌তেই তাদের তর্ক উপস্থিত হ'য়েছিল, তখনও তারই "ক্রমশঃ" চল্‌ছে। যুঁই একের পর এক গান ক'রে যাচ্ছে—'গ্রামছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ' থেকে সুরু ক'রে 'প্রলয় নাচন নাচ্‌লে যখন আপন ভুলে', 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি', 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা', 'আজ কি তাহার বারতা পেলরে কিশলয়,' 'My name is William Harry Green'—এর মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কণ্ঠকে বিশ্রাম দেয়নি। মাঝে মাঝে মায়া অথবা সাবিত্রীর ভৎ'সনার সুর শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু যুঁইএর তরুণ অন্তরটা ততক্ষণ পল্লীর আকাশ-বাতাসের সঙ্গে উধাও হ'য়ে বেরিয়ে পড়েছে—সে তখন সকল শাসন-বাঁধনের বাইরে।

প্রায় একমাইল পথ অতিক্রম ক'রে তা'রা এক গৃহস্থ-পরিবারে এসে উপস্থিত হোল। গৃহিণীর সঙ্গে এদের আগে থেকেই বিশেষ পরিচয় ছিল। সবাইকে দেখে আনন্দের আতিশয্যে প্রথমটা তাঁর কথাই সরেনি, তারপর যখন প্রকৃতিস্থ হ'লেন, তখন সবাইকে ধ'রে সে কী আদর! তাঁর ছোট ছেলে কতকগুলো ডাব পেড়ে আন্‌লে, তাই দিয়ে সাবিত্রীরা সবাই পথচলার ক্লান্তি দূর ক'রে নিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মায়া ও সাবিত্রী গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে জোর জবরদস্তি ক'রে রান্নাঘরে ঢুকে পড়্‌লো আর যুঁই কবিদার হাত ধ'রে বেরিয়ে গেল গ্রামটা একটু ঘুরে আস্‌বার আশায়। বেলা বারোটায় বাড়ী ফিরে এসে তারা দেখ্‌লে মায়া, সাবিত্রী তখনও স্নান করেনি। পুকুরে সবাই মিলে একসঙ্গে স্ফূর্ত্তি ক'রে একটু মাতামাতি করবে, এই তা'দের ইচ্ছা। তাই হোল। সবাই একসঙ্গে জলে নেমে পড়্‌লো। তাদের মাতামাতিতে পুকুরটা তোলপাড় হয়ে উঠছে, এম্‌নি সময় হঠাৎ দেখা গেল মায়ার মাথাটা যেন নীচের দিকে তলিয়ে যাবার উপক্রম করেছে। মেয়েদের মধ্যে সাবিত্রীর দেহের শক্তি সব চাইতে বেশী, সে তৎক্ষণাৎ মায়ার লম্বা চুলের গোছা একহাত দিয়ে টেনে ধরে তার মুখখানা জলের উপরে তুলে ধর্‌লে—এ যাত্রা মায়া বেঁচে গেল।

স্নান সেরে উঠে এসে হাস্‌তে হাস্‌তে সাবিত্রীকে মায়া বল্লে, 'পুরাণের সাবিত্রী তার স্বামী সত্যবান্‌কে প্রাণদান করেছিল, আর এই ঘোর কলির সাবিত্রী তার বন্ধু মায়াকে প্রাণ দান ক'রেছে।'

স্নানের পর খেতে বস্‌বার আয়োজন। পুকুরের দিক্‌কার প্রশস্ত, খোলা বারান্দায় সবার খাবার জায়গা হোল। গৃহের যিনি জননী তিনি স্বহস্তে পরিবেশন ক'রলেন। সাবিত্রীদের মনে হোল তা'রা যেন সুধা পান ক'রছে, আর গৃহকর্ত্রী যেন কল্যাণী লক্ষ্মীমূর্ত্তি। আনন্দের আতিশয্যে শুভা ব'লে উঠ্‌লো, 'প্রেম-ই তো সুধা; অন্য কোন সুধার স্বাদ তো পাইনে, কারণ তাতে শুধু দেবতারই অধিকার। মানুষের অন্তরে এত প্রেম, আর 'প্রেম নেই' ব'লে আমরা কেঁদে মর্‌ছি। কেবল ঐ দরজাটুকু ফাঁক করার শৈথিল্য; সে শৈথিল্যকে পরাজিত ক'রে দরজা খুলে একবার প্রবেশ ক'রলেই দেখ্‌তে পাবো, কোথাও প্রেমের অন্ত নেই। এত প্রেম যাদের, তা'রা কখনও মর্‌তে পারে না, কারণ প্রেম স্বয়ং মৃত্যুহীন এবং তার ভক্তকে সে অমৃতত্ব দান করে। ভরা থাক্‌ বাংলার পল্লী, ভরা থাক্‌ বাংলার মা-বোনের অন্তরের স্নেহ-দয়া-প্রেম, ভরা থাক্‌ তাদের সহজ সুখ।'

কথা শেষ হবার পর মুখ ফিরিয়ে শুভা দেখ্‌লে যুঁই মুখ টিপে হাসছে। শুভাকে চাইতে দেখে একগাল হেসে সে ব'লে উঠলো, 'কবিদা, তোমার কথাগুলো যখন মায়াদি সাবিত্রীদি হাঁ ক'রে শুন্‌ছিল, সেই অবসরে আমি মায়াদির পাতের মাছ ভাজাটা লুকিয়ে তুলে এনেছি, ও এখনও টের পায়নি।'

খাওয়া শেষ হ'লে সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলে। সেদিন জোয়ার আস্‌বার কথা, তাই যুঁই ধ'রে বস্‌লো সে গ্রামের বড় খালটায় জোয়ারের জল দেখতে যাবে। প্রথমে সে কবিদার কাছে আবেদন জানালে; কিন্তু সেখানে বকুনি খেয়ে সে গেল সাবিত্রীর কাছে, কারণ তার আব্দার সবচাইতে সাবিত্রী-ই বেশী সহ্য করে। সাবিত্রী একা যেতে চাইলে না, তাই সবাইকেই যেতে হোল প্রায় আধ মাইল দূরে সেই খালের কাছে।

সেখান থেকে ফিরে আসতে বিকেল হ'য়ে গেল। গৃহকর্ত্রী সবাইকে মিষ্টিমুখ করালেন, তারপর আবার আস্‌বো প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্ধ্যার আগেই সাবিত্রীরা ষ্টেশনে আসবার জন্য বেরিয়ে পড়্‌লো। কিছুদূর এগিয়ে গেছে, হঠাৎ একজনের মুখোমুখি এসে শুভা থম্‌কে দাঁড়ালো। চার পাঁচ বছর আগে এর সঙ্গে তার শেষ দেখা হ'য়েছিল টাউন হলের একটা সভায়। তার পর এর কোন সংবাদ-ই শুভা জানে না।

এখানে এর একটু পরিচয় দিলে নেহাৎ মন্দ হবে ব'লে মনে হয় না। শুভা যখন আই-এ পড়তে প্রথম কলকাতায় এল, তখন এই ছেলেটিকে সে পেয়েছিল সমপাঠী রূপে। সমপাঠী সে ছিল বটে, কিন্তু তার প্রতিভাদীপ্ত, উজ্জ্বল চোখ, সুদৃঢ়, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মুখসৌষ্ঠব, পৌরুষদৃপ্ত, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ শুভার কল্পনাপ্রবণ অন্তরখানিতে অনেকটা শ্রদ্ধা ও প্রণতি জাগিয়ে তুলেছিল। পরস্পর

পরস্পরকে খুব সুস্পষ্ট ভাবেই চিনতো, কিন্তু একদিনের জন্যেও তাদের বাক্য বিনিময় হয়নি। আজ দীর্ঘ চার পাঁচ বছরের ব্যবধানে সকল সঙ্কোচ কেটে গেছে, তাই মুখোমুখি হতেই শুভা জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌লো, 'আপনি এখানে ?' ছেলেটি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, 'আপনিও তো তাই !'

শুভা মায়াকে আস্তে আস্তে বল্লে, 'তোরা এগিয়ে যা ভাই, আমি একটু পরে আসছি। মায়া কিছু না বল্‌তেই সাবিত্রী শুভার কাণে কাণে ব'লে এল, 'এখন কিনা মনের মতো সঙ্গী পেয়েছে, তাই আর আমাদের সঙ্গে যাবার তোমার প্রয়োজন থাক্‌বে কেন ?' একথার কোন জবাব না দিয়ে শুভা তার এই বহুদিনের পরিচিত অতিথিটিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগ্‌লো। ধীরে ধীরে সে জান্‌তে পার্‌লে, তার বন্ধু (?) এখন প্রবাসের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ক'রছে। ছুটিতে বাংলা দেশে এসেছে, বাংলার কয়েকটা পল্লী সম্বন্ধে একটু সত্য খবর জান্‌বার আশায়। শুভা যখন তার মুখ থেকে শুন্‌লে, এর চাইতেও বৃহত্তর একটা আশা—অস্পৃশ্যতা নিবারণের আশা ছুটির বিশ্রাম থেকে ভুলিয়ে তাকে এখানে এনেছে, শুভার সমস্ত দেহমন পুলকে কণ্টকিত হ'য়ে উঠে কেবল একটি নমস্কার-রূপে সেই গোধূলির আলোয়, সেই পল্লীর মাটিতে, এই কর্ম্মী যুবকটির পায়ের কাছটিতে একান্তভাবে লুণ্ঠিত হ'তে চাইল।

তারপর দু'জনে পথচলা সুরু ক'রলে। একথা সেকথার পর স্টেশন এসে গেল। যাবার সময় ছেলেটি যখন নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিতে চাইল, শুভার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'কলকাতার দিকে কখনও গেলে দেখা ক'রবেন।' এর উত্তরে মৃদুহাস্যজড়িত, ক্ষুদ্র একটু 'আচ্ছা' ব'লে সে আবার গ্রামের দিক্‌কার পথ ধর্‌লে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ট্রেণের দেখা পাওয়া গেল। সবাই মিলে একটা খালি কামরায় উঠে পড়্‌লো। সাবিত্রী বল্লে, ওবেলা যাবার সময় ইকনমিক্‌স্‌এর যথেষ্ট শ্রাদ্ধ করা হয়েছে, এবার একটু গান ও কবিতার শ্রাদ্ধ হোক্‌। এই বলে চয়নিকার যতগুলি কবিতা সে মুখস্থ বল্‌তে পারতো একে একে সব বলে গেল। তারপর সুরু হোল তার গান—অতি মৃদু অথচ অতি মিষ্ট। এবার মায়া তা'কে বাধা দেয়নি, বোধ হয় সলিল-সমাধি থেকে তাকে বাঁচিয়েছে তাই।

গাড়ী পাগলের মতো ছুটে চলেছে। সেদিন ছিল লক্ষ্মী-পূর্ণিমার রাত—মাঠ-ঘাট জ্যোৎস্নায় ভ'রে গেছে—কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই—আর তা'রই সঙ্গে সাবিত্রীর গান, 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে ?'—সবার মনেই কল্পলোকের সৃষ্টি ক'র্‌ছিল।

হাওড়ার কাছাকাছি একটা ষ্টেশনে সবেমাত্র ট্রেণ ছেড়েছে, এমন সময় যুঁই শুভার কাঁধে হাত রেখে ব'ল্লে, 'কবিদা 'Morning shows the day" একথাটা একেবারেই ভুল ; আমরা এখন থেকে জোর গলায় ব'ল্‌বো, "All is well that ends well", ঠিক নয় ? শুভা তা'র মুখের দিকে আপনার উজ্জ্বল, সস্নেহ চোখ দু'টি তুলে ধরে শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হোল, 'সত্যি কথাই ব'লেছিস্‌, যুঁই !'

অশান্ত যুঁই অন্য সাথীদের সঙ্গে গল্প জমিয়ে তুললে; হঠাৎ তা'র কাণে প্রবেশ কর্‌লো শুভার মৃদু গানের দু' একটি লাইন—

একটুকু ছোঁয়া লাগে
একটুকু কথা শুনি
তাই নিয়ে মনে মনে
রচি মম ফাল্গুনী............

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ট্রেণ হাওড়ায় এসে দাঁড়ালো। এত আলো, এত জনতা, এত কোলাহল, এত আড়ম্বরের ভিতরে প্রবেশ ক'রতে হবে মনে ক'রে শুভার সমস্ত মন বিরূপ হয়ে উঠলো। তা'র মনে হ'তে লাগলো, কোনও রকমে যদি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়টাকে সেই স্নিগ্ধ পল্লীটিতে স্থানান্তরিত করা যেতে পারতো, তবে বোধ হয় চিরদিনের জন্য সে বেঁচে যেত।

বাসে উঠে প্রায় আধঘণ্টা তা'দের অপেক্ষা ক'রতে গেল, কারণ সাম্‌নে অনেকগুলো বাস্‌ তা'দের রাস্তা জুড়ে' দাঁড়িয়েছিল। সারাদিনের ক্লান্তিতে শুভার দু'চোখ ভ'রে ঘুম আস্‌ছিল, কতক্ষণ যে এ অবস্থায় কেটে গেছে সে জান্‌তেই পারেনি; হঠাৎ তার তন্দ্রার নেশা কোথায় উধাও হ'য়ে গেল, সে শুন্‌তে পেল বাস্‌কণ্ডাক্টার নিদারুণ কণ্ঠে হাঁক্‌ছে—'এই—এই—মাণিকতলা—মাণিকতলা!'
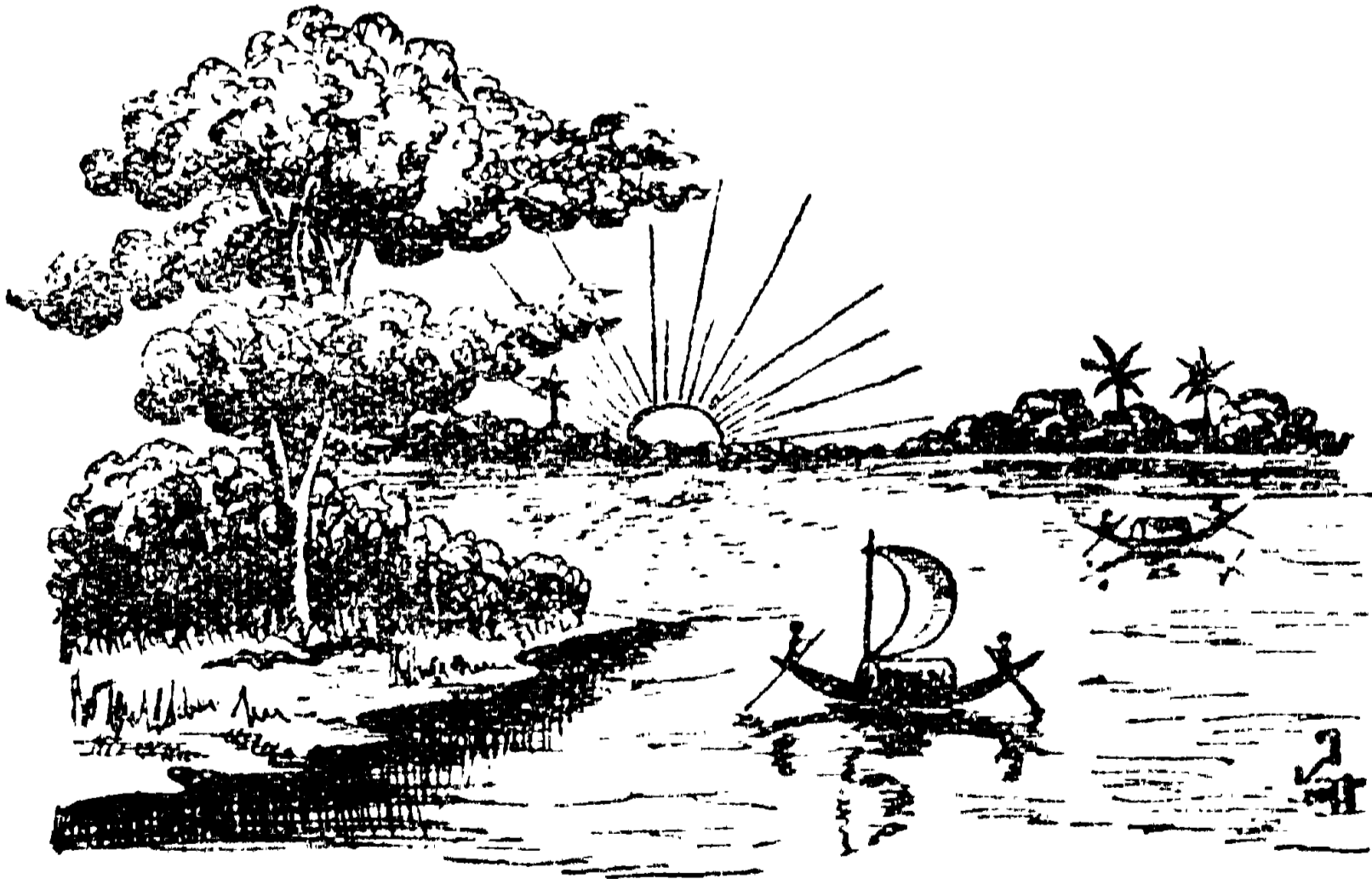
গান

শ্রীবেলাদেবী

বাংলা মায়ের শ্যামল কোলে
আছে কতই মধুর স্নেহ
ঘুমিয়ে যখন থাক্‌ব বুকে
এলিয়ে দিয়ে সোনার দেহ।
রবেনা মোর ভয় ভাবনা,—
হয়ত ফিরে আর পাবনা
এই দেশেরি সোনার স্মৃতি
এই দেশেরি অমল স্নেহ।
সবুজ ধানের দোল্‌না হাটে
যুঁই চামেলির পল্লী বাটে,
কোথা এমন ভুলিয়ে রাখে
কোথা এমন মধুর গেহ!
থাকি যখন পরবাসে
স্বপন স্মৃতি চোখেই ভাসে
ভাবি সদাই নয়ন জলে
ছাড়তে কি মা পারে কেহ।
তোমার ধরার শ্যামল মাটি
তোমার ফুলের আঙিনাটি
কত ভালো বাসি আমি
জানেনা মা অপর কেহ!

জন্ম-শাসন

শ্রীসুধাময়ী দেবী

জন্মশাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছুকাল হইতে এদেশের লোকের মনে আন্দোলন দেখা দিয়াছে। মেয়েদেরই এ বিষয়ে অধিক ভাবা স্বাভাবিক, কারণ এসমস্যা প্রধানতঃ মেয়েদেরই, যদিও পরোক্ষে ইহা সমগ্র জাতির।

জন্ম শাসনের প্রয়োজন আছে—প্রথমতঃ স্বাস্থ্য, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা ও তৃতীয়তঃ অর্থের দিক্ দিয়া।

অধিক সন্তান হইলে মায়ের স্বাস্থ্য যে ক্রমশঃই ভাঙ্গিয়া যায় তাহা বলা বাহুল্য। মায়ের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিলে এদেশের লোককে বড় একটা উদ্বিগ্ন হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সন্তানগণ যে তাহার ফল ভোগ করে কত দিক দিয়া তাহা আপাত দৃষ্টিতে বুঝা যায় না, অন্ততঃ অনেকে তাহা বুঝিতে চায় না। এক একটা সন্তান হইতে মায়ের দেহের যতখানি শক্তি ক্ষয় হয় তাহা পূরণ করিতে সময় লাগে যথেষ্ট। সেই ক্ষতির পূরণ হইতে না হইতে যদি আর একটা সন্তানের জন্ম তাঁকে দিতে হয়, তবে তাঁর দেহের উপর যে জুলুম হয় তাতে সন্তানেরও ক্ষতি করে। সেই সন্তানের সুস্থ দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ সম্ভব কিরূপে? তারপর তাহার লালন-পালনের জন্য যে সময় প্রয়োজন, যে মনোযোগ আবশ্যক, মায়ের সে সময়, সে মনোযোগ দিবার অবসর কোথায়? বয়সের অল্প ব্যবধানের শিশুদের লইয়া মা কাহার অভাবই বা পূরণ করেন, কার অভিযোগই বা আগে শোনেন? ইহার উপর রহিয়াছে সংসারের সকল কর্ত্তব্য। শিশুদের সেবা যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়াও যে মা সংসারের অন্যান্য কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতে পারেন, তাঁহার শক্তি সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু বহু-সন্তানবতী মাতার পক্ষে সকল দিক্ রক্ষা করা বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। এরূপ ক্ষেত্রে সন্তানেরাই দুঃখ ভোগ করে অধিক। যথাসময়ে তাহাদের স্নান-আহার হয় না, মায়ের সস্নেহ সঙ্গলাভে শিশুর শরীর ও মনের যে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি হয় তাহার কল্পনা করাই এক্ষেত্রে বৃথা। এমন কি মায়ের সামান্য মনোযোগের অভাবে যে সদভ্যাস সমূহ শিশুকাল হইতে গঠিত করা যায়, সেগুলিও হইতে পারে না। বরং মায়ের দৃষ্টির অভাবে নানা কুঅভ্যাস অনায়াসে মজ্জাগত হইয়া যায়। সংসারের নানা কাজের মধ্যে মা শিশুর জন্য যতটুকু সময় দেন, তাহাও ব্যস্ত ও অনেক সময় বিরক্ত মন লইয়া। ইহার ফলে মা ও শিশুর মধ্যে যে স্বাভাবিক মধুর সম্বন্ধ তাহার পরিবর্ত্তে অনেক স্থলেই অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। ইহার ফল শিশুর পক্ষে যে কত মারাত্মক তাহা শিশুর মন যাঁহারা বোঝেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারেন। অনেক স্থলেই যে সকল শিশুর বুদ্ধির

বিকাশ তেমন হয় নাই দেখা যায়, সেখানে মায়ের তাহার প্রতি মনোযোগের অভাব বুঝিতে হইবে। মায়ের যত্ন ও মনোযোগ শিশুর প্রাণশক্তি; ইহার অভাবে শিশু-কোরক শুকাইয়া যায়। যে মা সংসার ও শিশু-পালন দুই দিকই সমান ভাবে বজায় রাখিতে যান, তাঁহার শরীর ও মন দুইএরই উপর যে চাপ পড়ে, তাহাতে অধিক কাল তাঁহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা কঠিন, বাঁচিয়া যদিও বা থাকেন, ত জীবন্মৃত অবস্থায়। সন্তানদের দশাও অনুরূপ হয়। উপযুক্ত যত্নের অভাবে যে ক'টী সংসার হইতে অকালে চলিয়া যায় তাহাদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়; যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও রুগ্ন শীর্ণ দেহ বহন করিয়া সংসারের ভার বৃদ্ধি করে। চোখের উপর কতশত ঘটনা এরূপ নিয়তই ঘটিয়া যাইতেছে, তথাপি আমাদের চোখ ফোটে না।

বিভিন্ন সন্তানের যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিক্ষার আবশ্যক আছে তা' মায়ের নিকট হইতেই প্রথম গ্রহণ করা আবশ্যক। বিদ্যালয়ে যাইয়াই বালক-বালিকাগণ জীবনের শিক্ষা কতটুকু গ্রহণ করে? কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া ও খেলাধূলার মধ্য দিয়া জীবনে কার্য্যকরী শিক্ষা সামান্যই তাহারা লাভ করে। গৃহের আবেষ্টন, পিতামাতার নিকট আচার-ব্যবহার ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা, এইগুলি সংসার-পথের চিরদিনের সম্বল। সন্তানকে এই সকল পাথেয় যোগাইয়া দিতে পারেন বুদ্ধিমতী মাতা। ইহার জন্য চাই মায়ের সন্তানের নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন। সেই সম্বন্ধ স্থাপিত হয় আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া। মা যদি সেই আলাপ-আলোচনার অবসরই না পান, তবে সন্তানের সমূহ ক্ষতি। ক'একটী সন্তান যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন মায়ের আর সন্তান না হওয়াই বাঞ্ছনীয় নতুবা সন্তানদের মনে পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মান খুবই স্বাভাবিক।

সন্তান জন্মাইলেই ত কেবল হইল না; তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য যেমন অর্থের প্রয়োজন আছে, উপযুক্ত শিক্ষার জন্যও অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং আর্থিক সামর্থ্য বুঝিয়া সন্তানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে সন্তানদের উপর অবিচার করা হয়। যথাযথ ভরণ-পোষণের অভাবে মাতা ও সন্তানের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি, তাহার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সন্তানদের শিক্ষার জন্য মাতার যে দেহ মনে অবসরের দরকার সে সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে। মাতার দেহ-মনের অবসর মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে খুবই কম। পরিচারক বা পরিচারিকা রাখার সামর্থ্য সকলের নাই। সংসারের যাবতীয় কাজের ভার গৃহিণীর উপর। সেই সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে সন্তান পালন ও সন্তানের শিক্ষাদান একটী। সুতরাং বহু সন্তান লইয়া মাতার পক্ষে কোনও কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করা অসম্ভব। ইহার উপর গৃহিণীর আর একটী কর্ত্তব্য রহিয়াছে স্বামীর সেবা ও চিত্ত বিনোদন। সংসারের খুটিনাটী কাজ ও শিশুদের আব্দার-অভিযোগ রক্ষা করিয়া গৃহিণীর স্বামীসেবা কোনমতে চলিতে পারে, কিন্তু চিত্ত-বিনোদন কোনমতেই সম্ভব নয়। এদিকে পুরুষ চায় কর্ম্মান্তে গৃহে আসিয়া নিরুপদ্রব শান্তি ও আনন্দ, নারীর সঙ্গ ও সেবা। গৃহ নিরানন্দময় বা বিশৃঙ্খল কোলাহলপূর্ণ দেখিতে দেখিতে পুরুষের মন গৃহবিমুখ হইয়া পড়ে। আমোদের

সন্ধানে সে যায় অন্যত্র। নারী যৌবনসুলভ আনন্দ করিবার অবসরের অভাবে হইয়া পড়ে অকাল-বৃদ্ধা।

এই সকল অশান্তি ও অর্থের অনটনের কথা ভাবিয়া অনেক পুরুষ আজকাল বিবাহ করিতে নারাজ। বিবাহ তাহাদের নিকট বিভীষিকাময়। শিক্ষিতা নারীদের নিকটও বিবাহের অন্ধকার দিকটা বেশী করিয়া প্রতিভাত হইয়া উঠে। এই বিভীষিকা কমাইতে পারা যায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা।

ভগবান মানুষকে বুদ্ধি বলিয়া একটী পদার্থ দিয়াছেন। প্রকৃতির অন্ধশক্তি দ্বারা অন্ধের ন্যায় সে চালিত হইবে, এ ভগবানেরও ইচ্ছা নয়। যে কটী সন্তান হইলে দম্পতী অর্থের দিক্ দিয়া সামর্থ্যের দিক্ দিয়া অনায়াসে তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে, নিজেদের দাম্পত্য জীবনও আনন্দময় রাখিতে পারিবে সেই ক'টী সন্তানেরই জন্ম তাহাদের দেওয়া কর্ত্তব্য।

অর্থের স্বচ্ছলতা থাকিলেই বহু সন্তানের জন্ম দেওয়া যাইতে পারে, এ মনে করা ভুল। ধনীর গৃহে শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেতনভোগী লোক থাকায় মায়ের কতকটা বিশ্রাম হইতে পারে, কিন্তু বহু সন্তানের জন্মদানও কি সহজ ব্যাপার? ধনীর গৃহে হাজার সুখ-সুবিধার মধ্যে থাকিলেও সন্তান প্রসবে শরীরের যে শক্তিক্ষয় হয় তাহা পূরণ করা সময়সাপেক্ষ। সুতরাং ধনীর বনিতা বহু সন্তানের জননীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া গেছে, এমনও দেখা যায়।

তবে একথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, কেবল নিজেদের আমোদ ও স্বার্থপরতার জন্য বিবাহিত জীবনে সম্পূর্ণ জন্মরোধ করিয়া রাখিবার অধিকার কাহারও নাই। একথা ভুলিলে চলিবে না, বিবাহ সামাজিক ব্যাপার, বিবাহের উদ্দেশ্য মূলতঃ সৃষ্টি। সমাজের প্রতি প্রত্যেক দম্পতীর কর্ত্তব্য হইতেছে সৎ সন্তান দান। যাহারা কেবলমাত্র নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের কিঞ্চিৎ হানি ঘটিবে ভাবিয়া এই কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে চায় না, তাহাদের স্বপক্ষে কিছুই বলিবার নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক দম্পতীর কর্ত্তব্য সমাজকে সৎসন্তান দান। সন্তান সৎ ও সুন্দর হইতে হইলে দম্পতীর পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেম থাকা একান্তই প্রয়োজন। যেখানে সেই শ্রদ্ধা ও প্রেমের অভাব, সেখানে সন্তান না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে কথায় কথায় বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন তুলিলে সমাজকে অতিশয় বিপর্য্যস্ত করা হয়। দুই একটী সন্তান বর্ত্তমানে বিবাহ-বিচ্ছেদ না করাই শ্রেয়ঃ মনে হয়। সন্তানদের সম্মুখে নিজেদের মনোমালিন্য যথাসাধ্য প্রকাশ না করিয়া আপনাদিগকে সংযত রাখা যাইতে পারে; অথবা কিছুকালের জন্য পরস্পর দূরে থাকিতে পারা যায়। দূরে থাকার কারণ সন্তানগণের নিকট ও পরিবারস্থ অন্য সকলের নিকট অপ্রকাশিত রাখিতে পারিলে ভাল। এই সাময়িক বিচ্ছেদে পরস্পরের মনের গ্লানি অনেক সময় দূর হইয়া যায়।

বিবাহের পর প্রেমের সত্যতা ও গভীরতা যাচাই করিবার জন্য কিছুকাল সন্তান পালনের দায়িত্ব না লওয়ার প্রস্তাবটী মন্দ নয়। বিশেষতঃ বিবাহের পর পরস্পরের সঙ্গ পাইবার যে প্রবল

আকাঙ্ক্ষা তাহা ধীরে ধীরে শান্ত, সুসংযত হইবার পূর্ব্বেই যদি নারীকে সন্তান-পালনের জন্য বিব্রত হইতে হয় তবে পুরুষের মন কতকটা দমিয়া যায়, ইহা বাস্তব সত্য। ইহাতে পরস্পরের মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটা দূরত্ব আসিয়া পড়ে। ঐরূপ দূরত্বের ফলেই অনেক স্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন মনে জাগে। যাহাকে দেখিয়া শুনিয়া ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে, বিবাহের কিছুকাল পরেই তাহাকে ভাল না লাগার কারণ আর কিছুই নয়—পরস্পরের অবস্থা ও মনোভাব পরস্পরে বুঝিতে না পারা। সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন এত সহজে উঠিতে দেওয়া কোনও কাজের কথা নয়। বরং সাময়িক মনোমালিন্যের হেতু সন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

ছোটখাটো কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ দেওয়া সমাজের পক্ষে সত্যই মারাত্মক। তবে কোন পক্ষের চরিত্রের দোষ দেখিলে সন্তান অবর্ত্তমানে পুরুষ-স্ত্রী উভয়েরই বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার থাকা আবশ্যক। অসচ্চরিত্র হইলেও স্বামীকে পূজা করিতে হইবে, এ আদর্শ আর আজকাল চলিবে না। তবে প্রকাশ্যে বিচ্ছেদ সাধন করিবার পূর্ব্বে নানাদিক্ দিয়া সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। চরিত্র সংশোধন করিবার সময়ও এবং সুযোগ দেওয়া চাই। হাজার হইলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ কিছু সুখের ব্যাপার নয়। সন্তান দুই একটী বর্ত্তমান থাকিলে সম্পূর্ণ বিবাহ-বিচ্ছেদ সন্তানের সম্মুখে কু-দৃষ্টান্ত। সে স্থলে চরিত্র সংশোধিত হওয়া পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ না রাখিবার অধিকার উভয়েরই আছে, এবং বৃথা হা হুতাশ না করিয়া এইরূপেই মনে হয় ব্যভিচার অনেক কমাইতে পারা যায়। অবশ্য কেবলই প্রেমহীন ঘৃণা সকল সময় তেমন কার্য্যকরী হয় না; তবে নীচতার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন করিবার তেজ থাকিলে নীচতা আপনিই তাহার সম্মুখে মাথা নত করে।

যাহা হউক, বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন লইয়া খুব নাড়াচাড়া না করিয়াও এইটুকু বলা যায়, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ মানুষের ইচ্ছাধীন হওয়া কোনও দোষের নয়, বরং তাহাই বাঞ্ছনীয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন্ম-শাসনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য সৃষ্টি একথা সত্য। তবে দাম্পত্য জীবন যে শুধুই সৃষ্টির জন্য, একথা বলিলে ভুল বলা হয়। দাম্পত্য প্রেম সুন্দর সজীব রাখিবার জন্য দৈহিক মিলনের প্রয়োজন আছে। সুতরাং সৃষ্টির প্রয়োজনের বাহিরেও দৈহিক মিলন মনের মিলনের সহায়তা করে। সেখানে প্রয়োজন মত সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করাতে কোনও দোষ নাই।

জন্মশাসনবিধি প্রচলিত হইলে সমাজে উচ্ছৃখলতা বাড়িবে এই ভয় অনেকের মনে আছে। উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিতে আজ পর্য্যন্ত কেহ পারে নাই। জন্মশাসনের কথা যাহারা জানে না, সেই সকল নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা কি কম? বরং তাহারা ভীষণতর পন্থা অবলম্বন করিয়া অধিকতর পাপে লিপ্ত হয়। জন্মশাসন-বিধির অভাবে যথেষ্ট দুঃখভোগ করে নির্দ্দোষ শিশুরা। এ ক্ষেত্রে জন্মশাসনের দ্বারা অনেক হতভাগ্য শিশুর অপ্রত্যাশিত জন্মরোধ করিলে বরং কল্যাণই হইবে।

উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকৃতপক্ষে কমাইতে হইলে মানুষের মনের পাপ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিতে না দেওয়ার উপায় করিতে হয়। তাহার জন্য চাই শিক্ষা, কার্য্যক্ষেত্র ও কাজের শক্তি বাড়াইবার চেষ্টা, নানারূপ বিভিন্ন চিন্তারাজ্যে মনকে চালিত করা।

পিতামাতা বা কোনও গুরুজন বালক-বালিকাদিগের বয়ঃপ্রাপ্তিকালে যদি অতি স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের নিকট যৌন-সম্বন্ধের যথাযথ প্রয়োজন, ইহার সংযত সৌন্দর্য্যের দিক্‌টী বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে বহু জটীল সমস্যার সমাধান বোধ হয় অতি সহজে হইয়া যায়। বালক বালিকাগণ, যুবক যুবতীগণ যদি আপনা হইতেই বুঝিতে শিখে, যে এই সম্বন্ধের অপব্যবহারে নিজেদের স্বাস্থ্যের ও ও সমাজের স্বাস্থ্যের হানি ঘটে, তাহা হইলে উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের জন্য বোধ হয় কঠোরতর নীতি অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। ব্যাধির প্রতিকারের জন্য উপরে প্রলেপ না লাগাইয়া ভিতরকার চিকিৎসা করাই শ্রেয়ঃ।
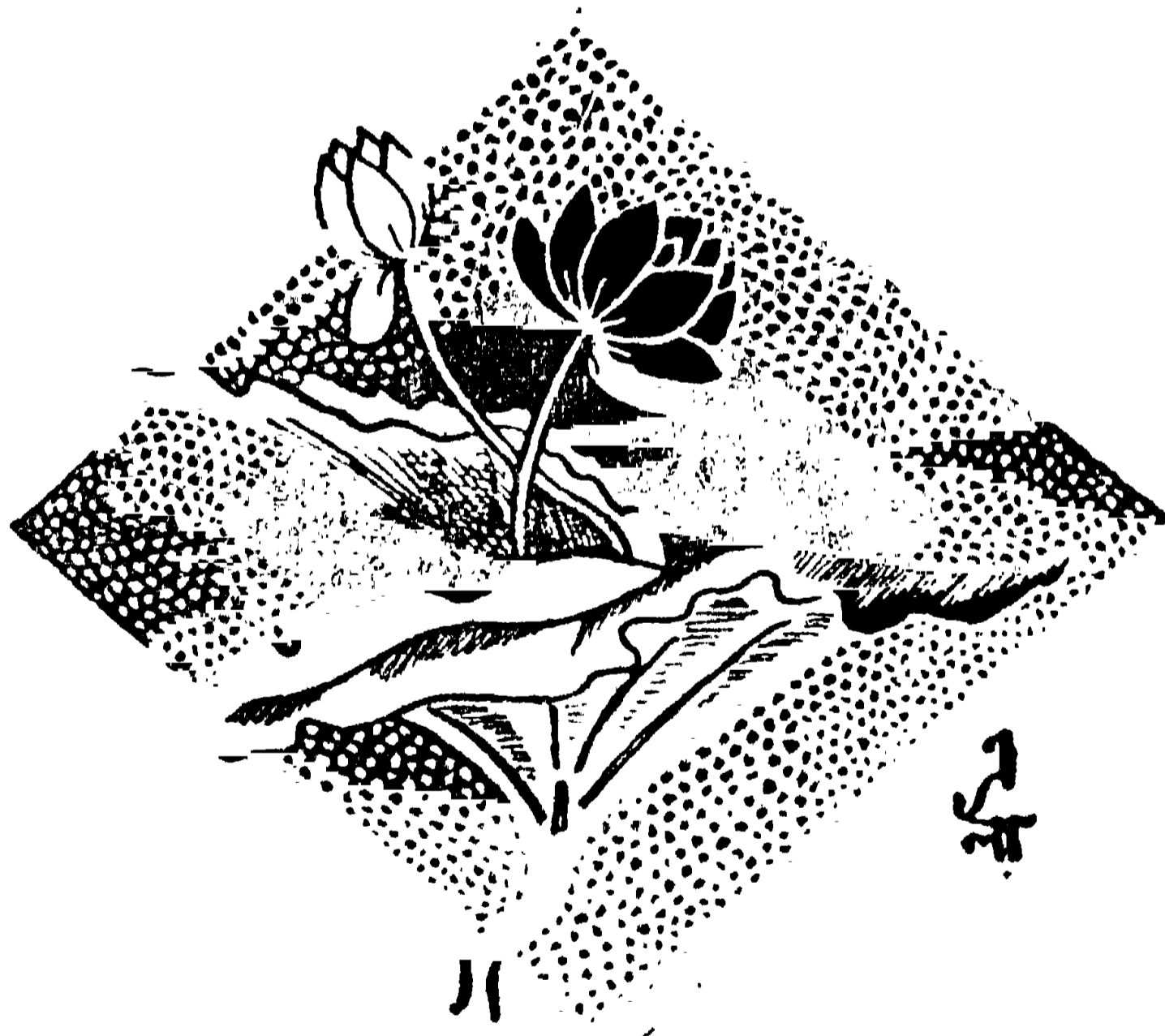
ব্যথা

শ্রীঅনিমা বসু

চলে যদি যাবে
        এসেছিলে কেন ?
                দুদিনের তরে হাসাতে।
মরম দহিয়া
        সরমে বাঁধিয়া
                নয়নের জলে ভাসাতে।
বিরহের জ্বালা
        বুকে জ্বেলে দিয়ে
                যাবে যদি তুমি চলিয়া,
মিলনের রাতি
        কেন বা ফুরাল
                শুধু দুটি কথা বলিয়া।
কেন বা পোহাল'
        সে সুখ রজনী
                বিরহ জাগাতে স্মরণে।
ফিরিবেনা বুঝি
        এ মধু যামিনী
                জীবনে অথবা মরণে।

পতিতা-সমস্যা

শ্রীরমা দেবী

আদিম যুগ হইতে মানুষ যতই সভ্যতার উচ্চ স্তরে উঠিতেছে, ততই তাহার অন্তরের পশুবৃত্তিকে দমন করিবার জন্য সে কঠোরভাবে চেষ্টা করিতেছে। সে চেষ্টা প্রথমে ব্যক্তিগত-ভাবে, পরে সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হয়। অতি প্রাচীনকালে নরনারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইত না, পরে সমাজের মধ্যে বিবাহপ্রথার প্রবর্ত্তন হইলেও এক পুরুষ বা এক নারী বহু বিবাহ করিত। মানব-সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথাও কদর্য্য বলিয়া বিবেচিত হইল এবং একনিষ্ঠ প্রেম বা বিবাহের মধ্যে এক পতি-পত্নীর সম্বন্ধই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া সমাজে উচ্চস্থান পাইল। এই পরিবর্ত্তন এবং সংযম-শিক্ষা সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার জন্য; চরিত্র বলের প্রধান উপায় সংযম এবং সমাজ-শৃঙ্খলার প্রথম সোপান সংঘর্ষ পরিবর্জ্জন। এক পুরুষ বহু বিবাহ করিলে অসংযত হয় এবং এক নারী একাধিক পুরুষকে বরণ করিলে পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাই সমাজে একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ প্রচারের প্রয়োজন হইল। উহা প্রচারের ও প্রবর্ত্তনের জন্য তদনুযায়ী নীতি-শাস্ত্র প্রভৃতি রচিত হইল। কিন্তু তথাপি দেখা যায়, নর নারীর মধ্যে অসামাজিক সম্বন্ধ লুপ্ত হয় নাই, এমনকি চিন্তা করিলে ইহাও দেখা যাইবে, যে প্রতি নরনারীর মনেই অসামাজিক আকর্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার কারণ কি? মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, মানব সৃষ্টির পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মানব সভ্যতার যুগ অপেক্ষা অসভ্য যুগের কালের পরিমাণ অনেক বেশী। সেই আদিম যুগের লক্ষ লক্ষ বছরের অসামাজিক আচরণ নরনারীর সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছে, তাই এত সামাজিক কঠোরতা ও বিধি-নিষেধের মধ্যেও তাহাদের অন্তরে অসামাজিক আকর্ষণ এত প্রবল। সেইজন্য পারিবারিক সম্বন্ধের বাহিরেও নারীদের আমরা দেখিতে পাই। যতদিন পৃথিবীতে মানবের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন এই সংস্কারও কিছু না কিছু থাকিবেই। তবে সমাজের কল্যাণের দিক দিয়া নরনারীর এই অসামাজিক বন্ধনও ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার প্রধান কারণ নারী-জীবনের সম্মানবৃদ্ধি এবং বহু পরিবারকে অশান্তির হাত হইতে রক্ষা করা। এই চেষ্টা সভ্য-জগতে একেবারে নূতন নহে। বিগত শতাব্দীতে ইউরোপের কোন কোন দেশে প্রবলভাবে এই আন্দোলন চলিয়াছিল এবং আইন দ্বারা এই কুপ্রথা নিষিদ্ধও হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফল ফলিয়াছিল অনেক বেশী। বারবণিতাগণ সহজ ভাবে সমাজের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। পূর্ব্বে সমাজের লোক বারবণিতা বলিয়া যাহাদের চিনিত এবং স্ত্রী কন্যাগণকে যাহাদের সংস্পর্শ হইতে সাবধান করিয়া রাখিত তাহা এখন আর সম্ভব হইল না, সুতরাং

গুপ্ত বারবণিতাদের সংস্পর্শে আসিয়া কুলবধূগণের প্রভূত ক্ষতি হইতে লাগিল। সেইজন্য বাধ্য হইয়া সেই সমস্ত দেশে এই নিষিদ্ধ আইন রদ্ করিতে হইয়াছিল। এখনও ইউরোপের অনেক দেশে বারবণিতা লোকচক্ষে নাই, কিন্তু লোকচক্ষে না থাকিলেও চায়ের আড্ডায়, কাফেখানায়, দোকানের বিক্রেতারূপে ও সান্ধ্য সম্মেলনে তাহাদের অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেনা। যে পাপ প্রথা প্রকাশ্যে হইত, তাহা অপ্রকাশ্য ভাবে চলে, এইজন্য উহা আরো ক্ষতিকর। শত্রুকে শত্রু বলিয়া জানা থাকিলে সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা করা যায়, কিন্তু শত্রু গুপ্তভাবে অবস্থান করিলে আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া পাপ প্রথা অবাধে চলিতে দেওয়াও উচিত নহে; ইহা দূর করিবার জন্য বারংবার আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের প্রথম দেখিতে হইবে ও গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে, এই কু প্রথা সমাজের এক অংশে বিস্তার করিতেছে কি করিয়া। অনেকের ধারণা তীব্র যৌন আকর্ষণই ইহার মূলে একমাত্র কার্য্য করে। ইহা একেবারে মিথ্যা না হইলেও একমাত্র কারণ নহে এবং প্রধান কারণও নহে। প্রধান কারণ জীবন-ধারণ-সমস্যা এবং অর্থ-সমস্যা। অনুসন্ধান করিলে আপনারা জানিতে পারিবেন, পতিতাদের মধ্যে অনেকেই বালবিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের মধ্য হইতেই সংগৃহীত হয়। অন্য কোন দেশের নারীরা বোধ হয় হিন্দু-বিধবাদের মত এত নিঃসহায় নহে। পুত্র অবর্ত্তমানে হিন্দুবিধবা স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী আইনতঃ হইলেও কার্য্যতঃ হয় না, পুত্র বর্ত্তমান থাকিলেও আত্মীয়-স্বজন চক্রান্ত করিয়া হিন্দু বিধবাদিগকে তাহাদের ন্যায়-ধর্ম্ম সঙ্গত অর্থ ও বিষয় সম্পত্তির অধিকার হইতে কিরূপে বঞ্চিত করে তাহা আপনারা সকলেই জানেন। নিঃসহায় হিন্দুবিধবা আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের মত কোন শিক্ষাও পায় না। তাহারা কিছুদিন দারিদ্র্য, দুঃখ দুর্দ্দশা, অত্যাচার ও পেষণ সহ্য করিয়া অবশেষে দুটি খাইয়া বাঁচিবার জন্য, একটু সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য অবশেষে দেহকে পণ্য দ্রব্যে পরিণত করে। অত্যাচারী ও দুশ্চরিত্র স্বামী-পরিত্যক্তা রমণীদেরও এই একই অবস্থা। এই জন্যই পতিতা-সমাজে, কুমারী নারীর সংখ্যা অনুপাতে কম; কুমারী যাহারা আছে তাহারা প্রায় সকলেই পতিতা কন্যা—গৃহস্থ পরিবার হইতে সংগৃহীত নহে। পতিতা শ্রেণীর অনেক মেয়েই বাড়ীতে দাসীবৃত্তি বা পানের দোকান করে। রাত্রে তাহারাই আবার অর্থ উপার্জ্জনের জন্য পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। দিনের পরিশ্রমে তাহারা যাহা পায়, তাহা তাহাদের সংকুলান হয় না বলিয়াই রাত্রে আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। অন্যান্য দেশের মত এদেশেও ইহা একটা প্রধান ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে। বহু অর্থ, বহু মস্তিষ্ক ও বিরাট আয়োজন ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। দরিদ্র পল্লীবালাদের ভুলাইয়া আনিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ গুপ্তচর রহিয়াছে। কৃষক কর্ম্মকার সূত্রধর প্রভৃতি শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েরা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র নিম্ন-গৃহস্থ শ্রেণীর নারী, যাহারা শরীর খাটাইয়া উপার্জ্জন করিতে পারে না, ইহাদের দ্বারা প্রলোভিত হয় সহজে। তাহার কারণ বিদেশী বণিকদের সংঘর্ষে এই শ্রেণীর লোকের অবস্থা অত্যন্ত

শোচনীয়, তাহাদের অন্নাভাব দারুণ, তাই সহজেই তাহারা এই পাপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কলের শ্রমিক, কুলি, মাঝি নাপিত প্রভৃতি যাহারা সহরে আসিয়া সামান্য অর্থোপার্জ্জন করে, দেশে স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্য যাহারা অর্থ পাঠাইতে পারে না এবং দেশে যাহাদের জমিজমাও নাই; তাহাদের সংসারে স্ত্রী-কন্যাগণ কি করিবে, কোথায় যাইবে? এই অবস্থায় তাহাদের পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান সহর-বাজারই এই পাপ ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র, কারণ সেখানে পয়সা আছে—দু পয়সা পাওয়া যাইবে। সুতরাং অর্থ-সমস্যাও যে এই কুপ্রথার মূল কারণের মধ্যে একটী তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

অন্য কারণ—হিন্দু সমাজের নির্ব্বুদ্ধিতা। আপনারা ইহাকে অনুদারতা বলিতে পারেন, কিন্তু আমি নির্ব্বুদ্ধিতাই বলিব। যদি কোন বালিকা এক বা একাধিক বার প্রলোভনের বাধ্য হয়, তাই বলিয়া তাহাকে সমাজ হইতে পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য আত্মবিক্রয়ের পথে বসাইয়া দিতে হইবে—ইহার কোন সদ্‌যুক্তি নাই। বরং তাহাকে সমাজের সৎ সংসর্গের মধ্যে রাখিয়া সংশোধিত হইবার সুযোগ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর রমণী ছাড়া আর এক শ্রেণীর নারী পতিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে—তাহারা নিজেদের অনিচ্ছায় অন্যের দ্বারা অত্যাচারিতা। তাহাদের যে কি করিয়া, কোন্ বিধিমতে, কি যুক্তিতে হিন্দু সমাজ গ্রহণ করে না তাহা বলিতে পারি না। হিন্দু সমাজের এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই এই পাপ ব্যবসায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ লাভ করিতেছে ইহাও আমাদের ভুলিলে চলিবে না। এখন ভাবিতে হইবে—এই পাপ ব্যবসা সমাজ হইতে যায় কি করিয়া? এই শ্রেণীর রমণীদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিতা বা অল্প শিক্ষিতা, তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিয়া যদি কোন এমন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারা যায়—যেখানে পতিতা রমণীগণ উচ্চ শিক্ষার সহিত সৎভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিবার মত শিক্ষালাভ করিবে, তবেই দেখা যাইবে এই পাপ প্রথা অচিরেই লুপ্ত হইয়াছে। নরনারীর অন্তর হইতে প্রেরণা ও শুভ সংস্কার জাগ্রত না হইলে এবং সদ্‌ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিবার কোনও সুবিধা না পাইলে, তাহাদিগকে সংশোধিত করিবার জন্য বাহিরের কোন চেষ্টাই বিশেষ কার্য্যকরী হইবে না। বিষই বিষের শক্তি নষ্ট করিতে পারে। পতিতালয়ে যাহারা মানুষ হইয়াছে, সেই বন্দীশালা হইতে মুক্ত হইবার পথ তাহারাই বলিয়া দিতে পারে। তাহাদের মধ্যে উচ্চমনা নারীরও অভাব নাই, তাহাদের হৃদয়েও উচ্চ ভাব, উচ্চ আদর্শ, একনিষ্ঠ প্রেম ও সুখ শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, তাহা আরো উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের টানিয়া আনিতে হইবে এবং আমাদের মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত তাঁহাদের সেই সব অভাগিনী ভগিনীদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া পথের সন্ধান বলিয়া দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত যতীন বসুর প্রস্তাব সমর্থনে সর্ব্ববঙ্গ মহিলা-সমিতির অধিবেশনে পঠিত

মৃগমদ

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

৯

ডাক্তারের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনুপম বলিল, 'আজ আর উনি এলেন না, আরেকটা কল্‌এ চলে গেলেন, রোগীর অবস্থা সেখানে সিরীয়াস্‌, কাজেই আস্‌বার জন্য জোরও কর্ত্তে পাল্লুম না। কিন্তু বলে দিলেন, জ্বর আজ ছাড়্‌বে—কোনো ভাবনা নেই।'

অরুণিমা ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, 'সত্যি ছাড়্‌বে?'

অনুপম ঈষদ্‌হাস্যে বলে, 'যদি ঠিক ঠিক বিশ্বাস কর্ত্তে পারেন—তবে ছাড়্‌বে।'

'আশা কর্ব্ব—তারপর নিরাশ যদি হই। সে আরো খারাপ লাগ্‌বে।'

অনুপম হাসিতে হাসিতে বলে, 'সংস্কার যখন রয়েছে আপনার, তখন হয়ত নিরাশ হ'তে পারেন! ঠিক ঠিক বিশ্বাস যদি করেন—'

'ভাব্‌লুম ভাল হ'য়ে গেলুম, আর অমনি ভাল হলুম—এ-ও কি কখনো হয়?'

'হয় বৈকি! মানুষের চিন্তার ক্ষমতা অপরিসীম, চিন্তার বলে অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়। আমাদের বাড়ীর কাছে এক ব্রহ্মচারী মাঝে মাঝে আসেন, তাঁর কথা শুন্‌তে আমি যাই প্রায়ই। তিনি এই কথাটা খুব জোর দিয়ে বলেন। সংশয়হীন প্রতীতির সঙ্গে যা ভাবা যায়—তা হবেই হবে। এখনকার লোক যন্ত্রের সিদ্ধি লাভ ক'রে বস্তুর মোহে মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু তখনকার লোক তপস্যার বলে হতেন বাক্‌সিদ্ধ। তপস্যার প্রভাবে তাঁরা যা মনে কর্ত্তেন তাই হোত। আপনি পুরাণের গল্প জানেন?'

'সে ত গল্প!'

'সিলোন যদি যান কখনো দেখ্‌বেন বালুময় তটভূমি—কিন্তু ওদেশের লোকেরা জানে ওরই মধ্যে স্বর্ণরেণু আছে। ওরা তাকে কৌশলে পৃথক্‌ করে নেয়। আমাদের সংহিতা পুরাণ ইত্যাদির গল্প ওরি মত।'

'নাম কি ওঁর?'

'কৃষ্ণদাস। এই নামেই উনি পরিচয় দেন।'

'ভাল হ'লে আমাকে নিয়ে যাবেন এক দিন তাঁর কাছে।'

'আপনার যদি ভাল লাগে যাবেন।'

'আমার ভাল লাগা আমার মনের ভিতর এখনও নিশ্চিত আকারে দেখা দেয় নি। কি ভাল লাগবে না লাগবে তা আমি নিজেও জানি না। তবে, এঁর কথা শুন্‌তে আমার ঔৎসুক্য হচ্ছে এ ঠিক।'

'উনি একথা সর্ব্বদাই বলেন, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ভিন্ন শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। একদিন উনি আমাদের জিজ্ঞাসা কর্লেন সব চেয়ে কঠিন কাজ কি। কেউ কিন্তু জবাব দিতে পারে নি।'

অরুণিমা সবিস্ময়ে বলে, 'তাই নাকি!'

'আপনি বলুন না।'

একটুখানি ভাবিয়া অরুণিমা হাসিয়া বলে, 'আপনি জিজ্ঞাসা করেই কিন্তু সব ঘুলিয়ে দিলেন। তখন কিন্তু মনে হয়েছিল, এ অতি সহজ প্রশ্ন।'

'এ বড় দুরূহ প্রশ্ন, কেন না সব চেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নিজের ভাল করা।'

'বলেন কি!'

'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট! নিজের ভাল কর্ব্বার অতিরিক্ত লোভে আমরা মন্দটাই করে চলি।'

'অদ্ভুত কথা কিন্তু।'

'প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে কোনো মত প্রকাশ করা যায়—তা প্রথমে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। শেষে যাচাই কর্ব্বার বেলা সত্য মিথ্যা ধরা পড়ে। যেমন হেঁয়ালির ছবি। আসল জিনিসটা প্রথমে চোখে পড়ে না—কিন্তু খুঁজে খুঁজে একবার তা ধর্‌তে পার্‌লে সেই ছবিটা আর সব বাজে জিনিসের চেয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

অরুণিমা বলে, 'মানুষ কিন্তু অতি বিচিত্র জীব! এক আনি দেখ্‌তে পেয়ে মনে ভাবে দেখ্‌তে পায় অনেকখানি, কিন্তু আসলে দেখ্‌তে পায় না পনেরো আনি। কর্ত্তে যা পারে—তার চেয়ে কর্ত্তে পারেনা বিশগুণ—তবু ক্ষমতার অভিমান আকাশ-স্পর্শী!'

'উনিও ঠিক এই কথাই বল্‌ছিলেন। মানুষ কি করে নিজেকে ঠকায়। কৃপণ নিজকে বঞ্চিত ক'রে টাকা জমায়—অপব্যয়ী নিজের স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসিয়ে টাকা ওড়ায়, রাজা প্রজা-শোষণ ও পীড়ন করে নিজের সিংহাসনকে দুর্ব্বল করে, ছেলেরা কলেজ পালিয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে ফাঁকি দেয়, গুরু-পুরোহিত দক্ষিণার পুঁটুলি বেঁধে পরকালকে ফাঁকি দেয়, ব্যবসাদার খদ্দের ঠকিয়ে আসলে নিজের লোকসানের পথ পরিষ্কার করে।'

'কি সুন্দর বলেছেন। আমি ভাল হ'লে আমাকে নিয়ে যাবেন ওঁর কথা শোনাতে।'

'নিজের কানে শুনে আস্‌বেন একবার! আমি আপনাদের যা দিলাম—তা ফিল্‌টার করা গঙ্গা জল। এতে শুধু কথার ধারাটি আছে কিন্তু কথার সেই তেজ—আলোর মত যা জ্বলে উঠে চারিদিক আলোকিত করে তোলে—তা নেই।'

আভা হাসিয়া বলে 'অনুপম বাবু, এই জন্যেই কিছু দিন থেকে আপনার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তনের আভাস পাচ্ছি।'

অনুপম চুপ করিয়া থাকে। কতক্ষণ পরে অরুণিমা বলে, 'কিন্তু দেখুন, নীতি উপদেশ রাশি রাশি আমরা শুনেই যাই শুধু—কাজের বেলা কিছুতেই কোনো কাজ দেয় না।'

অনুপম বলে, 'মানুষ খানিকটা দেখে, খানিকটা ঠেকে খানিকটা ঠ'কে শেখে। অনেক তোড়্‌পোড়্‌ খেয়ে তবে বুদ্ধি পাকে। এইজন্যেই ত কাঁচা মাথার দর নেই।' সনিশ্বাসে অরুণিমা বলে 'সোজাকথায় বল্‌তে গেলে এই দাঁড়ায় যে মানুষকে হাতুড়িপেটা হতেই হবে, গড়ে উঠ্‌তে হবে ঘা খেতে খেতে।' ঈষদ্ধাস্যে অনুপম বলে, 'তা বটে। কিন্তু ওরও দরকার আছে। জীবনের পথে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিতে হয়। যা পেয়েছেন বা পাচ্ছেন খুসী মনে তাই নিন।'

'খুসী মনে?'

'ক্ষতি কি! ব্রহ্মচারী বলেন, শুধু ভোক্তা নয়, দ্রষ্টাও হওয়া চাই সঙ্গে সঙ্গে। দেখার সঙ্গে বিচার চাই। আমাদের জীবনের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতাকে যখন আমরা মুছে ফেল্‌তে চাই, অস্বীকার কর্‌তে চাই, তখন আমরা নিজেকে অনেকখানি ছোট করে বসি। কারণ ঐ গুলোই হচ্ছে জীবনের আসল বনিয়াদ। ঐ সব ভুল ত্রুটি প্রমাদ পার হতে হতেই আমরা মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করি।'

'সুন্দর কথাটি কিন্তু।'

'তাহলে এর পর আর পরিতাপ কর্ব্বেন না।'

'তা কি করে বল্‌ব—আজ বিছানায় পড়ে পড়ে যা ভাব্‌ছি—কাল হয়ত কাজের মাঝে তা মনে পড়্‌বে না! জগৎ পারাবারে মানুষ হচ্ছে জল বুদ্বুদ, আমাদের ভাবনাও বুদ্‌বুদেরি মত ওঠে আর মিলিয়ে যায়।'

অনুপম ছাড়িয়া দেয় না, বলে, 'এই বুদ্‌বুদ-ফোটা জলেই যখন আবার স্রোত জাগে, আবর্ত্ত হয়, তখন কী না হয়ে থাকে!'

অরুণিমা হাসে, বলে 'তবে না আপনি কথা কইতে জানেন না!'

'তা জান্‌তুম না বটে।'

'এখন ত বেশ শিখেছেন!'

'মণির রং নেই, কিন্তু জবার কাছে থাক্‌লে লাল দেখায়।'

দুজনের হাসিতে তখন ঘর ভরিয়া যায়।

মাঝখানে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বিভাময়ী আসেন। অনুপম উঠিয়া প্রণাম করে।

বিভাময়ী বলেন, 'এই যে তুমি এসেছো! ভালই হোল। দুপুরটা সবাই মিলে গল্পে গুল্‌জার হয়ে কাট্‌বে এখন! হুট্‌ করে এর মধ্যে আবার চলে যেয়োনা যেন। এখানেই খাবে কিন্তু। আজ রবিবার কোনো ফাঁকি আজ আর দিতে পার্ব্বে না!'

কুণ্ঠিত ভাবে অনুপম বলে, 'বাড়ীতে বলে আসিনি, ওঁরা আবার ভাব্‌বেন।' 'এইত!

আমি বয়কে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি খবর দিয়ে, সেজন্য তোমার ভাবতে হবে না। তুমি আমাদের যতটা পর ভাব, আমরা কিন্তু তোমায় তত পর ভাবি না। তোমার ওপর কেমন একটা মায়া যেন পড়ে গেছে।'

পিছন হইতে হাসিয়া আভা বলে, 'এ বুনো হরিণকে বেড়ী পরাতে দেরী আছে মেজদি! আহা বেচারি!'

অনুপম লজ্জায় বিব্রত হইয়া ওঠে, মেয়েরা হাসিতে থাকে।

রাত্রি প্রায় আটটা। অনুপম ও প্রসূন বেড়াইয়া ফিরিল। অনুপম ফটকের কাছ হইতে বিদায় লইতেছিল, প্রসূন তাহাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া চলিল। শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রি। কিছু আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দিক্প্রান্তে বর্ষণ-লঘু মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে ধারাবগাহন-দীপ্ত চন্দ্রিমা সুনির্ম্মল নীলাকাশ তলে দাঁড়াইয়া আছে। কদম্বের শাখা শূন্য, কৃষ্ণচূড়ার রক্তপীত পুষ্পমুকুট অন্তর্হিত; আধখানা বাগানের উপর কালো ছায়া ফেলিয়া অটুট বিমর্ষতার মত অচল নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাগানের ধারে ধারে জুঁই চামেলী ধারা-ধৌত জ্যোৎস্নাদীপ্ত ছোট্ট মুখগুলি বাহির করিয়া সবিস্ময়ে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে।

জলার্দ্র পথ দিয়া সাবধানে হাঁটিতে হাঁটিতে অনুপন বলিল 'তুমি যে কি রকম লোক—আমি তা এপর্য্যন্ত বুঝ্তে পার্লুম না।'

'তোমাদের ঐ এক কথা। আভাটা আমায় যা শুনিয়ে দিলে—অরুণা পর্য্যন্ত, অবশ্য মুখে আমায় কিছু বলে নি—কিন্তু ভাবটা এমন দেখালে যেন কস্মিন কালেও আমায় চেনে না। বেড়াতে গিয়ে আমি যেন মস্ত একটা কুকর্ম্ম কোরেছি।'

'যত দুরূহ বিষয় জলের মত ব্যাখ্যা কর—আর একটা জলের মত স্বচ্ছ কথা বুঝতে পার্লে না?'

'না, পার্লুম না। আমার অক্ষমতা স্বীকার কর্চ্ছি। কি পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠেছে—এস ঝরণার ধারে বেঞ্চে বসি গিয়ে!'

'জলের ভিতর ওখানে কোথায় বস্‌বে! চল বারান্দায় বসি।'

দুজনে বারান্দায় উঠিয়া রেলিংএর কাছে চেয়ার টানিয়া বসিল।

প্রসূন সহাস্যে বলিল, 'এবার লেক্‌চার শেষ কর।'

'লেক্‌চার আবার কি! মানুষের হৃদয় বলে যে একটা জিনিস আছে—তার সম্বন্ধে ত দেশের রাজা কোনো আইন গড়ে নি—'

'গড়্‌তো যদি তা: হ'লে কি হোত? জরিমানা? জেল? ফাঁসী? উঃ, কি হয়েছো তোমরা।'

'তোমার মটো বুঝি স্ফূর্ত্তির দিনে স্ফূর্ত্তি করা আর দুর্দ্দিনে সরে পড়া; অরু অরু

অরু—দিন রাত মুখে বুলি,—অরু এমন অরু তেমন,—অরু এই বলেছে, অরু ঐ বলেছে—যাই অরু ব্যারামে পড়্‌ল, অমনি তুমি গেলে নীরা দেবীর সঙ্গে বেড়াতে!'

'অপরাধটা কি-ই বা এমন হয়েছে তাতে! আমি এখানে থাক্‌লে কি অরুর জ্বর ছেড়ে যেত? আমি না ডাক্তার, না নার্স—সুতরাং কি উপকার হোত তার আমি এখানে থাকায়? তা ছাড়া দেখ—রোগীর সেবা আমার কর্ম্ম নয়। আমি ও বরদাস্ত কর্ত্তেই পারি না। বন্ধ ঘরে ওষুধের গন্ধ ভরে থাকে,—আলো বাতাস পর্দ্দার ও পিঠে থম্‌কে থাকে—নিস্তব্ধ ঘরে ঘড়িটা জোরে টিক্ টিক্ করে—আপাদমস্তক ঢেকে একটা মানুষ মড়ার মত পড়ে থাকে—ও দেখ্‌লেই আমি নিজে অসুস্থবোধ কর্ত্তে থাকি। তার যত্ন নেবার লোকের ত আর অভাব হয় নি। মেজদি ছিল, আভা ছিল, তার মা পর্য্যন্ত এলেন, এর ওপর আর কি চাই! আভাটা বল্‌ছিল তুমি নাকি তার খুব সেবা কোরেচো—তা ও আমাকে শোনাবার জন্যে কথাটা বল্‌তে পারে—সত্যি সেবা করেছিলে না কি?'

কুণ্ঠিত ভাবে অনুপম বলে, 'দু একদিন এলুম, তাতেই কি আর কিছু হয়!'

'সেবা হচ্ছে মেয়েদের কাজ, পুরুষ করে তা পেরেছে? বল্লেই হোল আর কি!' বাহিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া বিভাময়ী ব্যস্তসমস্ত ভাবে প্রবেশ করিল।

শোফ্‌য়ার গ্যারেজ হইতে গাড়ী বাহির করিয়া আনিল। বিভাময়ী ও প্রসূন গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। জ্যোৎস্না-ঝলকিত চামেলী বেলার পাশ দিয়া গভীর নীল রংএর প্রকাণ্ড গাড়ীটা দীপ্ত দুই অগ্নি-চক্ষে আলোক বিকীর্ণ করিয়া ভয়ঙ্কর একটা অতিকায় জন্তুর মত হুস্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। অনুপম শূন্য পথের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। গাড়ী চলিয়া যাওয়ার শব্দে অরু বাহিরে আসিল ও অনুপমকে অন্ধকারে উপবিষ্ট দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

অনুপম বলিল 'ভয় পাবেন না—আমি।'

'আপনি যান্ নি?'

'প্রসূন ওঁকে পৌঁছে দিতে গেছে—আমাকে বলে গেছে অপেক্ষা কর্ত্তে।'

প্রসূনের পরিত্যক্ত চেয়ার সরাইয়া নিয়া বসিয়া সুইচ্ টিপিয়া দিয়া বলিল, 'আপনার বন্ধু বসিয়ে রেখে গেছে, তাই বসে আছেন? নইলে আপনার দেখা পাওয়াই ভার!'

'কাজ যখন থাকে আর যখন ফুরিয়ে যায়, দুটো অবস্থাই ত একরকম হতে পারে না।'

'বাস্তবিক আমার মনে হয়—আপনার মত লোকের কাছ থেকে আমি এত সেবা পেলুম কি করে! সে ও কথায় হচ্ছে না, কৈফিয়ৎ দিন—আসেন না কেন!'

'ভয় হয় পাছে বেশী এসে আপনাদের উত্যক্ত করে তুলি।'

'আচ্ছা আপনাকে অভয় দেওয়া গেল।'

অনুপম কোনো উত্তর দিল না।

'আমি ত এখন ভাল হয়ে উঠেছি—চলুন না একদিন সেই ব্রহ্মচারীর কাছে।'

'তিনি ত নেই এখানে।'

'কোথায় গেছেন ?'

'বদরিকাশ্রম।'

'আর আসবেন না ?'

'বোধ হয় না। এঁরা পরিব্রাজক বেশী দিন কোথাও থাকেন না, ঘুরে বেড়ান।'

'কেন ঘুরে বেড়ান ?'

'এক স্থানে দীর্ঘকাল থাক্‌লে পাছে সেখানে মায়া বসে যায়।'

'আমাদের আবার উল্টো অবস্থা—প্রাণে সর্ব্বদা ভয় পাছে মায়া খসে যায়। রৌদ্রে পথ হেঁটে চলে পথিক, মাঝে মাঝে পথের ধারে গাছের ছায়া মেলে—সাধ হয় সব ফেলে সেই খানেই চিরদিনের ঘর বাঁধ্‌তে। শূন্য পথ চারধারে ধূলো ওড়ে—রোদ খাঁ খাঁ করে, ঝড়ের ঝাপ্‌টা লাগে—ঘর না বাঁধতে ঘর ভেঙ্গে পড়ে, তবু সাধ হয়।'

অরুর সুদূরার্পিত উদাস দৃষ্টি অনুপমের দীপ্ত চক্ষের সহিত সম্মিলিত হইল, বেদনাঙ্কিত একটা হাসি তাহার লঘু ওষ্ঠপুটে ভাসিয়া উঠিল। অনুপম মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

বলিল, 'যারা সোজা রাস্তায় চলে তারা অনেক দূর অনায়াসে হেঁটে যেতে পারে, কিন্তু পাহাড় ভেঙ্গে যারা ওঠে, তারা দুধাপ উঠে হাঁপিয়ে বসে পড়ে।'

সহজ কথার ধারায় কথার স্রোত ফিরাইতে চেষ্টিত হইয়া অনুপম বলে, 'তা ত পারবেই। খুব জোরালো মানুষ ছাড়া পাহাড় ভাঙ্গ্‌তে পারে না। একবার চন্দ্রনাথ গিয়েছিলুম, খানিক উঠি আর জিরোই—উঠতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল, সে রাত্রি সেখানে থেকে পরের দিন শেষে নামি।'

'মানুষ কি দুর্ব্বল !'

'প্রকৃতি একটা শক্তি—মানুষ তার ক্ষুদ্রতম একটা অংশ মাত্র। কাজেই মানুষ খালি লড়্‌তে থাকে, কিন্তু পেরে আর ওঠে না। এক দিক্ দিয়ে জিত্‌লেও আরেক দিক্ দিয়ে খানিকটা হার তার মান্‌তে হয়।'

'এত দুর্ব্বার প্রচণ্ড, অপরিসীম, অখণ্ড এই প্রকৃতি জান্‌তুম না তা।'

কি বলিতে কি বলিয়া ফেলে ভাবিয়া অনুপম কোন কথার উত্তর দিল না। তাহার বুক দুর-দুর করিতে লাগিল, দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। উঠিয়া পড়িবার ইচ্ছা করিয়াও সে উঠিতে না পারিয়া না যযৌ ন তস্থৌ ভাবে বসিয়া থাকে।

অরু বলিয়া যায় 'ভুল যখন আমরা করি, তখন নিজের কাছে ও পরের কাছে সমান ভাবেই ধিক্কার পেতে থাকি। কিন্তু মানুষ ত এমন ভুলও করে, যার উপর তার কিছুমাত্র হাত নেই—

যা তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যায়—যেমন করে ঘূর্ণি হাওয়া তার দারুণ পাকাবর্ত্তে গাছপালা ঘরবাড়ী সব উব্‌ড়ে গুঁড়ো করে টেনে নেয়।'

অনুপম বাহিরে জ্যোৎস্নাস্নাত পুষ্পশাখার দিকে দৃষ্টিহীন চক্ষে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—এই সব হেঁয়ালি ও প্রচ্ছন্ন কথার ভিতর দিয়া অরুণিমা কোন্ সত্যকে প্রকাশ করিতেছে! সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানস চক্ষে ভাসিয়া উঠিল, কালীঘাটের এক অপরিসর গলির ভিতর অপরিচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ এক দ্বিতল বাড়ী। বাক্সপেঁটরা ও জিনিষপত্রে ঠাসা ছোট ছোট অন্ধকার ঘর, এখানে সেখানে ময়লা কাপড় জামা ঝুলিতেছে, তুলা বাহির করা উল্টানো ছেঁড়া বিছানা। ঘরে লোক গিজ্‌গিজ্ করিতেছে, কালো কিম্ভূতকিমাকার ছেলেমেয়েগুলি মাটিতে পড়িয়া লুটোপটি ও চেঁচামেচি করিতেছে। নীচের তলায় তাহার অন্ধকার ছোট ঘরটি—তক্তপোষের উপরে ছেঁড়া মাদুর—কাঁথার উপরে কালো রং-এর মশারী দুইদিক্‌কার দড়িতে বাঁধা পড়িয়া অসহায় ভাবে ঝুলিতেছে। অনুপমের মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল।

সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলে, 'যে ভুলের জন্য আপনি পরিতাপ কচ্ছেন সেই ভুলই যে আপনাকে বাঁচিয়ে দেয় নি—তা-ই বা কে বল্‌বে।'

অরুণা বাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষু দুটী তুলিয়া অনুপমের দিকে চাহিল, তাহার নেত্রপ্রান্ত হইতে বড় বড় জলের ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল।

অনুপম প্রগাঢ় স্বরে বলে 'একটা ভুলে গড়িয়ে পড়ার চেয়ে গোড়াতে তা ছিঁড়ে যাওয়া ভাল।'

'তা ভাল।'

বৃষ্টির ভিতর রৌদ্র বিকাশের মতন অরুর অশ্রুসিক্ত আঁখিতে হাসি দেখা দিল।

বাহিরে প্রসূনের পদশব্দ পাওয়া গেল। অরু ত্রস্তে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল, অনুপম বারান্দা হইতে নামিয়া ফটকের দিকে অগ্রসর হইল।

———

ক্রমশঃ

সমাজ ও নারী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী-সরস্বতী

শুনেছি আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে আজও দাস-প্রথা রয়েছে—খুব গোপনে অনেক জায়গায় এখনও এ প্রথা চলে। সুসভ্য ইউরোপ, আমেরিকাতেও একদিন অবাধে দাসত্ব প্রথা চলতো, এখানে আমাদের এই ভারতেও আমরা দাসত্ব প্রথার প্রমাণ পাই।

আজ আমরা সুসভ্য হয়েছি, আমরা সে আবহাওয়ার মধ্য হতে দূরে এসে বলি, সে একটা ছিল অতীত যুগ, যখন এ দেশের অনেক ছেলেমেয়েকে দাস-দাসী ভাবে বিক্রয় করা হতো এবং তারা অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করত। তাদের নিজেদের 'পরে কোন অধিকার পর্য্যন্ত থাকত না, সংসারের সকল ভার তাদের হাতে থাকতেও তারা সংসারের কেউই ছিল না। প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধনে অপারগ হলে তাদের প্রভু সহজেই তাদের দূর করতেন, সন্তানের পরেও তাদের এতটুকু দাবি-দাওয়া থাকত না। আজ আমরা সুসভ্য হয়েছি, সে প্রথা আমাদের দেশ হতে উঠে গেছে! বাস্তব চোখে দেখতে গেলে দাস-প্রথা উঠে গেছে সত্যি, কিন্তু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দেখতে পাওয়া যায় সে প্রথা বাংলার ঘরে আজও রয়েছে! বাংলার মেয়েরা এখনও এই ভাবে জীবন যাপন করছেন।

মেয়েদের এই নিঃসহায় দিকটার পানে অনেকদিন হতে অনেকেরই চোখ পড়েছে, এই হীন প্রথাটাকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্যে অনেকেই চেষ্টা করছেন। বাংলার নারী-সমাজ গণনাতীত কাল হতে পর-নির্ভরশীল ও শক্তিহীন। অনেক অত্যাচারেও অনেক সময় অনেক মেয়ের মধ্যে অনুভূতি জাগেনা। শুনেছি দাস-দাসীর সন্তানদের মধ্যে বিশেষ করে এই জ্ঞানটাই দেওয়া হতো, তাদেরও দাস দাসী হতে হবে, স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় তাদের নেই। বাংলার মেয়েদের মধ্যেও এ ধারণা আছে, তারা বাল্য হ'তে শিক্ষা পায়, তারা সংসারে এসেছে শুধু নীরবে কাজ করে যেতে, তারা সংসার যন্ত্রের চাকা মাত্র, তাদেরই চল্‌তেই হবে। কোনও অভাব অভিযোগ জানাবার উপায় নেই, কেউ তাদের কথা কাণে নেবেনা। যত অন্যায়ই হোক্ তাদের সব সয়ে যেতে হবে, অন্যায় বলা তাদের পক্ষে মহাপাপ।

এ দেশের মেয়েদের শিক্ষা বহু যুগ হতে একই ধারায় চলে আসছে। এ দেশের আইন-কানুন পুরুষরাই তৈরী করেছেন, তাতে কোনদিন মেয়েদের মত নেওয়ার দরকার হয়নি—আজও হয় না। বাড়ীর কর্ত্তা নিজের খুসি মত যে কাজ করে যান, তাতে কথা বলার অধিকার অনেক স্ত্রীরই নেই। যত বড় অন্যায়ই হোক, নীরবে স্ত্রীদের সয়ে যেতে হবে, জিজ্ঞাসা কর্‌বার পর্য্যন্ত অধিকার থাকে না।

দেখা যায়, যে জয়লাভ করে সে পরাজিতের উপরে ইচ্ছামত ব্যবহার করে যায়, ক্ষমতার মোহ তাকে অন্ধ করে ফেলে। যে আইন সে তৈরী করে, সেটা যখন খুসি ভেঙ্গে নূতন করে গড়ে নিতে পারে, তাতে কথা বলা চলে না। তাই দেখতে পাওয়া যায়, স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীর ব্যভিচারিতাও চলে, চোখের জল সাম্‌লে তা-ও মেনে নিতে হয়। চোখের জল্ সে অবাধে ফেল্‌তে পারে, মুখ ফুটে একটী কথা সে বল্‌তে পারবে না, তা হলে তার স্বামীকে অপমান করা হয় এবং সত্যই সেটা সতীত্বের নিখুঁত আদর্শ নয়। মেয়েরা যুগ যুগ হতে শুনে আসছে স্বামীকে ভক্তি-শ্রদ্ধাই শুধু করে যেতে হবে, দেবতা যতই নিষ্ঠুর হোন, যাই খুসি ব্যবহার করুন তার সে দিক দেখলে চল্‌বে না,—এ বিষয়ে তাকে একেবারে অন্ধ বধির হয়ে থাক্‌তে হবে, এই হচ্ছে এ দেশের মেয়েদের সামনে পাতিব্রত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ দেশের পুরুষ মেয়েদের সামনে সীতা, সতী, সাবিত্রী, বেদবতী প্রভৃতি অনেক মেয়ের দৃষ্টান্ত ধরে দিয়েছেন, এবং বরাবর উপদেশ দিয়ে আসছেন, মেয়েদের আদর্শ বজায় রাখতে এই সব সতী-নারীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চল্‌তে হবে। একটা যুগে সীতা রাজকন্যা হয়েও স্বামীর সঙ্গে বনে গমন করেছিলেন, সাবিত্রী অশেষ কৃচ্ছসাধন করে সত্যবানকে ফিরিয়ে পেয়েছিলেন, সতী ভাঙ্গর ভোলার কুঁড়ে ঘরে স্বামী সেবা করেছিলেন, বেদবতী কুষ্ঠাক্রান্ত স্বামীকে লক্ষহীরার বাড়ীতে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দৃষ্টান্ত মহৎ, তবে একটা কথা এই—তাঁরা যে সব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তাঁদের এ শিক্ষা দিতে হয় নি, এ সতী-প্রবৃত্তি এই দেশের মেয়েদের নিজস্ব জিনিস। ভারতের জল-হাওয়ার গুণে মেয়েদের মনে সে প্রবৃত্তি আপনিই জেগে ওঠে, তাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা নেই বলেই মনে হয়।

মেয়েদের সতীধর্ম্ম সম্বন্ধে সচেতন করার সময় পুরুষেরও মনে রাখা উচিত এ ধর্ম্ম তাঁদের মধ্যেও থাকা দরকার। সীতার মত স্ত্রী তৈরী করতে গেলে নিজেকে রামের মত আগে করতে হবে, নইলে সীতা তৈরী হয় না। দাস-প্রথার সময় দাস-দাসীদের ছেলেমেয়েরা যেমন ঠিকই জানত তাদেরও দাস-দাসী হতে হবে, মনিবের মনস্তুষ্টি করতে হবে, এ দেশের মেয়েরাও সেই রকম বাল্য হতে শিক্ষা পায়, তাদের ধরিত্রীর মত সহনশীলা হতে হবে, লতার মত নমনীয়া হতে হবে, তাকে সব সময়েই কারও-না-কারও অধীনে থাকতেই হবে। গোড়া হতে এই রকম ভাবে দাস-মনোবৃত্তিই মেয়েদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে রেখেছে, আজ মেয়েরা যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলেও ভেঙ্গে পড়ছেন, সেও কি এই জন্যেই নয়?

যে সংস্কার মেয়েদের মনের মধ্যে জন্মে গেছে তা সহজে দূর করা কঠিন। এ দেশের বুকে দুর্ব্বল মেয়েদের উপরে শক্তিশালী পুরুষেরাই বরাবর যথেচ্ছ ব্যবহার করে আসছে, এ কথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। কৌলিন্যের অভিমানে অন্ধ অনেক পুরুষের অসংখ্য স্ত্রী দেখা গেছে, আজও অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বিবাহ ছিল যেন একটা খেলা। নির্গুণ স্বামী

বিবাহই করে চলেছেন, হয়তো বিবাহের দিনটা ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর দেখা জীবনে আর কোনদিনও হয় না। একটী লোকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি মেয়ের আশা ভরসা সাধ সাঙ্গ হয়, তা ভাবলে সত্যই জ্ঞান থাকে না।

অনেকগুলি নিষ্ঠুর প্রথা যে এদেশে ছিল তার মধ্যে সতীদাহ ছিল অন্যতম। সকল মেয়েই যে ইচ্ছা করে জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ হতে যেতেন তা নয়। অল্পবয়স্কা বালিকাগুলি, যাদের মন হতে ভাই বোন মা বাপের স্নেহাকর্ষণ দূর হয় নি, প্রথানুযায়ী তাদেরও স্বামীর চিতায় ফেলে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে পুড়িয়ে মারা হতো, আজ আমরা এ দেশের পূর্ব্বতন ইতিহাস পড়ে শিউরে উঠি। আজ সতীদাহ আইনের জোরে উঠান হয়েছে, বাল্যবিবাহ উঠাবার প্রচেস্টা চলেছে, কিন্তু আজও তা সফল হয়নি। আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়—ছোট ছোট মেয়েরা যখন পুতুল খেলা ফেলে সত্যকার বউ সেজে ঘোমটা টেনে সত্যকার সংসারে প্রবেশ করে। ছোট মেয়েটী ভুল হয়তো অনেকই করে, নির্য্যাতনও তখন হতে তাকে বড় কম সইতে হয় না—যার ফলে কত অভাগিনী মেয়ে আত্মহত্যা করে মুক্তিলাভ করে। বেঁচে থাকলে তাদের শুনতে হয়, সীতা সাবিত্রীর মত মেয়ে যখন দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন, তখন তাকেও সইতে হবে বই কি?

শাস্ত্র লিখে গেছে—প্রমাণ দিয়ে গেছে, পুরুষের কোন কিছুতেই দোষ নেই, তিন পা চল্‌লেই তাঁরা পবিত্র হন, কিন্তু মেয়েদের বাল্য হতে যে সব বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে রাখা হয়েছে, তার একটু এদিক-ওদিক হলে চলবে না।

তাই আমরা আজ শুনতে পাই, রাম যখন মায়ামৃগের সন্ধানে ছুটেছিলেন, তখন যে গণ্ডী দিয়েছিলেন সীতা যদি সেই গণ্ডীর বাইরে পা না দিতেন, তা হলে তাঁকে হরণ করা রাবণের সাধ্যও হতো না। তারপর সীতা যে বাস্তবিক নিষ্কলঙ্কা এ প্রমাণ কিছুতেই গ্রাহ্য হয়নি, তাঁকে অগ্নি প্রবেশ করে সতীত্বের প্রমাণ দিতে হয়েছিল।

মেয়েদের বেলায় আইনগুলো কঠিন হতে কঠিনতর হচ্ছে, মেয়েরা কোনক্রমে গণ্ডীর বাইরে পা দিলে সমাজে তার পথ চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হয়ে যায়। বাংলায় যত নারী-নির্য্যাতন চলেছে এ রকম আর কোন দেশে চলে না, কয়টী স্বামী দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা সেই ধর্ষিতা স্ত্রীকে আবার গ্রহণ করেছেন! এই সব ধর্ষিতা মেয়েদের স্থান কোথায়?

কোন্ মেয়ে পথ ভুলে বাইরে এসে পড়লে তার আর ফিরবার পথ থাকে না! লতার মত পরাশ্রয়ী—আত্মনির্ভরে অসমর্থ বলেই তাদের চরম অবস্থা পাপবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়। ঘরে তাদের স্থান পুরুষেরা দিতে নারাজ, কিন্তু তাঁরাই আবার অন্যভাবে এদের সংখ্যাবৃদ্ধির সহায়তা করেন।

বাংলায় এ রকম পথহারা মেয়ে ঢেরই আছে, এরা কত সময় বলপ্রকাশে পর হতে বাধ্য হয়েছে, অনেক সময় প্ররোচনায়—অনেক সময় অভাবে পড়ে বিপথে আসতে বাধ্য হয়েছে, এদের পানে চাইতে কেউ নেই, এরা উদ্দেশ্যহীন জীবনটা উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই কাটিয়ে দিতে বাধ্য হয়!

অনেক সময় এই সব অভাগিনীদের দিয়েই পুরুষের ব্যবসা চলে। বাংলা হতে বহুদূরে এ রকম মেয়েরও সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের বিক্রয় করা হয়েছে, বাংলার কথা তারা ভোলেনি, তারা নিত্য কেবল চোখের জল ফেল্‌ছে!

সামান্য ভুলের বশে মানুষের কত বড় সর্ব্বনাশ হয় তার প্রমাণ এই সব হতভাগিনী মেয়েরা! যাদের দেখে আমরা ঘৃণায় মুখ ফিরাই, সমাজ যাদের বহুদূরে নির্ব্বাসিত করেছে, যদি সত্যকার হৃদয় দিয়ে ভাবা যায়, তবে জানা যাবে এরাও একদিন আমাদের মাঝে জন্মেছিল, মানুষ হয়েছিল, এদের সামনেও আশা ছিল আনন্দ ছিল, আজ কিছুই নেই, তারা বহুদূরে সরে গিয়ে অভিশপ্ত জীবন যাপন করছে। এদের মধ্যেও মা আছে, আর সেই সব মায়েরা নিজেদের ঘৃণিত জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করে সন্তানদের যাতে রক্ষা করতে পারে তার জন্য ব্যগ্রও হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের মানুষ করবার পথ কই, উপায় কই? তাদের যে সমাজ বহুদূরে তৈরী হয়েছে, সেখান হতে এদিকে তাকিয়ে তারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

ওরা মেয়ে, সেইজন্যেই গণ্ডীর বাইরে যাওয়ায় তাদের এ দুর্দ্দশা,—কেউ তাদের টেনে নেবার চেষ্টা কোনদিন করে নি, তাদের উন্নতির চেষ্টা করে নি। কিন্তু কত ভদ্র উচ্চশিক্ষিত পুরুষেরা এর জন্য দায়ী, সমাজের বাইরে তাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট করলে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম হতো না। কিন্তু পুরুষদের সম্বন্ধে সব বিষয়ই অন্য বিচার। বিচারক কেবল দণ্ডই দিয়ে যান, অপরাধীর পানে চাইবার কোন দরকার তাঁর থাকে না।

ক্ষমতা-গর্ব্বে অন্ধ পুরুষ নিজেদের উচ্চ আদর্শ ধরে রাখতে চান, তারা চলে গেলে—তাদের পানে চাইবার দরকার মনে করেন না। মেয়েদের মধ্যে যে সত্যকার প্রাণ আছে তা ভাব্‌ছে কে—দেখ্‌ছে কে?

মেয়েদের এই ধ্বংসের পথে তুলে দেওয়ার জন্য দায়ী আমাদের সমাজ। চিরদিন মেয়েরা এ সমাজে অনেক পেছনে পড়ে থাকে,—তাদের মতামত কোনদিনই কানে কেউ স্থান দেয় নি, তাদের দুঃখ বেদনার পানে কেউ কোন দিন চায় নি। মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় না, অতি অল্প বয়সেই কেবল মাত্র সমাজের ভ্রূকুটী হতে বাঁচবার জন্য ধর্ম্ম-রক্ষার নাম করে বিবাহ দেওয়া হয়! উপযুক্ত পাত্র দেখে কয়জন লোক কন্যা সম্প্রদান করতে পারেন? এ দেশে পুরুষদের মধ্যে যদিও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, আর্থিক দুরবস্থার জন্য অবশ্য অনেক ছেলে পড়তে পায় না, কিন্তু মেয়েদের জন্য তারই বা কতটুকু ব্যয় হয়! সৎচরিত্র ভাল ছেলে কয়টি পাওয়া যায়? স্বাস্থ্যবান্ ছেলে কয়টী দেখা যায়? এদেশে বালবিধবার সংখ্যাও বড় কম নয়। কেবল মাত্র উদরান্নের জন্য আত্মীয়ের গলগ্রহরূপে এদের সংসারে থাকতে হয়, কেবলমাত্র শিক্ষার অভাবও অজ্ঞানতাই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

কেউ কেউ বলবে, বৈধব্য অদৃষ্টে থাক্‌লে অবশ্যই তা ঘট্‌বে। এ খুব সত্য কথা, কিন্তু

তার মধ্যে ঐ কথাটাও বোধ হয় বলা চলে, বাল্যে যদি উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যেত, দুর্ভাগিনী বিধবাদের চিরদিনের জন্য আত্মীয়ের গলগ্রহ হ'তে হতো না, এবং অনেক সময় আত্মীয়ের দ্বারাই তাদের সর্ব্বনাশ হতো না। শিক্ষা পেলে তারা যেমন করেই হোক নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হতো, নিজেদের জীবিকা নিজেরাই চালাতে পারত, অভাবের তাড়নায় প্রতারণার ভুলে নিজেদের সর্ব্বস্ব হারাত না।

ধর্ম্মের নামে অবধি ব্যভিচারিতা আজও এ দেশে চলে থাকে। এই রকম দুর্ভাগিনী মেয়েদের আশ্রয় দেওয়ার নাম করে রেখে এদের পরে যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়, তা আজ দেশের লোকের কাছে অবিদিত নেই।

আমরা বলতে চাই, শিক্ষাই যখন সকলের মূলাধার, মানুষকে মানুষ হয়ে দাঁড়াতে একমাত্র শিক্ষাই যখন সহায়তা করে, তখন সকল মেয়েকে বাল্যকাল হতে সুশিক্ষা দিতে হবে, তাদের সামনে সত্যকার আদর্শ যেমন আমাদের দেশে বরাবর দেওয়া হতো তেমনই রাখ্‌তে হবে। সংস্কার আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে বটে, যে সংস্কার বশে আমরা ভুলে যাই এই সব মেয়েরা একদিন বড় হয়ে থাক্‌তে পারত, সংসারে দেবীর আসনই পেত, কিন্তু ওরা পুরুষদের নির্দ্দয়তায় স্থান পায় নি, অনেক দূরে সরে থাক্‌তে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু এই সংস্কার দূর করা কি এতই শক্ত ব্যাপার হবে? একটা খুঁটি যদি মাটির মধ্যে পোতা থাকে, হঠাৎ একটা আকর্ষণে তাকে তোলা হয় তো না যেতে পারে, কিন্তু বার বার সেই খুঁটিটাকে যদি ধাক্কা দেওয়া যায় সেটা পড়ে যাবেই, তখন তাকে উপ্‌ড়ে ফেলা কঠিন নয়। আমাদের সংস্কারটাও এমনি করে দূর করে দিতে হবে—দেশের দশের সমাজের কল্যাণের জন্য আমাদের দাঁড়াতে হবে।

মেয়েদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে নালিশ করব কার কাছে? মেয়েদের মনের মধ্যে যে হীনভাব জেগে উঠেছে, সেটা দূর করতে হবে নিজেদেরই। নারীর কলঙ্ক নারীরই, পুরুষের ও যে জয়টীকা! মেয়েদের ভার মেয়েদেরই নিতে হবে—যারা পথ হতে সরে গেছে তাদের আশ্রয় তৈরী করে যাতে তারা সৎশিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের মানুষ করতে হবে, সকলের কাছ হতে দূরে রাখ্‌লে চল্‌বে না।

ভারতের সভ্যতা ভারতীয়ের মনে দেবত্ব ভাবটাই বরাবর জাগিয়ে এসেছে, ভারতের সাধনা বহির্মুখী নয়, অন্তর্মুখী,—ঘরে ধ্বংসলীলা চলুক, সে বাইরের পানে লক্ষ্য রেখে গতির বেগে চলবে—ভারত তা কোনদিন চায় নি। যারা আজ সমাজের বাইরে থেকে সমাজের অনিষ্ট করছে, তাদের দিয়েই সমাজের কল্যাণ সাধন হতে পারে যদি তাদের গড়্‌তে পারা যায়।

সাপুড়ে সাপকে ততখানিই মাথা তুলতে দেয় যেটুকু ওর দরকারে লাগে,—যতটুকুতে তার কোনও অনিষ্ট হবে না। সীমার বাইরে যাতে সে না যায় সেদিকে তার সদা সতর্ক দৃষ্টি পড়ে থাকে। যে মুহূর্ত্তে সীমার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে, সেই মুহূর্ত্তেই তার মাথায় বাড়ি

মারে, যাতে বেচারাকে তখনই মাথা নুইয়ে ফেলতে হয়। পুরুষও ঠিক ততটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে—নিজের দেবত্ব সে অটুট রাখতে চায়; কিন্তু মানুষ মানুষকে শীঘ্রই চিনতে পারে। পুরুষের অধীনে চিরদিনই মেয়েদের থাক্‌তে হবে, মেয়েদের পাপের বিচার সেই কর্‌বে, আজও সে মুক্তকণ্ঠে এই কথা প্রচার কর্‌তে চায়।

দুনিয়ার আবর্জ্জনা এসে জমা হয়েছে এইখানে—তাই এখানকার সংস্কার আগে দরকার। একই কাজের জন্য স্ত্রীপুরুষ দুজনকেই সমান শাস্তি দেওয়া বা পুরস্কৃত করা দরকার, মেয়েরা মেয়ে বলেই যে ষোল-আনা শাস্তি ভোগ করবে এ হতে পারে না।

এই রকম পথভ্রষ্টা অভাগিনীদের স্থান গড়তে হবে মেয়েদেরই, এদের আশ্রয়-দাতা পুরুষ কেন হবে? পুরুষ এদের রক্ষার নামে অত্যাচারই করে থাকেন, এদের দিয়ে ব্যবসা চালান, ভিন্ন দেশে—যেখানে যে সমাজে গেলে এ দেশের লোকের কানে সে বার্ত্তা পৌঁছিবেনা, সেখানে বিক্রয় করে দেন এ কথা পূর্ব্বে বলেছি। এদের শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক, এদের আরও নরকের পথে নামিয়ে দেন। এদেরই সন্তানদের পথে দেখতে পাওয়া যায়,—তারা পথের ধারে ভিক্ষা করে—অর্থের জন্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিক্রয় হয়ে যায়। অতি হীন জঘন্যভাবে এরা গড়ে উঠে, সামনে কোনও উদ্দেশ্য নাই—যে-কোন রকমে জীবনটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া মাত্র। এই সব আবর্জ্জনা যেখানে জমে থাকে সেখানে অনেকটা স্থান দুর্গন্ধে ভরে উঠে—যতদূর সম্ভব সেখানকার বাতাস বিষাক্ত করে তোলে।

উপযুক্ত শিক্ষা দিলে এরাও মানুষ হতে পারে, জগতের অকল্যাণ না করে এরাও কল্যাণ সাধন করতে পারে, ভদ্রভাবে এরাও জীবন কাটাতে পারে। বিচারক এদের পানে চান না, চাইবার আবশ্যকতা বোধ করেন না। কোন মেয়ে বিচারস্থলে উপস্থিত থাক্‌লে এ কথাটা নিশ্চয়ই তুল্‌তেন—ভবিষ্যতের বাস্তবিক শুভের পানে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। পুরুষের জগৎ বর্ত্তমান নিয়ে, কিন্তু মেয়েদের অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনটীকে জড়িয়ে নিয়ে জগৎ সৃষ্টি কর্‌তে হয়েছে, কেবল একটাকে নিয়ে তার চলে না। সাধারণের চোখে অতি ঘৃণ্য, অতি হেয়, অতি অপবিত্র এই স্থানগুলিকে নাড়াচাড়া করলে যে দুর্গন্ধ এতটুকু স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে বলে অনেকে সঙ্কুচিত হয়ে উঠছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় এর ফল ভালোই হবে। অনেক কীট আছে যারা এ বিষে মরে না, এই বিষপান করেই বেঁচে থাকে, তখন তারাই মুখে করে এই বিষের একটুখানিও গ্রহণ করে বয়ে নিয়ে যায়, গৃহস্থের অজ্ঞাতে ব্যঞ্জনে মিশিয়ে দিয়ে অনেকগুলি প্রাণ নষ্ট করে দেয়। গৃহস্থ নিশ্চিন্ত মনে থাকে,—আবার এমন বিপদ আসছে সে সম্বন্ধে ভাবতেও পারে না। সে রকম ভাবে জায়গায় জায়গায় মানুষের বসতির ঠিক পাশে পাশে এই স্থানগুলির চিহ্ন বিলোপ করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

দেশের সকল মেয়ে আজ বদ্ধপরিকর হয়ে এ কলঙ্ক-চিহ্ন তাঁরা লোপ করে দিন, ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা দাঁড়ান, যাতে উপযুক্ত শিক্ষা চারিদিকে বিস্তৃত হয় তার জন্য চেষ্টা করুন। নারীত্বকে—মাতৃত্বকে এমন করে অবহেলিত অপমানিত না হতে দিতে তাঁরা বদ্ধ-পরিকর হোন্। সামনে এই পূতিগন্ধময় নরক রেখে পথ চল্‌তে আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করি, চোখ ফিরিয়ে নেই। কি দরকার তার? তার চেয়ে একে একেবারে উচ্ছেদ করা—এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়া—সকল মেয়েকে নিজদের সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া উচিত নয় কি?

কেউ যদি বলেন—মেয়েরা বিদ্রোহ আন্‌তে চাচ্ছেন, সেটা একেবারেই ভুল ধারণা করা হবে। এর নাম বিদ্রোহ নয়—একটা দুর্নীতির চলাচল বন্ধ করা মাত্র, সত্যের ও সুনীতির এতে প্রতিষ্ঠা হবে। সত্যকার অনুতাপ যাদের মধ্যে এসেছে তারা পথ চলতে পাবে, যারা জ্ঞানহীনা মেয়েদের প্ররোচিত করে দূরে এই সকল স্থানে নিয়ে এসে—খেয়াল মিট্‌লে ফেলে রেখে আবার নিরীহ ভালোমানুষটী হয়ে মা বোন স্ত্রীর কাছে ফিরে যায়—সেখানে তারা স্থান পাবে না, জগৎ তাদের ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে দেবে।

সত্যের সুপ্রতিষ্ঠা হোক, দুর্নীতির ধ্বংস হোক, মানুষমাত্রেই এই কামনা করেন। ভণ্ডামীর মুখোস যারা পরে বেড়ায় তাদের সে মুখোস খুলে খসে পড়ুক,—মিথ্যা মিথ্যাই থেকে যাক, মেয়েরা শিক্ষা পেয়ে নিজেদের মর্য্যাদা নিজেরাই রক্ষা করুন, নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তার প্রতিকারে অগ্রসর হোন।
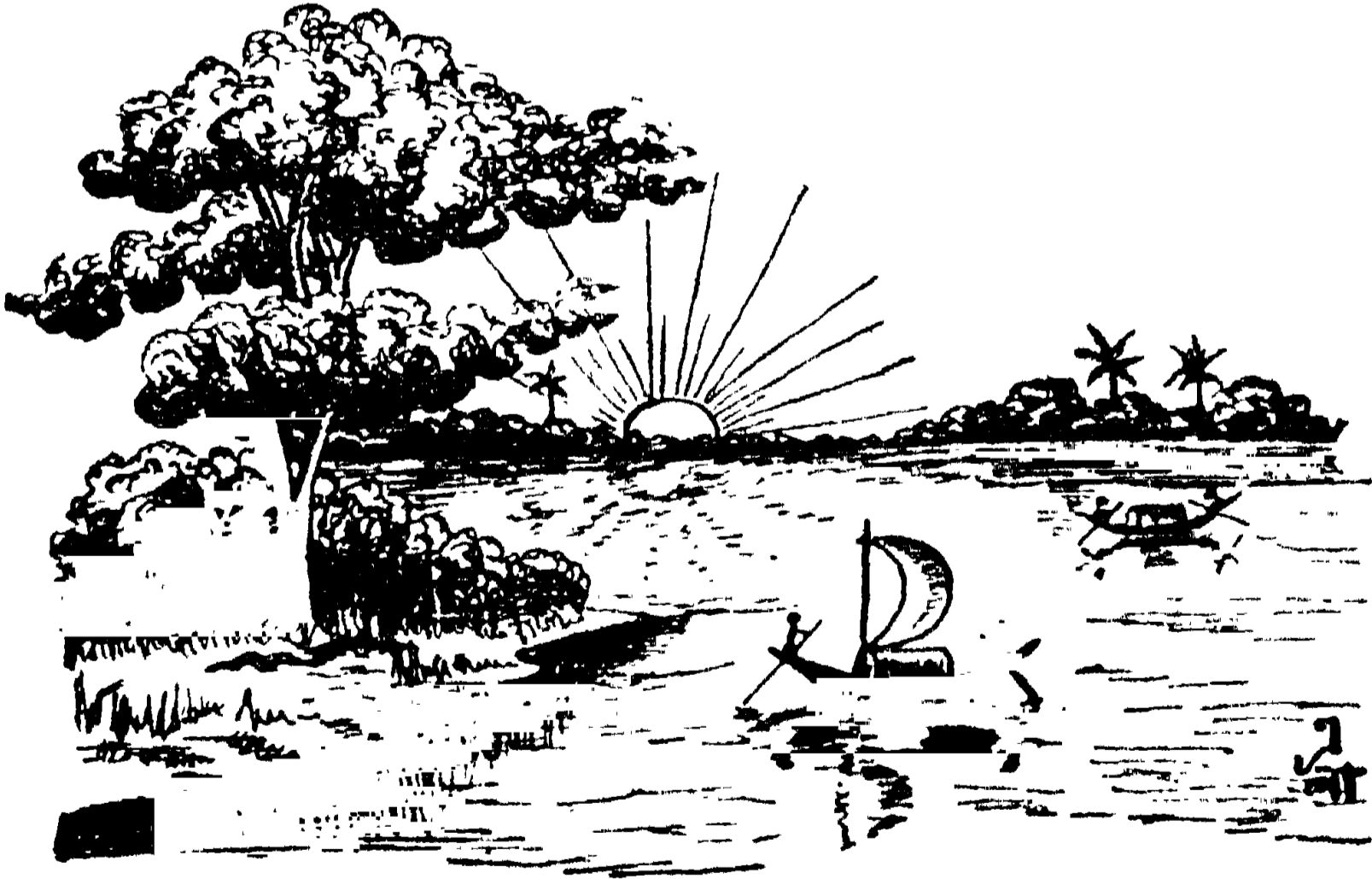
শৈশব-স্মৃতি

শ্রীসুধাংশুপ্রভা রায়

মধুর বড় লাগ্‌ছে আজি শৈশবেরি স্মৃতিখানি।
কোন্ অতীতের মধুর মায়ায় আজ্‌কে হৃদয় নিচ্ছে টানি!
পল্লী-প্রভাত উঠ্‌ত হেসে
অরুণ আলোয় উজল বেশে
কতই পাখীর গানের সুধায় প্রাণের মাঝে তৃপ্তি আনি,'
আজো তাহা ভুল্‌তে নারি সেই সে মধুর স্মৃতিখানি।

ধূলোখেলার পুলক ভরা হুড়োহুড়ি আঙ্গিনাতে,
যূঁই শেফালী থাকৃত ফুটে একটী ধারে চাঁদনী রাতে,
জুট্‌ত কত খেলার সাথী,
আজ্‌কে শুধু স্মৃতির ভাতি
উঠ্‌ছে জ্বলে হৃদয় মাঝে ফুট্‌ছে কতই স্বপন-বাণী।
কোন্ অতীতের মায়ার বলে আজ্‌কে হৃদয় নিচ্ছে টানি।

ভোর বেলাতে ফুল কুড়াতে ছুটছুটি তরুর তলে,
দুপুর বেলা পুকুর মাঝে সাঁতরে যেতাম অগাধ জলে,
সেই খানেতে লক্ষ শোভা
ফুট্‌ত কমল মনোলোভা,
মৃণাল হাতে চল্‌ত খেলা কোমল গায়ে হানাহানি,
জাগ্‌ছে মনে সেই সেদিনের স্বপন সম স্মৃতিখানি।

মনের মাঝে আজো জাগে হারিয়ে-যাওয়া গানের সম
লতায় পাতায় পুষ্পে ঢাকা জন্মভূমির কুটীর মম।
শৈশবেরি খেলা-ঘরে
কতই খেলা খেলেছিরে,
আজো জাগে পরাণ-মাঝে স্বপন-ভরা স্মৃতিখানি,
জীবনের এই সন্ধ্যা-বেলায় বড় মধুর ভোরের বাণী

রুচি-পরিবর্ত্তন

শ্রীনিস্তারিণী দেবী

বিগত কার্ত্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে শ্রীযুক্তা কামিনী-রায় লিখিত "সাহিত্য ও সুনীতি" নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া আকাঙ্ক্ষোচিত প্রতিকারের পথ দৃষ্টিগোচর হইল। এই প্রকার প্রবন্ধের যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলায় বহু খ্যাতনামা লেখিকা আছেন, তাঁহাদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ হয় নাই এ পর্য্যন্ত। আজ ভগিনী কামিনী অতি সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবিক নবীন লেখক-লেখিকার ও পাঠক-পাঠিকার এমনই রুচি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, পাশ্চাত্য সাহিত্য-অর্জ্জিত প্রেমের শ্লীলতাহীন অভিনয়পূর্ণ উপন্যাস ও চিত্র না হইলে আর্টের শিল্পকলার সৌন্দর্য্য দেখিতে পান না। এজন্য কোন কোন মাসিকের সম্পাদক নবরুচি-বিহীন গল্প ও প্রবন্ধাদি ছাপিতে অনিচ্ছুক। সাহিত্যের যে আলোচনায় নরনারীর মনের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির ছায়াপাত করে, উহা প্রকাশ করিয়া কি ফল? উপন্যাস-প্লাবিত মাসিক তরুণ-তরুণী বালক-বালিকা সকলের হাতে দেখা যায়, এবং সেই সুকুমার কোমল অপরিণত হৃদয়ে বৈধ-অবৈধ সকল বিষয়ের নগ্নচিত্রের রূপ দেখিয়া কি শিক্ষা ও কি প্রকার রুচি গঠিত হইয়া উঠে, তাহা সকল মাতাপিতার বিবেচ্য। শ্রীযুক্তা কামিনী রায়কে আজ ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। আশা করি, মনীষী ও মনস্বিণীগণ আমার এ মন্তব্যে রুষ্ট না হইয়া বিচার করিবেন, এবং যদি কোন ভ্রম হইয়া থাকে তবে ক্ষমা করিবেন। যখন মানুষের শরীর মনে যৌবনের সঞ্চার হইয়া অদম্য শক্তি উদ্যম উৎসাহে নব-রাগে রঞ্জিত করে, তখন কি তাহার কেবল আপাত-মনোরম আনন্দ ভোগ-লালসার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য হয়, না কায়-মন-চিত্তের উন্নতি বৃদ্ধি করিয়া নিজের ও সংসারের সুখ-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি করাই মানবোচিত ধর্ম্ম। কল্পিত সুখ অপেক্ষা বাস্তবের সুপ্রসার চেষ্টা বাঞ্ছনীয় নহে কি? মনের মহত্ত্ব বিকাশ শিক্ষার আদর্শ। শালীনতা সকল গুণের মধ্যে একটা প্রধান মনের বৃত্তি, বিশেষ রমণীগণের। তাহাদের সর্ব্বত্রই ইহা বজায় রাখা প্রয়োজন, কিন্তু পাশ্চাত্য প্রকোপে তাহা ক্রমে গণ্ডী ছাড়াইয়া চলিতেছে। চিত্রে-কাব্যে-গল্পে, সাজ-পোষাকের ফ্যাসন এখন এমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা রমণীগণ নিজ নারীত্বের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। লজ্জা সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য আবরণ অবশ্যই চাই। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির রুচির বিকাশ অপূর্ব্ব। একই প্রকারের পোষাক ঘরে বাইরে, ট্রেণে, পথে, দেবালয়ে, দোকানে বাজারে সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আমরা যাহাদের অনুকরণ করি, তাহাদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত হওয়া নিয়ম। অর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত রাখা অপেক্ষা প্রাচীনকালের নিয়মে লোকের দৃষ্টি কম আকৃষ্ট হইত বলিয়া মনে হয়। মেয়েরা বিবাহ উৎসবে যে প্রকার সাজে সজ্জিত হইবেন, আবার বাজারে দোকানেও তাহাই দেখা যায়, ইহা কোন ক্রমেই প্রার্থনীয় নহে। অবরোধ অবগুণ্ঠন ভাঙ্গিয়া রমণী,

যখন বাহিরে শত পুরুষের সম্মুখীন হইতেছেন, তখন নিজের সুরুচির পরিচয় দিতে হইবে। লজ্জা নারীর প্রধান ভূষণ ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না, তাহা বিসর্জ্জন দিয়া কি সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারা যায়? অধুনা যে সকল চিত্র নয়নের সম্মুখে পুস্তকের পাতায় পাতায় অঙ্কিত করিয়া আর্টের ঔৎকর্ষ দেখান হইতেছে, তদনুযায়ী মানুষের সৌন্দর্য্য-লালসা উত্তেজিত হইয়া মন সেই আদর্শের দিকে ধাবিত হওয়া বিচিত্র কি? শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের "সাহিত্য ও সুনীতি" সকল নারীকেই পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। ইহার একস্থানে তিনি বলিয়াছেন "রমণীদের, স্বাধীনভাবে চলাফেরা আবশ্যক। কিন্তু তাঁরা যেন বিদেশীয় বেশবিন্যাসের নির্লজ্জতাটুকু পরিহার করেন।"
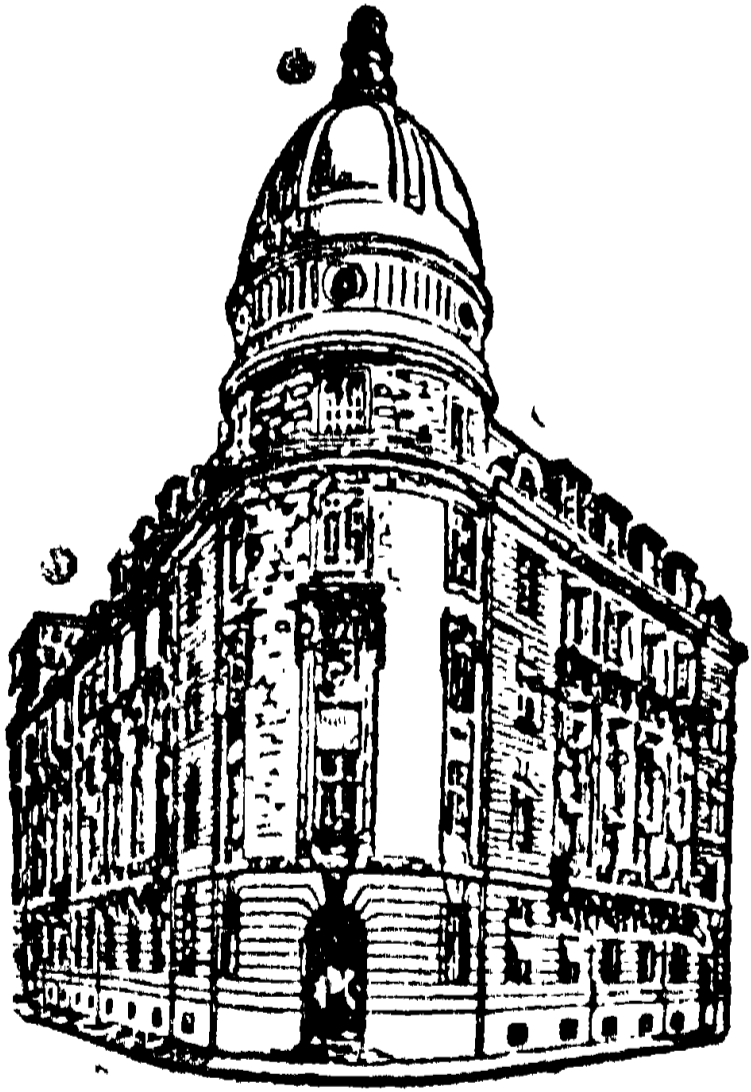
গোলকধাঁধা

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

(১২)

সকালবেলার আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

শান্তা নীচে প্রিয়লালবাবুর বৈঠকখানা ঘরের পাশে একটি কক্ষে অপরেশের সহিত কথা বলিতেছে। ঘরখানা আয়তনে ক্ষুদ্র। ইতঃপূর্ব্বে এটি ছিল অব্যবহার্য্য—যত রাজ্যের পুরাতন বাক্স বইয়ের গাদা এবং ভাঙ্গা খাটপালঙ্কের অংশ স্তূপাকার হইয়া আশ্রয় লইয়াছিল এইখানে। সম্প্রতি ইহাকে পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, কারণ, প্রিয়বাবুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও শান্তা যখন একবার শক্তি-মন্দিরের সংস্রব স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে, তখন সেই সম্পর্কে মাঝে মাঝে দুই-একজন বাহিরের ভদ্রলোকের আগমন সম্ভাবনা আছে বৈকি? অপরিচিত আগন্তুককে সচরাচর উপরে লইয়া যাওয়া একেবারেই অসঙ্গত, বাহিরের ঘরে সকল লোকের অবাধ দৃষ্টির সম্মুখে যখন তখন শান্তাকে বাহির করিয়া আনাও একান্ত অশোভন। সুতরাং ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রিয়লালবাবু হিন্দু নারী ও আধুনিতার সমন্বয় সাধন করিয়া অন্তঃপুর স্বর্গের রহস্যছায়া এবং কর্ম্মমুখর মর্ত্ত্যের প্রকাশ্য দিবালোকের মাঝখানে আবিষ্কার করিয়াছেন ত্রিশঙ্কুর অবস্থানরূপে এই ঘরখানি।

অপরেশ বলিলেন, "নেক্‌সট্ মিটিংএ আমি এই প্রস্তাবটি তুলব ঠিক করেছি, কেননা যত শীগ্‌গির শীগ্‌গির করা যায় ততই ভালো।"

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "সবাই মত দেবেন তো?"

'নিশ্চয়! এতে আপত্তি তুলবার তো কারও বিশেষ কোনো গ্রাউণ্ড দেখচি না, সবাই না দিলেও অধিকাংশই দেবেন।'

'কিন্তু তা হলেও আমার তো বিশ্বাস, এটা আপাততঃ না হ'লেও চল্‌তে পারে!" অপরেশবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'কি করে চল্‌বে? কোন কিছু নতুন ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট কর্ত্তে গেলেই টাকার দরকার!'

'তা মানি। কিন্তু আমাদের দেশে টাকার যখন এত টানাটানি, তখন যতদূর সম্ভব ব্যয়সংকোচ কর্ত্তে চেষ্টা করাটাই ঠিক নয় কি?"

অপরেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'সে তো বটেই। তবে যেগুলো দরকার সেগুলো কর্ত্তেই হবে তো? এই কমাস ধরে শক্তিমন্দিরের কাজ যে চল্‌ছে, সে কোনো রকমে টেনেহিঁচ্‌ড়ে চলা—দেখ্‌তেই পাচ্ছেন, বাইরের কোন রকম শ্রীবৃদ্ধি করা যাচ্ছেনা। আজকাল ছাত্রীসংখ্যা হিসাবে এর যেরকম উন্নতি দেখতে পাচ্ছি, তাতে ঘরে বাইরে উভয়তঃই একটু পরিবর্ত্তন না কর্লে চলবে কেন বলুন?'

শান্তা উত্তর দিতে উদ্যত হইতেছিল, কিন্তু থামিয়া গেল। অপরেশের প্রস্তাবে তাহার সম্মতি বিশেষ ছিল না, কিন্তু ইতিমধ্যেই আরও দু'একদিন তাঁহার সহিত শান্তার মতান্তর প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং নিত্যই এই ভদ্রলোকটিকে সব ব্যাপারে প্রতিবাদ করিতে তাহার সঙ্কোচে বাধে।

তাহাকে মৌন দেখিয়া অপরেশ বলিলেন, "কি বলছিলেন—বলুন না? আপনার মতামত জান্‌তেই তো এসেছি!"

"ভাবছিলাম, দরকারটা একেবারেই অপরিহার্য্য কি না। আপনি যাকে ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট বল্‌ছেন, আমার মনে হয় তার অনেকটাই অনাবশ্যক।—" সসঙ্কোচে এইটুকু বলিয়া সে অপরেশের মুখের দিকে তাকাইল।

অপরেশ বাবু মনে মনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যবোধ করিলেন, একটু ধাক্কাও খাইলেন। তাঁহার নিজের আগ্রহাতিশয্যেই শান্তা তাঁহার শক্তিমন্দিরে প্রবেশ করিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পর হইতে তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই মতের অনৈক্য। শান্তা সাধিয়া কোথাও কোনও বিষয়ে প্রভুত্ব করে না, বরঞ্চ অনন্যসাধারণ বিনয় সহকারেই কথা বলে। এজন্য অপরেশবাবু তাহাকে পছন্দ করেন খুবই। কিন্তু মাঝে মাঝেই দেখা যায়, অপরেশ যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, শান্তা মনে করে ঠিক তাহার বিপরীত। ইহাতে তিনি বিরক্ত হন না, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হন।

শান্তা দেখিল, অপরেশ মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া আছেন। নিজের আচরণে কোনরূপ রূঢ়তা প্রকাশ হইয়া পড়িল কি? তাড়াতাড়ি ত্রুটি সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "আমার যা মনে আসে তাই বলে ফেলি—কিছু মনে করবেন না সেজন্যে। মতামত জিজ্ঞেস করলেন, তাই বল্লাম। হয়ত আমার ভুলও হতে পারে বুঝতে।"

অপরেশ হাসিয়া বলিলেন, "যা মনে আসে তাই বলবেন না তো কি করবেন? ফ্র্যাঙ্কনেস্ জিনিষটা আমি বড্ড ভালবাসি। সরলভাবে মনের কথা খুলে না বল্‌লে অনর্থক অনেক গোলমালের সৃষ্টি হয়।"

"আমিও তাই বলি।"

"আচ্ছা, বলুন তাহলে আমার প্রস্তাবটা আপনার অনাবশ্যক কেন মনে হয়।"

শান্তা বলিল, "আপনি সভ্যদের চাঁদা এবং ব্যায়াম শিক্ষার্থীদের ভর্ত্তির খরচ, দুটোই বাড়াতে চাচ্ছেন। সভ্যদের চাঁদার হার বাড়াতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, কারণ যাঁরা একটা মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে উদ্যোগ করে অনুষ্ঠান করেছেন, তাঁদের এর জন্যে কিছু কিছু স্যাক্রিফাইস্ কর্ত্তে হবে বৈ কি? কিন্তু যারা শিখতে আস্‌ছে, তাদের ওপরে বোমা চাপানো আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। তাতে করে ব্যবসায় বুদ্ধির ভালো নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু পরোপকার ব্রতের অনুপ্রাণনার পরিচয় পাওয়া যায় না।"

"তা হলে ব্যয়সংকুলান হবে কি করে?"

"ব্যয় সংক্ষেপ করুন।"

অপরেশ বলিলেন, "ব্যয় সংক্ষেপ কোনোমতেই যে করা যাচ্ছে না, আপনিও তো দেখচেন!"

শান্তা বলিল, "চেষ্টা থাকলে যায়। এই ধরুন, আপনি বল্‌চেন—শক্তিমন্দিরের ব্যায়ামার্থীদের একটা আলাদা য়ুনিফর্ম্ম দেবেন, যাতে তাদের বাহিরে একটা বিশেষত্ব থাকে। আমি বলি, এটা একেবারে নিরর্থক। আপনি বল্‌চেন, দিনকে দিন যে রকম উন্নতি হচ্ছে, তাতে আমাদের বর্ত্তমান বাড়ীটাতে স্থানাভাব হয়ে পড়চে, অন্যত্র বড় রকমের একটা বিল্ডিংয়ে তুলে নিতে হবে। আমি তো দেখচি, স্থানাভাব যা হচ্ছে তা ব্যায়াম শেখানোর নয়—সে হচ্ছে বড় আফিসঘর, সেক্রেট্যারিয়েট্ টেব্‌ল, ভিজিটারস্ রুম্, মানানসই রকমের লাইব্রেরী ইত্যাদির। কেমন, নয়?"

অপরেশ বলিলেন, "কেন যে এগুলো প্রয়োজনীয় নয় আমি তো বুঝতে পারছিনা। ছোট বড় সব ব্যাপারেই একটুখানি টেস্‌ট্ থাকাটা কি ভালো নয়?"

"ভালো হতে পারে, কিন্তু অপরিহার্য্য নয়। যেখানে পেটের অন্ন জোটাতেই লোকের গলদ্‌ঘর্ম্ম, সেখানে বাইরের রুচির দিকে এত জোর দিলে চল্‌বে কেন বলুন?" একটু হাসিয়া বলিল, "বিলিতী হাওয়া এত বেশী এসে আমাদের গায়ে লেগেছে যে, অনাড়ম্বর কোনও অনুষ্ঠান যে বৃহৎ ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে, এ কল্পনাটাও উড়ে গেছে।"

অপরেশ বাম হাতখানিতে চেয়ারের হাতলের উপর ভর করিয়া তাহাতে মুখ ঠেকাইয়া ক্ষণ কালের জন্য মাথা নীচু করিয়া রহিলেন; ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া গম্ভীরভাবে শান্তার মুখের দিকে একবার তাকাইলেন, কিন্তু কথা বলিলেন না। তাঁহার মৌনদৃষ্টির গভীরতায় হঠাৎ যেন শান্তা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

অপরেশবাবু বলিলেন, "যখনই যে কাজ আমি হাতে নিয়েছি জলের মত স্বচ্ছন্দগতিতে চলে গেছে, কোথাও বিশেষ ঠেক্‌তে হয়নি। প্রথম বাধা পেতে সুরু কর্‌লাম আপনার কাছে।"

শান্তা বলিল, "একসঙ্গে কাজ কর্ত্তে গেলে একে অন্যের ভুল সংশোধন না করে দিলে কি ভালো হয়? অবিশ্যি, ভুল যে আপনারই—আমার নয়, এমন কথা আমি জোর করে বল্‌তে পারিনে।"

গম্ভীর ভাবে অপরেশ বলিলেন, "হুঁ।"

শান্তা কোন উত্তর করিল না।

অপরেশ বলিলেন "কিছু মনে করবেন না—কিন্তু আমি গৌরব করে এটুকু আমার সম্বন্ধে বল্‌তে পারি যে, যুক্তিতর্কেও কেউ আমাকে এ পর্য্যন্ত ঠকাতে পারেনি, আমার ইচ্ছাশক্তির সাফল্যে কখনও কোনও বাধা স্থায়ী হয়নি।—" একটু থামিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস আপনাকে আমি কন্'ভিন্‌স্ করাতে পারব।"

শান্তা মনে মনে হাসিয়া বলিল, "চেষ্টা করে দেখতে পারেন।" "হ্যাঁ—দেখ্‌ব আর একদিন।" আলোচনার অর্দ্ধপথেই অপরেশবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, "বেলা হয়ে গেছে আজ উঠি এখন।"

দরজার কাছাকাছি গিয়া ফিরিয়া একটু বলিলেন, "আচ্ছা, আসি তাহলে—নমস্কার।"

১৩

শান্তাও উপরে চলিয়া আসিল। দোতালায় সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখে—বারান্দায় সত্যকাম ও মাণিকে বিষম যুদ্ধ চলিয়াছে। সত্যকামের হাতে একটা মস্তবড় লাল টুক্‌টুকে গোলাপ—তাহাই লইয়া কাড়াকাড়ি।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া সত্যকাম মুখ ফিরাইয়া দেখিল, শান্তা। সুতরাং যুদ্ধোদ্যম প্রশমিত করিবার প্রয়োজন বিবেচিত হইল না—প্রিয়বাবু অথবা ইন্দুমতী তো নয়—হাসিয়া সে আবার মাণিকের সঙ্গে রণে প্রবৃত্ত হইল। শান্তাও হাসিমুখে আপন মনে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

মাণিক অর্দ্ধেক হাসিয়া অর্দ্ধেক কাঁদিয়া অনুনাসিক কণ্ঠে বলিল, "দেখ—দিচ্ছে না—"

তাহার সুরের অবিকল অনুকরণ করিয়া সত্যকাম প্রতিধ্বনি করিল, "দেখ—দিচ্ছে না—" ক্ষেপিয়া গিয়া বালক তাহার ক্ষুদ্রমুষ্টি দিয়া সত্যকামের উরুতে দিল এক ঘুসি। সত্য সত্য ব্যথা কতটুকু লাগিল সন্দেহের বিষয়, কিন্তু সত্যকাম 'উ—হুঃ" বলিয়া এক লাফে তিনহাত পিছাইয়া গিয়া গোলাপশুদ্ধ হাতখানি উঁচুতে ধরিয়া বলিল, "দেব না—কক্ষনো দেব না!"

মাণিক নিরুপায়। হঠাৎ কি একটি উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। ছুটিয়া গিয়া ঘর হইতে একটি মোড়া বাহির করিয়া আনিল—হাতদুইখানি পিছনে রাখিয়া, লুকাইয়া। তাহার নিজের ক্ষুদ্র কলেবরের অন্তরালে অতবড় মোড়াটি যে কোনোমতেই লুকাইবার নয়, ততখানি সূক্ষ্মবুদ্ধি তাহার হয় নাই। অত্যন্ত বুদ্ধিমানের ভঙ্গিমায় মৃদুহাস্যে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিয়া সে সন্তর্পণে মোড়াটি সত্যকামের পায়ের কাছে নামাইয়াই তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইবে, অমনি সত্যকাম পা দিয়া সেটাকে ফুটবল করিয়া দিল দূরে ছুড়িয়া। ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া এবার মাণিক চীৎকার করিয়া কাঁদিতেই সুরু করিল, "দেখ মা, সত্যকাকা কি কচ্চে— !"

সত্য হাতখানা নীচু করিয়া আনিয়া মাণিকের মুখের প্রায় সামনে ফুলটি নামাইয়া ধরিয়া বলিল, "নেবে?—নাও।"

মুহূর্ত্তে ক্রন্দন থামিয়া গেল। সাগ্রহে মাণিক হাত বাড়াইতেই সত্য হাসিয়া হাতশুদ্ধ সরাইয়া ফেলিল—মানুষকে উত্যক্ত করিতে সে অত্যন্ত পটু। এবারে মাণিকের অসহ্য হইল, সে উচ্চৈঃস্বরে কান্না জুড়িয়া দিল।

ব্যাপার বেগতিক দেখিয়া সত্যকাম হাসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া আদর করিয়া বলিল, "চল, তোমায় বেড়িয়ে নিয়ে আসি, সেখানে অনেক ফুল দেব।"

দূরের ঘর হইতে ডাক শোনা গেল, "মাণিক, চান করবি আয়।" সুষমা বাহির হইয়া আসিলেন।

মাণিক বলিল, "আমি কাকার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি।"

"এই দুপুরে আবার বেড়ানো কি রে? আয়।"

সত্যকাম ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, "মিনিট দুই আগে ওর সঙ্গে আমার এক পালা হয়ে গেল কিনা, তারই সন্ধিস্বরূপ ঘুষ হচ্ছে!"

মাণিকের সঙ্গে সত্যের প্রায়ই মাঝে মাঝে এ রকম কুরুক্ষেত্র বাধিয়া থাকে। সুষমা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি এখনও কি ছেলেমানুষী যে কর ঠাকুরপো!"

"ছেলেমানুষী করব না তো আমি বুড়ো হয়ে গেছি নাকি!—সত্যি বৌদি, এক কুড়ি বয়স পেরিয়ে এলাম, তবু মনেই হয় না বড় হচ্ছি। ভয়ানক চঞ্চল আমি, না?'

মাণিককে কোল হইতে নামাইয়া তাহার মায়ের হাতে সমর্পণ করিয়া সত্যকাম গোলাপ বৃন্তটি হাতে দোলাইতে দোলাইতে শান্তার ঘরের দুয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের মধ্যে পূর্ব্বের জানালা দিয়া রোদ আসিয়া লুটাপুটি করিতেছে; স্নিগ্ধতা নাই, বড় প্রখর। তবু শান্তা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। কপালে গালে উত্তাপ আসিয়া লাগিতেছে। কনুইয়ের উপর ভর দিয়া হাতের উপর মুখ রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দেখিতেছিল। কত গাড়ী ঘোড়া, কত ট্রাম মোটর ছুটাছুটি করিতেছে, কত লোক! অশ্রান্ত কাজের গতি!

সত্যকাম বলিল, "আস্‌ব?"

শান্তা ফিরিয়া সহাস্যে বলিল, "আসুন।"

ঘরে ঢুকিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ্ টিপিয়া দিয়া সত্যকাম বলে, "বেশ গরম পড়েছে আজ, না?"

হাসিয়া শান্তা উত্তর দিল, "তা ছাড়া, এক্ষুণি আপনি যা লুটোপুটি করে এলেন—গরম লাগ্‌বার কথাই বটে!"

"ওটা আমার স্বভাব—কি করব বলুন?"

কতক্ষণ দুজনেই চুপ; শান্তা কথা বলিতে জানে না, সত্যকাম ভয় পায়।

সত্যর বড় অস্বস্তি ঠেকিতে লাগিল। শান্তা সাম্‌নের দরজা দিয়া বারান্দার দিকে চাহিয়া, সে-ও একবার ঘাড় ফিরাইয়া সেদিকে তাকাইল, কিন্তু প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার মত কোনও বস্তু চোখে পড়িল না—মাণিকও নাই, বাড়ীর পোষা বিড়ালটাকে পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না! কতক্ষণ শান্তার অন্যমনস্ক মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সত্যকাম বলিল, কি ভাব্‌চেন?"

"বিশেষ কিছুই না!" বলিয়া শান্তা পাশের চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল, একটা মৃদু নিঃশ্বাস পড়িল।

সত্যকামের কাণে তাহা গেল হয়ত। অনেকক্ষণ অলসভাবে চিন্তাস্রোতে মন ভাসাইয়া দিয়া হঠাৎ যখন মানুষ সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া জাগ্রত জগতের মধ্যে ফিরিয়া আসে, তখন এমন দীর্ঘশ্বাস আপনার অজ্ঞাতেই যে বাহির হইয়া আসে, এ তথ্যটা সত্যর ছিল বোধ হয় অপরিজ্ঞাত। সে বলিল, "বল্‌বেন না—তাই বলুন!"

শান্তা কৌতুক অনুভব করিল, হাসিমুখে উত্তর করিল, "আচ্ছা, তাই-ই!"

ইহার পরে এসম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। তথাপি সত্যকাম কথাটাকে শেষ হইতে না দিয়া বলিল, "আপনাদের সব কিছুই হেঁয়ালি।"

"হেঁয়ালি কে নয়? কোনও মানুষই কোনও মানুষের সবটা বুঝ্‌তে পারে না—আমিই কি আপনার সব জানি?"

সত্য বলিল, "আপনাকে না জানাতে দেওয়ার মত আমার কিছুই নেই।"

'আমারও নেই।'

সত্য চুপ করিল।

শান্তা কথা ফিরাইয়া বলিল, 'নূতন কলেজ কেমন লাগ্‌ছে?'

'ভালই!'

'আপনাদের ক্লাসে আপনারা ক'জন?'

সত্য বলিল, "ওঃ—ঢের! প্রায় দেড়শ খানেক ছেলে, পাঁচটি মেয়ে।"

কলেজের কথা উঠিয়া পড়াতে সত্যকামের পথ সুগম হইল। তরলভাবে অনেক-কিছু বাজে কথার অবতারণা করিয়া ফেলিল। এবারে তাহার স্বচ্ছন্দ গতি! তাহার সেই উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিমায়, হাস্যমধুর কণ্ঠে সে যাহা-কিছু বলিয়া যায়, সবই শুনিতে লাগে বেশ! তাহার অনর্গল বাক্য-স্রোতের মধ্যে আর কাহাকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিলেও শ্রোতার তাহাতে অরুচি ধরে না।

খানিকক্ষণ পরে উঠিয়া বলিল, 'যাই বেলা হয়ে গেছে। অনেক বাজে বক্‌লাম!' সত্যকাম দুয়ারের কাছে পৌঁছিতে শান্তা বলিল, "আপনার ফুল ফেলে চল্লেন যে!" সত্য একবার গোলাপটির দিকে একবার শান্তার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, 'থাক্‌লই বা!'

অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া সে টক্ টক্ করিয়া ছাদের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

বেলা বাড়িয়াছে; হাতেও করিবার মত কাজ কিছুই নাই। শান্তা টেবিলের উপরের বই খাতাগুলি বারেক নাড়িয়া চাড়িয়া গোলাপ ফুলটি হাতে লইয়া বহুক্ষণ গন্ধ শুঁকিল, চাহিয়া দেখিল—কী অপূর্ব্ব তার রূপ! যেন যৌবনের সদ্যজাগ্রত রাগরক্ত হৃদয়খানি!

অন্যমনস্কভাবে ফুলটি খোঁপায় গুঁজিয়া শান্তা বাহির হইয়া ইন্দুমতীর রান্নাঘরে আসিয়া দেখা দিল। মা সেখানে বিবিধ পাত্রে বিবিধ নিরামিষ ডালতরকারী রাঁধিয়া নামাইতেছেন। পাশে একখানা থালায় স্তূপীকৃত লাল আলুসিদ্ধ ও নারিকেলের পুর। ইহারই লোভাকৃষ্ট হইয়া মাণিক কিছুক্ষণ হইতে রান্নাঘরে স্থান লইয়াছে। শান্তা একখানা পিড়ি টানিয়া বসিল।

হঠাৎ মাণিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "অ্যাঁ! ছোড়দি, তুমি কোথায় পেলে?"

"কি রে?"

মাণিক ছুটিয়া আসিয়া তাহার ঘাড়ের উপর ঝুঁকিল। শান্তা চুলের মধ্য হইতে গোলাপটি খুলিয়া আনিয়া আদর করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "নাও।"

বালক মহাখুসী।

ক্রমশঃ
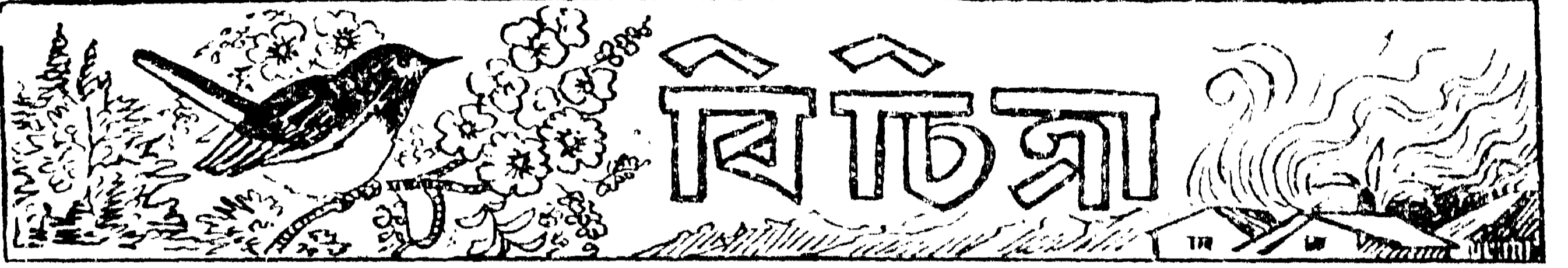
নারী-প্রগতি

নারী বিক্রয়ের ব্যবসা একেবারে বন্ধ হউক

এক দেশ হইতে নারী ও শিশুদিগকে অন্য দেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করা হয়। এই ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য জেনেভার বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের আইন-পরিষদে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, বিক্রয়ে কঠোর আইন প্রণয়ন করা দরকার। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা নারী স্বেচ্ছায় এক দেশ হইতে অপর দেশে গিয়া আত্মবিক্রয় করিতে রাজী হয়। এ সব স্থলেও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। আমরা মনে করি, প্রত্যেক সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট, এরূপ আইন প্রণয়ন করিতে যত্নবান্ হইবেন।

মহিলারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাহেনানা

বিগত দশই অক্টোবর তারিখে মাদ্রাজে মহিলা সম্মিলনীর ৭ম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। মহীশূরের লেডি মির্জ্জা ইসমাইল সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় এই আবেদন করা হয় যে, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে মন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গ্রহণ করা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মহিলাদের কর্ত্তব্য। মহিলারা কখনও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন সমর্থন করেন না। আর একটি প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দেওয়া হয় যে, তাঁহারা বিশেষ জোরের সহিত সর্দ্দা আইন সমর্থন করিয়াছেন। সভায় উপসংহারে সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, এ সময়ে সাধারণ নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করা মহিলাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

নারীর অধিকার

লক্ষ্ণৌয়ের মহিলা সমিতির সভানেত্রী লেডি ওয়াজির হোসেন "নারীর অধিকার" সম্পর্কে লক্ষ্ণৌয়ের নানা স্থানে কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এখন মহিলাদের অধিকার স্বীকৃত হইতেছে। নানা দিক দিয়া পরিবর্ত্তন আসিতেছে। এ সময়ে স্বীকার করিতে হইবে যে, যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের নারীদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। লেডি ওয়াজির হোসেন প্রসঙ্গক্রমে নানা কুসংস্কারের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাল্য বিবাহের প্রথা দূর করিবার জন্য সর্দ্দা আইন পাশ হইয়াছে। তথাপি আমরা এই সংস্কারকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এ সমস্তের প্রতিকারের সময় আসিয়াছে। তাহা না হইলে পৃথিবীর সভ্য জাতির নিকট লজ্জায় আমাদিগকে মাথা নত করিতে হইবে।

ভারত-নারীর উচ্চাভিলাষ

শ্রীযুক্তা পদ্মিনী সাথিয়ানাধান 'দি ইয়ং বিল্ডার্স' পত্রিকায় ভারত নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —

"বর্ত্তমান ভারত-নারীর প্রধান উদ্দেশ্য জাতি গঠনে সহায়তা করা। এতদিন যাঁহারা সম্পূর্ণ তন্দ্রামগ্ন ছিলেন, দেশের কর্ম্ম চিন্তা আজ তাঁহাদিগকেই সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনকে জয়যুক্ত করাই হইল বর্ত্তমানে প্রধান চিন্তা। এমন কি অন্তঃপুর ছাড়িয়া অনেকে স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করিয়াছেন। স্বদেশী জিনিষ বিক্রয়ে উৎসাহ দিতে এবং স্বদেশী সঙ্ঘকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে আজকাল তাঁহারা দোকানে দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতেও ত্রুটি করেন না।

বহু নারী সমাজের উন্নতিকল্পে নিম্নশ্রেণীয়দের শিক্ষার দ্বারা জাতিকে উন্নতস্তরে আনয়ন করিতে সচেষ্ট। বাস্তবিকই তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রশংসারই। আশা করা যায়, তাঁহারা সাফল্য লাভ করিবেন। গণশিক্ষা সমস্যাই বর্ত্তমানে বড় সমস্যা। প্রত্যেক নারীরই তাঁহার চতুর্দ্দিকের অবস্থার পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান ভারত-নারীর আর একটা প্রধান উদ্দেশ্য হইল, নিজেদের অবরোধ-প্রথা হইতে মুক্ত করিয়া পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার লাভ করা। এমন নির্ব্বিচারে পুরুষজাতির অনুসরণে তাঁহারা কি মনে করেন বুঝা কঠিন। সম্ভবতঃ এতদিনের অবরুদ্ধ অবস্থা তাঁহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। যে সমস্ত প্রথা তাঁহাদের সুখ-স্বাধীনতার অন্তরায় সেগুলি পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ করিতে চান, এ জগতে পুরুষের ন্যায় তাঁহাদেরও জীবনের আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকার আছে। তাই তাঁহারা ভোটাধিকার এবং কর্ম্মক্ষেত্রের অন্যান্য অধিকারও চাহিতেছেন।

তাঁহাদের অনেকের রুচি সৌন্দর্য্যকলার দিকে। শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে তাঁহারা গুণী হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন। তাঁহারা চান ভারতে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে এবং প্রাচীন সভ্যতা যে শিল্পকলার গৌরব করিত তাহা পুনর্জীবিত করিতে। ভারতে নবজন্মের সাড়া পড়িয়াছে এবং ইহাতে নারীর দানও কম নয়। নাটক, নৃত্যকলা এতদূর উন্নত হইতেছে যে এখন কোন নারীর নাট্যমঞ্চে অভিনয় করা নিন্দনীয় নয়। অন্যান্য শিল্পকলারও তাঁহারা উন্নতি করিয়াছেন। ইহা আমাদের দুঃখের বিষয় যে, সংখ্যায় অধিকতর মহিলারা লোকহিতকর কর্ম্মের পরিবর্ত্তে শিল্পোন্নতির প্রতি আকৃষ্ট নন। গতবৎসর নিখিল ভারতীয় নারী সম্মেলনে (A. I. W. Conference) যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা বর্ত্তমান মহিলাদের মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাই। এখানে ঐ সভার কয়েকটি প্রস্তাব উদ্ধৃত করা হইল—(১) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার। (২) বয়স্ক লোকদের জন্য শিল্পশিক্ষার প্রচলন। (৩) দেশের সার্ব্বজনীন মঙ্গলের জন্য সদ্ভাবের সহিত কাজ করা। (৪) সর্দ্দাবিল জনপ্রিয় করিয়া তোলা। (৫) মন্দিরে দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদ। (৬) স্বদেশী শিল্পের উন্নতি ও প্রচার। (৭) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নে সাহায্য করা।

ডাক্তারী বিদ্যায় নারীর কৃতিত্ব

মিসেস্ এ, জি হ্যারিসন নাম্নী একটী মহিলা চেয়ারিং ক্রশ মেডিক্যাল স্কুল হইতে সব পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করিয়া এগারটী বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন—এবং এগারটী বিষয়েই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল, তিনি বিবাহিত এবং দুইটী সন্তানের জননী।

সারাদিন নিজের অধ্যাপনায় কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে তিনি সন্তানদের সহিত থাকিতেন। আমাদের দেশে মেয়েদের শক্তির অপচয় ভিন্ন শক্তি বিকাশের কোন পথই চোখে পড়ে না। তাহার উপর বিবাহ করিয়া একটী সন্তানের জননী হইলে তো কথাই নাই।

আমেরিকা প্রবাসিনী বাঙালী মহিলা

স্বাধীন দেশের আবহাওয়া মানবের কার্য্যক্ষমতা ও চিন্তাশক্তি বিকাশে কতদূর সাহায্য করে শ্রীযুক্তা কমলা মুখার্জ্জি তাহার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের কন্যা ও বধূ, স্কুল কলেজের শিক্ষা লাভের বিশেষ কোন সুযোগই বাল্যকালে তিনি পান নাই। বিবাহের পরে স্বামীসহ আমেরিকায় গমন করেন। সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাঁহার শিক্ষার সুযোগ দিয়াছে। এই অনুকূল আবহাওয়ায় স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি তথাকথিত উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এদেশে শিক্ষিতা সমাজেও তাহা অতি দুর্লভ।

শ্রীযুক্তা কমলা মুখার্জ্জি

জয়শ্রীতে প্রতিমাসেই তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাষার সারল্যে সেগুলি সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। সর্ব্বোপরি এই প্রবাসিনী মহিলার লেখাতে স্বদেশের প্রতি একান্ত অনুরাগের পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হই। নারীর উন্নতিমূলক সর্ব্বপ্রকার কাজে তাঁহার সহানুভূতি ও উৎসাহ আছে। এ দেশের সহিত সকল ভাবে সংযুক্ত থাকিবার যে কোন সুযোগ তিনি উপেক্ষা করেন না।

শিশু-শিক্ষায় বাঙালী মহিলা

শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা গুপ্তা বি-এ, বি-টির নাম ও জয়শ্রীর পাঠক পাঠিকার নিকট সুপরিচিত। তিনি শিশুশিক্ষা সম্বন্ধীয় একাধিক প্রবন্ধ ইহাতে লিখিয়াছেন। তাঁহার সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়িয়া সকলেই বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ যাহাদের শিশু মনস্তত্ত্ব বিষয়ে নূতন জ্ঞান লাভ করার আগ্রহ আছে, তাহারা ইহাতে অনেক ভাবিবার ও জানিবার তথ্য পাইবেন। প্রবন্ধগুলি সুলিখিত, ইহার ভাষাও সহজবোধ্য।

সম্প্রতি শ্রীযুক্তা সুনীতি গুপ্তা শিশুশিক্ষা বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালে লীড্‌স্‌এ অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। সেখানে দুই বৎসরের পাঠ্যবিষয় তিনি এক বৎসরে সমাপ্ত করেন। ১৯৩১ সালে তিনি ডিপ্লোমা পান ও শিশুর মনস্তত্ত্ব বিষয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান (First Class first) অধিকার করেন। এতদ্‌ব্যতীত Piaget on Intellectual Development of Children বিষয়ে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বিশেষ সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে দেশে যত রকমের শিক্ষা-প্রণালী আছে এবং বিভিন্ন

বিদ্যালয় আছে, তাহা ভাল করিয়া জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বৎসরের থিসিস পড়িয়া শিশুমনস্তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ জগৎ-বিখ্যাত পণ্ডিত প্রফেসার ভ্যালেন্টাইন অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের বিষয় ছিল—'সাত বৎসর বয়স্ক শিশুর বিচার-বুদ্ধি।' ইহার জন্য তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে Binet, Simon, Piaget প্রমুখের উদ্ভাবিত নানা প্রণালীগুলি পরীক্ষা করিয়া প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার মৌলিক পরীক্ষা-বিধিও ছিল।

শ্রীযুক্তা সুনীতি গুপ্তা

এই থিসিস্ শ্রীযুক্তা গুপ্তা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমাদের উহা অনুবাদ করিয়া জয়শ্রীতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে নানা গবেষণা-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

এই মনস্বিনী মহিলার নিকট বাঙালী অনেক-কিছু আশা করে।

দেশ

ভারতে ছেলেমেয়েদের একত্র অধ্যয়ন-ব্যবস্থা (Co-education)

ছেলেমেয়েদের একত্র অধ্যয়ন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা গতমাসের 'জয়শ্রীতে' কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। ডাক্তার জে, এইচ, গ্রে 'দি ইয়ংমেন অফ্ ইণ্ডিয়া বার্ম্মা এণ্ড সিলোন' পত্রিকায় এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

"সমাজে নারী-পুরুষ সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছেলেমেয়েদের একত্রর অধ্যয়ন-ব্যবস্থার সমস্যা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিবাহের পূর্ব্বেই হোক বা পরেই হোক, ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক ও বান্ধবতা তাহাদের স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর পরিণতির জন্য একান্ত আবশ্যক। সম্মিলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ইহার প্রধানতম পন্থা।

একত্র অধ্যয়ন-ব্যবস্থার সহিত যিনি বহুদিন সুপরিচিত, তাঁহার নিকট এ সমস্যার সমাধান কঠিন নয়। বস্তুতঃ তাহার নিকট ইহা অনতিক্রম্য সমস্যা মোটেই নয়। কিন্তু যিনি তেমন পরিচিত নন্ তাঁহার পক্ষে সমস্যাটি তত সহজ নয়। একত্র অধ্যয়নের ফল সম্পূর্ণ ভাল বা সম্পূর্ণ খারাপ নয়। ইহার দোষ এবং গুণ দুই আছে। তবে

কোনটা বেশী তাহা অনুমান করা কঠিন। এই সম্মিলনের ফলে উভয় উভয়কে জানিতে পারে, পরস্পরের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। ইহা বাস্তবিকই ভাল। হয়ত সময়ে এই ব্যবস্থার ফলে কোন বিপদ আসিতে পারে। কিন্তু সেজন্য একটা বিপদের আশঙ্কা করিয়া জীবন যাহাতে সুন্দর হইয়া ওঠে তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বিশেষতঃ একত্র অধ্যয়নের ফলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবই সহস্রগুণ জাগাইয়া তোলে, নিজেদের অবনমিত মোটেই করে না। সত্যই সে পরিবারকে হতভাগা বলিতে হইবে যেখানে একটি মাত্র শিশু আছে অথবা যেখানে শুধু ছেলের দল বা শুধু মেয়ের দলই আছে। পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে স্বাস্থ্যপ্রদ বান্ধবতা গড়িয়া উঠে, সম্মিলিত শিক্ষারও লক্ষ্য তাহাই।

ভারতের পক্ষে হঠাৎ এই পথ অবলম্বন করা হয়ত ঠিক না-ও হইতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত আবেষ্টনীতে যদি তরুণতরুণীরা আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মিশিতে পারে, তবে ভারতীয় জীবনে যে একটা অভাব থাকিয়া যায় তাহা পূরণ হইবে। এজন্য এবিষয়ে দৃষ্টি দিতে হইবে। উপরন্তু দেখা যাইবে, পরস্পরকে এই একত্র অধ্যয়ন ব্যবস্থাই সুফল দিবে এবং উহাই বিবেচনার কাজ হইবে। বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থার কোন ত্রুটি থাকিলেও অকস্মাৎ প্রচলনই উহার কারণ মাত্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ভারতের অনেক গৃহেই আমি দেখিয়াছি যেখানে এই অবাধ সংমিশ্রণ আছে সেখানেই একটা আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে। আমার বিশ্বাস স্কুলে, কলেজে এবং সাধারণ জীবনযাত্রায় ইহা প্রচলিত হইলে ভারতীয় জীবন পরম মাধুর্য্যপূর্ণ হইবে।"

আমরা গত মাসেও লিখিয়াছিলাম, এবারও পুনরায় লিখিতেছি এবং বাংলাদেশের ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি, তাহারা মেয়েদের জন্য স্ব স্ব স্কুলে পাঠের ব্যবস্থা যেন অবিলম্বে করেন। বিশেষভাবে গ্রামের স্কুলগুলির জন্যই আমাদের এই বিশেষ আবেদন। ঘরে ঘরে শিক্ষাহীন মেয়েদের জীবনগুলি পঙ্গু ও ব্যর্থ করিয়া সমাজ-দেহই দুর্ব্বল ও দুর্ব্বহ করিয়া তোলা হয় মাত্র। দরিদ্র বুভুক্ষু শিক্ষাহীনদের ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা এদেশে নাই। শিক্ষা আমাদের দিতেই হইবে এবং তাহা অল্প ব্যয়েও হওয়া চাই। এই অবস্থায় গ্রামের স্কুলগুলি মেয়েদের জন্য অবারিত করিয়া না দিলে উপায় কোথায়? শিক্ষার আলোক-রশ্মি যেদিন জীবনে জীবনে প্রতিফলিত হইবে সেদিন কোথায় যাইবে, তথাকথিত কলুষ-কালিমা, কোথায় দূর হইয়া যাইবে অজ্ঞতার সূচীভেদী অন্ধকার! বাংলার ঘরে ঘরে এই আলোক বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিতে দেশের স্কুলগুলি কি অগ্রণী হইবে না?

ইণ্ডো-আইরিশ সংঘ

আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডাবলিনের ম্যানসন হাউসে ভারত ও আয়র্লণ্ড সংঘের প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। উহার সভাপতি হইয়াছিলেন ডবলিনের ভূতপূর্ব্ব লর্ড মেয়র। সভায় এক একজিকিউটিভ কমিটি নিযুক্ত হয়; তাহার সভানেত্রী হইয়াছেন শ্রীমতী ম্যাক ব্রাইড, সেক্রেটারী হইয়াছেন রাই, কে, মাল্লিক। শ্রীমতী ম্যাকব্রাইড মিঃ ভি, জে, প্যাটেলকে জানাইয়াছেন যে উক্ত সংঘ স্থাপিত হইয়াছে এবং ছয় মাসের খরচ ভারতবর্ষ দিলে ভবিষ্যতে সংঘ নিজের ব্যয় নিজেই করিতে পারিবে।

সিগারেট আমদানী

গত বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলনের ফলে কিছুদিন সিগারেটের আমদানী কমিয়াছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। কেবলমাত্র বিলাতী বর্জ্জনের কথা স্মরণ করিয়া অনেকেই আবার বিদেশী সিগারেট এবং সেই

ইতিমধ্যেই ডি-ভ্যালেরা ইংলণ্ডের পণ্যের উপর শুল্ক বাড়াইবার বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংলণ্ডও ইহার প্রতিশোধ লইবে, অটোয়া চুক্তির কোন সুবিধাই সে ফ্রীষ্টেট্‌কে দিবে না। তবে সাম্রাজ্যের সকল দেশের সহিতই আয়র্লণ্ডের বিরোধ হইবে না, অটোয়ায় তাহার সহিত কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষ চুক্তি হইয়াছে।

এই বৈঠকের ব্যর্থতা সম্পর্কে ডি-ভ্যালেরা বলেন—"সম্ভবতঃ যদি আমরা তাহাদের নিকট ভিক্ষুকের বেশে যাইতাম এবং মাথা হইতে টুপী খুলিয়া লইয়া অবনত শিরে দাক্ষিণ্য ও কারুণ্যের জন্য প্রার্থনা করিতাম তবে হয়তো কিছু মিলিত। কিন্তু সামান্য একটা ন্যায়-বিচারের কার্য্য করিতেও তাহারা রাজী নহেন।

····· যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ফ্রীষ্টেটের প্রতি সাইলক মনোবৃত্তি এবং ইউরোপের প্রতি পরম দানশীলতার পরিচয় দিতেছেন, সেই গবর্ণমেণ্টই আবার আমেরিকার নিকট ঋণ মকুবের জন্য আবেদন করিতেছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে, যদি জগতের আর্থিক উন্নতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের পরস্পরের মধ্যে যে বিপুল ঋণভার রহিয়াছে তাহা মকুব করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস পরিণামে আমরা এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইব।" ডি ভ্যালেরার এই উক্তি বৃটিশের মানসিক দৈন্য ও সঙ্কীর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহার ন্যায়নিষ্ঠাকে বিশ্বের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাই মনে হয়, আজ ভারতের স্বায়ত্ব শাসনের ভবিষ্যৎ রূপ কল্পনা করা কঠিন হইবে না।

আমেরিকার আর্থিক অবস্থা

ঐশ্বর্য্য বিলাসে যে আমেরিকা উচ্ছ্বসিত আবার তাহারই ব্যাঙ্ক ফেলের তালিকাও ভয়াবহ। গত সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোট ষাটটী ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। অর্থাৎ গড় করিয়া দেখিতে গেলে দিনে প্রায় দুইটি করিয়া ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হইয়াছে। এক একটি ব্যাঙ্কের সহিত শত শত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ের উত্থান-পতন অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। শুধু সেপ্টেম্বর মাসে নহে, কয়েক মাস ধরিয়াই ব্যাঙ্ক ফেলের এইরূপ ধূম পড়িয়াছে, তথাপি হাহাকার প্রবল হইয়া উঠে নাই। একটি ব্যাঙ্ক নষ্ট হইলে ভারতবর্ষে চারি দিক হইতে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হয়, আর ষাটটি ব্যাঙ্কের কারবার বন্ধ করিয়াও আমেরিকা বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী। ধনী ও দরিদ্র দেশের ইহাই প্রভেদ।

বিশ্বসভায় ভারতের দাবী

ভারত সমস্যা আলোচনার জন্য গত ৬ই অক্টোবর জেনেভাতে এক আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনী হইয়াছিল। ইহাতে ইউরোপ ও আমেরিকার ১৫টি দেশের ২৫টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা যোগদান করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই পৃথিবীতে আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী ও শান্তিস্থাপন।

সম্মেলনীর সভাপতি হইয়াছিলেন ডাঃ এড্‌ভাত প্রিভাট। তিনি এবার মহাত্মা গান্ধীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্দেশ্যের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এই সম্মেলনীতে তিনি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী মিটাইবার প্রয়োজন বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

সম্মেলনীর পক্ষ হইতে ভারত ও বৃটেনে সন্ধিস্থাপনার্থ মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি, অর্ডিনান্স সমূহের প্রত্যাহার, রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি এবং আগামী গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের যোগদান করিতে দেওয়ার কথা তারযোগে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট জানান হয়। এই সম্মেলনীর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের ত্রয়োদশ অধিবেশনের প্রতিনিধিদের নিকট এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দান করিয়াছেন যে—ভারত গবর্ণমেণ্টের

দমননীতির ফলে মহাত্মা কারারুদ্ধ ও বহু কংগ্রেসকর্ম্মী বন্দী এবং দুর্ব্যবহার জর্জ্জরিত এবং ইহার ফলেই ভারত ও বৃটেনে বর্ত্তমান সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

ভারত ও বৃটেন উভয়ই বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সদস্য। ভারতের এই অবস্থার প্রতি প্রত্যেক সংঘেরই আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য যখন আন্তর্জ্জাতিক শান্তিস্থাপন তখন ভারতের এই অশান্তি ইহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে।

আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনী ও তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ভারত সমস্যা আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি—সমস্ত সভ্য জগতই ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এতদিন ইংরেজেরা ভারতের প্রকৃত অবস্থা জগতে প্রকাশ করিতে চায় নাই, কিন্তু এখন আর চাপা দিবার উপায় নাই। সত্যকে অন্তরালে রাখিবার আর উপায় রহিল না। ভারতের পূর্ণস্বাধীনতার দাবী সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় একথা সভ্য জগত বুঝিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের উদ্দেশ্য কোন রূপেই সফল হইতে পারে না।

এই আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনীর একটি বিষয়ে আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছি। ভারত-সমস্যা এখন বিশ্ব সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল মাত্র ভারত-সমস্যা মিটাইবার জন্যই আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি বহুদেশে সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। আমরাও তাই চাই, সমস্ত বিশ্ব ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানুক এবং পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর সার্থকতা উপলব্ধি করুক। আমরাও চাই, ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সফল করুক।

জয়শ্রী

শ্রীরেণুপ্রভা দেবী

জয়শ্রী, তোমারই শ্রী উঠুক ফুটিয়া
যুগে যুগে শতরূপে নূতন করিয়া।
ব্যথিত হিয়ার গান
উৎসব হাসি তান
একে একে বরি' লহ পরাণ ভরিয়া।
কে ওই দেখায় পথ প্রদীপ ধরিয়া?

বাধাহীন চলি'. যাও দীর্ঘ পথ বাহি'
কাহার আশায় মিছে রবে পিছে চাহি'
বিজয় পতাকাখানি
উচ্চশির রবে জানি,
দুলিবে প্রলয় দোলে তবু ভয় নাহি,
নব-যুগ-গীতি যেও একমনে গাহি'।

দেবতার আশির্ব্বাণী ভালে তব লিখা,
পরালো যতনে সবে গৌরবের টীকা,
অন্তরের গুপ্ত ধন
হোক্ তারি জাগরণ,
জ্বলুক উজল হয়ে জ্ঞান-দীপ-শিখা;
অমলিন হ'য়ে থাক্ বিজয়-মালিকা।

জয় হোক্ জ্ঞানী, গুণী, মনীষীর গাথা,
নব নবীনের গানে ভরি লহ পাতা,
তাহারি রাগিণী খানি,
অমৃত অভয় বাণী
শুনাইও ঘরে ঘরে উচ্চে তুলি মাথা।
জয়শ্রী-মহিমা ধন্য হউক বিধাতা!

রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল-প্রতিষ্ঠান

(ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়)

আমাদের দেশে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর সংখ্যা যে কি ভয়ানক তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। এক বাংলা দেশেই, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুরাক্ষসীর করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। এই ভীষণ মাতৃ ও শিশুমৃত্যু যে অনিবার্য্য তাহা নহে--বরং ইহা অনেকাংশে নিবারণীয়। পাশ্চাত্য দেশেও মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার একদিন আমাদের দেশের মতই ভীষণ ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গর্ভিণী ও শিশুর যথাবিধি যত্ন লওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় ঐ সকল দেশে ঐ মৃত্যুহার খুবই কমিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশেও এমন একদিন ছিল, যখন ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ গর্ভিণীদের প্রসব-ব্যথা উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোনরূপ যত্ন লওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করিতেন না। কিন্তু সেদিন বহুকাল হইল অতীত হইয়াছে। এখন তাঁহারা গর্ভিণীর গর্ভসঞ্চারের সময় হইতেই মাসের পর মাস নিয়মিতরূপে তাঁহার তত্ত্বাবধান আরম্ভ করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা জানেন যে, এইরূপ সতর্কতা দ্বারা গর্ভিণীর প্রসবকালীন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার এবং নবজাত শিশুর তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক প্রথম বৎসরটা ভালয় ভালয় কাটাইয়া উঠিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট বাড়িয়া যায়।

যদিও প্রসবকালে বা প্রসবের পর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এমন অনেক অবস্থা ঘটে যাহার ফলে প্রসূতি চিররুগ্ন হইয়া যান অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি বিশেষজ্ঞগণ খুবই জানেন যে, এই সকল অবস্থার সূত্রপাত হইয়া থাকে সাধারণতঃ গর্ভাবস্থায়। যদি কোন উপায়ে উহার প্রতিষেধ করা যায়, তাহা হইলে প্রসূতির যে সকল ভয়াবহ উপসর্গ বা সঙ্কটাবস্থা সাধারণতঃ উপস্থিত হয়, তাহাদের হাত হইতে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়।

এই সকল সঙ্কটাবস্থার প্রতিষেধ করিতে হইলে গর্ভধারণের সময় হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত গর্ভিণীর বিজ্ঞানসম্মতভাবে যত্ন লওয়া উচিত। ইহাকেই বলে গর্ভাবস্থার তত্ত্বাবধান। ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) শিক্ষাদান, (২) পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ।

শিক্ষাদান—(ক) গর্ভিণীকে নিজের ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার মূলসূত্রগুলি যুক্তিসহকারে বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাঁহাকে ঐগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করা।

(খ) তাহাকে গর্ভাবস্থার স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনগুলি ও অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি যুক্তিসহকারে বুঝাইয়া দেওয়া, যাহাতে তিনি স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনগুলিতে চিন্তান্বিত না হন, এবং অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি দেখা দেওয়া মাত্র, উহাদিগকে ধরিয়া ফেলিয়া ডাক্তারকে জানাইতে পারেন।

পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ—দুইটী বিশেষ কারণে গর্ভিণীকে নিয়মিত পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করা দরকার। প্রথম জানা দরকার, গর্ভিণীর শরীরের গঠন ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থা এরূপ কিনা যে সহজ স্বাভাবিক প্রসব হইবার সম্ভাবনাই অধিক, অথবা যন্ত্রপাতির সাহায্যে ডাক্তারের দ্বারা প্রসব করাইতে

হইবে। এইটী জানা বিশেষ দরকার। কারণ, পূর্ব্ব হইতেই অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করা থাকিলে প্রসূতি ও শিশু উভয়েরই জীবনরক্ষা হইতে পারে—অন্যথায় উভয়েরই অমানুষিক যন্ত্রণা ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয়তঃ জানা দরকার—মাতার রক্ত সারশূন্য ও দূষিত হইয়া যাইতেছে কিনা। গর্ভস্থ শিশু মাতার রক্ত হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং ঐ রক্তে তাহার শরীরের দূষিত পদার্থ পরিত্যাগ করে। ফলে মাতার রক্ত সহজেই তরল ও দূষিত হইয়া যায়, যদি না মাতা উপযুক্ত আহার, বিশ্রাম এবং বিশেষ করিয়া শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গমনের উপায়গুলি ঠিক রাখিয়া উহা সতেজ ও বিশুদ্ধ রাখেন। গর্ভাবস্থায় যে নানারূপ উপসর্গ হয় তাহার প্রধান কারণ ইহাই।

মাতার রক্ত সতেজ ও বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে এবং অস্বাভাবিক বিপজ্জনক উপসর্গগুলির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, এই সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ মত চলা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই এবং এই পরামর্শ দিতে হইলে ডাক্তারকে নিয়মিত মূত্র ও রক্ত পরীক্ষা, ওজন নেওয়া প্রভৃতি কয়েকটী আবশ্যকীয় পরীক্ষা করিতে হইবে। ছয় মাস পর্য্যন্ত মাসে একবার, ৭ম ও ৮ম মাসে দুইবার এবং ৯ম মাসে প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে এই পরীক্ষাগুলি করা বিশেষ দরকার। এই পরীক্ষাগুলিতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। কেবল একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যে যে দিন ডাক্তার বলিয়া দিবেন, সেই সেই দিন ঘণ্টা খানেকের জন্য গর্ভিণীকে ডাক্তারের নিকট আসিতে হইবে মাত্র। এই পরীক্ষাগুলি বাড়ীতে করা বিশেষ অসুবিধাজনক এবং ব্যয়সাধ্য। সেইজন্য ডাক্তারের নিকট না আসিলে গর্ভিণীর, বিশেষ করিয়া গর্ভস্থ শিশুর সমূহ ক্ষতি।

উপরোক্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে গর্ভিণীর তত্ত্বাবধান করা, শিক্ষিতা ধাত্রী দ্বারা প্রসবকালীন সাহায্য ও সেবা করা এবং অন্ততঃ এক বৎসর পর্য্যন্ত নবজাত শিশুর পর্য্যবেক্ষণ করা—এই তিন উপায়ে আমাদের দেশে অজ্ঞতার দরুণ যে মাতৃ ও শিশুবলি হইতেছে তাহা কথঞ্চিৎ রোধ করারূপ মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া রামকৃষ্ণ মিশন ভবানীপুরে, ১০৪নং বকুলবাগান রোডে, একটি "শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান" খুলিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানটী সবেমাত্র খোলা হইয়াছে, এখনও উহার সাধারণের জন্য উৎসর্গ করা হয় নাই—৺পূজার ছুটীর পর হইবে। তাই অনেকেই হয়ত উহার কথা এখনও জানে না। তাছাড়া প্রতিষ্ঠান মুখ্যতঃ যে কার্য্যের প্রবর্ত্তন করিতেছেন, উহা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া সর্ব্বসাধারণকে ঐ কাজের প্রয়োজনীয়তাও জানান বিশেষ দরকার। রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আমার উপরই এই কাজের ভার দিয়াছেন।

আমি আপনাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, এই নূতন প্রতিষ্ঠানটী রামকৃষ্ণ মিশন এক মহৎ উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ দেশসেবার ভাব লইয়া আরম্ভ করিতেছেন। মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় যে নাই তাহা নহে। কিন্তু বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গর্ভবতী মাতা ও শিশুদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও শিক্ষাদান করা এই প্রথম—অন্ততঃ কোন দেশীয় প্রতিষ্ঠানই উহা এ পর্য্যন্ত করেন নাই। অথচ এই কাজটীই মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রচেষ্টার ভিত্তিস্বরূপ। তাই এই প্রতিষ্ঠানটিকে এই কার্য্যের অগ্রণী বলা যাইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান হইতে **জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে যতদূর সম্ভব বিনা খরচায়** সর্ব্বসাধারণের সেবা করা হইবে। প্রতিষ্ঠানটী রামকৃষ্ণ মিশনের একটী শাখাকেন্দ্র হইলেও ইহার পরিচালনার ভার স্থানীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর ন্যস্ত আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর নাম লইয়া যখন আমরা "চিত্তরঞ্জন সেবাসদন" আরম্ভ করি তখন অনেকেই মনে করিয়াছেন, ওসব কাজের দেশে তেমন আদর হইবে না—হাঁসপাতালে কেহ যাইবে না। কিন্তু এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেবাসদন যে কিরূপ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই নূতন "রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানটী"ও অল্পকালের মধ্যেই ঐরূপ জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে এবং কালে ইহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আরও অনেক ঐরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে।

আমি এই নূতন প্রতিষ্ঠানটীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিতেছি এবং আমার অন্যান্য কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদন করিয়া এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার দ্বারা ইহার যতটুকু সেবা করা সম্ভব তাহা করিতে পারিলে নিজকে ধন্য জ্ঞান করিব। বর্ত্তমানে আমি ও ইডেন হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জ্জন ডাক্তার শ্রীমান্ মনীন্দ্রনাথ সরকার এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যের নিয়মিত তত্ত্বাবধান করিতেছি। এতদ্ব্যতীত একজন অভিজ্ঞা বাঙ্গালী লেডী ডাক্তার, জনৈকা সেবাব্রতধারিণী পাশ্চাত্য নার্স, ও দুইজন শিক্ষিতা ধাত্রী হাতে কলমে এই কাজটী করিতেছেন। প্রতিষ্ঠানের নিজের একটী ছোট "পরীক্ষাগার' আছে। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার উহার পরীক্ষকরূপে নিযুক্ত আছেন।

প্রতিষ্ঠানটীর কথা পল্লীস্থ সকলকে জানাইবার জন্য স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাদের লইয়া একটি সেবিকা সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা এবং প্রতিষ্ঠানের লেডী ডাক্তার, নার্স বা ধাত্রীরা দু-একজন করিয়া মধ্যে মধ্যে গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী যাইবেন। গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীরা তাঁহাদের এই কার্য্যে সহায়তা করিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। বলা বাহুল্য যে, ইহারা তাঁহাদেরই কল্যাণের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী যাইতেছেন।

আমরা এই বিজ্ঞপ্তি-পুস্তিকাখানি আলোচনার জন্য পাইয়াছিলাম। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব ও অভিনবত্ব উপলব্ধি করিয়া উহা আমরা সম্পূর্ণই মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য এই অতি-প্রয়োজনীয় অথচ এযাবৎ একান্ত অবজ্ঞাত বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শিশু ও মাতৃ-মঙ্গল সম্পর্কে জয়শ্রীতে কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্কল্প আমাদের অনেক দিন থেকেই আছে। মহিলা ডাক্তারদের দৃষ্টি আমরা এবিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। জার্ম্মান-প্রবাসী ডাঃ শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী বসুর একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

তেপান্তরের মাঠ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

শৈলর একতালার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে নীচে চাইলে দেখা যায় শুধু গলির একটুখানি টুক্‌রো, আর ওপরে চাইলে দেখা যায় এক ফালি নীল মেঘ বা কুয়াসা কি নক্ষত্র ভরা আকাশ, তেপান্তরের মাঠও নয় মাঠের ওপর রাজপুত্রের ঘোড়াও নয় দিগন্তরের দৃশ্যও নয়। কিন্তু চোখ বুজ্‌লেই একটা তেপান্তরের মাঠ আকাশ বাতাস গলি পথ ভরে জেগে ওঠে।

কিন্তু সে মাঠে রাজপুত্রের স্বপ্ন সে কোনোদিন দেখে না, কেননা সে রাজপুত্রের গল্পই শোনেনি ভাল ক'রে' কখনো। বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে। যাকে নিয়ে বাড়ীশুদ্ধ সকলের প্রকাশ্য এবং জননীরও স্বগত ধিক্কারের অবধি ছিলনা, যদি ছেলে হ'ত! ছেলে হ'লে কি হত? তা অবশ্য জানা নেই, কিন্তু বিয়ে দিতে তো হত না। না, শৈল বিধবা নয় চিরকালকার গল্পের প্লটের বিধবার মতন, শৈলর বিয়ে হয়নি। বয়স এবং রূপ? বয়স একটা বিয়ের বয়সের সীমায়ই ছিল—ষোল থেকে চব্বিশ পর্য্যন্ত হতে পারে, যাই হোক। রূপ? রূপ শতকরা পনর জন মেয়ের যেমন চেহারা হয় তেমনি ছিল। অর্থাৎ বাংলার 'পাঁচ'ও নয় আবার অলোকসামান্য অপরূপও নয়! ঘস্‌লে মাজ্‌লে যাকে রূপ বলা চলে, আর না হলে একরকম থাকে। শৈল বিয়ের কথা ভাবতে শেখেনি, কেননা সে জান্‌ত, (সেটা সে শুনে শুনে বুঝেছিল), আর পাঁচটা ব্যবহার্য্য জিনিষের মত স্বামী সংগ্রহ করতেও খরচা লাগে। জিনিষটা একটু বেশী দামীও। পয়সা না থাকার আর পাঁচটা বিলাসের মতন স্বামীর বা বিয়ের বিলাসের ধ্যান শৈল করেনি। অন্ততঃ প্রকাশ্যে করেনি।

সবাই হয়ত ভাব্‌বেন, ওর কি তাহলে কেউ ছিল না? ছিল নাই তো। শাস্ত্রোল্লিখিত রক্ষণাবেক্ষণ করবার অধিকারী তিন জনের মধ্যে পিতা তো শৈশবে গত হয়েছিলেন, পতির কথাতো বলছিলামই—হ'ন নি, আর পুত্রের কথা তো উঠেই না। আর মাও বাল্যেই অর্থাৎ দশ বছরের মেয়েকে রেখেই গত হ'য়েছিলেন। শাস্ত্র আর কোনো অভিভাবকের কথা উল্লেখ করেন নি। কিন্তু শ্লোকের শেষের লাইন অনুসারে জ্যাঠতুত ভাইয়ের সংসারে ছিল। নিয়ম করে দুবেলা খেত, বছরে ছ'খানা কাপড়, আর ছ'টা গামছা নয় চারটে সেমিজ পেত। সকালের রান্না সেরে বেলা দুটায় এসে ঘরের কোনটীতে শুয়ে আকাশের পানে চাইত, আর আবার পাঁচটায় আগুণ পড়্‌লে রান্না ঘরে ঢুকে রাত্তির পৌনে এগারটায় ছাড়া পেত।

বাড়ীর কর্ত্রী ছিলেন বিধবা দিদি। তিনি ওর মায়ের চেয়েও বয়সে বড় ছিলেন। আর তিনজন বোন আর কটী ভাজ। তারা কেউ ওর চেয়ে ছোট কেউ বা বড় এমনি। সেজবৌ, বড়বৌ, তাদের সব ছেলে মেয়ে, কারুর তিনটী, দুইটী, চারটী। জ্যাঠতুতো ভাই ছ'জন। ছোট যারা শৈলদি'ই বলে, অমান্য তারা প্রকাশ্যে কেউ করে না।

কিন্তু শৈল একদিন দিদিকে কাকে বলতে শুনেছিল—সে বুঝি জিজ্ঞেস করে ও মেয়েটী কে?

দিদি বলেন, 'ও? ও এই একজন'—বলে একটা মুখ ভঙ্গি কর্‌লেন।

সে বল্লে 'আহা বিধবা?'

দিদি বল্লেন—'মূলে মা রাঁধেনি তার আবার পান্তা! জ্বালাস্‌নে—সাত কূলে কেউ নেই, ধিঙ্গী হাতি তার আবার বিয়ে হবে! তবে না বিধবা!'

বিধবা হলে একটা সুবিধা ছিল—কৈফিয়ৎ দেবার বিড়ম্বনা থাক্‌ত না, উপরন্তু আশ্রয়-দাতৃত্বের উদারতার মর্য্যাদাও লাভ কর্‌তেন। প্রশ্নকর্ত্রী প্রসঙ্গান্তর চর্চ্চায় মনোনিবেশ করলেন। শৈল রান্না ঘরে ব'সে খুন্তি দিয়ে উনুনের অনেকখানি অনাবশ্যক মাটী চেঁচে দিতে লাগল। ও কথাতে অভিমান দুঃখ করবার মতন ভরসাও ওর নেই; ভাব্‌বার কথা কইবারও ওর কেউ নেই। মাটীগুলো ঝরে ঝরে উনুনটা বেশ সুশ্রী হয়ে উঠ্‌তে লাগল। শৈল খানিকক্ষণের জন্যে সেইটাই যেন করছিল, এম্‌নি মনে হল দিদির কথাটা যেন অবান্তর।

গল্পের বইয়ে পড়া যায় যে কত শত যুবক মহাপ্রাণ সদয় তরুণরা ঐ রকম অনাথাকে একেবারে উদ্ধার করে সমাদরে বরণ করে নিয়ে যায়। তা যায় হয়ত—কিন্তু শৈলর জ্যাঠতুতো ভাইদের শালারা, বন্ধুরা ভাইফোঁটায় এসে, কতরকম খাবার,—এমনি বেড়াতে এসে ডিমের সিঙ্গাড়া, মাছের কচুরী, কত কি বিশিস্ট নোন্তামিষ্টি ওর তৈরীই খেয়ে যায়; খেয়ে বোনের, ননদের, বোনেদের জয় জয়কার করে। শৈলর আঁচলখানি রান্নাঘর থেকে দেখা যায়—শৈলকেও; কিন্তু এতো আর গল্পের বই নয়।

শৈলও শুধু ভয়ে ভয়ে ভাবে, যদি নুন বেশী হয় কচুরীতে বা কম হয় তো কি হবে? যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। হ'ল, হলই বেশী। কিন্তু ও কেবলি ওই রকমই ভাবে।

কিন্তু ওরা খেয়ে বলে, 'বাঃ চমৎকার দিদি! কে করেছে, আপনি? নয়ত 'তুমি?'

কথার উত্তর না দিয়ে দিদি এবং বোনেরা সহাস্যে বলেন, 'নেনা আর দুটো? কিবা খেলি? বাড়ী গিয়ে না হয় আজ খাস্‌নি'।

সেদিন না হয় ওঁরা করেননি, কিন্তু শৈল শিখ্‌ল কার কাছে? শৈল জান্‌ত কি? আজকে ও করেছে বটে কিন্তু শেখা? সেটাতো মান্‌তে হবে! সে হিসেবে ধরতে গেলে ওঁদেরই করা।

শৈল 'চমৎকার' শোনে, ভাবে, বল্লেন বুঝি শৈল করেছে। কিন্তু কিছুই আর শোনা যায় না।

তাহোক, রান্না ভাল হয়েছে তো? তাহলেই হোলো। ওর চেয়ে বেশী আশা শৈলর মনেই জাগেনা।

দোতলার ওপরে জাঠ্‌তুতো ভাইদের শোবার ঘর, তারা গল্প করে, গান গায়। ওদের ঘরের পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে শৈল রাত্তিরে এক একদিন দোতলায় ওঠে। কিন্তু দোতলার স্বর্গের ধ্যান সে করে না। ওর বুকের বালিকা শৈল এখনো মনকে রূপ-কথা বলে ভোলায়। সেদিন ওর আকাশটা বড় হয়ে যায়। এক-আকাশ তারাশুদ্ধ যেন হাসিতে ভরা কার মুখ ওর পানে চায়। তারা যেন ওকে রূপ-কথা বলে যে রূপ-কথা ও মার কাছে শোনেনি, যা' তিনি শেষ করে বলেননি, যা' কেউ বলেনি কখনো। তাই, আর পারুল বোনটী! ওর যদি ভাই থাক্‌ত! শৈল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে। তেপান্তরের মাঠ কি রকম দেখ্‌তে হয়? শৈল বই বেশী পড়েনি, মানে ও সব কথার মানে জানে না। ভাব্‌তেও খুব গুছিয়ে পারে না, হিংসে কর্‌তে পারে না, রাগ কর্‌তে ভরসা পায় না, কাঁদ্‌তে অভিমান করতেও পারে না, ও শুধু ভয় পায় সবাইকে। কেউ কিছু বল্লে ও শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চায়—তারপর ভুলে যায়। রাস্তা নিঝুম হ'য়ে গেল, পথিকের যাওয়া-আসা ক্রমশঃ কমে এলো, পাশের বাড়ীর বড়ো কর্ত্তা কেবলি কাশেন। পাড়ার বাড়ীর আলো গুলো নিবে আসে, ওর চমক্ ভাঙ্গে, ও আবার তেমনি নেমে আসে।

দোতলার ঘরের কাছে একটু দাঁড়ায়। বৌয়েরা সবিস্ময়ে বলে—'কি শৈল ঠাকুর্ঝি?'

ও বলে 'কিছু না'—নেবে যায়।

ভ্রুকুঞ্চিত করে একজন বৌ বলে, 'এত রাত্তিরে ছাতে ওঠা কেন?'

শৈলর কানে যায়। মার বুঝি দু একটী আগে ছেলে মেয়ে হয়ে মারা যায়, তাই তার নাম রেখেছিলেন 'সইল'। তা' সইল। 'সইলো' ভাষাতত্ত্ব মতে শৈল বানানে নাম হয়ে উঠ্‌ল। তখন ছিল 'সইল' এখন হ'ল শিলা থেকে। পেছনে এলো উপসর্গ 'বালা'। এ শৈল কিন্তু শিলার নয়—যেন পাথর নয় আর কিছু, যেন শৈবালের মত। যেন গৌরী, না গিরিবালা। তবে শিলার মত সহিষ্ণু বটে।

সকালে উঠ্‌তে বেলা হল সেদিন। কে বৌ বল্লে, 'অত রাত অবধি জেগে থাক ঠাকুর্ঝি তাই বেলা হয়।' যেন রোজই বেলা হয়।

শৈল অপ্রস্তুত মুখে বল্লে 'আজ বড় বেলা হয়ে গেছে। দিদি, একটু তেল দেবেন?' স্বল্প-কুন্তলা সেজদিদি তেল মাখাচ্ছিলেন ভাজের চুলে। শৈলর আতেলা রুক্ষ মাথাটাতে এত চুল কি করে যে থাকে!

ভ্রুকুঞ্চিত করে বল্লেন—'একে তো উঠ্‌তে বেলা করেছ, তার পর ঐ কাঁড়ি চুলে তেল দেবে—তবে নাইবে, রান্না ঘরে ঢুকবে?'

শৈল অপ্রতিভ মুখে ফির্‌তেও পারলে না, দাঁড়াতেও না—দিদি যদি বলেন অত তেজ কিসের? বিরক্তিভরে বল্লেন, 'নাও—একটু নিয়ে যাও।'

হাত পেতে তেল নিয়ে সে কলতলায় গেল। বিধবাদের চুল কাটতে আছে সে দেখেছে, কিন্তু ওদের কি কাটতে আছে? কিন্তু অত ভাবনার সময় আছে? দুটো উনুন জ্বলে খাই খাই করছে। চুলোয় যাক্ চুল আর নাওয়া।

বেলার আর বাকি নেই। দুটো বাজ্‌ল। খেতে বসে দিদির খুব গল্প করা অভ্যাস। সেদিন হচ্ছিল অল্পদিন আগের পুষ্কর-দর্পণ বৃত্তান্ত। 'বাপরে, সে কি দুষ্কর পথ! তোমরা কেউ পারতে না হাঁটতে বড়বৌ। আর কি কুমীরের ছিষ্টি সেই হ্রদটায়।'

বড় বৌ বল্লেন, 'দিদি তুমি নেবেছিলে নাইতে? ভয় করল না?'

মেজ বৌ বল্লে, 'মাছের ঝোলটা আজ বেশ হয়েছে। নিরামিষ দিক থেকে দিদি বল্লেন, 'আর একটু করে দাও না শৈল।'

শৈল মাছের কাঁসি খানা নিয়ে এল।

বড় বৌ বল্লেন 'কই দেখি? একখানা নেজা আর কানকো দুখানা?'

'আচ্ছা, নেজা খানা সেজো বৌকে দাও আর কানকো একখানা আমাকে দাও—এবার তুমি বোসো গে আর আমরা কিছু নোবো না।' পুষ্কর, প্রয়াগ, বৃন্দাবনের গল্প চল্‌তে লাগ্‌ল। বেলা আর নেই, শীতের আগেই যেন শীতের বেলা দৌড়ে চলে।

শৈল ছয় আনা দামের দিদির পুরোনো মাদুর খানা উত্তরাধিকার সূত্রে নয়—দয়াসূত্রে লাভ করে ছিল, সেই খানা পেতে শুয়ে পড়ে। শুধু কি ভাবে যেন।

গলির মাথায় নীল আকাশ টুকু দেখা যায়। সাদা সাদা মেঘ হাল্‌কা ভাবে তুলোর মতন পড়ে আছে তার ওপর। ওরই মত যেন শৈলর ও জীবনের পাতায় সুখ দুঃখ বলে বিশিষ্ট কোনো অধ্যায় নেই। মনের লেখা ইতিহাসের মত দূরে ওর মনে পড়ে—কিছুই বিশেষ মনে পড়ে না। না খেলনা পুতুল, ফিতে কাঁটা, ভাল কাপড় জামা শাড়ী গহনা, কি কোনো তুচ্ছ বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও করে নি, ভাবেও না। শান্তিও নেই, অশান্তিও নেই; ওর অত ভাব্‌বার শক্তিই নেই, জানেই না। শুধু একটা একটা ছাড়া ছাড়া ভাবনা তা নিজেরও সবটা নয়—ভাবে। হয়ত ভাবে দিদিরা কেমন পুষ্কর তীর্থ কর্‌তে গিয়েছিলেন খেতে বসে গল্প কর্‌ছিলেন। কি উঁচু পাহাড়ে উঠ্‌তে হয়। কি বালি নাকি! যেন বালির সমুদ্দুর দিদি বল্‌ছিলেন। ওর নিজের যাবার সাধ?—না দুরাকাঙ্ক্ষা করবারও একটা ক্ষমতা দরকার, ওর ও দিকটা নেই। যে অত ভীরু সে কখন আপনার কথা ভাব্‌বে?—ও ভাবে, সাবিত্রী ঠাকুর ওঁরা দেখে এসেছেন আবার গায়ত্রীও আছেন—সুন্দর নাকি মূর্ত্তিটা। সাবিত্রী নাকি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ঐ উঁচু পাহাড়ে উঠে বসে ছিলেন, আর সেই অবসরে স্বামী ঐ গায়ত্রীকে বিয়ে করে ঘরকন্না কর্‌তে আরম্ভ করেন। ওর একটু হাসি পেল। স্বামীর কথায় ওর বছর তিনেক আগের একটী ঘটনা মনে পড়ে গেল। ওর জ্যাঠ্‌তুতো বোনের বিয়ের সময় সকলে ওঁদের নিন্দে কর্‌তে লাগল, বুঝি তাই ওরও একটী

সম্বন্ধ এসেছিল। একদিন সকালে কারা দুজন দেখ্‌তে এলেন। তাড়াতাড়ি ওকে রান্নাঘর থেকে বের করে মুখে খানিক সাবান স্নো ঘসে মেজ বৌদির একটা সিল্কের শাড়ী আর তারই জামা ঢলঢলে হল; তাই পরিয়ে মেজবৌ কার একটা হার পরাতে চাচ্ছিল, দিদি বল্লেন, না হার দিস্‌নি—তা হলে বিয়ের সময় দিতে হবে। অমনি হাতে ওর মার বালা আছে ওতেই হবে।

বৈঠকখানায় ভাইয়েরা নিয়ে গেলেন। ও প্রথমেই একবার চাইতেই দেখলে, একটি কাঁচা পাকা বেশীর ভাগই পাকা চুলে ভরা মাঝখানে অল্প টাকপড়া মাথা একটা ভদ্র লোককে, আর ও চোখ তুলে চায়নি। ও গিয়ে বসল। সেই ভদ্রলোকটীকে ও ভেবেছিল তিনি শ্বশুর—যাঁকে 'তোমার নামটী কি মা' জিগেস কর্‌লে মানায়, তিনি বল্লেন, নামটী কি?

ও বলে, শ্রীমতী শৈলবালা দেবী। অপর জন জিজ্ঞাসা করলেন, বয়স কত? তা বুঝি দাদারা হক্‌চকিয়ে কি বলবেন ঠিক করতে না পেরে এক সঙ্গেই একজন বল্লেন ষোলো, একজন বল্লেন আঠারো। মোট কথা ওঁরা বড় বয়স চান? তাগলে ঠিক করে বলা যেত।

ভদ্রলোকেরা একটু হাসলেন শৈলর বোধ হল—কিন্তু ওতো মুখ তোলে নি। পরীক্ষা হয়ে:গেল। বোবা নয় নাম বলতে পারে; খোঁড়া নয় চলতে পারে; আর কানাও নয় চোখ দুটী পদ্ম চোখ না হোক, পরিষ্কার দুটী চোখ।

ওঁরা বল্লেন, নিয়ে যান। ও চলে আস্‌তে আস্‌তে শুনলে, দাদারা বল্‌ছেন, ও বোনটী আমাদের খুব কাজ কর্ম্ম পারে—ইত্যাদি। ভেতরে এসে কাপড় চোপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুক্‌ল ভাতের ফেন গাল্‌তে। তারপর সব দাদারা ভেতরে এলেন, দিদি বল্লেন 'কি হল—পছন্দ হল? না, ওরা বল্লে বড় ছোট মনে হচ্ছে। ঐ বুড়ো ভদ্দর লোকটাই বিয়ে কর্‌বেন কিনা—মাস কতক হল স্ত্রী গত হয়েছে চারটী ছেলে তিনটী মেয়ে—সুন্দরী গাঁয়ের স্টেশন মাষ্টার। একটু বেশী বড় চান—আমার কেমন ভুল হ'ল নইলে বয়স তো কুড়ি হল না? তা আবার খবর দেবে। কিছু দিতে পারলে হ'ত। দিদি বল্লেন, ওঃ, তা আর কোথায় পাবি? ভাজেরা বরের কথায় মুখ টিপে হাস্‌লে।

কিন্তু আর তাঁরা খবর দিলেন না এবং বরের বা স্বামীর কথায় নিজের সম্বন্ধে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছাড়া আর কারুরই কথা মনে আসে না, আর মনে হলেই কেমন ওর হাসি পায়, ও ভেবেছিল যে তিনি মা বলে কথা কইবেন। যথাসময়ে বোনদের বিয়ে হয়ে যেতে লাগল, তা যাক্। কিন্তু সাবিত্রী কি বাবু—এত রাগ আর ওঁরই বা কি বিয়ে করা?—শৈলর নীল আকাশটুকু ঝাপ্‌সা হয়ে গেল; চোখের সামনে জেগে ওঠে প্রকাণ্ড দিক্‌-দিগন্তহীন প্রান্তর বাংলা দেশের মাঠের মত সবুজ নয় শ্যামলা নয়-এ মাঠ শৈল কখনো দেখেনি, এই যেন সেই তেপান্তরের মাঠ। অনেক দূরে একদিকে পাহাড়ের সারি বেঁটে বেঁটে বাবলা গাছ এখানে ওখানে, আর শুধু পুরীর বালির মত ধূধূ করা বালি। যেদিকে তাকায় সুমুখে পাহাড়ের ওপারে সাদা কি দেখা যায় যেন বাড়ীর মতন, সমতলে পেছনে দূরে মেটে ঘর। কোন্ দিকে যাবে শৈল ভাবে। কিসের জন্যে তা ও জানেনা,

শুধু ভাবে আগে ঐ মন্দিরের দিকে যাবে—না কোথায় যাবে কোন পথে এলো তাও বোঝা যায় না। পাহাড়ে প্রান্তরে আকাশে আর অমিল নেই—সমস্ত শূন্য ভরে তারা ওরই পানে চেয়ে আছে শুধু—

'ও দিদিমণি, আকা যে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল, কত ঘুমতে লেগেছে গো দিনের বেলায়—' পরিষ্কার কাংস্যকণ্ঠে ঝির আহ্বান কাণে এল।

শৈল ধড়মড়িয়ে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বস্‌ল। দিদির গলা শোনা গেল 'সকালে তিনমণ কয়লা পুড়বে সন্ধেয় দুমণ পুড়বে তবে ঘুম ভাঙবে, অমনি? শৈলির দিনেও কি মড়ার ঘুম!'

অপ্রতিভ শৈল কাপড় কাচ্‌তে কলতলায় গেল।

দুধ, বার্লি, সাগু, তারপর ডালের পরে ভাত, তারপর চচ্চড়ি, ডাল্‌না-মাছ, রুটি সকালে ছোটছেলেদের জলখাবারের লুচি খানকতক; বড়দার বস্‌বার ঘড়ের ঘড়িতে একটা একটা করে কতগুলো বেজে যায়। চাকি বেলুন হাঁড়িকুঁড়ি ধোওয়া মোছা হয়। এক এক করে সকলের খাওয়া হয়ে যেতে থাকে। সবাই চলে যায়। ও নিজের ভাতকটী নিয়ে বসে। কেউ জিজ্ঞাসা করেনা, কি আছে না আছে সেও কিছু বলে না। সে বলেও না ভাবেও না—কলটেপা পুতুলের মত কাজ শেষ করে চলে।

রাত্তিরে আবার জানলা দিয়ে নক্ষত্রভরা আকাশ—কোন্ অজানা দেশের রূপকথার পাতা মেলে ধরে ওর চোখের সামনে। ও ভাবে ও পথটা কতখানি চওড়া? ছায়াপথের একটুখানি দেখা যায়। ওর কাছে যেন আকাশ আর পৃথিবী একই—সবই সমান যেন। ওটা যেন আর একটা পৃথিবীর বিস্তৃত প্রাঙ্গন; রাত্রে ওর রোজ দেওয়ালী, সকালে সূর্য্যের আলোর ধারাস্নাত ওর সাজ নেই তাই মেঘের রংয়ের উৎসব। কিন্তু তেপান্তর মাঠটা? কোন্‌দিকে? কিরকম দেখ্‌তে? আচ্ছা, যদি কেউ ওকে নিতে আসতো? রাজপুত্র? না আগেই তো বলেছি ও সেকথা ভাল করে শোনেইনি। তবে? মৃত্যু? না—ওর অভিমান নেই, রাগ নেই কষ্ট নেই, ও শুধু সবাইকে ভয় করে, তাও শান্তভাবে মৃত্যুকেও সে ভাবেনা; মরণের মত অভিমান ওর মনে জাগেই না। তবে কে নিতে আসবে? তাও জানে না। রাত্তিরের আকাশের ঝিক্‌মিক্ হাসিমুখ তার চোখের সামনে ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, ঘুম চোখে শৈল তেপান্তরের মাঠের একখানা ছক্ খুঁজে খুঁজে বেড়ায় যেন সব জায়গায়—যদি পার হতে পারে।
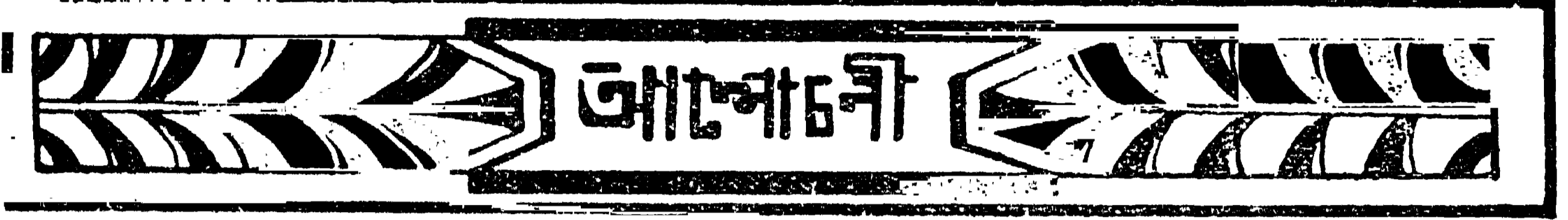
অটোয়া চুক্তির পরিণাম

বিগত জুলাই মাসে কানাডার অটোয়া সহরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের যে বৈঠক বসিয়াছিল সাম্রাজ্যের সকল দেশের অধিবাসীদের আর্থিক উন্নতি ও সুবিধা সম্বন্ধে সহযোগিতায় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে, তাহা এতদিনে শেষ হইয়াছে। বৈঠকে ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডের অধীনস্থ স্বায়ত্ত শাসন-প্রাপ্ত অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া নিজ নিজ দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতেও প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের একটী বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া আসিয়াছেন। এই চুক্তি ভারতের পক্ষে কিরূপ উপযোগী হইবে সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার। এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে ভবিষ্যতে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ হইবে। ভারতের জনমত এই চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী এবং সর্ব্ব-ভারতীয়-বণিক-সমিতি (ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স), একাধিক অর্থনীতিবিদ্ ও বাণিজ্য-নীতিবিদ্ বিশেষজ্ঞেরা নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহা ভারতের স্বার্থের কিরূপ বিরোধী।

কারণ ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্য-চুক্তির প্রধান কথা হইতেছে, সাম্রাজ্যজাত পণ্যকে সুবিধা দানের নীতি। অর্থাৎ ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের অধীনস্থ অন্যান্য দেশ হইতে যে সকল জিনিষ আমদানী হইবে তাহা অধিক মূল্য হইলেও ক্রয় করিবে এবং পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ হইতে যে জিনিষ ইংলণ্ড ও তাহার অধীনস্থ দেশে রপ্তানি হইবে তাহা তাহারাও এই নীতি অনুসারে ক্রয় করিবে। এই ব্যবস্থাটী শুনিতে যেমন কার্য্যতঃ তেমন নয়; কারণ ভারতবর্ষ পরাধীন এবং অন্যের ইঙ্গিতে চলিতে বাধ্য। ভারতবর্ষ বৃটিশের সমান অংশীদার নহে, স্বাধীন দেশ নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলিতে পারে। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের সহিত এক হইয়া কাজ করিতে গেলে নিজের স্বার্থ বলি দিতে হইবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যাহারা ভারতের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন তাহাদের সহানুভূতি হারাইয়া ভারতকে দ্বিগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯৩২ সালে আইন করিয়া বিদেশ হইতে যত মাল ইংলণ্ডে আমদানী হইতেছে তন্মধ্যে কাঁচা মাল ও কয়েকটী জিনিষ ভিন্ন অন্য সবগুলির উপরে শতকরা দশটাকা শুল্ক বসাইয়াছেন। ভারতবর্ষ যদি অটোয়ার বর্ত্তমান চুক্তিতে সম্মতি দেয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও ইংলণ্ডে আমদানী ভারতের নানা শুল্ক হইতে রেহাই পাইবে, অন্যথায় নভেম্বর মাস হইতেই তাহার উপর শুল্ক বসিবে। অধিকন্তু অটোয়া চুক্তি গ্রহণ করিলে ভারতের যে সকল মালের সঙ্গে বিদেশী মাল প্রতিযোগিতা করিতেছে, তাহার উপরে ইংলণ্ড আরও মোটাহারে শুল্ক বসাইবে। অর্থাৎ একই সঙ্গে বিদেশী মালের উপর শুল্ক বৃদ্ধি ও ইংলণ্ডের মালের উপর শুল্ক হ্রাস করা হইবে। ভারতবর্ষ কাঁচা মাল রপ্তানী করে এবং ইংলণ্ড প্রধানতঃ শিল্পদ্রব্যই ভারতের বাজারে রপ্তানী করিয়া থাকে। কাজেই এই রক্ষণ শুল্কের সাহায্যে ইংলণ্ড বিনা বাধায় অধিকাংশ শিল্পদ্রব্য ভারতের বাজারে চালাইবার সুবিধা পাইবে,—কারণ ইহার ফলে বিদেশজাত অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের আমদানী একেবারে কমিয়া যাইবে। অপরদিকে ভারতের কাঁচা মালের অর্দ্ধেকও ক্রয় করিবার প্রয়োজন বা ক্ষমতা ইংলণ্ডের নাই, সে ভারতের মাত্র এক চতুর্থাংশ ক্রয় করিতে সমর্থ। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশের জন্য তাহাকে জগতের অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। তাহাদের সহানুভূতি হারাইলে ঐ সকল জিনিষ বিক্রয় করিতে যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে এবং বিক্রয়ও কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমান অবস্থাতে ভারতের পক্ষে স্বাধীন মতামত দিবার অনুকূল প্রতিষ্ঠান সমূহের সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই করা সম্ভবপর নয় বলিয়া মনে হয়। স্যামুয়েল হোর প্রমুখ বৃটিশ নেতাগণ যদিও ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা হইলেও অটোয়া-চুক্তিতে সাম্রাজ্যবাদীগণের স্বার্থপরতা আরও রূঢ়ভাবে প্রকাশ হইয়াছে মাত্র। ইংলণ্ডে কয়েক হাজার বেকারের সংখ্যা সেখানকার পার্লামেণ্টকে পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য দরিদ্র ভারতকে অধিকতর দারিদ্র্যে পতিত হইতে হইবে। ভারতের শিশু-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকে আরও সম্পূর্ণভাবে আর্থিকক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের কবলে পতিত হইতে হইবে এবং তাহার রাজনীতিক পরাধীনতার ভিত্তি আরও দৃঢ়মূল হইবে।

ভারত-সরকার স্বার্থ বজায় রাখিতে ব্যবস্থা-পরিষদ ইহা যাহাতে গ্রহণ করেন তাহার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বেসরকারী সদস্যগণ দেশের এই সঙ্কটাবস্থায়—এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যাহাতে অটোয়া চুক্তি গ্রহণ করা না হয়, সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন আমরা ইহা আশা করি। কিন্তু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহারা সমগ্র জাতির ইচ্ছাকে দলিত পিষ্ট করিতে কোনদিনই দ্বিধা করে নাই, এ ব্যাপারেও যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে এ আশা সুদূরপরাহত। বিশ্বের দরবারে নিজের

কলঙ্ক-কালিমা মোচনের প্রয়াসে এই জাতি, যাহারা সকল ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য, তাহাদের আহ্বান করিয়া সম্মান দিবার বিড়ম্বনা ভোগ করিবার সত্যই কিছু প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

চট্টগ্রামের জরিমানা

পাহাড়তলী বৈপ্লবিক ঘটনার পর গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, অক্টোবরের পনর তারিখের মধ্যে বিপ্লবীদের কোন সংবাদ প্রদান না করিতে পারিলে চট্টগ্রামের অধিবাসীদের দণ্ড স্বরূপ জরিমানা দিতে হইবে। সেইকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর গবর্ণমেণ্ট চট্টগ্রাম সহর ও তাহার অন্তর্গত সাতটী গ্রামের উপর আশী হাজার টাকা জরিমানা ধার্য্য করিয়া এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। এই অপরাধের জন্য কেবল মাত্র যে হিন্দুরাই দায়ী এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ না পাইলেও, গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া কেবল হিন্দু অধিবাসীদের উপরই সমস্ত জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন এবং ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঐ টাকা আদায় স্থগিত রাখিবেন। এই ইস্তাহারে বলা হইয়াছে "গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে যাহারা দুইবৎসর যাবৎ চট্টগ্রাম সহরে নানা বৈপ্লবিক ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সাধারণের শান্তি ভঙ্গের জন্য দায়ী, চট্টগ্রাম সহরের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের হিন্দু অধিবাসীরা তাহাদের আশ্রয় দান করেন ও সাহায্য করেন।" এ বিষয় যদি তাঁহারা নিঃসন্দেহ তবে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে সকল শক্তি-সামর্থ্য ব্যর্থ হইয়া গেল কেন?

সম্প্রতি চট্টগ্রামের একটী সভায় খাঁ বাহাদুর আব্দুল মমিন, যিনি অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন বলিয়াছেন—"চট্টগ্রামের হিন্দুদের উপর আশী হাজার টাকা জরিমানা ধার্য্য করিয়া অথবা সান্ধ্য আইন জারি করিয়া সরকার যে আন্দোলন দমন করিতে সমর্থ হইবেন এ বিষয় আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাহাদের একহাতে প্রাণঘাতী হলাহল এবং অন্য হাতে রিভলবার তাহাদের কিছুই হইবে না, কেবল কয়েকজনের নিরীহ জনসাধারণকে শাস্তি দেওয়ার ফলে রাজভক্তদের মধ্যেও অশান্তি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে।" শাস্তিদান ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ করায় তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্যহীন ব্যয়ভার প্রপীড়িত নিঃস্ব হিন্দুসমাজের পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করা যে কতদূর কষ্টসাধ্য হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তথাপি যেখানে কর্ত্তব্যপরায়ণ সৈন্য ও অন্যান্য সকল পন্থা ব্যর্থ হইয়াছে, সেখানে ইহাও যে কতদূর কার্য্যকরী হইবে সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রহিয়াছে।

দেশী বস্ত্র সংরক্ষণ

জাতীয় অর্থনীতির দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁতে বোনা বস্ত্রশিল্পের সংরক্ষণ যে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে সে বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের এমনই

রুচির বিকার উপস্থিত হইয়াছে যে, অল্প মূল্যের নানারূপ. রঙীন ও কৃত্রিম রেশমী বস্ত্রই আমাদের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করে,—ফলে বোম্বাই মিল এবং বিদেশী নকল রেশম দ্বারা প্রস্তুত শাড়ী বাঙ্গলার ঘরের শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে দেখিতেছিলাম, কোন সংবাদ-পত্রে এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া বঙ্গমহিলাদের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। পূজার সময় অন্যান্য বারে সাধারণতঃ তাঁতিরা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু এবারে তাহাও হয় নাই। সত্যই এ বিষয় মেয়েদের যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। অল্প মূল্যের বিদেশী বস্ত্র নয়ন-মুগ্ধকর হয় সত্য—কিন্তু একথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে সেইস্থলে তাঁতের কাপড় কিনিলে একটী অন্নহীন ক্ষুধার্ত্ত পরিবারের অন্ন-সংস্থানের কিঞ্চিৎ উপায় করা হয়, এবং সেই সঙ্গে যাহা আমাদের নিজস্ব শিল্প তাহাকে পুনর্জ্জীবিত ও উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করা হয়। গত নিখিল-ভারত প্রদর্শনীতে আচার্য্য রায় তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

'আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে আচার ব্যবহার ও চাল চলনে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি,—পশ্চিমের সভ্যতা পশ্চিমেরই কল্যাণ সাধন করিয়াছে, কিন্তু আমাদের পক্ষে বড়ই নির্ম্মম পরিণামকে আনয়ন করিয়াছে। * * * * ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশমী বস্ত্রের চাহিদা ১৯২২ সাল হইতে ২৬ সালের মধ্যে ২৫ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে ফলে মুর্শিদাবাদ ও মালদহের রেশম শিল্প ধ্বংসপ্রায়। যন্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা শক্তির প্রয়োজন—এমন কি তাহা হয়ত সম্ভবও নয়। কিন্তু এমন অনেক কাপড় আছে যাহা কলে প্রস্তুত হইতে পারে না, দেশী মিল হইতে উপযুক্ত সূতা সরবরাহ করিতে পারিলে সেইসব শাড়ী দেশে উৎপন্ন হইয়া বহু দরিদ্রের অন্ন সংস্থান করিবে—এবং চাহিদা বাড়িলে সেই পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতে থাকিবে। যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে কয়েকজন মাত্র ধনকুবের হইয়া উঠে—শ্রমিক ও বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ব্যাপকভাবে বহু লোকের অন্ন-সংস্থানও তাহাতে হয় না। আমাদের বিশ্বাস, কেবল মাত্র মেয়েরা এ বিষয় একটু চিন্তা করিলে এবং যথাসম্ভব তাঁতের বস্ত্র ক্রয় করিলে অনেকাংশে ইহা সফল হইতে পারিবে। কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিষয়ক একটি প্রসঙ্গ আমরা 'চয়নে' প্রকাশিত করিয়াছিলাম, তাহা দেশবাসীর বিশেষ প্রণিধান যোগ্য মনে করি। সত্যই আজ আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে অনেকখানি চিন্তা-ভাবনা করিয়া চলিবার দিন আসিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী

উপনিবেশ সমূহে ভারতীয়গণের অবস্থা দিনে দিনে আরও সঙ্কটময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রায় সাড়ে আট শত নরনারী শিশু প্রভৃতি নির্ব্বান্ধব নিঃসহায় অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়াছে—প্রয়োজন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে উপনিবেশগুলি হইতে দেশে প্রেরণ করা

হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের বাসস্থান ও আহারের কোন সংস্থান করা প্রয়োজন কেহ মনে করে নাই। সম্প্রতি তাহাদের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট দুইহাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন, ইহার বেশী এক কপর্দ্দকও তাঁহারা আর দিতে অক্ষম। এতোগুলি বেকারের অবস্থা প্রতিকারের ভার কে নিবে, সে বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন তাঁহারা মনে করেন নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট শ্বেতাঙ্গ বেকারদের সাহায্যের জন্য ৫০০,০০০ পাউণ্ড মঞ্জুর করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সাহায্য ভারতবাসীদের দেওয়া হইবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু এই অন্যায়ের কোন প্রতিকার করিতে অক্ষম।

আফ্রিকাতে ভারতীয়গণের অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সূচনা দেখা যাইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কর্ম্মী ভবানী দয়ালের বিবৃতিতে প্রকাশ যে সম্প্রতি যোহানেস্‌বার্গে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, পৃথিবীর ঐ অংশে ভারতীয়গণের অস্তিত্ব লোপ সাধনের উদ্দেশ্যে যে তিনটী বিশেষ আইন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আরম্ভ করা হইবে। তন্মধ্যে প্রথমটী হইল, ট্রান্সভাল এসিয়াবাসী ভূ-স্বত্ব আইন। ইহাদ্বারা ভারতীয়গণকে শুধু তাহাদের জন্য বিশেষ ভাবে পৃথক কৃত অঞ্চল সমূহে বাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে বাধ্য করা হইতেছে। দ্বিতীয়টী ট্রান্সভাল লাইসেন্স অর্ডিনান্স। ইহা দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটী ও লোকাল বোর্ড সমূহকে স্বেচ্ছাচার-মূলক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং তৃতীয়টীতে ১৯৩১ সালের ইমিগ্রেশেন আইনের ধারা যাহা দ্বারা ভারতীয়গণকে ট্রান্সভাল রেজেষ্ট্রেশন আইন অনুসারে প্রাপ্ত অধিকার সমূহ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

এই গুলির প্রতিকার কল্পে উক্ত কংগ্রেস নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই একটী মাত্র পন্থা ছাড়া ভারতবাসীর প্রতিবাদ জানাইবার আর কি সম্বল আছে? অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে যাহারা অভিযান করিয়াছে, দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া তাহারাই যুগে যুগে সত্য ন্যায়সঙ্গত দাবী অর্জ্জন করিয়াছে ইহাও সত্য।

তৃতীয় গোল-টেবিল বৈঠক

ভারতবাসীগন স্বায়ত্ত শাসন লইবার জন্য যদিও বিশেষ ব্যগ্র নয়, কিন্তু বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যগ্র। স্যার সামুয়েল হোর বলিয়াছেন, এবার আমাদের কাজ আমরা নিরিবিলি সম্পন্ন করিব—বাহিরে কোন আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। সমগ্র দেশময় বিক্ষোভ, মহাত্মাকে বাদ দিয়া কংগ্রেস তথা সমগ্র জনমতকে উপেক্ষা করিয়া ভারতের ১২ জন প্রতিনিধি ইংলণ্ডে রওনা হইয়াছেন। এ অধিকার ভারতবাসী তাহাদের

দেয় নাই, তাঁহারা জাতির প্রতিনিধি নহেন, তাঁহারা মুষ্টিমেয় স্বার্থপর আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধি মাত্র। তবু তাঁহাদের ব্যয়ভার দরিদ্র ভারতবাসীকে অনেকাংশেই বহন করিতে হইবে। তিনটী গোলটেবিল বৈঠকের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ১৯৫,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে—তাহার মধ্যে ৭১,০০০ বৃটিশের এবং ১২৭,০০০ টাকা অনশনক্লিষ্ট ভারতবাসীকে জুটাইতে হইয়াছে।

ভিক্ষানীতি কোনদিন কোন জাতিকে উন্নত করে নাই। সবলের অনুগ্রহ প্রার্থনার দান ভারত তাই কোন দিনই গ্রহণ করিবে না। আপন শক্তিতে ক্ষমতায় জাতি তাহা অর্জ্জন করিয়া লইবে—সেই সাধনাই সমগ্র জাতির সাধনা, উহাই তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিবে সত্যবস্তু লাভ করিতে। মিথ্যা ছলনায় ক্ষুদ্র লোভ ও তুচ্ছ লাভের আশায় সে মিথ্যার সহিত আপোষ করিবে এ ধারণা যাহারা করিয়াছে তাহারা ভ্রান্ত। আমরা কোন দিনই এই বৈঠকের সমর্থন করি নাই, বর্ত্তমানেও করিতেছিনা। শক্তি বলে সবকিছু চালান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জাতির সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করা যায় না।

অস্পৃশ্যতা ও মহাত্মা গান্ধি

মহাত্মা গান্ধীকে গভর্ণমেণ্ট যারবেদা জেলের মধ্য হইতেই অস্পৃশ্যতা নিবারণোদ্দেশ্যে চিঠি পত্র লেখা ও দেখা সাক্ষাৎ করার বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি অস্পৃশ্যতার মূলোচ্ছেদ করিবেন সংকল্প করিয়াছেন এবং তজ্জন্য পুনরায় উপবাস আরম্ভ করা প্রয়োজন বোধ হইলে করিবেন, এবং কেবল গুরুভায়ুর মন্দিরের দ্বার হরিজনের জন্য উন্মুক্ত যদি ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে করা না হয় তাহা হইলে শ্রীযুক্ত কেল্লাপ্পান উপবাস আরম্ভ করিবেন তৎসঙ্গে মহাত্মজীও উপবাস আরম্ভ করিবেন জানাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিরলা মালব্যজী জামোরিনের নিকট যাইতেছেন। মহাত্মাজী নিজেও জামোরিনের নিকট তার করিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে নিজেও যাইবেন। মহাত্মাজীর উপবাসের পর হইতে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হইয়াছে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু আন্দোলন হইতেছে, সার্ব্বজনীন কালীপূজা, দুর্গোৎসব জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়া গেল। কিন্তু মন্দিরের বিগ্রহকে আবার পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধি করিয়াও লওয়া হইয়াছে, বহুদিনের অভ্যাস ও সংস্কার হঠাৎ দূর করা কঠিন। সামাজিক কোন নিয়মই আইন করিয়া একদিনে প্রবর্ত্তনও করা যায় না, আবার তেমনি তুলিয়াও দেওয়া যায় না—সময়ে ধীরে ধীরে হয়। (বাংলায় পূর্ব্বে চৈতন্যদেব পরে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে) সমগ্র উত্তর ভারতে চৈতন্য দেব, ব্রাহ্ম-সমাজ, আর্য্য-সমাজ প্রভৃতির প্রভাবে মান্দ্রাজের পঞ্চম অথবা হরিজনের মত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় না, মহাত্মাজীর প্রভাবে নিশ্চয়ই এবার তাহাদের প্রতি সামাজিক কঠোরতার হ্রাস হইবে। আমরা বাংলা দেশের আচার ব্যবহার দেখিতে অভ্যস্ত হওয়ায় ঠিক দাক্ষিণাত্যের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। তাই মনে হয় দেশের সমগ্র চিন্তা এইদিকে কেন্দ্রীভূত হইয়া শেষে সকলের আগে যাহা করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন তাহার প্রতি মনোযোগের অভাব না ঘটে। সকলের মূলে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলে সামাজিক গ্লানি ও কলঙ্ক, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি অনায়াসে দূর করিতে পারা যাইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান

এই প্রতিষ্ঠানটি এদেশে একেবারে নূতন, ইহাও নূতনই স্থাপিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা অন্যত্র বিস্তৃত ভাবেই প্রকাশ করিয়াছি, এস্থলে উহার পরিচয়ে ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য আর কিছু লিখা অনাবশ্যক। ইহার পরিচালনার ভার কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়াছেন কাজেই সে সম্বন্ধেও কিছু বলা বাহুল্য। তবে এই প্রসঙ্গে আমরা শুধু একটা কথা জোর দিয়া বলিতে চাই যে, মেয়েরা ইহার প্রয়োজনীয়তা যতটা বুঝেন, পুরুষেরা যদি তেমনি ভাবে আন্তরিকতা ও হৃদয়ত্বা দিয়া যথার্থই ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন, তবেই ইহার স্থায়িত্ব ও ব্যাপকত্ব আশা করা যায়। বস্তুতঃ বাংলাদেশের সর্ব্বত্র এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া না উঠিলে অনতিবিলম্বে আঁতুড় ঘরই বাঙালীর শ্মশান ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের এই সতর্ক-বাণী জাতির কাণে পৌঁছিবে কি ?

নারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশ

অনেক দিন হইতেই সংকল্প আছে, দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন নারীপ্রতিষ্ঠান ও মহিলাকর্ম্মীদের বিবরণী জয়শ্রীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত করিব। পূর্ব্বে একবার ইহার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একজন মহিলাকর্ম্মীর বিবরণী ব্যতীত, আমরা অন্যকিছু প্রকাশ করিতে পারি নাই। পুনরায় আমরা বিশেষভাবে আমাদের দেশেরই মহিলা-প্রতিষ্ঠান গুলির দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি। সামাজিক, রাজনৈতিক শিক্ষাবিষয়ক বা যে-কোন নারী-প্রতিষ্ঠানের বিবরণী আমরা জয়শ্রীতে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাদ্বারা দেশের বিভিন্ন মেয়েদের মধ্যে যোগ স্থাপনে সুবিধা হইবে, যাহারা কোন কাজের আদর্শ বা সুযোগ পান না তাহাদের পন্থানির্দ্দেশে ইহা সহায়তা করিবে, কর্ম্মীদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে ইহা সাহায্য করিবে এবং প্রগতির পথও ইহাতে সহজতর হইবে। আশা আছে, বাংলার মেয়েরা এ বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন এবং এই একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারটির প্রতি মনোযোগ দিবেন মফস্বলের প্রতিষ্ঠান সমুহ বোধ হয় সত্বরই এজন্য তৎপর হইতে পারিবে !

দীপালি প্রদর্শনী ও উৎসব

প্রতি বৎসরই দীপালি প্রদর্শনী হয়, এবারও হইবে। শিল্প-প্রদর্শনীর সহিত, সপ্তাহব্যাপী দীপালি-উৎসবও অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠান মহিলাদের একটি পুণ্য ও পবিত্র ব্রত। শুধু তাহাই নহে, ইহা নারী-প্রগতির স্মারক-চিহ্ন, ইহা তাহাদেরই জয় যাত্রার বিজয়-কেতন। এই বিজয়-পতাকা বহন করিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন—ঝড়-ঝাপ্টা কম হয় নাই. তবু অস্খলিত পদে অচপল গতিতে তাঁহারা পথ চলিয়াছেন। দশটি বছর এমনি করিয়াই কাটিয়াছে। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে যে দ্বাদশজন মহিয়সী মহিলা অন্তরের প্রেরণায় দীপালির হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, যখন তাঁহাদের একাদশজনই নানা কর্ম্মক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন. সেই সময় হইতে তাঁহাদেরই

পুরোবর্ত্তিণী শ্রীযুক্তা লীলাবতী নাগ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের মত দীপালির দীপ্ত শিখা অনির্ব্বাণ রাখিয়াছেন। আজ তাঁহার অভাবে তাঁহারই অশরীরী প্রেরণা সহস্র মূর্ত্তি ধরিয়া বাংলার নারীদের এই ব্রতানুষ্ঠানে উদ্যোগী করিয়া তুলিয়াছে। যে শিখা জ্বলিয়াছে, তাহা নিভিবার নয়। দেশের প্রতিটি মেয়ের জীবন যেদিন এই পূত হোমাগ্নির জ্ঞানশিখায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, সেইদিন অবসান হইবে দীপালির যজ্ঞ-সাধন, দীপালির ব্রতানুষ্ঠান। তাই বলিতেছিলাম, দীপালি-অনুষ্ঠান অতি পুণ্য ও পবিত্র, অসামান্য ইহার দায়িত্ব ও গুরুত্ব, মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও তপস্যা এই পথের অতি-বড় সম্বল।

যাহার প্রতীক্ষায় সারা বছর উন্মুখ হইয়া থাকি, সেই উৎসব আবার আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। নারী-প্রগতির মূর্ত্তি প্রতীক এই অনুষ্ঠানকে সফলতর করিয়া নারী-সমাজের অগ্রগতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে আজ সকলের সমবেত চেষ্টা ও প্রয়াস ইহার সহিত যোগযুক্ত করা চাই। তাই আজ আহ্বান জানাইতেছি বাংলার নারীকে—শিল্পে-জ্ঞানে, অর্থে সামর্থ্যে স্নেহে-প্রেমে ইহাকে সফল করিয়া তুলুন, সার্থক করিয়া তুলুন। ধন্য হোক্ নারী-প্রগতির পুণ্য প্রয়াস, সত্য হোক্ নারী-হৃদয়ের একনিষ্ঠ সঙ্কল্প।

সাঁওতাল পল্লী

শ্রীসাবিত্রী দেবী

দ্বিতীয় বর্ষ	পৌষ, ১৩৩৯	নবম সংখ্যা

জার্ম্মাণীতে শিশুমঙ্গল

ডাঃ শ্রীমৈত্রেয়ী বসু

যখন কলেজে পড়িতাম, আমাদের একজন প্রফেসর বারবারই বলিতেন যে, একটা জাতির সভ্যতার স্তর নিরূপণের মাপকাঠি হইতেছে সেই জাতির মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা। তাহা যদি সত্য হয় তবে বলিতে হইবে জার্ম্মাণী সভ্যতার অতি উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে। জার্ম্মাণ জাতি যে মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গলের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে তাহা নয়—ভূসম্পত্তি বিহীন শ্রমজীবিরাও যাহাতে অসুস্থতার সময় চিকিৎসা ও কর্ম্মহীনতার সময় অন্ন পায় তাহার জন্য দেশব্যাপী বিপুল ব্যবস্থা আছে। ভৃত্যকে মাহিনা দিয়াই প্রভুর ক্ষান্ত হইবার জো নাই, তাহার জন্য প্রতি মাসে কিছু করিয়া টাকা অসুখের ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নিকট জমা দিতে হইবে যাহাতে অসুখে পড়িলে যেন হাঁসপাতালে বিনা পয়সায় থাকিতে পায়। বৃদ্ধ বয়সের অক্ষমতার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই সকল ব্যবস্থাই লোকের উপর শুল্ক বসাইয়া সেই টাকা দ্বারাই করা হয়, কোন ধনীলোকের কিংবা ধনীদিগের দয়ার উপর নির্ভর করা হয় না।

আজ আমার লিখিবার বিষয় হইতেছে শিশুমঙ্গল। সমস্ত জার্ম্মাণী জুড়িয়াই ইহার বিশেষ সুব্যবস্থা আছে। আমি কেবল ম্যুনসেন সহরের একটা সমিতির কথা বিবৃত করিব। এই একটী সমিতির কার্য্যাবলী হইতেই অন্যগুলির ধরণ বোঝা যাইবে। এই সমিতিটির নাম হইতেছে—ম্যুনসেনের শিশুমঙ্গল জিলা সমিতি। ইহার উদ্দেশ্য—যে সকল শিশু পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকের নিকট মানুষ হইতেছে তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল পরিদর্শন করা ও আবশ্যক মত সাহায্য দান করা। *

* জার্ম্মাণীতে বহু বালকবালিকা আশ্রমে মানুষ হয়।

এই সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয় ১৯১৩ সনে অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভের এক বৎসর পূর্ব্বে, মাত্র দুইটী সেবাকারিণী ও কয়েকটি শিশু লইয়া। আজ এই সমিতির অভিভাবকত্বে প্রায় পঁচিশহাজার শিশু উপকৃত হইতেছে। সহরটিকে আঠার ভাগে ভাগ করিয়া আটাশটি জিলা তৈয়ারী করা হইয়াছে, প্রত্যেকটি জিলার জন্য একজন করিয়া শিশুমঙ্গল কর্ম্মে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত ডাক্তার আছেন। ইঁহারা প্রতি সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট দিনে ও স্থানে শিশুগণকে পরীক্ষা করিয়া জননীদের শিশু লালনপালন সম্বন্ধে পরামর্শ দেন—প্রয়োজন মত ঔষধাদিও দেন। প্রত্যেক শিশুর একটি করিয়া কার্ড আছে—এই কার্ডে তাহার জন্মের সময় হইতে উন্নতি বা অবনতির গতি লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রত্যেক বার শিশু যখন পরীক্ষাগারে আসে তাহাকে ওজন করা হয়, সে দিনে কতটা পরিমাণে কি জিনিষ খাইতেছে তাহা লিখিয়া লওয়া হয় ও সবশুদ্ধ শারীরিক সাধারণ পরিপুষ্টি সম্বন্ধে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এইরূপে জন্মের সময় হইতে ছয়বৎসর কাল শিশু এই সমিতির তত্ত্বাবধানে থাকে। এই সময়ের ভিতর তাহার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য এই সমিতি দায়ী। আঠারটি জিলার সকল শিশুর কার্ড একটি সেণ্ট্রাল অফিসে জমা থাকে। ছয়বৎসর বয়সে শিশু যখন স্কুলে পড়ে তখন তাহার সহিত তাহার নামের কার্ড সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই সম্পর্কে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে ছয় বৎসর বয়সে সকল সুস্থ সবল জার্ম্মাণ শিশুকে স্কুলে যাইতেই হইবে। ধনী দরিদ্র সকল বালক-বালিকাই এই নিয়মের অধীন ও বলাবাহুল্য যে সকলেই এক স্কুলে পড়ে। এই সময় হইতে স্কুলকর্ত্তৃপক্ষ বালক বালিকাদের স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী।

সমিতির সেবাকারিণীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া শিশুগণকে চোখে চোখে রাখেন—স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম দেখিলেই তাহাদিগকে ডাক্তারের নিকট লইয়া আসেন। তবে স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম সাধারণের দৃষ্টিতে অনেক সময় ধরা পড়ে না বলিয়া সুস্থ শিশুরা তাহাদের সুস্থতা প্রমাণ করিবার জন্য পরীক্ষাগারে আসে। ইহা ভিন্ন ওজন ও খাওয়ার তত্ত্বাবধানের জন্য ত তাহাদিগকে পরীক্ষাগারে মধ্যে মধ্যে আসিতেই হইবে।

শিশু পরিদর্শন ভিন্ন সমিতির আরও কয়েকটি কার্য্য আছে। তাহার ভিতর একটী হইতেছে শিশুরা কোন অসুখের পর যাহাতে হাওয়া বদলাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। ম্যুন্‌সেন সহরের পারিপার্শ্বিক স্থান সকল অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও খুবই সুন্দর। সেইজন্য হাওয়া বদলাইবার জন্য অধিকদূর যাইবার প্রয়োজন হয় না। সহরের নিকটেই একটী আশ্রম আছে, সেখানে ২০০টি বালক-বালিকা থাকিতে পারে। আশ্রমের অধিবাসী শিশুরা সমস্ত দিন পাইন বনের ভিতর খেলাধূলা আহার ও বিশ্রাম করে। ইহার জন্য সকল রকম ব্যবস্থাই আছে। এইজন্য পিতা মাতাদের যাহা খরচ পড়ে তাহা যৎসামান্য।

সমিতির আরও একটী কার্য্য হইতেছে মাতাদিগকে ও স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিশু লালনপালন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। এই শিক্ষা সমাপ্ত হইলে যাহারা চাকুরী করিতে চাহে

তাহাদের চাকুরী জুটাইয়া দেওয়াও এই সমিতির কার্য্যতালিকাভুক্ত। প্রতিবৎসর বড়দিনের সময় এই সমিতি দরিদ্রমাতাদিগকে নানাপ্রকার যৌতুক দিয়াও সাহায্য করেন।

এখন দেখিতে হইবে যে সমিতি এত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন—ইহার রসদ কোথা হইতে সংগ্রহ হইতেছে। এই সমিতি সহরের কতিপয় ডাক্তার ও অন্যান্য ভদ্রলোকের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সহরের কর্পোরেশন্ বহু অর্থ দান করেন ও অসুস্থতা ইন্সিওরেন্স সমিতিও মূল্যবান সাহায্য করেন। কর্পোরেশনের সাহায্য ব্যতীত এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান চলা সহজসাধ্য নহে। সমিতর মেম্বরগণের নিকট হইতেও কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ হয়। প্রত্যেক মেম্বরকে বৎসরে অন্ততঃ তিন মার্ক অথবা প্রায় তিন টাকা করিয়া দিতে হয়।

এই সমিতির কার্য্যের ফল স্বরূপ ম্যুনসেন সহরের শিশুমৃত্যুর হার আশ্চর্য্য রকম কমিয়া গিয়াছে। আজকাল প্রায় প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায়ই য়ুরোপের শিশু-মঙ্গল সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলি পড়িয়া বহুলোক উপকৃত হ'ন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনেকগুলিই আমার চোখে পড়িয়াছে। তাহা সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র কলেবর প্রবন্ধ লেখার কারণ হইতেছে এই যে, উপরে বিবৃত সমিতির কার্য্য অল্পব্যয়সাধ্য ও আড়ম্বরশূন্য, এবং সেই কারণে আমাদের দরিদ্র দেশে আরম্ভ করিবার উপযোগী। আমাদের দেশে শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান নাই বলিলেই চলে। ইহার জন্য দেশের শাসক-সম্প্রদায় যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু জনসাধারণেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। উপরে বিবৃত সমিতিটির কার্য্য জনসাধারণের চেষ্টাতেই আরম্ভ হয় —এখন অবশ্য কর্পোরেশন ও ইনসিওরেন্স কোম্পানী সাহায্য করেন। এ রকম একটি সমিতি গঠন করিয়া কার্য্য চালাইতে হইলে খুব অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন একথা ঠিক নয়। সমিতির নিযুক্ত ডাক্তারদিগের জন্য খুব অল্পই ব্যয় হয়, কারণ তাঁহারা অনেকেই করপোরেশনের কিংবা ইউনিভারসিটি হাঁসপাতালে কার্য্য করেন এবং সেখান হইতে মাহিনা পান—এই শিশুমঙ্গল কার্য্যের জন্য অল্প অর্থই লইয়া থাকেন, কেহ কেহ বা একেবারেই লন না। পরীক্ষাগারগুলিও টাকা দিয়া তৈয়ারী করিবার দরকার হয় না—প্রত্যেক পাড়ার হাঁসপাতালে একটি করিয়া ঘর পাইলেই কার্য্য চলিয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানটি যেমন মাতাদিগের জন্যই বিশেষ করিয়া স্থাপিত—তেমনিই ডাক্তাররা তাঁহাদের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন। যে লোকের মাসে ৩০৲ আয় তাহার সন্তানকে ব্যয়সাধ্য কৃত্রিম খাদ্য খাওয়াইতে পরামর্শ দেন না। পাঁচমাস বয়সের পর হইতে শিশু যে দুধ ভিন্ন অন্য অনেক জিনিষ খাইতে পারে তাহা মাতাদের বলিয়া দেন। আমাদের দেশে পালং শাক, বিলাতী বেগুণ ইত্যাদির মূল্য অল্পই—এই সকল জিনিষ যে শিশুর উপযোগী খাদ্য তাহা আমাদের দেশে খুব অল্পলোকেই

জানেন। অবশ্য শিশুর উপযোগী করিয়া তৈয়ারী করিবার বিশেষ পদ্ধতি আছে, তাহাও সহজসাধ্য। কাজেই আমরা দেখিতেছি শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বহুমূল্য বিলাতী ফুড দরিদ্র মাতাদিগকে বিলাইতে হইবে তাহাও ঠিক নয়। জার্ম্মান শিশুগণকে নানারূপ সব্জি, ফল, দুগ্ধ, ভাত, ওট মিল, বার্লি ইত্যাদি ভিন্ন অন্য কোন জিনিষই আমি খাইতে দেখি নাই। তাহাদের স্বাস্থ্যও ভারতীয় শিশুদের অপেক্ষা ভাল ভিন্ন মন্দ নয়। আর আমাদের দরিদ্র দেশ হইতে প্রতিবৎসর কত সহস্র টাকা গ্ল্যাক্সো, মেলিন্স ফুড, অ্যালেনবেরী কোম্পানী লইয়া যাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই—অথচ শিশুরা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিয়া যাইতেছে।

শিশু-মঙ্গল কার্য্যের জন্য বিশেষ আন্দোলন করিবার সময় আমাদের দেশে আসিয়াছে, এবং এ কার্য্য আরম্ভ করিবার ভার হইতেছে দেশের শিক্ষিতা মহিলা-সম্প্রদায়ের।

মিউনিক, জার্ম্মাণী
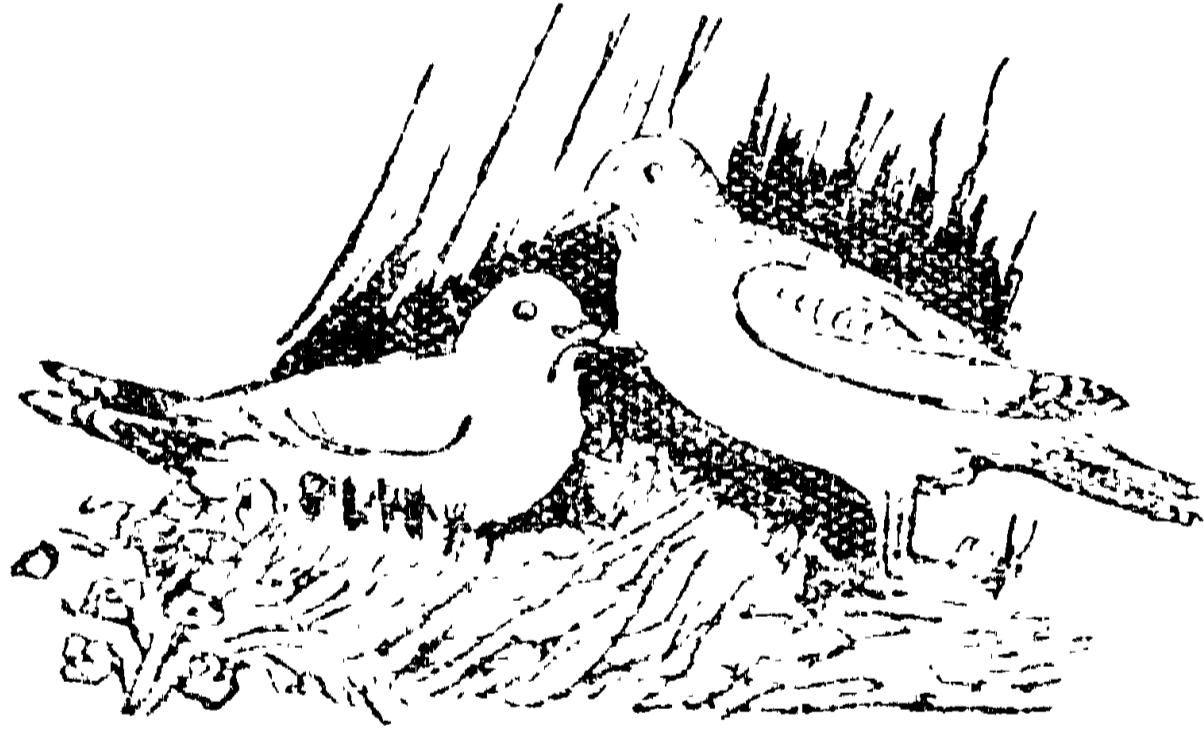
গোলক ধাঁধাঁ

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

(১৪)

প্রিয়বাবুর লাইব্রেরী ঘরে শান্তা বই খুলিয়া বসিয়াছে—শঙ্করভাষ্য সমেত বৃহদারণ্যক। বড় বড় বই পড়িবার সাধ তাহার চিরকালের, কাকাবাবুর ভাণ্ডারে তাহার অভাবও নাই, শুধু বিদ্যার বেষ্টন পায় নাই এই যা ছিল বাধা। কলেজের পড়াশুনার চাপ যতদিন ছিল, ততদিন সময়ের ছিল অভাব। পরীক্ষার পর হইতেই সে যত রাজ্যের বিখ্যাত বই—দেশ বিদেশের দার্শনিক গ্রন্থ পড়ায় মন দিয়াছে। সুষমা কৌতুক করিয়া বলেন, সাধু সন্ন্যাসী হবি নাকি লো? শান্তা উত্তর না দিয়া হাসে আর পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার বিশেষ বিষয় ছিল দর্শন, ভিতর হইতেও তাহার দর্শনের দিকে ঝোঁক। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূল নীতিটি কি? শেষ পৌঁছিবে গিয়া কোথায়? কেউ কি জানে না?—না জানিলে মানব জীবনের লক্ষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কোথায়? লক্ষ্য স্থির না থাকিলে মানুষ চলে কোন্ পথ ধরিয়া? ছেলেবেলা হইতেই শান্তার অদ্ভুত মনোবৃত্তি। কেবলই সে ভাবে—ভালো কাজ করিতে হইবে শুনি, কিন্তু ভালোমন্দের মাপকাঠি কোথায়!

দিনটা বড় মেঘলা। সারারাত্রি বৃষ্টি পড়িয়া পড়িয়া ভোরের দিকে যেন শ্রান্ত হইয়া থামিয়াছে। অন্তরের গূঢ় বেদনা যত গভীরই হউক, চিরকাল তাহাকে কাঁদিয়া প্রকাশ করা যায় না। প্রচণ্ড আঘাতের দুর্দম আবেগে জমাট অশ্রু গলিয়া পড়িয়া যখন কিছুকালের জন্য নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন চক্ষে থাকে শুধু একটা সজল ছায়া, মুখের উপরে গভীর কালিমা, তাহাই স্বচ্ছ দর্পণটির মত আপনার হৃদয়পট খুলিয়া ধরে। আজিকার আকাশখানির ছবিও ঠিক এই রকমের—থমথমে, ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণ। শান্তা বাহিরে দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া দেখে, এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত একাকার ধূসর! জীবন্ত সুন্দর মুখের উপর যে বর্ণবিভা থাকে, নিঃশেষে তাহাকে মুছিয়া লইয়াছে। কতদিন ধরিয়া তিলে তিলে ওর অন্তরে কালিমার সঞ্চার হইতেছিল, কেহ খবর তো রাখে নাই—যতদিন সম্ভব সকল জ্বালা গোপন করিয়া নীরবে সহ্য করিয়াছে। কিন্তু সব সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া আজ এই করুণ ক্রন্দনের পর এই ব্যথা-ভরা মৌন সকলকেই যেন কাঁদাইতে চায়।

চাহিয়া চাহিয়া শান্তা উন্মনা হইল।

পাশের বাড়ীগুলিতে বারান্দায় বাতাসে কাপড় শুকাইতেছে, হুহু করিয়া এক একবার বাতাসের ঠেলা লাগিয়া কোনও কোনটা ফুলিয়া উঠিতেছে নৌকার পালের মত। ছাদের কোণে দুই তিনটা কাক কিসের একখণ্ড টুকরা লইয়া ঠোকাঠুকি করিতেছে, উহাদের বিরস চীৎকারে স্তব্ধ

আকাশখানি মুখরিত। দূরে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথা দেখা যায়, লাল ফুলগুলি রাত্রির অশ্রান্ত বর্ষণে কেমন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। উহার বিচিত্র সূক্ষ্ম পাতার ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে, পাতাগুলি পুলকে, শিহরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝির ঝির করিয়া এক পশলা অশ্রুপাত। দূরে, শব্দ কিছুই শোনা যায় না, তবু শান্তা অনুভব করিল, ঐ জলঝরার মৃদু শব্দ যেন কাণে আসে। সবই কেমন ম্লান, অশ্রু-সজল, তবু কী সুন্দর! একটা লাইন মনে পড়িয়া গেল—মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।

নাঃ, আর পড়িতে ভালো লাগে না। আজকার দিনটা তাহার নিবিড় ছায়া লইয়া ঠিক যেন হৃদয়ের মধ্যে সাড়া দেয়, মস্তিষ্কের ত্রিসীমানায় যায় না। উপনিষদের 'গভীর তত্ত্ব বিচার করিবার মত উজ্জ্বল আলো এখন মাথার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না; বাহিরের আলোক স্তিমিত, ভিতরেও তাই। সমস্ত সত্ত্বা দিয়া আজ যেন মানুষ শুধু অনুভব করিতেই ব্যগ্র!—উপনিষদখানা সামনে খোলা পড়িয়া রহিল, অন্যমনে কয়েকখানা পাতার নীচে আঙুল ঢুকাইয়া শান্তা খোলা জানালার পথে চাহিয়া রহিল। দৃষ্টিপথে কোথাও বাধা নাই, কিন্তু দেখিবার বস্তুও কিছু চোখে পড়ে না। বাহিরের ছবি যেখানে মনের মধ্যে প্রতিবিম্ব ফেলিয়াছে, সমস্ত দৃষ্টি আজ সেইখানে।

পিছনে দুয়ারের কাছে সত্যকাম আসিয়া দাঁড়াইল। শান্তা ফিরিয়া তাকাইল না। সত্য কতকটা অতিষ্ঠ, কতকটা আহত হইল,—ভাবিল, ফিরিয়া যাই।

তবু অবাধ্য চরণের গতি গেল সম্মুখের দিকে।

সামনের আলমারীগুলির কাচের কবাটে অস্পষ্ট আলো খেলা করিতেছিল। হঠাৎ তাহার বুকে একটা গভীর ছায়াপাত অনুভব করিয়া শান্তার স্বপ্ন টুটিল। মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখে—সত্যকাম।

সত্য বলিয়া উঠিল, "বাপ্ রে বাপ্! এতক্ষণে তন্দ্রা ভাঙ্গল? আমি পাঁচ মিনিট ধরে এখানে, দাঁড়িয়ে!"

"ঘরে ঢুকে পড়লেন না কেন?"

"আপনার ধ্যানভঙ্গ করব অত বড় দুঃসাহস আমার নেই!"

বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া শান্তা বলিল, "সত্যি, আকাশটা কি সুন্দর লাগচে, দেখচেন?"

"সুন্দর! বলেন কি? বৃষ্টিতে বাদলে পচে মরলাম। এখন রোদ উঠলেই বাঁচি!"

শান্তা একটু হাসিয়া বলিল, "আপনি দেখচি আশ্চর্য্য লোক।—আচ্ছা আপনি মেঘদূত পড়েছেন?"

"সংস্কৃত সাহিত্যে দন্তস্ফুট করবার শক্তি বা ধৈর্য্য কোনটাই আমার নেই।"

"রবিঠাকুরের 'কেকাধ্বনি'?"

'পড়েছিলাম—এ্যাপ্রিশিয়েট কর্ত্তে বেশী পারিনি কিন্তু।'

হাসিয়া শান্তা বলিল, 'ও আপনি পারবেন না—আমি বুঝতে পেরেছি।'

সত্যকাম বলিল, 'তা আপনার মত অত উঁচুদরের কবিত্ব আমার নেই, স্বীকার করি।'

শান্তা উত্তর না দিয়া হাসিল।

কথা বলিবার কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া তারপর কতক্ষণ চুপ।—কিন্তু বড় অশান্তিকর! খানিক পরে নীরবতা ভাঙ্গিয়া সত্যকাম জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা আপনি এত গম্ভীর কেন?"

"গম্ভীর? কৈ?"

সত্য বলিল, "এই তিনচারদিন আপনার কাছে আসিনি কেন জানেন?"

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"ভয় করে বলে।'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শান্তা সবিস্ময়ে বলিল, 'ভয়!'

সত্যকাম চোখ নীচু করিয়া শান্তার মুখের উপরে দৃষ্টি নামাইয়া আনিয়া সহাস্যে বলিল, 'সত্যি।'

শান্তা বলিল, 'ভয় করবার মত আমার মধ্যে কি দেখলেন?'

'পরিষ্কার বুঝিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে—কিছু একটা আছেই যাতে মানুষকে একেবারে কাছে ঘেঁসতে দেয় না।'

চেয়ারের একদিকে একটু হেলিয়া বসিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাসিমুখে শান্তা বলিল, "তাহলে আমার দুর্ভাগ্য! বাস্তবিক, ভীষণ হওয়া জিনিষটাকে আমি বড্ড অপছন্দ করি।"

এক মিনিট্ চুপ করিয়া থাকিয়া সত্য বলিল, "আমি আপনার কাছে এলে আপনি রাগ করেন,—না?" জিজ্ঞাসুনেত্রে সে শান্তার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

শান্তা বলিল, "আমাকে রাগ কর্ত্তে দেখেচেন কখনো?"

"দেখবার দরকার করে না—বোঝা যায়।"

"তাহলে এরপরে আমার তো বলবার কিছুই নেই। যা আপনি অল্‌রেডি বুঝে রেখেচেন, তাকে অপ্রমাণ করবার আমার সাধ্য কোথায়?"

সত্যকাম বলিল, "সত্য কথাকে অপ্রমাণ করবার সাধ্য কারুরই থাকে না।"

কথা কাটাকাটি করিয়া কোনই লাভ নাই বুঝিয়া শান্তা চুপ করিল। টেবিলের উপর গতদিনের খবরের কাগজখানা পড়িয়াছিল, অপ্রয়োজনেও সেখানা সে খুলিয়া ধরিল।

সত্য একটু ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাস করিল, 'আজকের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্?'

'না।'

এ পাতা ও পাতা উল্টাইয়া শান্তা হঠাৎ বলিল, 'আজকে কলেজ নেই বুঝি?'

'হ্যাঁ—আছে তো!'

'কটায় ক্লাস্?'

'ঢের দেরী—একটায়।'

শান্তা সামনের দেয়ালে ঝুলানো বড় ঘড়িটার দিকে একবার তাকাইল।

চট্ করিয়া সত্যকাম টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সহজ তরল কণ্ঠের পরিবর্ত্তে কেমন এক প্রকার অস্বাভাবিক স্বরে বলিল, 'থাক, আর আসব না—যাই'।

শান্তা চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কোথায় আঘাত লাগিয়াছে, বুঝিতে বাকী রহিল না। বাস্তবিক ভারি অন্যায় হইয়া গিয়াছে। সে ভয়ানকভাবে অপ্রস্তুত হইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'ওকি হ'ল? আমি—'

কথাটা পূরোপূরি শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই সত্যকাম বলিল, 'দরকার কি? মিছে-মিছি এসে আপনাকে বিরক্ত করব কেন?'

'বিরক্ত আমি হইনা—সত্যি—'

অবিশ্বাসের সুরে একটু হাসিয়া সত্য বলিল, 'হ্যাঁ, তা জানি।'

'বিশ্বাস করচেন না?—সত্যিই!'

'বুঝেচি:—চল্লাম।'

শান্তার একটু রাগ হইল। ঠোঁট্ বাঁকাইয়া একটু হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা যান। আমার ক্ষতি কি?'

সত্যকাম দরজার কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, 'না, ক্ষতি আপনার কিছু নেই, ক্ষতি আমারই।'

সে চলিয়া গেল। শান্তা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সত্যকাম কি সত্যসত্যই ব্যথা পাইয়াছে, না শুধু একটা বাহিরে দেখানো অভিমান? তাহার মুখের উপর যে একটা ম্লানিমা শান্তা দেখিতে পাইল, তাহা কি বাস্তব না বাহিরের অন্ধকারের ছায়া, না, নিজেরই আজিকার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি? কিন্তু এমনই বা কি সাংঘাতিক কারণ ঘটিয়াছে যাহাতে সত্যর এত অভিমান! শান্তা কখনও কাহাকেও কাছে আসিতে অথবা গল্প করিতে বাধা দেয় নাই। সকলকে আত্মীয় করিয়া লওয়াই তাহার স্বভাব! যতগুলি মানুষকে আজ অবধি তাহার চিনিবার অবকাশ ঘটিয়াছে, সকলকেই সে অল্পবিস্তর ভালোবাসে, সত্যকামকেও ভালো না বাসিবার কোনও কারণ তো ঘটে নাই। তবু সে সন্তুষ্ট হয় না কেন? আশ্চর্য্য তার প্রকৃতি! এত চঞ্চল, হাস্য পরিহাসপ্রিয়, এমন বালক-সুলভ সরলতা অথচ মাঝে মাঝে অকস্মাৎ গাম্ভীর্য্য বাহির হইয়া আসে কোথা হইতে? হৃদয়টা ভারি কোমল অল্পতেই বুঝি দাগ পড়ে। এতটা বুঝিলে শান্তা আরও সন্তর্পণে, আরও সস্নেহে তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিত।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তা বইখানি খুলিয়া বসিল।

(১৫)

সপ্তাহ খানেক পরে ললিতা একদিন আসিয়া উপস্থিত। বহুদিন তার আসা হয় নাই। 'আসি আসি' করিয়া এ বাধা সে বাধা—সংসারী মানুষের বাধা আর ঘোচেই না। তবু তো রক্ষা—ছেলে মেয়ের উপদ্রব এ পর্য্যন্ত ললিতার স্কন্ধে আসিয়া চাপে নাই। আজ নিতান্তই আসিবে বলিয়া জোর করিয়া সময় করিয়া লইয়াছে, সুষমা ও ইন্দুমতীর সঙ্গে সামান্য একটু কথার প্রয়োজনও ছিল।

শান্তার পরীক্ষার কিছু পূর্ব্ব হইতেই ইন্দুমতী তাহার বিবাহের জন্য একটু আধটু সন্ধান করিতেছিলেন। এবারে পড়া সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, এখন রীতিমতই চেষ্টা করা প্রয়োজন নয় কি? হিন্দুমেয়ের পক্ষে যতদূর বিদ্যালাভ হওয়া সম্ভব, তাহা শান্তাকে দেওয়া হইয়াছে, এবারে নারী জীবনের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য ভার বরণ করিয়া লওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য, এই ইন্দুমতীর মত। প্রিয়লাল বাবুর মতে—বিদ্যানুশীলন এখানেই থামিয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই, তবে যাহা বাকী আছে, তাহা বিবাহিত জীবনের অবসরেই চলিতে পারে। সুতরাং শান্তার বিবাহ এখন সর্ব্বানুমোদিত।

ললিতা আজকাল নিজে গৃহিনী; সুতরাং বিবাহাদি গুরুবিষয় লইয়া গুরুজনদের সহিত আলোচনা পরামর্শ করিতে কিছু বাধে না। তার উপর, শান্তাকে সে বড় ভালোবাসে. তাহার জন্য একটি নিখুঁত পাত্র স্থির করিয়া দিবার আগ্রহও আছে অনেকখানি। এই সম্বন্ধেই একটি প্রস্তাব জানাইবার জন্য সে আসিয়াছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ললিতা ও শান্তা জাপানী ছবি আঁকা মাদুর বিছাইয়া মেঝেয় গড়াগড়ি দিতেছিল, খাটের উপরে শুইতে আর ভালো লাগে না—ভারি গরম। অনেকদিন এমন নিশ্চিন্ত আরামে এমন নিরালা বিশ্রম্ভসুখ দুইবোনের উপভোগে আসে নাই। ভারি ভালো লাগে। মনে পড়িয়া যায় কত দিবসের ছোট খাট কত কাহিনী!

'ছেলেবেলাটা কি সুন্দরই ছিল দিদি!'

'সত্যি কি সুখেই গেছে, না?'

শান্তার মনে পড়ে—দেশ-দেশান্তরের কত অভিনব অভিজ্ঞতা, কত রঙীন্ কল্পনা, সঙ্গে সঙ্গে কত অসম্ভব স্বর্গসৃষ্টি। সে অবস্থার ও আবেষ্টনের রূপান্তর ঘটিয়াছে, তবু সেই কল্পনার কুহক ও স্বর্গের মাধুরী আজও চক্ষের সম্মুখ হইতে ঘুচিয়া যায় নাই। তাহাকে যেন আজ আরও নিবিড়ভাবে আরও জাগ্রত ভাবে লাভ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পথের সাথী কে হইবে? সে যেন ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

'এমনি দুপুরবেলা কতদিন আমরা সেই জামগাছের ছায়ায় বসে, সেই ছাদের চিলে কোঠায় শুয়ে শুয়ে মানুষের দুঃখ-দৈন্য, সমাজের সংস্কার নিয়ে কত কল্পনাই করতাম—ভুলে গেছিস্ দিদি?'

ললিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, 'বলিস্‌নে আর ভাই। কিছুই যে তার সফল কর্ত্তে পারব না, একথা মনে কর্ত্তেও পারিনি।'

'সত্যি।—পারব না? কেন ভাই?'

ললিতা আফ্‌শোষ করিয়া বলে, 'সম্ভাবনা তো কই কিছুই দেখচিনে। সংসারের পাকে জড়িয়ে পড়লে আর বোধ হয় বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না মেয়ে মানুষের পক্ষে।'

শান্তা নিঃশ্বাস ফেলিল।

পারিবে না বলিয়া ললিতার মনে বাস্তবিক কোনও ক্ষোভ আছে কি? কই মনে তো হয় না। তাহা হইলে শান্তা হয়ত একটু সুখী হইত, হয়ত আবার নিজের প্রাণের প্রেরণা দিয়া ললিতাকে টানিয়া লইয়া যাত্রা সুরু করিতে পারিত। কিন্তু আগেকার সেই আদর্শের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ আজ তার কই? থাকিত যদি, তবে ললিতার কথাগুলি এমন নির্ব্বিকার সুরে বাহির হইতে পারিত না নিশ্চয়ই। যে তেজস্বী ললিতা আপনার সম্মুখে কোনও বাধাকে নীরবে কখনও সহ্য করিতে চাহে নাই, বিদ্রোহের ফণা তুলিয়া দাঁড়ানোই যাহার স্বভাব, আদর্শ-সিদ্ধির পথে সত্য সত্যই বিঘ্ন অনুভব করিলে তাহার সুরে ও ভঙ্গীতে কি একটা প্রচণ্ড ক্রোধ, একটা গভীর বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিত না? না, না—শান্তা বুঝিল, ললিতার লক্ষ্যই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর তো পড়া শেষ হয়ে গেল, এর পরে কি করবি ঠিক করেছিস্ ভাই?'

একটু ভাবিয়া শান্তা উত্তর দেয়, 'কি করব?—কি জানি দিদি, একেবারেই বুঝতে পারচি না। যেদিকে তাকাই, দেখতে পাই কত কাজ করবার পড়ে রয়েছে। কিন্তু নিজের মনের সত্যিকার ঝোঁক যে কোন্‌দিকে, ঠিক ধরতে পারি না। ইচ্ছে করে, এক সঙ্গে সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি; তা তো হয় না! বিরাট্ একটা কিছু গড়ে তোল্‌বার আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে ভেতর থেকে ধাক্কা দেয়, কিন্তু ডেফিনিট্ কোনও একটা লক্ষ্যে যুক্ত না হতে পারার দরুণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বেঘোরে নষ্ট হয়। কি করব বুঝি না, কেউ পথ দেখিয়েও দেয় না—কাজেই নিজের মধ্যে দিশেহারা হয়ে মরি। একটা নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় শীগ্‌গির শীগ্‌গির না পেলে আমার আর ভালো লাগচে না ভাই।'

সুষমা ঘরে ঢুকিলেন। ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেই এতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে—বেজায় দুরন্ত। অথচ না ঘুম পাড়াইলে সারা দুপুর রোদের মধ্যে বকুল ও রেণুর সঙ্গে ছাদময় হুড়াহুড়ি করিবে। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে শান্তার শেষ কথা কয়টা সুষমার কানে গেল। পরিহাস করিয়া বলিলেন, "শীগ্‌গির শীগ্‌গির একটা ওকে জুটিয়ে দে না ললিতা! অবশ্যি যোগ্যং যোগ্যেন হয় যেন!"

শান্তা হাসিল।

সুষমা বলিলেন, "কিরে? হাস্‌লি যে!"

"তোমার কথা শু'নে।"

"হাস্‌বার মত কি কথা বল্লাম আমি?" অর্দ্ধেক সকৌতুকে অর্দ্ধেক গুরুগম্ভীর হইয়া

বলিলেন, "আর চিরটা কাল মুখে হেসে উড়িয়ে দিলেই চল্ল আর কি? আসলে যে পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, সে আর বুঝতে পারিনে বুঝি?"

আবার শান্তা হাসিল। চকিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুষমা দেখিতে পাইলেন, ঠোঁটের কোণে কিরকম অবজ্ঞার সহাস্য ব্যঙ্গ।

রাত্রিতে আহারান্তে সুষমা যখন আপনার ঘরে আসিলেন, প্রিয়লালবাবু শুইয়া শুইয়া একখানা বই পড়িতেছেন। সুইচে হাত দিয়া সুষমা বলিলেন, "লাইটটা নিবিয়ে দিই?"

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রিয়লাল বলিলেন, "না, না, আর একটুখানি বাকী—এই পাঁচ ছ' পাতা—

বিছানার উপরে বসিয়া পড়িয়া সুষমা বলিলেন, "তা হলে তুমি নিবিয়ে দিও। আমি ঘুমোলাম।"

"আচ্ছা, সে হবে'খন।"

খানিক পরে বই বন্ধ করিয়া পাশ ফিরিয়া প্রিয়লা বলিলেন, "নির্ম্মল একটা প্রস্তাব এনেছিল—ললিতা তোমাকে বলেছে?"

"শান্তার বিয়ের তো?"

"হ্যাঁ"

"শুনেছি।'

"তোমাদের পছন্দ হয়?"

"হ্যাঁ, বেশ তো!"

"আমারও ভালই মনে হচ্ছে।"

সুষমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু শোনো একটা কথা।—শান্তা বিয়ে কর্ত্তে রাজি হবে তো?'

প্রিয়লাল বলিলেন, 'কি রকম?'

"আমি তো একরকম ছেলেবেলা থেকেই ওকে দেখচি—একটু যেন অস্বাভাবিক রকমের না? আজকাল বিশেষভাবে এদিকে অসম্মতি দেখ্‌চি যেন। বোধহয় বিয়ে করবেই না।"

প্রিয়বাবু এক মুহূর্ত্ত বিস্মিত হইয়া রহিলেন, তাহার পরেই কঠোর ভ্রূভঙ্গি করিয়া তাচ্ছল্যের স্বরে বলিলেন, "করব না বল্লেই হবে? ওসব কথায় কাণ দিও না যেন তোমরা। শান্তা কি বল্‌চে শুনি?' মেয়েদের কোনও গুরুতর বিষয়ে কোনও যে স্বাধীন মত থাকিতে পারে, এবং বিশেষতঃ তাঁহার ইচ্ছা বা ধারণার বিরুদ্ধে তাঁহার পরিবারস্থ কেহ যে স্বীয় অভিমত দাঁড় করাইতে পারে, এ তাঁহার কাছে একান্ত অসম্ভব, অত্যন্ত ধৃষ্টতা!

সুষমা স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইলেন। প্রিয়লালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কথা বলিলে ফলোদয় যে তাহাতে কতটুকু হয়, তাঁহার ভালই জানা ছিল। শান্তার দোষ কাটাইবার ব্যগ্রতায় তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'না সে নিজে কিছু বলেনি আমার মনে হয়।'

"ওসব বাজে।' বলিয়া প্রিয়লালবাবু গম্ভীরভাবে পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিলেন।

ক্রমশঃ

বিগতকৈশোর

শ্রীবেলা দেবী

স্বপনে হেরেছে কবি—
পেয়েছে ফিরিয়ে সোণার কিশোর হারাণো গোপন ছবি!
পুলকের বানে ভরে গেছে বুক,—নাই তার শোক জরা,
মৃত্যুর দ্বারে অতিথি না হবে ছাড়িবে না এই ধরা;
এই ধরণীর প্রিয়তম সে যে,—ছাড়িতে পারে না তারে,
অতি বিস্ময়ে অতীতের পানে চেয়ে দেখে বারে বারে,—
হায়রে কিশোর, সোণার কিশোর কেমনে ভুলিলে তুমি,
এই যে সেদিন তোমারি দুয়ারে সোণার স্বপন ভূমি!
এই বনানীর গোপন দোলায় নেচেছিল তারি বুক,
ছিল নাকো দুখ, শোক-ব্যথা-মান, বুক ভরা শুধু সুখ!
সে জানিত শুধু ফোটা-ফুল হয়ে রহিবে অবনী'পরে,
সাঁঝের বাতাসে পড়িবে না ঝরে সারাটি ফাগুন ধরে',
গন্ধ বিলায়ে অন্ধ পথিকে শোনাবে মরম গীতি,
নব কিশলয়ে হেরিবে নিশীথে ভোরের স্বপন স্মৃতি!

* * *

ঝরে গেল তার সোণার কিশোর যৌবন দিল ধরা
কবির পরাণে জাগিল সহসা আকুল গানের ভরা;
এক ঘুমে হায় কেটে গেল দিন ফুরাল গানের মেলা,
ঝরিল বকুল একটি নিমেষে ব্যাকুল সাঁঝের বেলা!

* * *

শুধাল পথিক যৌবন-গত মৃত্যুর দ্বারে ফিরে
জীবনে তাহার নেমেছে সন্ধ্যা আঁধার এসেছে ঘিরে,
চিত্ত তাহার বিত্ত মাগে না চাহেনা মুক্তা হেম,
ফিরি দেশে দেশে পরদেশী বেশে মাগেনি তুচ্ছ প্রেম!
'জনমের মত কেনা হয়ে র'ব পার যদি দিতে মোরে
সোণার কিশোর ফিরায়ে দিতে গো পার কি দু'দিন তরে?'

কবি হেসে কয় স্বপন স্মৃতির কভু কিগো পরাজয়,
কালের প্রভাবে নাই তার ক্ষয়, নাই যার অপচয়!
দিন যায় কেটে কাঁদে বসে দীন,—যায় না দিবস কভু
সে যে শুধু হায় মানুষের মনে,—জানে না মানুষ তবু!
দিন—দিন করে দুনিয়ার মাঝে কাটায় মানুষ কিনা,—
কবি শুধু হায় নীরবে বাজায় আপন মনের বীণা!

"শেষ-প্রশ্ন"

শ্রীশ্যামা সেনগুপ্তা

বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান পরিণতির আলোচনা কোরতে গেলে "শেষ-প্রশ্ন" কে এড়িয়ে যাবার উপায় থাকে না। সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ যে বিষয় নিয়েই আরম্ভ হোক্ না কেন, সেটা প্রায় সর্ব্বদাই "শেষ-প্রশ্ন" নিয়ে তুমুল তর্কে এসে থামে। আর তা হওয়া উচিত্ নিশ্চয়ই। শরৎচন্দ্রের এ বইখানি নিয়ে সমালোচনা না হওয়াটাই অন্যায় এবং বিস্ময়কর হোতো। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে তিনি যে কথা বলেছেন তারই নিঃসঙ্কোচ, উন্মুক্ত প্রকাশ যে পাঠকসম্প্রদায়কে চঞ্চল কোরে তুলবে তা নিতান্তই স্বাভাবিক। 'শেষ-প্রশ্নের' সমালোচনা এ যাবৎ অনেক শুনেছি ও পড়েছি। বাংলার সাময়িকীতে এর অপ্রাচুর্য্য নেই, কিন্তু অনুকূল সমালোচনা এ পর্য্যন্ত খুব কমই দেখেছি, অথচ বইখানি যে কোন দেশের সৎ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হোতে পারে। এ কথাটাতে অনেকে হয়তো আপত্তি কোরবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বলতে হয় যে 'শেষ-প্রশ্নের' সমালোচনা যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই 'শেষ-প্রশ্নকে' নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করেন না। সংস্কারমুক্ত সত্যান্বেষী মন, যা সাহিত্য বিচারের সব চাইতে খাঁটী মাপকাঠি, তাকে হারিয়েও স্বচ্ছন্দে ভর্ৎসনা করাটাকে আর যাই বলা যাক নিরপেক্ষ, সত্য সমালোচনা বলা চলে না।

'শেষ-প্রশ্নের' সমালোচনার কতকগুলো প্রচলিত ধারা আছে। অনেকেই 'শেষ-প্রশ্নের' নাম উচ্চারণ মাত্রই বলবেন, 'রেখে দিন 'শেষ-প্রশ্ন', এর সাহিত্যিক মর্য্যাদার কথা, ও একটা তর্কের-বাণ্ডিল বই আর তো কিছু নয়, তা প্রকাশভঙ্গীতে যতোই কেন মুন্সিয়ানা থাকুক না।' এই সমালোচনাটীর যাথার্থ্য আমি অন্ততঃপক্ষে উপলব্ধি কোরতে পারিনে। জীবনে তর্কের প্রয়োজন আছে, আধুনিক মানবের জীবনযাত্রাতে গভীর চিন্তা, ও অসঙ্কোচ বিশ্লেষণ-শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই চিন্তা-প্রণালীকে উপন্যাসে যে এতোটাই চিত্তাকর্ষক কোরে দিতে পারলো সাহিত্যে তার দান কিছুমাত্র অশ্রদ্ধেয় নয়। অনেকে বলেন তর্কই যদি কোরবে, মতবাদই যদি প্রচার কোরবে, তবে প্রবন্ধ লেখো। উপন্যাস এর ক্ষেত্র আলাদা, এটা তো আর তর্ক বিতর্কের সমষ্টিমাত্র নয়। কথাটায় কিছু সত্যতা যে আছে তা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু মতবাদ থাক্‌লেই যে উপন্যাসের মর্য্যাদা কমে যায় এ কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ বিশ্ব-সাহিত্য আলোচনা করলে এমন উপন্যাস অতি অল্পই দেখা যাবে যাতে মতবাদের কোন চিহ্ন নেই। রচনার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অত্যন্ত স্বাভাবিক; তাতে সাহিত্যের অমর্য্যাদা হয় না। 'রাশ্যার' সাহিত্যের আসন আজ জগতে কোন দেশের চাইতে নীচে নয় কিন্তু তার মধ্যে মতবাদের স্বল্পতা নেই। অবশ্য বার্ণার্ডশ-এর মতো মতামতকে প্রচলিত করবার জন্যে যে নাটক লেখা, তাকে আমি সাহিত্যের কোন উচ্চ আসন

দিতে চাইনে, কিন্তু মতবাদের জন্যে যদি 'শেষ-প্রশ্ন'কে আমরা 'তর্কের বাণ্ডিল" বলেই ত্যাগ করি তবে বিশ্ব-সাহিত্যের অধিকাংশকেই অসাহিত্য বলে বিবেচনা করতে হয়!

আসলে 'শেষ-প্রশ্নের' মধ্যে যা আমাদের পীড়া দেয় সে মতবাদ নয়, মতবাদের অভিব্যক্তি। বিদেশী সাহিত্যে এ যৌবনশক্তির জয়গান বহুবার পেয়েছি, কিন্তু বিদেশী বলেই তা আমাদের অতোটা আঘাত করে না। কিন্তু 'শেষ-প্রশ্নে' ঐ মতেরি অকুণ্ঠ আলোচনা দেখে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মন বিমুখ হোয়ে ওঠে। 'কমলের' কথাতে উপন্যাসোল্লিখিত অনেকে ব্যথা পেয়েছেন, রাগ কোরেছেন, পাঠকদের অজ্ঞাত নাই। 'কমলের' কথা অস্বীকারও কোরতে পারা যায় না অথচ নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করবার সাহসও হয় না, তাই মনে হয় 'কমলের' স্পর্দ্ধার সীমা নেই।

মতবাদের জন্যে 'শেষ-প্রশ্ন'কে দোষী করাটা সঙ্গত নয়, কারণ কোন একটা মতবাদ 'শেষ-প্রশ্ন'এ নেই। যদিও 'কমলের' মতবাদই আমাদের মনকে আহত করে বিশেষ ভাবেই জাগ্রত কোরে রাখে, তবু যথার্থভাবে বিচার কোরতে গেলে উপন্যাসের অন্য চরিত্রগুলির কথা ভুল্‌লে চলে না। বইখানা প্রথমবার যখন পড়লেম তখন মনে হোয়েছিল শরৎবাবু 'কমলের' মুখ দিয়ে যা বলাচ্ছেন তাই বুঝি তাঁর মত, কিন্তু পরে যতোবারই পড়েছি ততোবার এই কথাটাই পরিষ্কার হোয়েছে যে শরৎবাবু 'শেষ-প্রশ্নে' কোন পথই নির্দ্দেশ কোরে দেন্‌নি। 'কমল'কে যেমন তিনি দেখিয়েছেন, 'আশুবাবু' 'রাজেন্দ্র', 'নীলিমা'কে দেখাতে তো ভোলেন নি। প্রাণ-শক্তির উপাসিকা 'কমল' এর পাশেই ধৈর্য্যের হিমগিরি 'আশুবাবু' সম-পরিমাণ শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করেন। আর এদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্নেহ, এই দুই বিভিন্ন মনোবৃত্তিকেই সমভাবে গৌরবান্বিত কোরেছে। 'আশুবাবু' বলছেন—"তুমি আমাকেই সকলের চেয়ে বেশী আঘাত করেছ, কিন্তু আমিই তোমাকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি।"

"কমল" বলছে—"তার কারণ আপনি যে সত্যিকার বড় মানুষ কাকাবাবু, আপনি তো এদের মতো মিথ্যে নন্।"

এই সত্যিকারের বড়ো হওয়াটাই 'শেষ-প্রশ্নের' কথা, 'কমলের' পথই যে তার একমাত্র পথ এমন তো নয়। পুরাতনের প্রতি 'কমলের' শ্রদ্ধা সাধারণতঃ নেই, যেহেতু সাধারণতঃ আমাদের সমাজ পুরাতনের ভারে পঙ্গু, অচল, অসুস্থ হোয়ে পড়ে আছে; কিন্তু তাই বলে পুরাতনকে যদি আজ জীবধর্ম্মের অনুবর্ত্তী করা যায় তবে তাকে 'কমল' অস্বীকার কখনো কোরবে না। "আশুবাবুর" কথাতেই ব'লতে হয়—"যে সব কথা তার মুখে আমরা গুঁজে দিতে চাই ঠিক সেই কথাই কমল বলে নি—সে অনুষ্ঠানের মুল্য বোঝে, নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, কিন্তু অনুষ্ঠান, নিষ্ঠার মুল্য ততোদিনই থাকে যতোদিন তা মনের স্বচ্ছন্দ পরিণতিকে প্রতিহত না করে। "কমলের' অথবা শরৎবাবুর কথার ভেল্কিবাজিতে, চিন্তার সুতীব্র স্পষ্টতায় আমরা যদি 'কমলের' আসল মনোভাবকে বুঝতে না পারি তবে 'শেষ-প্রশ্ন' বোঝা সম্ভব নয়।

যদিও 'কমল'ই কাঁটার মতো আমাদের 'গলায় আট্‌কে আছে' তবু অন্যান্য চরিত্র ছাড়া 'শেষ-প্রশ্নের' পূর্ণ সমালোচনা হয় না। এই মতবাদের প্রসঙ্গতেই 'রাজেন্দ্রের' কথা না বলে পারা যায় না। 'কমলের' একমাত্র সমকক্ষ এই 'রাজেন্' যে 'কমলের' স্বেচ্ছাদত্ত বন্ধুত্বের জন্যে লালায়িত হয়নি প্রয়োজন নেই বলে। 'শেষ-প্রশ্নে' 'কমল' যেমন আছে তেমনি আছে 'রাজেন্দ্র'। 'কমল' যেখানে হৃদয়কে বসিয়েছে সবার উপরে, 'রাজেন্' সেখানে কর্ম্মের প্রাধান্য দিয়েছে। 'কমলের' কাছে মনের মিলটাই সবার চাইতে বড়ো, 'রাজেন' বলছে—'কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে, মতের অমিলের বাধা যদি আমার কর্ম্মকে প্রতিহত করে? আমরা চাই মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য, ও ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই।"

এই কথা দেখে 'শেষ-প্রশ্নে" কোন্ মতের প্রাধান্য স্বীকার কোরবো? আসল কথা এই যে শরৎবাবু কোন মতকে চরম বলে স্বীকার করেন নি; কোন প্রশ্নের শেষ সমাধান তিনি করবার চেষ্টা করেন নি, আর কোন বড় সাহিত্যিকই তা করেন না। 'কমলের' মধ্যে সংস্কারমুক্ত, সভ্য বুদ্ধিমান্ মানবের নিতান্ত national একটা জীবন-প্রণালীর ইঙ্গিত কোরেছেন মাত্র, তার বেশী নয়। শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী বর্ত্তমান বৎসরের ভাদ্রসংখ্যা 'বিচিত্রায়' 'শেষ-প্রশ্ন' প্রসঙ্গে বলেছেন যে 'আশুবাবুর' মধ্যে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষ কী ছিলো আর 'কমলের' মধ্যে ইঙ্গিত কোরেছেন ভারতবর্ষ কী হোতে পারে। কথাটা সত্যি। 'কমল'কে বর্ত্তমান ভারতের মাপকাঠি দিয়ে :বিচার করা চলে না; 'কমল'কে সত্যি আমরা চিনিনে। এতে আমাদের কাছে 'কমল'কে যদি কিছু অস্বাভাবিক মনে হয় তবে শরৎ-বাবুকে দোষ দেওয়া চলেনা। সাহিত্য যদি আমাদের গণ্ডীকে ছাড়াতে না পারলো তবে তাতে আনন্দও পাওয়া যায় না, শিক্ষাও হয় সামান্য। ইব্‌সেন-এর ডলস্‌হাউস্ পড়ে ইয়োরোপ ক্ষিপ্ত হোয়ে উঠেছিলো; নূতনের আবির্ভাবে রুষ্ট জনমতের অভাব কখনো হয়না, হয়ওনি; কিন্তু আজ ডলস্‌হাউস্ না প'ড়লে সৎ-সাহিত্যের একটা ধারার নিদর্শনই পাওয়া যায় না। তখন সে বইকে an open drain ব'লতে লোকের বাধেনি, আজ তার সমাদর দেখে লোকমতের স্থৈর্য্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে। অবশ্য এ আমার বক্তব্য নয় যে লোকমতের কোন মূল্য নেই। নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সত্য সাহিত্যের বিচার যে কোন এক যুগএর মতামত নিয়ে করা চলে না সেটাই বলতে চাই। তাই 'শেষ-প্রশ্ন'কে আজ সুনীতির বিরোধী বললেও হয়তো কাল তা আর বলতে হবেনা। সাধারণতঃ সাহিত্যের বিচার আমরা নিরপেক্ষ ভাবে কোরতে পারি না, কারণ শত চেষ্টাতেও জন্মগত যে সংস্কার তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় না, 'কমলের' মধ্যে এই সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিমান্ মানবের রূপ আমাদের কাছে তাই অস্বাভাবিক মনে হয়।

সমাজ-বন্ধনকে যুক্তি দিয়ে বিচার না কোরে 'কমল' মান্‌বেনা, তাই বলে সে যে আবার পশুজগতের প্রবৃত্তি-সর্ব্বস্ব জীবনেই ফিরে যাবে এমন তো নাও হোতে পারে। মানব-মনে বুদ্ধির

চিন্তাবৃত্তির যে বিকাশ হোয়েছে তাকেই 'কমল' সবার উপরে স্থান দিয়েছে, পাশব চেতনাকে নয়। জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তের মূল্যদান করা, অতীত দুঃখের ছায়ায় বর্ত্তমানের আনন্দকে ম্লান হোতে না দেওয়াটা যে কতোখানি মনের জোরের দাবী করে তা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। 'কমল' অসুখ দুঃখ বহন কোরতে পারে, কিন্তু মানবাত্মার অসম্মান সইতে পারে না।

অনেকে বলেন, এতে 'কমল'কে অতিমানবী কোরে চিত্রিত করা হোয়েছে, এতোটা কখনো সম্ভব নয়, বিশেষতঃ আমাদের দেশে। আমাদের দেশে এখনো হয়তো এম্‌নি বে-পরোয়া সাহসী মেয়ে সচরাচর দেখা যায়না, কিন্তু ভবিষ্যতে তীক্ষ্ণধী নির্ভীক মেয়ে জন্মাবে না এমন কথা বলা চলেনা। আর সত্যিই কি 'কমল' অস্বাভাবিক? দুর্ব্বল মানবের সাধ্যের অতীত তার সাহসিকতা? "কমলের চোখে জল" কি তাকে মাঝে মাঝে তার মধ্যের চিরন্তনী অসহায়া নারীকে প্রকাশ কোরে দেয়নি? কমল বুদ্ধিতে অসামান্যা, মনের জোর তার আশ্চর্য্য; ভারতের নারীর মধ্যে এতোটা দেখা যায় না, তাই বলে 'কমল'কে অস্বাভাবিক বলতে পারিনে।

আর উপন্যাস রচনার মধ্যে সামান্য যে অতিশয়োক্তি, তার জন্যে 'শেষ-প্রশ্ন'কে অবাস্তব বলা চলে না। তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য-রচনাতেও এ অতিশয়তা থাক্‌বেই কারণ সাধারণকে লোকচক্ষুর সম্মুখে আন্‌তে গেলেই তাকে গতানুগতিকের থেকে কিছুটা পৃথক্ কোরতে হয়। যে লেখক মশার কামড়ের উপর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যেতে পারেন, তাঁর অনুভব-শক্তি আমাদের চাইতে কিছু বেশী এবং সেই হিসেবে হয়তো কিছু অস্বাভাবিকও অথচ তা পড়লে মনে হয়, ঠিক ঠিক এমনি মশার উৎপাতে কতোদিন উত্যক্ত হোয়েছি। এইতো সাহিত্যের ভিত্তি। তাতে অসাধারণত্ব থাক্‌বেই অথচ সত্যেরও অভাব হবে না।

উপন্যাস হিসেবে "শেষ-প্রশ্ন"এর নিকৃষ্টতার কথা প্রায়ই শোনা যায়। সমালোচনাটীর মূল্য বুঝতে পারিনে। "শেষ-প্রশ্নের" গল্পাংশ ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাসের মতো ঘোরালো না হোতে পারে, কিন্তু উপন্যাসের উপাদান তাতে যথেষ্ট আছে। "শেষ-প্রশ্ন" আরম্ভ কোরে ফেলে রেখেছে এমন পাঠক (পাঠিকাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম) এ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। শুধু "তর্কের বাণ্ডিল" আর 'উগ্র বিলিতী মতবাদের কড়া এসেন্স'কী এতোখানি ঔৎসুক্য দাবী কোরতে পারে? তা হোলে পৃথিবীতে প্রবন্ধের প্রচলন আরো অনেকটাই বেশী হোত।

তারপর উপন্যাস রচনা কৌশলে অধুনা যে পরিবর্ত্তন বিশ্ব-সাহিত্যে দেখা দিয়েছে, বাংলা-সাহিত্যে তারই প্রবর্ত্তন শরৎচন্দ্র কোরেছেন। তাঁর পরবর্ত্তী প্রতিভাবান্ কথাশিল্পীরা এই পন্থা অনুসরণ কোরে যে সাহিত্যের জন্মদান কোরেছেন তা বাস্তবিকই যে-কোন দেশের গৌরবের বস্তু। আধুনিক উপন্যাসের মধ্যে গল্পের চাইতে চরিত্র বিশ্লেষণের অংশটাই বেশী থাকে; "শেষপ্রশ্নে"ও যদি তাই থাকে তবে তাতে আক্ষেপ করবার কিছু নেই।

আর অনর্থক প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি কোরে পাঠক-পাঠিকাকে উত্যক্ত কোরব না, তবে

এইটুকু বলতে পারি যে বাংলা কথা-সাহিত্যে এবং বিশ্ব-সাহিত্যে "শেষ-প্রশ্ন" অতি উচ্চ আসনই দাবী কোরতে পারে। কমল থেকে আরম্ভ কোরে "সতীশ" পর্য্যন্ত প্রত্যেকটা চরিত্র বিভিন্নভাবে সমালোচন-যোগ্য। প্রত্যেকটী চিত্র নিখুঁৎ অপরূপ। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাতে শরৎচন্দ্র যে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, "শেষ-প্রশ্ন" তাকে অধিকতর ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত কোরেছে। 'শেষ-প্রশ্নের' মধ্যে গভীর চিন্তাশীলতার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণশক্তির যে নিদর্শন পাই তা শুধু বিলাতী মতবাদের অনুকরণ কোরেই লাভ করা যায় না। সাগর-পারের চিন্তাধারা তাঁকে হয়তো আঘাত কোরেছে, কিন্তু অভিভূত করেনি। আর বিদেশের চিন্তাপ্রণালী যদি আজ আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ কোরে থাকেই তবে তাতে অন্যায় তো কিছু হোতে পারে না। মানুষ সবার আগে মানুষের, তারপরে তার জাতীয়তা। শরৎবাবুর ভাষাতে বলতে গেলে বলতে হয়—"ভালোর শত্রু আরো ভালো, মন্দ নয়।"

সে কথা ছেড়েই দিই। মঙ্গলকে, বিদেশ থেকে আগত বলেই ত্যাগ করার যুক্তিযুক্ততা নিয়ে তর্ক আজ কোরবো না। এইটুকু মাত্র বক্তব্য সে 'শরৎচন্দ্র' যা লিখেছেন তা নিজে না অনুভব কোরে লেখেন নি। বিশ্ব-সাহিত্যের যুগ-প্রগতির ধারাকে "শেষ-প্রশ্ন" অতিক্রম করেনি, কিন্তু তার মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশীল যে মনের পরিচয় পাই তা যথার্থই অসামান্য। শরৎচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাস সকল তাঁকে নিতান্তই বাঙ্গালীর কোরে রেখেছিল, 'শেষ-প্রশ্নে' বিশ্ব-প্রগতির সাথে তাঁর যোগ দেখ্‌তে পাই।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টি আর এক দেশের রচনাকে মনে করিয়ে দেয়—সে 'রাশ্যা' যে দেশের লেখার মধ্যে কিনা আদর্শের জন্যে একনিষ্ঠ, আন্তরিক সাধনা প্রকাশ পেয়েছে। সে দেশের সাহিত্যের সুর যদিও শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে কাণে বাজে, তবু এ সত্যি যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টিকে সে অভিভূত করেনি। এক কথায় শরৎচন্দ্র বাংলার কথা-সাহিত্যকে যে সম্পদ দান কোরেছেন তার তুলনা হয় না। 'শেষ-প্রশ্ন' পড়তে এসে যাঁরা শুধু গল্পই খুঁজবেন তাঁদের হতাশ হোতে হবে, কারণ এ নিছক গল্প নয়। এতে তাঁদের স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা কোরতে হবে, হয়তো অনেক কিছুই শিখতে হবে। শেষ-প্রশ্নের বিচার শুধু আখ্যায়িকার মাপকাঠিতে করা চলে না।

শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়ের' শেষ পরিচয় এখনো পাইনি—যেটুকু পেয়েছি তার উপরে মন্তব্য করা বৃথা। কিন্তু 'শেষ-প্রশ্নে' তাঁর যে অপরূপ, অভিনব প্রতিভার সাক্ষাৎ পেয়েছি তা যে কোন দেশের গৌরবের বস্তু—আমাদের দেশের তো নিশ্চয়ই।

মাতা-পিতা ও সন্তান

শ্রীমালতী দাস-গুপ্তা

নরনারীর মধুর এবং কঠোরতম কর্ত্তব্যের আরম্ভ হয় সে দিন থেকে যে দিন তাঁরা পিতৃত্বের অথবা মাতৃত্বের পদে অভিষিক্ত হন।

কর্ত্তব্য সাধারণতঃ মধুর অথবা কঠিন হ'য়েই থাকে, কিন্তু মধুর এবং কঠিনের একত্র সমাবেশ বোধ হয়, একমাত্র পিতামাতার সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যের মধ্যেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সন্তানের সুখদুঃখের সঙ্গে আপনাকে জড়িত করে পিতামাতা কত আনন্দ পান তা আর বেশী করে ব'লে দেবার আবশ্যক হবে না ;—কঠিন যে কেন সেটাই একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। কর্ত্তব্যকে আমরা মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারি,—প্রথম নৈতিক, দ্বিতীয় আত্মিক বা আত্মগত।

প্রথমটিকে আমরা নীতির দিক দিয়ে এবং দ্বিতীয়টিকে আমাদের নিজেদের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের সুখ-সুবিধার জন্য ক'রে থাকি। কিন্তু কেবলমাত্র সন্তানের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য না করায় উপরের দু'প্রকার কর্ত্তব্য লঙ্ঘনের দায়িত্ব পিতামাতাকে নিতে হয়।

শিশুই দেশের ভবিষ্যৎ। গাছের প্রতি প্রথম থেকেই সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে যেমন তার কাছ থেকে ভাল ফলের আশা করা যায় না, তেমনি যদি শিশুকাল থেকে ভাল ক'রে সন্তানের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য না রাখা যায়, তবে পিতামাতার এবং জাতীয় জীবনের উভয়েরই যথেষ্ট ক্ষতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দায়িত্বটি যদি কেবলমাত্র কঠিনতমই হ'ত তাহ'লে ভাববার কথা ছিল ; প্রকৃতির এমনি বিচিত্র-বিধান যে কর্ত্তব্যটির মধ্যে এত মধু ঢেলে দেওয়া হ'য়েছে যে সে কর্ত্তব্য সম্পাদনের সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদও মধুময় হ'য়ে ওঠে।

সন্তানকে সর্ব্বপ্রকারে সুখে রাখা প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য। অধিকাংশ পিতামাতা এখানে একটা মহা ভুল ক'রে থাকেন। প্রচুর খেল্‌না অথবা সুন্দর সুন্দর কাপড়-চোপড় দিয়েই শিশুদের পরিপূর্ণ সুখী ক'র্‌তে পারা যায় না। ইংলণ্ডের বিখ্যাত আইন-এবং রাজ-নীতিবিদ্ স্যার জন সাইমনের মাতা ফ্যানি সাইমন বলেন,—"True happiness is a thing entirely of the spirit, and there must be a close, deep bond, born of sympathy and understanding, between parents and children before it can exist" এই নিগূঢ় যোগসূত্র আন্‌তে হ'লে সন্তানরা যতদিন শিশু থকে ততদিন পর্য্যন্ত পিতামাতাকে তাদের সেবার জন্য যথেষ্ট সময় এবং ধৈর্য্য দিতে হয়। তা না ক'রে সে ভার যদি সম্পূর্ণভাবে

অপরের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে যাঁর কাছে সে ভার দেওয়া হয় তিনি যতই কর্ত্তব্য-পরায়ণ হন না কেন, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সে যোগসূত্র স্থাপন করিয়ে দিতে পারেন না। সন্তানের প্রতিদিনের বিপদ-আপদ ছোটখাট প্রচেষ্টা, তার সফলতা অথবা বিফলতার আনন্দ ও দুঃখের অংশ গ্রহণ ক'রে তাদের চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলির সঙ্গে ভাল ক'রে পরিচয় রাখা প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। এতে পিতামাতাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হবে, সেটুকু আত্মত্যাগ না ক'রে কোন পিতামাতার পক্ষেই সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করা সম্ভবপর নয়।

একটা কথা প্রত্যেক পিতামাতাকে স্মরণ রাখ্‌তে হবে যে, শৈশবের দিনগুলি বড়ই তাড়াতাড়ি কেটে যায়, এবং সন্তানের সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধ-সূত্রযোগের এই মাহেন্দ্রক্ষণটি যদি একবার হারান যায়, তবে তাতে পিতামাতাকে যে ক্ষতি স্বীকার কর্‌তে হবে তার কাছে সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সাধনের জন্য বর্ত্তমান ক্ষতি স্বীকার অতি তুচ্ছ।

সন্তানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌তে অবশ্য সকল পিতামাতা পারবেন না, তবে যেগুলি একান্ত আবশ্যকীয় সেগুলিকে নিজহাতে না কর্‌লে চল্‌তে পারে না।

শিশু-সন্তানের সঙ্গে খেলা ক'রে,—তাদের সঙ্গে গল্প ক'রে পিতামাতা যে আনন্দ পান, তা তাঁদের জীবনের একটি চিরন্তন আনন্দ-উৎস হ'য়ে থাকে, তার মধুর স্মৃতি তাঁরা কোনদিন ভুল্‌তে পারেন না।

সন্তানের প্রতি বাধ্যবাধকতামূলক নীতি, অর্থাৎ "আমি বল্‌ছি সুতরাং তুমি কর্‌তে বাধ্য"—এ রকম ব্যবস্থা না থাকাই ভাল। সন্তানের প্রতি বল-প্রয়োগের পক্ষে কোন যুক্তিই নেই। পিতামাতা এবং সন্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব ভাবই আদর্শ সম্বন্ধ হওয়া উচিত। অন্যায় ক'র্‌লে শাস্তি পেতে হবে, সুতরাং অন্যায় না করাই ভাল, এই ভাব নিয়ে অন্যায় থেকে বিরত থাকার চেয়ে আমার মতে অন্যায়কে অন্যায় মনে ক'রেই তাকে এড়িয়ে চল্‌তে শিক্ষা করা উচিত।

আমার প্রবন্ধ শেষ করবার পূর্ব্বে আর কয়েকটি কথা প্রত্যেক পিতামাতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। প্রত্যেক নরনারীই তাদের জীবনে এক একটি আদর্শকে বড় ক'রে স্থান দেন। তাঁদের সেই ঈপ্সিত আদর্শকে আপন আপন জীবনের এক-একটি প্রধানতম অংশ ক'রে তোলবার সুযোগ, সুবিধা এবং সময় সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। যে আদর্শকে নরনারী আপনার আয়ত্বের মধ্যে আন্‌তে পারলেন না, অথচ সেটাকে তাঁরা অত্যন্ত ভালবাসেন, এবং হয়ত প্রাণের চেয়েও বেশী দাম দেন, সেটাকে আপন আপন আত্মজ ও আত্মজার মধ্যে দ্বিগুণ ক'রে ফুটিয়ে তোলবার একটা স্বাভাবিক প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মনকে সর্ব্বদাই উদ্বেলিত ক'রে তোলে। কিন্তু এখানেও বাধা আছে যথেষ্ট। তাঁরা যে সন্তানের মধ্যে দিয়ে

আপন আপন আদর্শকে নির্ব্বিবাদে গড়ে তুলবেন, সকল সময় এমন হয় না। এমন ক্ষেত্রের অভাব হয় না, যেখানে দেখা যায় সন্তান এবং পিতামাতার আদর্শ বিভিন্ন প্রকারের। পূর্ব্বে যে মহীয়সী মহিলার কথা লিপিবদ্ধ ক'রেছি, এখানেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে যুক্তিটাকে ভাল ক'রে পরিষ্কার করে দিতে চাই। এই মহিলার চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি মনে ক'রতেন যে চিকিৎসার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর যতখানি উপকার করা যায় এমন আর কোন কিছু দিয়েই নয়। তাঁর হৃদয়ের একান্ত কাম্যধন ছিল যে তাঁর পুত্র সাইমন (বর্ত্তমানে স্যার) ডাক্তার হয়। স্যার সাইমন কিন্তু ডাক্তার হ'তে চাইলেন না। তিনি যে ভবিষ্যতে আইনজ্ঞ হবেন তার ছায়া তাঁর চরিত্রের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছিল। এটা তাঁর হৃদয়কে যথেষ্ট পীড়িত ক'রতো, কিন্তু সেটাকে তিনি কোন দিন বাহিরে প্রকাশ হ'তে দেন্‌নি। তিনি বলেন,—এই ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা তাঁর নিকট যতই যাতনা-দায়ক হোক্ না কেন, সমস্তটাই তিনি নির্ব্বিবাদে নিজের মধ্যে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেন যে সন্তানের পছন্দের উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করবার অধিকার পিতামাতার নেই। সন্তান নিজের রুচি অনুযায়ী যে দিক্‌কে বেছে নেবে, সেটাকেই আপনার আদর্শ মনে ক'রে নিয়ে তাকেই সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য পিতামাতার সমস্ত শক্তি এবং সামর্থ্য নিয়োজিত করা উচিত।

আমাদের জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান দুরবস্থা বিনা কারণে হয়নি। সন্তানের প্রথম শিক্ষা মাতার কাছে যতখানি হওয়া সম্ভব, পিতার কাছে ততখানি নয়, কারণ শৈশবে এবং কৈশোরে সন্তান যতখানি মাতার সঙ্গ পায়, পিতার সঙ্গ ততখানি পায় না। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অবজ্ঞার দ্বারা আমাদের সমাজ এ যাবৎ যত পাপ সঞ্চয় ক'রেছে, নানাদিক দিয়ে তাকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হ'য়েছে এবং হ'চ্ছে। মেয়ে জাগরণের যে প্রবল বন্যা আজ এসেছে, তা আমাদের গত জীবনের সমস্ত মলিনতা ধুয়ে দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের যে আবার অম্লান শুভ্র ক'রে তুলবে, সে আশা আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমার হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করি।

সোনার কাঠি-রূপার কাঠি

শ্রীমতী—দেবী

সুদূরের উদ্দেশ্যে

সুপ্রিয়ার মা ভাইরা গেলেন সেই দূর অম্বালায়,—সুপ্রিয়া ফিরে এলো বোর্ডিংএ।

ওদের বংশে ওদের বাড়ীতে মেয়ে বোর্ডিংএ রাখা, মেয়ের পরীক্ষা দেওয়া, পাশকরা, মেয়ের অত বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে না হওয়া প্রথমও নতুনও। কিন্তু কেন যে কি জন্য যে তা করলেন তা' স্পষ্ট কেউই কারুকে বল্লেন না, অথচ একটু অস্পষ্ট হ'য়েও তা' রইল না। মনের ভেতর সবাই জানলেন, অজিত পছন্দ করে। যেন অজিতরাও তাই বুঝলে।

স্কুল থেকে ফিরে রমা কোনো দিন বলে 'দাদা, আজ ওর মুখটা এমন শুকনো দেখলাম!' ভাই বোনে গল্প করে ওদের। হয়ত কোনোদিন মাকে ঠাকুমাকে বলে, 'তোমরা ওকে একদিন—ছুটীর দিনে নেমন্তন্ন করনা ঠাকুমা?'

মা ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইলেন। পিতামহী অত লক্ষ্য করেন না, অন্য মনে বলেন, 'আচ্ছা'।

কিন্তু নিমন্ত্রণ করা হ'য়ে আর ওঠে না।

আর অজিতও কিছু বলতে পারে না।

ট্রেণে পৌঁছে দেবার দিন ওরা ভাই, বোনেও গিয়েছিল অন্য আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে।

সুপ্রিয়ার বিষণ্ণ নীরব বিদায় নিয়ে চলে আসাটা ওর মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা এলো, তারপর ছুটী।

রমা বল্লে, 'ঠাকুমা, ওকে ওর দাদা নিতে আসবেন, তোমরা একদিন খেতেও বল্লে না, আনলেও না, কি ভাববে বলত ওরা?'

'ভাববে আবার কি? তোর এককথা!' উষ্ণস্বরে মৃদুকণ্ঠে মা জবাব দিলেন শাশুড়ীর শ্রুতিগোচর না হবার মতন করে।

ঠাকুমা বল্লেন, 'তা' নিয়ে আয় না একদিন'।

তারপর মৃদুহাস্যে বল্লেন, 'কি বলা যায় যদি আসেই ঘরে—তাহলে আগেই অমনি আসবে? —একেবারে বরণ করে আনবি!'

রমা মার কথায় রেগে গিয়েছিল, বল্লে, 'হ্যাঁ, ভারি তো বিয়ে, তার দু'পায়ে আল্‌তা। বিয়ে হচ্ছে কিনা তারি ঠিক ঠিকানা নেই! আমার বন্ধু বলেই আমি বলছিলাম। থাক্‌গে'।

রমা চলে গেল।

মা আর পিতামহী—নিমন্ত্রণের দিন ভাবতে, বলতে করতে পাঁচ সাত দিন গেল।—

রমা খবর নিয়ে এলো, ওর দাদা এসে কোন মামার বাড়ী না কোথায় উঠেছেন, সুপ্রিয়া সেই দিনই রাত্রের গাড়ীতে যাবে।

তারক এসে অজিতের সঙ্গে ও অজিতদের বাড়ীর সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে গেল।

অজিতের পিতামহী নানাবিধ হা-হুতাশ বিলাপ করে কথা কইলেন, শেষকালে বল্লেন, 'দেখ, কবে আছি না আছি এইতো সব ব্যাপার? তা' তোমরা আসছ কবে?'

অর্থাৎ ওরা যখন পাত্রীপক্ষ তখন ওরা ওঁদের প্রাপ্য যথোচিত তোষামোদ এবং তৈলদান যথারীতি কেন করবে না। ওরাই বলবে, 'আপনারা কবে দয়া করবেন' 'আমাদের যে কি হল,' 'আমার দায় ইত্যাদি। বিয়ে না হয় দেওয়া যায়, কিন্তু ওঁদের অতটা ঔদার্য্য সত্ত্বেও (এরকম সোজাসুজি মেয়ে নেওয়া) ওরা যে খোসামোদও করবে না তার কি মানে?

তারক ভালমানুষও ছেলেমানুষও, সে বল্লে, 'এখন আর ছুটী কই—কি ক'রে আর আসব? আর সতি [illegible]পনার শরীরও খারাপ দেখছি।'

[illegible]ত্র পক্ষরা—যারা আশেপাশে ছিল, তারা ওর নির্ব্বুদ্ধিতায় চটল, এবং আর একটী কথাও ওবিষয়ে কইবে না স্থির করলে।

পিতামহী আর একবার দুবার ইঙ্গিত করে বল্লেনও—'ও আর পড়বে কিনা, আর কোথায় পড়বে ইত্যাদি।'

তারক নির্ব্বোধের মতনই—সে কথাতেও কিছু বল্লেন না। প্রাইভেট পড়বে—এই সব বলে।

ট্রেণের সময় হ'য়ে এলো।

রমারা গেল স্টেশনে দেখা করতে।

সুপ্রিয়া অজিত অপ্রস্তুত ভাবে দুএকটা কথা কইলে। তারপর হাজার মাইলের উদ্দেশে গাড়ী ছেড়ে দিলে। আজন্ম কলিকাতা-বাসিনী শ্যামা বাঙ্গালা দেশের মেয়ের চোখের সামনে থেকে শ্যামা জননীর পল্লব-ঘন স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু, মধুর শান্তশ্রী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তর তর করে সরে ভেসে গেল।

তারপর কখনো রুক্ষ শ্যামশ্রী বন অরণ্যের মাঝ দিয়ে, ধূসর ঊষর মুক্ত প্রান্তর বনভূমির মধ্য দিয়ে, কখনো বা ছোট ছোট পাহাড়ের পাশ দিয়ে সুপ্রিয়া আর তারক দুদিনেই গন্তব্য জায়গার কাছাকাছি এসে পড়ল।

পিতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে এবারে সুপ্রিয়ার যেন আরও কোন নিবিড় মমতার বন্ধন, কোন্ জননীর স্নেহনীড় ক্রোড়, শততুচ্ছ ঘটনায় ঘেরা তার চেয়ে তুচ্ছ মধুর স্বপ্ন যেন সবেরি বিয়োগ হ'ল।

ভাববার পক্ষে—সুপ্রিয়ার বয়স বেশী হয় নি, কিন্তু অনুভবের দিক দিয়ে তার মনের ঘুম ভেঙ্গে ছিল।

দ্রুতগামী ট্রেণের মধ্যে বসে সংখ্যাহীন দেশ গ্রাম নগর পল্লী ছাড়িয়ে যেতে যেতে অন্য মনে তীব্র রৌদ্রভরা মুক্ত প্রান্তরের দিকে চেয়ে তার মনে হতে লাগল, যেন কোথায় কোন্ অনির্দ্দেশ্য যাত্রার পথে সে চলেছে।

প্রতিভা মল্লিক

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল সব বেরুলো। সুপ্রিয়া রমা সকলেই ভাল করে পাশ করেছে। রমা কলেজে ভর্ত্তি হ'ল। আর তাদের কলেজে পড়তে এলো প্রতিভা মল্লিক।

তার বাপ মফঃস্বলের কোন এক জায়গার সরকারী বড় ডাক্তার। ছয় ভাইয়ের একবোন। রং বেশ ফরস্া, মুখখানি ভালো, কাপড়-চোপড় সাজসজ্জা ততোধিক ভাল রকমের। পাশও ভাল রকমেই করেছে। বাপ বলেন, পড়বে। বি-এ পাশ করে কিংবা আই-এর পর বিয়ে হবে। মা ভাবেন, এইবারে সম্বন্ধ করি, এই দলের ঘরের মেয়ে। যাদের তাড়াও নেই, অথচ সখও হচ্ছে বিয়ে দেবার।

সম্বন্ধও তার এগারো বছরে এসেছে এক সতর বছরের বড়লোকের ছেলের সঙ্গে; চোদ্দ বছরে এসেছে আর এক বড়লোকের বিদ্বান্ ছেলের সঙ্গে; তারপরে পনরো ষোলো, সতেরো সকল বছরেই সমানেই রকম রকম ঘরে রাজ্যের সম্বন্ধ এসেছে।

কিন্তু ওর বাবার মাথায় ফুল পড়েনি। কুলোকে বলে, মেয়ের বাবার আবার এত জাঁক কিসের? এমনি করতে করতে সে কলকাতার কলেজে: পড়তে এলো, কোন জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে। সে যাই হোক, সে কিন্তু ঐ সম্বন্ধ আসার চোটে অনেক-কিছু কথা নিজের সম্বন্ধে জেনে বুঝে নিয়েছিল।

অর্থাৎ ওর যে রূপ আছে, ওর বাপের অবস্থা ভালো, ওযে সাধারণ মেয়ের চেয়ে লেখা-পড়া শিখেছে এবং শিখছে ইত্যাদি ইত্যাদি :—

কলকাতায় পড়তে এলে দেখতে দেখতে সতীর্থ মেয়েরাও সে কথাগুলো জানলে কতকটা

এমন সময়ে রমার সঙ্গে পরিচয় সূত্রে বেরিয়ে পড়ল প্রতিভার মা যে রমার মার বকুলফুল। যেহেতু রমার মার দিদির ননদের মেয়ে প্রতিভার মা, সেইজন্যে ছোট বেলার কদিনের ভাব আলাপে তাঁরা পরস্পর বকুলফুল পাতিয়েছিলেন, এতদিনে সেই বকুল বন্ধুত্ব পুষ্পের যে সৌরভটুকু আজো মরেনি, হঠাৎ রমার মা ও প্রতিভার মায়ের মেয়েদের পরিচয় আলাপে সেটা সুবাসিত হয়ে উঠ্‌ল।

সম্বন্ধ ঘরের মেয়ে, তার ওপর সুন্দরী, আবার লেখাপড়া, বাড়ীর সকলে মেয়েরা—শতদল, কমলা, অজিতের ভাজেরা, মা তো বটেই, সকলেই তাকে দেখা করবার জন্য আলাপের জন্য উৎসুক হ'য়ে উঠলেন।

সুন্দর মুখখানি হাসিতে ভরে, অকৃত্রিম গর্ব্বের আনন্দে লজ্জায় বিকশিত মুখে প্রতিভা এলো।

কাপড় চোপড়, শ্রীশোভা তো আছেই, তারপর গান।

শ্রোতারা অন্তরালে, শ্রোত্রীরা সুমুখে—সবাই মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। এদের সেকেলে বাড়ীতে রমা পড়েছে এবং স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে এই না ঢের!

আর প্রতিভা!

না, মেয়ের মত মেয়ে! ওর বাপ যে কি করেছে আর না করেছে, আর কি আশ্চর্য্য মহিমা সংঘটন হয়েছে তার!

তারমধ্যে গান আরম্ভ হ'ল। তা' আবার শুধু গলায়। বাজনা না হ'লে গাইতে পারার আভিজাত্যটুকুও সে মৃদুহাস্যে জানালে, ওর বাবা বলেন, মেয়েদের হয় শুধু গলায় গান গাওয়া, নয় কোনো তারের যন্ত্রের সঙ্গে গান গাওয়াই উচিত, গলা খারাপ হয় না। ও একটু একটু সেতার বাজাতে শিখেছে আরও শিখবে!

শ্রোত্রীরা দর্শিকারা অবাক হয়েই থাকে।

রমার মা মুগ্ধ হয়ে বল্লেন, 'দেখেছ মা-যেমন রূপ তেমনি গুণ, কি ভালো মেয়েটী!'

শাশুড়ী বল্লেন, 'খাসা! বড় সুবুদ্ধি মেয়েটী।'

ওঁরা প্রতিভাকে যাবার সময় সময়ে অনুযোগ করলেন, ওর মা কেন এখানে এলে দেখা করে না।

ঝরা বকুলের সৌরভ নতুন হয়ে টাট্‌কা ফুলের মত অকস্মাৎ সুদূরবর্ত্তিনী বহুদিন বিস্মৃত দুটি সখীর মনের আঙ্গিনা সুরভিত করে তুল্লে।

সব কথার মধ্যে যে কথাটা কেউ বল্লেনা, অথচ সবাই ভাবলে, সেটা হচ্ছে প্রতিভার সঙ্গে সুপ্রিয়ার তুলনা।

সাবিত্রী

পূজার ছুটী এসে পড়ল।

অজিত আর নিশীথ বেরিয়ে পড়্‌ল বিদেশের উদ্দেশে।

সবাই বল্লে, 'কোথা?—পুরী?—মাদ্রাজ?—দক্ষিণে নয়?'

কোথায়?—পশ্চিমে?

ওরা বল্লে 'কোথায় কে জানে।'

যারা প্রশ্ন করে, তারা ওদের ইচ্ছামত আরো বোকা সেজে জিজ্ঞাসা করে—'কোথায় পাঞ্জাবে? কাশ্মীরে?'

ওরা বলে, 'ঠিক করিনি, যেতে পারি!'

যাই হোক, ওরা এখানে ওখানে পাঁচ সাত জায়গায় ঘুরে কাশ্মীরে নয়, রাজপুতানার উদ্দেশ্যে বেরুলো। এবং আজমীরে এসে পৌঁছল।

কিছুদিন হ'ল, সুপ্রিয়ার দাদা তারক আজমীরে বদলী হয়েছেন।

মরুভূমি পাহাড়ের ধূসর বালির প্রান্তরের দেশ তখন বর্ষার সামান্য একটু প্রসাদ পেয়ে শ্যাম হয়ে উঠেছে। বাংলার মত সর্ব্বশ্যাম নয়, বাবলা ভরা প্রান্তরের বালিতে, মাঠে, সুদূর গিরি পর্ব্বতে, রৌদ্রের সে তীব্র জ্বালাভরা ভাবই যেন গেরুয়া-পরা শ্যাম হাসিমুখ উদাসীন বৈরাগ্য স্নিগ্ধস্নেহে সবার পানে চেয়ে আছে।

আনা সাগরের সামনের পাহাড়ে বেশ শ্যাওলা পড়েছে। পাহাড়ের কোলে আনা সাগর থৈ থৈ জলে ভরা। আশ্বিনের প্রথম, তখন রোদ্দুর মধুর হ'য়ে উঠেছে, বেলা ছোট হ'য়ে এসেছে। সকালখানি যেন কোমল মাধুর্য্যে অপরূপ, এমন সময়ে তারকদের বাড়ীর সামনে অজিতদের গাড়ী এসে দাঁড়াল।

বিস্ময়ে, আনন্দে স্নেহ ভরে বাড়ীর লোকেরা অতিথিদের অভ্যর্থনা করে নিলে।

দেখাশোনার পালা এলো।

তারক বল্লে, 'আমার তো সময় নেই তোমরা তোমাদের সঙ্গে মাকে খুকীকে ওদের সবাইকে নিয়ে যাও।'

তারকের বন্ধু সে দেশের আর এক ডাক্তারবাবু ছিলেন। তিনি বল্লেন, 'তাহলে আমার মাকে দিদিকেও আপনার মার সঙ্গে পাঠিয়ে দিই।'

অজিত হাসলে, বল্লে, 'তাহলে আপনাদেরও আমি নিয়ে যাব, সকলকেই দেখাব। সে বরং গর্ব্বের কথা হবে আপনাদেরও দেখিয়ে এনেছি।'

নিশীথ একটু হেসে বল্লে, 'যেতেন ওঁরা, যদি তেমন সুবহভার থাকতেন স্কন্ধে, তখন তোমাকে আর কষ্ট দিতেন কি!—কি বলেন বিভাস বাবু!'

বিভাস বাবু উচ্চহাস্যে সমর্থন করলেন।

তারক হাসতে হাসতে বল্লে, 'সেকথা আমায় বলতে পার না, আমার সুখবহ ভারটী তোমাদের আমি অনায়াসে দিচ্ছি।'

অজিতের পানে চেয়ে নিশীথ একটু হাসলে,—ভাবটা, তোমারো তো সুখবহ ভারের আভাস খানিকটা পাচ্ছ—মন্দ কি!—

ডাক্তার সামনে ব'লে আর কিছু বল্লে না।

মেয়েদের কপালে সাবিত্রীর সিঁদুরের রাঙ্গা ফোটা; পরিশ্রম শ্রান্তিতে মুখ আরক্ত; অপরাহ্ন বেলার রক্ত সবিতা সাবিত্রী পাহাড়ের পাশে হেলে পড়েছেন; পশ্চিমটা রাঙ্গা হয়ে এসেছে; পূবের প্রান্তরে বালির ওপরে পাহাড়ের ছায়া বাবলার জঙ্গলে ছায়া ঘন হয়ে পড়েছে; ওরা সব নেবে এলো।

যাত্রী পথিকদলের হাসি পরিহাস, আলাপ গল্প, সহজ কথাবার্ত্তা, কখন পরিচয়ের লজ্জা, মেয়েদের মুখে তার আভাসখানি মাত্র রেখে চলে গেছে,—জড়তা অপ্রস্তুত ভাবটা সহজ করে দিয়ে।

সুপ্রিয়ার মা সকলকে সিঁদুর পরিয়ে সুপ্রিয়ার কপালে একটা বড় ফোঁটা টিপ পরিয়ে দিলেন।

নাববার পথে বিভাসবাবুর বোন সহাস্যে বল্লেন সুপ্রিয়াকে, 'তুমি কবে লোহাটা পরছ ? এবার পরে ফেল!'

মৃদু হ'লেও কথাটা সকলেরই কাণে গেল। রাঙ্গা ফোঁটাপরা সুপ্রিয়ার দিকে চেয়ে,—নিশীথ বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু হাসলে।

বিভাসবাবু একবার সুপ্রিয়ার মুখের দিকে চাইলেন শুধু।

ওঁরা কেউই জানেন না ওদের সঙ্গে এদের কি সম্বন্ধ হতে পারে।

সুপ্রিয়ার কাণ লাল হয়ে উঠল।

শ্রান্ত যাত্রিনীরা অনেক পেছিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এলো। সূর্য্য তখন একেবারে ডুবে গেছে।

পার্ব্বত্য তীর্থের পথ শেষ করে ওরা যখন গাড়ীতে উঠল্ তখন তীর্থপথ সমস্ত সন্ধ্যার ক্লান্ত গাম্ভীর্য্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

আঁকা বাঁকা পথ দুধারে পাহাড় রেখে, কখনো একধারে পাহাড়, বাবলা জঙ্গল, অজানা গাছে আগাছায় শ্যাম ঘন বন, পরিচ্ছন্ন ধূসর প্রান্তর পাশে রেখে গাড়ী আজমীরের সহরের পথে মোড় নিলে।

সুপ্রিয়া নির্ব্বাক দৃষ্টিতে বাইরের মুক্ত আকাশের নীচে অসম অপূর্ব্ব রুক্ষ সৌন্দর্য্যভরা সন্ধ্যারাত্রির দিকে চেয়েছিল।

ক্রমশঃ
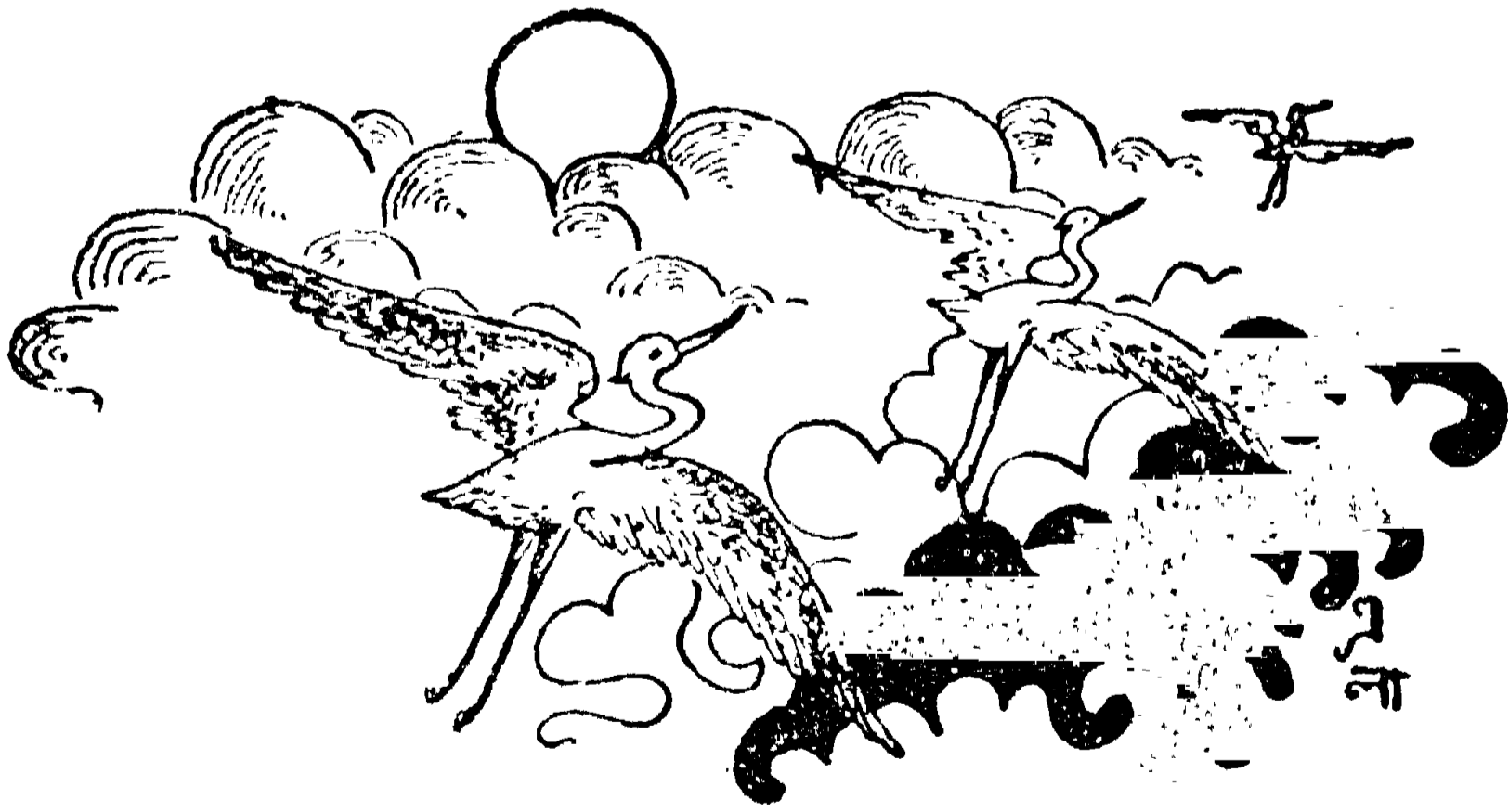
দাবী

শ্রীসরযূ সেন

বারে বারে আর তোমার কাছে,
মানবো না হার মান্‌বোনা,
ধরা আমায় দিতেই তোমার হবে,
মিথ্যা তোমার ছলনাতে,
দুঃখ হিয়ায় আন্‌বোনা
দহন জ্বালা, তাও এ বুকে স'বে।

চিত্ত তোমার কভু, ওগো!
চঞ্চলতার অন্তরালে,
শোনে আমার গোপন ব্যথার তান,
পাষান তব প্রানের কোণে,
করুণ ধারা যদি ঢালে
সেদিন হবে দুঃখ অবসান।

লক্ষ ছবির মোহন শোভা,
যদিই তোমার হৃদয় মাঝে
লাগায় মধুর ফাগুণ শিহরণ,
মৃন্ময়ের এ স্নিগ্ধ শিখায়
জ্বল্‌বে ওগো জীবন সাঁঝে,
সত্যজয়ী, মিথ্যা সমাপন।

সেদিন তুমি চিন্‌বে আমায়,
মোহের বাঁধন প'ড়বে খুলে
দেখ্‌বে সেথায় ঘূর্ণিবায়ু নাই,
আসবে শান্তি, সুপ্ত রূপে—
উগ্র কঠোর গর্ব্বে ভুলে
বক্ষে সেদিন হবে আমার ঠাঁই।

জন্ম-শাসন আলোচনা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

গত শ্রাবণের জয়শ্রীতে শ্রীসুধাংশু গুপ্তের জন্ম-শাসন সম্পর্কীয় শ্রীজগৎ মিত্রের ঐ বিষয়ে লেখার আলোচনা বেরিয়েছে। নবশক্তির চয়নে শ্রীশচীন সেনের লেখাও দেখলাম।

জগৎমিত্রের লেখাটী ১৩৩৮ পৌষের স্বদেশে বেরিয়েছিল, আর জ্যৈষ্ঠের জয়শ্রীতে চয়িত হয়েছিল।

লেখাটীর ভাব আমেরিকার ডেন্‌ভারের বালক অপরাধীর বিচারক বেন লিণ্ডসের রচনা থেকে খানিকটা নেওয়া হয়েছে।

জয়শ্রী এবিষয়ে মেয়েদের আহ্বান করেছেন আলোচনা করতে।

মেয়েদের বিবাহিত জীবনের দিক বা মাতৃত্ব ও সন্তান নিয়ে আলোচনা ওভাবে এদেশে এখনো মেয়েরা নিজেরা বড় একটা করে না। হয়ত পরিজন স্বজনদের সঙ্কোচ করেন, কিম্বা গোড়ার দিকেই কিছু হয় না, যেমন শিক্ষায় জীবিকায়; হয়ত তেমন ভাববার মতন শিক্ষা সুযোগও নেই তা' ওসব তো পরের কথা। স্বাধীনতার সংজ্ঞা জার্ম্মাণ দার্শনিক নিট্‌শের মতে, নিজের কাজের দায়িত্ব নিজে নিতে পারা। মেয়েরা সেই নিজের আর নিজের জীবনের কোনো প্রয়োজনের কাজের—অন্নবস্ত্রের কিছুরই ভার যখন নিজেরা নেন না, নিতে পারেন না, তখন হয়ত যা'তে (বিবাহিত জীবনে) সম্পূর্ণ নির্ভরতাই তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, তা নিয়ে নিরর্থক আলোচনা করতে চা'ন না ভরসাও করেন না। যে খেতে পায় না, সে প্রথমেই অট্টালিকার প্রাসাদের স্বপ্ন দেখে না, অথবা যে পঙ্গু সে 'কেদার বদরীর' ধ্যান করে না। যাদের হাতে নিজের বলতে কিছুই স্পষ্ট নেই সমস্তটা ভাগ্যের পাশাখেলার ওপর ও খানিকটা পরিজনের নির্দ্দেশের ওপর, মুষ্টি ভিক্ষার ওপর নির্ভর করে, সে বিবাহিত জীবন ও তার সব নানা প্রকার সমস্যার কথা ভাববে কখন?

কেন না একমাত্র জীবন ধারণের ওপরই সমস্ত সমাজ আর মানুষ নির্ভর করে এটা সত্য, আর বাস্তব সত্য। যে সেই জীবনটা বাঁচায় অন্যের জীবিকার সাহায্যে ও মতের ওপর, তার মতামতই বা কি? আর নেবেই বা কে সে মত?

ভদ্রতা বা পুস্তকোল্লিখিত ব্যবহারিক নীতি-বাক্য অবশ্য পৃথক জিনিষ।

তবু আলোচনা করতে বসে এই আলোচনা আরম্ভ হওয়ার আগে কথা সব প্রথমেই আমাদের মনে হয়—সে হচ্ছে মেয়েদের স্বভাব ও তার প্রবণতা। জগৎ বাবু যে আমেরিকা লেখকের লেখা নিয়ে আলোচনা ও অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাঁদের দেশের সাধারণ মনোভাব কি ও কি সংস্কারে গড়া, আর তাদের সর্ব্ব-সাধারণের ঐ একই ধরণ কিনা আমরা জানিনা মেয়েদের সাধারণ

হিসেবে-আর আমাদের দেশের ও বটে। তাতে আমাদের মনে হয় এতে যুক্তির দিকই শুধু ভাববার নেই মনের দিকও আছে; আর সে মনের দিক সন্তান, সমাজ সংস্কার সবদিক দিয়েই ভাববার। তা ছাড়াও পাশ্চাত্য বা অত্যধিক অগ্রসর জাতের গড়পড়তা কত জনের মনোভাব কোনদিকে বয় সব বোঝা যায় না, এবং তা এখনো যখন পরীক্ষাধীনই আছে তখন তার সম্পূর্ণ বিচারের দিন এখনো আসেনি।

প্রায় সাধারণ মেয়েদের জীবনে সবদেশেরই সবচেয়ে বড় ঘটনা বিবাহ; শিক্ষা, জীবিকা, কৃতিত্ব, কুল, জন্ম কিছুই তার কাছে দাঁড়ায় না, দাঁড়ানের প্রথা নেই। আর এই বিবাহ ব্যাপারটা প্রায়ই মেয়েদের দায়, দায়িত্ব, প্রয়োজন ঘাড়ে করে নেয়। আর যেমন ষোলো আনা নেয়, তেমনি সবদিক দিয়ে এমন ভাবে তাকে ঐ ব্যাপারটার সঙ্গে মিশিয়ে নেয়, যে, সাধারণতঃ তার আলাদা অস্তিত্ব থাকে না, এবং থাকলেও চলে না। পৃথক অস্তিত্বে তার প্রয়োজন থাকে কিনা—সেকথা যাক্, আসলে সে অস্তিত্ব থাকেনা এইটেই সত্য। এবং এই বিয়ে থেকেই যতসব অন্য ঘটনা আর অবস্থার উদ্ভব হয়, কাজেই মেয়েদের জীবনে এর স্থানই প্রধান। প্রথমে বিয়ে তারপরে মাতৃত্ব, তার পরে পূরোপূরি সংসার যাত্রা, গৃহ—নীড়—ঘরকরণা, যাই হোক একটার পর একটা আছেই।

এবং সমস্যাও এই বিবাহ, মাতৃত্ব, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিধবা ও বিপত্নীক বিবাহ, বহু বিবাহ, অবিবাহিত জীবন ও ব্রহ্মচর্য্য সব দিকেই আছে। এখন আলোচ্য বিষয়ে লেখকদের মতামত দেখা যাক।

সুধাংশু বাবুর মতে বিয়ের ব্যাপারটীকে বন্ধন-মূলক কিম্বা বন্ধন-প্রধান করে রাখা উচিত;

জগৎবাবু বনাম বেন লিণ্ডসের মতে বিবাহটা ফাঁসের মত গ্রন্থি দিয়ে মুক্তি প্রধান করে রাখা উচিত; শ্রীযুক্ত শচীন সেনের মতে প্রেমের জন্যে বিবাহই বিবাহ, আর মিলনই বিবাহের বিশেষ অনুষ্ঠান, অন্য অনুষ্ঠানকে বড় করা অনাবশ্যক।

এঁদের নিজের নিজের দিকের প্রত্যেকেরই বলবার যা' আছে বলেছেন।

এখন আমাদেরও ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে দেখলে জিনিষটার ভালমন্দ পরে পরে দেখা যেতে পারবে।

বিবাহের ব্যাপারটা যদি মাত্র নর-নারীর মিলনেই কাব্যের মতন শেষ হয়ে যেত, তাহলে এইসব ছোট বড় জটিল কুটিল সমস্যা হয়তো কোনদিন জাগত না, অথবা প্রাকৃতিক জগতের মতন শুধু সাময়িক সংসার পাতিয়ে নিঃশেষ হ'ত, তাহলেও হয়ত প্রেমের সঙ্গে শৃঙ্খলের, ভালবাসার সঙ্গে বন্ধনের, দরকার হ'ত না। কিন্তু দেখা যায় ভবিষ্যত ভেবে মানুষ যে সব অনুষ্ঠান তৈরী করে বিয়ে তার একটা বিশেষ অনুষ্ঠান।

জজ বেন লিণ্ডসের মত হচ্ছে,—সামাজিক অনুষ্ঠান ও বন্ধন যেখানে মানুষের হৃদয়কে ও প্রাকৃতিক স্বভাবকে পঙ্গু করে রাখে তাকে না মানা; তাঁর বইখানি এই শ্রেণীর নজীর দৃষ্টান্তে

ভরা। তাঁর মতের মধ্যে বড় কথা এই, যে হৃদয়ের দিক দিয়ে যদি মিলন না হয় তো' বন্ধনে দরকার নেই, এবং সন্তানের দিক যদি বড় করা না হয়—তাহলেও তিনি ভাল মনে করেন না।

তাঁর আদর্শে সন্তান রক্ষা তথা প্রেমের বন্ধন এই বড় কথা। সন্তানযুক্ত অপ্রেমের বিবাহে তিনি সন্তানকে ভাল রেখে মুক্তিই নির্দ্দেশ করেন। মা বাপের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রেম-নিষ্ঠা, পত্নীপ্রেম পাতিব্রত্য, কোনো কিছুকেই তিনি বড় স্থান দেন নি, মনের প্রবণতার কাছে। তাঁর আদর্শ মানুষকে মানুষের দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করা, আর তার সেণ্টিমেণ্টকে দয়া করা। যেখানে ভুলই অপরাধ বা পাপ কিম্বা নিষ্ঠুরতা নয়,—সেখানে তাঁর পরামর্শ দয়ার দিকই নিয়েছে। আর সব অবস্থায়ই সর্ব্বত্রই শিশুকে তিনি সব চেয়ে বড় করেছেন। তাঁর মতে শিশুই ভবিষ্যৎ সমাজ।

তারপর আমাদের বিবাহের উদ্দেশ্য যে শচীন সেন বলেছেন সমাজের জন্য সেটা অনেকটা ঠিকই; বরং ওটাকে সংসারী হওয়া বলাই ঠিক। তাতে দেখা যায় - আমাদের দেশে পুরুষ বিবাহ করে সংসার ধর্ম্ম করবার জন্যে; আর মেয়ের বিবাহ হয় নিজের নিজস্ব করে একটা সংসার গড়ে তোলবার জন্যে। সে ক্ষেত্রে প্রথমে বিবাহ, তারপর সন্তান বা মাতৃত্ব, তারপর রীতিমত বন্ধন সামাজিক জীবন স্থরু হবে নিঃসন্দেহ।

আর ওদের দেশে হচ্ছে, প্রথমে পূর্ব্বরাগ, তারপর বিবাহ ও দাম্পত্য-নীড় রচনা। তারপরে যদি সংসার গড়ে ওঠে তো, তাহলেও সন্তানেরা স্ব স্ব প্রধান। আর না গড়ে তো বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনর্ব্বিবাহ, যাই হোক নানা রকম। ওরা পাখীদের মত নীড়ধর্ম্মী বলা যায়। ছেলেমেয়ে পৌত্র দৌহিত্র পরাশ্রিত গলগ্রহ শ্রেণীর ভাগে ভাগ্না, ভাজ ভাইপোদের স্থানের ভাবনা ভাবা ওদের নিয়ম নয়। তারা সবাই স্বাবলম্বী হতে বাধ্য। কাজেই সংসার বাঁধা আর ভাঙ্গা ওদেশে সহজ। দুদিক থেকেই সব প্রথমে মনে আসে মেয়েরা কি চান?

গোড়ার স্বভাবেই পুরুষে আর মেয়েতে তো বিরোধ। নব নব প্রমোদের খোঁজ করে বেড়াতে মেয়েরা এদেশে এখনো ভালবাসেন না। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতিতে নব নব প্রমোদের সন্ধান স্পৃহা স্বভাবতঃই আছে।

মাতৃত্বের যে বন্ধনের কথা জগৎবাবু তুলেছেন, তাকে স্বীকার করে নিলেও নিম্নশ্রেণীতে যেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যেও ও প্রবণতার অভাব আছে। মানুষের জীবনে প্রেমটা খুব বড় জিনিষ মানি, কিন্তু প্রেম ছাড়া যে সব অন্যবিধ বৃত্তি আছে, মায়া মমতা স্নেহ, সেগুলোও মেয়েদের জীবনে কম প্রধান নয়।

প্রেমের কথায় দেখা যাক্, প্রেম মানুষের জীবনে বিকাশ লাভ করে কিশোর কালের পরে থেকে; প্রায় প্রৌঢ়কালের আরম্ভ অবধি থাকে। আমি প্রবল মোহ মুগ্ধতার কথাই বলছি। জগৎবাবুও এই প্রেমের কথাই বলেছেন। তার আগে পরে তার তত ঝোঁক আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আকর্ষণী শক্তিও উভয়তঃ কমে আসে, প্রৌঢ়ত্বের পর সেই আগে বা

পরে যে সেণ্টিমেণ্ট থাকে, মা বাপকে ভালবাসা ও সন্তানকে ভালবাসা, বিশেষ করে সন্তানকে ভালবাসা, আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা যাকে প্রেমের রূপান্তরিত অবস্থাই বলেন, সেগুলোও মানুষের জীবনে কম প্রবল নয়। প্রত্যেক সম্পর্ক, বয়স ও স্বভাবে তার একটা বিশিষ্ট ক্ষেত্র থাকেই। প্রেম যে সময় সংসার যাত্রাহীন, বন্ধনহীন, নিতান্ত বি-দেহী অতনু-শূন্য অস্তিত্ব, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ হীন, নিঃসন্তান, তখনি তো তাতে সহজে বিচ্ছেদ আসে।

কিন্তু এ ধরণের ভালবাসার কথা জগৎবাবু বলছেন না। যে প্রেম মাদকতাময়—বা পূর্ব্বরাগ জাতীয়—তারই কথা তাঁর আলোচ্য।

পূর্ব্বরাগ যুক্ত বিবাহ, ও কি করে তা' সুচিরস্থায়ী বা দৃঢ় বন্ধন হবে এঁদের এই হচ্ছে বিতর্কের বিষয়।

পূর্ব্বরাগ যুক্ত মিলনের পরও যাতে সন্তানের ঝঞ্ঝাট পোয়াতে না হয়, যেহেতু এইটেই নারীর বন্ধনের কারণ এই হচ্ছে জগৎবাবুর প্রধান কথা। তাই তাঁর মত, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তার নিজেকে স্বাধীন ও মুক্ত রাখা। তাতে তার যথার্থ-প্রেমের যে বিবাহ তাই হ'তে পারে অথচ পূর্ব্ব দুর্ব্বলতার বা প্রেমের কোনো বন্ধন কিম্বা ফল না থাকতে পারে। এখানে দেখি, (১ম) বেন লিণ্ডসের মতেই তাঁর বইতে, যথার্থ প্রেম চিনতে গিয়ে অনেক সময়ে অনেকে অপ্রেমের বিবাহ করছে, আবার এ অপ্রেমের বন্ধন মুক্ত হতে গিয়ে আবারো অপ্রেমের বিবাহ যে কখনো না হয়, তা নয়।

সুধাংশুবাবুর মত হচ্ছে (ক) নরনারীর বন্ধনকে শিথিল করে দিলেই যতই দৃঢ়মূল পূর্ব্বরাগ বা অনুরাগ হোক সেটা খুলে বা খসে যাবার সম্ভাবনাই বেশী; অর্থাৎ তার ভিত্তি ছোট খাট ভাব সংঘাতেই নড়তে থাকবে। (খ) এই প্রেম বস্তুটা যে খুব 'কালচার' সাপেক্ষ তাও নয়। (গ) জন্ম নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সে হয়ত বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু অশান্ত বিবাহিত জীবনে সন্তান যেখানে থাকবে, সেখানে সে স্নেহের বন্ধন থেকে মুক্তি পায় কোথা হতে 'বিচ্ছেদ' করে নিলেও।

এ অনেক বড় সমস্যা, আর অনেক কথা; সাধারণ ভাবে আমাদের মনে হয় (১ম) বিবাহ বন্ধন খোলবার পথ এদেশেও দরকার আছে অনেক ক্ষেত্রেই; কিন্তু বিবাহিত সম্পর্কে শিথিলতা না থাকাই শ্রেয়। (২য়) নারীর পক্ষে মাতৃত্ব তার বন্ধনের কারণ হলেও, তার সে বন্ধনকে স্বীকার করে নেবার শক্তিও থাকুক। নব নব সুযোগের জন্য স্নেহের বন্ধনকে অস্বীকার না করা অনেক সময়ে ভালই। অত্যাচারিত-নির্য্যাতিত অপ্রেমের সম্পর্কে কিম্বা প্রয়োজনের ব্যাপারে, বিবাহ মুক্তি, বিচ্ছেদ, আবার বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্র থাকা যেমন দরকার, তেমনি নিজেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে সংযম শূন্য মিলনের বিবাহে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা-বিবাহ প্রচলন, মানুষের নৈতিক সামাজিক ও প্রেমের দিকেও ভাল মনে হয় না। পরীক্ষা বিবাহের দ্বারা চারিত্রিক দুর্ব্বলতা যে

আশ্রয় করবেনা তারই বা ঠিক কি ?—তা ছাড়া, এই বিচার বা পরীক্ষা বিবাহ এখনো ও দেশেই পরীক্ষাধীন তার শেষ বিচারের ফল কি কে জানে! যেখানে পরীক্ষা বিবাহের প্রথম কথা হচ্ছে সত্য প্রেমের সন্ধান, অথচ শেষ কথা দাঁড়াচ্ছে সাধারণতঃ সংসারের সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকা। এটা অনেক সময় সত্য।

এবিষয়ে মতামত আরও পাওয়া এবং আরও আলোচনা হওয়া উচিত। অনেকেই এতে বিশেষ করে ভাববার জিনিষ বলতে পারবেন হয়ত।

কিন্তু ভাববার কথা এই,—যে এই পূর্ব্বরাগ অনুরাগ ব্যাপারগুলি তরুণ মনোধর্ম্মেরই বিষয়, ও তার সীমা বাঁধাই আছে, চিরন্তনী নয়। তারুণ্য কেটে গেলে তারপর কি দাঁড়ায়? নির্ব্বাচন সম্ভব হয় কি ? পুরুষের ক্ষেত্র দেখি না হয় আর্থিক গুণের জন্য পুনঃ পুনঃ নির্ব্বাচিত হ'ন ; কিন্তু মেয়েদের তখন কি সম্পদ থাকে পরীক্ষার শেষে, প্রৌঢ়ত্বের আরম্ভ সীমায়? অবশ্য হয়ত এটা চরম দিক দেখা হ'ল, কিন্তু ভাববারও আছে। এ ছাড়া নারীর স্বাস্থ্য শ্রী হিসেবেও এতে ভাববার আছে।

শ্রীশচীন সেনের লেখাতে একটা বলবার আছে, যাদের দেশের কথা আমরা বলি, তাদের দেশের সব দিক দিয়ে সেটা পৌরুষে ব্যক্তিত্বে বিশিষ্টতায় ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করেছে, ফুটেছে ; আমাদের অবসাদগ্রস্ত জড়ধর্ম্মী নির্জীব দেশে নরনারীর সেই আকর্ষণ ধর্ম্ম সহজ না হয়ে কুশ্রী হয়ে ওঠে। প্রবলের যাতে শৌর্য্য আছে শ্রী আছে, দুর্ব্বলের সেখানে কিছুই মানায় না। বিশেষ করে আমাদের দেশের আচার লোকমত কিছুই ওর অনুকূল নয়।

পরিশেষে এই বিবাহ মাতৃত্ব তার আদর্শ সম্বন্ধে আরও আলোচনা হলে আরও মতামত পরিষ্কার দেখা যাবে।
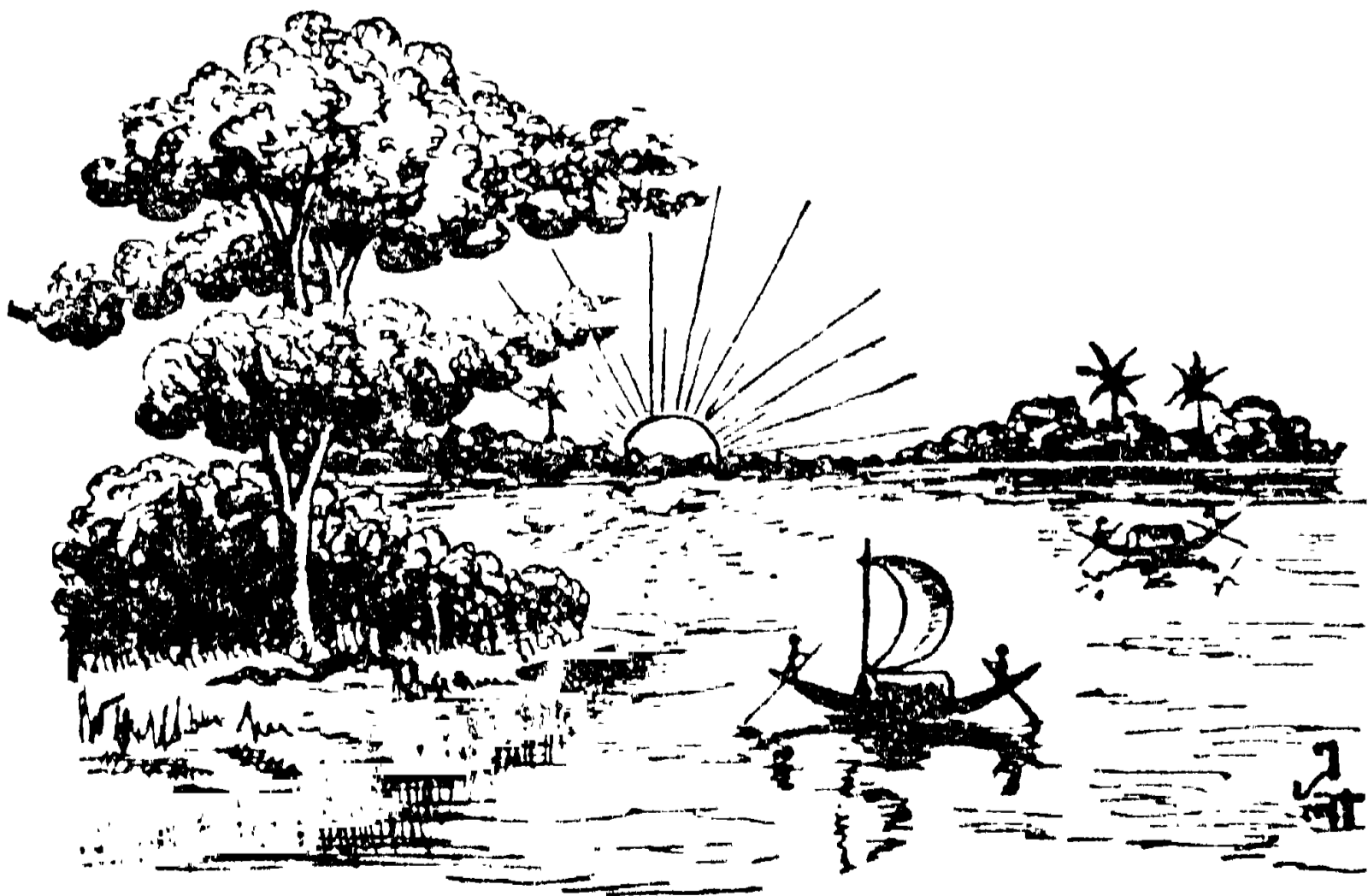
দেবতা ও মানুষ

শ্রীসুনীলকুমার ধর

আজকের এই নিত্য-নূতন পরিবর্ত্তন, আলোক-সন্ধান ও আবিষ্কারের যুগে ভগবানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও নির্ভরতা যে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এ কথা আর অস্বীকার করা চলে না। মানুষ আজ তাহার অ-দেখা বিধাতাকে অতিক্রম করিতে চলিয়াছে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, মানুষের শক্তি ও গতিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা বা রাখিবার পুরাতন সঙ্কীর্ণ রীতি-নীতিকে আজকে মানুষ আর বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। নিজের ক্ষমতার উপর মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাড়িয়াছে— এবং এই জন্যেই সে আজ বলিতেছে—প্রাচীনদের, ভীরুদের ভাঙ্গা মন্দিরে তাহাদের সনাতন দেবতা পড়িয়া থাক, তুমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ, আগাইয়া চলো, আরো—

তাই সে আজ বিদ্রূপের সঙ্গে প্রশ্ন করিতেছে—প্রার্থনা করিলেই যদি করুণা পাওয়া যায়, তবে নিঃস্ব গরীব অসহায় কৃষক চৈত্রের দিনে (বা অনাবৃষ্টির দিনে) নিজের ছোট শস্যক্ষেতটীর জন্য সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া, অশ্রু-অঞ্জলী দিয়া প্রার্থনা করিয়াও এক বিন্দু জল পায় না কেন?

নিশুতি রাতে নদীতে ঢল নামিয়া বা অজস্র-বর্ষণ যখন ঘুমন্ত মানুষ সমেত ঘর-বাড়ী ভাঙিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে, মানুষের ভবিষ্যৎ দিনের সম্বল ক্ষেতের শিশু শস্য চারাগুলি অসহায়ভাবে কিছুকাল মাথা সোজা রাখিবার চেষ্টা করিয়া একেবারে ডুবিয়া গেল—তখন কোথায় রহিল সেই ন্যায়পরায়ণ চিরকরুণাময় মানুষের ভাগ্য বিধাতা! একান্ত অসহায় ছোট ঘরের মানুষদের, ভীত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বুঝি তাঁহার চরণে পৌঁছিল না!

আকাশ ভাঙিয়া, পৃথিবীর চারি পাশে প্রলয়ের প্রচণ্ড ঢেউ তুলিয়া ঝড় যখন পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, মানুষের চির-সহায় বিধাতা ত' ঐ গৃহহীন পথের মানুষটিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। সে পথের উপরই মরিল!

এইরূপ বহু প্রশ্ন আজকের মানুষের মনে জাগিতেছে, এবং শুধু মনে জাগিতেছে না— এর কোন সদুত্তর না পাইয়া তথা কথিত ভগবান বা ভগবানবাদীদের বিরুদ্ধে সে অভিযান শুরু করিয়াছে। এ বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে এই কথা প্রথমেই মনে পড়ে, যে ভগবান নইলে মানুষের চলে না (ভগবানকে যদি মানিতেই হয়) এবং যাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার এতদিন কাটিয়াছে—তাঁহার বিরুদ্ধে এ অভিযান করিবার দুঃসাহস

তাহার কোথা হইতে আসিল এবং কেন আসিল ? আর মানুষের এই ভগবান-বিদ্বেষ বা ধর্ম্ম-বিদ্বেষ যদি একান্তই হঠকারিতা বা যৌবনের ক্ষীণায়ু নেশা বা ধর্ম্ম হয় তবে দিন দিন এই ধর্ম্ম-বিদ্বেষী অর্থাৎ আত্মবিশ্বাসীদের সংখ্যা এত বাড়িতেছে কেন ?

যাহারা আজ বলিতেছে—'Religion is the opium of the people' তাহাদের এই উক্তির উত্তরে বা প্রতিবাদে কি জবাব আজ ভগবান-বাদী বা ধর্ম্ম-অনুসারকরা দিতে পারেন ? এতদিন এই বিদ্রোহোক্তির প্রতিবাদে যে উত্তর তাহারা পাইয়াছে তাহাতে সন্তুষ্ট নয়। স্পষ্ট কিছু শুনিতে চায়। কিংবা যাহারা আজ বলিতেছে—আফিমের মত ধর্ম্মের নেশা এবং ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো সংস্কারের মোহ মানুষকে পঙ্গু নির্ভরশীল ও অকর্ম্মণ্য করিয়াছে নিজেদের দিকে তাকাইয়া তাহাদেরই বা আমরা আজ কি জবাব দিব ?

এই বিশ্বপ্রকৃতি যদি সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানেরই সৃষ্টি হয় এবং মানুষ হয় তাঁহার খেলার পুতুল—তবে মানুষের মনে সেই ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার এই দুঃসাহসই বা কেমন করিয়া রূপ নিল ? এই বিশ্বপ্রকৃতির একজন সর্ব্বময় এবং সর্ব্বক্ষম প্রভু আছেন, তিনি মানুষের সাধারণ দৃষ্টির অগোচরে থাকিলেও বিপন্ন মানুষের কাতর প্রার্থনা কখন অবহেলা করিতে পারেন না বা করেন না এবং এই বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি সৃষ্ট জিনিষের প্রতি তাঁহার মমতা, করুণা ও সমবেদনার অন্ত নাই এবং এই 'সৃষ্টি' রক্ষার জন্যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তাহার কার্পণ্য নাই,—এই বিশ্বাসের উপর ধর্ম্মের যে ভিত্তি তাহাকে আজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া যাহারা বলিতেছে—ভগবান বলিয়া কেহ নাই, মানুষের এই মন গড়া অলঙ্কার দেবতার চরণে মাথা কুটিয়া মাথা ব্যথা করা ছাড়া কোন লাভ নাই—অলক্ষ্যের শ্রীচরণে প্রার্থনা করা বা শ্রীচরণ উদ্দেশে অশ্রুবিসর্জ্জন, আয়ুক্ষয় ছাড়া আর কিছু নয়—এবং নিজেদের আবিষ্কৃত সত্যকে সামনে রাখিয়া তাহারা যদি ধর্ম্মের প্রথম সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ব্যঙ্গ করিয়াই বলে—The divine potter did mix and mould clay into the forms of men and women, and then breathe the breath of life into these forms'—তাহা হইলেই বা আজ কি বলিয়া প্রতিবাদ করিব ? এবং ভগবানের প্রথম সত্য ও ভগবানকে নায়ক করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম হন যখন একেবারে মিথ্যা ও ভূয়ো বলিয়া প্রমাণিত হইল তখন কেহ যদি আজ বলে ভগবান ও ধর্ম্মকে বাদ দিয়াও সে বেশ স্বচ্ছন্দে বাঁচিতে পারে এবং তাহার প্রতিবাদে কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই যদি সে বলে—হাজার হাজার বছর ধরিয়া মানুষ (পূর্ব্বতন) এই পৃথিবীকে সুন্দরতম পবিত্রতম ও নিরাপদ করিবার কত রকম চেষ্টাই ত করিয়াছে এবং এই জন্যই তাহারা দেবতা-দানব, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি কথা ও উদাহরণের সৃষ্টি করিয়াছে, নানা অসম্ভব ও চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ দিয়া লিখিয়াছে, অসংখ্য ধর্ম্মপুস্তক দেবালয় ও কারাগার তৈরী করিয়াছে—ধর্ম্ম অনুসারকদের নানা

উপায়ে পুরস্কৃত করিয়া ও লোভ দেখাইয়া ধর্ম্মবিরোধীদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই—জীবন্তে পুড়াইয়া মারিয়াছে পর্য্যন্ত; ভাল কথা, মিষ্ট কথা বলিয়া ভয় দেখাইয়া কতরকমেই না মানুষকে ন্যায়পরায়ণ, পরিশ্রমী ও ধার্ম্মিক করিবার চেষ্টা করিয়াছে—একখানি তাহারা যতদূর সম্ভব মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিবার কোন ত্রুটি করে নাই কিন্তু এ কথা কি অস্বীকার করিতে পারিবে—refinement এবং তাহার সমস্ত ধর্ম্মবুদ্ধির আড়ালে আজও মানুষ তেমনি হিংস্র, লোভী ও পাপী আছে—তাহার এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই—তাহার এই দীর্ঘ অনুযোগের উত্তরেই বা কি বলিতে পারি!

যাঁহারা বলে মানুষের চেয়ে বড়ো কেহ নাই এবং আত্মবঞ্চনার চেয়ে বড়ো পাপ নাই তাহাদের তুমি কোন্ কথার দোহাই দিয়া ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব স্বীকার করাইবার চেষ্টা করিবে? এবং যাহারা বলে—কাহাকে বঞ্চিত না করা, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে তাহার প্রাপ্য অংশটুকু দেওয়া দেবতার ষোড়শোপচার পূজার চেয়ে অনেক বড়ো পুণ্য, আজকের দিনে কোন্ সাহসে তুমি তাহাদের এ কথার প্রতিবাদ করিবে?

এবং তাহারা যখন বলে—পূর্ব্ব পুরুষের ধর্ম্মভীরুতা স্ব-ধর্ম্মের দোহাইএর জন্যেই মানুষের আজকের এই অসংখ্য অভাব অভিযোগ এবং ধর্ম্মের দোহাই দিয়াই পাপ ও ভিক্ষা-বৃত্তি আজও বাড়িয়া চলিয়াছে, কারাগার ধর্ম্মশালা বা হাসপাতালে আজ আর ভীড়ের অন্ত নাই—তখন আমি ইহার প্রতিবাদে একটি কথা বলিতে পারি নাই। সত্য কথা বলিতে কি—ধর্ম্ম কি ভগবান কেমন এবং ইচ্ছামত বা আমাদের প্রয়োজন মত কোন কাজ বা সাহায্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে কিনা এ বিষয়ে একটা জন্মগত ভয় বা সংস্কার ছাড়া আর কোন ধারণাই আমার নাই—এবং আমার মত লোকের সংখ্যাইত পৃথিবীতে বেশী! তুমি হয়ত আমার এই স্পষ্ট স্বীকার করিবার সুযোগ লইয়াই আমাকে বিদ্রূপ করিবে, কিন্তু আমাকে এমন কোন কথা লিখিবার পূর্ব্বে এবং পরের ধার করা ধর্ম্মের বড়ো বড়ো বুলী আওড়াইয়া ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবার আগে একবার আপনার মনে মনে আমার এ কথাটা আলোচনা করিয়া দেখিয়ো। আমাকে আঘাত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আলোচনা করিও না বা আমার অর্ব্বাচীনত্ব প্রমাণ করিবার উত্তেজনায় একধারে আমার কথা আর একধারে পুরনো পুঁথির কথা রাখিয়া ওজন করিয়া দেখিয়ো না—তাহা হইলে তুমিও ভয় ও সংস্কারের মোহ কাটাইতে পারিবে না। আজকের দিনে ভক্তির চেয়ে দুঃসাহসের প্রয়োজন বেশী! প্রথমে অস্তিত্ব তাহার পর ধর্ম্ম।

সেদিন কে যেন বলিতেছিল—ধর্ম্ম নির্ভরতার গণ্ডী, অন্ধ বিশ্বাস ও জন্মগত সংস্কারের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া যতদিন না পৃথিবীর প্রত্যেক ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করিবে এবং অলক্ষ্যের দেবতার মোহ কাটাইয়া মানুষ নিজেকে বুঝিবার চেষ্টা করিবে—ততদিন অসংখ্য অবত

আসিয়াও মানুষকে পাপের প্রলোভন হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না, ধর্ম্মের দোহাই দিয়াই সে চিরকাল সব চেয়ে বড়ো পাপ করিবে।

আমিও অবশ্য এ সব কথাই নিজের উপলব্ধি হইতে লিখিতেছি না কেননা আমার ভয় ও সংস্কারের মোহ আজও ঘোচে নাই—তবে মনে যে দ্বন্দ্ব উঠিয়াছে এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি এই জন্যেই তোমাকে লেখা। ধার্ম্মিক এবং ভগবান সম্বন্ধে একজন authority বলিয়া তোমার বেশ নাম ডাক আছে। কিন্তু এই সঙ্গে নিজে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে যতটুকু বুঝিয়াছি ও উপলব্ধি করিয়াছি তাহাও জানাই। নানা লোকের এই সব আজগুবি কথা (অর্থাৎ ভগবান নাই, ইত্যাদি) শুনিয়া কি জানি কেন, আমারও ধারণা ও বিশ্বাস হইয়াছে—'Nature has no design, no intelligence. Nature produces without purpose, sustains without intention and destroys without thought' এবং সব চেয়ে বেশী করিয়া মনে হইয়াছে—আইন শাস্তি দিতে পারে কিন্তু মানুষকে পাপ করিবার প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারে না। এবং আমি যতদূর বুঝিয়াছি জ্ঞানের (অর্থাৎ literature) প্রচার ভিন্ন মানুষের এই প্রলোভন বা instinct এর হাত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। ধর্ম্মের propaganda মানুষকে পাপ হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিতে পারে কিন্তু তাহার পাপ করিবার নেশা কখনও যাইবে না কিন্তু জ্ঞানের আলো মানুষের পাপ প্রবৃত্তির অনেকটা উপশম করিতে পারে।

মানুষের চরিত্রে সব চেয়ে বড়ো তাহার instinct, এই instinct এর বশে মানুষ না পারে এমন কাজই নাই। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বা ভবিষ্যতের দোহাই দিয়া তাহার instinct এর কণ্ঠরোধ করিবার চেষ্টা করে মাত্র কিন্তু সুযোগ পাইলেই তাহার এই instinct প্রাধান্য লাভ করিবেই। কিন্তু জ্ঞানের আলো দিয়া এই instinct ও তাহার ফলাফল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দমন করিবার শক্তিলাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভিতরে sacrifice-এর একটা ভাব আসে। ছোট একটা উদাহরণ দিই, হয়ত তোমার মনে ধরিবে না, তবুও লিখি। পুরুষ ও নারীর প্রণয় ব্যাপার। ধর্ম্মকে ঘিরিয়াইত সকল মানুষের সংসার বা জীবন-যাত্রা চলিয়াছে (তোমাদের মত লোকের মতে সকলেই), কিন্তু জ্ঞানের আলো যাহারা পায় নাই তাহাদের মধ্যে এই প্রণয়ব্যাপার লইয়া প্রতিদিন খুনোখুনি ও নানাপ্রকার কুৎসিত ঘটনা ঘটে অথচ যাহারা জ্ঞানের আলো পাইয়াছে (এবং তোমাদের মতে তাহারাও যখন ধর্ম্মকে ঘিরিয়া আছে) এবং যাহারা নিজেদের বুঝিয়াছে তাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং নিজেদের দিকে তাকে অনায়াসেই ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, এবং করে দু'য়ের প্রমাণের অভাব নাই। তুমি বলিবে ধর্ম্ম ও জ্ঞান এই দু'য়ের জন্যেই ত্যাগ স্বীকারের প্রবৃত্তি কিন্তু আমি বলি, মানুষের জীবনে জ্ঞানের আলো—active, ধর্ম্ম বা ভগবান passive। মানুষের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বা বিপদের সময় নিজের শক্তি ও সাহসের জন্যে ভগবানকে প্রয়োজন (যাঁহাকে আমরা ভগবান বলি) আমরাও অনেক সময় কিন্তু যাহার আত্ম-

উপলব্ধি ও আত্ম-বিশ্বাস আছে, অর্থাৎ যে অন্য কাহারও উপর নিজের ভার চাপাইতে চাহে না এবং না চাপাইয়াও বাঁচিতে পারে তাহার জীবনে ভগবানের প্রয়োজন কোথায় ?

মানুষের জীবনে ধর্ম্মের প্রভাবের চেয়ে বড়ো তাহার শরীরের রক্তের প্রভাব, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহার প্রভাব এড়ানো অসম্ভব। এই জন্যেই পৃথিবীকে সুন্দর, নিষ্পাপ ও নিরাপদ করিতে হইলে—যে কোন উপায়ে অক্ষম, অজ্ঞ, অকারণ ধর্ম্ম-ভীরু, দরিদ্র ও কুৎসিত রোগগ্রস্তদের সন্তানের জন্মদান হইতে নিবারণ করিতেই হইবে। কোন ধর্ম্মের atmosphere বা ভগবানের দোহাই দিয়া পাপগ্রস্ত লোককে ধার্ম্মিক করা যায় না—ধর্ম্মের আড়াল দিয়াই সে তাহার পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি। এবং এমন সব লোকের নাম বলিতে পারি যাহারা দিনের জীবনে সাধু, কিন্তু রাত্রে তাহাদের আর চেনা যায় না। কোথায় বা সেই রুদ্রাক্ষের মালা—কোথাই বা নামাবলী! এঁদের অনেকেই তোমার চেনা।

Passion is and always has been deaf—এ কথা আজও অস্বীকার করিবার উপায় নাই—ধর্ম্মের বুকুনি দিয়াও এর কণ্ঠরোধ করা যায় না। এবং মানুষের passion যে, তাহার intelligence, conscience ও reason এর চেয়েও বড়ো এর প্রমাণও আমি অসংখ্য দিতে পারি কিন্তু প্রমাণেও তোমরা সন্তুষ্ট নও বলিয়া আজ আমি তোমার কাছে এর জবাব চাহিতেছি।

মনুষ্যত্বের চেয়ে বড়ো ধর্ম্ম নাই—মানুষের চেয়ে বড় কেহ নাই—এ কথা তোমরা কেন মানিতে চাও না, অকারণে 'ধর্ম্ম'ও 'ভগবানকে' টানিয়া কেন মানুষের জীবনযাত্রাকে আরো সংশয়-সঙ্কুল ও জটিল করিয়া তুলিতে চাও ?

এর কোন জবাব দিবার পূর্ব্বে, আমি তোমার দৃষ্টি বর্ত্তমান রাশিয়ার দিকে ফিরাইতে চাই। একবার এদের দিকে তাকাইয়া দেখো।

আজকের এই পৃথিবীব্যাপী হাহাকারের দিনে কেবল ওদেশের লোকেরই অভাব নাই, অভিযোগ নাই—

অথচ ওদের দেশেই anti-God propagandaর ঝড় সব চেয়ে প্রবল বেগে বহিতেছে, শক্তিহীন নগ্নমূর্ত্তি দেবতা আজ পথের ধূলায় লুটাইতেছে, মানুষের চেয়ে বড়ো সেখানে কেহ নাই !

পরে আরো অনেক কথা লিখিবার রহিল।

"নবশক্তি"

বক্ষ্যমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা মহিলাদের মতামত আহ্বান করিতেছি। —সঃ জঃ

রাজেন্দ্রাণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

হে সুন্দর,

একদিন বর্ষাক্লান্ত দিবসের শেষে
আসিয়া দাঁড়ালে তুমি দুয়ারে আমার ভালোবেসে।
সেদিনে আনত আঁখি, লজ্জাভরে পারিনি চাহিতে
তোমার মুখের পানে, আঁখি মোর মুদিল ত্বরিতে।
সেদিন আকাশ ছিল নিবিড় নিমেষ মেঘে ঢাকা
দূর হতে দেখা যায়, বিজলী মেলিয়া চলে পাখা
ঝলসি নয়ন শুধু; হে সুন্দর, সেই মিলনের
দিনটী যে গেছে কেটে, আজ দিন চির বিরহের
আসিয়াছে হেরি মোরে, কহ তুমি কোথা আছ আজ?
দূরে-অতি দূরে আছ হে সম্রাট্, হে রাজাধিরাজ।

আমার সকল লাজ, সব দৈন্য, সকল ক্ষুদ্রতা
ঢেকেছিলে সেই দিন; কাণে কাণে বলেছিলে কথা;
"হে ইন্দ্রাণী, রাজরাণি, আজ তব প্রজা আমি—তাই
আমারই এ ক্ষুদ্র কর উপহার দিতে তোমা চাই।"

কত যুগ যুগান্তের অতীত দিনের ইতিহাস
জাগাইলে সেই দিন; কত দিন কত বর্ষ মাস
কেটেছিল প্রতীক্ষায়, সেই কথা পড়েছিল মনে
নিভৃত অন্তর হতে গুপ্তবাণী এনেছিলে টেনে।
বর্ষাস্নাতা সুপ্তি মগ্না ধরণীর বুকে চুপিসারে
সমস্ত জগৎ ছিল বাহিরে দাঁড়ায়ে অন্ধকারে।
পায়নি সে দেখা রাজা, সেই রাতে তোমার-আমার,
আকাশে ঢালিয়া গেছে সারারাতি নয়ন আসার।

তৃপ্তিহীন, শ্রান্তিহীন, কর্ম্মময় গত দিবসের
সব গাথা হলে শেষ; ক্ষুদ্র ফাঁক ও ভরে অন্তরের
অতীত দিনের স্মৃতি—

বলিনু সেদিন—"এলে আজ
বরিতে সাম্রাজ্ঞী পদে এ দীনারে হে রাজাধিরাজ ?
আমাদের সে কাহিনী আছে তো আজিও ওগো লেখা,
আকাশেতে, নদী নীরে, আর আছে পাহাড়েতে আঁকা
আজও তাহা চোখে পড়ে।
মুকুট গড়িয়া নিজ করে
এনেছিলে-পরাইলে সযতনে মুখখানি ধরে।
তুমি মোর, আমি তব মাঝখানে কেহ নাহি আর ;
আমাদের ঘেরি গর্জ্জে উদ্বেল বিপুল পারাবার
গরজিয়া আছাড়িয়া পড়েছিল আমার চরণে।
কত যে তরঙ্গ আসে, কত যায়
কেবা তাহা গণে,
কে রাখে হিসাব তার ? লক্ষ লক্ষ জন যেথা রহে
আমি ও তাদেরই মত ; প্রাণে মোর তৃপ্তি ধারা বহে
ভাবি মনে মহারাজ, আজি এক দীনা কাঙ্গালিনী
আমারে মুকুট দানি করিলে হে মোরে রাজেন্দ্রানী !
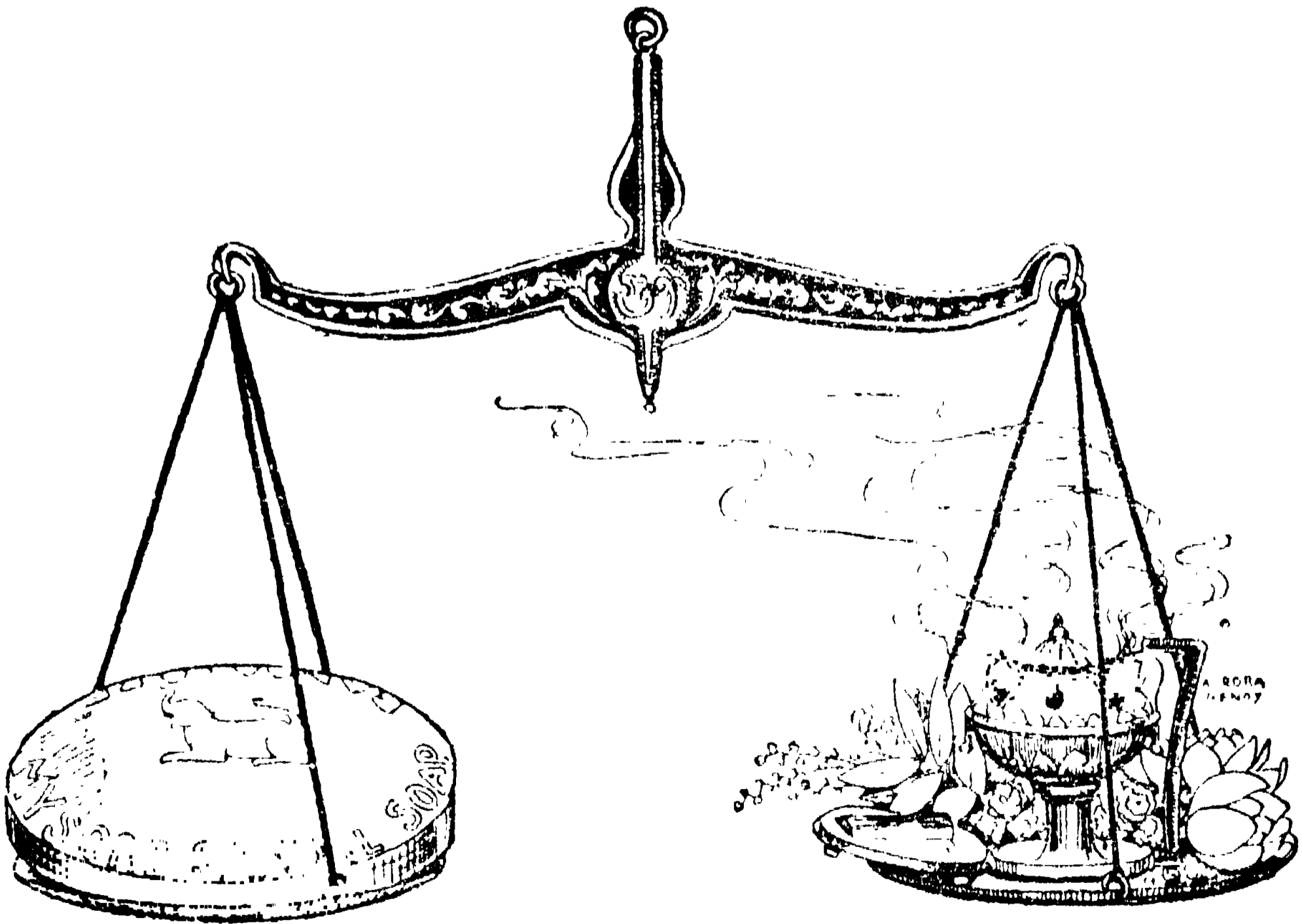
মৃগমদ

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

(১০)

কলেজ যাওয়ার জন্য তৈরি হইয়া আসিয়া নীরা চন্দ্রিমার ঘরের দরজার কাছ হইতে ডাকিল—'হয়েছে তোর, চাঁদ ?'

চন্দ্রিমা ইজি চেয়ারে অলস ভাবে শুইয়াছিল। হাতের বইখানা চেয়ারের হাতার উপর রাখিয়া বলিল, 'আজ যাব না'।

নীরা আসিয়া চন্দ্রিমার পাশে শুইয়া পড়িয়া বলিল 'আজ কলেজ খুল্‌ল, আজ যাবিনে কি রকম! কি হ'য়েছে তোর ?'

'শরীরটা ভাল লাগ্‌ছে না!'

'বেড়িয়ে এসে ভাল লাগ্‌ছে না, সে কি ? দিব্যি বায়ু সেবন করে সব স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে আসা গেল—আর এখানে পা না দিতে দিতে তোর শরীর ভাল লাগ্‌ছে না ?

'তা না লাগ্‌লে আর কি করি বল্‌!'

নীরা চন্দ্রিমার মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু ভাবে চাহিয়া বলে, 'ঘুম বুঝি হয়নি কাল রাতে ?' চন্দ্রিমা ইতস্ততঃ করিয়া বলে, 'না।'

'...না ? কেন ? বেশ্‌ ত ঠাণ্ডা পড়েছে। কাল আবার রাত দুপুরে কেউ গান গায় নি ত ?—

"সুন্দরী তুমি শুকতারা
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ,
স্বপ্নে যে বাণী হ'লো হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ
নিশীথের তল হ'তে তুলি
লহ তারে প্রভাতের জন্য—বলে"

এক "আঁধারের বক্ষে মেশা আধো জাগ্রত চন্দ্র" কাতর মিনতিতে রাত্রির মৌন আকাশ ধ্বনিত করে তোলে নি ত ?'

চন্দ্রিমা আরক্তিম মুখে উঠিয়া বসিয়া বলে, 'নীরা দিন দিন তুই অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ছিস্‌! কি যে তুই বলিস্‌, কি যে না বলিস্ তার ঠিক নেই ! এই মুসৌরি যাওয়ার আগে সকলের সামনে কি রকম বিশ্রী ভাবে আমাকে রিডিকিউল্‌ করলি ! মানুষের সহিষ্ণুতার সীমা আছে বাপু!'

চন্দ্রিমা উঠিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই নীরা তাহাকে ধরিয়া বসায়, ব্যগ্রতার বশে তাহার হাতের বই মাটিতে পড়িয়া যায়।

দুই বাহু দিয়া চন্দ্রিমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া নীরা বলে, 'যাঃ যাঃ, এই কথায় আর রাগ করে না! তুই ক্ষেপিস্ বলেই ক্ষ্যাপাতে আমার টেম্পটেশন্ হয়। সে হিসাবে দোষ তোরই। তুই ক্ষেপিস্ কেন বোকার মত! যা প্রকৃত তা নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে না, যা অপ্রকৃত তারই সঙ্গে প্রকৃতকে জুড়ে তার অদ্ভুত বিসদৃশতায় লোক কৌতুক উপভোগ করে থাকে। লার্ন্‌ড্ মেয়ে তুই, তোকে আবার এ কথা বোঝাতে হবে? এই কেশবলাল যত বড় স্কলারই হোক, আর সুগায়কই হোক্—আর কবিই হোক্—তুই কি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারিস্ ওকে স্যুটর্ বলে, অথবা লাভার বলে?'

চন্দ্রিমা শান্ত হইয়া বসে, নীরা কার্পেটের উপর ছড়াইয়া যাওয়া বইগুলি উঠাইয়া নিয়া বলে, 'তোর মান ভঞ্জন কর্ত্তে গিয়ে আমি বোধ হয় আজ লেট্ই হয়ে গেলাম। (হাত ঘড়িটা ঘুরাইয়া দেখিয়া) এই যাঃ, সাড়ে দশটা পার হয়ে গেছে,— চলি এবার নিভৃতে নির্জ্জনে তুই এখন সেই অদৃশ্য আধোজাগ্রত চন্দ্রের ধ্যানকর' বলিয়া নীরা হাসিতে হাসিতে পড়িতে পড়িতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চন্দ্রিমা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে থাকে। অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে তাহার মন সহসা এক আলোকের রেখাপাতে প্রফুল্ল হইয়া ওঠে। নীরাই বলিয়াছে ঠিক্ কথা—কেশবলালের কোয়ালিফিকেশন যতখানিই হোক, আর যত বড়ই হোক্ এ কথা ত ভোলা চলিবে না যে সে তাহাদের বাগানের মালী, তাহাদের চাকর মাত্র।

বোকামী তাহার যত বড়ই হোক্ এমন বোকামী তাহার কখনও ঘটে নাই যাহাতে এই কথাটা সে বিস্মৃত হইয়াছে বা কখনও হইবে। যত গোল বাধাইয়াছে লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে নীরা! তাহার বিশ্রী ঠাট্টায় সে এতোটা এম্‌ব্যারাস্‌ড বোধ করিতেছিল শুধু—কিন্তু ওরকমভাবে বলিলে কেই বা তা না করে!

কেশবলাল আসিয়াছে অবধি মেয়ের মুখে শুধু ঐ এক কথা! দিন রাত ওর কথা ওরকম করিয়া বলে বলিয়াই তার ভাবনার মধ্যে ও মিশাইয়া গেছে?

এইটাই যা কিছু খারাপ! বাড়ীর চাকর—তাহার কথা লইয়া এত আন্দোলনই কেন, আর ভাবনা-ই বা কেন!—ও যদি জানিতে পায় কোনো রকমে—কি বিশ্রী ব্যাপার হইবে!

নীরাকে যে কি পাগলামিতে পাইয়াছে! নাঃ, এ এখন বন্ধ করিতেই হইবে নীরাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। কি ফক্কুড়িই যে মেয়ে শিখিয়াছে—তাহার সঙ্গে সহজে পারিবার যো নাই। সহজে না হয় শক্ত হইয়াই তাহাকে এই বাচালতা রোধ করিতে হইবে।

চন্দ্রিমার মনের ভাব এ সঙ্কল্পে অনেকখানি লঘু হইয়া গেল। একটুখানি আগে যে সে মনে করিয়াছিল, বাগানে সে আর যাইবে না, গাছগুলি তাহার মরিল কি বাঁচিল, ফুল ফুটিল কি না ফুটিল, পল্লব মরিল কি শীর্ণ হইল—কিছুই আর দেখিবে না,—সে উৎকট অভিলাষ শরতের ছিন্ন মেঘের মত মনের কোন অলক্ষ্য দিগন্তে অপসারিত হইয়া গেল। চন্দ্রিমা প্রসন্ন চিত্তে উঠিয়া স্নানাহার করিয়া আসিল, তাহার পর তাহার ঘরের সম্মুখকার বাগানের অংশ টুকুতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বাগানে পা দিয়া প্রথম তাহার উপলব্ধি হইল কিসের অভাব তাহার মন নিদাঘের বল্লরী মত ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিয়াছে। এই মাটি একদিন ছিল তাহার খুসীর খেয়াল, বাসনার বিলাস,—এই মাটিকে ছাড়িয়া দূরে গিয়া আজ সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে এই মাটির মূলে তাহার প্রাণের মূল কতখানি মিশিয়া গিয়াছে; এই তৃণে, তরু পল্লবে, ফুলে ফলের সাথে হৃদয় তাহার কি অচ্ছেদ্য অবোধ্য বন্ধনে আবদ্ধ; বাহিরের কৃত্রিমতা তাহার বুদ্ধিকে ভুলাইয়াছে মাত্র, তাহার মনের বুভুক্ষা বারণ করিতে পারে নাই; সকল কিছুর অন্তরালে তাহার মন নিভৃতে একান্তে এই মাটিকেই যাচ্ঞা করিয়াছে, ইহাকেই অন্বেষণ করিয়াছে, কিন্তু মনের এই নিগূঢ় পরিবেদনার সুরটিকে না পারিয়াছে সে উপলব্ধি করিতে না পারিয়াছে কোনো রূপ দিতে।

তৃষিত চক্ষু দিয়া চন্দ্রিমা চারিদিকে চায়, দুরন্ত এক আবেগে তাহার আঁখি পল্লব আর্দ্র হইয়া ওঠে—মনে হয় এই মাটিতে তৃণের উপর সে একবার গড়াগড়ি দেয়, পুষ্পিত এই কাঞ্চণ করবী গন্ধরাজকে দুই বাহু দিয়া বক্ষে আঁকড়িয়া ধরে—ফরগেট-মি-নটের গুচ্ছের ভিতর মুখ গুঁজিয়া দেয়।

দুইটা ফুলের কেয়ারির মাঝখানে চন্দ্রিমা পা ছড়াইয়া বসে।

বারান্দা হইতে 'বয়' তাহা দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, দিদিমণিকে কুরসী আনিয়া দিবে কি না, চন্দ্রিমা সহাসমুখে বলে কুরসীতে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই।

চন্দ্রিমা উঠিয়া হাঁটিতে থাকে। মেঘ-মেদুর-প্রচ্ছায়া-ঘন দিন, অবনত আকাশের অংশ-ভ্রষ্ট ধূসর জলদ উত্তরীয় খানি দিগন্তরের শিয়রে লুটাইতেছে। বাতাসে তাহার দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়, শিহরিত তরু পল্লবে বিগলিত অশ্রুর আভাস লাগে।

খালের ভিতরের নৌকা স্রোতের টানে যেমন করিয়া বাহিরের নদী বক্ষে গিয়া পড়ে, চন্দ্রিমা তেমনি হাঁটিতে হাঁটিতে আপনার অজ্ঞাতসারে বাহিরের দিকে গিয়া পড়ে। পথের ধারে নূতন কেয়ারি, নূতন ফুলের চারা তাহাকে দূরে আরো দূরে আবাহন করিতে থাকে। তট-তরু-তল-লীন বর্ষার জল স্রোতে, নিবিড় পল্লব রন্ধ্র পথ-প্রবিষ্ট আলোকের মত এক অকারণ পুলক ও বেদনা তাহার মনে ঝিলিমিলি খেলিতে থাকে।

সহসা বৃষ্টি নামে, বড় বড় ফোঁটা চড়্ বড়্ করিয়া পড়ে। তাহার পর ঘন অবিচ্ছিন্ন

ধারা নামে। চন্দ্রিমা পলাইতে অবকাশ পায় না, ব্যগ্রভাবে সম্মুখে চাহিতেই লতা প্রাচীরের অন্তরালে কেশোলালের ঘরের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে।

চন্দ্রিমা একবার থমকিয়া দাঁড়ায়, ভাবে, তাহার ঘরে সে আশ্রয় লইবে কি? সঙ্গে সঙ্গে অমনি মনে হয়, ঘরের মানুষ হয়ত ঘরেই নাই, আর সব লোকের মত সেও সম্ভবতঃ কোথাও আহার করিতে গিয়াছে। হয়ত কোনো হোটেলে নয়ত কোনো রেস্তোরাঁতে:কে জানে কোথায়। ওর মত বাবু কি আর হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খায়!

ভাবিতে ভাবিতে অর্দ্ধসিক্ত চন্দ্রিমা কিংশুকের ভেজানো কপাট ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

দরজার বিপরীত দিকের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া কিংশুক বাহিরের দিকে মুখ করিয়া একটা বাটি অতি মনোযোগ সহকারে ধুইতেছিল, ঘরের ভিতর অভাবনীয় চুড়ির রিণিঝিণি শুনিয়া সে ফিরিয়া চাহিল।

নিস্পন্দ নিষ্পলক চন্দ্রিমা মন্ত্রাবিষ্টের মত চোখে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইল।

এক অনন্ত মুহূর্ত্ত! দেবতার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া যেন সে জীবনের অন্ধকার দ্বার তলে আসিয়া পড়িয়াছে, চারিদিকে তাহার জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, সুরভি ঝরিয়া পড়িতেছে, সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে।

একটি অনবহিত, অতর্কিত, অশেষ অতুল মুহূর্ত্ত; পরক্ষণেই কিংশুক সসব্যস্তে বলে, 'জলে ভিজে গিয়েছেন যে দেখছি! এ সময় কি বাইরে বার হ'তে আছে!'

সিক্ত কুন্তলের উপর হাত বুলাইয়া চন্দ্রিমা হাসিয়া বলে, 'বৃষ্টিটা বড্ড্ তাড়াতাড়ি নেমে এল। দৈব দুর্ব্বিপাক কি আর মানুষ আগে হিসেব কর্ত্তে পারে!'

কাঁটার মত কথাটা খচ্ করিয়া কিংশুকের বুকে বেঁধে। সামলাইয়া লইয়া সে অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'বসুন, আমি কামিনীকে ডেকে আন্‌ছি।'

কিংশুক চোখ নীচু করিয়া কথা কয়, চন্দ্রিমা সেই অবকাশে তাহার মুখের দিকে চায়,—মনে তাহার প্রদোষ আকাশের ছবি জাগিয়া ওঠে। একদিকে তাহার দীপ্ত রবিরশ্মি, অন্যদিকে রাত্রির তিমির ছায়া। আলো মিশিয়াছে অন্ধকারে, অন্ধকার মিশিয়াছে আলোতে।

কিংশুক চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করিতেই চন্দ্রিমা বলিল, 'জল থেমে যাবে এখনি। কামিনী এখন জ্যেঠিমার পা টিপছে। ওকে ডেকে কাজ নেই। ওখানে যদি খবর পৌঁছানো যায় যে আমি জলে ভিজে বসে আছি, তবে হাঁ হাঁ করে ছুটে আস্‌বে। জ্যেঠিমা বক্‌বেন কামিনীকে, কামিনী বক্‌বে কুসুমকে, কুসুম বক্‌বে সতীশকে,—সারা বাড়ী হুলস্থূল লেগে যাবে এখন। তার চাইতে চুপ্‌চাপ্ একটু বসি, জল ছাড়্‌লে যাব এখন!'

এতক্ষণে চন্দ্রিমা ঘরের দিকে চাহিল। ঘরখানা নীচু হইলেও বড়, জিনিষ পত্র সব পরিপাটি করিয়া সাজানো। ক্যাম্প খাটটি জানালার কাছে পাতা, বিছানা তাহাতে বিছানোই

রহিয়াছে। বালিশের ওয়াড়ে কারুকার্য্য করা। একটা বালিশ শিয়রের দিকে, আরেকটা পায়ের দিকে, মাঝখানে একটা খোলা বই! খাটের পাশে ছোট একটি ক্যাম্প্ টেবিল। লিখিবার উপকরণাদি এবং মোটা মোটা কতকগুলি বই তাহার উপর সজ্জিত। ছোট একটা টুলের উপর একটা ট্রাঙ্ক ও একটা সুটকেশ, একটা বেতের বাক্স। পশ্চিমের জানালার কাছে একটি ডেক্ চেয়ার, একটা তেপায়া। তাহার পাশ দিয়া একটা হোয়াট্‌নট, তাহার উপর চায়ের উপকরণ, খাওয়ার প্লেট্ ডিশ্ ইত্যাদি চীনের বাসন। নীচের থাকে ছোট ছোট গোটা দুই তিন ডেক্‌চি। মাটিতে একটা ষ্টোভ, তাহার উপর একটা ঢাকা শুদ্ধ বাসন বসানো। তেপায়ার উপরে একটা ছুরী কাঁটা, চামচ, কাটা কাঁচের একটা লবণদানী ও ক্রুয়েট, একটা বড় প্লেটে এক থোপা আঙ্গুর, আপেল, ও ছোট একটা প্লাম কেক্। দেয়ালের গায় বড় একটা ছবি ওয়ালা দেয়ালপঞ্জী, গুটি দুই র‍্যাক্, ছোট্ট একটা মিনিয়েচার ক্যাবিনেট।

বর্ণনা করিতে যতখানিই সময় লাগুক, চন্দ্রিমা এক পলকের দৃষ্টিতে সব দেখিয়া লইয়া জানালার বাহিরে জলধারার দিকে চাহিয়া বলিল, 'বেশ বৃষ্টি নেমে বস্‌ল যাহোক্।'

এবারে কিংশুক সাহস করিয়া চন্দ্রিমার দিকে চাহিল। জলে ভিজিয়া চূর্ণ কুন্তল তাহার ললাটে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, আঁচল গিয়াছে গায় বসিয়া। গ্রীবায় বাহুতে জল বিন্দু তখনও টলমল করিতেছে।

কিংশুক মনে মনে নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রিমা যদি বাড়ীর ছেলে হইত তবে বাক্স খুলিয়া সে তাহাকে তাহার কাপড় তোয়ালে জামা বাহির করিয়া দিতে পারিত, তাহাতে দোষ ধরিবার ভয় ও থাকিত না, দোষ ঘটিবার ভয় ও থাকিত না। কিন্তু চন্দ্রিমাকে তাহার কাপড় তোয়ালে সে দিবেই বা কি করিয়া এবং চন্দ্রিমা তাহা লইবে এমন অশ্রুতপূর্ব্ব অসম্ভবকে সে সম্ভবপরই বা মনে করে কি করিয়া!

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল দিন কয়েক মাত্র আগে সে একখানা টার্কিস তোয়ালে কিনিয়াছে, খুলি খুলি করিয়াও সেখানা খোলা হয় নাই। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া র‍্যাক্ হইতে সেখানা পাড়িয়া কিংশুক বলিল, 'আপনি যদি এ রকম ভিজা কাপড় চোপড়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন, তবে ঠাণ্ডা লেগে ফ্লু হবে। এটা নূতন তোয়ালে গায়ের জলটা মুছে ফেলুন।'

তোয়ালেটা চন্দ্রিমার সম্মুখে টেবিলের অত্যন্ত অপ্রতিভ ভাবে রাখিয়া দিয়া কিংশুক তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

চন্দ্রিমা অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তোয়ালেটা তুলিয়া গায়ের জল মুছিল।

এবার সে ভাল করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল এবং প্রত্যেকটি জিনিষ বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইল। হাতের কাছে বইগুলি কোনোটা খুলিয়া কোনোটার নাম ঘুরাইয়া দেখিল সবগুলিতেই এক নাম লেখা—কিংশুককান্তি মিত্র।

চন্দ্রিমার মনে পড়ে কিংশুকের প্রথম দিনের নাম বলার কথা। নাম কি জিজ্ঞাসা করিতে সে এমন বিব্রত হইয়া গেল ও এমন ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল, যে কথাটা তাহার এখনো পরিষ্কার মনে আছে। নাম কিংশুক কান্তি—তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অদ্ভুত "কেশোলাল" বানাইতে বেচারীর কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল ও কিছু সময়ও লাগিয়াছিল; তখন যাহা তাহার কাছে দুর্বোধ্য লাগিয়াছিল, এখন তাহা জলের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। এই জিনিষ পত্র বাক্স বিছানা, খাদ্যোপকরণ, পুস্তক গ্রন্থাদি দুঃস্থ এক মালীর ছেলের ত হইতেই পারে না—সাধারণ ভদ্র ঘরের ছেলের পক্ষেও অসম্ভব।

হাতের বইখানি সযত্নে স্বস্থানে রাখিয়া দিয়া চন্দ্রিমা ভাবিতে লাগিল, কাহার ছেলে ও, কোন্ দুঃখে কোন্ বিপদে পড়িয়া বাগানের মালী সাজিয়াছে! হয়ত কোনো একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা ওর বাপ মা আত্মীয়-স্বজন সব একদিন সহসা ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছে, সৌভাগ্যের সুখময় অঙ্ক হইতে অকস্মাৎ ও নিক্ষিপ্ত হইয়াছে দুর্গতির কণ্টক বনে। ওর ধরণ ধারণ অভ্যাস, ওর আকৃতি প্রকৃতি রুচি স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে ও বড় ঘরের ছেলে। মূর্খ, অলস অসদাচারী যে ও নয়—স্বকর্ম্ম দুর্ব্বিপাকে যে ও এ দুরবস্থায় পতিত হয় নাই—তাহা সে হলপ করিয়া বলিতে পারে। গোটা কয়েক বইতে তাহার লাহোর ইউনিভারসিটির নাম ও লেখা—গত বৎসর ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিল। ফেল করিয়া হয়ত লজ্জায় চলিয়া আসিয়াছে। অকৃতকার্য্যতার দুঃখে কোনো কোনো ছেলে আত্মহত্যা করিয়াছে এমনও ত শোনা যায়, সুতরাং কথাটা এমন অসমীচীনই বা কি!

সহসা চারিদিক শব্দে সচকিত করিয়া নীরার গাড়ী বাগানের পথে ঢুকিল। চন্দ্রিমা উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

কিংশুক ভিজিতে ভিজিতে ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'গাড়ীটা এখানে আন্‌তে বলব?'

কুণ্ঠিত ভাবে চন্দ্রিমা বলিল, 'না। থাক্ কাজ নেই।' লজ্জায় তাহার কর্ণমূল রঞ্জিত হইয়া উঠিল। গাড়ী হইতে নামিয়াই নীরা তাহার খোঁজ করিবে। বয়টা আবার তাহাকে বাগানে ঘুরিতে দেখিয়াছে—সুতরাং সে হতচ্ছাড়া লোকটা তিলমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিবে যে সে বাগানেই ছিল, এবং বৃষ্টিতে বাগানেরই কোনো ঘরে হয়ত ঢুকিয়া পড়িয়াছে। নীরা তখন একটুও ধরিতে দেরী হইবেনা, কোথায় কোন্ ঘরে সে আছে। হয়ত সে নিজেই আসিয়া এখান হইতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে।

গাড়ী ঘুরিয়া বারান্দায় দাঁড়াইতেই চন্দ্রিমা বলিল, 'ছাতি আছে?'

র‍্যাকের উপর হইতে আইভরি হ্যাণ্ডেল ছাতিটা পাড়িয়া কিংশুক অপ্রতিভ ভাবে চন্দ্রিমার হাতে দিল। চন্দ্রিমা হাসিয়া বলিল, 'জল ত আর ধরল না এখন ছাতি মাথায় দিয়েই যেতে হচ্ছে।'

চন্দ্রিমা এস্তপদে বাহির হইয়া গেল। কিংশুক ফিরিয়া পশ্চিমের জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। লজ্জায় তাহার মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। যে কথাটা

সব চেয়ে বেশী সে গোপন করিতে চাহিয়াছিল, সে কথাটাই সব চেয়ে বেশী আজ প্রকাশ হইয়া গেল। মালীগিরি করিতে আসিয়া এত বাবুগিরির তাহার কি প্রয়োজনটা ছিল! বাড়ী হইতে তাহার বাক্স বিছানা বই সঙ্গে না নিলে কি তাহার চলিত না? পিছনে যাহা সে ফেলিয়া আসিয়াছে—তাহা পিছনে রাখিয়াই চলা কি তাহার সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল না? কি ভাবিল চন্দ্রিমা তাহাকে? কি মনে করিল? সর্ব্বশেষে এই আইভরি-হ্যাণ্ডেল দামী ছাতিটা সে তাহার হাতে দিয়া দিয়াছে—বাড়ী শুদ্ধ লোক হয়ত তাহা লইয়া এতক্ষণে কত সমালোচনা জুড়িয়া দিয়াছে!

কিংশুক যতই ভাবে, ততই তাহার নিজের মূর্খতার ও নির্বুদ্ধিতার পরিমাণ উপলব্ধি করিতে থাকে। সাধ করিয়া বাছিয়া যে সব জিনিষ সে আনিয়াছে ও কিনিয়াছে, উদ্ভট অদ্ভুত হইয়া তাহা তাহার চক্ষে বিঁধিতে থাকে। লজ্জায় তাহার মন ওঠে মৃয়মান হইয়া।

বিরক্ত হইয়া ভাবে, এখনি সব জিনিস গঙ্গার জলে ডুবাইয়া দিয়া সে সকল লজ্জার অবসান করিবে। উঠিয়া দু'চারিটা জিনিষ সে জড়ও করে,—আবার ভাবে—এখন দিনের বলা গাঁঠরি লইয়া রওনা হইলে বাড়ীর লোকে ও আশে পাশের লোকেই বা কি বলিবে! রাত্রিবেলা সকল লোক যখন ঘুমাইয়া পড়িবে তখন চুপি চুপি এ সব জিনিষ পত্র গাড়ীতে বোঝাই করিয়া নিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া আসিবে। ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রি। ক্ষুধা বোধ হওয়াতে কিংশুক উঠিয়া টেবিলে খাইতে বসিল। ফল, কেক, মাখন রুটি ডিম ইত্যাদির শেষে একটা র‍্যাম্প্‌বেরি খাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। আজ আর সে রাঁধিল না।

বৃষ্টি একবার থামিয়া গিয়া আবার তখন জোরে নামিয়াছে। ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করিয়া বহিতেছে। খোলা জানালা দিয়া জলের ছাঁট ঘরে ঢুকিতে সুরু করিল। কিংশুক উঠিয়া শীত কম্পমান দেহে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল, কপাটের কাছে আসিয়া একবার বাহিরে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। চারিদিকে ক্রুদ্ধ জলধারার তর্জ্জন শব্দ, তিমিরাচ্ছন্ন অন্তরীক্ষ মণ্ডিত করিয়া নিঃসীম নিঃশেষ অন্ধকারের তরঙ্গ মসীধারায় গলিয়া যেন নামিতেছে। চারিদিকে ক্রুদ্ধ জলধারার তর্জ্জন-শব্দ, ক্লিষ্ট ধরণীর বিলাপে গগন তল ভরিয়া উঠিয়াছে। জলের ছাঁটে কিংশুকের গা ভিজিয়া গেল।

কপাট বন্ধ করিয়া আসিয়া সে গা মুছিয়া বিছানার উপর বসিল। এই শীতে, ঠাণ্ডায় বৃষ্টি বাদলে অন্ধকারে জিনিস পত্র লইয়া কোথায় সে যাইবে, আর গেলেই কি তাহার আজকার এ লজ্জা ধুইয়া যাইবে! ধরা পড়িয়া গেলে চোরের পক্ষে স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। যে ফাঁকি ফাঁসিয়া যায়, ছিন্ন বসনের মত তাহা লজ্জা বারণ ত করেই না উপরন্তু দীনতা বাড়ায়।

কিংশুক এতক্ষণে থই পাইয়া শান্ত হইয়া শুইল।

বাহিরে বৃষ্টি তখন মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, জলের শব্দ ক্ষীণ হইয়া উঠিয়াছে, বাতাস বহিতেছে ব্যথিতের ক্লান্ত শ্বাসের মত। শাখায় শাখায় অস্পষ্ট মর্ম্মর ধ্বনি শোনা যায়।

অন্ধকারে জাগিয়া দুই চক্ষু মেলিয়া কিংশুক চাহিয়া থাকে। চন্দ্রমার উদয়ক্ষণে দিক্-চক্রবালে বিভাসিত কৌমুদী বিভার মত তাহার মনের দিগন্তে এক অপরূপ আলোকচ্ছটা বিভাসিত হইয়া ওঠে। কিংশুকের বুক জুড়িয়া সাগর বক্ষে চন্দ্র বিম্বের মত সে জ্যোতি ঝলকিয়া ফিরিতে থাকে।

ক্রমশঃ

গান

শ্রীহাসিরাশি দেবী

ও মোর নীল গগণের তারা !
তোরে খুঁজে না পাই,
সদাই হারাই লুকোচুরীর পারা।
ও মোর নীল গগণের তারা।
ও তুই কোথায় ব'সে খেয়া করিস পার,
কোথায় তোর সনে মোর হয়রে একাকার ;
কোথায় তোর সনে মন উধাও হ'য়ে যায়,
পরশ নাহি পায়—
শুধুই খুঁজে সারা।
ও মোর নীল গগণের তারা।

আজ শুনি দূর হ'তে তোর আকুল করা গান,
নিমেষে চোখ জলে ভরে উতল করে প্রাণ ;
ওরে অতীত দিনের মাঝে যে মোর কত,
হারিয়ে গেছে মাণিক শত শত
ঝরে নয়ন ধারা।
ও মোর নীল গগণের তারা॥

নারীর দ্বিবিধ কর্ত্তব্য

শ্রীরমা দাস

চায়ের সময়।...ধূমায়িত তাঁবুর ভেতর বসন্তের স্নিগ্ধ রোদ্ ঢুকে আমার পাশে উপবিষ্টা মেয়েটীর তর্ক কর্‌বার প্রবৃত্তিটাকে একটু নরম করে দিয়েছিল। মেয়েটী একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে এমন একটা বিশেষ ভাবে কথা বলছিল, যেন তরুনদের পক্ষে বলবার অধিকার তার আছে।

আধুনিক জগতে মেয়েদের জীবন যাত্রার ধারাটা তাকে আকৃষ্ট করেছিল। মানুষ কি চায় এবং সেই চাওয়া অনুসারে নিজের জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করাই সব চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় এটা সে অনুভব করত।

বি, এ পাশ করবার একমাস আগে সে এক রিসার্চ্চ-লেবরেটারীতে চাকরী পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। খুব সম্ভব আগামী বসন্তেই সে স্বতন্ত্র ভাবে থাকতে পারবে আর পিতৃ গৃহের নানা বাধ্যবাধকতার হাত হ'তে মুক্তি পাবে।

তেইশ বছর বয়সে সে বল্লে,—আমি বিয়ে করব এবং যতশীঘ্র সম্ভব চারটী সন্তানের মা হব। তবে আমার বন্ধুদের মত চাকুরীকেই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করবো না; পনর বছরের মধ্যে যখন আমার শিশুরা বড় হবে, তখন আমি আবার কর্ম্মস্থলে ফিরে আসব।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম 'তুমি কাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছ?' সে শান্তভাবে উত্তর দিল 'না,—এখন কিছু ঠিক করা প্রয়োজন মনে করি না।' এরকম ধরণের কথা বার্ত্তা প্রায়ই শোনা যায়। নবযুগের মেয়েরা, যারা এই পরিবর্ত্তনের যুগে নিজদের অদৃষ্ট নিজেরাই গঠন করতে একান্তভাবে চেষ্টা করছেন এবং যখন কলেজের শিক্ষা ও সমাজ তাদের জীবন যাত্রার প্রনালীকে নতুন কোন আদর্শ দিতে পারেনি, তখন তাদের চিন্তা-ধারা স্বভাবতঃ এই দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। প্রত্যেকটী মেয়ে প্রতিভাশালিনী, উচ্চ শিক্ষিতা এবং উৎসাহী। তারা ব্যক্তিগত ভাবে নিজেদের স্বার্থ এবং মাতৃত্বের সামঞ্জস্য বিধান করতে চাইছে এমন একটা যুগে, যখন একদিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার হতে আফিস আদালত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মেয়েদের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে এবং অন্যদিকে গৃহলক্ষ্মীর আসনও তাদের জন্য অবারিত রয়েছে।

সম্ভবতঃ এদেশের উচ্চ শিক্ষিতা কয়েক লক্ষ মেয়ে এই সমস্যার মাঝখানে হাবুডুবু খাচ্ছেন। প্রায় ছয় লক্ষ মেয়ে কলেজে এবং নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষা পাচ্ছে আর প্রায় আশী হাজার মেয়ে সম্ভবতঃ আস্‌চে জুনে বি-এ পাশ করে বেরুবে। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এবং কি করে তারা তাদের জীবনটাকে সার্থক করে তুলতে পারে, সে বিষয়ে তারা এখনও গোলক ধাঁধাঁর

ভেতরেই রয়েছে। স্পষ্ট কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, কি করে যে তাদের জীবনে সামঞ্জস্য আনা যেতে পারে সে সম্বন্ধে তারাও যেমন অজ্ঞ, তাদের যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁরাও ঠিক তেমনি অজ্ঞ।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে নোরা (Nora) তার পুতুল ঘরের দ্বারা ভেঙ্গে স্বামীও সন্তান-সন্ততি পরিত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, মানুষ হিসাবে পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়াবার জন্যে, চিরাচরিত নিয়ম কানুন পরিত্যাগ করে ইচ্ছানুসারে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে। প্রায় কুড়ি বৎসর পরে "Twelve Pound Look" এর Kate ও ঠিক তেমনি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। এদের ব্যক্তিত্বের দাবী আজ বিশ্বের সভায় মঞ্জুর হয়েছে।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে যখন যান্ত্রিক সভ্যতার পত্তন হল তখন হতে মেয়েদের জীবনে একটা যুগান্তর এসেছে! একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী, অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-দীর্ঘ শতাব্দী ধরে যেখানে কেবল পুরুষই আধিপত্য করে এসেছে সেখানে আজ নারী পুরুষ উভয়েই সমবেত হয়েছে। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের এত পরিবর্ত্তন হয়েছে যা তার পূর্ব্ব ইতিহাসে দেখা যায় না। নব নব সহরের সৃষ্টি এবং কল কব্জার অভ্যুদয়ের প্রভাবে নারী অতি দ্রুত গতিতে একেবারে একটা নূতন দেশে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ভাব ও কার্য্যের দিক দিয়ে মনে হয় সে যেন তার পথ হারিয়ে ফেলেছে।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে শিক্ষিতা নারী আজও যন্ত্রচালিত পৃথিবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারেনি। আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আনন্দের মাঝে দাঁড়িয়ে পরিবার পরিচালনা সম্বন্ধে কোনরকম পরিষ্কার ও সন্তোষজনক উপায় নির্দ্ধারণ করতে পারেনি। নারী কোথাও পারিবারিক জীবন হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে কাজে তার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও আনন্দ, সে কাজেই আপনাকে নিযুক্ত রেখেছে, আবার কোথাও তারা একটানা গৃহস্থালীর কাজের ভিতর ডুবে রয়েছে।

মাত্র কয়েকজন নারী ব্যতীত কেউই বিবাহ, শিশুপালন, ও স্নেহ ভালবাসা এবং নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভকে আপনাদের জন্মগত অধিকার মনে করে এই সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করতে পারে নাই। আমেরিকার শিক্ষিত মহিলারা বর্ত্তমান জগতের কার্য্য বিভাগের সঙ্গে আপনাদের কার্য্যাবলীর সমন্বয় স্থাপন করতে পারেন নাই। এমনকি পৃথিবীর কয়েকটী বড় বড় সহরের শিক্ষাগার ছাড়া আর কোথাও মেয়েদের শিশুধারণ ও পালন যে কত বড় দান তা স্বীকার করে সেদিকে শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা মনে করে না।

বর্ত্তমান কলেজে-শিক্ষিতা মেয়েরা গৃহ পরিবারের ও বাইরের কাজের ভিতর সমন্বয় স্থাপন করতে পারেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পারিবারিক জীবনক্ষেত্রে অথবা বাইরের কার্য্যক্ষেত্রে কোথাও নারীকে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সাহায্য করেনা। এ শিক্ষা নারীকে কেবল বাইরের সাজসজ্জা মাত্র দিয়েছে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই উপযুক্ত করে গড়ে তোলেনি।

অধুনা হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেওয়াতে কলেজ সমূহে মহিলাদের বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা চল্‌ছে। মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে টিচার্স কলেজে শিক্ষা সম্মেলনে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অপরিসর গার্হস্থ্য জীবন ও নির্বান্ধব অর্থকরী কর্ম্মক্ষেত্র, এই উভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় অবস্থিত কর্ম্মহীন ও অসন্তুস্ট অসংখ্য আধুনিক মেয়ে সমাজের যে কত বড় অপচয় তাঁরা তা হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পেরেচেন।

ওয়েলেস্‌লি কলেজের গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর শতকরা আশী জন ছাত্রী অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত, কিন্তু অর্দ্ধেকের বেশী বিবাহ করে এবং অর্থকরী বিদ্যাদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করেন। টেক্‌সাসের (Texas) একটি কলেজের প্রেসিডেণ্ট লিখেছেন যে শতকরা সাতানব্বই জন ছাত্রী মনে করে যে বিবাহের পূর্ব্বে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন এবং বিবাহের পর অর্থকরী কার্য্যে অনেকেই নিযুক্ত থাকেন।

অর্দ্ধশতাব্দী ধরে যে গৃহ-পরিবারে মেয়েদের একচত্র আধিপত্য ছিল তাকে অবজ্ঞা করে স্কুল কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সম্প্রতি আর্ট কলেজ গুলিতে মেয়েদের এমন শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে যাতে তারা শিশুপালনে উপযুক্ত হয়।

'মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা মেয়েদের দেওয়া হউক' বর্ত্তমান কলেজ গুলিতে এই বাণীই ধ্বনিত হচ্ছে। সংক্রামক ব্যধির মত উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমের ১৫০টী কলেজের বইয়ের তালিকায় শিশু-পালন ও শিশু-শিক্ষা পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহ ও অর্থনীতি শিক্ষা দেবার জন্য একটি বিভাগ খোলা হবে বলে ঘোষনা করা হয়েছে এবং এ বিভাগে শিশু-পরিচর্য্যা ও শিশুর খাদ্যাখাদ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। বোস্টনের অধ্যক্ষ বলেন যে, এ ক্ষেত্রের কার্য্য এতদূর জটিল যে পুরুষেরও পিতৃত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রধানতঃ দুইটী প্রভাবই এই অন্দোলনের সূচনা করেছে। প্রথমতঃ মেয়েদের কলেজ গুলির অপকৃষ্টমূলক মনোবৃত্তি (inferiority complex) দূর হয়ে গেছে, বিগত ৫০ বৎসরের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফলে বুদ্ধি ও প্রতিভা ক্ষেত্রে মেয়েরা যে ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম তা প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মনোবিজ্ঞানের আলোচনার ফলে শিশুপালন ও খাদ্য-খাদ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নানা নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে।

মেয়েদের সব চেয়ে বড় কাজ গৃহলক্ষ্মী হওয়া ও গৃহনীড় রচনা করা (home making)।

এই গৃহ পরিবারের সবদিকে দৃষ্টি রাখতে হলে মেয়েদের শরীর-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান ও অর্থনীতি শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সমাজ ও গৃহের সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'লে এসব কিছু জানা দরকার। যে মেয়েরা গৃহপরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যবসা ও অর্থকরী ক্ষেত্রে জীবন যাপন করে, তাদেরও শিশু ও খাদ্যাখাদ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে জানা দরকার। ম্যাকসারে কলেজে শিশু মনস্তত্ত্ব, খাদ্য-তত্ত্ব এবং চিত্র কলাদির সৌন্দর্য্য জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। ভাসারে (Vassar) যদিও 'গৃহ তৈরীকরা' বিষয় শিক্ষা-তালিকা ভুক্ত করা হয় নাই, তবুও যাতে বিদ্যার্থীরা ভবিষ্যতে সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য খাদ্যাখাদ্য পরীক্ষাগার ও শিশু পরিচর্য্যার বিদ্যালয় আছে।

৩৭ টী দেশের ৯৫ টী কলেজের ১০০০০ জন ছাত্রী (যারা কেউ গৃহ কার্য্যে এবং কেউ বাইরে অর্থকরী কার্য্যে নিযুক্ত) প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সম্বন্ধে একটি দৈনন্দিন লিপি প্রস্তুত করেছেন। বিজ্ঞান মতে ঐ সকল বিষয়ের ৭টী বিষয়ে যথা—শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, ভূগোল বিদ্যা, কলা বিদ্যা, সমাজনীতি অর্থনীতি ও রাজনীতি, ধর্ম্ম ও নীতি এবং খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এইগুলি সব শিক্ষারই প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

এক শ্রেণীর লোকের মতে 'গৃহ তৈরী করা' শিক্ষাই মেয়েদের একমাত্র শিক্ষা নয়। তাঁরা বলেন নারী ও পুরুষের ক্ষমতা ও প্রকৃতি-গত অনেক সাদৃশ্য আছে, সুতরাং পুরুষের মত নারীকেও তার ব্যক্তিগত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া কর্ত্তব্য। তারা স্কুল কলেজে যে শিক্ষা লাভ করে তা সমাজের পক্ষে অনিস্টকর নয়, কারণ বিবাহের পর ও সে শিক্ষা তারা কাজে লাগাতে পারে। Dr. Ethel Puffer Howes এর মতে মেয়েদের মাতৃত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা নয়। তাদের যেদিকে ঐকান্তিক আগ্রহ ও ইচ্ছা সেদিকেও শিক্ষালাভে সুযোগ দেওয়া উচিত এবং তারপর গৃহ পারিবারিক সম্বন্ধেও কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে মেয়েরা বাইরের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও জীবন পথে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন তাদের হ'তে হবে সে বিষয়েও তাদের একটু শিক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত ডাঃ তারকনাথ দাস মহাশয়ের প্রেরিত একখানি মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ অবলম্বনে উহারই ভাবানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল। গার্হস্থ্য জীবন ও কর্ম্মক্ষেত্র উভয়তই মেয়েদিগকে উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য আমেরিকার কলেজগুলিতে যে বিপুল প্রচেষ্টা ও আন্দোলন চলিতেছে এখানে তাহারই সামান্য আভাষ পাওয়া যাইবে। এ সমস্যাটি আমাদের দেশেও দেখা দিতেছে। ইহার গুরুত্ব ও দায়িত্বের প্রতি শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সঃ জঃ
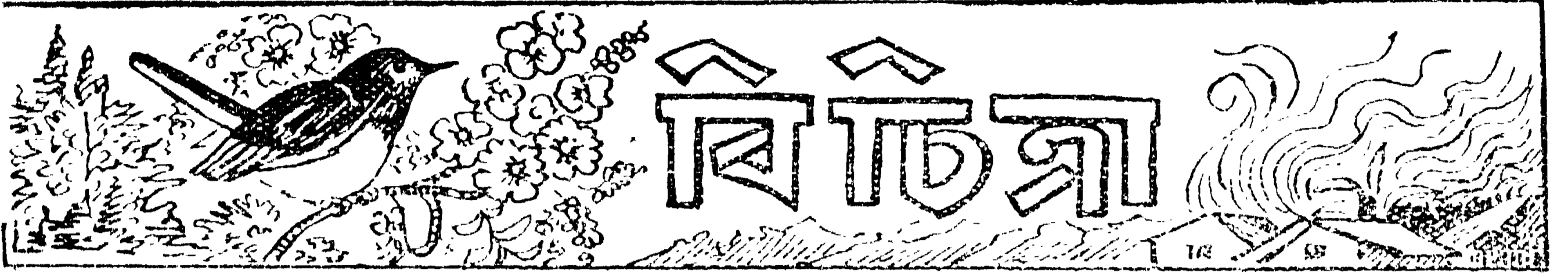
শ্যাম ও ভারতের যোগাযোগ

ভারতের বাহিরে ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, আদর্শ সম্বন্ধে অনেকেরই কোন উচ্চ ধারণা নাই। ভারতবর্ষ পরাধীন ও শক্তিহীন বলিয়াই ইহার সম্বন্ধে বাহিরের লোকের কোন ঔৎসুক্য নাই—এবং তাই এত অজ্ঞ থাকা সম্ভব হইয়াছে। কাজেই আমাদের চেষ্টা দ্বারা, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি, শক্তি সম্পদ জগতের সম্মুখে ধরিতে হইবে—যাহাতে সকলেই ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইতে পারে। একমাত্র ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহার প্রচার কার্য্য চলিয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রতিবাসী এশিয়া মহাদেশ অঞ্চলে ইহার কোন চেষ্টাই হয় নাই। এই সব দেশে ভারতবাসী যাঁহারা জীবিকার্জ্জনের জন্য যান তাঁহারা উচ্চস্তরের লোক নন্। কাজেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদের এই সঙ্কীর্ণ ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়।

ভারতের প্রতিবাসী উন্নতিশীল শ্যামরাজ্যের রাজধানী ব্যাঙ্কক সহরে জনৈক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী স্বামী সত্যানন্দ পুরী গত সেপ্টেম্বর মাসে চুলালঙ্কর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধভাবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। ইনি কলিকাতার ইণ্ডিয়া বুরো এবং ভারত পরিষদের প্রতিনিধিরূপে সেখানে গিয়াছেন। ভারত ও শ্যামের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন ও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। রাজপরিবারের সহিত আলাপে তিনি জানেন্ যে ভারত সম্বন্ধে ইঁহাদের ধারণা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। শ্যামদেশের ভাষায় পুস্তক রচনা দ্বারা তিনি ভারতের চিন্তাশক্তির স্বরূপ ইঁহাদের নিকট প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় শ্যাম ও বঙ্গদেশের কৃষ্টির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সেখানকার বাঙ্গালীদের একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে, এবং এই সমিতিতে তিনি আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য মহৎ এবং তাঁহার কার্য্যপ্রণালীও প্রশংসনীয়। এ সংবাদ প্রত্যেক বাঙ্গালীর মাত্রেই আশা ও আনন্দের সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই। শ্যাম ও ভারতের কৃষ্টিগত আত্মীয়তা পুনঃ স্থাপন প্রচেষ্টা সফল হইয়া বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করুক আমরা তাহাই প্রার্থনা করি।

লণ্ডনে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র-সঙ্ঘ

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের স্বীয় পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বহুদিন ছিল না। আমাদের আশার ও আনন্দের বিষয় যে গত ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান্ ষ্টুডেন্ট্স্ সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন" এই অভাব দূর করিয়াছেন। ইহার উদ্বোধনকালে অধ্যাপক রমণ, স্যার হরি সিং গৌর, স্যার অ্যালবিয়ন বন্দোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সাপুরজী সকলতওয়ালা প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীগণ উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করেন।

এই সংঘ সম্পূর্ণ ছাত্রদের দ্বারাই সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত। সংঘের বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ২৫০। ইহার কার্য্যপ্রণালী ও সুব্যবস্থা সম্পন্ন। ইহার উদ্যোগে ছাত্রদের একটি বাসস্থান গঠিত হইয়াছে সেখানে খেলার বন্দোবস্ত

আছে। একটি পাঠাগার স্থাপনেরও চেষ্টা হইতেছে। ছাত্রদের পড়িবার জন্য ভারতীয় প্রায় সকল মাসিক পত্রিকাই এবং ইউরোপ ও আমেরিকার পত্রিকাগুলি রাখা হয়। বর্ত্তমানে একটি ভোজনশালাও স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রদের মনোরঞ্জনের জন্য একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা, গান বাজনা তর্ক বিতর্ক ইত্যাদি হয়।

সংঘের পক্ষ হইতে প্রকাশ্য সভায় মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মালব্য ও মিঃ পেটেলকে মান পত্র দেওয়া হয়। শ্রদ্ধেয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও একবার অভিনন্দিত করা হয়। প্রায়ই ভারতীয় মনীষীদের ছাত্ররা অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন।

এই সংঘ কতকগুলি শাখায় বিভক্ত। তার মধ্যে একটিতে সাহিত্য আলোচনা হয় ও অন্য আর একটিতে ভারতীয়দের জন্য ফুটবল ক্লাব ও ইউরোপীয়দের মধ্যে ভারতীয় খেলার প্রচলনের চেষ্টা হয়।

গত বৎসর এই সংঘের উদ্যোগে বিদেশস্থ সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি "ফেডারেশন অফ্ ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্টস্" স্থাপনের প্রস্তাব হয়। এই বৎসর ম্যুনিকে ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে—এই 'ফেডারেশন্' স্থাপনের আলোচনার জন্য।

এই সংঘ প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখে এবং তাহাদের বিশেষরূপে সাহায্য করে।

ইহার বর্ত্তমান কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ সরকার আগামী জানুয়ারী মাসে সংঘের প্রতিনিধি হইয়া দেশে আসিবেন—ইউরোপীয় শিক্ষা সম্বন্ধে দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে।

বিদেশে এইরূপ একটি সংঘ গঠিত হওয়াতে প্রত্যেক ছাত্রই সুবিধা হইয়াছে। ইহার ফলে ছাত্ররা বিদেশেও তাহাদের দেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে। ইহার প্রতি শিক্ষিত দেশবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত, কারণ আত্মীয় স্বজন বর্জ্জিত বিদেশে গিয়া নানারূপ অবস্থা বিপর্য্যয়ে অনেককেই পড়িতে হয়, সে অবস্থায় একটী দেশী প্রতিষ্ঠান তাহাদের নানাভাবে সাহায্য করিতে পারে।

তুরস্কে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা

সম্প্রতি কনষ্টাণ্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সেখানে একটি পুস্তকের মেলা বসিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা।

যদিও আজ প্রায় ৩ বৎসর যাবৎ তুরস্ক আরবী লিপি পরিত্যাগ করিয়া ল্যাটিন লিপি গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি নূতন লিপির সাহায্যে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা দুই হাজারের বেশী হইবে না। তুরস্কে পুস্তকের মূল্য অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি মহার্ঘ। স্কুল কলেজের ছেলেরাই বেশীর ভাগ পুস্তক কিনিয়া থাকে। তাই আজকালের সাহিত্য বলিতে গেলে, স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তক নিয়াই। এই দেশের পণ্ডিত সমাজ মনে করেন যে পর্য্যন্ত না প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদ পত্রের কাটতি এক লক্ষের উপর উঠিবে এবং দশহাজার বই দৈনিক বিক্রি হইবে, সেই পর্য্যন্ত তুর্কীরা শিক্ষিত জাতি বলিয়া দাবী করিতে পারে না। তাই দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত লোকই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে, শীঘ্রই এখানে একটি তুর্কীভাষাতত্ত্বের কংগ্রেস বসিবে। ইহাতে তুর্কীভাষার আরও কি কি উপায়ে সংস্কার করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা হইবে। আনাটোলিয়া এবং মধ্য এশিয়ার রূপকথা বর্ত্তমান বিজ্ঞান সম্মতভাবে অধ্যয়নের এবং গবেষণার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই ব্যাপারে কনষ্টাণ্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ই অগ্রণী।

এ বছরের নোবেল প্রাইজ

এ বছর নোবেল প্রাইজ সাহিত্যের জন্য দেওয়া হইয়াছে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক জন্ গলস্‌ওয়ার্দীকে এবং রসায়ন শাস্ত্রের জন্য দেওয়া হইয়াছে আমেরিকার ডাঃ ল্যাংমুরকে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রাইজ দেওয়া হয় নাই।

ভারত ও জার্ম্মানীর কৃষ্টির সহযোগিতা

ডয়টসে একাডেমির সিনেট একমত হইয়া বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এবং ডাঃ সি, ভি, রমণকে অনারারি করেসপণ্ডিং মেম্বারের পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। গত বৎসর স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এই সম্মান লাভ করাইয়াছিলেন। ডয়টসে একাডেমির পক্ষ হইতে ভারতীয় মনীষীগণের এই সম্মান প্রদান কেবল মাত্র তাঁহাদের প্রতিভার পরিচায়ক নয় কিন্তু ইহা ভারত ও জার্ম্মানির মধ্যে কৃষ্টির সহযোগিতার নিদর্শন স্বরূপ।

চলচ্চিত্র দ্বারা শিক্ষা বিস্তার

গত আগষ্ট মাসের 'ইয়ং বিল্ডার' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করা হইল—

"সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছেন এবং অশিক্ষিতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ইহাই প্রধান উপায় মনে করিয়াছেন। চলচ্চিত্রের কাজ শিক্ষার জন্য তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র এবং ছাত্ররা যাহাতে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করিতে পারে তার জন্য ২৪১টি স্কুল আছে। চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েট পরিচালকরা বাস্তবের সহিত যোগ রাখিয়াছেন।—কোন মেয়ের দরকার হইলে বা কোন ডাক্তারের প্রয়োজন হইলে বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য আনা হয়। এইজন্য তাহাদের চলচ্চিত্রে বাস্তবজীবনের সংস্পর্শ আছে। সাধারণতঃ আমরা যাহা দেখি সেই রকম কেবল মাত্র সমাজ ধর্ম্মের প্রচারের বা ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি তাহাদের চিত্রের উদ্দেশ্য নয়। তাই রাশিয়াতে তাহারা চিত্র দেখে আমোদ প্রমোদের জন্য নয়—ইহা তাহাদের দৈনিক কর্ম্মের অঙ্গ। তার জন্য এখানে যে আমাদের বন্দোবস্ত নাই তাহা নয়, কিন্তু সে কেবল আমোদ প্রমোদের জন্যই।

চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা এখানে কেবলমাত্র সহরের ভিতরেই আবদ্ধ না—প্রত্যেক গ্রামে, স্কুলে, হাসপাতালে, কারখানায়, সর্ব্বত্রই ইহার প্রচলন। শ্রমিক শ্রেণী তাহাতে সহজেই প্রবেশাধিকার পায় তার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করেন।"

রাশিয়ায় চলচ্চিত্র দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের বেশ সহজ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। শিক্ষা বিস্তারের অন্যান্য উপায় সময়সাপেক্ষ—এই উপায় বোধহয় সহজ ও চিত্তাকর্ষক হয়। আমরাও যদি দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চলচ্চিত্রের সাহায্য লই, তাহা হইলে সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে বেশী অসুবিধা হয় না। শিক্ষা বিভাগের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আমরা অনুরোধ জানাইতেছি, কারণ এখন আমাদের দেশেও অনুন্নত শ্রেণী, শ্রমিক কৃষক প্রভৃতির শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা ও চেষ্টা চলিতেছে। ব্যাপকভাবে অল্পসময়ের ভিতর শিক্ষা দিবার এ যে উৎকৃষ্ট পন্থা— রাশিয়ায় তাহার প্রমান পাওয়া যাইতেছে।

গোয়ালিয়রে মহিলা সম্মেলন

গোয়ালিয়র তৃতীয় মহিলা অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাননীয়া স্বরূপ রাণী হাসকর সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যের বিভিন্নস্থান হইতে পাঁচ শতের উপর প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী মাননীয়া বিজয়বাই পাটঙ্কর একটী সুন্দর ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি বালিকাদের জন্য বাধ্যতা মূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলনের এবং মহিলা শিক্ষয়িত্রীগণের জন্য ট্রেনিং কলেজের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলেন।

শিশুবিবাহ বা বাল্য বিবাহের কুফল দর্শাইয়া তাহার নিন্দা করেন এবং বলেন যে উহার দ্বারা নারীর জীবন নষ্ট হইয়া যায়। গোয়ালিয়ারেও শিশু বিবাহ বন্ধ আইন হইবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার বিরুদ্ধে, জাতিভেদের এবং সামাজিক ছুঁৎমার্গের তিনি খুব নিন্দা করেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে সকল মানুষ একই ঈশ্বরের সন্তান এবং সকল জাতির উপরই ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে।

তিনি সকলকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেশের আর্থিক দুর্গতি দূর করিতে অনুরোধ করেন।

সভাতে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে, বালক বালিকার জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন, মহিলাদের জন্য ট্রেনিং কলেজ স্থাপন, সর্দ্দাবিল সমর্থন, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য নরনারীকে শিক্ষা দান।

জাতীয় স্বাতন্ত্র্য দাবী

নারী প্রাগতিকেরা যদিও মনে করেন বিশ্বের নারী আজ উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু ভাল করিয়া চিন্তা করিলে উহার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ মনে আসে। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব বিষয় প্রত্যেকটী কার্য্য, এমনকি ভাবনা চিন্তায় পর্য্যন্ত তাহার প্রকাশ ও পরিণত করিতে তাহাকে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইয়াছে, বর্ত্তমানেও তাহাই হইবে।

সম্প্রতি জেনেভার জাতিসঙ্ঘে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য দাবীতে পুনরায় তাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন।

সমগ্র পৃথিবীর ৪ কোটি ৫০ লক্ষ মহিলার প্রতিনিধিগণ গত ২ বৎসর যাবৎ পুরুষদের সহিত সমান জাতীয়তার দাবী করিয়া আসিতেছিলেন। জাতিসঙ্ঘ পরিষদের আইন কমিটিতে পুনরায় তাঁহাদের পরাজয় ঘটিয়াছে।

মহিলা প্রতিনিধিগণ হেগ সম্মেলন সর্ত্তের ৮ হইতে ১১ ধারা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া জাতীয়তা হিসাবে পুরুষদের সহিত সমানাধিকার দাবী করিয়াছিলেন। দুই জন সদস্য ভোট দান করেন নাই।

বিবাহিতা মহিলাগণ যাহাতে স্বীয় ইচ্ছানুসারে স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণ করিতে পারেন অথবা নিজের জাতীয়তা রক্ষা করিতে পারেন, তজ্জন্য চিলির ম্যাডাম মাটি ভার্গারা, কোলামম্বিয়ার ম্যাডাম ম্যারিয়া ডি পাজানো, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কানাডার মিঃ চার্লস এইচ, কাজান তাঁহাদের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন।

ডেন্‌মার্কের ভারত বন্ধু

ডেন্‌মার্ক দেশীয় ভারত বন্ধুদিগের উদ্যোগে কোপেনহেগেনে গত অক্টোবর মাসে একটি মিটিংয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিল—

ডেনমার্ক ও নরওয়ে দেশীয় ভারতবন্ধুদিগের এবং কোপেনহেগেনের শান্তি সমিতির উদ্যোগে কোপেন-হেগেনের এই মিটিং এই মত জানাইতেছে, যে ৩৫ কোটি ভারতবাসীর স্বায়ত্ত শাসন লইয়া ভারতবর্ষে ইংরাজের সহিত তাহাদের যে বিবাদ চলিয়াছে, তাহাকে কেবলমাত্র ইংরেজরাজের নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার বলা চলে না, কারণ ইহার উপর সমগ্র পৃথিবীর তথা বিশ্বমানবের শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

ইংরেজ শাসন কর্ত্তারা অস্ত্রহীন ভারতীয় স্ত্রী পুরুষ ও শিশুগণের উপর বলপ্রকাশ করিয়াছেন—

অহিংসা প্রচার কার্য্যে আহত ভারতবাসীকে সাহায্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট রেডক্রস্ ব্যবহার করিতে দেন নাই। পুলিশকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়া অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে।

বিনা বিচারে এখনও কারাবাসের হুকুম হয়—এবং অস্বাস্থ্যকর আন্দামান দ্বীপে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে নির্ব্বাসনে পাঠান হইতেছে।

আমরা এই সকল অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আমাদের বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিতেছি। ভারতের প্রশ্ন আজ শুধুই ভারতে আবদ্ধ হইয়া নাই—সমগ্র মানব জাতির কল্যানকল্পে ও জগতে শান্তি স্থাপন কার্য্যে ইহার প্রয়োজনীয়তা সুদূর পাশ্চাত্যের শান্তিকামী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদীগণ ইহাতে কর্ণপাত করিবেন কি?

চীনদেশে দাসী বিক্রয় প্রথা

চীনের আভ্যন্তরিক মন্ত্রীসভা দাসী বিক্রয় প্রথা রহিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া চীনদেশীয় স্ত্রী লোকদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শত শত বৎসর ধরিয়া মুইৎসাই (muitsai) অথবা দাসী বিক্রয় প্রথা চীনদেশের একটি কলঙ্ক ছিল। এই প্রথায় গরীব সংসার হইতে কুমারীদিগকে যৎসামান্য মূল্যে ক্রয় করিয়া ধনী গৃহে বিক্রয় করা হইত। মেয়ের দাম হইতে সাধারণতঃ তাহার ভ্রাতার শিক্ষার খরচ প্রদত্ত হইত।

এমন কি আজকালও এই কুপ্রথার প্রচলন আছে, বিশেষতঃ গ্রাম্যপ্রদেশের গরীব গৃহে স্ত্রী সন্তান একটি ভাগ্য বলিয়া গণ্য হয়। কোন কোন স্থলে বাপ মা অনেক সময়ই তাহাদের প্রিয় সন্তানকে বিক্রয় করিতে রাজী হন্ না—কিন্তু নিজের পিতামাতার আহার সংস্থান ও ভ্রাতার শিক্ষা ও সন্মানের জন্য মেয়েরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দাসত্ব বরণ করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত চীনদেশে বিরল নয়।

এই হতভাগ্য দাসী দিগের উপর নিষ্ঠুর ও দুর্ব্যবহারের ফলেই গভর্ণমেণ্ট দাসী বিক্রয় প্রথা উঠাইয়া দিবেন স্থির করিতেছেন। সংকল্পটী এখনও কার্য্যে পরিনত হয় নাই। সভ্য জগতে নারীদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার এখনও চলে ইহাই আশ্চর্য্য।

লবণ শুল্ক বৃদ্ধি ও বাংলা

ধনিকতন্ত্রতার চরম আত্মপ্রকাশ তাহার উৎকট স্বার্থপরতায়। অর্থের প্রতি স্বাভাবিক লোভ মানুষের অর্থার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে এমন তীব্রভাবে বাড়িয়া যায় যাহার জন্য নিকট আত্মীয় প্রতিবেশী পড় করিয়াও অর্থশোষন করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ আসেনা। বোম্বাই বহুদিন হইতে ও নানা ভাবে বঙ্গদেশকে শোষণ করিয়া অপরিমিত ধন অর্জ্জন করিতেছে বাংলায় ধনে ধনী হইয়া সে আর্থিক দুর্দ্দশাগ্রস্থ বাঙ্গালীর উপর নূতন বোঝা চাপাইবার সহায়তা করিয়াছে বাংলার লবণ শুল্ক বৃদ্ধির ব্যবস্থাকল্পে।

স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইল বাংলাতে—তাহার প্রাক্কালে সে বাংলাদেশ বিলাতী বস্ত্রই ব্যবহার করিত, কিন্তু এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়ায় এবং তখনও বাংলায় প্রস্তুত কাপড় না থাকায় বাধ্য হইয়া সে বোম্বাইয়ের বস্ত্র কিনিতে আরম্ভ করে। বোম্বাই বণিকের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত বাংলা দেশে তখন হইতেই সুরু হইয়াছিল। ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কোন কাজ বাংলা করেনা, অপরকে শোষণ করিয়া নিজকে সমৃদ্ধ করিবার বুদ্ধি বাংলার নাই বলিয়াই ব্যবসায় ক্ষেত্রে সে এ পর্য্যন্ত অক্ষম অজ্ঞই রহিয়া গেল।

অমিত অর্থের মালিক বোম্বাই আজ রাজনীতি ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতেছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বল্প আভাসেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

গত দেড় বৎসর হইল, বাংলাদেশে বিদেশ হইতে যে লবণ আমদানী হয় তাহার উপর সাড়ে চারি আনা শুল্ক স্থাপন করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ের লবণ বাঙ্গলা দেশে বেশী পরিমাণে আশানুরূপ বিক্রি হইত না বলিয়া বোম্বাই ও এডেনস্থিত বোম্বাইয়ের বনিকগণের লবণ অধিক বিক্রির জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ দিয়া আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করাইয়াছে—যাহার মূল্য বাঙ্গালীকে দেড় বৎসরে দিতে হইয়াছে ৪০ লক্ষ টাকা। ইহাতে ও তাহারা সন্তুষ্ট না হইয়া সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব করিয়াছে, যে মন প্রতি লবণের শুল্ক আরও এক আনা বৃদ্ধি করা উচিত। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে মূল্য বাবদ বাঙ্গালীকে আরও প্রায় ২০ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হইতে হইবে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য যদিও আজ বাঙ্গালা এ সকল বিষয় ভাবিবার মত অবসর ও মনের স্থৈর্য্য নাই, তাহা হইলেও এই সকল অহিতকর আইন প্রণয়নের ফল সমগ্র জাতিকে ভোগ করিতে হইবে. তাহার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় ইহা যে আরও কতদূর ক্ষতিকর হইবে তাহা মনে করিয়া এ বিষয় সময় থাকিতে ভারত সভা এই কার্য্যে উদ্যোগী হওয়া উচিত। বাংলা বাঁচিতে চায়, তাহার রক্ষার ব্যবস্থা বাঙ্গালীকেই করিতে হইবে।

গোলটেবিল ব্যয়ভার

তিনটি গোলটেবিল সভায় একলক্ষ পাঁচানব্বই হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। এই খরচের বৃটেন বহন করিয়াছে একাত্তর হাজার পাউণ্ড আর দুর্ভাগ্য ভারতের বহন করিতে হইয়াছে একলক্ষ চব্বিশ হাজার পাউণ্ড প্রায় আঠার লক্ষ ষাট হাজার টাকা।

বিবেচনা করিলে দেখা যায় এত অতিরিক্ত খরচের কোন প্রয়োজন ছিল না। মুমূর্ষু ভারতবাসী অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া নিরুপায় ভাবে এম্‌নি অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আপন দুঃখের বোঝা বাড়াইয়া চলিয়াছে। ইহার প্রতিকারের উপায় শাসক কখনও, ভাবিবেন না ভাবিতে হইবে আমাদেরই।

অস্পৃশ্যতা নিবারণী সঙ্ঘ

জাতির উন্নতি সাধন কখনও একশ্রেণীকে বাদ দিয়া সম্ভবপর নয়। এই মর্ম্মবাণী প্রচার করিলেন সত্যের ঋত্বিক মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার এই বাণী সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য দেশময় একটা সাড়া পড়িয়াছে। দেশের অবনত শ্রেণী যাহারা সবচেয়ে কম খাইয়া, কম পরিয়া অর্দ্ধ মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে—তাহাদিগকে উন্নতস্তরে উঠাইবার দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করিয়াছে, সকলেরই। ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সমস্ত বাহ্যিক আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া প্রতি বৎসর পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঁচবৎসরে পতিত হিন্দুজাতির সর্ব্বতোভাবে উন্নতি কামনায় শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলা সভাপতি ও মিঃ এ. ডি, থ্যাকার সম্পাদকরূপে এক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে।

এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য অবনতশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, তাহাদের আর্থিক ও শারিরীক অবস্থার উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা। সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহাদের অবাধ গতি থাকিবে। মোটকথা তাহাদের সর্ব্বতোভাবে উন্নতিই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সমস্ত ভারতে প্রায় ৪ কোটী হরিজন বাস করে। কর্ম্মক্ষেত্রগুলি বাইশটি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে ১৮৪টি কেন্দ্র থাকিবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে ৫০০০৲ টাকা অবনত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে ও কর্ম্মীদের ব্যয়স্বরূপ খরচ করা হইবে।

পাঁচ বৎসরের সঙ্কল্প লইয়া এই কর্ম্মক্ষেত্র আরম্ভ হইল। কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের দ্বারা একনিষ্ঠ-ভাবে কার্য্য করিলে জাতির যথেষ্ট উন্নতির আশা করা যায়। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিয়া মহাত্মার প্রাণান্ত করা চেষ্টাকে ফলবতী করুক এবং সমগ্রজাতি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া জাতির শ্রী, গৌরব বৃদ্ধি করুক ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আমেরিকায় মিষ্টার প্যাটেল

মিঃ প্যাটেল বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। তিনি ভারতের বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রতি আমেরিকাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল ধারনা সংশোধন করিতে যত্নপর হইয়াছেন। ওয়াসিংটনে পৌঁছিয়া তিনি ওয়াসিংটনের সমাধির উপর মাল্যদান করিয়া বলেন 'আমাদের বিদ্রোহ জর্জ্জ ওয়াসিংটনের বিদ্রোহেরই অনুরূপ।'

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদ নির্ব্বাচনে ৩ জন প্রতিদ্বন্দী ছিলেন—সাধারণতন্ত্রী মিঃ হুভার, সমাজতন্ত্রী মিঃ নরম্যান ও গণততন্ত্রী মিঃ রুজভেল্ট। প্রকৃতপক্ষে প্রতিদ্বন্দীতা চলিয়াছে গণতন্ত্রী মিঃ রুজভেল্ট ও সাধারণতন্ত্রী মিঃ হুভারের মধ্যে। অধিক ভোট পাইয়া মিঃ রুজভেল্টই প্রেসিডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম। তিনি নিউইয়র্কের গবর্ণর ছিলেন।

তাঁহার বৃটনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশে আশঙ্কা করা হয় ইউরোপের আর্থিক ও সমরঋণ সমস্যার সুবিধা হইবে। কিন্তু আশা করা যায় তিনিও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেসিডেণ্টের ন্যায় বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের অস্ত্রহ্রাস, যুদ্ধনিবারণ ও আর্থিক সমস্যা সম্পর্কিত নীতির সহিত সহযোগিতা করিবেন। গণতান্ত্রিক দলের জয়ের ফলে মার্কিন কংগ্রেসও গণতান্ত্রিক সদস্য সংখ্যা বেশী লইবে।

ভারতীয় সভ্যতার অনুশীলন

একশত বৎসর পূর্ব্বে ইং ১৮২৭ সনে ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহা বহু বৎসর ধরিয়া ভারত সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছে। এই সমিতির মধ্যে ইউজন বাণফ, বার্গেন, বার্থ, এমিলসেনাট, সিলভ্যাঁ লেভি প্রভৃতি পাশ্চাত্যের বহু প্রথিতযশা অধ্যাপক ভারতের পুরাতত্ত্ব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। আমাদের দেশ হইতে যে সব ভারতীয় ছাত্র বিলাতে গমন করেন, তাঁহারা এই সমিতিতে বিশেষ অভ্যর্থনা লাভ করেন; এইখানে যে সমস্ত প্রাচ্য দর্শন সংগৃহীত আছে, তাহা তাঁহারা পড়িতে পান।

এই সমিতির গত বৎসরের (১৯৩০-৩১) কার্য্য-বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই বৎসর প্রধানতঃ (১) বৈদিক সাহিত্য ও ভাষা, (২) ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, (৩) ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্য, (৪) ভারতীয় দর্শন, (৫) বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম এই সব বিষয়ে গবেষণা করা হইয়াছিল।

প্রকাশ বিভাগেও সমিতির কার্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ বাহির করা হইতেছে। ইহার অনুবাদক স্বর্গীয় অধ্যাপক সেনার্ট।

সংস্কৃত-ফরাসী অভিধানের প্রথম খণ্ড লিখিত হইয়া ছাপান হইতেছে। নাগপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মার পত্নী শ্রীমতী ভানুমতী কৃষ্ণ বর্ম্মা এই অভিধান মুদ্রণের কার্য্যে ১৫,০০০ ফ্রাঙ্ক দান করিয়াছেন। প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে যাহাতে এই সমিতির গ্রন্থালয়ে যথেষ্ট পুস্তক থাকিতে পারে, তজ্জন্য বোম্বাইয়ের এন্ এম

ওয়াদিয়া ট্রাষ্ট (N.M. Wadia Trust of Bombay) ১০, ০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই সমিতির আর্থিক অবস্থার সচ্ছলতার জন্য বরোদার গাইকোয়াড়ের দানের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা হইবে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ১৯৩০ সনে বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুত কালিদাস নাগ ও শ্যামদেশীয় যুবরাজ দামরঙ্গের সহিত এই সমিতির কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন। এই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর' উপাধি পাইয়াছেন, শ্রীযুত দিবাকর, ইয়ামুফ হুসেন এবং এস্ মিত্র। এখনও ভারতের তিনজন কৃতী মহিলা ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমিতিভুক্ত হইয়া গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় নারী সদস্য

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইনানুসারে বিহার ও উড়িষ্যা নারী পরিষদ হইতে কুমারী শৈলবালা দাস গত নভেম্বর মাসে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা দাস তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিস্ ডি অ্যাক্রুকে ৪৮—৪২ ভোটে হারাইয়া দিয়াছেন। ইঁনিই বিহারের নারী নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে প্রথম সেনেটার নিযুক্ত হইলেন।
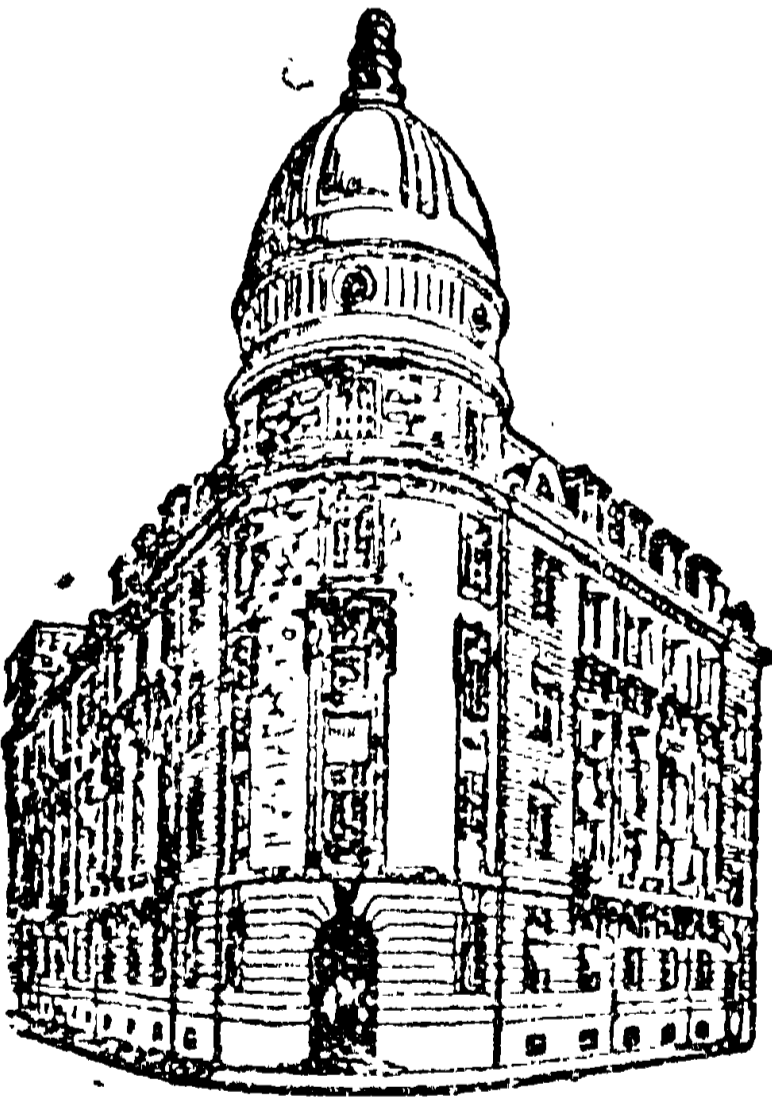
বিপত্তি

শ্রীধরিত্রী দেবী

সহরের একখানি দ্বিতল বাটীর উজ্জ্বল আলোকিত ঘরে একখানা খাটের উপর একটী মেয়ে শুইয়া আছে,—গায়ে একখানা কাপড় দেওয়া, বছর ছাব্বিশ বয়েস। দেখিলে মনে হয়, কালে ইঁহার সৌন্দর্য্য খুবই ছিল, এখন মুখে পাণ্ডুরতা, শীর্ণ নিস্প্রভ চাউনি, রোগেভোগা মুর্ত্তিখানি, বড় ম্লান।

মাথার কাছে পাখা হাতে বসিয়াছিল রানু—বছর ষোলো বয়স। মাসিমার হাঁপানীর টান আজ বাড়িয়াছে, রানু খানিকক্ষণ পরে কহিল—'কেমন লাগচে, মাসি? বুকে পুরোন ঘীটা দিয়ে দেব কি?'

'নারে-আর কিছু লাগচে না। এখনতো কমেচে, তুমি একটু এই ফাঁকে গিয়ে ঘুরে এসোনা রানু?'

'কিযে বলো মাসি, তোমাকে একা ফেলে আমি বাইরে যাবো। আমার তো আর কিছু হয়নি?'—বলিয়া রানু খাটের উপর পা দুইটী তুলিয়া ভাল করিয়া বসিল।

'তোর মেশোকে একটু ডেকে দিয়ে যানা? আজ তো তাঁকে দেখতেই পাইনি। বেরিয়ে গেচেন বুঝি?

'বেরিয়ে কোথায় যাবেন মাসি, বাইরের ছাতে আচেন। আমাকে বল্‌ছিলেন যেতে, তা আমি কি করব ছাতে বসে বলতো?'

'গেলিনি কেন মা? সারাদিন একঘরে বন্ধ হ'য়ে থাকা। বুকে একটু হাতখানা দেতো মা—' রানুর উজ্জ্বল চোখদুটী ভারী কোমল। মেয়েটীকে দেখিলে চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়,—ছিপ্‌ছিপে পাতলা সুশ্রী চেহারা, কিন্তু মুখে ভারী স্নিগ্ধ একটী গাম্ভীর্য্য পূর্ণ ভাব আছে। দেখিলে ভারী ভাল লাগে। মৃণালিনী চোখ বুজিয়া বালিশ দুটাতে আর একটু হেলান দিয়া শুইয়া কহিলেন, পুরুষ মানুষ সারাদিন কি রোগীর ঘর ভাল লাগে?' রানু কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। মেশোমশাই কেন যে এমন করেন, রানু এ কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। মাসীর এতো অসুখ, নাই গেলেন বাইরে একদিন, ভারী তো বেড়ানো। ঘরে একটু বসিলে কি হয় জানি না।

* * * *

অতটুকু দুই বছরের মেয়েটীকে কোলে লইয়া— মন্দাকিনী যখন বিধবা হইয়া বাপের বাড়ীতে আসিল মৃণালিনী তখন বাপের বাড়ীতে। বিবাহের দুবছর পরে আসিয়াছে। শ্বশুর বাড়ীর

আদরিণী বধূ, সে শীঘ্রই চলিয়া যাইবে। মন্দাকিনীর কোলের মেয়েটীর আগে পরপর তিনটী আরো ছেলে মেয়ে। নূতন বৈধব্যের শোকে সে অভিভূত। মৃণালিনী রানুকে বুকে তুলিয়া লইলেন, যতদিন বাপের বাড়ীতে থাকিলেন, রানুকে বুক ছাড়া করিলেন না। এ যেন তারই মেয়েটী।

ছয় মাস পরে তিনি ফিরিয়া গেলেন রাণুকে নিয়াই—মন্দাকিনী অনেক করিয়া বারণ করিলেন, তাহার মা অনেক বুঝাইলেন, ছোটছেলের ঝঞ্ঝাট সে সহিতে পারিবে কেন ? আর শ্বশুর শ্বাশুড়ী কি মনে করিবেন,—সে হয়না—আর অসুখ বিসুখ ভালমন্দ সবই আছে। কিন্তু মৃণালিনীর চোখের জলের কাছে কাহারও কোন যুক্তি টি'কিল না। মন্দাকিনীকে দুইহাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—'দিদি, তোমার ও মেয়েটা তো আমাকেই দিয়েচ, তবু কেন যেতে দেবেনা ? সে কিছুতেই হবেনা, এর ওপর তোমার কোন দাবী দাওয়া নেই তোমার যারা রইল, তাদেরই তুমি দেখ। ও আমার মেয়ে, মাঝে মাঝে তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাবো। মন্দাকিনী আর কিছু বলিতে পারিলেন না, মাকে বলিলেন 'নিয়ে যাক মিনু ওকে, আমি সবগুলোকে দেখতে সময়ও পাইনা, আর ওরও সখতো হয়। রানুকে ও অত ভালবাসে নিয়েই যাক্, আমারই একটু কষ্ট হবে, রানুর আর কি ?' মা আর বিশেষ আপত্তি করিলেন না। তবু পরের জিনিষ, তার ওপর কিই বা দাবী। মৃনালিনী যখন অত বড় মেয়ে হইয়া স্বেচ্ছায়ে এ ভার গ্রহণ করিতেছে তাঁহার আর কি ? যাক,—সব ভাল থাকিলেই ভালো।

তাহার পর হইতে সুদীর্ঘ তের বছর রানু মাসীর সঙ্গেই আছে, এখন তাহার বয়স পনর ষোল হইল প্রায়। মাসীর সঙ্গে গিয়া সে বহুবার মার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছে কিন্তু থাকিতে পারে নাই, কারণ ইদানীং মৃনালিনী হাঁপানীতে বড় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাড়ীতে তাহার স্বামী শিখর নাথ, তাহার পিসিমাতা। তাহার মা মারা গিয়া পিসীমাই গৃহিণী, এই পিসীমাটী চিরকাল বাপের বাড়ী থাকায় স্বভাবটা কিছু মুখরা ও কর্ত্রীত্ব স্পৃহা খুব বেশী ছিল। মৃনালিণীর হাঁপানী থাকা সত্ত্বেও সে উঠিত ও কাজকর্ম্ম করিত, রানু মাসীকে তাহার সমস্তখানি শক্তি দিয়া ভাল রাখিবার চেষ্টা করিত, আর পিসীমার সঙ্গে ঝগড়া করিত। শেখরের বড় ভায়ের দুটী ছেলে বাসায় থাকিয়া পড়িত—তাহাদের দেখাশোনা করিবার ভার ছিল রানুর উপর।

সেদিন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে,—ঘরের ভিতর জানালা দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের পাণ্ডুর আভা মৃনালিনীর মুখ খানির উপরে পড়িয়া তাহা আরো পাণ্ডুর, বিবর্ণ দেখাইতেছে। রানু খাটের উপর চুলের ফিতা আয়না ইত্যাদি লইয়া তাহার চুল বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল।

'আচ্ছা রানু, উনি বেরিয়ে গেলেন জলখেয়ে গেলেন তো ? চা ক'রে দিয়েছিলি তো ?'

'বারে,—তাঁকে সব দিয়েই তো এসেচি, তুমি যে কি, খালি আমি কিচ্ছু দেখিনা-না ? চা ক'রতে গিয়েই তো গল্প করছিলাম আমরা। আচ্ছা মাসি, মেশোমশাই আমাকে অত ঠাট্টা করেন

কেন? খালি সারাদিন রানু তুমি কি সুন্দর, তোমার চোখ কি সুন্দর—এই সব বলেন। আজ চায়ের জল করচি, তা বললেন আগুণের তাতে রানু রাঙ্গা হ'য়ে উঠেচে।'

'উনি খুব কথা বলেন এখন, নারে?' তোকে সুন্দর বলবেন না তো কে সুন্দর আছে, বল্? মাসি তো গঙ্গাযাত্রী হ'য়ে আছে, গেলেই হয়। এ জীবন্মৃত হ'য়ে থেকেও যন্ত্রণা—মলেই শান্তি। ঘরের ভিতর দুইটী নারীর হৃদয়েও বাহিরের মতই অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। এই অন্ধকার বুঝি ইহাদের ভিতরে একটুখানি ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছিল। কি যে বিষয়, কেন যে এমন হয়,—শিখরনাথকে লইয়া এই দুইটী নারীর ভিতর অলক্ষে যেন একখানি দুস্ক্রমনীয় ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছিল।

মৃণালিণী জানালার বাহিরে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, কে জানে রানুর কচি মনে আঘাত দিয়া ফেলেন নাই তো? যে কথাটা অষ্ট প্রহর মনের মধ্যে রহিয়াছে, যে চিন্তার মীমাংসা করিতে করিতে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতো তিনি ঘুণাক্ষরেও বাহিরে প্রকাশ করিতে চান না। অথচ কিযে বিষয়টা, সেটা এমনিই অপবিত্র, অশুচি, যে তিনি মনের কাছেও যেন তাহা স্বীকার করিতে সাহস পান না। মৃণালিণীর কথা শুনিয়া রানু কোন উত্তর করিল না। সে সবচেয়ে রাগ করিত, মাসী যখন তখন কেন এই মরিবার কথা তোলেন! সে মাসীকে যত ভুলাইয়া রাখিতে চায়, তিনি ততই সেটাকে খুঁচাইয়া বাহিরে আনিতে চান কেন?

রাণুকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মৃণালিনী কহিলেন 'রাণু কাছে এসে বোস্ মা, চুলগাছা তোর বেঁধে দি। কিবা যত্ন করছি তোর, আয় না মা'।

'না, তোমাকে আমার চুল বাঁধতে হবেনা, আমার চুল আমিই বাঁধিতে পারি। যখন তখন মরতে পেলেই তো তুমি বাঁচো, এই কথাটাই দিবারাত্র শোনাচ্চ। আমার খুব ভাল লাগে, না?' বলিয়া রাণু পিছন ফিরিয়া আয়না চিরুণী গুলা দেরাজের উপর রাখিয়া বোধ করি চোখের জল চাপিবার জন্যই বলিল,—'যাই কাজ আছে নীচে।' মৃণালিনী আর ডাকিলেন না, তিনি জানিতেন রাণু এই সব কথা শুনিলে আন্তরিক ব্যথা পায়,—তাহার রাগ শীঘ্র মিটিবার নয়।

রানু ছাতে গিয়া দাঁড়াইল। একটু রাত হইয়াছে, একাদশীর চাঁদ প্রায় অস্ত যাইতেছে। সুমুখের ল্যাম্প পোষ্টগুলাতে আলো জ্বলিতেছে, শীতকালের কুয়াসাভেদ করিয়া খুব উজ্জল দেখাইতেছে না। রানু ভাবিতেছিল কেন এমন হয়। মেশোমশাই কেমন করিয়া যেন তাকান; খালি যখন তখন বলেন রানু কাছে এস, কেমন ভাবে যে কথা বলেন তাহার ভাল লাগেনা। মাসীও এখন অন্য রকম হইয়াছে, এই যে মাসী রুগ্ন আজ কতদিন ধরিয়া ভুগিতেছে, কেন মেশোমশাই কি একটু কাছে বসিতে পারেন না? এত গল্প করিতে সময় পান, তাহার কি এটুকু বুদ্ধি নাই, কেন এমন হয় তাহা কি সে বোঝে না? পদশব্দ শুনিয়া পিছন ফিরিতেই শিখরনাথ কাছে

আসিয়া কাঁধের উপর হাতখানি রাখিয়া কহিলেন, 'কার কথা ভাবচ রান্নু? একলাটি ছাতে অন্ধকারে,—আমাকে ডাক্‌লেই হোত।'

'বারে, আমার তো আর ভয় করে না, আপনি কি করতে আসবেন?'

'কি ভাবছিলে, রান্নু? আজ তোমার জন্যে ভারী একটা নতুন জিনিষ এনেচি কি বল ত? 'চীনাবাদাম,—না ডালমুট,—

'তাও না। তুমি কিন্তু রাগ করতে পাবে না রান্নু'—

'আপনি তো রোজই আন্‌চেন আমি রাগ করব কেন? শিখরনাথ একটা ভেলভেট কেস তাহার সামনে খুলিয়া ধরিলেন। বাতির আলো পড়িয়া একজোড়া ইয়ারিং জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। দুইটী বড় উজ্জ্বল মুক্তা। শিখর নাথ দেখিলেন রান্নুর মুখখানা কেমন ম্লান হইয়া উঠিল। সে যেন বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, তিনি ভাবিয়াছিলেন রান্নু খুব খুসী হইবে। কিন্তু এ কি লজ্জা?

'আচ্ছা, আপনি কি যে করেন, আমাকে এতো দামী জিনিষ দেওয়ার কি হোল? আপনার সবই বাড়াবাড়ি।' শেষের দিকে তাহার কথার সুরটা কেমন ঝাঁঝাল লাগিল—'রান্নু, তুমি নেবে না? আমি কত ক'রে আনলাম একটু খুসীও হবেনা,—বলনা রান্নু। আমি অন্যায় ক'রেচি?'

'হ্যাঁ, মাসিমা দেখলে, কি সব না, এ আপনার বড় অন্যায় মেশোমশাই। দিন আপনি মাসিমার কাছে আগে, তারপর আমি নেব।'

'কেন, আমার হাত থেকে নেবে না? আপত্তি আছে কিছু? মাসী কি তোমাকে খেয়ে ফেলবেন, নাকি? আমি যাকে ভালবাসি, তাকে যা আমার খুসী তাই দেব,—কার কি তাতে? তোমার মাসির জন্যে ভয় করে? আশ্চর্য্য—অথচ এই মৃণাল আমাকে কত বলত আগে, থাক্‌গে রান্নু, বড় অন্যায় করেচি, কিন্তু এই অহেতুকী ভয়ের কারণটা কি শুন্‌তে পাই না?'—

'ভয় আবার কি? আমার অত ভয় টয় নেই, মাসির ওষুধ দেওয়ার সময় হয়েচে—কটা বাজে মেশোমশাই?'

'জানিনে রান্নু, তুমি একটু থাক না এখানে। আমাকেও কি ভয় করে? আমি তো আর তোমায় বক্‌বনা? বলিয়া শিখর নাথ সস্নেহে রান্নুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া তাহাকে কাছে বসাইবার চেষ্টা করিলেন।

'আমাকে ডাক্‌চে যে, যাই আমি। কত রাত হোল, মাসির খাওয়া আছে,—যাই, মেশোমশাই, আপনিও নীচে আসুন না?' বলিতে বলিতে রান্নু অকারণ ব্যস্ততার সহিত নীচে চলিয়া গেল, শিখর নাথ চুপ করিয়া ইয়ারিং জোড়া হাতে করিয়া বসিয়া রহিলেন। যে কথাটা এতোদিন মনের ভিতর বাষ্পাকারে ছিল, সেটা যে কবে ধীরে ধীরে এমন জমাট ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, শিখরনাথ তাহা যেন এতোদিন টের পান নাই। আজ রান্নুর এই ভাবটী মৃণালের প্রতি অকারণ একটা ভয়, সঙ্কোচ ভাব যেন তাঁহাকে একটী সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া গেল। রান্নু আর তাঁহার কাছে

একা থাকিতে চায়না—কেন সঙ্কোচ আসে ? এটা যেন ঠিক খাপ খাইতেছে না—মৃণালের কথা ভাবিয়া আরো অস্থির হইয়া উঠিলেন, কেন তাহার এই অবিশ্বাস ?

সেকি তাঁহার একটী ক্ষুদ্র উপহার দেওয়াতেও অসন্তোষ প্রকাশ করে ? কিন্তু কেন ? মৃণালকে তিনি তো সবই দিয়াছেন ? সেকি এটুকুও সহ্য করিতে পারে না ? আমি কি দুর্ব্বল ?

নীচে নামিতেই মাসীর পায়ের কাছে মালা হাতে বসিয়াছিলেন পিসিমা, রাণু ঘরে ঢুকিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'বুকের ব্যথাটা বড্ড বেড়েছিল, বৌমা তো অস্থির, আবার সেই ফিটের ব্যামোটা বাড়ল, তা বলি রাণু গেল কোথায় ? সে নইলে তো বউমার অসুখে কেউ করে দিলে হবেনা, নীচ তো আতি পাতি করলাম, কোথায় ছিলি ? মেয়ের যদি ঝুঁটী দেখা যায়—সেই মোহিনী আসে, বুকে পিঠে মালিশ করে, তবেগে বৌ ঠাণ্ডা হ'ল। বলি রাণুকে ডাকি, তা বৌমা বলে, আমাকে মোহিনী দিলেই হবে। নিশির কাছে গেলে কি আর তোর জ্ঞান থাকে না, কতরাত হোল বল্ তো ?'

রাণুর মুখে ভয় ও সঙ্কোচের ছায়া পড়িল, 'আমি তো ছাতেই ছিলাম পিসিমা, একটু ডাক্‌লেই হোত আমি আসতাম,—এখন কেমন আছ মাসি ?' বুকে হাত বুলিয়ে দেব ?' মাসী বলিলেন 'ভালই আছি, তোমার কিছু করতে হবেনা।' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

'আরে মোহিনী, যানা বাপু, শিখরকে ডেকে দে না হয়, ডাক্তারকে একবার বলে আসুক রাত্রে আসে একবার,—শিখর ফিরেচে তো বাসায় ? না তার তো বেড়ানই সারা হয় না দশটার আগে, একটু দেখবে শুনবে, সেদিকও না।'—

'কেন, বাবু তো সেই সন্ধ্যেকালেই এসেচেন্ পিসিমা, সেইতো ছাতে এই কাল ধরে গল্প করছিলেন, দিদি তুমিই বলনা ? বিনি তো বল্ল তাই, আমি তো আর বেরুইনি ঘর থেকে কে কোথায় কি করে জানব বল ? আমি চল্লুম বউমা, রাণু দিদি রইলেন।' মোহিনী চলিয়া গেল,—পিসিমা আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া জপেরমালা সমেত হাতখানা কপালে দেবতার উদ্দেশ্যে ঠেকাইয়া উঠিয়া কহিলেন,—'কিজানি বাপু তোমাদের রীত্, বুড়ো মানুষ আমরা ওসব বুঝিনা। এই মাসি মাসি করে মরেন, আবার তো মাসী হেদিয়ে মরেও সাড়া পান না, অত গল্পগাছা কি দিন রাত্তির ? যাই, আবার সব খাওয়ার ব্যবস্থা করি,—নীচে তো আর নামতে পারিনি বাতের জ্বালায়'—বলিয়া পিসিমা নীচে চলিয়া গেলেন।

রাণু নিঃশব্দে নির্ব্বাক হইয়া মৃণালের কাছে বসিয়া রহিল। এতোকাণ্ড হইয়া গিয়াছে সে আসে নাই, সে যে শিখরের কাছে গল্প করিতেছিল, কাহারও সাড়া শুনিতে পায় নাই, এটাই যেন ভীষণ অপরাধ হইয়া গিয়াছে। সকলেই যেন সেই ইঙ্গিতই করিতেছে। কেন, সেই তো সারাদিন রাত মাসির কাছে থাকে দেখে, একটু সময় যদি সে অনুপস্থিতই থাকে, সেটাকি এতোই দোষের হইয়াছে ? সে তো নিজে শিখরনাথকে ডাকিয়া লয় নাই,—তিনি গেলেন সেকি তার দোষ, তিনি যখন তখন তাহাকে একলা পাইলেই কাছে আসেন, সে তাহাকে নিবারণ করিবে কি করিয়া। আজই

বিকালে মাসি কি সব বলিলেন। এখন হইতে সে খুব শক্ত হইয়া থাকিবে কিন্তু মাসিতো তাহাকেই বলিতে পারেন, সে কি পর হইয়া গিয়াছে?—একটা কথাও বলিতে পারেন না?—

'মাসি, কেমন লাগচে এখন? আজ সন্ধ্যার সময় তুমি তো অষুধ খাওনি,—আমার মনে ছিল না, দেব এখন?

মৃণালিণী বলিলেন, 'দেনা কি দিবি, ও তো তুই দিস্ বলে আমি আর কারো কাছে চাইনা। রাণু প্রীত হইয়া উঠিল, আলমারীর কাছে দাঁড়াইয়া অষুধ ঢালিয়া দিতে দিতে বলিল, 'তোমার নাকি ফিট্ হ'য়েছিল? যখন শরীরটাতে সয়না নাই বা উঠতে বিছানা থেকে—কেমন আছ এখন?'

'ভালই আছি—ও আর নতুন কি, একটা একটা লাগাই আছে। তুই কোথায় গিছ্লি? ওখানে চিঠিপত্র গুলো আছে,—দিস্ তো।'

রাণু চিঠি দিয়া চলিয়া গেল।

বিকাল বেলা রাণু নীচের কাজ করিয়া উপরের বারাণ্ডাতে মোড়া লইয়া অসমাপ্ত সেলাইটা সারা করিবার অভিপ্রায় বসিল। তাহার মন যেন কেমন হইয়া গিয়াছে,—সর্ব্বোপরি তাহাকে এই লজ্জাতে যেন অভিভূত করিয়া দিয়াছে, বাড়ীর সকলে তাহাকে ও শিখরনাথকে লইয়া কি ভাবিতেছে। মৃণালিণী যদি এই রকম ভাবিতে পারিলেন, সে আর কাহাকে কি বলিবে? যাহা সে কল্পনাতেও আনিতে ঘৃণা করে, কি করিয়া সে নির্লজ্জের মত তাঁহাকে বলিবে, তুমি ভাব যা আমি তা নই, আমি হীন নই। এ কি অপরিসীম লজ্জা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে,—তাহার আর আপন কে আছে? কিন্তু মাসীর রুগ্নদেহে এই সব চিন্তার বিষ প্রবেশ করাইয়া সে কি আরো অনিষ্ট করিবে? এই মাসী তাহাকে মায়ের মত চিরদিন সব দুঃখ বিপদ হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে সে তাঁহার মেয়ে হইয়া, তিনি ছিঃ—এইবার রাণুর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। ঘৃণায় তাহার কপোল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল,—সে যাহা চন্দন ভাবিয়াছিল, তাহা যেন পঙ্ক হইয়া গিয়াছে। সে মার কাছে ফিরিয়া যাইবে, এখানে থাকিলে এ অশান্তি আর ঘুচিবে না। নানান চিন্তা রাণুকে ঘিরিয়া ধরিল, সে যেন জোর করিয়া বলিতে চাহিল মাসি, তুমি কি করিয়া এমন ভুল করিলে? আমি কি তোমার মেয়ে নই? আর সকলে বলুক, কিন্তু তুমি তো আমাকে চেন। রাণুর সেই উজ্জ্বল চঞ্চল চোখে ভীতু ভীতু ভাব আসিয়াছে, সর্ব্বদা যেন সঙ্কুচিত অপরাধীর মত, কেন সব এমন হইয়া গেল। সহজ ভাব কি ফিরিয়া আসে না?

শিখরনাথ বারাণ্ডাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, রাণু যেন ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, 'ও কি, আপনি? এখানে কেন? বেড়াতে যাননি?' যেন তাঁহার এখানে আসাটা রাণু মোটেই চায় না,—'ও কি, তুমি কি ভয় পেলে? আর এই অন্ধকারে চোখ বিঁধিয়ে সেলাই কেন কর?'

'মেশোমশাই, কতদিন থেকে যে বল্‌চি আমাকে এক প্যাকেট উল আনিয়ে দিন, তাও দিচ্চেন না! আজ নিশ্চয়ই দেবেন, এখন তো যাচ্চেন বাইরে?'—

'না, আজ আর বেরুব না শরীরটা ঠিক নেই। দেখি কি হ'চ্ছিল এতক্ষণ?' 'শি নাথ কাছে জানালাটার উপর বসিয়া সেলাইটা তুলিয়া লইলেন। তাঁহার শীঘ্র উঠিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। রাণু বলিল, 'ভাল লাগ্‌চে না আর এখানে আমার থাকতে, চারিদিক আটকা আর কলকাতায় থাকতে পারচিনা। মাকেও বহুদিন দেখিনা, ভাবচি একবার যাব শীগ্গিরই; বলিয়া রাণু শিখরের দিকে চাহিল, যেন অসহায়, তাহার কাছে অনুমতি চাহিতেছে—দৃষ্টিতে তাহার শ্রান্ত ভাব ফুটিয়া উঠিল।

'কোথায় যাবে, বাড়ীতে? এই বারে তো যাবেই, একটা কিছু ঠিক হোক আগে, বিয়ের জন্যে যে রাণু ব্যস্ত হ'য়ে উঠচ—আচ্ছা আর তো দেরীও নেই তার কিসের?' বলিয়া শিখরনাথ কতকটা রসিকতার ভাবে জোরে হাসিয়া উঠিলেন।

'তাতো আর আমি বল্‌চি না, আপনি অমনি বল্‌লেই হ'ল। তাছাড়া মাকেও লিখেচি আমি যাব, দিন কত ঘুরে আসব।'

শিখরনাথ যেন কতকটা আত্মগত ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'এই রাণু, তখন এতটুকু মেয়ে ঘুরে বেড়াত ছোট্ট ডলটীর মত দেখাত,—সেবারে শিলং থেকে যখন আসি, তুমি তখন সাত আট বছরেরটী। যখন খুব দুষ্টুমী ক'রতে, মৃণাল আমাকে ডাক দিত। বাপ্‌রে, কি ভয়টাই পেতে আমাকে দেখে মেশোমশাই যেন বাঘ ভালুক, তাই তুমি ভাবতে, না রাণু?' শিখর নাথ সস্নেহে রাণুর হাতখানি হাতের ভিতরে লইলেন। তারপরে কবে কোথা দিয়ে যে এত বড়টী হয়ে উঠলে, যেন টেরই পেলামনা। সেই রাণু আজ বিয়ে হয়ে শ্বশুর ঘর ক'রতে যাবে।' সহসা অন্ধকারে কার ছায়া দেখিয়া শিখরনাথ রাণুর হাত ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—

'একি মৃণাল?—এই অন্ধকারে বাইরে এসচ কেন?' মৃণাল কবাট ধরিয়া দাঁড়াইল, 'এমনি এলাম, একটু বারাণ্ডা খানাতে বসতে।'

শিখর নাথের চট্ করিয়া রাণুর হাতখানি ছাড়িয়া দেওয়া ও রাণুর অবনত মুখ খানির দিকে চাহিয়া মৃণাল যেন সব স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তীব্র কথাগুলো বলিতে চাহিয়াছিল কিন্তু সে ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল,—'এই অন্ধকারে কি গল্প করছিলি রে রাণু?'—রাণু মাসির মুখের দিকে একবার চাহিয়া হঠাৎ ব্যস্ততার সহিত জিনিষপত্র গুলো তুলিতে তুলিতে কহিল, 'এই শীগ্গিরই বাড়ী যাব, তাই বলছিলাম মেশোমশাইকে। তোমারও শরীরটা একটু ভাল আছে, আমার আর যেন মন টিঁকছে না এখানে। বোস তুমি মাসি, আলো আনি।' রানু সেলাইগুলো লইয়া চলিয়া গেল।

রাণু যাইবার দিন সকালে মৃণালের ঘরে গিয়া দেখিল মাসিমা শুইয়া আছেন। তাহাকে দেখিয়াও কোন কথা কহিলেন না, তাহার দিকে তাকাইলেন না।

রাণু কাছে গিয়া ছোট মেয়েটীর মত তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'মাসি, এখনও কেন তুমি রাগ করচ? খুসি হয়ে বল আমি যাই।'

রাণু কেন যে নিজে থেকে চলিয়া যাইতেছে, কেন যে মাসিকে একটী কথাও বলে নাই এই চিন্তাটা লইয়া সে এতোদিন ভাবিয়া ভাবিয়া এতো যন্ত্রণা ভোগ করিল, অথচ একটী কথাও সে মাসিকে বলে নাই, একটী দিনও বলে নাই, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও এই কথাটী সে কেন বলিল না। রাণু কি দেখে না মাসি কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে?

রাণুর যাওয়ার শেষ মুহূর্ত্তে যে সে এমন করিয়া সব সংশয়ের বোঝা লইয়া যাইবে, কে জানিত! আজ যেন সব মৃণাল সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাই তাহার দুর্ব্বলতা আর বাধা মানিলনা, দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল যেন মঙ্গলাশীর্ব্বাদের মতই। রাণুর মাথাটা তিনি জোরে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বাহির হইতে কে বলিল, 'রাণুদি, শীগ্‌গির এসনা। রাণু মৃণালের বুকের মধ্যে মুখ রাখিয়া বলিল, 'মাসি, যে দিন তুমি সব ভুল বুঝতে পারবে, আবার আগের মতন হবে, সে দিন আমাকে আসতে বোল। তোমার চিঠি পেলেই আমি আসব, দেরী কোরনা কিন্তু'—বলিয়া হাসিতে গিয়া আরো কয়েক্‌ ফোঁটা অশ্রু মৃণালের পায়ের উপর ঝরিয়া পড়িল।

পা

শ্রীমানারাণী দেবী

জীবনের যাত্রাপথে কত আসে, কত চলে যায়,
লেখা থাকে হৃদয়ের মর্ম্মপটে, স্নিগ্ধ নিরালয়।
কত ভুলি কত ফেলি কত তুলে, লয়ে চলি সাথে,
হয়'তো আপনি কত ঝরে পড়ে, ভাঙ্গি বেদনাতে।
হয়তো চাহিনি যারে এসেছে সে, হৃদয়ের মাঝে,
প্রত্যাখাত করুণ ছবিটি তার, মর্ম্মে মর্ম্মে বাজে।
একান্ত চেয়েছি যারে অবহেলি সরে গেছে দূরে,
পরাণ পিয়ালা কেহ ভরিয়াছে সুমধুর সুরে।
সাঙ্গ আজি খেলাধূলা আনমনে দিন গুণি তাই,
খেয়াঘাটে বসে আছি আর কিছু চাহিবার নাই।
সারাটী জীবন ভরে পেয়েছি যে অশ্রু গান হাসি,
শেষের চলার পথে পাথেয় সে চির অবিনাশী।

নারীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী

মেয়েদের বিষয়ে কোন নূতন বই (এখন অবশ্য আর তেমন নূতন নাই। এই আলোচনাটী কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিত, তবে তাহা হইলেও বইখানির পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা আছে) প্রকাশিত হইলে প্রথমেই আতঙ্ক হয় বিরুদ্ধতার হিমাচলে আর একটী প্রস্তর বুঝি সংযুক্ত হইল। খ্যাত ব্যক্তি প্রণীত বা বিজ্ঞানসংজ্ঞিত হইলেও সে শঙ্কা দূর হয় না। কারণ মেয়েদের বিষয়ে বড় লোকের কাছ হইতেও এবং বিজ্ঞানের নামেও অনেক কিছুই গলাধঃকরণ এ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। সেইজন্য Langdon Davies প্রণীত "A short History of Women" বইখানিও তেমন আশা লইয়া আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু প্রথমেই ইহা যে একটী সত্যের ও বিশ্বাসের ভাব জাগাইয়াছে ক্রমেই তাহা পূর্ণ করিয়া আগ্রহ জন্মাইয়াছে। নারী সম্বন্ধে মানুষের এতদিনের যে মনোভাবের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতির ইতিহাস লেখক সমস্ত বইখানি ধরিয়া দিয়াছেন, এখনও যাঁহাদের সেইভাবই কম বেশী রহিয়া গিয়াছে, তাঁহারা হয়ত ইহারও কোন কোন কথা লইয়া নারীপ্রগতিকে ধমক দিতে আসিতে পারেন। কিন্তু ঐ বিষয়ে ভাবনা, চিন্তার দায় যাঁহারা রাখেন, বইখানিতে তাঁহারা অনেক সাহায্য ও চিন্তার খোরাক পাইবেন। পাশ্চাত্য দেশের নারীর ভাগ্যের ইতিহাসই অবশ্য ইহাতে প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। তাই পড়িতে পড়িতে মনে হয় ভাবোচ্ছ্বাসের ফেনিলতা, আপ্ত বাক্য লইয়া কুস্তি, সস্তা জাতীয়তা বা তথাকথিত পাশ্চাত্য যৌনবিজ্ঞানের অবিচারিত খিচুড়ী তৈরী ছাড়িয়া এমনি একখানি সরল সবল ইতিহাস কবে আমাদের মেয়েদের সম্বন্ধেও রচিত হইবে। তবে বইখানি আমাদের দেশের নারীর ইতিহাস বুঝিতেও খুবই সাহায্য করে সন্দেহ নাই। কারণ আমাদের দেশও কিছু পৃথিবী ছাড়া নয়। এই পৃথিবীর মাটি, জল হাওয়াও সর্ব্বত্রই, আর ইহাতেই জাত মর্ত্ত্য নরনারীই এখানেও বরাবরই ছিল ও আছে। একস্থানের সহিত অপরস্থানের ভাবের বা রক্তের আদান প্রদান ও হয় নাই এমন নয়।

যাহা হউক এখন বইখানির বিষয়েই আসা থাক। জীববিদ্যা (biology) মতে প্রাণীর জন্ম ও যৌনবিভাগের বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনাটী সহজ, পরিষ্কার; উহাতে শেষকথা বলিয়া খতম করিবার প্রয়াস নাই বা এক সূত্র ধরিয়া নিজের কোন বিশেষ প্রিয় মতবাদে (pet theory) ঝম্পপ্রদানও নাই। এই বিভাগে লেখক দেখাইয়াছেন জীব-জন্মের জন্য দ্বৈলিঙ্গত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়। বহুকোষ উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীজন্মের পূর্ব্বে

* A short History of Women—By Langdon Davies.

প্রকৃতি আরও নানা উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধিতে ছিলেন এবং এখন নিম্নশ্রেণীর জন্তু ও উদ্ভিদের মধ্যে তাহা চলিয়া আসিতেছে। লিঙ্গবৈশিষ্ট্য অনেক প্রাণীর মধ্যে নাই। প্রত্যেক কীট দ্বিধাবিভক্ত হইয়াই আপনাদের বৃদ্ধি ও রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থায় শীঘ্রই জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিপ্রবাহে ক্লান্তি জন্মে। তখন প্রধানতঃ সাময়িকভাবে দ্বৈলিঙ্গত্বের আবির্ভাব ঘটে। এবং মাঝে মাঝে ঐ উপায়ে বলাধান করিয়া লইয়া আবার পূর্ব্ব নিয়মের দ্বিধাবিভক্তির সৃষ্টিলীলা চলে। কোন কোন কীট এবং উদ্ভিদের মধ্যে আবার এক দেহেই দ্বৈলিঙ্গত্ব দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে উদ্ভিদকে এক বৃক্ষেই সৃষ্টিক্রিয়া সংসাধনের পরিবর্ত্তে বিভিন্ন বৃক্ষের বীজজ পরাগের সম্মিলনের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতে দেখা যায়। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় দ্বৈলিঙ্গত্ব জীবসৃষ্টির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় না হইলেও ইহাতে তাহার অনেক উন্নতি ও সাহায্য হয়। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা জীবনীশক্তির নবীকরণ, দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টির শ্রমবিভাগ, তৃতীয়তঃ বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনার বৃদ্ধি ঘটে। কারণ একজনের উত্তরাধিকার অপেক্ষা দুইজন হইতে তাহা পাওয়া গেলে স্বভাবতঃই উহা বিচিত্র ও সমৃদ্ধতর হইবার সম্ভাবনা। দুইজনের গুণ মিলিয়া জীবনসংগ্রামে টিঁকিয়া থাকার যোগ্যতাও বেশী লাভ করা যায়।

জীববিদ্যা এখনও অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাতে এই যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাত বর্ত্তমান নারীপ্রাগতিকদের অনুকূলেই উষ্মাপ্রকাশ। সুতরাং "Some feminists" (কতকগুলি স্ত্রীপ্রাধান্যবাদী) বলিয়া তিনি কাহাদের প্রতি উষ্মাপ্রকাশ করিয়াছেন বোঝা যায় না। তাঁহাদের গালি দিতে গিয়াই তিনি বিপক্ষদের কিছু সুবিধা দিয়াছেন এবং ঐতিহাসিকের গাম্ভীর্য্যেরও কতকটা লাঘব ঘটিয়াছে। তিনি যে বলিয়াছেন এক রকম শিক্ষা দীক্ষা যতই হউক, একটা বালিকাকে বালক বা একটা বালককে বালিকা কখনই করা যাইবে না, নারীপ্রগতিবাদীরা ত তাহাতে আশ্বাস ও সমর্থনই পাইবেন। কারণ তাঁহারাই ক্রমাগতঃ বলিয়া আসিতেছেন ভাল জিনিষ যাহা কিছু সবই নরনারী উভয়কেই আপনাপন ব্যক্তিগত শক্তি, প্রকৃতি অনুসারে গ্রহণ করিবার ও তাহাতে বিকাশ লাভের সুবিধা দেওয়া হউক, তাহা হইলেও তাহারা নরনারীই থাকিবে, অন্য কিছু হইয়া যাইবে না। মানুষের বুদ্ধি বিকাশের আদিমাবস্থায় সমস্ত জীব ও জড় বস্তু সম্বন্ধে তাহার যে অনির্দ্দেশ্য ভয় ছিল (ভিতরে ভিতরে যাহা এখনও যথেষ্টই রহিয়াছে) নারী সম্বন্ধে আবার পুরুষের বিশেষরূপেই সেই ভাব থাকায় এবং জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এক একরকম ভ্রান্ত ধারণা ও অজ্ঞানতায় নারীর অবস্থাও যে এক এক সময়ে এক এক জাতির ভিতর এক একরকম দাঁড়াইয়াছে তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। নারীপ্রগতিবাদীরাও ত তাই বলেন যে নরনারী উভয়েরই শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধ এতটা আচ্ছন্ন, অবিকশিত, ভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে যে তাহাদের শক্তি, প্রকৃতি বা সম্ভাবনা যে কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই যখন শক্তি প্রকৃতি প্রয়োজনের এত তারতম্য তখন প্রথম হইতেই নর নারীর জন্য কোন বিশেষ গণ্ডী না কাটিয়া সকলকেই আপনাপন

শক্তি প্রকৃতি প্রয়োজনানুযায়ী গুণ কর্ম্মের চর্চ্চা করিতে দেওয়া হউক না। তাহা হইলেই বরং নর নারীর সত্য প্রকৃতি, সম্ভাবনাদি জানিবার, বুঝিবার সুবিধাই হইবে। আর তাহাতেও যখন নরনারী নরনারীই থাকিবে তখন ত কোন ভয় বা ক্ষতির কারণ নাই। "Male character" (পুরুষ চরিত্র) বা Female character" (স্ত্রী চরিত্র) বলিয়া যে এমন কিছু বিশেষ রকম স্বতন্ত্র পদার্থ নাই:তাহাত তিনিও বলিয়াছেন।

জীবন সংগ্রামে টিঁকিয়া থাকিবার জন্য জীবজগতে নানা আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বনের দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন। মানুষের মধ্যে সেই জীবনের সমস্যা আরো বহুগুণেই জটিল ও বিচিত্র। তা'ছাড়া মানুষ স্ত্রী পুরুষে বিভক্ত জন্তুরূপে প্রজা সৃষ্টির যন্ত্র হইলেও তাহার মনুষ্যত্বের বা জাগ্রত বুদ্ধির দাবীও আছে। বিশেষতঃ অন্য জীবের মত প্রকৃতির প্রেরণায় মাত্র নয়, সেই জাগ্রত বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়াই যখন তাহার সব সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তখন নরনারী সকলের মধ্যেই তাহার চর্চ্চা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র মুক্ত রাখিতে পারিলেই তাহা প্রকৃষ্টতররূপে সাধিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া যাহা করিতে হয় মানুষ কাজের বা বৃত্তির (occupation) পরিবর্ত্তন করিয়াও তাহা করিতে পারে। সেইজন্যও নরনারীর শিক্ষাদীক্ষা, কাজকর্ম্ম সম্পূর্ণ পৃথক হইলে চলে না। কারণ উভয়েরই সব রকম কাজ করিবার আবশ্যকতা অনেক সময়ই আসিয়া থাকে। "Eggs way" অর্থাৎ সৃষ্টি রক্ষার প্রয়োজনেও তাহাদের মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার যোগ্যতা থাকা দরকার। মানুষের মধ্যে এই "Eggs way" জটিল। সরাসরি প্রজনন ভিন্নও সকল রকম মঙ্গল কর্ম্মকেই ত প্রকৃত পক্ষে "eggs way" বা সৃষ্টি সৌকর্য্যের কাজ বলা যাইতে পারে। কাজেই সে সব কাজে নিযুক্ত থাকিয়াও মানুষের যৌনধর্ম্ম অনুসারে চলাই হয়। যেমন মেয়েদের রাষ্ট্রসভার অনুসারে সদস্যপদ গ্রহণ ও ভোটপ্রাপ্তি তাঁহাদের যৌন বিষয়েরও অনুকূল। কারণ তাহাতে আপনাদের জাতীয় বিশেষ স্বার্থরক্ষা মূলক (শিশুত্ব, মাতৃত্বের রক্ষা, সাহায্য ইহারই অন্তর্গত) আইন কানুন প্রণয়ণ এবং বিরুদ্ধ আইনাদির নিরোধ তাঁহাদের আয়ত্বে আসে। আর প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মানব ব্যবস্থাই তাঁহাদের স্পর্শ করে বলিয়া সব বিষয়ের সহিতই ত তাঁহারা জড়িত।

তিনি যে দেখাইয়াছে নরনারীর স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব কেবল যৌনযন্ত্রেই আবদ্ধ নয়, সমস্ত দেহেই উহার প্রভাব পরিব্যাপ্ত; তাহাতেও নারীপ্রাগতিকদের কোনই আপত্তি বা মুস্কিল নাই। এক অন্নই গ্রহণ করিয়াও স্ত্রী বা পুরুষ দেহ যখন স্ব স্ব প্রয়োজনই সিদ্ধ করে, মানসিক অন্ন সম্বন্ধেও যে তাই এই শুধু তাঁহারা বলিয়া থাকেন। প্রত্যেক বিষয়ই ত প্রত্যেকে আপনাপন প্রকৃতি, প্রয়োজনানুসারেই গ্রহণ এবং তাহা হইতে সেই অনুযায়ী ফলই লাভ করে।

নরনারীর প্রকৃতির কতকগুলি লক্ষণ যৌন কারণ বশতঃই প্রকাশ পায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মেয়েদের চাঞ্চল্য, পরিবর্ত্তনশীলতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতাদি তাহাদের

বিশেষ শারীর ধর্ম্মের জন্যই ঘটিয়া থাকে দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে নারীদেহে সময় বিশেষে ক্যালশিয়মের অল্পাধিক্য ঘটিবার কারণগুলি বোঝা গেলেও মেয়েরা সত্যই পুরুষাপেক্ষা চঞ্চল, অস্থির, দায়িত্বহীন পরিবর্ত্তনশীল বেশী কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। অবশ্য উহার সবগুলিই দুর্ব্বলতা বা দোষ কিনা বলা যায় না। কারণ চাঞ্চল্য, পরিবর্ত্তনশীলতাদি প্রতিভা এবং ক্রমোন্নতির সম্ভাবনাও সূচিত করে। অনেকস্থলে আবার এইগুলি পুরুষেরই বেশী আছে বলিয়া সেই প্রতিভার অধিকারী বলাও হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য বিষয় ছাড়িয়া দিলেও যৌনসম্বন্ধে (যৌনলক্ষণ যাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পাইবার কথা) স্থৈর্য্য, অপরিবর্ত্তনীয়তা, দায়িত্ব ইত্যাদি কাহারা এ পর্য্যন্ত বেশী দেখাইয়াছে? এবং মেয়েদের সম্বন্ধে চাঞ্চল্যাদির প্রবচন সত্ত্বেও রাষ্ট্রসমাজ, পরিবার সমস্তই এ বিষয়ে দায়িত্ব, স্থৈর্য্য, দৃঢ়তাদির দাবী কাহার কাছেই বা বেশী করিয়া আসিতেছে?

মেয়েরা যতই ব্যায়াম করুন না, পুরুষের মত পেশীর দৃঢ়তা ও শক্তি লাভ করিতে পারিবেন না ইহাও তিনি বলিয়াছেন। তাহাতেও কোনই ক্ষতি দেখা যায় না বা মেয়েরা সেইজন্য ব্যায়ামের চর্চ্চা করিবেন না ইহাও কিছু বোঝায় না। যে যতটা শরীর মনের উন্নতি করিতে পারে, তাহার সুবিধা যেন থাকে ইহাই কথা। বিশেষতঃ পেশী সম্বন্ধে মেয়েদের দুর্ব্বলতা এবং মেদ বৃদ্ধির দিকেই প্রবণতা থাকিলে তাহার প্রতিকারের জন্য উহার চর্চ্চাই ত তাঁহাদের আরো করা উচিত। জ্ঞানের কাজইত প্রকৃতির উন্নতি, সংশোধন ও সাহায্য। দুর্ব্বলতা আছে বলিয়াই কাহাকেও ঠেসিয়া না ধরিয়া (তিনিও যাহার উল্লেখ করিয়াছেন) যথাসম্ভব তাহার নিরাকরণই ত আবশ্যক। সকল রকম শারীরিক, মানসিক দুর্ব্বলতা সম্বন্ধেই ইহা খাটে। খালি মেয়েদের কেন নরনারী উভয়েরই শারীর, মানস যে সমস্ত দুর্ব্বলতা প্রকৃতির জন্যই হউক বা এতদিনকার অবস্থা শিক্ষা দীক্ষার জন্যই হউক দাঁড়াইয়া গিয়াছে, জ্ঞানের সাহায্যে যত দূর হয় তাহার নিবারণ ও শক্তি বৃদ্ধিইত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত যাহাই হউক কাহারও কোন বিষয়ে স্বভাবতঃ সবলতা কি শ্রেষ্ঠতা থাকিলে তাহাত থাকিবেই। তাই বলিয়া কি দোষ, দুর্ব্বলতাগুলি সংশোধনের বা কমাইবার চেষ্টা হইবেনা?

স্ত্রীপুরুষত্বের একটী চিহ্ন গতি ও অপেক্ষা ধরিয়া পুরুষ নারীর অনুসন্ধান করিবে আর নারী শুধু তাহার অপেক্ষা করিয়া থাকিবে ইহাও কিছু দাঁড়ায় না। নরনারীর মধ্যে সেই ধর্ম্ম তাহাদের যৌনকোষের মধ্যে আছে। গতিশীলতা কিছু বেশী হয়ত পুরুষের ইহা হইতে জন্মিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া নারী যদি পতির সন্ধানে বিরত থাকে, তবে তাহার যৌন উদ্দেশ্যও বিফল হইবারই সম্ভাবনা। এই সবেই বোঝা যায় জীববিদ্যা হইতে জানিবার বিষয় অনেকই পাওয়া গেলেও নরনারী সম্বন্ধে সমস্ত মীমাংসা শুধু তাহা হইতেই হইবার নয়। কারণ মানুষ জন্তু হইলেও মননশীল। এমনকি মনস্তত্ত্ব বিদ্যার সাহায্যেও তাহার সব তত্ত্ব নিঃশেষে অধিগত হইতে পারে কিনা সন্দেহ। যেহেতু মনস্তত্ত্ব বিদ্যায়ও মানুষ তখন যাহা আছে তাহাই বলিতে পারে। তাহার

সম্ভাবনা কি ? পরীক্ষিতব্য বিষয় ভিন্ন আর কি তাহার মধ্যে আছে ? কতরকম অবস্থা ও উত্তরাধিকার ভেদে কত লোকের মধ্যে মানসিক শক্তি, প্রকৃতি কিরূপ দাঁড়াইতে পারে তাহার নির্ণয় কি করিয়া হইবে।

সৃষ্টির শ্রমবিভাগ যৌনভেদের একটী কারণ বলিয়া বোধ হয় জন্য নরনারীর এতদিনকার কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্নতাই স্বাভাবিক বলিয়া তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু যৌনভেদের প্রত্যক্ষ্য বিষয় হইতে কৃষ্টিগত ভেদের দিকে আসিতে হইলেই সবিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। কারণ ইহাতে এতই উপদ্রব জমিয়াছে যে কোন নিশ্চিত ভিত্তি পাওয়া কঠিন। তবে ইহা হইতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে যে সৃষ্টিকার্য্যের যে অংশ এখন উহাতে মাতার উপরই রহিয়াছে তাহাতে তাঁহার যেরূপ যন্ত্রণা, বিপদ দুর্ব্বলতাদি ঘটিয়া থাকে, পালনেও পিতার সাহায্য আবশ্যক। বাস্তবিক মানুষের মত বোধবান উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে যে বিষয়ে দুইজন সংশ্লিষ্ট তাহাতে অপরের দায়িত্ব না থাকিলেও মানুষের দায়িত্বজ্ঞানের মূলই আহত হয়। কিন্তু নরনারীর কর্ম্মক্ষেত্রকে বিষমরূপে বিভক্ত করিয়া রাখা হইলেও এই অবশ্য কর্ত্তব্য বিভাগটা সম্বন্ধে মানুষের বোধ প্রকৃতপক্ষে এতদিন জাগ্রত হয় নাই। পিতার যে কর্ত্তব্য করিতেই হয় তাহার জন্য নারীর প্রতি যেন একটা আক্রোশের ভাব বর্ত্তমান। নারী যে মাতার কর্ত্তব্য করিতেছেন তাহা না দেখিয়া তাহার স্থলে পিতার দায় লইবার সময় নারী যেন ফাঁকি দিয়া তাহার ও তাহার সন্তানের (যেন তাহারই মাত্র। অন্যদিকে আবার জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার জন্য সন্তান পিতারই, মাতা শুধু তাহাকে বহন করিবার যন্ত্র মাত্র)। এই ভাবেও অবশ্য নারীকে দেখা হইয়াছে। গ্রাসাচ্ছাদন আদায় করিতেছে এই ভাব উহার মূলে। সেইজন্য নারীর সম্পূর্ণ অধীনতা, সব বিষয়ে নিম্নপদ, আপনার সেবা ইত্যাদি অনেক কিছুর পরিবর্ত্তে তবে সে ইহা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যশিশুকে অন্য জন্তু অপেক্ষা অনেক বেশী জিনিষ শিখিতে হইলেও সে অসহায়তর হইয়া জন্মায় বলিয়া অন্য জন্তু মাতাপেক্ষা নারীর সন্তানপালন বহুগুণে কঠিনতর, সন্তানজন্মেও অনেক বেশী ক্লেশ, বিপদ সহ্য করিতে হয়। মানুষের বিচিত্র শক্তি প্রবৃত্তি পরিচালনারও অনেক সঙ্কোচ করিয়া ত্যাগস্বীকার আবশ্যক হয়। তাই সমদায়িত্বের জন্য মানুষের মধ্যেই প্রধানতঃ পিতারও এবিষয়ে কর্ত্তব্যের ভার পড়িয়াছে। কিন্তু মাতার পক্ষে উহার অনেকাংশ অপরিহার্য্য শারীরিক ধর্ম্ম, আর পিতার পক্ষে দায়িত্বের নির্ভর, মানুষ চৈতন্য বলিয়া উহার সত্য বোধ এত অস্পষ্ট, এত অসম্পূর্ণ। নারীর অধীনতা, নিম্নাবস্থাদির ইহা একটী প্রধান কারণ। তাই ইহার পরিবর্ত্তন ত আবশ্যকই। মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর জটিলতা এবং মনুষ্যত্বের দাবীও ক্রমেই বিচিত্রতা লাভ করায় আগের মত নরনারীর কর্ম্মক্ষেত্র দুইটী নির্বাত খোপে ভাগ করা এখন আরোই অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সন্তান পালনে পিতার দায়িত্বও যে লোপ হইবার নয় মূল হইতে

দেখিলে ইহাও বোঝা যায়। তবে নারীর অর্থার্জ্জনের সুবিধা, মাতৃত্বের রাষ্ট্রসাহায্য ইত্যাদি দ্বারা মাতৃত্ব ও শিশুত্বের রক্ষাও যেমন আরো নিশ্চিত ও দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, আর্থার্জ্জন ক্রমেই জটিল ও কঠিন হইয়া পড়ায় তাহাতে সাহায্য পাইলে পিতারও সে বিষয়ের ভার লাঘব হইয়া গৃহ পরিবারের জন্য অন্য বিবিধ কর্ম্মেও তিনি আপনার অনুরাগ ও কর্ত্তব্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন।

যৌনভেদের অপর অনুমিত কারণ পিতামাতা একজন হওয়াপেক্ষা দুইজন হইলে সন্তানের পক্ষে উত্তরাধিকারে বৈচিত্র ও সম্ভাবনার বৃদ্ধি। ইহাতে তথা কথিত নারীপ্রাগতিকেরা যাহা বলেন তাহা বিশেষরূপেই সমন্বিত হয়। কারণ প্রত্যেক মানুষ যতই বিকাশ লাভের সুবিধা পাইবে, ততই তাহার উত্তরাধিকার সন্তানের পক্ষে সমৃদ্ধতর হইবার সম্ভাবনা। উভয়ের গুণই উভয়ের গ্রহণ করিবার আবশ্যকতাও ইহাতে প্রমাণিত হয়। এতদিন নরনারীর মধ্যে এক একরকম সদ্গুণের অবিকাশে এবং কন্যার পক্ষে পিতার ও পুত্রের পক্ষে মাতার গুণ অকৃষ্ট থাকায় এই দ্বিধা উত্তরাধিকারের ফল মানবজাতি সম্পূর্ণ পায় নাই। নারী-প্রাগতিকেরা সেই বাধা দূর করিতে চান। তাহাতেও যে নরত্ব বা নারীত্বের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা নাই আগেই দেখা গিয়াছে।

ঠিকভাবে গ্রহণ করিলে তাই জীব বিদ্যার মধ্য হইতে নরনারীত্বের রহস্যের আভাস ত পাওয়াই যায়। নরনারীর সমস্ত দেহ ব্যাপিয়াই একদিকে যেমন স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্বের বিশেষ ক্রিয়া চলিতেছে এবং প্রত্যেক নরনারী সৃষ্টিকার্য্যে আপনার বিশেষ অংশ প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার যন্ত্র মাত্র; তেমনি আবার তাহাদের শরীরের প্রত্যেকটী কোষই পিতামাতার মূল স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বের অংশ মিলিয়া তৈরী। সুতরাং উভয়ের মধ্যেই উভয়ের সমস্ত সম্ভাবনাই রহিয়াছে।

জীবনীশক্তির নবীকরণ যে যৌনভেদের আর একটী কারণ বলিয়া অনুমিত হয় নরনারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও প্রেমই তাহার প্রমাণ। আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য বোধেরও ইহাই ত মূল প্রেরণা। কিন্তু নরনারীর সম্বন্ধ সহজ ও স্বাভাবিক না হওয়ায় ইহাও বিকৃত, ক্লিস্ট, বাধাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। বক্ষ্যমান পুস্তকেই ইহা বর্ণিত। প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের দাবী উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে স্বীকৃত এবং স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার প্রকাশ স্বাভাবিক হইতে পারে।

প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক যাহা বলিয়াছেন বিরুদ্ধবাদীরা তাহা হইতে যে ছিদ্র পাইতে পারেন সেই সম্বন্ধেই এতক্ষণ বলা হইল। তাহার পরও তিনি নারীর এতদিনকার অবস্থা সম্বন্ধে নারী প্রাগতিকদের মতই সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্ত্তমান কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৃথিবীর এবং প্রধানতঃ পাশ্চাত্য দেশের নারীর ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন।

নারীপ্রাগতিকেরা উহাতে সমানুভাবিতা ও আলোক দুইই পাইবেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। পুরাতনপন্থী সংস্কারক বন্ধেরা মাত্র নহেন, অত্যাধুনিকদের অনেকেও শুধু দয়া করিয়া তাহা পড়িয়া দেখিলে ভাল হয়।

বর্ত্তমানের বিষয় ঠিক কিছু না বলিয়া আধুনিক সভ্যতার বিশেষতঃ আমেরিকার মেয়েদের এখনকার ধারা দেখিয়া নারীর অবস্থা ভবিষ্যতে কি হইতে পারে শেষে গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে তিনি আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুই স্থানে নবাদর্শ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কার্য্যে পরিণত হইয়াছে তাহার তুলনা করিলেও, পরে কেবল আমেরিকার কথাই বলিয়াছেন। আমেরিকায় যাহা প্রত্যক্ষ্য হইতেছে রাশিয়ায় এখনও তাহা কল্পনায় রহিয়াছে মনে করিয়াই হয়ত রাশিয়ার বিষয় পরে আর বলেন নাই (লেখক আমেরিকান ইহাও হয়ত কারণ হইতে পারে)। কিন্তু নব্যতম হইলেও আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে রাষ্ট্রসামাজিক আদর্শে মৌলিক ভেদও যে রহিয়াছে। আমেরিকা ধনিকতন্ত্রতার চরম,—আর রাশিয়া তাহার ঠিক বিপরীতরূপে শ্রমিকতন্ত্র। সুতরাং আমেরিকার কোটীপতির পত্নীদের যে সামাজিক প্রভাবের কথা তিনি বলিয়াছেন রাশিয়ায় তা অসম্ভব। উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের শুধু সখের অর্থার্জ্জনের সম্ভাবনাও সেখানে কমই। তারপর প্রাচ্যে নারীজাগরণের যে সূচনা দেখা যাইতেছে তাহাও কি রূপ পরিগ্রহ করিবে বলা কঠিন। তবে উহাতে আমেরিকা অপেক্ষা রাশিয়ার প্রভাবই বেশী আসা সম্ভব বোধ হয়। কারণ তাহার সহিতই প্রাচ্যদেশের সাদৃশ্য ও নৈকট্য অনেক বেশী। রাশিয়াও অনেক পরিমাণে প্রাচ্যই। এমন কি আমেরিকাকেও ধনিকতন্ত্রতার সকল সমস্যা, অন্যায় দূরীভূত হইয়া উহা যে সেখানে শিকড় গাড়িয়াছে মনে হইতেছিল সম্প্রতি তাহাতেও সন্দেহ জন্মাইতেছে। কাজেই আমেরিকার ভবিষ্যৎও অন্য অভিমুখে যাওয়া বিচিত্র নয়।

মানুষের মনোভাব ও হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়া মেয়েদের মুক্তি যে এখনও প্রায় আরম্ভই হয় নাই একথা তিনিও বলিয়াছেন। সুতরাং তাহা হইলে কিছু অন্য ভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। কারণ এইজন্যই মেয়েদের স্বাধীনতা বা তাঁহাদের সম্বন্ধে নূতন ধারণা বিবাহের বাহিরে যতটা স্বীকৃত, বিবাহের মধ্যে সেরূপ নয়। কাজেই বিবাহ ও মামুলি অবস্থা মেয়েদের পক্ষে এখনও কম বেশী সমার্থকই রহিয়াছে। নব্য মেয়েরা বিবাহের মধ্যে ঢুকিতে সেইজন্য স্বভাবতঃই ইতস্ততঃ করে। এই কারণেই পুরুষও অন্য মেয়ের সম্বন্ধে যতই উদারনৈতিক হউক, স্ত্রীর সম্বন্ধে সে ধারণা তেমন আনিতে পারে না বলিয়া শিক্ষিত স্বাধীন মেয়েদের বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হয়। দুইদিক হইতে এভাবে বাধা পাইলে অবিবাহিতের সংখ্যাবৃদ্ধি অনিবার্য্য আর এ অবস্থায় Aspasiaর আবির্ভাবও তাই ঘটিতে বাধ্য। তারপর যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে পুরুষের সংখ্যাহ্রাসে (ইয়োরোপে ত বিশেষরূপেই) মেয়েদের বিবাহে বাধা ঘটিতেছে। বিবাহের পর স্বামীর বিশ্বস্ততাও এখন আরোই দুর্লভ পদার্থ হইয়া উঠিতেছে। এমনকি স্বামীর চরিত্ররক্ষা যেন স্ত্রীরই দায় হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে ভুলাইয়া,

তোষাইয়া সামলাইয়া রাখা এতই কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে যে, অর্থার্জ্জন, বিবাহচ্ছেদাদি বাহিরের কতকগুলি বিষয়ে সুবিধা হইলেও প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর অবস্থা আগের অপেক্ষাও বরং শোচনীয়ই হইয়াছে। তারপর বিবাহের পরও বয়সের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন অস্বীকার করিয়া স্ত্রীর রূপযৌবনের অতি খেলো নীচ দাবীও আগে এত উদগ্র ছিল না। এখন এই একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপারও যেন স্ত্রীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। শ্রমলাঘব যন্ত্রাদির আবিষ্কারে গৃহকর্ম্মের খাটুনি কমিলেও সাহায্যকারী পরিচারকের অভাবে অসুবিধাও ঘটিয়াছে। মেয়েদের শুধু রূপযৌবনের মূল্য এখন যেভাবে দেওয়া হইতেছে অন্য কোন বিষয়েই তাহার শতাংশের একাংশও নয়। মেয়েরাও তাহার সুবিধা অবশ্য না লইতেছে এমন নয়। সবরকম কর্ম্মক্ষেত্রে মেয়েদের যখন লইতেই হইল তখন সুন্দরী যুবতীর দাবীই তাহাতে প্রশস্ততর করা হইল। উহাদের সহিত ব্যবহারও পুরুষের নারী সম্বন্ধে মামুলি ব্যবহার অনুসারেই প্রধানতঃ চলিতে লাগিল। ইহাতে ঐ মেয়েরা আপাততঃ কিছু সুবিধা পাইলেও উহা আগেরই জিনিষ। ইহাতেও পূর্ব্বের গণিকা, রক্ষিতাদির মত এই মেয়েদের পত্নী হইতে পৃথক করিয়া রাখিতেছে। পরস্পরের স্বার্থও তেমনি বিরুদ্ধ। মেয়েদের পুরুষের সম্বন্ধে দাবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পত্নীর স্বামীর সম্বন্ধে দাবী কম ছাড়া বৃদ্ধি পায় নাই। নারীর সম্বন্ধে পুরুষের পছন্দ ও সুবিধাজনক বিষয়গুলির দাবী কিন্তু বরং বাড়িয়াছে। কাজেই নরনারীর মধ্যে বৈষম্যের লোপ বাহিরের কতকগুলি বিষয়ে অনেকটা হইলেও উহার ফল মেয়েরা সমগ্রভাবে বা স্বাভাবিকভাবে তেমন পাইতেছে না। রাশিয়ায় যে পরীক্ষা হইতেছে তাহাতেই মাত্র যদি ইহার প্রতীকার হয়। কারণ সেখানেই শুধু মেয়েদের স্বাধীনতার নামে সুবিধা লওয়ার (exploit) ভাব নাই।

তারপর এতদিনকার নারীপ্রগতিতে মেয়েদের দিকেই শুধু পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছে। পুরুষের সম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই। মেয়েরা পুরুষের একচেটিয়া কাজে আসিতেছে, কিন্তু মেয়েদের একচেটিয়া কাজে পুরুষের প্রবৃত্তি কিছুমাত্র দেখা যায় নাই। কারণ পুরুষ এ পরিবর্ত্তন অনেকটা অবস্থাগতিকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিয়াছে। আপনাকে তাহার সহিত মানাইবার চেষ্টা করে নাই। এই ভাব কাটিয়া গৃহ পরিবারে তাহারও নূতনভাবের কর্ত্তব্যবোধ জাগিলে এবং যন্ত্রসৃষ্টির সুবিধা মানুষ সত্যই লাভ করিয়া, বেকার না হইয়াও যদি অবসর পায়, আর তাহার সহিত বিবাহের নূতন বাধাসমূহ দূর হইয়া অধিকাংশলোকের যদি উহার সুযোগ ঘটে, তাহা হইলে পরিবারের মর্য্যাদা আবার বৃদ্ধি পাইতে পারে। Aspasia, Don Juan এর সংখ্যাও তাহা হইলে কমা সম্ভব। ভবিষ্যতের পরিবার অবশ্য ঠিক এতদিনকার মত হইবে না। কারণ নারীর অধীনতার উপর না হইয়া নরনারীর সাম্য স্বাধীনতার উপরই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সাধারণ পাকশালা, বস্ত্রধৌতালয় (Communal kitchen, Communal laundry") ইত্যাদি তাহার সাহায্যের নানারকম ব্যবস্থাই তাই থাকিবে।

প্রথমে অসম্ভব বলিয়াও নরনারীর গুণকর্ম্ম বলিতে এখন যাহা বোঝায় পরে যে তাহাতে অনেক পরিবর্ত্তন এবং সাদৃশ্য আসিবে একথা তিনি শেষে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহা অবশ্য আসিবেই। এখন যে ভেদ যৌনগত, জাতিগত, ধর্ম্মগত ইত্যাদি এক এক শ্রেণীগত হইয়া আছে তাহা অনেক কমিয়া ব্যক্তির বিভিন্নতাই পরে বেশী ফুটিবে বোধ হয়। সুতরাং পৃথিবীর বৈচিত্র নষ্ট না হইয়া তাহার প্রকাশ আরও স্বাভাবিকই হইবার সম্ভাবনা। দলগত ভেদে ঘৃণা, বিদ্বেষাদির সৃষ্টি করিয়া বহুদিন হইতে পৃথিবীর সমূহ অমঙ্গলই ঘটাইয়া আসিতেছে। নারীর ইতিহাসও তাই এত স্বতন্ত্র না হইয়া সভ্যতার ইতিহাস, মানবেতিহাসের সহিতই একত্ব লাভ করিবে।

এগুলি কল্পনায় মাত্র; কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার গতি সেদিকে নয় লেখক বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার অনুমান হইতে অন্যরকম হইবারও আছে দেখা গেল। এখন যখন মানুষ অন্ধ ভাবাপেক্ষা বুদ্ধি বিচারের উপরই নির্ভর বেশী করিতে আরম্ভ করিতেছে, তখন বর্ত্তমান সমস্যাগুলির নিবারণ সে করিবে, আর নবাদর্শসম্মত ভাবেই করিতে চেষ্টা করিবে আশা করা যায়। তারপর নূতন অবস্থার অপরিহার্য্য ধাক্কা সামলাইলে বিবাহ, পরিবার সম্বন্ধে এতদিনকার ধারনার ভিতর যে ভাল জিনিষগুলি মানুষের সংস্কারগত হইয়াও বুদ্ধি বিচারসহ তাহাকে রূপ দিতেও সে প্রয়াস পাইবে মনে হয়। বিশেষতঃ স্বাধীনতার সঙ্গে নৈরাপদ, নিশ্চয়তাও যে মানুষের চাই। সমাজতন্ত্র বা তাহার বর্ত্তমান অভিব্যক্তি বলশেভিজম্ এর মধ্যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, নিজস্ব সম্পত্তির ধারণা ইত্যাদি লইয়া উন্নতিশীল সংস্কারকদেরও যে তর্ক আছে, তাহার মিমাংসার উপরেও গৃহ, সমাজের আকৃতি অনেক পরিমাণেই নির্ভর করিবে।

তিনি যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ সভ্যতায় নারীর প্রাধান্যও না ঘটিবারই সম্ভাবনা। যান্ত্রিক সভ্যতার মোড় ফিরিয়া পৃথিবীব্যাপী অর্থব্যবহারের চেহারাই বদলাইয়া যাওয়া সম্ভব। উহার সহিত নারীর স্বাধীনতামূলক, রাষ্ট্রসমাজ মানুষের সংস্কারগত ও সহজ হইয়া আসিলে পুরুষেরও বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি তাহার মধ্যে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবার কোনই বাধা নাই (তিনি যাহার অভাব দেখিয়া ক্লিষ্ট)। এ সবই বর্ত্তমান যুগাদর্শ দেখিয়া অনুমান বা আশা মাত্রই সন্দেহ নাই। পুরুষের পূর্ব্বসংস্কার না কাটিলে নারীর মুক্তি সামান্য, নিরস্ত্রযুদ্ধ সভ্যতায় তাহা আবার জ্বলিয়া উঠিবে কিনা তাই বা কে বলিতে পারে? তবে তাহা হইলে হয় মানবজাতির ধ্বংস নয়ত বর্ব্বরতার মধ্য দিয়া আবার নবযাত্রা সুরু করিতে হইবে।

শিক্ষাবিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ ও বাঙ্গালা

বাংলার সরকারী ব্যয় কি উপায়ে সংক্ষেপ করা যাইতে পারে তাহার তদন্তের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে। উহার ভিতর শিক্ষা-বিভাগ সম্পর্কে ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, আপাততঃ তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সমগ্র ভারতবর্ষই পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শিক্ষায় খুবই কম অগ্রসর। শিক্ষার জন্য সকল সুসভ্য গভর্ণমেণ্ট যে রূপ ব্যয় করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষে তাহা তুলনাই করা চলিতে পারেনা। ১৯৩১ সালের ভারতবর্ষের লোকগণনার যে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, হাজার করা চৌত্রিশ জন মাত্র শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িয়াছে—তাহাও দশবৎসর পরে। হাজার করা ১৫৬ জন পুরুষ এবং ২৯ জন স্ত্রীলোক নাম সহি করিবার মত বিদ্যার্জ্জন করিয়াছে এবং ইংরাজি লিখন পঠনক্ষম হইয়াছে হাজার করা ২৫ জন পুরুষ ও ৩ জন স্ত্রীলোক। ইহা কোনক্রমেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিবার মত সংবাদ নয়—এবং এ কথাও বলা চলেনা যে ভারতবাসী শিক্ষায় অগ্রসর হইতেছে। তাহার উপর বাঙ্গলা। বাঙ্গলার অবস্থাতো আরও নৈরাশ্যজনক ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট হইতে শিক্ষায় অনেক কম ব্যয় করিয়া থাকেন। শিক্ষার ব য় বেশীর ভাগই বহন করে জন সাধারণ। সমগ্র ব্যয়ের গড়ে শতকরা ৪৮'৩ ভাগ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ প্রদান করেন, এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট মাত্র ৪৪'৯ ভাগ দেন। বাঙ্গলার ছাত্রগণের অভিভাবকেরা সমগ্র ব্যয়ের ৪২'৪ ভাগ দেন, যাহা অন্য কোন প্রদেশের অভিভাবকগণই দেন না।

মাদ্রাজে স্কুল সমূহে গবর্ণমেণ্ট প্রতি ছাত্র বাবদ ৯ টাকা ৯ আনা ৩ পাই, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ১৭ টাকা ৫ আনা ১০ পাই, ও বঙ্গীয় গবর্গমেণ্ট মাত্র ৫ টাকা ১৪ আনা ৫ পাই মাত্র মাত্র ব্যয় করেন। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসরের জন্য ১৪ টাকা, ১২ আনা ও ৩ পাই পাঞ্জাব ১৫ টাকা ১ পাই ও ব্রহ্ম ১৯ টাকা ৩ আনা এবং বিহার উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্ট ও ৬ টাকা ১ আনা ৩ পাই ব্যয় করেন। সরকার হইতে উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে বাঙ্গলার শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ হইতে একেই কম, এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যয় সঙ্কোচ করা নিতান্তই অসঙ্গত ও অন্যায় হইবে।

১৯৩১ সালের নভেম্বরের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় ৫৪৪—৪৭ পৃঃ তে দেখান হইয়াছে, যে বঙ্গে কেবল মাত্র হিন্দুদের জন্য অভিপ্রেত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সরকারী ব্যয় ১,১১,৫৫১ টাকা

কিন্তু কেবল মাত্র মুসলমানদের জন্য অভিপ্রেত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যয় ১৫,৮৮,০৯১ টাকা। অর্থাৎ শুধু মুসলমানদের শিক্ষার সরকারী ব্যয় শুধু হিন্দুদের শিক্ষার সরকারী ব্যয়ের চৌদ্দ গুণেরও অধিক। ব্যয় সংক্ষেপও প্রথমে বোধহয় হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়াই সুরু হইবে, কারণ সংস্কৃত কলেজ ও স্কুলের ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমেই সেই আশঙ্কা হইবার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। অবশ্য কলিকাতার মাদ্রাসা অথবা ইসলামিয়া কলেজ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে না।

শিক্ষা ব্যাপারেও এই অসাম্য ও পক্ষপাতিত্ব বিশেষ রূপে নিন্দনীয়। তাহার উপর বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট শাসন ব্যয় বাড়াইয়াই চলিয়াছেন। পুলিশ বিভাগে ব্যয় হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই পাইতেছে। এ সকল অবশ্যই নাগরিকদের নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া। বাঙ্গলার অবস্থা দিনে দিনে ভয়াবহ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। আর্থিক দুরবস্থা, শিক্ষার অভাব উৎপীড়নে ক্লিষ্ট বাঙ্গালীর সম্মুখ হইতে আলোর রেখা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতেছে, কে জানে ইহাই নবোদিত সূর্য্যের অরুণিমা সূচক নিকষ কালো গহন রাত্রি কিনা?

বেকার সমস্যায় মেয়েদের দায়িত্ব—

গত মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই নানা কারণে বেকার সমস্যা প্রবল ও জটীল হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এ সকল সমস্যার মীমাংসা সরকারকে করিতে হয়, তাহাদের অভাবের দাবী পূরণ করিতে হয়। আমাদের দেশে বেকার সমস্যা দিন দিন গুরুতর রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতিকারের কোন উল্লেখ যোগ্য চেষ্টা সরকার অথবা দেশবাসী কাহারও পক্ষ হইতেই এপর্য্যন্ত হয় নাই। সম্প্রতি ইন্‌ডাষ্ট্রি বিভাগের মন্ত্রী নবাব কে-জি-এম্ ফারোকি রাজকোষ হইতে বেকার সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টায় একলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ কিছুই নয়, কেবল মাত্র তাঁহার সহানুভূতির পরিচায়ক হইতে পারে মাত্র।

সরকার এই অর্থ সঙ্কট ও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণকে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের কুফল বলিয়া এবং জনসাধারণের মনে সেই ভাব ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন নানা পুস্তিকা ও 'প্যামফ্লেট্' বিলি করিয়া। গত আগস্ট মাসে চট্টগ্রামে বাঙ্গলার গবর্ণর সার জন সাইমন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন * * "আপনারা জানুন, বর্ত্তমান অবস্থা যে শোচনীয় সে বিষয় সরকার অনবহিত নহেন। বৎসরের পর বৎসর আপনাদের যুবকরা এবং বালিকাগণও বঞ্চিত হইয়া তাহাদিগের উদ্যম প্রয়োগের কোন উপায় পাইতেছে না। কিন্তু বেকারের দল হইতে ইহার কর্ম্মী সংগৃহীত হইতে পারে এবং এই আন্দোলনের নায়কগণ লোকের মনে যে, ভাবের উদ্রেক করিতে চাহে, কাজের অভাবে লোকের মনে সেই ভাব প্রবণতার সঞ্চার হয়।"

ইহার পরে তিনি নানা অসুবিধা সত্বেও সরকার দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির ও যুবকদিগকে উদ্যম প্রয়োগের নূতন নূতন পথ নির্দ্দেশের চেষ্টা করিতেছেন এই কথা বলেন। কিন্তু দেশের

লোকের সে আশাপূর্ণ হয় নাই বলাই বাহুল্য। গবর্ণরের উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় কর্ম্মহীন অসন্তুষ্ট অসংখ্য মনই যে বিপ্লববাদের মূল কারণ তাহা নয়,—কিন্তু সেই সকল মনই যে বিপ্লবকে টিঁকাইয়া রাখিতে ও বর্দ্ধিত করিতে সাহায্য করিতেছে একথা তাঁহারাই স্বীকার করেন। তাহা হইলে একথা স্বতঃই মনে আসা বিচিত্র নয় যে, যে বিপ্লব প্রচেষ্টাকে দমন করিবার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে, এও যদি বিপ্লবের অনাচারের সামান্য সাহায্যও করে তবে তাহার প্রতিকারের জন্য কোন চেষ্টা না করিয়া অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা হইতেছে কেন? যাহা হউক, এ বিষয় দেশ বাসীরও অমুত্তমই লক্ষিত হয়। আমাদের দেশে উপার্জ্জনক্ষম সাধারণতঃ এক জনের উপরই একটী পরিবারের ভরণ পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে। কাজেই একজন বেকার হওয়ার অর্থ একটী পরিবারের অন্ন সংস্থানের উপায় বন্ধ হওয়া। এ বিষয় মেয়েদের যে কোন দায়িত্ব আছে তাহা এখনও কাহারই মনে আসে না। মেয়েরাও যদি কিছু কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টা এবং উপায় করেন তবে অনেক পরিমাণে ভার লাঘব করা হয়। ইহা লইয়া অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে, বাহিরের কর্ম্ম ক্ষেত্রে পুরুষের যেখানে কাজ জুটিতেছে না সেখানে মেয়েরা গিয়া যোগদান করিলে সমস্যা জটীলতরই হইবে। কিন্তু তাহা নিতান্তই অমূলক ভীতি মাত্র। অর্থার্জ্জন মানেই চাকুরী করা নয়,—তাহার যে বিভিন্ন দিক ও পন্থা আছে তাহাই খুঁজিয়া বাহির করা ও সেই অনুযায়ী চেষ্টা করা। কুটীর শিল্প, স্বল্প ব্যয়সাধ্য ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা, যাহা অল্প মূলধনে চলিতে পারে, এই সব দিকে মনোযোগ ও দৃষ্টি দেওয়া এবং এই সকল প্রচেষ্টাকে কর্ম্মে পরিণত করিতে সকলেরই সচেস্ট হওয়া উচিত। এ বিষয় মেয়েদেরও যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহাই আমরা সব মেয়েদের ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছি।

অর্ডিনান্স বিল

অর্ডিনান্স বিল লইয়া কাউন্সিলে যে বাদানুবাদ তর্ক বিতর্কের প্রহসন চলিতেছিল তাহা শেষ হইল সিলেক্ট কমিটিতে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় তাহা পাকা আইনে পরিণত হইয়া। অটোয়া চুক্তিও অবশ্য মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রক্ষার জন্য অর্ডিনান্সগুলি পাকা আইনে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং শীঘ্রই সেগুলিও বিনা বাধায় মঞ্জুর হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। বোম্বাইয়ের লাট ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন, * * * অর্ডিনান্সগুলির সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে সমগ্র দেশে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাহা হইলেও কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শিত হইলে উহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে। কারণ সংগ্রাম এখনও চলিতেছে। * * * * বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ হেগ বলেন—"আমরা সমস্ত বিষয় ধীর এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই বিলের আয়ু তিন বৎসর করা হইয়াছে, কারণ তাঁহারা আশা করেন যে তিন বৎসর পর আইন অমান্য আন্দোলনের আথিক ও নৈতিক ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া অসহযোগের

যে অনিষ্টকর মনোবৃত্তি হইতে এতোকাল সাফল্যের কল্পনা চলিয়া আসিতেছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে।

কিন্তু এই নীতি যে কতদূর ব্যর্থ সে সম্পর্কে বহু আলোচনা তর্ক বিতর্ক এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। সেদিনও দিল্লীর একটী সভায় কর্ণেল বার্কলে "বর্ত্তমান জীবনের মনস্তত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,—"এই বিপ্লবের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট অর্ডিনান্স প্রভৃতি যেরূপ বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা যে বিন্দুমাত্র কার্য্যকরী হইবে সে বিষয় আমার এতটুকু বিশ্বাস নাই। এইজন্যই মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বাঙ্গালীর মনের অবস্থা বুঝিবার জন্য কতকগুলি পন্থা নির্ণয় করিয়া সেগুলি কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য, আমি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারী বিবেচনায় সেগুলি অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মাত্র এই উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যে বিপ্লববাদ একেবারে দূর করা অসম্ভব তাহাতে আমি নিঃসন্দেহ।"

অর্ডিনান্স বিল, সরকারের দমন নীতি লইয়া কিছু বলিতে সঙ্কোচ ও বিতৃষ্ণায় মন ভরিয়া উঠে। যাহা হইবার তাহা হইবেই, দেশবাসীর ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক একটীর পর একটী আইনের ভার চাপিতেছে তাহা যেমনই হোক স্কন্ধে তুলিয়া লইতেই হইবে। এ সকল অবস্থার বহুদিন পূর্ব্বে কবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"স্কন্ধে যত চাপে ভার, বহি চলে মন্দগতি যতক্ষন থাকে প্রাণ তার।" ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা কবির সে উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

সংবাদ পত্রের দুরবস্থা

জরুরী অর্ডিনান্স বলে প্রেসের উপর আরও ভাল রকম কর্তৃত্বের অর্থাৎ সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য যে আইন জারী করা হইয়াছিল তাহা লইয়া ব্যবস্থা পরিষদে পুনরায় বাদানুবাদ হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা পাশ হইয়া গিয়াছে।

সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করিবার সপক্ষে এতোই যুক্তি সরকার পক্ষ দেখাইয়াছেন যে সম্পর্কে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয়। তবে একথাও সত্য, যে অমূলক মিথ্যা প্রচারের আশঙ্কায়, জনসাধারণের উত্তেজনাকর সংবাদ প্রকাশে উত্তেজিত হয় বলিয়া সংবাদ পত্রের উপর কঠোর আইন জারী করা হইল, সত্য সংবাদ প্রকাশের সুবিধা না থাকিলে মানুষের মন স্বভাবতই বিপরীত দিক ধরিবে। তুচ্ছ ঘটনা লোকমুখে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ হইবে, কারণ সত্য একেবারে গোপন করা সম্ভব নয়, ফলে উল্টা ফলই বেশী দেখা যাইবে। দেশবাসীর মনে যে অসন্তোষ ও অশান্তির সৃষ্টি হইবে তাহার ফল কাহারও পক্ষেই ভাল না হইবার কথা।

নূতন প্রেস অর্ডিনান্স জারীর পর হইতে সংবাদপত্র পরিচালন যে কতদূর দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রত্যেক সংবাদপত্র সেবীগণই অনুভব করিতেছেন। যখন প্রথম এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা হয়, তখন উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র বাঙ্গালার নারী জাতির সকল বিষয় মুক্ত মতামত গঠন ও তাহার প্রকাশ ইহাদের প্রধান লক্ষ্য হইবে। বাঙ্গালার নারীরা কি চান, তাঁহাদের সকল

বিষয় অভাব অভিযোগ সামাজিক দোষ ত্রুটী দূর করিবার প্রয়াস, তেমনই আবার বর্ত্তমান জাতি গঠনে নারীরা কি ভাবে সাহায্য করিতে পারেন, রাজনৈতিক আন্দোলন, বর্ত্তমান যুগে যাহাকে কোনক্রমেই বর্জ্জন করা সম্ভব নয়, তাহার সম্বন্ধেও মুক্ত মতবাদ প্রচারের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও সুযোগ, অর্থাৎ যাহাতে বাঙ্গলার নারীর মনোভাবের, চিন্তার, সংহত একত্র সমাবেশের মূর্ত্ত প্রকাশ হইতে পারে তাহার সুবিধা দেওয়া। কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিবার সুযোগ হইল না। প্রেস অর্ডিনান্সের অর্থ এতোই ব্যাপক, যে একমাত্র কূট আইনজ্ঞ ভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশ অন্য কাহারও দ্বারা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। শত বাধা নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যে বাণী নির্গত হয়— তাহাও ভীত সন্ত্রস্ত মূক আবেদন মাত্র। সত্য ও ন্যায়ের নির্ভীক উক্তি দুঃখে ক্ষোভে অন্তরে গুমরিয়া মরে, এবং মুক্ত মত প্রকাশের প্রচেস্টা শুধু নিরুপায় ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

ঐক্য সম্মিলনী

সাম্প্রদায়িক মীমাংসার জন্য যে বৈঠক বসিয়াছিল, সন্তোষজনকভাবে তাহার নাকি মীমাংসা হইয়াছে। নেতৃবৃন্দগণ সকলেই এই সাফল্যে আশাতীত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। এই সহ-যোগীতার সাফল্যে হিন্দুগণের আশা করিবার কিছুই নাই। যে 'তের দফা' দাবীর জন্য দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল্ কনফারেন্স মহত্মার আপ্রাণ চেস্টা বিফল হইল, ঘরোয়া বিবাদ মিটাইবার ক্ষমতার অভাবে তৃতীয় পক্ষ প্রধান মন্ত্রীর শরণাপন্ন হইতে হইল, তবু মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবী এতটুকুও কমিল না, ইহাতেই তাহাদের মনোভাব সম্বন্ধে যথেস্ট স্পস্ট ধারণা করা যাইতে পারে। সংখ্যা লঘিষ্টের অজুহাতে সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধার পাকাপাকি বন্দোবস্ত তাঁহারা করিয়া লইতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র। ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের ৫১টী আসন সংরক্ষিত থাকিবেই, ইউরোপীয়েরাও ২৫টা পদের দাবী ছাড়িতে সম্মত নহেন, বাকী রহিল হিন্দু। শেষ পর্য্যন্ত হয়তো তাহার যে নির্দ্দিস্ট সংখ্যক আসন রহিয়াছে তাহাও লইয়া আপোষ নিষ্পত্তির চেস্টা হইবে। ঐক্য সম্মিলনীর ফলে মুসলমানেরা কিছুমাত্র স্বার্থত্যাগ করে নাই, সম্মেলনের সাফল্য অথবা বিফলতার জন্য তাহার কিছুই আসিয়া যাইবেনা। তাহাদের সর্ব্বপ্রকার দাবী মানিয়া লইয়া—নিজের আদর্শ ক্ষুন্ন করিয়া এ আপোষ করিয়া হিন্দুরা কি লাভবান হইবেন? ত্যাগের আদর্শ দেখাইবার দিন এখন নাই—তাহার প্রয়োজনও নাই। এখনও অবশ্য বিষয় কোন কথা ঠিক করিয়া বলা সম্ভব নয়, এলাহাবাদের সর্ব্বদল সম্মিলনে কি হইবে তাহার উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে; তবে আমরা আশাকরি হিন্দু নেতৃবৃন্দ দেশ ও জাতির স্বার্থের বিরোধী অযৌক্তিক যুক্তি সকল কখনই মানিয়া লইবেন না।

সুনীতি দেবী

স্বনাম ধন্য কেশবচন্দ্র সেনের জেষ্ঠা কন্যা মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভুপ বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী মহারাণী সুনীতি দেবী আর ইহলোকে নাই, তিনি পরিণত বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

মহারাণী প্রথম বয়স হইতেই নারীশিক্ষা ব্যপদেশে খুব যত্ন পরায়ণা ছিলেন। যখন কলিকাতা ছাড়া আর কোনখানে বালিকা বিদ্যালয় ছিল না সেই সুদূর অতীতকালে তিনি কুচবিহারে

সুনীতি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দার্জ্জিলিংয়ের মহারাণী স্কুল ও তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট স্থাপনা কালেও তিনিই তাহার বিশিষ্ট উৎসাহী ছিলেন এবং অর্থ সাহায্যও যথেষ্টই করিয়াছেন। শেষ কালে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের বাস ভবন কমল কুটীর ক্রয় করিয়া ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউটকে দান করেন। গিরিডির বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যও তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন। তিনি অল্প বয়সে কুচবিহারে ভদ্র মহিলাগণের সহিত খুব মিশিতেন ও তাহাদের একঘেয়ে জীবন যাত্রার প্রণালী দেখিয়া তাঁহাদের জীবনে বৈচিত্র ও আনন্দ দান কল্পে তাঁহাদের লইয়া মধ্যে মধ্যে বন ভোজন করিতেন। তদুপলক্ষে তোর্ষা নদীর মধ্যে বস্ত্রাবাস টাঙ্গাইয়া স্নানের ব্যবস্থা এবং তোর্ষার তীরে অপর একটি বস্ত্রাবাসে আহারের ব্যবস্থা হইত। এতদ্ভিন্ন তিনি বৎসরে একবার করিয়া রাজ বাড়ীতে আনন্দ বাজারের অনুষ্ঠান করিতেন, তিনদিন বাজার খোলা থাকিত ক্রয় ও বিক্রয় দুই মেয়েরা করিতেন, সে কয়দিনই সহরে আনন্দের উৎস বহিয়া যাইত।

একবার পূজার ছুটীর মধ্যে তিনি নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে ঢাকায় আসেন, তদুপলক্ষে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি নানা স্থান হইতে আসিয়াছিলেন; ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা, সভা আহ্বান করিয়া বক্তৃতা, ঊষা কীর্ত্তন সব তাতেই যোগদান করিয়া সকলকে উৎসাহিত করেন।

নিখিল ভারত স্ত্রী সম্মেলনের স্থাপনা হইতেই তিনি তাহার উৎসাহী সভ্যা ছিলেন এবং আমৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার কাজ করিয়া গিয়াছেন।

নারী-শিক্ষা মন্দির

মেয়েদের শিক্ষায় বাংলাদেশ বড়ই অনগ্রসর। আর যাহাও আছে তাহাও গতানুগতিক ধারায় সম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ। এই অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার উদ্দেশ্যে একটি সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার পরিপূর্ণ আদর্শ লইয়া ছয় বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা লীলাবতী নাগ নারী-শিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মহত্তম সংকল্প ও উচ্চতম আদর্শ ইহার স্থাপনার প্রেরণা দিলেও, শিক্ষা-মন্দিরের আরম্ভ হইয়াছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও নিতান্ত সাধারণ ভাবে। তারপর এই কয় বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় ইহা বৃদ্ধি ও পুষ্ট হইয়া সহরের অন্যতম প্রধান বিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। শিক্ষা-মন্দিরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ইহাকে বরণীয় ও জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। বাংলার মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে শিক্ষা-মন্দির একটি বিশেষ স্থান জুড়িয়া রহিবে, দীপস্তম্ভের মত সগৌরবে মাথা তুলিয়া চারিদিকে শুভ্র জ্যোতিরেখা বিকীর্ণ করিবে। ইহারই মধ্যে দেশের নানাস্থানে এই আদর্শ কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সত্যই ইহা আমাদের পরম আনন্দের বিষয়।

শিক্ষা-মন্দিরের বিশেষত্বগুলি অন্যত্র মুদ্রিত। পাঁচটী বিভাগ—(১) হাই স্কুল (২) বিশেষ বিভাগ, (৩) শিল্প বিভাগ, (৪) কোচিং ক্লাশ ও (৫) মহিলা আশ্রম। হাই স্কুলে শিশু শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত যথা নিয়মে বালিকারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে। বিশেষ বিভাগ বয়স্কা মেয়ে ও মহিলাদের জন্য। ইহাতে চারি বছরে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত

বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যাহারা কোন বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পায় নাই অথবা যাহারা সাংসারিক কাজকর্ম্মের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে পড়িবার সুবিধা পান না, এই বিভাগটি তাহাদের জন্যই বিশেষ ভাবে উপযোগী। বর্ত্তমানে প্রায় পঞ্চাশটি বালিকা ও মহিলা এই বিভাগে অধ্যয়ন করিতেছেন। সত্যই বিশেষ বিভাগ নারীশিক্ষার একটি অতি-প্রয়োজনীয় অভাব দূর করিতেছে। সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ছাড়া বাংলা সাহিত্যের উপর একটু বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং এই বিভাগের ছাত্রীরাও এ বিষয়ে বেশ অগ্রণী। দুঃস্থ মহিলাদের জন্য শিল্প-বিভাগ ও প্রাইভেট্ পরীক্ষার্থিনীদের জন্য কোচিং ক্লাশ মেয়েদের শিক্ষা ও সংস্থানের দিক্ দিয়া অন্যতম উপায় ও উপকরণ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ছাত্রী ও অন্যান্য মহিলাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে মহিলা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সহরে কর্ম্মজীবী মহিলাদের থাকিবার জন্য পৃথক্ কোন বোর্ডিং না থাকাতে, 'মহিলা আশ্রম' এদিক দিয়া একটি বড় অভাব পূরণ করিয়াছে। সহজ ও সরল জীবনযাত্রা মহিলাশ্রমের অন্যতম বিশেষত্ব।

শ্রদ্ধেয়া প্রতিষ্ঠাত্রীর কারাবরোধের পর, শিক্ষা-মন্দির বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্তা ঊষারাণী রায় বি এ, বি-টি মহাশয়ার পরিচালনায় যোগ্যতার সহিত উন্নতি-পথে চলিয়াছে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না, ইহার স্থায়িত্ব ও দায়িত্ব ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণ-প্রচেষ্টার উপরই শুধু নির্ভর করে না, করে সহরের সমগ্র পৌরবর্গের উপর। তাই আজ দায়িত্বশীল নাগরিক-প্রধানদের এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, যে নারীশিক্ষার এই নবসৃষ্টি, পরিপূর্ণ শিক্ষার এই অগ্রদূত যেন আন্তরিকতা ও আনুকূল্যের অভাবে ম্রিয়মান না হয়।

দীপালি প্রদর্শনী

প্রায় বার বৎসর হইল ঢাকাতে দীপালি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বার বৎসর কাল দীপালি সমিতি ঢাকার মহিলাদিগের মধ্যে নানারূপে শিক্ষা ও আনন্দ দান করিয়া আসিতেছে। বৎসরে একবার করিয়া এই মহিলা প্রদর্শনী হয়। মহিলাদের প্রধান উৎসব বলিতে গেলে এই একটী মাত্র প্রদর্শনীই ঢাকা বাসীকে সপ্তাহকাল নানারূপ আমোদ ও বিশেষ করিয়া মহিলাদের একঘেয়ে জীবনের বৈচিত্র ও আনন্দের জিনিষ ছিল। প্রতিবারের মত এই বারও প্রদর্শনীর আয়োজন যথোপযুক্ত ভাবেই করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রদর্শনীর পূর্ব্বদিন বৈকাল বেলা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ নোটিশ দিয়া তাহা দুইমাস কালের জন্য বন্ধ রাখিতে আদেশ দিয়াছেন। নোটিশে বলা হইয়াছে—এই সমিতি একটি ধ্বংশকর প্রতিষ্ঠান ও ইহা একটি প্রসিদ্ধ বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত আছে, সেইজন্য জন-সাধারণের ধন প্রাণ নিরাপদ করিবার জন্য ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

এই মহিলা সমিতি বহু বৎসর হইতে প্রকাশ্য ভাবেই নানা কার্য্য করিয়া আসিতেছে—গুপ্তভাবে কিছুই করে নাই। সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্য হইতেও এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যাহা বৈপ্লবিক অপরাধ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে—তথাপি এরূপ করিবার কারণ তাঁহারাই বলিতে পারেন। আগামী বারে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।—

সূচীপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ	মাঘ, ১৩৩৯	নবম সংখ্যা

মনের কথা

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

মনের সম্বন্ধ তো যাবার নয়। বিশেষতঃ আমার মত মানুষের, যার কাছে মনই সব। আর সকলে দেখলে সূর্য্য উঠল—একটা দিনের আরম্ভ হ'ল। সেই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি আরো কিছু দেখি, নতুন আলো, রাঙ্গা সুন্দর, কোমল অরুণ কান্তি, আমার জন্যে দিনের সঙ্গে সেই দিনের নতুন সংবাদ নিয়ে আসে, অন্তরের মধ্যে কোনও অভিনব বারতা জানা। আমার কাছে রাতের ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্নদিনের প্রত্যক্ষ ঘটনার চেয়ে সত্য। তাইতো আর দশ জনে যেমন করে ভাবে, আমি তেমন করে ভাবতে পারিনা, তাদের যেমন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ, আমার পক্ষে তা সম্ভব হয় না।

* * * * *

এতো প্রবন্ধ নয়—যুক্তি বিচার বিবেচনার খাতির নেই, এ আমার আপন মনে কথা কওয়া, নয়ত মনের ভাব নাড়া পায় না। বোঝা বইতে বইতে ঘাড় যখন বড় টাটিয়ে আসে, তখন যেমন মাঝে মাঝে ভারটাকে, নাড়াচাড়া ক'রে তুলে না ধরলে, আর নড়া যায় না আমারও চেষ্টা তারি মত। ভার যা' আছে তা যতই দুর্ব্বহ হোকনা কেন, গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতেই হবে, নইলে, মজুরী পাওয়া যাবে না। মন যে অনন্তের তীর্থ পথে চলেছে, সেখানে ভার নামিয়ে রাখবার জন্যে, কোন্ অহল্যা থাম গেঁথে দিতে পারেন? নিজেকেই ব্যবস্থা করতে হয়, তাই ক্ষণিকের জন্যে এ বিশ্রাম-চেষ্টা। নিরন্তর ব্যথার হাত হ'তে অব্যাহতি পাবার উদ্যম। তার পর আবার চল্‌তে হ'বে, উঠে পড়ে যেমন করেই হোক এ যাত্রা তো সাঙ্গ করতে হবেই।

* * * *

আজ ক'দিন আমি মনটাকে, একেবারে শূন্য করে ফেলেছি, সব আশা ও সব ইচ্ছার বিসর্জ্জন, জানিনে হঠাৎ একটা মুহূর্ত্তে তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হোক বলা, যেন কেমন সহজ হয়ে এল। মনটা অকস্মাৎ একেবারে হাল্কা হয়ে গেল। আমিও বাঁচলাম, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যাপার যে ইচ্ছায় নিয়মিত হয়ে চলেছে, যে মন সব ভাবনা ভাবছে, সেইখানে নিজের ভাবনার কাঁটার বোঝা নামিয়ে দিতে পারলে কি কম আরাম?

নারীর আদর্শ সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'

শ্রীসুলতা কর

চল্লিশ বছর আগে নারীর আদর্শ সম্বন্ধে যে মত চলিত ছিল, তা' এখনকার প্রাচ্যের মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপেই মিলে যায়।

তখন বলা হ'ত নারী যদি স্বামী বা পুত্রের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করতে না পারে, তবে তার নারীত্ব ব্যর্থ। প্রেমাস্পদের জন্য আত্মবিসর্জ্জনেই নারী জীবনের সার্থকতা।

ঠিক এই সময় বিখ্যাত লেখক আনাতোল ফ্রাঁস্ একটী প্রবন্ধ রচনা করেন, তাঁর প্রবন্ধের নাম ছিল 'মারিয়ার ডায়েরী'। তাঁর প্রবন্ধের নায়িকা মারিয়ার রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি সবই ছিল অসাধারণ। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তিনি নানাভাবে যোগ দিয়েছেন, জীবনের আনন্দকে তিনি নিঃশেষে উপভোগ করেছেন, কিন্তু তিনি প্রেমাস্পদের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করেন নাই। কেবলমাত্র এই দোষের জন্য বিখ্যাত সম্পাদক স্টেড অন্যান্য সকল সমালোচকদের সঙ্গে এক মত হয়ে, এই রচনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। এমন কি তিনি মারিয়াকে নারী আখ্যা পর্য্যন্ত দিতে অস্বীকার করেন।

সম্পাদক স্টেডের দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, চাতুর্য্য, প্রখর বুদ্ধি ইত্যাদি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায় তিনি সহজেই জনমতকে আয়ত্ত কর্‌তে পারতেন। তিনি যে সব আদর্শকে অত্যন্ত ভালবাসতেন তার মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল সে সময়ের প্রচলিত নারীত্বের আদর্শ। আর আদর্শকে সমর্থন করার জন্য তিনি এমন সব উক্তিকেও মেনে নিতে পারতেন, যা প্রত্যেক নিরপেক্ষ লোকের কাছেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে ধরা পড়ে যাবে।

'মারিয়ার ডায়েরী' তাঁর এতদিনের প্রিয় আদর্শকে এমন একটা আঘাত করল যে, তিনি বল্‌লেন হয় মারিয়া সত্যই নারী নয়, আর তা না হয়ত তার চরিত্র-অঙ্কন একেবারেই অস্বাভাবিক হয়েছে। তিনি বল্‌লেন মারিয়া নায়িকা, দার্শনিক, বিদুষী সব কিছুই হতে পারে, কিন্তু নারীত্ব তার মধ্যে একেবারেই নেই, কেননা সে স্বামী, পুত্র বা কারও জন্যই আত্মোৎসর্গ করে নি। তাঁর মতে এই গুণটী ছাড়া নারীর আর একটী বড়গুণ সংযম, আর মারিয়ার সংযম নাই। কিন্তু সংযমহীনা কোন নারী যে কেমন করে একাদিক্রমে সুদীর্ঘ ছয় বছর প্রতিদিন দশ ঘণ্টা কাজ করে চিত্রকার্য্যে নিপুণা হতে পারে, তারও কোন কৈফিয়ৎ তিনি দিতে পারলেন না। তাঁকে একথাও স্বীকার কর্‌তে হ'ল যে মারিয়ার বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রের এমন একটা মাধুর্য্য ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তার পারিপার্শ্বিক জগত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

যখন সম্পাদক স্টেড নারীত্বের এই রকম আদর্শ প্রচার করে জনমতকে আয়ত্ত কর্‌ছিলেন, তখন সারা ইউরোপে একমাত্র বার্ণার্ড শ'র স্বাধীন লেখনী সমগ্র জনমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আন্‌তে সক্ষম হয়েছিল। নারীর আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর সেদিনের মতবাদ আজ সর্ব্বত্র আদৃত হয়েছে।

তিনি বল্‌লেন যে নারীকে অপরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তে হবে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অপরের জন্য সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার অর্থ এই, যে নিজের স্বাধীন সত্বাকে একেবারে ভুলে যাওয়া। নর কিংবা নারী যে নিজের স্বাধীন সত্বার কথা ভুলে, পরের মুখ চেয়ে পরের জন্য বেঁচে থাকে, সে মানুষের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। প্রত্যেক স্বাবলম্বী পুরুষই এরকম ভাবে আত্মোৎসর্গ করাকে একান্ত ঘৃণা করে, আর সে সবচেয়ে বেশী আনন্দ প্রত্যাশা করে স্বাবলম্বী দৃঢ় চিত্ত নারীর কাছ থেকে।

বার্ণার্ড শ' বলেন 'পরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর' এই মন্ত্র ক্রমাগত প্রচারের ফলে নারীর প্রতি যে কতদূর অবিচার করা হয়েছে, তা আমরা পরিষ্কার দেখ্‌তে পাই নর-নারীর বিবাহিত জীবনের মধ্যে। বিবাহকে যত উচ্চেই স্থান দেওয়া হোক্, আর প্রেমের যত অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাই করা হোক্ এটা নর-নারীর দৈহিক মিলনের ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরুষ নারীকে ভোগের উপাদান বলে ভাবে, আর বিবাহ ক'রে সে ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে নারীর সঙ্গলিপ্সার স্পৃহাটা মিটিয়ে নেয়। পুরুষ খুব ভাল করেই জানে, যে পরমুখাপেক্ষী, দেহে মনে পঙ্গু নারীর জীবন এ ছাড়া আর কোন কাজেই লাগতে পারে না, আর চরম নির্য্যাতিতা হলেও সে কখনই এই বিবাহিত জীবনকে অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না।

বিবাহ জিনিষটা যে কি তা' প্রত্যেক পুরুষ যেমন বোঝে, প্রত্যেক নারীও ঠিক্ তেমনি বোঝে। তবুও পরের জন্য আত্মোৎসর্গ কর্‌তে হবে এই মন্ত্রের মোহে তার মন এমন পঙ্গু হয়ে যায়, যে তার সাধ্য থাকে না যে বিবাহিত জীবনের বিরুদ্ধে, প্রচলিত আদর্শের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজের অস্তিত্ব প্রচার করে।

হয়ত প্রত্যেক নারীর পক্ষেই একথা সত্য না হতে পারে, কিন্তু অনেকের পক্ষেই এটা সত্য। এজন্য বার্ণার্ড শ' বলেন, যে নারী স্ত্রী হতে পারে, মাতা হতে পারে, কিন্তু সবার ওপরে সে যে নারী এই সত্যটুকু ভুল্‌লে তাকে মনুষ্যত্বের দাবী থেকে স্খলিত হতে হবে। তাকে সর্ব্ব প্রথমে মনে রাখতে হবে যে সে কখনই স্বামীর জন্যই বা পুত্রের জন্যই জীবন ধারণ করে না। নিজের স্বাধীন সত্বাকে ভোগ করবার জন্য, জীবনের আনন্দ আহরণ করবার জন্যই তার বেঁচে থাকা।

প্রকৃতি যে নারীকে মাতৃত্বের জন্য ও গৃহপালনের জন্য একটা বিশেষ শক্তি দিয়েছেন একথা বার্ণার্ড শ' সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, যে, যেমন সামরিক জীবন প্রত্যেক পুরুষের পক্ষে সত্য হতে পারে না, তেমনি বিবাহিত জীবন ও প্রত্যেক নারীর পক্ষে সত্য নয়। প্রত্যেক নারীই মা হবার জন্য জন্মায়না, মারিয়ার মত কোন তেজস্বিনী নারী যদি এ কথা সগর্ব্বে ঘোষণা করে তবে সে নারী নয় বলে চিৎকার করাও মূর্খতা।

বার্ণার্ড শ' পরিহাসদীপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছেন, যে, ইউরোপে দেখা যায় অধিকাংশ

নারীই কুকুরছানা পালন কর্‌তে ভালবাসে, তবে কি একথাও বল্‌তে পারি যে এই কাজের জন্যই নারীর জন্ম? কিন্তু তিনি একথা স্বীকার করেন যে নারী পুরুষের দাসত্ব কর্‌ছে এর চেয়ে ঢের বেশী সত্য এই যে, কতকগুলি যুগ যুগ ধরে চলে আসা আদর্শের পায়ে সে দাসীত্ব কর্‌ছে। পুরুষ তার কানে যে সব মধুর মন্ত্র আবহমান কাল থেকে ঢেলে আস্‌ছে, সে সব অস্বীকার করে সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই। সবচেয়ে বড় জিনিষ যা সে হারিয়েছে, সে হচ্ছে তার স্বাধীন চিন্তাশক্তি।

বার্ণার্ড শ' স্বাধীন আত্মার, জাগ্রত মনের পরিচয় লাভের জন্য একান্ত উৎসুক। তিনি বলেন যে নারীর সুপ্ত আত্মা জড়তা কাটিয়ে যেদিন প্রথম মুক্তির আবাহন গাইবে, সেদিন তাকে সর্ব্ব প্রথমে ধ্বংস করতে হবে এই গতানুগতিক আদর্শের মোহ। তাকে তখন কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, পাপ, পুণ্য সব কিছুকেই স্বাধীন চিন্তাশক্তি দিয়ে বিচার করে, যাচাই করে নিতে হবে, নির্ব্বিচারে গ্রহণ করার দিন জগতে ফুরিয়ে গেছে।

বিয়োগ

শ্রীমমতা মিত্র

শূন্য ঘরে আজকে তোমায় আকুল আঁখির নীরে
খুঁজছি যে গো চাইছি ফিরে ফিরে।
বৃথাই খোঁজা, মিথ্যে চাওয়া, ব্যর্থ অশ্রুজল
সবার চোখের অন্তরালে ঝরল অবিরল।
বারেক শুধু তোমার মুখের ডাক শুনিবার তরে
পরাণ আমার অধীর হ'য়ে হায় গো কেঁদে মরে।
কোথায় তুমি রয়েছ আজ শুধাই বারেবার,
তোমার দেখা পাই না খুঁজে আর।

সহসা তুমি গেলে গো চলে কোন অজানা পুরে
আপন জনে সরায়ে দিয়ে দূরে ?
যাবার বেলায় কারেও যে তুমি একটি না কথা বলে
চিরকাল তরে ঘুমায়ে পড়িলে মহা নিদ্রার কোলে।
কোন্ দিন কাল পরাল ও ভালে মরণের রাজটীকা ?
পারি নি জানিতে কেমনে তুলিলে মৃত্যুর যবনিকা।
নীলাকাশ হ'তে পূর্ণিমা চাঁদ চাহিয়া সহাস চোখে
লয়ে গেল ডেকে কোন্ সে অমর লোকে ?

জাগিতেছে মনে দূর অতীতের মধুর দিবস যত
পুলক-রসে রঙ্গিন স্মৃতি কত।
সকলের লাগি ভেবেছ কত যে দেছ কত ভালবাসা,
নিরাশ হৃদয়ে কত না সময় জাগায়ে তুলেছ আশা।
নির্ম্মল তব পুণ্য জীবন, নারী নহ, ছিলে দেবী,
একদিন তরে লও নাই সেবা. গিয়েছ সবায় সেবি।
সংসার হায় কিছুই তোমায় দেয় নাই, দেছে ফাঁকি,
তবুও তোমার হেরেছি উদার আঁখি।

আজ দূর হ'তে করুণ কোমল তোমার নয়ন তারা
দেখিছে না কি গো মোদের অশ্রুধারা ?
আজ আর তুমি না হও ব্যথিত আমাদের বেদনায়,
কাছে এসে দেহ কর না পরশ সুগভীর মমতায়।
মরম বীণার সব কটি তার ছিঁড়ে দিয়ে গেলে দূরে,
আর কি কখনও মোহন রাগিণী বাজিবে নূতন সুরে ?
কি দিয়া যতনে সাজাব আজিকে তোমার পূজার থালা ?
নিরালায় বসে রচি অশ্রুর মালা।

গোলকধাঁধাঁ

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

(১৬)

ললিতার কথায় শান্তা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাহার নিজের সম্বন্ধে একথা কেহ কোন দিন তুলিবে, এজন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে যেন এখনও অন্তরে বাহিরে কুমারী।

ললিতা জিজ্ঞাসা করে, বিবাহ করিতে তাহার আপত্তি আছে কি না। উত্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া না পাইয়া শান্তা পাল্টা প্রশ্ন করে, "না কর্লে তোদের আপত্তি আছে ?"

"আমার আপত্তি কিছু নেই ভাই। তবে মা, কাকাবাবু এরা সবাই কর্লে সুখী হন যখন—"

"না কর্লে দুঃখ কি আছে, দিদি, আমি তো দেখ্‌তে পাইনে!" ললিতা ভাবিয়া বলিল, "বিয়ে কর্লে তুই সুখী হবি, এই তাঁদের বিশ্বাস। সবাই তাই হয়।"

শান্তা মনে মনে অস্বীকার করিল। তাহার তো বিশ্বাস, বিবাহ করিলেই সে অসুখী হইবে, ও তাহার শক্তিপথে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা। বিবাহের মধ্যে এমন প্রলোভন কি আছে যার আকর্ষণে নিজের অখণ্ড মনুষ্যত্বকে সে বিসর্জ্জন দিতে পারে ? কিছুই না! সে উত্তর দিল, "বিয়ে করে আমার আর যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা কর্ম্মস্পৃহা সব যদি লোপ পায়, আমি কি তাহলে সুখী হবো, তুইও মনে করিস্ সত্যি ?"

"আর সব লোপ পাবে কেন ভাই ? কি যে বলিস।" শান্তা তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার জবাব দিতে পারিল না। স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে, বিবাহ, পতিদেবতার প্রতি অত্যদ্ভুত আসক্তি, সন্তানের সৃষ্টি, বাৎসল্য, দায়িত্ব—একটির পর এক একটি শৃঙ্খল আসিয়া একত্র জড়াইয়া নারীর মানসিক ও আত্মিক বৃত্তির অনুশীলনে পদে পদে অন্তরায় ঘটায়। কিন্তু মুখ ফুটিয়া এতকথা সে দিদিকে কোনোমতেই বলিতে পারিবে না।

ললিতা বলিল, "আর তাছাড়া ভাই, লোপ পাওয়া তুই যাকে মনে করিস্, সেটাও সত্যিকার লোপ পাওয়া নয়। যে কাজটি তুই নিজে হাতে না কর্ত্তে পারিস্, সেটা যদি তোর ভবিষ্যদ্বংশধরে সম্পন্ন করে, তাহলেও তো তোরই সার্থকতা ডিরেক্‌ট্‌লি না হলেও ইন্‌ডিরেক্‌ট্‌লি। জানিস্‌তো—দি হ্যাণ্ড্ ত্থাট্ রক্‌স্ দি ক্রেড্‌ল্ রূল্‌স্ দি ওয়ার্ল্ড্ ?"

এই কথাটায় শান্তার হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইল। চিরকালের আওড়ানো যত বাজে বুলি! দৃপ্তভাবে কি একটা প্রত্যুত্তর ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া পড়িতেই তাহাকে দমাইয়া বলিল, "ডিরেক্‌ট্‌লিই সার্থকতা অর্জ্জন কর্ত্তে পারি যদি তবে ইন্‌ডিরেক্টলি সার্থকতার আশায় হাত পা গুটিয়ে প্রতীক্ষায় বসে থাকি কেন ?"

ললিতা চুপ করিয়া ভাবিল, "সে তো সত্যি। কিন্তু আমি বলি কি জানিস্—মা হওয়ারও তো মস্তবড় সার্থকতা আছে, এ কর্ত্তব্যভার তো মেয়েদের নিতে হবে। এই মহৎ দায়িত্বভার মুখ্যতঃ সুসম্পন্ন কর্ত্তে গিয়ে অন্য দুচারটে কর্ত্তব্য যদি গৌণভাবে করা যায়, তাতে এমনই বা কি ক্ষতি?"

"মা হওয়ার দায়িত্ব এতই কি মহৎ? আমি কিন্তু বলি, এর কোনও বিশেষ মূল্যই নেই। আশ্চর্য্য হইয়া ললিতা বলিয়া উঠিল "মূল্য নেই!! মাতৃত্ব লোপ পেলে সৃষ্টি শুদ্ধু লোপ পাবে যে!"

"এই সৃষ্টিটাকে যে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, এমন বিধান কে দিল ভাই?" ললিতা একেবারে অবাক হইল।—"সৃষ্টির কোনও মানে নেই, সংসার অসার—এ সমস্ত সেকেলে সংস্কার তুই জোটালি কোত্থেকে বল্‌তো? মডার্ণ স্পিরিট হচ্ছে,

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

শান্তা বলিল, "মর্ত্তে কি আমি চাই? কিন্তু বেঁচে থাকারও খুব বেশী দরকার দেখতে পাইনে। নেহাৎ যখন একবার জন্মে পড়েচি, তখন জন্মটাকে ভালোকরে সার্থক করবার চেষ্টা কর্ত্তে হবে বৈ কি—অন্ততঃ জীবনটাকে একবার স্পষ্ট করে জান্তে চাই। কিন্তু যারা এখনো জগতে আসেনি, তাদের টেনে আনার কি দরকার?" কথা বলিতে একবার আরম্ভ করিয়া শান্তার সঙ্কোচ কাটিয়া আসিল। বাহিরের দিকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি মেলিয়া নির্ব্বিকার সুরে বলিয়া চলিল, "সত্যি কথা কি জানিস্? মানুষ নিজের প্রবৃত্তিকে সংযত কর্ত্তে পারে না বলেই বিয়ে করে এবং নূতন জীবের জন্ম দেয় তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ; অথচ নিজেদের এই দুর্ব্বলতাটুকু স্বীকার কর্ত্তে লজ্জা পায়, কাজেই সুমহৎ কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম ইত্যাদি বড় বড় কথার অবতারণা করে তাকে ঢাকে। আমি অবিশ্যি বল্‌ছি না বিয়ে করাটা অন্যায়। দেহধারী মানুষ তার স্বাভাবিক প্রকৃতিবশে এটা খুবই কর্ত্তে পারে। কিন্তু আত্মাযুক্ত মানুষ তার আত্মিক উন্নতির জন্যে যদি এই দৈহিক প্রলোভনকে জয় কর্ত্তে পারে অথবা চেষ্টা করে, সেটা হয় গৌরবের। 'সুন্দর ভুবনে' বেঁচে থাকাটা খুব সুখের কথা, কিন্তু যতদিন ভুবনকে সুন্দর করে তোলা না যায়, ততদিন এর অধিবাসী বাড়িয়ে লাভ কি বল্? মানুষের মাঝে বাঁচা বেশ ভালো, কিন্তু আগে মানুষের মত মানুষ তৈরী কর্ত্তে হবে তো? মনুষ্যত্ব বস্তুটি কি তাই জানলাম না, নিজেই এখনও মানুষ হতে পারিনি, অথচ ভবিষ্যৎ মানুষ সৃষ্টি করবার এবং গড়ে তুলবার ভার নেব আমি!!"

এবে একেবারে রীতিমত সার্মন!—ললিতা কি উত্তর করিবে ভাবিয়া পাইল না। ব্যবহারিক জীবনের অতি সামান্য ব্যাপারের মধ্যে যদি এই সব দার্শনিক প্রসঙ্গের আবির্ভাব হয়, তবে তো বড় বিপদের কথা!

ললিতা বলিল, "বুঝলাম তো সব! কিন্তু দেখ ভাই এর জন্যে যদি গুরুজনরা অসন্তুষ্ট হন সেটা কি ভালো হবে?'

শান্তা বলিল, "নারে—কেউ অসন্তুষ্ট হবেন না।"

ললিতা প্রিয়লাল বাবুর অভিপ্রায় শুনিয়াছে, সেই জন্যই সে এত ব্যস্ত ও শঙ্কিত। সে বলিল, "কি জানি ভাই, কাকাবাবু হয়ত বিয়ে দিতে চান্—"

"চাইলে কি হবে বল্! আমি যে—"

"কিন্তু কাকাবাবুকে জানিস্ তো! তিনি যা মনে করেন্ তাকে টলানো কি আমাদের সাধ্যি? সে দিন তিনি কাকিমাকে নাকি বল্লেন—"

শান্তার ভ্রু কুঞ্চিত হইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌ছিলেন?" প্রিয়লালের উক্তিগুলির উপরে যথাসম্ভব সুরের মাধুর্য্য বুলাইয়া ললিতা বিবৃত করিল।

শান্তার মন হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। পরিবারের প্রতি খুঁঠিনাটি ব্যাপারেই প্রিয়বাবুর মতামত এমন অত্যধিক প্রাধান্যলাভ করিয়া আসিতেছে যে, তাহার চোখে বড় বিসদৃশ ঠেকে। বয়সের ও অভিজ্ঞতার পরিমাণে তাহার মায়ের স্থান অনেক উচ্চে কিন্তু তাঁহার মতামত সকল সময় তো কার্য্যকরী হয় না। সহধর্ম্মিনী হিসাবে সুষমার অধিকার প্রিয়লালের সমান হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি কখনও তো প্রিয়বাবুর বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিতে সাহসী হন না। এমন হয় কেন? কাকাবাবুর চরিত্রে অনেক প্রশংসনীয় গুন আছে সত্য, কিন্তু তাহার প্রকৃতিগত এই প্রভুত্ব প্রিয়তা শান্তাকে বরাবর পীড়া দিয়া আসিতেছে। পুরুষের এই জাতিগত অহঙ্কার সে কোনদিন সহ্য করিতে পারে না। আজ প্রিয়বাবুর এই প্রভুত্ব তাহার নিকট একান্ত গর্হিত মনে হইল। নিতান্ত যদি তিনি অভিভাবক না হইতেন, তাহা হইলে সে ইহাকে বলিত—স্পর্দ্ধা। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের গূঢ়তম ঘটনা যে বিবাহ, সে সম্বন্ধেও তিনি হস্তক্ষেপ করিতে আসেন কেন? শান্তার বিবাহের প্রয়োজন অপ্রয়োজন বাহিরের ইঙ্গিতে তো কখনও চালিত হইতে পারে না—ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও অধিকার শান্তারই নিভৃততম অন্তরে। তাহার তো স্পষ্ট মনে আছে, গুরুজনদের উপরোধ অনুরোধ সত্ত্বেও কাকাবাবু বহুবয়স অবধি অবিবাহিত ছিলেন। সে অধিকার তিনি পাইয়াছিলেন কোথা হইতে? পুরুষের অধিকার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অপ্রতিহত—আর মেয়ে বলিয়াই কি নারী জীবনের একান্ত নিগূঢ় ক্ষেত্রেও সে অপরের আদেশানুবর্ত্তী? সকলের সকল আদেশ ও অনুরোধ সে নির্ব্বিরোধ হাসিমুখে পালন করে বলিয়া প্রিয়বাবুর কি বিশ্বাস হইয়াছে, সে বাধা দিতে জানেই না? সে কি দুর্ব্বল? শান্তা ভাবিতে ভাবিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবার সে কোনমতেই নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে না। যদি বিবাহ করিবার পক্ষে তাহার আর কোনও বাধা না-ও থাকে, তবু একমাত্র কাকাবাবুর এই প্রভুত্বকে প্রতিহত করিবার জন্যই সে অবিবাহিত থাকিবে। এমন অদম্য প্রলোভন নিশ্চয়ই বিবাহের মধ্যে নাই, যাহাকে তাহার ইচ্ছাশক্তি পরাভূত করিতে না পারে। প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ

করিবার যে অধিকার ও শক্তি পুরুষের আছে, নারীরও তাহা আছেই। না যদি থাকে, তবে লজ্জার কথা।

শান্তা গম্ভীর প্রশান্তমুখে বলিল, "আমার যা বলবার, তা তো বল্লাম ভাই!" ললিতা বলিল, "কিন্তু—কাকাবাবু যদি জোর করেন?"

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া শান্তা বলিল, "দেখা যাক্।"

(১৭)

সত্যকাম সেদিন যে চলিয়া গিয়াছে, আর এ কয়দিন আসে নাই। শান্তা মনে মনে একটু দুঃখ পায়, অকারণের অভিমান যে এতদিন স্থায়ী হইতে পারে তাহা সে ভাবে নাই। সত্যকাম যদি সেদিন অমন নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাগুলি না বলিয়া এমনিই সহজে তাহার কাছে আসা বন্ধ করিত, তবে শান্তার বিশেষ ক্ষতি ছিল না। ব্যবহারের তারতম্যটুকু চোখেও পড়িত না। কিন্তু এখন কোনমতেই ভুলিয়া থাকার জো নাই, কথার কাঁটা কেবলই মনের মধ্যে খোঁচা দিয়া মনটাকে সজাগ করিয়া রাখিতে চায়।

কয়দিন ধরিয়াই সত্যকামের বড় ইচ্ছা হইতেছিল, আবার রাগ ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া আসে। শান্তা সাধিয়া তাহার মান ভাঙ্গাইতে আসিবে না, ইহা যখন জানা কথাই, তখন দূরে দূরে থাকিয়া লোকসান তাহারই। কিন্তু কেমন করিয়া ফিরিয়া আসা যায়?

অসহ্য গরম! দুপুরবেলা শান্তার ঘুম কিছুতেই আসিতেছে না। ঘরের কোণে কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া জানালার কাছে গিয়া চোখে মুখে জল ছিটাইতেছে, এমন সময় সত্যকাম হাসিতে হাসিতে অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দেখুন দিকি, কাকে নিয়ে এসেছি!"

সঙ্গে সঙ্গে রোগাধরণের শ্যামবর্ণ একটা ছেলে দুয়ারের সম্মুখে দেখা দিল। সোৎসুকে ফিরিয়া শান্তা বিস্ময়পুলকে বলিয়া উঠিল, "ওমা! বারীন—তুমি?"

সসঙ্কোচে লাজুকভাবে একটু হাসিয়া ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "ভালো আছেন?"

হাতের গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া শান্তা ব্যস্তসমস্ত ভাবে খাটের উপরে মাদুর খানা সুবিন্যস্ত করিয়া বলিল, "বোসো।"

বারীন বলিল, "অনেকদিন পরে আপনাদের সঙ্গে আর যে দেখা হবে এতো ভাবতেই পারিনি! ভারি ভালো লাগ্‌ছে।"

বারীন একটু হাসিল।

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আজ হঠাৎ এলে কোত্থেকে?"

"মাস দেড়েক ধরে কল্‌কাতাতেই আছি, এম, এ পড়ছি কি না!"

"ওহো, তাইত, তুমি তো এবার বি, এ, পাশ কর্লে!—এতোদিন এখানে আছ, আগে দেখা করনি কেন বল তো?"

"আপনারা এখানে আছেন আমি জানতামই না যে! আজকে হঠাৎ সত্যবাবুর কাছ থেকে একটু আগে শুনলাম।"

সত্যকাম বলিল, "দেখুন তো, আমি আপনার কি রকম উপকারটা কল্লাম। উনি তো আপনার সন্ধান জেনেও দেখা না করেই পালাচ্ছিলেন, আমি ধরে নিয়ে এলাম বলে! এজন্য আমাকে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কিন্তু!"

বারীন চিরকালের লাজুক ছেলে, কাহারও সঙ্গে মিশিতে একেবারেই অপটু, তাহা শান্তা জানে। তাহার পক্ষে এমনভাবে দেখা না করিয়া পালাইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। সে বারীনের দিকে একবার চাহিয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "যথেষ্ট ধন্যবাদ!"

গল্পগুজব অনেকক্ষণ চলিল। যে পুরাতন পরিচয় প্রায় ভুলিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, আজ এমন আকস্মিকভাবে তাহার পুনরভ্যুদয়ে শান্তার কেমন যে পুলক লাগিতেছে সে নিজেই অনেকটা বুঝিতে পারিল না। সত্যকাম দেখিল, তাহার চোখে মুখে একটা সস্নেহ জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কতটা সত্য, কতটা তাহার কল্পনা, বলা অবশ্য কঠিন।

বারীন বলিল, "ললিতাদিকে দেখ্‌চি না তো?"

"কাল এলেই কিন্তু ঠিক দেখা হত। আজকে ও ওর বাড়ী চলে গেছে।"

বারীন নূতন আবিষ্কার করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ওমা। ললিতাদির বিয়ে হয়ে গেছে?"

"কোন্ জন্মে!"

দীর্ঘদিনের অবকাশে কতকিছু নূতনত্ব, কত পরিবর্ত্তনই হয়ত এই পরিবারে দেখা দিয়াছে ভাবিয়া বারীন্দ্রের কেমন অদ্ভুত ঠেকিল।

ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা করিয়া, সুষমার সাথে পরিচিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বারীন বলিল, "বই নিয়ে কী দেখচেন এত সত্যবাবু? আমি চল্লাম—আপনিও বেরুবেন নাকি?"

সত্যকাম বলিলি, "ন্নাঃ!—চলুন আপনাকে নীচে পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বারীন্দ্র বিদায় লইতেই সত্যকাম আবার সোজা উপরে চলিয়া আসিল। বারীন্দ্র তাহার সতীর্থ—এই পর্য্যন্তই তাহার সঙ্গে পরিচয়। প্রিয়বাবুদের পরিবারের সঙ্গে তাহার কি যে সম্পর্ক তা জানে না। কিন্তু আজ দেখিয়া মনে হইতেছে, সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বিশেষ কিছুই নয়; তথাপি সত্যকামের কেমন কৌতূহল হইল, কেমন যেন মনের মধ্যে বিষয়টা ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। ঘরে আসিয়াই তাহার চিরাভ্যস্ত ভঙ্গিমায় টেবিলের কিনারা ঘেঁসিয়া বাঁকাভাবে দাঁড়াইয়া সে গল্প জুড়িল।

শান্তা সহাস্যমুখে শুনিয়া চলে; পাছে আবার অভিমানের পুনরভিনয় সুরু হয় সুতরাং প্রশ্রয় একটু বেশী করিয়াই দেওয়া ভালো।

সত্য হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বারীনবাবু আপনার কে হন?"

"কেউ না, এমনি আলাপ।"

"অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় বুঝি?"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "তাও কিন্তু নয়! আমি যেবার ম্যাট্রিক দেই—তখন আমরা রাজসাহীতে—সেবার মফঃস্বল থেকে যত ছেলে সহরে এলো পরীক্ষা দিতে, তার দু'চারজন ছিলো আমাদের বাড়ীতে। সেই সূত্রে বারীনের সঙ্গে আলাপ। তারপরে বিমল বেরোবার পরে আর একবার দুতিনদিনের জন্যে এসে আমাদের বাড়াতে ছিল। তারপর থেকে আর এতবছর দেখা হয়নি।

"এতেই এতো আত্মীয়তা!!"

শান্তা একটু হাসিয়া বলিল, "খুব আত্মীয়তা দেখলেন নাকি? সত্যি, একটু আশ্চর্য্য হবার কথা। অথচ আমি ওর বাড়ীর কারো নাম পর্য্যন্ত জানিনে, বাড়ীঘর বংশপরিচয় কিছুই না— মা বুঝি কিছু কিছু জানেন—কিন্তু হ'লে কি হবে? ওকে আপনার বলে মনে হয়। কত ছেলে এসেতো ছিল আমাদের ওখানে, আর কারো সাথে পরিচয়ও হয় নি কিন্তু আমার! এক একটী লোকের মধ্যে যেন বিশেষত্ব থাকে! না?"

সত্যকাম পকেট হইতে ফাউন্টেন্ পেন্‌টা নামাইয়া বারবার খুলিয়া বারবার বন্ধ করিতেছিল। মুহূর্ত্ত কয়েক নীরব থাকিয়া ঠাট্টার সুরে বলিল, "বারীনবাবু দেখ্‌চি গতজন্মে অনেক পুণ্যি সঞ্চয় করেছিলেন!"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "কেন?"

"দেখ্‌চি তো তাই!"

সত্যর ক্ষনেকের চাহনির মধ্যে কি একটু অভিনব আভাস অনুভব করিয়া শান্তা মনে মনে বিব্রত হইল।

ঝি আসিয়া খবর দিল, দিদিমণির সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়াছেন শান্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ভদ্রলোক?"

'—ঐ যে লম্বাপানা, জোয়ান মত দেখ্‌তে, ঐ যে মাঝে মাঝে আসেন!—' শান্তা বুঝিল, অপরেশবাবু। তিনি আজকাল প্রায়ই ছোটখাট কারণে আসা যাওয়া করিয়া থাকেন, গত দুই সপ্তাহে বোধহয় তিনবার আসিয়াছেন। অতসী নাই, কাজেই অপরেশের উপরেই এখন সকল কাজের ভার। সুতরাং শান্তার কাছে প্রয়োজন কিছু কিছু বাড়িয়াছে বৈ কি! কিন্তু শান্তার সকল সময় বেশী ভালো লাগে না যেন। তিনি মাঝে মাঝে অনর্থক বাজে কথা বলেন। একে তো শক্তি-মন্দিরের কাজের মধ্যে প্রাণমন দিয়া খাটিবার মত কিছুই সে পায় না, তাহাতে আবার সভ্যদের অনেকের সঙ্গেই মতেও মেলে কম। কাজেই শান্তা চায় নিজেকে যথাসম্ভব

কম সংশ্রবে রাখিতে অথচ অপরেশবাবু প্রায় কোনও ব্যাপারেই তাহার পরামর্শ না লইয়া কিছু করেনই না। ইহার চেয়ে অল্প সম্মান ও সমাদর দেখাইলেই তাহার ভালো লাগিত।

শান্তা বলিল, "যাচ্ছি।"

সত্যকাম অগত্যা উঠিল।

শান্তা নীচে গিয়া ঘরে ঢুকিতেই অপরেশবাবু সহাস্যমুখে সাদর নমস্কার জানাইয়া বলিলেন, "আবার আপনাকে একটু বিরক্ত কর্ত্তে এসেচি।"

শান্তা নির্ব্বিকারস্বরে বলিল, "কি বলুন!"

একখানা মোটা বাঁধানো খাতার কয়েকটা পাতা উল্টাইয়া অপরেশ বলিলেন, "এই খানটাতে আপনার একটা সিগ্‌নেচার চাই। আর দেখুন, কতগুলো করেস্‌পণ্ডেন্স্‌ এনেছি, আপনি একবার দেখবেন।"

নিজের ফাউণ্টেন পেনটি শান্তার হাতে আগাইয়া দিয়া অপরেশ চিঠির উদ্দেশে বুকখোলা সাহেবী কোটটির পকেটে হাত ঢুকাইলেন।

স্বাক্ষর করিতে করিতে শান্তা বলিল, "চিঠিগুলোর জবাব আপনিই দিয়ে দিলে হ'ত না?"

'হ্যাঁ, আমিই দেব। আপনার কাছ থেকে দুয়েকটা কথার শুধু অ্যাড্‌ভাইস্‌ নিতে চাই। কেন আপনি কি বড্ড ব্যস্ত? তাহলে বরঞ্চ থাক্‌—আমি আবার আর একদিন আসব!"

শান্তা তাড়াতাড়ি বলিল, 'না, তার দরকার নেই, আমি কিছু ব্যস্ত নই!"

অপরেশ শান্তার মুখের দিকে চাহিলেন। কথার মধ্যে প্রধান অংশ কোনটি? আবার আর একদিন আসিয়া তাহাকে বিরক্ত না করিবার ইঙ্গিত? না, আজ এত শীঘ্র বিদায় লইবার জন্য তাহার কোনই ব্যস্ততা নাই, ইহাই মর্ম্ম?

শান্তা চিঠিগুলি পড়া শেষ করিয়া খামে পূরিতে পূরিতে বলিল, 'তা এতে আমার মতামত নেবার বিশেষ কিছু দরকার ছিল না—আপনি যা ভালো বোঝেন তাই লিখে দিন।" একটু হাসিয়া বলিল, 'তা ছাড়া এমনিও—আমাকে যতটা বাদ দিয়ে কাজ চালাতে পারেন, ততই বোধহয় ভালো।"

আশ্চর্য্য হইয়া অপরেশ বলিলেন, 'সোক! কেন বলুন তো?"

"এমনিই। আমি এর সঙ্গে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পাচ্ছিনে। মনে করছি, অতসী এলেই একেবারে ছুটি নেব।"

"তার মানে!!"

শান্তা হাসিয়া বলিল, 'মানে—আমি শক্তিমন্দিরের সভ্যপদ থেকে বিদায় নেব।'

অপরেশ বলিলেন, "হ'তেই পারে না। একেবারে অসম্ভব।'

'কেন?'

'আমরা আপনাকে এত সহজে ছাড়তে পারিনে।"

'ছাড়লেই ছাড়া যায়।'

অপরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন আপনার হঠাৎ আজ এমন অদ্ভুত অভিপ্রায় হল, জানতে পারি?'

'আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমাকে দিয়ে আপনাদের কাজ ভালো চলবে না।"

অপরেশ বলিলেন, 'আপনার নিজের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

অসুবিধা অনেকটা নিজেরই বটে; তবে সে কথা তো বলা চলে না। শান্তা বলিল, "না আমার আর বিশেষ অসুবিধা কৈ?—কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমার সঙ্গে আপনাদের প্রায়ই মতের ঠোকাঠুকি হচ্ছে, সব তাতেই অমিল!"

ওরকম ঠোকাঠুকিরও মাঝে মাঝে দরকার। নইলে পথ পরিষ্কার হয় না। এজন্যেই তো বিশেষ করে আপনার থাকা উচিত। অনেকেই মনে যা বোঝে, বাইরে তা দশজনের বিরুদ্ধে বল্‌তে পারে না। আপনার মধ্যে সে দুর্বলতা নেই। আমি এই জিনিষটা বড্ড ভালোবাসি।"

শান্তা বলিল, "তা হলেও—"

বাধা দিয়া অপরেশ বলিলেন, "আরও একটা কথা—কিছু মনে করবেন না আশা করি—আপনার প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধতার মধ্যেও আমি কোন রূঢ়তার পরিচয় পাইনে। আপনার সব ব্যবহারই আমার কাছে মিষ্টি লাগে।"

এ আবার কি রকম কথা! শান্তার আদৌ ভালো লাগিল না। সে বলিল, "ও আপনার নিজের সৌজন্য, ও কোনও কথাই নয়।"

অপরেশ হাসিয়া বলিলেন, "আমার সৌজন্য নয়—আপনার মাধুর্য্য। আপনার বিনয়টুকু আপনাকে আরও সুন্দর করেছে।"

শান্তা কোনও উত্তর দিল না।

অপরেশ বলিলেন, "যেদিন আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, সেদিন তো আমার যেন মনে হয়েছিল, আপনার আগ্রহ আছে অনেকখানি। আজ কি হল?"

কি হইল, সে কথার উত্তর এক নিঃশ্বাসে বুঝানো সহজ নয়, সে নিজেই ভালো বোঝে নাই। বলিল, "এখন একথা থাক্। অতসী এলে পরে বোঝা যাবে।"

কাজের প্রয়োজন শেষ হইল বুঝিয়া শান্তা উঠিল।

অপরেশ প্রস্থানের উদ্যোগ না দেখাইয়া চেয়ারের পশ্চাৎদিকে অলসভাবে একটু হেলিয়া বসিলেন, "এক্ষুনি উঠচেন আপনি? আর একটু বসুন না!"

"কেন?"

"এমনি। বড্ড টায়ার্ড লাগছে।"

শান্তা অব্যবস্থিত চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

অপরেশ বলিলেন, "কেন—কাজ না থাকলে কি বসতে পারেন না? মানুষের সঙ্গে মানুষের শুধুই কি কাজের সম্পর্ক?"

শান্তা গম্ভীরভাবে বলিল, "সব সময় নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমার যোগ কাজের মধ্যে দিয়েই!"

অপরেশ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "ওঃ!—হ্যাঁ, এর বেশী আমি কিছু এক্‌স্‌পেক্ট কর্ত্তে পারি না—তবে আমার দিক্‌কার কথা অন্যরকম। আপনাকে আমি কেবল আমার কলীগ্‌ বলে মনে করি না, পরমাত্মীয় বলে মনে হয়।"

শান্তার চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তবু অপরেশের কথার মধ্যে যে একটি গম্ভীর আবেগভরা আবহাওয়া ঘোরালো হইয়া আসিতেছিল, তাহাকে হাল্‌কা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে শান্তা জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "উদারচরিতানাং পু বসুধৈব কুটুম্বকম্‌।'

"এ কথাটা আপনার সম্বন্ধেই বেশী খাটে। সত্যি আপনার মধ্যে এমন একটি সহজ সরলতা আছে, যা সবাইকে আকৃষ্ট না করে পারেই না। আপনার হৃদয়ের স্নিগ্ধতা আমি আমার মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করি বলেই আপনার সান্নিধ্য আমার এত ভালো লাগে।'

শান্তা বলিল, 'আপনার এতটা পক্ষপাতিত্ব অনুচিত।'

অপরেশ হাসিয়া বলিলেন, 'নিজের মূল্য মানুষ নিজে বুঝতে পারে না—সেজন্য দর্পণ চাই। কিন্তু 'আপনি বুঝতে পারেন বা নাই পারেন, আমি আপনার যেটুকু জেনেছি, তাতেই আমার শ্রান্ত জীবনে অনেকখানি শান্তি দেবে।'

শ্রান্ত জীবনে? এর অর্থ কি?—অর্থ যাহাই হউক, এত স্তুতিবাদ শান্তার ক্রমেই দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল, 'এখন উঠ্‌তে পারি?'

অপরেশ বলিলেন, 'আপনার খুসী! আপনাকে ধরে রাখবার তো আমার অধিকার নেই। যদি আপনি আমার আপনার জন হ'তেন, তাহলে হয়ত জোর করে অন্ততঃ আব্‌দার কর্ত্তেও পার্ত্তেম। কিন্তু শুধুই কাজের সম্পর্ক যে!—আপনি সন্তুষ্ট মনে যৎটুকু ফেভার দেখাবেন, তৎটুকুই আমার সৌভাগ্য!'

ছিঃ, কথা বলার ভঙ্গী কি অস্বাভাবিক! শান্তা উঠিয়া পড়িল।

(১৮)

কলেজ হইতে ফিরিয়া সত্যকাম আজ আর বেড়াইতে বাহির হইল না। সান্ধ্যভ্রমণ তাহার প্রাত্যহিক অভ্যাসও নয়। বন্ধুবান্ধব জুটিলে হয়ত কোথাও বাহির হইয়া পড়ে, নয়ত কচিৎ দুয়েকদিন একাকীও গড়ের মাঠে কিংবা নদীর ধারে ঘুরিয়া আসে। এই দুই তিনদিন ধরিয়া সে কি যেন ভাবে। আজও ঘরে বসিয়া কিছুক্ষণ একা একা বসিয়া রহিল। ভাবনা জিনিষটি

কোনোদিনই তাহার স্বভাব সিদ্ধ নয়। যখন যে পথে তাহার চলিতে ইচ্ছা করে, অনায়াসেই সহজ সুন্দরভাবে সেই পথে চলিয়া আসিয়াছে সুতরাং ভাবনা করিবার দরকার কি ?

বিকালের জলযোগ সারিয়া সে ছাদে চলিয়া আসিল। তখনও সূর্য্য একেবারে ডোবে নাই, শুধু ছিন্ন ছিন্ন মেঘের আড়ালে লুকাইয়া তাহার রশ্মি নিস্প্রভ হইয়া আছে। একটু একটু হাওয়ার হিল্লোল আসিয়া টবের রজনীগন্ধার গাছগুলিতে দোলা দিতেছে; তাহার নূতন যৌবনে যে প্রাণের সাড়া পড়িয়াছে—কোন্ পথে কতদূরে গেলে তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা মিলিবে, সত্যকাম তাহাই ভাবিতেছিল।

সুষমা ও শান্তা ছাতে আসিলেন। ওপাশে পায়ের শব্দ শুনিয়া সুষমা মাঝখানের দরজাটির মধ্য দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, 'সত্য ঠাকুরপো বুঝি ?'

ফুলগাছগুলির পরিচর্য্যা করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম; জলের ঝাঁঝর লইয়া তিনি সেই কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

শান্তা বলিল, 'কাকীমা, গোলাপ গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে, দেখ্‌চ ?'

'পোকায় শিকড় কেটেছে।'

কতক্ষণ বাদে সুষমা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার বৌদিকে দেখ্‌চিনা যে—ঠাকুরপো ?'

সত্য ওদিকের ছাদ হইতে উত্তর করিল, 'কারা সব এসেচেন দেখলাম।'

সুষমা বলিলেন, 'কারা গো ?'

সত্য হাসিয়া বলিল, 'আমি কি নাম জানি ? আপনাদেরই সব পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব।'

সুষমা বাকী টবগুলিতে জলসেচন করিয়া ভুঁইচাপা দুইটির সদ্যোজাত অঙ্কুরের প্রতি তত্ত্বাবধান করিয়া বলিলেন, 'যাই একবার প্রভার কাছে—দেখে আসি গে।'

শান্তা বুঝিল, কাকীমার সান্ধ্যভ্রমণ এখানেই সাঙ্গ হইল, আর রাত্রের পূর্ব্বে ফেরা হইবে না।

'যাও।' বলিয়া শান্তা অলসভঙ্গিমায় দেহ ফিরাইয়া রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

সুষমা সত্যকামের সম্মুখ দিয়া নামিয়া গেলেন। সত্য তখনও ছাদের ওপাশে দাঁড়াইয়া। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে কি বলিবে—কেমন করিয়া বলিবে ? সত্যকাম আস্তে মাঝখানের দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া চৌকাঠে পা দিয়া থামিল। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তরাগ শান্তার পশ্চিমাভিমুখী মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। বাতাসের মৃদু ঢেউ কপালের উপকার চুলের গোছা লইয়া খেলা-করিতেছিল। শান্তার দক্ষিণহাতে মুখের অর্দ্ধেকখানা ঢাকা পড়িয়াছে। সত্যকাম সেই অর্দ্ধাবৃত মুখের উপর সন্ধ্যার শেষ রশ্মির বিচিত্র ক্রীড়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

বুকের মধ্যে উচ্ছ্বাস ফেনাইয়া উঠিল। দূর ছাই। এখানে নির্ব্বোধের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি লাভ হইতেছে ? কাছে অগ্রসর হইতে কিসের এতই ভয় ?

শান্তা পশ্চাতে আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া সত্যকাম ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দেখছেন ?'

শান্তা ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আকাশ।"

"কি ভাবছিলেন ?"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "কিছু না !"

আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া সত্যকাম একবার পশ্চিমের দিকে চাহিল, একবার পূবের আকাশে। চারিদিকে অসীম প্রকৃতির বুকে চঞ্চল মেঘের খেলা, তাহার পবিত্র আনতমুখে অনুরাগের গোলাপী আভা। সত্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। প্রকৃতির এই মনোরম মাধুরী আজ এই মুহূর্ত্তে যেমন করিয়া সে নীরবে সর্ব্বাবয়ব দিয়া পান করিতেছে, মানুষের হৃদয়ের মধু যদি তেমনই নিঃশব্দে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইত, তবে তো ভাষার দারিদ্র্যে ক্ষোভ ছিল না কিছু। কিন্তু তাহা যে হয় না।

সে শান্তার মুখোমুখি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'একটা কথা যদি জিজ্ঞাসা করি আপনি রাগ করবেন ?'

শান্তা কৌতুকভরে তাহার দিকে মুখ তুলিয়া বলিলে, 'কি কথা আগে শুনি ?'

ইতস্ততঃ করিয়া সত্য বলিল, 'বলব ?'

'বলুন।'

'বারীনবাবুর সঙ্গে আমার তফাৎ কি ?'

শান্তা বলিল, 'তফাৎ ? কিছুই না।'

'সত্যি করে বলুন্ না !'

'বাঃ ! এতো ভারি আশ্চর্য্য প্রশ্ন !—বারীন বারীন, আপনি আপনি, এই তো দেখছি তফাৎ। তা ছাড়া আবার কি ?'

অল্প একটু হাসিয়া সত্য বলিল, 'সে আমিও জানি। কিন্তু সে কথা বল্‌ছি না। আপনার সঙ্গে সম্পর্কে আমাদের দুজনের পার্থক্য কোথায়, সেইটুকু জান্তে চাই।'

'আমার কাছে পার্থক্য কিছুই নেই তো !'

'তবে ব্যবহারের তারতম্য হয় কেন ?'

'তারতম্য কোথায় দেখলেন ?'

সত্য তাহার চোখের উপর আপনার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নামাইয়া বলিল, 'সত্যি নেই ?'

শান্তা একটু ভাবিয়া বলিল, 'আপনিই দেখিয়ে দিন্ না।'

সত্য থামিল। যাহা নিজে দেখা যায়, তাহাই কি অন্যকে দেখানো যায় না কি ? যাহা অন্তরে অনুভব করা যায়, তাই কি বাহিরে প্রকাশ করা চলে ? না বুঝাইয়া দিলে শান্তা কি

কোনো কথা বোঝে না? অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া সত্যকাম মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিল, 'বারীনবাবুর সঙ্গে আপনি যে ভাবে, যে ভাষায় কথা বলেন, আমার সঙ্গে ব্যবহারে আমি তো তার কাছাকাছি ও দেখতে পাইনে।'

শান্তা বিস্ময়প্রকাশ করিয়া বলিল, 'সত্যি!!—কিন্তু বারীনের সঙ্গে যে আমার আলাপ কত বছর থেকে!'

'বারীনবাবুর সঙ্গে আপনার যে ক'দিনের পরিচয় আপনিই বলেছেন, আমার সঙ্গে কি তার চেয়ে কম?'

শান্তা হাসিয়া বলিল, 'দিন গুণে দেখ্‌লে তা নয় অবিশ্যি, কিন্তু—'

'অথচ আপনি তাকে 'তুমি' বলে বলেন, আর আমার সঙ্গে ভালো করে কখনও কথাই বলেন না।'

এই কথাটুকুর জন্য! শান্তা এতক্ষণে বুঝিতে পারিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে অজানিত লজ্জা আসিয়া বুকের মধ্যে মাথা তুলিল। চক্ষু নামাইয়া লইয়া স্তিমিত সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, 'আপনার সঙ্গে কথা বলি না কে বল্লে? বলি তো, তাছাড়া আপনি জানেন না তো বারীনকে কি রকম আত্মীয় বলে মনে হয়!'

সত্য অভিমানভরা সুরে বলিল, 'আমিও কি কর্লে আপনার আত্মীয় বলে গণ্য হতে পারি, উপায় বলে দিতে পারেন? এত চেষ্টা সত্বেও কেন যে আপনাকে খুসী কর্ত্তে পারিনে তা জানি নে। আমারই দুর্ভাগ্য!'

শান্তা তাড়াতাড়ি বলিল, 'না না, তা নয়। খুসী যে আমি সর্ব্বদা হয়েই আছি।—আসল কথা কি জানেন, বারীনের সঙ্গে কোথায় যেন আপনার একটা প্রভেদ আছে—আপনারা দুজন দুই ধরণের।'

সত্য বলিল, 'সেই প্রভেদটাই তো আমি জিজ্ঞেস কর্‌ছিলাম। যদি দেখিয়ে দিতেন আমি দূর কর্ত্তে চেষ্টা কর্ত্তাম। বারীন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারে, আমারও কি সে অধিকার নেই?'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ।'

'বারীনকে যে নামে ডাক্‌তে পারেন, আমাকেও পারেন?'

শান্তা বলিল, 'ডাকা-না-ডাকার মধ্যে কি আছে বলুন? ওটা বাইরের জিনিষ।'

'বেশ তো! ওর মধ্যে তাৎপর্য্য কিছু যদি নাই থাকে, তো ডাক্‌লেই বা কি ক্ষতি?'

একেবারে নাছোড়বান্দা।—শান্তা বলিল, 'একবার আপনাকে 'আপনি' বলে ডেকে যখন ফেলেছি, তখন আবার বদলানোতে লাভ কি?'

'আমার যদি লাভ থাকে?'

শান্তা বিপদে পড়িল। খানিক ভাবিয়া বলিল, 'আসল কথা কি জানেন, যে ডাকটা যার বেলায় স্বাভাবিকভাবে মুখে আসে সেইটেই ডাকা ভালো না?'

সত্য বলিল, 'বারীনবাবুর বেলায় যে 'তুমি' স্বাভাবিকভাবে আসে, আর আমার বেলায় সেটা স্বাভাবিক হয় না কেন?'

শান্তা মনে মনে চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো!—ত্রস্তে অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া খুঁজিবার চেষ্টা করিল, এমন হয় কেন? বারীন্দ্রকে প্রথম দর্শনের দিন হইতে যেমন সরল স্নেহের আবেস্টনে টানিয়া লইতে দ্বিধা হয় নাই, সত্যকামের সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল কেন? বারীনকে যে সম্বোধনে অভিনন্দিত করিবার পূর্ব্বে কোনও প্রশ্নমাত্র মনের কোণে উদিত হয় নাই, সত্যকামের প্রতি তাহার প্রয়োগ করিতে গেলে মুখ বাঁধিয়া যায়। এ সঙ্কোচ কিসের? সত্যকামের সম্মুখে তাহার স্বাভাবিক সরলতা কোথায় অন্তর্হিত হয়? আশ্চর্য্য! বিব্রত হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

সত্যকাম মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ''এবার থেকে বল্‌বেন, বলুন?'

ইতস্ততঃ করিয়া শান্তা উত্তর করিল, 'চেষ্টা করব।'

হাসিয়া সত্য বলিল, 'চেষ্টা? আচ্ছা, সেই যথেষ্ট!'

শান্তা আর কিছু বলিল না।

সত্যকাম আবার বলিল, 'দেখুন আপনি বলছিলেন, যার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক সেইটেই ডাকা ভালো, না? কথাটা দুদিক থেকেই অ্যাপ্লিকেবল বলে ধরে নিতে পারি?'

তাৎপর্য্য না বুঝিয়া শান্তা তাহার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল, 'বুঝ্‌লাম না।'

'কথাটা এতই শক্ত?'

শক্ত বিশেষ কিছুই ছিল না, কারণ পর মুহূর্ত্তেই অর্থ বুঝিয়া শান্তা আবার লজ্জা পাইল। আর—সত্যকাম কী যে করে! কিন্তু তাহার অনুরোধ এড়াইবার উপায় কি? দরকারই বা কি? বারীনকে যে অধিকার সে স্বচ্ছন্দে দিয়াছে, সত্যকামকেও তাহা দিতে আপত্তির কারণ কি? কিছুই না।

সে একটু হাসিয়া বলিল, 'বেশ তো। আপনার যেমন খুসী!' মনে মনে বিচার করিল— কিন্তু বারীন তো তাহাকে 'তুমি' বলে না।

অজ্ঞাতে কোনকালে অন্ধকারের অন্তরাল হইতে চাঁদ উঠিয়া গিয়াছে ক্ষীণ জ্যোৎস্না মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণতর হইয়া দেখা দিল। পায়ের তলা হইতে ছাদের গায়ে দীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে। শান্তা চারিদিকে চাহিয়া গা ঝাড়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'যাই এবারে— সন্ধ্যা উৎরে গেছে।'

সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিল, নীচে এখন কি কাজ?'

'বই পড়্‌ব।'

'বই পড়তে এত ভালোও লাগে ?'

শান্তা সকৌতুক হাসি হাসিয়া বলিল, 'আপনার মত ফাঁকিবাজ আমি ? সাধনা না কর্লে কখনো সিদ্ধি হয় ?'

'আপনার আবার এখন কিসের সিদ্ধির প্রয়োজন ? পরীক্ষার বিভীষিকা তো আমাদেরই চোখের সামনে।'

'পরীক্ষা ছাড়া আর পড়া থাক্‌তে নেই ?'

সত্য বলিল, 'সে থাক্‌গে।—কি আপনি কথা রাখ্‌চেন না তো ?'

'কি কথা ?'

'এক্ষুণি কথা দিয়ে এরি মধ্যে ভুলে গেলেন ?'

'আচ্ছা—কাল থেকে—।'

'আজই বলুন না ?—'

নাঃ, এ বড় অতিরিক্ত আবদার। এত শীঘ্র কখনও কথা বদলানো যায় ? শান্তা মনে মনে চেষ্টা করিয়াও পারিল না।

উত্তরের অপেক্ষায় কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সত্যকাম হঠাৎ যেন গম্ভীর হইল। আগ্রহে, আবেগে, সঙ্কোচে ও ভয়ে মিলিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে অদ্ভুত ক্রীড়া চলিতেছে, প্রাণপণ শক্তিতে তাহাকে থামাইয়া দিয়া সে বলিল, 'বল না, শান্তা ?'

শান্তার সমস্ত অঙ্গে যেন তড়িৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল। এমন অস্বাভাবিক অনুভূতি তো তাহার সারাজীবনেও হয় নাই। এ হইল কি ? সে স্পষ্ট অনুভব করিল, তাহার কাণের মধ্যদিয়া যেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতেছে, সমস্ত রক্ত যেন মুখে ছুটিয়া আসিল। সত্যকাম লক্ষ্য করে নাই তো ? না না।—আপনার ভিতরকার এই আলোড়নে শান্তা আপনি স্তব্ধ হইয়া রহিল। ছিঃ, সে কি পাগল হইল ? বারীন যেমন, সত্যকাম তো তেমনই তাহার ভাই। তাহার মুখের স্নেহসুলভ এই একটি সম্বোধনে এত বিচলিত হইবার কি আছে ? নিজের উপর ধিক্কার দিয়া শান্তা ভাবিল,—সত্যকাম এত সহজে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ: অধিকার করিয়া লইতে পারিল, সে সেটুকু পারিবে না ? অর্থহীন লজ্জার বাধায় সরল সৌহার্দ্দকে বিকৃত করিয়া রাখিবে ?

অতিপ্রয়াসে সহাস্যমুখে সে উত্তর করিল, 'হ্যাঁ বল্‌ব। যাও তো এখন লক্ষ্মী ছেলের মত পড়াশুনো করগে।'

সত্যকাম উৎফুল্লচিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, 'যাচ্ছি। আর আমার আপত্তি নেই—এখন যা বল্‌বে তাই।'

(ক্রমশঃ)

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন

শ্রীঅমলা দেবী

আবার কাগজে দেখ্‌চি মহাত্মা একদিন উপোস করেছিলেন, কেন-না রাজ সরকার আপ্পাসাহেব পট্টবর্দ্ধনকে রত্নগিরি জেলে স্বেচ্ছায় মেথরের কাজ করতে চাওয়ায় তাতে অনুমতি দেয় নি। আপ্পাসাহেব সেই জেলেরই একজন রাজবন্দী। সরকার প্রথমে বলেছিল যে বন্দীরা যদি ইচ্ছামত কাজ বেছে নিতে চায় তা' হলে কোনো জেলে নিয়মানুবর্ত্তিতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। গান্ধীজী বলেন যে বেশীর ভাগ কাজ হিসাবে যদি কোনো রাজবন্দী স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কাজ করে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের কাজ করতে চায় তবে তাতে নিয়মানুবর্ত্তিতার হানি হয় না। রাজ সরকার সে কথা মেনে নেওয়াতে অনশন তিনি ভঙ্গ করেচেন।

আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী। বাঙ্গলার চিন্তাসূত্রের সঙ্গে নিজেদের যোগ রাখতে চাই; তাই কিছু দিন থেকে মনে হচ্চে যে ব্যাপার নিয়ে মহাত্মার মত একজন স্থিরধী মহাপুরুষ পুনঃ পুনঃ এমন করে প্রাণপণ কচ্চেন, সে সম্বন্ধে বাঙ্গালী বিশেষ করে বাঙ্গালী নারীদের সঙ্গে দু'এক কথা আলোচনা করি।

সেদিন স্থানীয় কলেজের একজন গোঁড়া মাদ্রাজী হিন্দুর সঙ্গে আমাদের বাসায় গৃহস্বামীর আলোচনা হচ্ছিল। (বলা বাহুল্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে দক্ষিণ ভারতেই অস্পৃশ্যতা এখনও ভীষণ আকারে বর্ত্তমান রয়েছে)। মাদ্রাজী ব্রাহ্মণটি অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন করা উচিত বলে নিমরাজী হয়ে মেনে নিলেও ব্রাহ্মণরা কেন যে অস্পৃশ্যদের সামাজিক সমানাধিকার দিতে ইচ্ছুক নয় তার দু'একটি কারণ দর্শালেন। তা হচ্চে প্রথমতঃ এই যে অস্পৃশ্যতার উৎপত্তি হয়েচে অস্পৃশ্যদের নীচ ও অপরিচ্ছন্ন আচরণে। তারা যে রকম নোংরা থাকে তাতে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করা স্বাস্থ্যের পক্ষেও হানিকর। কিন্তু দেখে আশ্চর্য্য হলুম যে অধ্যাপক মহাশয়ের মত বিজ্ঞ লোকটিও ভেবে দেখেন নি যে তাদের এরূপ জীবন-যাপন-প্রণালীর মূল কারণ কোথায়। শ্রমবিভাগের ওপর প্রথম জাতিভেদ নাকি স্থাপিত হয়েছিল। সেই আমলে মুচি-মেথর-মুদ্দ-ফরাসের কাজ যারা করত, তারা জাতিভেদের কঠিন নিগড়ে বাঁধা পড়ে তাদের অপরিচ্ছন্ন কাজের থেকে আর রেহাই পেলো না এবং পুরুষানুক্রমে এই অপরিচ্ছন্ন কাজ দ্বারা জীবিকা সংস্থান হেতু তাদের পরিচ্ছন্নতার যা কিছু অভ্যাস ছিল ক্রমে ক্রমে বিসর্জ্জন দিতে হোলো। ব্রাহ্মণ কর্‌বেন দেবার্চ্চনা; তিনি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠে স্নানাহ্নিক সম্পন্ন করে দেবার্চ্চনায় মন দিলেন। আর যে মেথর তারও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠ্‌তে হয়, কিন্তু তা যে কার্য্যের জন্য তা আমরা সবাই জানি। আর শুধু তাই নয়, দিনমানই তার প্রায় ঐ কাজ নিয়ে থাকতে হয়, স্নানাহ্নিক তিলক কাটার সার্থকতা তার কাছে কোথায় আর দিনে তিনবার বস্ত্র পরিবর্ত্তনেরই বা তার প্রয়োজন কি? তা ছাড়া সমাজ তাকে

এমন কৃচ্ছ্রসাধ্য কাজের জন্য পারিশ্রমিকই বা কি দেয় ? একদিন যারা হাত গুটোলে কলকাতা বোম্বাইর মত মস্ত মস্ত সহরে আসন্ন মহামারী করাল মূর্ত্তি নিয়ে হানা দেয়, তাদের মাসিক মাইনে চোদ্দ পনের টাকার বেশী দেওয়া হয় না। দারিদ্র্য জীবনের কর্ম্মঠ শরীরে তাদের সন্তান সন্ততিও হয় বেশী। * চতুঃপার্শ্বের এই রকম বন্ধনের মধ্যে পড়ে বেচারীদের অত্যন্ত নোংরা জীবন যাপন করা ছাড়া উপায় থাকে না। এদের নৈতিক চরিত্রের অবনতিও সেই একই কারণে। জঘন্য বস্তি, পাশাপাশি এক একখানি ঘরে এক এক পরিবার, কোন আব্রুর বালাই নেই ; স্বামী, স্ত্রী, বাপ, মা, পুত্র, কন্যা এক কুঠুরীতে পোরা। যুগ যুগান্তর থেকে যারা এই চমৎকার আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ তারা কি করে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতায় তাল ঠুকে সমান চালে চল্‌বে বুঝি না ! ব্রাহ্মণরা একথা অনেক সময়েই ভুলে যান্ যে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষরা যে বিধির বন্ধন সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন তারই দৌলতে আজ তথাকথিত অস্পৃশ্যদের জীবন এত নোংরা। এই জন্যেই মহাত্মা বলেন আমাদের আজ প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার দিন এসেছে ; এদের বড় হবার, মানুষ হবার সুযোগ আমাদের করে দিতে হবে এবং সে সুযোগ দিতে পার্‌লে আমাদের অহঙ্কার করার তো কিছু নেই-ই, বরং এত বিলম্বে হলেও কর্ত্তব্য পালন অবশেষে যে কর্‌তে পেরেচি তাই মনে করে পরিতৃপ্তি লাভ করতে হবে।

অধ্যাপক মহাশয় দ্বিতীয় নজির দেখাচ্ছিলেন, যে অস্পৃশ্যরা জাতওয়ালাদের ব্যবহারে যত ক্ষুণ্ণ বলে আমরা মনে করি তত ক্ষুণ্ণ নাকি তারা নয়। তারা নাকি অন্ততঃ তাদের অধিকাংশ নাকি তাদের স্বীয় সামাজিক অবস্থাতে বিশেষ অসুখী নয়। এ অবস্থায় তাদের বৃথা কতগুলা চাহিদা সৃষ্টি করে কেন ক্ষেপিয়ে তোলা, কেন বৃথা অশান্তির সৃষ্টি করা ? ভারতীয় সমাজে যথেষ্ট অশান্তি কি এখনই নেই ? এ কথার উত্তরে তীব্র প্রতিবাদ হয়েছিল যে প্রথমতঃ অনুমান হয়ত সত্য নয় যে অস্পৃশ্যরা নিজেদের নিদারুণ শোচনীয় অবস্থার উপলব্ধি করতে পারে না। আর যদি বা সত্যি পারে না তবে তাদের এই স্বীয় দুর্দ্দশা উপলব্ধির অক্ষমতাই সব চাইতে বড় প্রমাণ যে হিন্দু সমাজ তাদের মানসিক বৃত্তি গুলোকে পিষ্ট করে কি রকম পঙ্গু করে ফেলেচে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তারা মুক্ততর জীবনের কল্পনা করতেও ভরসা পায় না। শুনেচি আমেরিকাতে দাসদের মুক্তি দেবার সময় তাদের এই অবস্থা হয়েছিল; মুক্তির কথা শুনে তারা মুক্তি চায় নি, তারা চিরদিন ক্রীতদাসই থাক্‌তে চেয়েছিল। জগদ্দল পাথরের মত যে বিধির চাপ বিধাতা-প্রদত্ত সার্ব্বজনীন অধিকারের দাবী করতে মানুষকে অক্ষম করে তোলে, ভীত করে তোলে, সে যে কতবড় সর্ব্বনাশী শয়তানী শক্তি তা ভেবে পাই নে। প্রকৃতি দেবী বল্‌চেন—দুনিয়ার মানুষ, তোমরা সবাই অজস্র আলো আমার নাও, নাও মুক্ত বায়ু, নাও স্বাস্থ্য, নাও স্বাধীনতা—মানুষ হবার অধিকার ! আর এরা যেন অন্ধকারে অন্ধকূপে গড়াগড়ি দিচ্চে, আর বল্‌চে আমরা কিছু চাই না এসব, আমরা খাসা

* শুনেছি এটা একটা biological law.

আছি! নাটকে হলে ব্যাপারটা প্রহসন দাঁড়াত, কিন্তু সমাজের দেহে এ সজীব ব্যাধি একটা বিরাট্ ট্র্যাজেডি।

ন্যায় বুদ্ধির দ্বারা যদি আজও আমরা অনুপ্রাণিত না হই, হিন্দু সমাজ বাঁচ্‌বে না, বাঁচ্‌তে পারে না। সেই জন্যই মহাত্মাজী এর পাপ থেকে একে বাঁচাতে চান। এ পাপ থেকে রক্ষা পেতে হলে অস্পৃশ্যদের কৃপার চক্ষে দেখে এক আধ বার পিঠে হাত বুলোলে চল্‌বে না; তাদের সাদরে আলিঙ্গন করে বল্‌তে হবে, তুমি যে পাহাড়ের মতো ধৈর্য্য নিয়ে নিজের রক্ত তিলে তিলে দান করে যুগযুগান্তর ধরে সমাজের দৈনিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে এসেচ, স্বার্থহীন সেবা করে এসেচ, সেজন্য শ্রদ্ধাঞ্জলী গ্রহণ কর! তোমাদের কার্য্য হীন নয়, তা অত্যাবশ্যক অমূল্য সমাজ-সেবা। আমরা সে কার্য্যের অংশীদার হয়ে তোমার সমান হতে চাই। যে সুখ সুবিধার উচ্চাসনে দাঁড়িয়ে তোমাদের দুর্দ্দশা এতদিন লক্ষ্য করি নি, সে সুখ সুবিধার অংশীদার তোমরা হয়ে আমাদের কৃতার্থ কর, আমাদের পর্ব্বত প্রমাণ ঋণের বোঝা কমাও। এ সুরে না ডাক্‌লে তারা আজ আমাদের কথায় কাণ দেবে কেন? উপদ্রুত তাদের আমাদের কাছ থেকে কোনো কিছুই দান গ্রহণ কর্‌তে নইলে অপমান বোধ হবে। এই মনোভাব নিয়েই আপ্পাসাহেব রত্নগিরি জেলে মেথরের কাজ কর্‌তে এগিয়ে গেছেন। বাংলা দেশের ছেলেরা ঠিক এই মনোভাব নিয়ে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের কাজে নাম্‌বে না কি? মেয়েরা মেথরের কাজ কর্‌লে হয়ত ছেলেরা বল্‌বে, তাতে গৌরবের বিষয় বিশেষ কিছু নেই কেননা মেয়েরা family scavenger বা domestic scavenger তো বটেই, কিন্তু domestic scavenger হিসাবে অভিজ্ঞতার ফলে এ পর্য্যন্ত বলে ছেলেদের আশ্বাস দিতে পারি যে অস্পৃশ্যদের কাজ যদি এমনি ধারাই হয় তো তাতে বিশেষ ঘৃণ্য বা নোংরা ব্যাপার কিছু নেই।
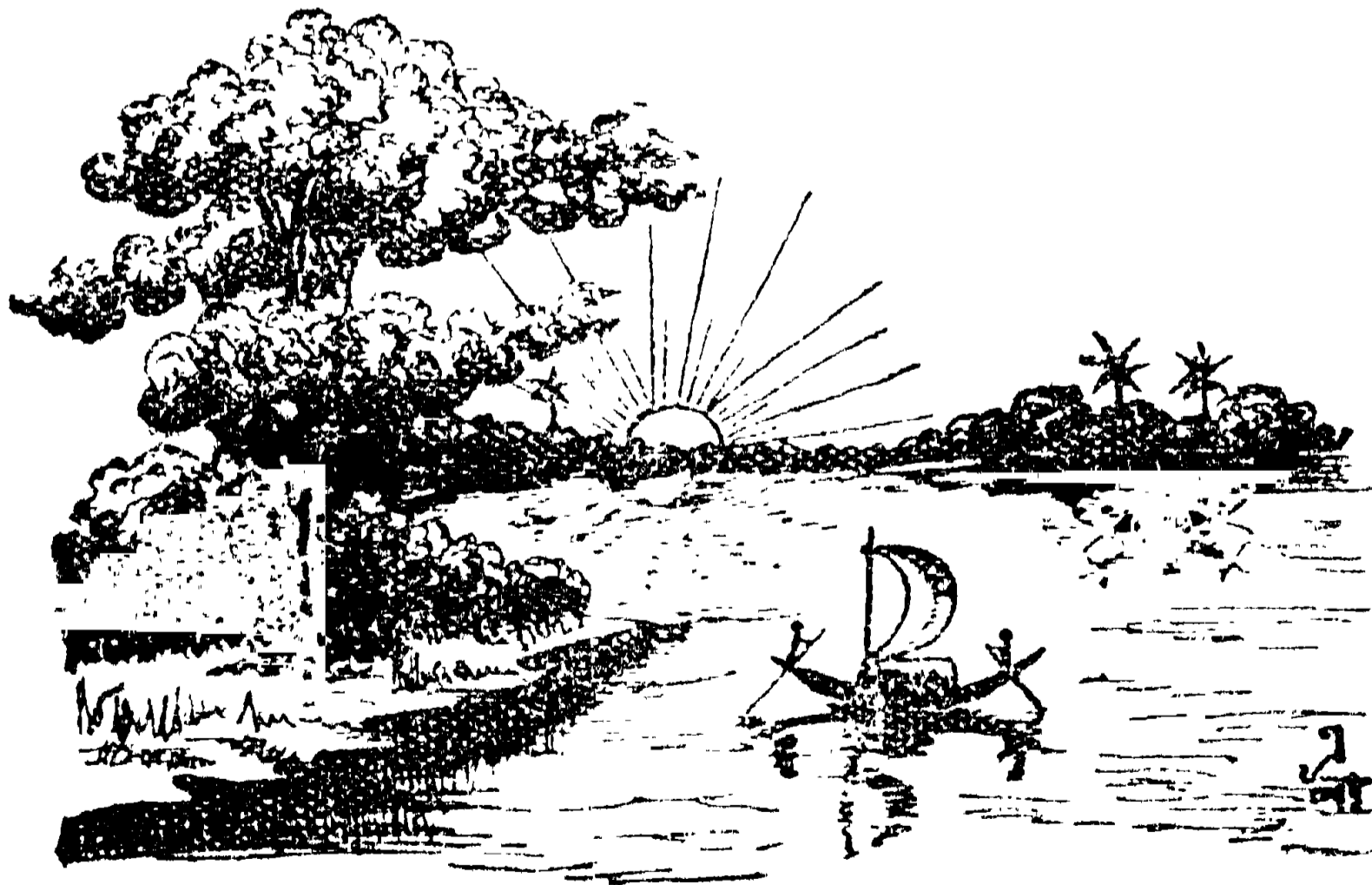
অজানার টানে

শ্রীনীহার দেবী

অশান্ত চরণ ক্ষেপে উদ্দাম সাগর
ছুটিয়া চলেছ কহ কাহার উদ্দেশে ?
ঊর্ম্মি উঠে উচ্ছ্বসিয়া নাহি সহে স্থির
চঞ্চল ছুটেছ কেন হেন শ্লথ বেশে ?
উদার মহত্ত্ব ভরা গম্ভীর গর্জ্জন
শ্রবণে কাঁপিছে বক্ষ দুরু দুরু দুরু
মেঘের চকিত স্পর্শে সঘন তর্জ্জন
বিরাট এ মহাযাত্রা কবে হোল সুরু ?
এমন সুস্থির তুমি মুহূর্ত্তে চঞ্চল
কেন হও দিশাহারা উন্মাদ পাগল ?
বাতাসে উড়িতে থাকে সফেন অঞ্চল
ছুটে চলো কি উদ্দেশে হাসি খল খল্ ?
কত আর ছুটিবেগো উদ্বেলিত প্রাণে
কত বর্ষ কত যুগ অজানার টানে ?

ডায়েরীর দু' এক পাতা

শ্রীকমলা সেন

আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ছে, দুঘণ্টা থেকে ঝড় জল সুরু হয়েছে কখন যে থাম্‌বে তার ঠিকানা নেই। ··· এই বর্ষার দিকে চাইলেই মনটা কেমন যেন ভারী হ'য়ে ওঠে। বুকের ওপর যেন একটা পাথর চাপা পড়ে, নিঃশ্বাসটা পর্য্যন্ত ঠেলে উঠ্‌তে পারে না। তবুও এই সময়টাকে বিদায় দিতে মন চায় না। মনে হয় এ থাক্—এ যতক্ষণ আছে হৃদয়ে বেদনা আছে সত্যি কিন্তু সে বেদনা যে আনন্দের ছায়া। শুধু একটানা বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ। শিক কটার ভিতর দিয়ে টুক্‌রো আকাশটা দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছে করে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশটা প্রাণ ভরে দেখে নিই। পাখীরা হয়ত উড়ে চলেছে আপন আশ্রয়। চাষীরা ফিরেছে মাঠ থেকে। এমন দিনে প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের একটা উৎকণ্ঠা সবারই মনে জাগে কিন্তু কাল্পনিক মিলন ছাড়া বন্দীর জীবনের বিরহ ত দূর হবার নয়। নির্ব্বাসিত যক্ষ মেঘকে দূত পাঠিয়েছিল, তাই বুঝি আজও মেঘ দেখ্‌লেই ঘুমন্ত স্মৃতি মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, প্রিয়ের সন্ধানে একটা স্মরণ লিপি পাঠাবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা অন্তরকে আকুল করে তোলে। কিন্তু মনের উচ্ছ্বাস কে সরলভাবে গ্রহণ করবে?

বহুদূর থেকে একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পাই—সে সুর কেবলই যেন বলছে, "ওগো দুখ জাগানিয়া তোমায় গান শোনাব।" "ওগো ঘুম ভাঙ্গানিয়া তোমায় গান শোনাব ···" গান শোনাব বলেই থেমে যাও কেন? গেয়ে যাও বন্ধু, গরাদের শিকে মাথাটা রেখে শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়ি। দুঃখ তো তুমিই জাগিয়েছ। তবে কেন আমার বিরুদ্ধে এ নালিশ? যেদিন তোমার মুখে ঘুম ভাঙ্গানিয়ার গান শুনলাম সেদিনই ত মনের কোণের রুদ্ধ বেদনা আগল ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল, এখনও যখন এ গান গাও, তুমি একবারও কি আমায় মনে কর? একবার ও কি মনে ভাব তখনকার ছবি যখন আমি গানের প্রত্যেকটি কথা ও সুর নিজের অন্তরে গ্রহণ ক'রে তোমার গানের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌তাম। এমন দরদী শ্রোতা আর কি পেয়েছ? আজ এই বাদলের দিনে চোখে ঘুম আস্‌বেনা। তুমি আজ রাত জেগে কি গান গাইবে? "বঁধূয়া নিদ্ নাহি আঁখি পাতে।" ···

মনে পড়ে এ দুটো গান গেয়ে একদিন আমায় পাগল করে দিয়েছিলে। আসন্ন বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ছুটে এলাম নদীর ধারে তখনকার সে মন নিয়ে আর যাই করা চলুক পড়া চলেনা। নদীর ধারে কতক্ষণ বসেছিলাম জানিনা। বাড়ী ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম, মনের মধ্যে সেই দুটো লাইন বাজ্‌তে লাগ্‌ল। মনে পড়ে বিদায়ের দিনে গেয়েছিলে,

'স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি
ভরা থাক্ ভরা থাক্।'

কিন্তু মিলনের উৎসবে তা আর কি ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌ব ? জানি, মৃত্যুর আগে নিরাশ হওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। তবু ত মনকে কিছুতেই আশান্বিত করতে পারি না। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে যদি মুক্তি পাই তখন সে কি আর আমায় চিন্‌তে পারবে ? একঘেয়ে বন্দী জীবন বহন কর্‌তে কর্‌তে হয়ত আর এক রকম হয়ে যাব। হয়তো আমার উপস্থিতি তখন তার কাছে বিরক্তিজনক হ'য়ে উঠ্‌বে। দশ বছরও যদি কারাদণ্ড হয় তবু মানুষ শেষের দিনের জন্য দিন গুণ্‌তে পারে, কিন্তু মুক্তির কোনও স্থিরতা নেই যার, আশাহীন বৈচিত্র্যহীন দিনগুলো তার কেমন করে কাটে ?

কি এর গানের মোহ—স্মৃতি টুকুও কোথা হ'তে কোথায় নিয়ে যায়। কণ্ঠ ত তার মিষ্ট নয়। কিন্তু গানের ভেতর একটা প্রাণ আছে, প্রত্যেকটি কথা যেন তার অন্তরের কথা। আমিতো কত কবিত্ব করছি। তুমি হয়ত সব ভুলে গেছ। ইচ্ছে হয় তোমার গান তোমাকেই ফিরিয়ে দিই। ...

"লীলাময়ী লো পাষাণ হিয়া
তনু কি গড়া মাধুরী দিয়া
(হায়) ফুলেরি তলে পাষাণ হিয়া।"

বন্ধুরা সকলেই কিছু না কিছু কর্‌ছে কিন্তু আমার যে কিছুতে মন বসেনা। শুয়ে শুয়ে একটা চিঠিই লেখা যাক্ তাকে।

(২)

২৪শে ভাদ্র, ১৩৩৭।

আজ চিঠি এসেছে তা'র, কুড়ি পৃষ্ঠা জোড়া চিঠি আমি লিখ্‌লাম, তার কি এই উত্তর ? এরই আশায় কি আজ সাতদিন পথ চেয়ে আছি ? একবার ও কি মনে হয়নি তার দুটো লাইনে কি আঘাত লাগ্‌তে পারে ? চিঠি লিখেছে দু'লাইন কিন্তু বুঝিয়েছে অসীম ক্ষমতা বটে। তাকে আঘাত কর্‌বার ইচ্ছে আমার ছিলনা। বন্ধুর সারল্য নিয়ে প্রীতি নিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে ছিলাম হয়ত উচ্ছ্বাসের মাত্রা একটু বেশী হয়েছিল। কিন্তু কাছে ছিল যতদিন সে ততদিন এমন ব্যবহার ও পাইনি যাতে তার কাছে চিঠি লিখ্‌তে আমাকে কলম সংযত কর্‌তে হতে পারে। কি ভুলই করেছি—পরীক্ষার সময়ে স্মিতমুখে শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করা, শেষ পরীক্ষার দিনে একসঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়া, বিদায়ের দিনে প্রিয় গান গুলো গেয়ে আমাকে আনন্দ দেওয়া এসবই কি তবে অর্থহীন ? ...

চেহারা তার ভাল নয়। নারীর মাধুর্য্য, কমনীয়তা তার চেহারাতেও নেই, ব্যবহারেও নেই। তবু যে তার প্রতি এতটা মুগ্ধ হয়েছি সে শুধু তার অসাধারণত্বের পরিচয় পেয়ে। দুটো জিনিষ তাকে মহিমান্বিত করেছে, বুদ্ধি আর সংযম। মনে পড়ে একদিন সে বলেছিল, 'অনুভূতি থাক্‌বে না

কেন? অনুভূতি থাকাটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু তার বর্ব্বরোচিত প্রকাশ থাকবেনা। ওটা পাশবিক বৃত্তি। সবিস্তারে বর্ণনার চেয়ে ব্যাঞ্জনার মূল্য অনেকবেশী। সেদিন তার সঙ্গে অনেক তর্ক করেছিলাম কিন্তু তবু সে তার মত থেকে বিচলিত হয়নি। দেখেছি আধুনিক বন্ধুত্বের ধরণকে সে কিরকম অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা কর্‌ত। বল্‌ত সে, যে বন্ধুত্বে উচ্ছ্বাস প্রবল ওটা বন্ধুত্বই নয়। অনেক বিষয়ে তার মতের সঙ্গে আমার মত মেলেনি তবু তাকে অশ্রদ্ধা কর্‌তে কোনও দিন পারিনি। একদিন সে বলেছিল খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্‌লেই তার অর্থ কেন বিকৃত হবে? একেবারে দুর্ব্বলতাশূন্য হলেই মানুষ খুব কাছাকাছি মিশ্‌তে পারে। আমার সঙ্গে সে কবিতা আর রাজনীতি আলোচনা করেছে, অবসর সময়ে ক্যারাম খেলেছে, আমায় গান শুনিয়েছে। এত মূর্খ আমি তাকে ভুল বুঝে তার সম্মানে আঘাত করেছি। আস্‌বার দিনে একখানা রুমাল দিয়ে সে বলেছিল, "মনে করবেন না। আমার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই রুমাল দিয়ে কবিত্ব কর্‌ছি, যুদ্ধযাত্রার জন্য এ নিশান আপনার হাতে দিলাম। বন্দীও যদি হন তবু কোনও দিন জয়ের আশা ছাড়্‌বেন না। জয়ের দিনে যে সন্ধি হবে সেদিন মুক্ত হ'য়ে এ নিশান আমার হাতে ফিরিয়ে দেবেন। যাক্, অভিমান করে একখানা চিঠি লিখে দেখি, তার কি উত্তর সে দেয়।

(৩)

২৫ শে কার্ত্তিক, ১৩৩৭।

আজ বার পৃষ্ঠা জোড়া চিঠি এসেছে। এমন সুন্দর চিঠি আমি জীবনে পাইনি। এত জটিল প্রশ্নের আলোচনা আছে এত। এই দামী চিঠিখানা পেয়ে অনেকদিনের মোহ আমার ঘুচে গেল। জান্‌তে চেয়েছে যে, মন যাদের বিদ্রোহী তাদের বুকে সুখদুঃখ, আশানৈরাশ্য, মান অভিমান এমন ক'রে কেন বাসা বাঁধে? সে ভাব্‌তেও পারেনা এমন মায়ামমতাহীন মন কি ক'রে এরকম ভাববিলাসী হয়। বুঝ্‌তে কি পার বন্ধু! যে হতভাগারা নিজেদের সারাজীবন বঞ্চিত করেছে, আত্মীয় পরিজন যাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায়না, জীবনের সম্বল যাদের কণামাত্র অবশিষ্ট নেই, তা'দের মনে এই কর্ম্মহীন দিনগুলিতে একটু স্নেহের জন্য কি বুভুক্ষা জাগে। বাইরে থাক্‌তে কাজে ডুবে থাক্‌তাম, মনের কোনও আপদ বালাই ছিলনা। এখন কিন্তু একটু স্নেহ ভালবাসার কথা মনে করতে মন অপূর্ব্বরসে ভরে ওঠে, একটু স্মৃতিতে মনের সুর হারিয়ে যায়, কঠিন ক্ষমাহীন চোখ দুটো দিয়ে শুধু বিচারই করবে? অন্তরের অনুভূতি দিয়ে একবার তলিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টাও কর্ব্বেনা?

আরও লিখেছে সে—"কেন আমরা আপনাদের বিশ্বাস কর্‌তে পারিনা—মেয়েতে মেয়েতে কি বন্ধুত্ব হয় না? একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের বন্ধুত্ব হলেই কেন তার অন্য অর্থ হবে? আজকের দিনে পুরুষ নারীকে একসঙ্গে কাজ কর্‌তে হবে, আজও যদি তারা পার্থক্য ভুলে গিয়ে না মিশ্‌তে পারে, বন্ধুর মন নিয়ে একে অন্যকে সাহায্য কর্‌তে না পারে, তবে যে কাজ এগিয়ে

যাবার চেয়ে পেছিয়ে যাবার ভয়ই বেশী। মেয়েরা হেসে কথা কইলেই আপনারা দুর্ব্বল হয়ে পড়েন, তাতে তারা সহজভাব হারিয়ে ফেলে, সে সাহস থাকেনা সে, শক্তি থাকেনা।" অনেক জায়গায় আঘাত পেয়ে সে এসেছিল আমার কাছে, কারণ আমাকে সে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু আমি তার বন্ধুত্বের সম্মান রাখ্‌তে পারলাম না, না জেনে তার সবচেয়ে গৌরবের স্থানটাতেই আঘাত করেছি। সে স্পষ্ট জানিয়েছে, শ্রদ্ধা ছাড়া আর কোনও মনোবৃত্তি যদি আমার থাকে, তবে তার সঙ্গে সম্পর্ক আমার এখানেই শেষ। আমি এ চিঠির জবাব দেবোনা, দেখি তার দিক থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায় কিনা। তবে আঘাত দিয়ে যে তার জন্যে অনুতাপ কর্‌বে তেমন মেয়েই সে নয়।

Genius বলে বলে এরা সবাই আমাকে পাগল করে তুলেছে। অন্তরের শ্রদ্ধা জাগিয়ে আমার সব রসটুকু শুষে নিয়েছে। কেমন করে জানাব তাকে যে Genius হয়ে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার লোভ আমার বিন্দুমাত্র নেই, মানুষের মত আমি চাই ভালবাসা—নিতে আর দিতে। এক একবার মনে হয়, সে কি এত হৃদয়হীন হ'তে পারে। ছুটীতে Fine arts এর দিকে এত বেশী ঝোঁক যার, কথায় গানে হাসিতে যে আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দিতে পারে, সে একটু মিষ্টি কথার উত্তরে এত কঠিন হয়ে ওঠে কেন? সে কঠিন খোলসের আবরণে কোমল হৃদয় তার লুকোতে চায় অথবা হৃদয়ই তার নেই, কে এই প্রশ্নের জবাব দেবে?

(৪)

আজ ছয়মাস পরে নববর্ষের সম্ভাষণ এসেছে। তাতে গতদিনের ঝগড়াঝাঁটি দূর করে সন্ধি কর্‌তে চেয়েছে। নববর্ষের দিনে তার কোনও নালিশ নেই, মনে কোনও ক্ষোভ নেই। অনেকটা যেন নরম হয়েছে বলে মনে হল, তবু লেখার কায়দাটুকু ছাড়্‌তে পারেনি। সকাল বেলা বন্ধুদের সঙ্গে হাসিগল্পে ভাল লাগ্‌ছিল না। চুপ ক'রে একা একা বসে আছি। বন্ধুরা চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অজস্র ঠাট্টা কর্‌তে লাগ্‌ল! এমন সময়ে তার চিঠি এল। বন্ধুরা চিঠিটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেল্‌ল। রাজনৈতিক বন্দীরা যখন একে একে খালাস হয়েছে, তখন সে আমার মুক্তির আশায় পথ চেয়েছিল, কিন্তু সে বিষয়ে নিরাশ হ'য়ে এই লিপি পাঠিয়েছে। অনেকেই অনেক পরিহাস করে গেল, আমার চোখে শুধু ভাস্‌তে লাগল চিঠির লাইনগুলো "দেশজোড়া সন্ধির দিনে কেউ যখন আপনাদের দিকে ফিরে চাইলে না তখন একটা আঘাত লাগা স্বাভাবিক। শুধু এই মনে ক'রে সান্ত্বনা লাভ কর্‌বেন, বাইরে থাকুন, আর ভেতরেই থাকুন শ্রেষ্ঠ গৌরব আপনাদেরই ... ।"

আগে একদিন ছিল যখন বন্ধুরা তার নাম নিয়ে কৌতুক কর্‌লেও আনন্দ হত। এখন আর সেদিন নেই। তাকে সর্ব্বসাধারণের দলে টেনে এনে আপনার করে চাওয়া ও পাওয়ার কথা ভাব্‌তেও ইচ্ছা হয় না। বুদ্ধিমান ও বেপরোয়া বলে মনে খুব অহঙ্কার ছিল, এখন সে ঘুচে গেছে।

এখন মনে যে ভাব আছে তা নিয়ে তাকে বন্ধুর মত জীবনের বড় কাজে সাহায্য করা চলে তাকে শ্রদ্ধা করা চলে।

তার কথাই ঠিক—কল্যাণ এবং শান্তির পথ সেখানে নয়, যেখানে সত্যের অভাব, সংযমের অভাব। প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে থাকা একটা বাহাদুরীর মত হয়েছে আজকাল। প্রবৃত্তিকে দমন করে বল্‌তে হবে, "আমি তোমায় জয় করেছি, আমি স্বাধীন, আমি রাজা।" যা যখন মনে হবে তা করলেই মানুষ স্বাধীন হয় না। সে চায় সে রকম বন্ধুত্ব, যে বন্ধুত্ব ভালবাসার কোনও প্রতিদান চাইবেনা, যাতে কোনও কিছুর দাবী দাওয়া থাক্‌বেনা। আচ্ছা তাই হবে বন্ধু! তুমি যে ভাবে চাও সেভাবেই নিজেকে তৈরী কর্‌বার ভার আজ থেকে নিজের হাতে তুলে নিলাম।...

গান

শ্রীসম্প্রীতি দেবী

এবার আমি বাহির হব পথের ধারে
ঘরের মাঝে বন্ধ হয়ে রইব না রে।
এবার আমি চলব পথে,
চির পথিক, চরণ রথে
চলার শেষে পাবই পাব চাইগো যারে।
কাঁটা পথে অনেক আছে
ফুটবে পায়ে জানি,
জেনেই আমি চল্‌ব, তারে
রইব না হার মানি।
বাধা কতই বাধ্‌বে পায়ে
ঠেলব তাদের চরণ ঘায়ে—
যাবার বেলায় কোনই বোঝা বইব না রে।

শিশু-মৃত্যু ও প্রসূতির অজ্ঞতা

বিগত স্বাস্থ্য-সপ্তাহে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম্-বি মহাশয় "আসন্ন-প্রসবা জননীর কি জানা উচিত" এই বিষয়ে একটি "ব্রড্‌কাষ্ট" বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ডাক্তার দাসের এই উপদেশ কি গর্ভবতী নারী, কি সন্তানের জননী সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত এবং সাধ্যমত পালন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার দাস বলেন—

প্রদর্শনীর কেন্দ্রগুলিতে হাতে-কলমে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কলিকাতার কোন কোন অঞ্চলে নারী-জাতির মৃত্যুহার পুরুষজাতির মৃত্যুহারের প্রায় দ্বিগুণ। আর, পুরুষজাতির তুলনায় যক্ষ্মারোগে নারীজাতির মৃত্যু-সংখ্যা পাঁচগুণ অধিক; বিশেষতঃ যাঁহারা অবরোধপ্রথা মানিয়া চলেন, তাঁহাদের মধ্যে আরও অধিক। ১নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য-সমিতি ৭০০ ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এই ৭০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে, দেখা যায় যে, শতকরা ৬২ জন ছাত্রী গ্রন্থিঘটিত রোগ ভোগ করে; শতকরা ৪৭ জনের মাংসপেশী দুর্ব্বল; শতকরা ৪২॥ জনের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আছে; আর শতকরা ৩২ জনের দন্ত রুগ্ন। ইহারাই ভবিষ্যতে আমাদের জাতির জননী হইবে।

গ্রন্থিঘটিত পীড়া কতটা পরিমাণে যক্ষ্মারোগের ফল, তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে এ কথা জানা গিয়াছে যে, অনেক মেয়ের স্ফীত গ্রন্থির মধ্যে যক্ষ্মারোগের বীজাণু পাওয়া যায়। আরও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে এই রোগে পুরুষদিগের অপেক্ষা নারীরাই ভোগে বেশী। ইহার কারণ কি?

চুণের অসদ্ভাব

নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর মধ্যেই একটি সাধারণ ভাব লক্ষ্য করা যায় যে, উভয়েরই রোগের মূল পুষ্টকারিতার এবং বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব। কেবল নারী ও পুরুষ বলিয়া উভয়ের মধ্যে যা-কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ডাক্তারেরা বলেন যে, খাদ্যে কিম্বা দেহে চূণের অপ্রাচুর্য্য ঘটিলেই যক্ষ্মারোগ, স্নায়ুমণ্ডলীর রোগ ইত্যাদি আরও কোন কোন রোগ হয়। স্ত্রীলোকদের দেহে চুণের অভাব কিছু বেশী; তাহার কারণ মাসিক ঋতুর দরুণ তাহাদের প্রচুর রক্তক্ষয় এবং ঘন ঘন গর্ভধারণ। সন্তানের জননী হওয়ার কঠোর অগ্নিপরীক্ষা ত আছেই; তাহার উপর, সন্তান প্রসব করিবার পূর্ব্বে তাহাদের যথোচিত যত্ন লওয়া হয় না। বিশেষ করিয়া, তাহাদের যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার তাহা তাহারা পায় না। যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য পাইলে, আর্ত্তবের সহিত যে পরিমাণে চূণ বাহির হইয়া যায় সে ক্ষতির কতকটা পূরণ হইতে পারিত। এই সকল কারণেই তাহাদের শরীর অসময়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের আর একটা কারণ—বিশুদ্ধ তাজা বায়ুর অভাব।

জন্মগত দৌর্ব্বল্য।

আসন্ন-প্রসবা নারীর এইরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রত্যক্ষ ফল: কি? শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের অনুষ্ঠানে এবং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য-সমিতির অনুষ্ঠানে হাতে-কলমে মেয়েদের দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, গর্ভাবস্থায় তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার ফলে, প্রসূত শিশুগুলির মধ্যে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের অর্দ্ধাংশ জন্মের এক মাসের মধ্যেই মারা পড়ে; এবং এই মৃত্যুর কারণ জন্মগত দৌর্ব্বল্য এবং অন্যান্য রোগ। আর মৃত্যু-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের একমাত্র কারণ জন্মগত দৌর্ব্বল্য।

স্বাস্থ্যের মূল

জাতিকে সুস্থ ও সবল করিয়া গঠন করিতে হইলে জননীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকা চাই। স্বাস্থ্য নির্ভর করে তিনটি জিনিষের উপর—বায়ু, জল ও খাদ্য। সহরের বায়ুর অর্দ্ধাংশই ধূলিকণা ও ধূমমাত্র। অপর অর্দ্ধাংশও বিশুদ্ধ নয়। তাহার কারণ আমাদের আচার ব্যবহার; যথা, অবরোধ প্রথা, আভিজাত্য, স্ত্রীজাতির পবিত্রতা সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা। এই সকল কারণের সমবায়ে সহরের বাকী অর্দ্ধাংশ বায়ু দূষিত হয়। যাহারা মনে করে যে, ভগবানের সৃষ্ট আলো-বাতাস উপভোগ করিলে, লোকে মেয়েদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এবং সূর্য্য মেয়েদিগকে দেখিতে পাইলে আমাদের জননী ভগিনীর পবিত্রতার হানি হয়, তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে ধিক্কার দিতে হয়। কিন্তু সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের পুরুষানুক্রমিক অনেকগুলি কদভ্যাসজনিত কুপ্রথা রহিয়াছে। ঘরের কোণে যাহাতে কিছুমাত্র বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য দরজা জানালা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ফলে বদ্ধ গৃহে গৃহবাসীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে গৃহমধ্যস্থ বায়ুতে তাজা প্রাণবায়ু একটুও থাকে না—উহা উত্তপ্ত অঙ্গারক বায়ুপূর্ণ প্রশ্বাস বায়ুতে পর্য্যবসিত হয়।

সহরে যে জল সরবরাহ করা হয় মোটামুটি তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু অনেক গৃহস্থবাড়ীতে ময়লা অপরিস্রুত জল তৈজসপত্র ধৌত করিতে এবং গৃহ মার্জ্জনার্থ ব্যবহৃত হয়। এই জল হইতেই বিসূচিকা ও উদরাময় রোগ জন্মে।

খাদ্য-নির্ব্বাচন

তাহার পর খাদ্যের কথা। মেয়েরা যথেষ্ট খাদ্য পায় না। খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যের কারণ সাধারণতঃ দারিদ্র্য। কিন্তু বিবেচনা করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিলে সস্তা খাদ্য হইতেও পুষ্টিকারিতা সংগ্রহ করা কঠিন নয়। বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে অনাবশ্যক ব্যয় সংযত করিলে খাদ্যের জন্য ফলমূল, শাকসব্জী, ডাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য অর্থাভাব ঘটে না। টাটকা ফলফুল ও শাকসব্জী ভক্ষণ করিলে চূণের অভাব পূরণ হইতে পারে। দুগ্ধ সরবরাহের সমস্যার সমাধানও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এখন আমরা আমাদের ছেলেপুলেদের চাকুরী করিবার উপযোগী করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকি। তৎপরিবর্ত্তে যদি তাহাদিগকে কৃষিবৃত্তি, গোপালন করিয়া গোরুর স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন পূর্ব্বক দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে দুগ্ধ-সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

ভারতীয় শুশ্রূষাকারিণীর অপ্রাচুর্য্য

ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটির রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে এযাবৎ যতগুলি বঙ্গভাষা-ভাষিণী ভারতীয়া শুশ্রূষাকারিণী তৈয়ার হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা তিন শতেরও কম।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালগুলিতে ১১১০০০ ভারতীয় রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে মাত্র ছয়জন ভারতীয়া নারী শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। ইহার অর্থ এই যে, যে সকল ভারতীয় রোগী হাসপাতালে অবস্থিতি করে, তাহাদের প্রত্যেক ১৭০০ জন রোগীর জন্য মাত্র একজন ভারতীয় নার্স পাওয়া যায়। সর্ব্বশেষ হিসাব হইতে জানা যায়, বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর ৮০০০০০০ লোক হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারী সমূহে চিকিৎসিত হয়। শিক্ষিতা নার্সদের অর্দ্ধেকও যদি ভারতীয়া নার্স হয় তাহা হইলেও প্রতি ৫৩৩৩৩ জন ভারতবাসীর জন্য একজনের বেশী নার্স পাওয়া যায় না।

অশিক্ষিতা ধাত্রীরা যে সকল শিশুকে প্রসব করায় তাহাদের মধ্যে শতকরা দশটি শিশু ধনুষ্টঙ্কার রোগে মারা যায়। যদি আরও বেশী পরিমাণে ভারতীয়া নারীগণকে নার্সের কার্য্য শিক্ষা-দানের বন্দোবস্ত করা যায় তাহা হইলে ধনুষ্টঙ্কার রোগে শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমিয়া যাইতে পারে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বলদেও মাতৃমন্দিরে ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে অনেকগুলি সম্ভ্রান্তবংশীয়া ভারতনারী নার্সিং শিক্ষা করিতেছেন। আরও অনেক নারী এই কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য সমুৎসুক। কিন্তু স্থানাভাবে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারা যাইতেছে না।

"স্বাস্থ্য-সমাচার"
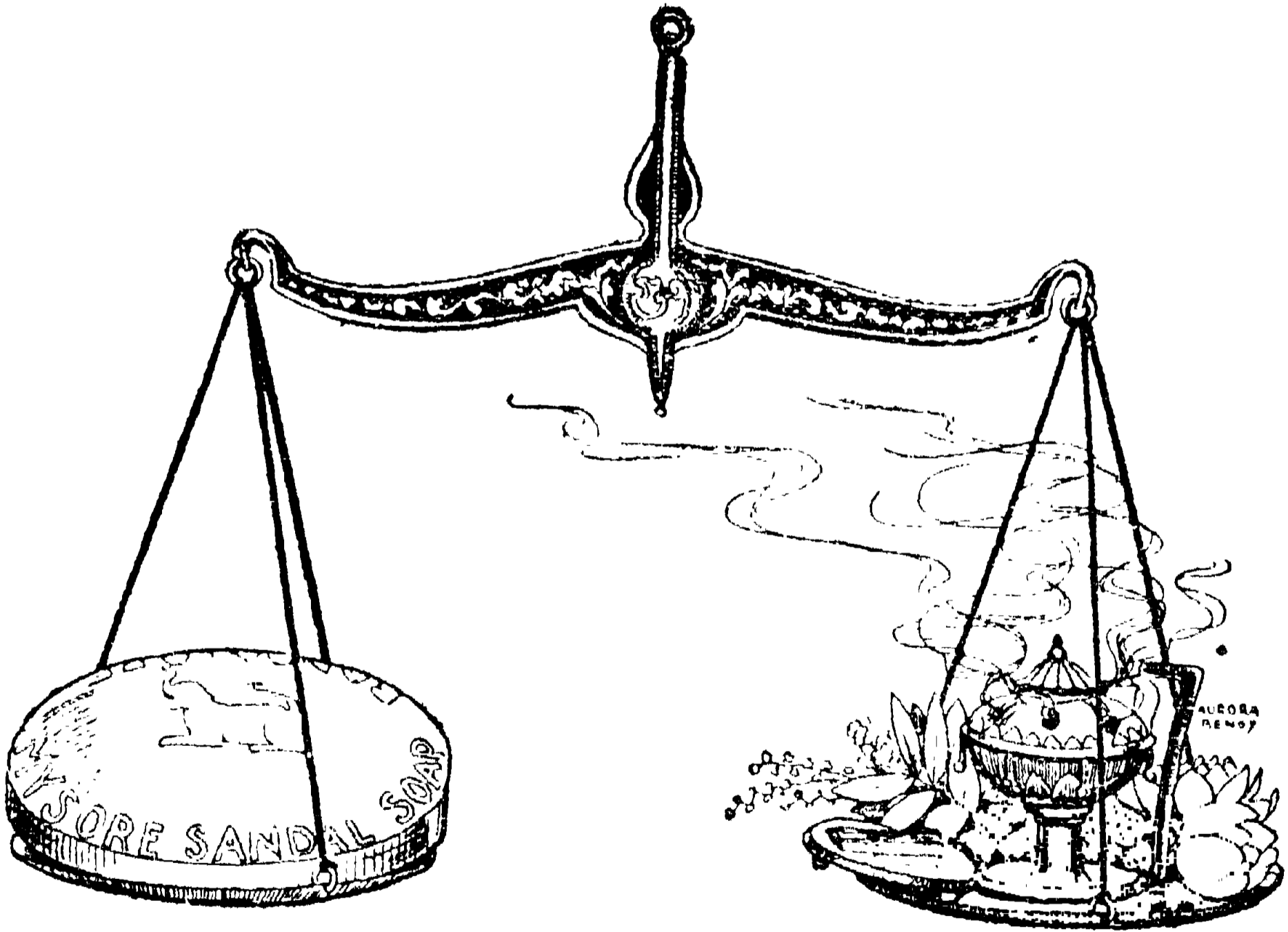
রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের সমালোচনা

শ্রীবিমানী সেন

'প্রবাসী'র মাঘের সংখ্যায় (১৩৩৮) কবি রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত যে চারিটী ছবি বাহির হইয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। কতকদিন পূর্ব্বে একজন সাহিত্যিককে 'প্রবাসী'র মতামতের সহিত নিজের মতামত মিশ্রিত করিয়া চিত্র কয়খানা সম্বন্ধে নানা প্রকার গভীর মন্তব্য প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি; আজ এতদিন গত হইবার পরেও এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, এ ছবির সমালোচনার ভালমন্দ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কোন মতেই স্পর্শ করিবে না। তাহার কারণ রূপসৃষ্টি করিয়াই তিনি বিদায় লইয়াছেন; এবং তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি হইতে বেশ বুঝা যায়, এ সৃষ্টির জন্য দায়ী তাঁহার মন নহে, দায়ী তাঁহার হাত ও দৈব। কবির কলমের ফলা হইতে রেখা ছন্দোবদ্ধ হইয়া কাগজের বুকে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা দর্শক ও কবি উভয়ের নিকটই সমভাবে অপরিচিত। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার লইয়া ও চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করা যে কোন কারণেই হউক যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া, নাম দানের ভারটুকু পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছেন দেশের দশের উপরে—এ শ্রদ্ধা না কৌতুক!

কবি ইহা বেশ ভাল করিয়াই জানেন যে তাঁহার দেশের লোক বড়র নাম করিয়া সব কিছুই করিতে পারে। ভগবানের নাম করিয়া পূজার যত্নে বৃক্ষের পুষ্টি সাধন করিতে পারে; আবার অনাহারে, অবহেলায় মানুষকে পায়ের তলায় পিষিয়া মারিতে দ্বিধা করে না। তাই কি আজ তাঁহার জীবন-সন্ধ্যায় একবার পরখ করিয়া লইতে চাহেন যে, দেশবাসী আজও আভ্যন্তরীণ সত্য দিয়া বড়ত্বের বিচার করে, না বড়ত্ব দিয়া সত্য মানিয়া লয়!

বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের পায়ের ধূলা পর্য্যন্ত অনেকে সোনার কৌটায় তুলিয়া রাখে। ব্যক্তি বিশেষের মনের তৃপ্তি যদি ইহা আনয়ন করে তবে ইহার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইবার কাহারও কিছুই নাই, থাকিতে পারে না। স্মৃতি-হিসাবে মানুষ যে-কোন বস্তুকে যত বড় ইচ্ছা সম্মান দান করিতে পারে কিন্তু 'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয় চিত্রগুলিকে কবির স্মৃতিবাহী না করিয়া গৌরববাহী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাই এ বিষয়ে যুক্তি-সঙ্গত মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

এ ছবি কয়খানা (কবির অঙ্কিত) যদিও অতিবেশী মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে, তাছাড়াও আজকালকার মাসিকে মাঝে মাঝে এমন সব আকৃতির চিত্র প্রকাশিত হয় যাহা শুদ্ধমাত্র ভাবের টিকিট আটিয়া শিল্পজগতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। ভাবের কুয়াশা যে প্রকার দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে শিল্পজগতের সৌন্দর্য্যটুকুকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে আর অধিক দিন

প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয় না। রাগিণী ও তালমান লইয়া লড়াই করিবার ফাঁকে 'মাধুর্য্য' যেমন সজল চক্ষে ওস্তাদী বৈঠক হইতে বিদায় লইয়াছিল, তেমনি শিল্পীদের মধ্যেও ভাবের এত প্রাদুর্ভাব দেখিয়া 'সৌন্দর্য্য' মোগলী ঢং এ সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে পশ্চাদ্‌গামী হইতেছে। স্বরূপ, সঠিকরূপ ত্যাগ করিয়া যত আর্ট যাইয়া প্রকাশ পাইতেছে অদ্ভুত ও বিকৃত রূপের মধ্য দিয়া। শুধু ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কথাশিল্প রহিয়াছে, চিত্রশিল্প নয়। চিত্রশিল্প সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় তখনই, যখন চিত্র ও শিল্পের প্রভাব সমানভাবে থাকিয়া একে অন্যের গৌরব বৃদ্ধি করে; অর্থাৎ চিত্রের মধ্যে গবেষণার উপযোগী যত কিছুই থাকুক, দর্শনোপযোগী কিছু থাকা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের চিত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে কেবল মাত্র একখানার মধ্যেই কবি ধরা দিয়াছেন। দীর্ঘ বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট ছবিখানা কবির ভাবপ্রসূত, ইহা ব্যতীত অপর তিনখানা যে সত্যি সত্যি তাঁহার হস্তপ্রসূত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 'প্রবাসী' বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট ছবিখানা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন "—ছবিটীতে কি ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন প্রকৃতির উপর একই বংশীধ্বনির ভিন্ন ক্রিয়া দেখান হইয়াছে? এ বংশী কে বাজাইতেছেন?" প্রথম প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বলিলে উত্তর শুদ্ধ হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। দ্বিতীয় প্রশ্ন নেহাৎই জিজ্ঞাসাসূচক, অতএব উত্তরসাপেক্ষ।

বংশী বাদকের পশ্চাতের জন্তুটিকে কুকুর বলিয়াই মনে হয়—পশ্চাতে পোষা কুকুর। সম্মুখে মোহাবিস্ট কতিপয় মনুষ্যমূর্ত্তি, অবস্থা একই প্রকার; ক্রমশঃ মূর্ত্তিগুলির অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যেন গ্রহচ্যুত আলোরশ্মি আসিয়া উহাদের অজ্ঞানতার মোহ কাটাইয়া দিতেছে। আবেশমুক্ত চোখে ঊর্দ্ধে তাকাইয়া, সেখানকার অসীম আলোর ভাণ্ডার দেখিয়া, শেষের দুই তিনটী মূর্ত্তির যেন চমক লাগিয়া গিয়াছে। দেশের পূর্ব্বাপর অবস্থার সহিত ছবির ভাবটী বেশ সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; ইচ্ছা করিলে বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়াও ইহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে ভাবেই গ্রহণ করা যাউক, ইহার পরে বাদকের পরিচয় বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। নাম দানের অধিকার কবির নিকট হইতে আমরা সকলেই পাইয়াছি, তাই ভুল হউক, শুদ্ধ হউক, চেস্টা করিতে দোষ কি? ছবিটীর নাম 'মোহ ও মুক্তি' বা 'মুক্তির আলো' দিলে কি ভুল হেইব?

নারী মূর্ত্তিটীর ভাব নাকি সম্পাদক মহাশয়কে লিয়োনার্ডোর (Leonardo da vinci) মোনা লিসার (Mona lisa) রহস্যাচ্ছন্ন হাস্য মনে পড়াইয়া দিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় কি কখনও গ্রামের মেলা দেখেন নাই? না দেখিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে দেখিবার চেস্টা না করাই ভাল; কারণ তাহা হইলে এই মূর্ত্তিতে এই হাস্য ধামায় করিয়া বহিয়া আনিয়া যাদুঘরে সাজাইয়া রাখিবার বাসনা তাঁহাকে পাইয়া বসিতে পারে। তিনি আরও বলিয়াছেন "এ নারী মূর্ত্তির মুখ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, বলা আরও কঠিন।" মোনালিসার হইল রহস্যাচ্ছন্ন হাস্য, কিন্তু "ইহা কেবল

হাসি নয়, কেবল কৌতুক নয়, কেবল বিরাগ নয়, ব্যঙ্গ নয়।" বেদান্তের ব্রহ্ম বর্ণনার মত কেবল কি যে নয়, তাহাই বলিয়াছেন, কি তাহা বলিতে যাইয়া খেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। পড়িলেই মনে হয় তাঁহার ভাবসাগরে ডুব দিবার চেষ্টা কেবলমাত্র দমের স্বল্পতা বশতঃই বার বার নিষ্ফল হইয়াছে। বালকের সম্মুখে হাত দিয়া গোঁফ ঢাকিয়া, হাঁটু ভাঙ্গিয়া দণ্ডায়মান হইলে, বালক সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রবীণ দর্শকের নিকট সে অবস্থা উপভোগ্য। এ ক্ষেত্রেও শিশু চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে সম্পাদক মহাশয়ের অবস্থা, প্রবীণ হইতে প্রবীণতর কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন, আমরা শুধু আন্দাজ করিতে পারি।

সম্পাদক মহাশয়ের মত অত গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া খেই হারাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। সাদা চোখে সাধারণ বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া নারী মূর্ত্তি ও অপর দুইটী চিত্রের নাম নীচে দিলাম। ভুলশুদ্ধ মীমাংসার ভার পাঠক-পাঠিকাদের উপরে। নারীমূর্ত্তিটী "খেলা ঘরের গৃহিণী" পাখীর ছবিখানা "শিশুর সম্পদ" এবং ফুলের চিত্রটীর নাম "সূচিশিল্প" বা "সূচি শিল্পের প্রতিকৃতি।" প্রদত্ত নাম কয়টী সম্বন্ধে সুধী ব্যক্তিদের মধ্যে কাহার কোন যদি আপত্তি থাকে, জানাইলে বাধিত হইব।

মিনতি

শ্রীপ্র—গুপ্ত

(১)

চল যাই প্রিয়,
বহুদিন দেখি নাই ওরূপ অমিয়।
হেরি তাহা একবার,
মুছিব নয়ন ধার,
পথশ্রমে ক্লান্ত মোরে, বারেক দেখিয়ো,
কত দীর্ঘ পথ আমি
আসিয়াছি অতিক্রমি,
পারি না যে আর,—এবে বুকে তুলে নিয়ো।

(২)

চল যাই সখে,
এত কি লেগেছে ভালো এই ধরণীকে ?
নাহি শোক, নাহি ব্যথা,
নাহি জান ব্যাকুলতা,
হয় না কাতর মন ম্লান মুখ দেখে ?
বিচ্ছেদ যাতনা সব,
কর নাকি অনুভব,
জীবন কি প্রিয় এত দয়িতার থেকে ?

(৩)

চল যাই নাথ,
কাটিয়াছে কত দিন, কত দীর্ঘ রাত !
ও বুকের স্পর্শ লাগি'
আমি যে কাতরে জাগি,
এ দুঃখের নিশা কবে হইবে প্রভাত ?
হৃদয় লয়েছ জিনি
যুগ যুগ তোমা' চিনি,
পরম আত্মীয়, দেছ মরণ আঘাত !

(৪)

চল যাই মোরা,
বহিতে পারি না আর দুঃখের পশরা।
কত কথা, কত জ্বালা,
কভু কি হবে না বলা ?
নিঃসঙ্গ, অনাথ কত ফেলি আঁখি ধারা।
জীবনে বিচ্ছিন্ন ভবে,
মরণে মিলন হবে,
পরলোক দ্বার কর অতিক্রম ত্বরা।

মৃগমদ

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

(১১)

ব্যালকনির রেলিং এ ঠেস্ দিয়া নীরা একলা দাঁড়াইয়াছিল। আকাশে অস্তরবির উচ্ছ্বসিত আলোকপ্রভার মত মুখে তাহার অপরিসীম কৌতুকের প্রভা। আঁচল খসিয়া মাটিতে লুটাইতেছে, বেণী খুলিয়া রেলিং এর বাহিরে দুলিতেছে। ঠোঁটে চাপা হাসি।

চন্দ্রিমা নীরাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিল। নীরা তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় লুকিয়েছিলি চাঁদ? তোকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আমি তোর ব্যালকনিতে এলুম।

আমাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এলে, না আর কিছুর জন্যে এলে তা কে জানে। মুখে হাসি যে ধরে না,—ব্যাপার কি? "ব্যাপার সঙ্গীন্। শুন্‌বি? আঁচ কর্‌ত দেখি?"

চন্দ্রিমা হাসিয়া বলিল, আমি যা আঁচ কর্ব্ব তা অর্জ্জুনের মত অব্যর্থ সন্ধান হবে। কিন্তু তা থাক্। তুই বল্।

নীরা পিছন হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া চন্দ্রিমার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, একজন আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে। এবারে বল্ দেখি কে?

প্রসূন বাবু!

নীরা হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলে, এক ঢিলেই সাবাড় কল্লি! কি ভয়ানক মেয়ে তুই।

চোখের আগেই যা ঝুল্‌ছে,—তা দেখ্‌তে লোকের আর কষ্ট কর্ত্তে হয় না!

নীরা চিঠিখানা চন্দ্রিমার গায় ফেলিয়া দিয়া বলে, নে, পড়্।

চন্দ্রিমা তাহা তুলিয়া নিয়া সুধায় কিন্তু, আমার পড়া কি ঠিক্ হবে?

নীরা সকৌতুকে হাসিয়া বলে, কেন ঠিক হবে না শুনি। "কি অদ্ভুত যে তোর মতামত সব! এক জনে তার প্রাণের গোপন কথা সঙ্গোপনে তোকে নিবেদন কোরেছে—কত লজ্জা ভয় ভাবনা বেদনায়—"

যা যা আর কবিত্ব ফলাস্ নি। তোর পড়্‌তে লজ্জা করে, আমি তোকে পড়ে শোনাচ্ছি।

পিছন হইতে শীলা প্রবেশ করিয়া বলে, কি ভাই, কার চিঠি?

নীরা কলকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে বলে, প্রসূনবাবুর চিঠি। আমাদের চন্দ্রিমা তা পড়্‌তে লজ্জা পাচ্ছেন।

শীলার হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, তাই নাকি! সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানা চন্দ্রিমার হাত হইতে লইয়া বিনা আড়ম্বরে পড়িতে আরম্ভ করিয়া দেয়—

যে মানুষ লোভাদুদ্বাহুরিব বামন প্রাংশুলভ্য ফলে কামনা করে—তাকে লোকে পাগল বলে। কিন্তু আকাশের চন্দ্রকে সরসীর কুমুদ—

শীলা হাসিয়া নীরার গায় লুটাইয়া পড়ে। চন্দ্রিমা বিস্ময়ভরা চোখে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকে।

নীরা বলে, চিঠিটা তবু গদ্যে পদ্যে নয়।

শীলা বাকিটা এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া লইয়া বলে, রেখেদে এটি স্মৃতিচিহ্ন করে।

নীরা চিঠিটা নিয়া ভাঁজ করিতে করিতে বলে, কাল ক্লাশে ললিতাদের দেখাতে নিয়ে যাব।

চন্দ্রিমার দুই চোখে বিস্ময় ও বেদনা ওঠে ঘনাইয়া, ক্ষুব্ধ স্বরে বলিয়া ওঠে, ক্লাসে কাল সবাইকে এ চিঠি দেখাবি? কি যে বলিস্!

নীরা চোখ মট্‌কাইয়া হাসিয়া বলে, তুই যে একেবারে ভীষণ রাগ করে উঠ্‌লি! দেখাই যদি, ক্ষতি কি তাতে? কবির কাব্য-কৌতুকে সবাই উপভোগ কর্ব্বে এমন আমোদ থেকে আমি তাদের বঞ্চিত কর্ব্ব, এমন কৃপণাত্মা আমি নই।

চন্দ্রিমা ছাড়ে না, তবু বলে, কিন্তু ভদ্রলোককে এ ভাবে অপদস্থ করাটা কি হৃদয়বত্তার কাজ হবে? নাই যদি দিতে পারিস্ তাকে কিছু না-ই দিলি, তা বলে তার ব্যর্থতাকে সবার কাছে হাস্যাস্পদ করে তাকে আঘাত দিতে যাওয়া কেন!

নীরা শীলাকে ঠেলিয়া বলিল, কিরে শীলা, চন্দ্রিমা আমাদের আজকাল কেমন বক্তা হয়ে উঠেছে! দেখেছিস্ আর এমন সমজদার লোক কখনও?

চন্দ্রিমা নিরস্ত না হইয়া বলে, ঠাট্টা কচ্ছিস্ কর। কিন্তু তাতে ঐ মানুষটির উপর যে অবিচার কর্ব্বে তা ঢাকা পড়্‌বে না। যাকে দেবার কিছু নেই, তাকে চাইবার অধিকার দেওয়া কেন!

নীরা মস্তক উন্নমিত করিয়া কপালে চক্ষু তুলিয়া বলে, আমি অধিকার দিয়েছি ওকে বলিস্ কি তুই পাগলের মত?

স্বীকার করিস্ আর না করিস্, সত্য তাতে বদলাবেনা। সব কথা নিয়ে তর্ক করা চলে না, এমন কি সব কথা বলাও চলে না। অধিকার ওঁকে দিয়েছিস্ কি না দিয়েছিস্ সে তোর বিলক্ষণ জানা আছে। আচ্ছা ধর, তোর দরজার বাইরে যদি একটা ভিক্ষুক হাত পেতে দিনরাত বসে থাকে তাকে তুই কি দিস্?

অনুচিত উপমান টানছিস্ কেন, অর্থহীন কথায় কি লাভ?

যা জিজ্ঞাসা কল্লু‌ম, তার উত্তর দেনা, তুই কি দিস্ তাকে শুনি?

শীলা মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া বলে, দুয়োরে যে ভিখিরী নাছোড়বান্দা হয়ে বসে থাকে, তাকে আমরা একটা পয়সা, একটা এক-আনি কিবা একটা দুয়ানি-টুয়ানি দিয়ে থাকি। বেশী দাতা যে হয়, সে হয়ত টাকাটাও দিয়ে থাকে।

নীরা হাসিয়া বলে, তাতে যদি সে খুসী না হয়ে তোর সমস্ত সম্পদের অধীশ্বর হতে চায়, তবে তাকে কি দিস্ ?

—একটি অর্দ্ধ চন্দ্র !

নীরা চন্দ্রিমার দিকে চাহিয়া বলে,—শুন্‌লি এবার ? নীচে ঝর্ণার জলে তরঙ্গের প্রতি-বিম্বিত অস্তরবি রাগের মত তাহার চোখে মুখে হাস্যচ্ছটা খেলিতে থাকে।

চন্দ্রিমা চুপ্ করিয়া থাকে। নীরা শ্লেষের ঝাঁঝে বলে, 'তুই কি স্ বল্‌না আমাদের ? আজকাল ত তুই এ সম্বন্ধে মস্ত একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়েছিস্।'

চন্দ্রিমা কোনো কথার উত্তর দেয় না। উন্মনা-ভাবে সায়াহ্নের স্বর্ণবিভা-খচিত পুষ্প-বিভূষিত উদ্যানের দিকে চাহিয়া থাকে। একটু চোখ তুলিলেই পূর্ব্বকোণ ঘেঁসিয়া এক লতা-প্রাচীর, কিন্তু সেদিকে চাহিতে তাহার সাহস হয় না। আষাঢ়ের আসন্ন বারিপাত মন্থর চল মেঘ মালার মত তাহার ভাবনা দূরের অস্পষ্টতা পরিহার করিয়া দৃষ্টির সীমায় নামিয়া আসিতে থাকে। কি সে বলিতেছিল তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজের মনের এক অশ্রুত কথার মোহে মগ্ন হইয়া যায়।

নীরা তাহার বিমুক্ত বেণী ধরিয়া টানিয়া বলে, কি ভাবনায় এমন ডুব দিলি ?

চন্দ্রিমা সচেতন হইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়, বলে প্রসূনবাবুকে কেন খারিজ কর্লি তাই ভাব্‌ছি।

নীরা হাসে। শীলা বলে, চন্দ্রিমা চক্ষু তোমার বাস্তবের দিকে একটু নামিয়ো। প্রসূন বাবুর সোস্যাল স্ট্যাটাস যা— সে হচ্ছে ওর বাপের, ওর কি দাঁড়াবে তা কেউ জানে না।

চন্দ্রিমা নীরার দিকে চাহিয়া বলে, সত্যি ?

নীরা ভ্রূকুটী করিয়া বলে, তুই যে এমন হাঁদা মেয়ে—তা জান্‌তুম না কিন্তু ?

চন্দ্রিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে, এরকম বিচার তোমরা কর্ব্বে—এ আমি মনে করি নি।

সোস্যাল স্ট্যাটাস্ নব্য ভারতের কাছে—খুব উঁচু জিনিষ নয়।

নীরা সকৌতুকে বলে, উঁচু জিনিষ উঁচু নয়—বলিস্ কি, মালভূমি আর উপত্যকা—একই পদার্থ ?

"তর্কে বহু দূর"—সুতরাং তর্ক নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ গুণধর্ম্ম নিয়ে, তার কালচার নিয়ে—টাকা নিয়ে নয় গো সুন্দরী !

টাকা নিয়ে নয় ? যে টাকা নইলে সব ফাঁকা—বলিয়া নীরা হাসিতে থাকে।

চন্দ্রিমা বলে—অবশেষে তোমরা ফ্যাসন্ ওয়র্শিপ্‌এ লেগে গেলে।

সোস্যাল স্ট্যাটাসের দোহাই দিয়ে জপ কর্ব্ব তারি মহিমা কিন্তু এ জেনো—

নীরা শীলার হাত ধরিয়া বলে, চল্ ভাই শীলা নীচে যাই। চাঁদাকে বক্তৃতার ভূতে পেয়েছে।

নীরা ও শীলা হাসিতে হাসিতে নীচে নামিয়া গেল। চন্দ্রিমা রেলিংএর উপর ভর দিয়া

নীচের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিছনে তাহার রুদ্ধ গৃহের ক্ষুদ্র সীমা, সম্মুখে আলোছায়ায় বিচিত্র অবারিত ধরণী।

পরিচয়ে বাঁধা তাহার মনের তটে ভাসিয়া আসে রোল-কল্লোল-মন্থিত সাগর-সমীরের মত এক অজানার অপরূপ আবাহন। তাহার সমস্ত প্রাণ উদগ্রীব উন্মুখ হইয়া তাহার দিকে কাণ পাতিয়া থাকে।

নীরা হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলে, নে, আর ভাবে কাজ নেই—চল্ বেরুব এখন।

চন্দ্রিমা নীরার রেঙ্গোর দিকে চাহিয়া বলে, কোথায় যাবে?

ডি, এন্, লাহা এসেছেন—জু'তে যাব তাঁর সঙ্গে।

লোকটি কে?

চিনিস্ না?

না।

না বৈ কি। আই সি এস্ দিগেন্দ্র লাহা। আদর্শের সন্ধান মিলে গেল কথা কইতে কইতেই?

খোদা যব্ দেতা—ছাপুড়্ ফোড়্কে দেতা। বুঝ্লি কি না? ও হোল দৈবের কথা। চেনা ছিল আগের, দেখা হয়ে গেল সেদিন হঠাৎ আভাদের বাড়ী?

আর অম্নি ছুটে এসেছেন?

মানুষের সব কাজে অর্থ আরোপ করা ভারী অন্যায়। দেখা হোল—বেরাতে এলেন। কি হয়েছে তাতে, সত্যি সত্যিই আমি ওঁর জন্য বরমাল্য নিয়ে বসে আছি কি না। বলিয়া সে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরে, আমি চঞ্চল হে,

আমি সুদূরের পিয়াসী।

দিন চলে যায়, আমি আন্‌মনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী।
ওগো সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
নাহি জানি পথ নাহি মোর রথ—

চন্দ্রিমা বক্র কটাক্ষে চাহিয়া বলে,—কেন বাপু, রথ ত তোর এসেছেই। এখন উঠে পড়্লেই ত হয়।

নীরা হাসিতে থাকে, বলে, রথ আমার এসেছে, তা জানি, কিন্তু তোকে ছায়া রথে ফেলে উঠি কি করে? তুই হ'লি আমার পিয়সহি অনসূয়া। চন্দ্রিমার আঁচল ধরিয়া নীরা টান দেয়।

অর্দ্ধেক রাগিয়া অর্দ্ধেক হাসিয়া চন্দ্রিমা বলে, যা, আমায় জ্বালাস্ নে। চিনিনে শুনিনে কোথাকার কে,—চলি আমি তার সঙ্গে বেড়াতে।

চল্ চেনা করিয়ে দিচ্ছি।

বল্লেই হোল তার কি? চাইনে আমি চেনা কর্ত্তে।

চাইনে বল্লেই হোল নয়? তোকে যেতেই হবে।

নীরা চন্দ্রিমাকে টানিতে টানিতে নীচে লইয়া গেল।

বারান্দার কোলের উপর এস্রাজ রাখিয়া বাজাইতে বাজাইতে অরুণিমা বাজনার সঙ্গে মৃদু স্বরে গাহিতেছিল—

তবু পথ চেয়ে থাকা,
নয়নের বারি নয়নে নিবারি
হাসি দিয়ে ব্যথা ঢাকা।
পিছনে যে অবহেলে ফেলে যায়
তার লাগি কেন মিছা হায় হায়
যে দীপের শিখা যায় নাক রাখা
প্রাণ পটে তারে লিখা।

আমার জন্যে পথ চেয়ে ছিলি?

অরুণিমা গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে চটুল চক্ষে চাহিয়া বলে, সত্যি ভাই ছিলুম।

তা খোস্ খবরের ঝুটাও ভাল।

পিছন হইতে আভা তাহার মাথায় চাঁটি মারিয়া বলে,—ওগো বিরহিণী, থামো থামো—নয়নের বারি অঞ্চলে মোছো। যে দীপের শিখা তোমার আদপেই জ্বলে নি—তার জন্য এত হা হুতাশ কোরো না।

লজ্জিত অরুণিমা এস্রাজ নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া বলে, আস্তে পেরেছো? তোমার জন্য পথ চেয়ে—

আভা ঠাস্ করিয়া গালে এক চড় বসাইয়া দেয়। বলে পোড়ারমুখী, মিছে কথা কইতে লজ্জা করে না।

আভা অরুণিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, এবার ঝগড়া করে এসেছি তোর কাছে জানিস্।

অরুণিমা হাসিয়া বলে, ওটা দুর্লক্ষণ, ঝগড়া যখন মিটে যাবে তখন অরু পোড়ারমুখী ঝগড়ার কারণ হয়েছিল বলে পাল্টে গাল খাবে। তারপর থাক্‌ছ কতদিন?

যতদিন ইচ্ছা।

এতটা ঔদার্য্য ভাবে কি টান সইবে ত শেষটা?

সেজন্য তোর দুশ্চিন্তা কর্ত্তে হবে না। বলিতে বলিতে দুজনে ঘরে ঢুকিল। মাঝখানে বরুণা মীনা মণ্টু ও মণ্টুর বাবা আসিয়া পড়িলেন। সকলের আনন্দ কলরবের বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল।

বৈকালিক জলযোগাদি শেষ হওয়ার পর আভা বলিল, চল্ অরু, বেড়িয়ে আসি এবার।

নিরুৎসুক কণ্ঠে অরু জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবে?

লেকে।

লেকে।

ধেৎ, লেক ত আর লেক্ নেই, ও হয়েছে সাগরের মেলা। সহর শুদ্ধ লোক ঐখানে জোটে গিয়ে, আরাম পাওয়া যায় না। তার চেয়ে বাড়ীর বাগানই ভাল।

মিছে নয় বাপু—লেকের ধারে মেয়েদের ভীড়। দুনিয়ায় দুদিন কোন জিনিষ ভাল থাক্‌বার যো নেই—যতক্ষণ না তা সবাই মিলে নষ্ট কর্ব্বে ততক্ষণ ছাড়্‌বে না।

অরু হাসিয়া বলে, তুমি ভোগ কর্ব্বে আর আমি চেয়ে দেখ্‌ব—সেকালের মুনি ঋষিরা ছাড়া মানুষের মন এরকম নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার কখন হয়েছে বলে ত শোনা যায় নি। আমার মন যদি না-ও চায়—তবু তোমার মন যে ঐ বস্তুটি চেয়েছে—তারি জন্য আমার ওটা চাইতে হবে।

আভা হাসিতে থাকে, বলে, সত্যি যা বলেছিস্।

মানুষের মন জুড়ে আছে কালো কুটিল লোভ—দুরন্ত, দুর্ব্বার, উগ্র—তাকে ঠেকাবার কোনো অস্ত্রই আজ পর্য্যন্ত কেউ গড়্‌তে পার্‌ল না।

পারে নি যে তা নয়। তবে কিনা ও হচ্ছে ছদ্ম শত্রু, সব সময় আত্মপ্রকাশ করে না, চেনাও যায় না ওকে সব সময়। কাজেই ওর বিরুদ্ধে সকলে সকল সময় অস্ত্র ধারণ বা প্রয়োগ কর্ত্তে পারে না।

ছদ্মশত্রু—একথা তুই নতুন বল্লি। আমি ত জানি ওর সঙ্গে মানুষের মল্লযুদ্ধ চলে অবিশ্রান্ত। যাক্ দার্শনিক গবেষণা থাক্, এখন, চল্ আমরা ইডেন গার্ডেনএ যাই। ওখানে তত ভিড় নেই আজকাল।

গার্ডেনে এদিক ওদিক খানিকক্ষণ ঘুরিয়া দুজনে নিভৃতে তরুতলে এক বেঞ্চে গিয়া বসিল। আভার কোলে মাথা রাখিয়া অরু পড়িল শুইয়া।

আভা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, ক্লান্ত হলি এই টুকুতেই, হয়েছে কি তোর?

তুমি বল না?

আমার বল্‌তে হবে, এম্‌নি দুরবস্থাই হয়েছে তোর? অরু হাসে। বলে, তোমার মতই শুনি আগে।

আমার মত শুন্‌বি? তোর হাসি নেই, খুসী নেই চপলতা নেই, উৎসাহ নেই, মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নেই—তোর চোখ বসে গিয়েছে, একেবারে অবসন্ন হয়ে গিয়েছিস্‌ মড়ার মত। কি এমন তুই পেয়েছিলি, আর কি এমন তুই হারালি, কিছুই বুঝ্‌লুম না।

আভার কোলে মুখ গুঁজিয়া অরু বলে, বিশেষ কিছু পেয়েছি যদি বলি,—তা যেমন ভুল হবে—পাইনি কিছু বল্লে তেমনি ভুল হবে। বিশেষ ও অবিশেষের মাঝখানে এই নির্ণয়রেখা দিন ও রাত্রির মিলন-সীমার মত। আলো মিশেছে ওখানে অন্ধকারে, অন্ধকার মিশেছে আলোতে। কোথায় কোন্‌টির আরম্ভ তা ধরা যায় না।

কথাটা ঠিক হোল না। আমি ত পরিষ্কার দেখ্‌ছি, তোর রাত্রি এখনও পোহায় নি, হয়ত তার শেষ যাম সন্নিকট, তবু ঊষা বিকাশ হতে এখনও ঢের দেরী।

হবে হয়ত তাই। মনের গহনে আজ পথ হারিয়েছি, কিছুই নির্দ্দেশ কর্ত্তে পার্‌ছিনে। আমার জানা যে জগৎ সে হয়ে গেছে অর্থহীন, পরিচয় আজ অজানার সঙ্গে।

আভা ঈষদ্ধাস্যে বলে, সে ত কবির কাম্য বস্তু রে। জানার মধ্যেই হোল জীবনের আসল স্বাদ, তারই মাঝ দিয়ে গেছে জীবনের প্রগতির পথ, যে মানুষের জানার পাঠ ফুরিয়ে গেছে। সে এসেছে নিরুৎসুকতার সেই মরু-সীমান্তে—জীবনের রসধারা যেখানে তপ্ত বালুর তাপে পাতালে লুকিয়ে গেছে।

অরু চোখ বুজিয়া থাকে, উত্তর দেয় না। আভা তার গায় হাত বুলাইয়া বলে, কেন এত ভাবিস্‌? জীবনের ছিন্নপত্র শীতের ঝরা পাতার মত বাতাসে উড়িয়ে দে। গাছ কি করে বাড়ে দেখেছিস্‌? ওপরের দিকে ওর পল্লব বিকাশ যতই হয়, নীচেকার পাতা ততই শুখিয়ে যেতে থাকে। বর্ত্তমানের ভাঙ্গা-চোরার ওপরেই ভবিষ্যের পূর্ণতর মূর্ত্তি গঠিত হয়ে ওঠে। তারপর বিষয়টার আরেকটা দিক তুই দেখ্‌ছিস্‌ না। মেজদার সঙ্গে তোর অন্য যে বিষয়েই মিল থাক, আসল বিষয়ে মিল্‌ত না। ওর স্বভাব উদ্বায়ী, ওর কোনো গুরুত্ব নেই। ও যেন দমকা হাওয়া নিমেষে উড়িয়ে নেয় সব—পরক্ষণে নিজে যায় সরে। ওর স্থিতি নেই। ফলের বাগে যে ফুলে ফল ধরে না তার আগেই ঝরে যাওয়া ভাল।

অরু চুপ করিয়া থাকে, আভা তাহাকে নাড়া দিয়া বলে, ঢের বক্তৃতা দেওয়া হোল। ওঠ্‌ এখন, চল্‌ ঐদিক্‌টায় যাই।

দুই জনেই উঠিয়া আবার হাঁটিতে থাকে। অকস্মাৎ পিছন হইতে একজন লোক টুপি খুলিয়া সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলে, বন্দেগী বিবিসাব।

অরু চমকাইয়া পিছনে হটিয়া যায়, আভা হাসিয়া ওঠে।

আভার স্বামী সহাস্যে বলে, যাকে দেখ্‌বার বিরাগে বাড়ী ছেড়ে আসা হোল, তাকে দেখার জন্যে যে আবার ঘোরা হচ্ছে! এই জন্যেই শাস্ত্রকাররা বলেছেন, স্ত্রীরচরিত্র দেবাঃ ন জানে কুতো মনুষ্যাঃ।

কপালের উপর ভ্রূ তুলিয়া আভা উত্তর দেয়, দেখ্‌ছিস্‌ ভাই, পুরুষের ভ্যানিটি কি রকম? ওঁকে দেখার জন্য আমরা এখানে এসেছি!

তবে রোজকার লেক্‌ ছেড়ে আজ এখানে কি জন্য এসেছো শুনি?

আভা অরুকে একটুখানি কাঁধে ধাক্কা দিয়া বলে, এই যে তোমাদের অরুণিমা দেবী, এঁর চিত্তবিনোদন কর্ত্তে এখানে আসা হয়েছে।

অরুর স্বামী হাসিয়া বলেন, ওঁর চিত্তপীড়ার কারণটা কি শুনতে পাই কিছু?

অরু লজ্জায় লাল হইয়া ওঠে, আভা তাহাকে বাঁচাইয়া বলে, নেও, ফাজ্‌লেমী আর কর্ত্তে হবে না।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা হাঁটিতে থাকে, অরু একটু একটু করিয়া পিছাইয়া পড়ে। আজ তাহা লক্ষ্য করিবারও অবকাশ পায় না।

অরু আসিয়া প্যাগোডার ঘাট্‌লায় বসিতেই আরেকদিকে আরেকটি ছেলের উপর দৃষ্টি পড়ে। ছেলেটি শঙ্কিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়ায়, অরু তখন পূর্ণ ভাবে তাহার মুখ দেখিতে পায়।

হাসিমুখে অরু বলে, আপনি এখন আর পালাতে পার্ব্বেন না, ধরা পড়ে গেছেন।

হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া অনুপম কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। অরু জিজ্ঞাসা করে, কোথায় ছিলেন এতদিন?

সঙ্কুচিত ভাবে অনুপম বলে, এখানে ছিলুম না!

কোথায় ছিলেন তবে?

দেশে গিয়েছিলুম পরীক্ষার পরে।

দেশে—কোথায়?

বিক্রমপুরে।

কোন্‌ গ্রামে আপনাদের বাড়ী?

শ্রীনগর।

আমাদের বাড়ী ধলগ্রাম, ওরি কাছে।

অনুপম সাগ্রহে কথাটা শুনিয়া রাখে; মুখে কিছু বলে না।

অরু জিজ্ঞাসা করে, পূজোর সময় কোথায় ছিলেন।

এখানে, আপনি ত তখন বাড়ী গিয়েছিলেন। আমি এসে ত আপনার কোনো খবরই পেলুম না!

পরীক্ষার ফল বার হোল, নাম দেখ্‌লুম শীর্ষ স্থানে। কন্‌গ্র্যাচুলেট্‌ও কর্ত্তে পাল্লুম না। বেশ লোক যাহোক্‌ আপনি!

হপ্তাখানেক হবে মাত্র আমি বাড়ী থেকে এসেছি। ওখানে খুব ব্যস্ত ছিলুম।

কিসে?

নানা কাজে।

নানা কাজটা কি শুনি? বসুন এই ঘাট্‌লায়, এখন পালাতে দেব না।

অরু ঘাটের একদিকে ও একটু দূরে অনুপম বসে। অরু বলে, ছাড়া পাচ্ছেন না, বলুন দেখি এখন, পূজোর পর বাড়ীতে কি কাজে এমন ব্যস্ত ছিলেন?

সপ্রতিভ ভাবে অনুপম বলে, আমরা এক দল গিয়েছিলাম কিছু সংস্কার কার্য্যে।

সংস্কার কার্য্যে? কিসের? কোথায়?

অরুণিমার ব্যগ্র প্রশ্নে অনুপম অধিকতর লজ্জা পায়, তবু তাহার কথার উত্তর দিতে হয়। বলে, গ্রামে।

নিজেদের গ্রামে?

জানেন ত, চ্যারিটির পত্তনই স্বগৃহে।

অরুণিমা জিজ্ঞাসা করে, কি কাজ কর্ল্লেন?

কুণ্ঠিত ভাবে অনুপম বলে, এ সময় জল চলে যায় পড়ে—নদী নালা ওঠে শুখিয়ে, লোকের পানীয় জল থাকে না। দূষিত জল খেয়ে রোগে ভোগে, মরে দলে দলে। এর কোনো প্রতিকার করা কি না তাই আমরা দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।

কি কর্ল্লেন?

পানীয় জলের পুকুর একটা মাটি তুলে পাড় উঁচু করে পৃথক্ করে দেওয়া গেল যেন বর্ষার বেনো জল তাতে না ঢোকে, এবং বাসন মাজা কাপড় কাচা স্নানাদি ওতে কেউ না করে। খানিকটা পঙ্কোদ্ধারও করা গেল। ওটা এখন বেশ বড় দীঘি হয়েছে। জলও ভাল হয়েছে। গ্রামে যে সব অচল জাত আছে, তারা যাতে ঐ পুকুরে জল নিতে পারে,—অস্পৃশ্যতা নিবারণ যাতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমরা তারো চেষ্টা কর্ব্ব।

প্রশংসমান চক্ষে চাহিয়া অরু বলে, তা হ'লে আপনারা কাজের মত কাজ কিছু করেছেন।

অনুপম হাসিয়া বলে, তা এখনো ঠিক বল্‌তে পারিনে। সাময়িক উৎসাহের ফলও সাময়িক হয়ে থাকে। পল্লীর সঙ্গে নগরের নাড়ীর যোগ যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তবে পল্লীমঙ্গল জল্পনা মাত্র সার হবে। আমরা যা করে এসেছি—তা রক্ষা কর্ব্বার দিকে যদি আমরা দৃষ্টি না রাখি, ওখানে আর না যাই, ওর ভালমন্দ হিতাহিতের ভাবনা না ভাবি—তবে ও দীঘি বালুর গর্ত্তের মত একদিন বুজে যাবে। আমাদের সংগ্রাম কর্ত্তে হবে পল্লীর বুকে প্রতিষ্ঠিত অজ্ঞতার সঙ্গে, জড়তার সঙ্গে, কুঁড়েমির সঙ্গে, কুসংস্কারের সঙ্গে, কুশিক্ষার সঙ্গে,—সে সংগ্রাম সহজ নয় এবং একার দ্বারাও সাধ্য নয়। আমরা যদি হারি, আমাদের জায়গা নিয়ে আরেক দলকে ওখানে দৃঢ়তর হয়ে দাঁড়াতে হবে। তবে জয়ের পথ সুগম হবে।

অরু চুপ করিয়া কথা শোনে, তাহার মনের ভিতর জোয়ারের জল ছল ছল করিতে থাকে।

তাহার অদেখা এই অগণিত অভাব-অনশন-দারিদ্র্য-ব্যাধি-ক্লেশ-ক্লিষ্ট লোকগুলির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যহীন দুর্গতিময় জীবন-যাত্রার চিত্র তাহার চক্ষের কাছে ভাসিয়া ওঠে। পরিবেদনাময় এক গভীর সহানুভূতি তাহার মনের কানায় কানায় ভরিয়া ওঠে। ঘুরিয়া ফিরিয়া সে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে, এই সংগ্রামে কি সে-ও যোগ দিতে পারে না? এই সুকঠিন জয়-যাত্রার পথে সে-ও কি সহগামী হইতে পারে না? হাসিয়া সে বলে, যুদ্ধে সেনা জুটাবার অভাব হয় না—আসল অভাব সেনাপতিত্বের। নেতৃত্ব যদি করেন তবে তলোয়ার্ পাবেনই। কাঠে কাঠে আগুন—কিন্তু তা নিজে জ্বলে না, তাকে জ্বালিয়ে তুল্‌তে হয়।

অনুপম অরুর আবেগ-দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসে মাত্র। তাহার মনে অপূর্ব্ব এক মাধুর্য্যের ছায়া মায়া বিস্তার করিতে থাকে; তাহার নিষ্কিঞ্চন আশার ম্লানিমার উপরে পড়ে ক্ষণিকের এক স্বর্ণাঞ্চিক আলোক-বিভাতি।

অনুপমের মনে হয়, এক তরণীতে ক্ষেপণী বাহিয়া অরুণ জ্যোতিস্বরূপিনী অরুণিমার সঙ্গে সে অনন্ত পারাবারবক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে। তরঙ্গে জাগিয়াছে উতরোল, ওপারে দিগন্ত গিয়াছে সাগর সীমন্তে মিশিয়া। গগনে মেঘের গুরু গরজনি, বাতাসে জলের কল কোলাহল। দুটি প্রাণী তাহারা—বহিয়া চলিয়াছে কোন্ এক অজ্ঞাত অদৃশ্য কূলের অভিমুখে—

অরুর কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গে। অরু জিজ্ঞাসা করে, তার পর, এখন কি কর্ব্বেন?

অপ্রতিভ ভাবে অনুপম বলে, জানিনে ঠিক্, বাবা যা বলেন।

আপনার নিজের কিছু ঠিক করা নেই?

ইতস্ততঃ করিয়া অনুপম বলে, না।

কোনো উচ্চ আশা নেই?

পরিষ্কার একটা কিছু নেই। আরম্ভ কর্ব্বার জায়গাটা শুধু দেখতে পাই, পৌঁছ্‌ব যেখানে, সেখানটা কোয়াশায় ঢাকা—হয়ত ওখানে একটা তটভূমি আছে—নয়ত গভীর গহ্বর!

অরুণিমা অনুপমের মুখের উপর চোখ রাখিয়া বলে, আপনার কথাগুলি কি রকম নৈরাশ্য-মাখা! আমি কিন্তু আপনাকে খুব সোজা একটা রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারি, আপনি রিসার্চ্চে ঢুকে পড়ুন। কৃতিত্ব দেখাতে পার্লে স্টেট্ স্কলারশিপ নিয়ে বিলাতে শিক্ষা সমাপ্ত করে আস্‌তে পার্ব্বেন। যে পথের প্রান্ত কোয়াশায় ঢাকা—যা অজ্ঞাত—যা অন্ধকারাচ্ছন্ন—সে পথে মিছিমিছি ঘুরে মর্ব্বেন কেন? আপনার যোগ্যতা আছে—আপনি নিশ্চয় সফল হবেন।

আপনার কথাগুলি আমি ভেবে দেখ্‌ব।

বিস্তর সময় রয়েছে—যতদিন হয় বসে ভাবুন, ক্ষতি নেই। ভাল, আমাদের ওখানে যাবেন।

অনুপম আবার ইতস্ততঃ করিতে থাকে। অরু হাসিয়া বলে, বিকালে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। না যদি যান, তাহ'লে—

তাহ'লে কি ?

আপনার সঙ্গে আড়ি।

অনুপম হাসে। অরু উঠিয়া বলে, আভাকে খুঁজে নি গিয়ে, ওরা ভুলে গেছে যে আমি সঙ্গে আছি। নমস্কার, আস্‌বেন কিন্তু।

অরু চলিয়া যায়, অনুপম শূন্য পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। নিশীথের তিমিরাচ্ছন্ন ওর মনের দিগন্তে ঊষা যেন এক নিমেষের দেখা দিয়া যায়, তাহার চরণপাতে প্রপর্ণ হৃদিমালঞ্চ তাহার নব মুকুল-মঞ্জীরে ভরিয়া ওঠে মৌন চিন্তাকাশ ভরিয়া আশার রাজে।

(ক্রমশঃ)

তোমার আসার আশা করিয়াছি বহু জন্মজন্মান্তর ধরি

শ্রীহাসিরাশি দেবী

হে শুভক্ষণ,
বহু সাধ-সাধনার ধন
দাঁড়াও হে আর একবার ; তারপরে
যেও চলি চিরদিন তরে।
বহু দিন রাতি
জাগিয়া, রেখেছি যেই বাতি
আঁধার পাথার তলে যতনে জ্বালিয়া,
নিভায়ে তাহারে তুমি আরও ঘন আঁধার ঢালিয়া
যেও না—যেও না চলি এত ত্বরা করি ;
আজিও যায়নি ঝরি
কাননের গোলাপ আমার—
এখনও রাত্রির বুকে তারকার হার নিদ্রাহীন
নিষ্পলকে মুখপানে রহিয়াছে চাহি—
দক্ষিণের বায় যায় গাহি

তোমার বিজয় বার্ত্তা ; অতিথি আমার
বুঝি কোন সুখময় তিথি
দেখা দিল খুলিয়া দুয়ার।

হে শুভক্ষণ,
আমার সকল দেহ মন
প্রতিদিন প্রতিমাস প্রতি বর্ষ ধরি
গণিয়াছে মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত করি
তব আগমন কাল,—দ্বারে তার পাতিয়া বোধন
ঘট—দিয়া আলিম্পন।
তব আগমন লাগি বরণের ডালা লয়ে করে,—
অতন্দ্র নয়নে জাগি' দ্বার পাশে প্রহরে প্রহরে,
নীরব নূপুর মোর গুঞ্জরিয়া উঠিবারে চায়—
বাতাস নিখিলে মোর আনন্দের বারতা ছড়ায়।
তারি মনে—তুমি বুঝি এলে!
গোপনে চরণ দুটি ফেলে
পথ শেষে মোর দ্বারে গেলে বুঝি থামি'!
এলে বুঝি—স্বপন শিখর হ'তে নামি!
চমকিয়া আসিয়াছি কুটীরের বাহির হইয়া,
আমার সঞ্চিত ধন যতনে বহিয়া
দিতে তব চরণের তলে
যেও না—যেও না তারে দ'লে
এত ত্বরা করি'—
তোমার আসার আশা করিয়াছি বহুজন্ম-জন্মান্তর ধরি'—
সাধনার ধন,—
হে শুভক্ষণ!

গৌরের বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী

সংবাদ-পত্রে যে আইন লইয়া যে ভাবে যতটুকু আলোচনা হয়, তাহা ভিন্ন আইন সভায় কোন্ বিল কি আকারে উপস্থাপিত হয় সে সম্বন্ধে সেখানে আলোচনাই বা কি ভাবে চলিয়া থাকে (সম্প্রতি তো তাহা কাগজে প্রকাশ করা আইনতঃ এক রকম বন্ধই করাও হইয়াছে) সাধারণের তাহা জানিবার সুযোগ কমই ঘটে। সুখের বিষয় মেয়েদের সংশ্লিষ্ট সামাজিক বিলগুলির বিবরণ "শ্রীধর্ম্ম" পত্র প্রায়ই প্রকাশ করিয়া থাকেন ("জয়শ্রী"কেও আমরা ইহার জন্য আহ্বান করিতেছি)। এই মাসের (ডিসেম্বর) সংখ্যায় গৌর মহাশয়ের হিন্দু-বিবাহ-বিচ্ছেদ বিলের বিবরণ ও আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বিলটী বহুদিন হইতেই মধ্যে মধ্যে আইন সভায় উপস্থিত হইতেছে। গত সেশনে ইহার প্রস্তাবনা-কালে যুক্তি-তর্কে পরাস্ত করা মুস্কিল দেখিয়া সভ্যেরা কিভাবে ঐ সময় পলাইয়া, গা-ঢাকা দিয়া উহা পণ্ড করিয়াছিলেন কাগজে তাহার বিবরণ আশা করি সকলেরই মনে আছে। এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু দেখিয়া থাকিলেও ইহার বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্মের ত্রাণের জন্য আহ্বান করিয়া একখানি পত্র 'Liberty'তে দেখিতে পাইয়া বিষয়টী আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তারপর এবারকার 'শ্রীধর্ম্মে' উহার বিশদ বিবরণ পাওয়া গেল। কিন্তু বিলটী কিভাবে উপস্থাপিত হওয়ায় উহার লক্ষ্য ও যুক্তি সম্বন্ধে আপত্তি করা হইয়াছে তাহা উহাতেও ঠিক জানা না যাওয়ায় ইণ্ডিয়া গেজেটের যে সংখ্যায় উহা মুদ্রিত হইয়াছিল আনাইয়া দেখা গেল। তাহাতে 'শ্রীধর্ম্মের' অভিমত যে খুবই সমীচীন ও সমর্থনযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। বাস্তবিক বিলটীর দ্বারা অভাব এতই সামান্য দূর হইবার সম্ভাবনা এবং উদ্দেশ্য ও যুক্তি যাহা দেওয়া হইয়াছে এতই আপত্তিজনক যে অনর্থক বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করিয়া উহা পাশ করা অনাবশ্যক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু হিন্দু-বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের যখন যথেষ্টই প্রয়োজন আছে, আর বিলটী যতই অসম্পূর্ণ ও আপত্তিকর হউক সে বিষয়ে প্রথম চেষ্টা, তখন সে সম্বন্ধে আলোচনা এবং মেয়েদের মত সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা খুবই দরকার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ সব দিক দিয়া ঠিকমত দেখান বোঝান না হইলে মেয়েদের সাধারণতঃ এবিষয়ে সহজেই বিরোধীদের কবলে পড়িয়া যাইতে ও এতদিনের সংস্কারবশে আতঙ্কগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। সেইজন্য প্রায় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে 'বাংলার বাণী'তে বিলটীর প্রথম উত্থাপনাকালে যে আলোচনা করিয়াছিলাম তাহা হইতে এখানে উদ্ধৃত হইল। তখন বিলটীর নিজস্ব মূর্ত্তিটা চোখে না পরায় উহার উদ্দেশ্য ও যুক্তির আপত্তিকরত্ব বিষয়ে অবশ্য জানা ছিল না। পরে 'শ্রীধর্ম্মে'র একটী প্রবন্ধের অনুবাদের সহিত মুল বিলটীর অনুবাদও দেওয়ার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু উহা এতই অশ্লীল যে অবিকল সব অনুবাদ দেওয়া সম্ভব হইবে না বলিয়াই

বোধ হয়। ইতিমধ্যে উক্ত গেজেটখানি (Gazette of India, Jan. 30, 1932 page 64) সকলের দেখিতে চেষ্টা করা প্রার্থনীয়।

"শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দার বাল্যবিবাহ নিবারণ ও গৌরের সম্মতি আইন সম্বন্ধে দেশে কিছু আন্দোলন, আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। মেয়েদের সভাসমিতিগুলিও একবাক্যে উহার সমর্থন করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত গৌর বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে যে আর একটী বিল উপস্থাপিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বড় দেখা যায় না। মেয়েরাও এবিষয়ে আপনাদের মত তেমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। কিছুদিন হইল এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পরও এপর্য্যন্ত কাহারও ইহাতে দৃষ্টি পড়িতে না দেখিয়া আবার নূতন করিয়া বলিতে বাধ্য হইতে হইল।

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আইন হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইলেও উহা আপনিই কমিতে বাধ্য, আর ইচ্ছা করিলে কাহারই আপনার পুত্র কন্যার বিবাহ প্রাপ্ত বয়সে দিবার কোন বাধা নাই। বিধবা বিবাহও যতই অপ্রচলিত হউক, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের জীবনোৎসর্গে তাহার আইনতঃ বাধা দূর হইয়াছে। সাহস থাকিলে যে কেহই তাহা দিতে বা করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু বিবাহে মেয়েদের বিবাহ-ভঙ্গের কোনই ব্যবস্থা না থাকায় সধবা নামের মেয়েদের অবস্থাই শুধু একেবারে সম্পূর্ণ নিরুপায়। কারণ হিন্দুবিবাহের অচ্ছেদ্যতা, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা যতই হউক, পুরুষদের উহাতে পাশ্চাত্য ডাইভোর্সের সকল সুবিধাই আছে, অধিকন্তু তাহার কোনই দায়িত্ব বা হ্যাঙ্গাম পোহাইতে হয় না। কিন্তু একপক্ষে মেয়েদের এই নিরুপায়াবস্থায় প্রতীকার্য্য দুর্নীতি, অন্যায় ও দুঃখ যে সমাজে কত বাড়াইয়া চলিয়াছে তাহা বলিবার নয়। ইহার সহিত পুরুষের বহু বিবাহ-প্রথা যুক্ত হইয়া মেয়েদের মূল্য ও মর্য্যাদা যে ভাবে কমাইয়া রাখিয়াছে, তাহাতে মেয়েদের প্রতি অত্যাচার, অনাচারের সংবাদে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তাই শ্বশুর বাড়ীতে বা স্বামীর কাছে যতই লাঞ্ছনা ঘটুক স্বামী পাছে আবার বিবাহ করিয়া বসে, এই ভয়ে পিতামাতার অবস্থা ভাল হইলেও তাঁহারা মেয়েকে সেই খানেই পাঠাইতে বাধ্য হন। ইহার উপর আবার আইনতঃও স্বামী জোর করিয়া লইয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ের কিছু প্রতিকারের জন্য নারী ও সমাজহিতে অক্লান্তকর্ম্মী গৌর মহাশয়ের একটী বিলের কথা কয়েক বৎসর আগে কাগজে সামান্য দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তাহার চরম গতি যে কি হইয়াছে তাহা কোথাও ভালরূপে চোখে পড়ে নাই। এদিকে স্বামী যতই দুশ্চরিত্র হউক, অত্যাচার করুক, অথবা নিরুদ্দেশ হইয়াই যা'ক, স্ত্রীর কোনই উপায়, প্রতীকার নাই। এ রকম অন্যায় বিষম সামাজিক পাপ। কিন্তু ইহাকেও আমরা ধর্ম্ম বলিয়া সদর্পেই প্রচার করিয়া থাকি। অভ্যাস ও সংস্কারের প্রভাব সব স্থলেই মানুষকে অন্ধ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু এত প্রত্যক্ষ অপচারগুলিতে অন্ততঃ বড়াই না করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

এবিষয়ে গৌর মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিলটীকেও কিন্তু বড়ই অসম্পূর্ণ বোধ হয়। কারণ স্বামীর কুষ্ঠাদি স্থায়ী ক্ষতরোগ, বিশেষরূপ শারীরিক অক্ষমতা এবং একান্ত বুদ্ধিহীনতার স্থলেই মাত্র হিন্দুনারীর বিবাহচ্ছেদের অধিকার উহাতে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বশিষ্ট ও নারদের অনুমোদনের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। কিন্তু ইহাপেক্ষা পূর্ণতর বিদ্যাসাগরোদ্ধৃত পরাশরবচনটী কেন গ্রহণ করেন নাই বোঝা গেল না। কারণ 'নষ্টে, মৃতে, প্রব্রজিতে, ক্লীবে চ পতিতে পতৌ'—ইহাতে বিধবাবিবাহও যেমন সমর্থিত হয়, তেমনি অপর চারটী ক্ষেত্রেও ইহার অধিকার দেখা যায়। আর গৌর যে তিনটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাপেক্ষাও উহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। স্বামীর অসচ্চরিত্রতা এবং পরিত্যাগের জন্যই অনেকে নিরুপায় ভাবে একান্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। নূতন বিলে তাঁহারা কোনই প্রতীকার পাইবেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ব্যাখ্যামত "স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র বিহিত"—ইহা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার কিছু প্রতীকার সম্ভব। কারণ "পতিত" অর্থেই বিবাহ-ধর্ম্ম হইতে পতিত অর্থাৎ অসচ্চরিত্র বলা যায়। যে ক্ষেত্রে এই জন্যই প্রধানতঃ স্বামী রোগগ্রস্ত বা বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তাহার প্রতিবিধানও উহাতেই পাওয়া যাইবে। গৌরের উল্লিখিত অক্ষমতাও 'ক্লীবে' শব্দেই বুঝাইতেছে। স্বতন্ত্ররূপে কুষ্ঠের বিষয়ই কেবল উহাতে নাই। কিন্তু সেরূপ জন্মাবধি নির্বুদ্ধিতা বা কুষ্ঠ থাকিলে বিবাহের সময়ই জানিতে পারার সম্ভাবনা। পরে ঘটিলে চরিত্রভ্রংশের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে তাহার উপায় উক্ত শ্লোকাধিকারেই রহিয়াছে। সচ্চরিত্র স্বামীরও কুষ্ঠ বা বুদ্ধিভ্রষ্টতা ঘটিলেই শুধু তাহার প্রতীকার উহাতে নাই। এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। তাহাপেক্ষা স্বামীর ব্যভিচার ও পরিত্যাগই অনেক বেশী ঘটিয়া থাকে। সুতরাং তাহার উপায়ই বিশেষ আবশ্যক। তারপর সদ্ব্যক্তি কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত হইলেও অতি অল্পসংখ্যক পত্নীই তাঁহাকে ত্যাগ করিতে চাহিবেন। তাহা কি উচিতও? আর আপত্তিও উহাতে নিশ্চয়ই বেশী হইবে। আকস্মিক বিপদ বা যে অবস্থায় মানুষের হাত নাই, তাহাপেক্ষা ইচ্ছাকৃত অপমানই দুঃসহতর এবং তাহার প্রতীকারই বেশী আবশ্যক। অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে স্বামীর পুনর্ব্বিবাহ অত্যাচার কিংবা অনুদ্দিষ্ট না হইয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগের স্থলেই ইহাতেও উপায় নাই, এগুলিকে অবশ্য 'বিবাহ ধর্ম্ম হইতে পতিত' বলিয়া ধরা না যায় এমন নয়। তবে অসচ্চরিত্রতা, অনুদ্দেশ ও সংসার পরিত্যাগের স্থলে প্রতিবিধান থাকিলে পরিত্যাগের ক্ষেত্র কতকটা সঙ্কীর্ণ হইবে। স্বামীর পুনর্ব্বিবাহের স্থলে রক্ষার জন্য একাধিক বিবাহ নিষেধ বিষয়ে স্বতন্ত্র আইন হওয়া প্রয়োজন। তাহার পর দুই পক্ষেই বিবাহচ্ছেদের বিশেষ স্থল ঠিকমত নির্দ্দিষ্ট হইয়া আইনের নির্দ্দেশানুসারেই মাত্র পুনর্ব্বিবাহের অধিকার থাকা সঙ্গত হইবে। এত বিষয়ে হীন পাশ্চাত্যানুকরণের স্রোত বহিতেছে আর সভ্যজাতির পক্ষে একান্তই আবশ্যক, ন্যায্য ও মানবহিতৈষী-মূলক এই সকল বিধানেই হিন্দুধর্ম্ম বা জাতীয়তা ধ্বংসলাভ করিবে?

যে কোন সংস্কারের নামেই হিন্দুধর্ম্ম লোপের আর্ত্তনাদও উঠিয়াই থাকে, তাহা আর তেমন কার্য্যকর না হওয়ায় এখন জাতীয়তা বা ভারতীয়তার নামও যুক্ত হইতেছে। কিন্তু এই সব সংস্কার-প্রচেষ্টা কি হিন্দুত্ব বা ভারতীয়ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বশতঃই করা হয় না? ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে বা জাতীয়তা ত্যাগ করিলে ত সব গোলই মিটিতে পারে। হিন্দুই থাকিতে চান এবং হিন্দুসমাজ ও ভারতীয়তারই উন্নতি চাহেন বলিয়াই ত সংস্কারকামীদের এত প্রয়াস। হিন্দুধর্ম্ম, সমাজের নানা সংস্কার-চেষ্টা বহুকাল হইতেই চলিয়াও সফল না হওয়ায় উহা এদেশের উপযোগী নয় একথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু বরাবর ঐ চেষ্টাতেই কি উহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয় না? তাহা তেমন সফল না হওয়ার একটা কারণ বরাবরই ঐ রকম সংস্কারে নূতন সম্প্রদায়ের মাত্র উদ্ভব হইয়াছে। সেইজন্য তাহা সমগ্র সমাজে, দেশে ব্যাপ্ত হইবার সুযোগ না পাইয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ হইয়া বৃহৎ সমাজের ধাক্কায় ক্রমে আপনাদের সব বিশেষত্বই প্রায় হারাইয়া প্রাণহীন, দূষিত কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য এখন সব সংস্কারই সমগ্র দেশ ও সমাজের জন্যই করিতে হইবে। নতুবা তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় না। এই একত্বের বন্ধনে জাতীয়তাও যেমন সত্য হইয়া উঠিতে পারে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও কমবেশী বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকিলে তাহার আশা বৃথা।

হিন্দু সমাজের কতকগুলি কুপ্রথার সহিত পাশ্চাত্য সংস্রবে নূতন নূতন আপদ আসিয়া মেয়েদের অবস্থার আরো যে রকম দুর্দ্দশা ঘটাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এই সকল সংস্কার তাহাতে আরো বিশেষরূপেই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "হোলকার মিলার বিবাহের" উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঘরে মামুলি স্ত্রী রাখিয়া এই রকম নব্য 'বিবাহ' এখন ফ্যাসানেই প্রায় দাঁড়াইয়া মেয়েদের সত্য অবস্থা বেশী প্রত্যক্ষ হইতেছে। যাহা হউক বহুবিবাহ নিবারণ যখন স্বতন্ত্র আইনের কথা, তখন আপাততঃ এই বিবাহচ্ছেদের আইনটাই যাহাতে অন্ততঃ শাস্ত্রোক্ত ভাবেই আর একটু পূর্ণতর ভাবে বিধিবদ্ধ হইতে পারে, তাহার জন্য আন্দোলন আবশ্যক। মেয়েদেরও ইহাতে চেষ্টা চাই। বাল্যবিবাহ ও সম্মতিআইন সম্বন্ধে যেমন তাঁহারা আপনাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবিষয়েও তাঁহাদের সেইরকম একাগ্রতা প্রার্থনায়। বিশেষতঃ ইহাতে বিরুদ্ধতার সম্ভাবনা যেমন আরোই বেশী, তেমনি সমর্থনের সহিত ইহার অসম্পূর্ণতাও দেখান দরকার। অনেক সুবিধা, ক্ষমতা, অনুকূল লোকমত এবং অনেক বেশী লোকের আগ্রহ সত্ত্বেও কোন বিল আপনাদের মনোমত ভাবে পাশ করাইবার জন্য পুরুষদেরও কত লোকের কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয়, কৌশল করিতে হয় তাহা দেখিয়াই মেয়েদের শিক্ষা হইতে পারে। যিনি যতটুকু পারেন সকলে মিলিয়া প্রাণপণ চেষ্টা ব্যতীত তাঁহারা আপনাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। পরিবর্ত্তন যাহা হইবে তাহাও তাঁহাদের অনুকূল না হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

"ভাঙ্গা মন আর জোড়া নাহি যায়—"

শ্রীপুষ্পলতা দে

মৃত্যুশয্যাশায়িতা জননী ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি ত আর বাঁচ্‌ব না; কিন্তু তোর বিয়েটা যদি দেখে যেতে পার্‌তাম—"

কন্যা বাধা দিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"কেন মা, ও কথা বল্‌ছ?"

"ইচ্ছে করে ত বলিনি পুষ্প, সত্যিই যে আমায় যেতে হবে। তোর বাপ আছে, তোকে বুকে করে রাখ্‌বেন, কোন কষ্ট হবে না জানি, কিন্তু তিনি তোর বিয়ে দিতে পার্‌বেন না ত! পুষ্পল্, একটা কথা বল্‌ব মা?"

"কি কথা মা?"

"তুই প্রেমাংশুকে বিয়ে কর্; সে জমীদারের ছেলে বলে বল্‌ছি না মা। তার বাইরেটা যেমন সুন্দর, ভেতরটা যে তার চেয়েও সুন্দর এ কথা আমার কখন অবিশ্বাস করিস্ না পুষ্প। জানি না তোর সে ভাগ্য হবে কি না, তবে আমি জানি সে তোকে ভালবাসে,—ওকি, মার কাছে লজ্জা কি রে?"

পুষ্পলা যখন মামার বাড়ী গিয়াছিল, তখন মামার বন্ধু প্রেমাংশুকে সে দেখে। সত্য বলিতে কি, সেই সুন্দর কমনীয়-কান্তি তরুণটীকে তাহার মন্দ লাগে নাই এবং সে যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট তাহাও জানিয়াছিল। তাই জননীর কথায় পুষ্পলা লজ্জারক্ত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

জননী পুনরায় বলিলেন—"তোর অমতে তোর আমি বিয়ে দিতে চাই না বলেই জিজ্ঞেস্ কচ্ছি; বল মা? অমতে বিয়ে দিচ্ছি না এই জন্যে, তাহলে চিরজীবনই তোরা দুজনে অশান্তি ভোগ কর্‌বি। পুষ্প—"

এইবার পুষ্পলা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে—"কেন বারবার ও কথা বল্‌ছ মা, আমার অমত নেই" বলিয়াই দ্রুতপদে কক্ষ হইতে পলায়ন করিল।

সুপ্রশস্ত, সুদৃশ্য, পুষ্পময় উদ্যানে বসিয়া তরুণী পুষ্পলা সেই কথাই চিন্তা করিতেছিল। তাহার সু-উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণের উপর মানসিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম ছায়া পড়িয়াছে; ললাট কুঞ্চিত। চক্ষুতে শূন্যদৃষ্টি।

আজ দীর্ঘ সাতবৎসর তাহার বিবাহ হইয়াছে। মৃত্যুমুখী জননীর অনুরোধে প্রেমাংশুর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তখন সমস্ত বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই বলিয়াই সে আপত্তি করে নাই। ভাবিতে পারে নাই সুরূপ, শিক্ষিত ধনী প্রেমাংশুর অকৃত্রিম প্রাণঢালা ভালবাসার

সে অপমান করিতে পারিবে? বস্তুতঃ তখন সে কিছুই ভাবে নাই, জননীর শেষ ইচ্ছাই তাহার নিকট সবচেয়ে বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। আজ জননীর অন্তিম বাক্য তাহার মনে পড়িল—"...মনে রাখিস্ পুষ্প, তাকে তুই এতটুকু অসুখী কর্‌বি না কোন অবস্থাতেই; তোর কষ্ট যত বড়ই হোক্, তাকে কোনদিন কষ্ট দিবি না। অতবড় প্রাণটা যদি তোর অবহেলায় নষ্ট হয়, ভগবান তোকে কখন ক্ষমা করবেন না। আমার শেষ আশীর্ব্বাদ তার মর্য্যাদা যেন তুই বুঝিস্..."

পুষ্পলা শিহরিয়া উঠিল। জননীর প্রত্যেক বাক্যেরই যে সে বিরুদ্ধাচারণ করিতেছে। কোনদিনই ত সে স্বামীকে সুখী করিতে চেষ্টা করে না। যে প্রেমাংশু তাহার এতটুকু কষ্ট বা অসুবিধা দেখিলে অস্থির হইয়া পড়ে, সেই অসীম স্নেহময় স্বামীর ভালবাসাকে সে কিরূপ নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়! কিন্তু সে ত এরূপ ছিল না। কে যে তার হৃদয় জুড়িয়া স্বামীর পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ত আজ তাহার অগোচর নাই। সেই ত স্বামীর বিরুদ্ধে তাহার মনটা এমন তিক্ত করিয়া দিয়াছে...

"পুষ্পল্—"

পুষ্পলা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল—ঠিক তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া প্রলয়েশ!

"একলা অন্ধকারে বসে আছ কেন পলা?"

"যার জীবনে এতটুকু আলোর রেখা নেই, যা ব্যর্থতায় অন্ধকার, সে কি আলো সহ্য কর্‌তে পারে?"

প্রলয়েশ পুষ্পলার অত্যন্ত নিকটে বসিয়া পড়িয়া, তাহার হাতদুটী ধরিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—"কি কর্‌লে তোমার ব্যর্থতা এতটুকু কমাতে পারি, বল পুষ্পল্?"

"বলেছি ত আমার জীবনে আর কিছুই কর্‌বার নেই। আমি যে নিজে হাতে সাধ করে এ বিষ খেয়েছি, নইলে সাম্‌নেই ত আমার অমৃত ছিল। যাক্ গে, কিন্তু তুমি যদি বিয়ে কর—"

"পলা!"

"কেন?"

"তোমায় কি করে বোঝাব পুষ্পা, তোমায় দুঃখ দিয়ে এ কাজ আমি কিছুতেই পার্‌ব না।"

"আমি দুঃখ পাব? এতবড় ভুল তুমি কর্‌ছ কেন?"

"ভুল? হয় ত ভুলই। কিন্তু পুষ্পল্, আমি বিয়ে কর্‌লে তুমি ঠিক এই কথাই বল্‌তে পার্‌বে না। সত্য নয় কি?

পুষ্পলা উত্তর দিল না, কারণ সে ভাল করিয়াই জানিত প্রলয়েশের কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য।

হঠাৎ তাহারা প্রেমাংশুর উচ্চকণ্ঠ শুনিতে পাইল—"তোর মা কোথা, দেখ ত স্মিতা!"

প্রলয়েশ ত্রস্তে পুষ্পালার নিকট হইতে অনেকটা দূরে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরেই প্রেমাংশু কন্যার সহিত বাগানে আসিল।

সুগঠিত, দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পরিশ্রমে ঈষদারক্ত, লাবণ্যভরা মুখে একটুখানি মিস্ট হাসি; তাহাতে সৌন্দর্য্য যেন আর বাড়িয়া গিয়াছে।

"অন্ধকারে একা বসে কেন পুষ্পা, বেড়াইতে যাওনি? আরে প্রলয়েশ যে, কখন এলি?"

প্রলয়েশ দ্রুত বলিয়া উঠিল—"এলাম্ বৌদিকে বল্‌ছি ঘরে যেতে, উনি কিছুতে যেতে চাইছেন না..."

"তা থাকুক না। তুমি ত রয়েছ, তবে আর কি? আমি ভাব্‌ছিলাম একলা বুঝি? তারপর পুষ্পালার দিকে ফিরিয়া বলিল—"কল্লোল আর মিলনিকাকে নেমন্তন্ন করে এলাম, বুঝ্‌লে? কাল সন্ধ্যায় আস্‌বে।"

পুষ্পালা গম্ভীরভাবে বলিল—"ভাল।"

প্রলয়েশ বলিল—"মিলনিকাটী বোধ হয় বৌদির সেই dearest friend, না ছোট্‌দা?"

"হ্যাঁ। সত্যি মেয়েটী চমৎকার; যেমন শিক্ষিতা, তেমনি সরল, অথচ ভদ্র, আবার তেমনি jolly ওরা দুটিতে বেশ আছে।" প্রেমাংশু কাহার ও নিকট হইতে উৎসাহ না পাইয়া চুপ করিল।

তারপর এক মুহূর্ত্ত দুজনকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"আচ্ছা তোমরা গল্প কর, আমি চান করে আসি। Tennis খেলে যা ঘেমে গেছি; জানিস্ প্রলয়, আচ্ছা মজা করেছি আজ......থাক সে পরে বল্‌ব—"বলিয়া তাদের দুজনের নীরবতাকে পূরণ করিতেই বোধ হয় নিজে হাসিতে হাসিতে ভিতরে চলিয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য, ভিতরে আসিয়াই তাহার এতক্ষণের ধারকরা হাসি মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রেমাংশু স্নানকক্ষে প্রবেশ করিল।

স্নান করিয়া সে যখন বাহিরে আসিল তখন তার মুখখানা বড় ম্লান ও চিন্তাক্লিস্ট। সে চিন্তাজালে জড়াইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ কাপড়ে টান পড়িতেই মুখ নীচু করিয়া দেখিল তাহার কাপড় ধরিয়া শুচিস্মিতা উৎসুক চক্ষে চাহিয়া আছে। সস্নেহে কন্যাকে ক্রোড়ে তুলিয়া চুম্বন করিয়া প্রেমাংশু বলিল—"কি মা?"

"কিছু না বাবা। তোমার অসুখ করেছে? মুখখানা অমন কেন?"

প্রেমাংশুর মুখে বেদনার চিহ্ন দেখা গেল। এতটুকু বালিকাও তাহার ব্যথা বুঝে, কেবল পাষাণী প্পাই......না, পুনা সে কি ভাবিতেছে। কিন্তু সত্য, এই একান্ত অনুগতা স্নেহময়ী কন্যা নহিলে গৃহে তাহার শান্তি নাই। প্রেমাংশু জোর করিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল—"কই কিছু না ত স্মিতা! তোর মা কই রে?"

"কাকার সঙ্গে বাগানে। চল না বাবা আমার সঙ্গে ক্যারাম খেল্‌বে।"

চল—বলিয়া প্রেমাংশু কন্যার সহিত খেলিতে গেল। কিছুক্ষণ খেলিয়া প্রেমাংশু যখন নিজ পাঠকক্ষে প্রবেশ করিল, তখনও পুষ্পলা বাগানে।

প্রেমাংশু পড়িতে বসিল বটে, কিন্তু কিছুই পড়িতে পারিল না। হাতের উপর মাথা রাখিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। কতক্ষণ যে সে এইভাবে বসিয়া থাকিত বলা যায় না, অকস্মাৎ টপ্‌ করিয়া একফোঁটা জল কোলের উপর পড়িতেই সে চকিত হইয়া মুখ তুলিল। লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি দেখিয়া লইল কক্ষে কেহ আছে কিনা। ঘড়িতে দেখিল—১০টা বাজিয়া পাঁচ মিনিট।

প্রেমাংশু বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—পুষ্পলা এইমাত্র বাগান হইতে আসিয়া উপরে গিয়াছে।

প্রেমাংশু অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কখন যে সে পুষ্পলার কক্ষের সম্মুখে আসিয়াছে তাহা জানিতেও পারে নাই।

পুষ্পলা অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। প্রেমাংশু নিঃশব্দে তাহার পিছনে আসিয়া ধীরে ডাকিল—"পুষ্পল্‌—"

পুষ্পলা চম্‌কিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তুমি? এখানে কেন?"

প্রেমাংশু বেদনা পাইল কতখানি তাহা অন্তর্য্যামী ছাড়া কেহ জানিল না। কিন্তু সে ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল—"এখানে আস্‌বার অধিকার কি আমার নেই? কিন্তু বল তো পুষ্প, কি আমার অপরাধ যার জন্যে তুমি আমায় এত উপেক্ষা এত ঘৃণা কর?"

স্বামীর কণ্ঠে বেদনার আভাস পাইয়া পুষ্পলার মনটা আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িতেই মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল। জ্বালাভরা কণ্ঠে বলিল—"ঘৃণার যোগ্য হলেই মানুষ ঘৃণা করে।" পুষ্পলা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তার কিছুক্ষণ পরেই পুষ্পলা দেখিল—প্রেমাংশু নিজে গাড়ী চালাইয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রেমাংশু যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সকলে নিদ্রামগ্ন, সে কাপড় ছাড়িয়া একেবারে উপরে উঠিয়া গেল। আহারের প্রবৃত্তি আজ তাহার একেবারেই ছিল না।

শয়ন কক্ষে আসিয়া দেখিল—স্মিতা তাহার শয্যায় নিদ্রিতা, সে পিতার নিকট শুইত। কক্ষের অপর পার্শ্বে শিশুকন্যাকে লইয়া পৃথক শয্যায় পুষ্পলা সুষুপ্তা। প্রেমাংশু একবার সব দেখিয়া লইয়া স্মিতাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল।

(২)

পরদিন প্রভাতে চা খাইতে খাইতে পুষ্পলা বলিল 'কাল কত রাত্তিরে ফেরা হয়েছিল? কোথা গিছ্‌লে?'

পুষ্পলা নিম্নকণ্ঠে কথা বলিলেও তাহার কণ্ঠে ক্রোধ এবং বিদ্রূপ চাপা ছিল না। প্রেমাংশু স্ত্রীর মনোভাব বুঝিয়াও নির্ব্বিকার ঔদাস্যের সহিত বলিল—'ঘড়ি তো দেখিনি তখন!

'আর, কোথায় যাওয়া হয়েছিল, সে প্রশ্নটা বুঝি বাহুল্য ?'

'হ্যাঁ; কারণ ও প্রশ্নের উত্তর তুমিই ভাল রকম জান।'

পুষ্পলা তাহার প্রেমময় নির্ম্মল-চরিত্র স্বামীকে ভালরূপেই চিনিত, তথাপি তাহার মনটা অকারণে কেমন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল; তাই বলিল—'জানি বলেই যে চিরকাল জান্‌তে হবে, তার কোন কথা নেই! তোমার চলাফেরার উপর আমি আজকাল যদি সন্দেহ করি ?'

প্রেমাংশু একবার চোখ তুলিয়া চাহিল। সে দৃষ্টিতে যে কী ছিল তা প্রকাশ করা যায় না। তারপর সে বলিল—'জিনিষটা এত হীন যে তা' নিয়ে আলোচনা কর্‌তেও আমার ঘৃণা হয় পুষ্প। সন্দেহ কর্‌তে ইচ্ছা হয় করো; কারুর ইচ্ছার উপর বাধা দেবার অধিকার আমার নেই।''

পুষ্পলা এতক্ষণে বুঝিল—কতটা হীনতার পরিচয় সে দিয়াছে। স্বামীর চোখের পানে চাহিতেই তাহার বুকটা দুলিয়া উঠিল। এতক্ষণের কথাবার্ত্তার কদর্য্যতা যেন তাহারই মুখে কালি মাখাইয়া দিল। দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

প্রেমাংশু ভুলিয়া গিয়াছিল—আজই সে মিলনিকাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। তাই সে নিশ্চিন্ত মনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাঠকক্ষে বসিয়া রহিল।

এই সময় মিলনিকা নিঃশব্দে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। এ গৃহ তাহার অপরিচিত নহে। সে আসিয়া প্রথমে পুষ্পলার নিকট গিয়াছিল; তারপর বাগানে স্বামীকে রাখিয়া প্রেমাংশুর সন্ধানে আসিয়াছিল।

দেখিল প্রেমাংশু ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত, তার হাতে একখানা খোলা বই। কিন্তু মিলনিকা দৃষ্টি মাত্রেই বুঝিল—বইয়ের পাতার উপর চোখদুটাই ছিল, মনটা ছিল না। কিন্তু আজ প্রেমাংশুর একান্ত ব্যথিত ম্লান মুখের পানে চাহিয়া তাহার কোমল নারী হৃদয় বেদনায় মুচ্‌রাইয়া উঠিল। বুঝিল এই সুন্দর যুবক হাসির আড়ালে কতখানি ব্যথা লুকাইয়া রাখে। সে পুষ্পলার সব কথা জানিত, তাই প্রেমাংশুকে দেখিয়া এইটাই তাহার সবচেয়ে ব্যথা লাগিল—যে এই গভীর আপনহারা ভালবাসার প্রতিদান পুষ্পলা কিরূপেই না দিতেছে।

মিলনিকা অগ্রসর হইয়া ধীরে ডাকিল—"প্রেমাংশুবাবু"।

প্রেমাংশু চমকিয়া মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের আতিশয্যে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে কহিল—"মি-ল-নি-কা ?"

—কিন্তু বিস্ময়ের এত প্রাবল্য কেন ? আপনি ত আস্‌তে বলেছিলেন।

প্রেমাংশু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জিতস্বরে বলিল—তাই ত! তাই ত! এতবড় ভুল একেবারে অমার্জ্জনীয়। কিন্তু কতক্ষণ এসেছ তোমরা ?"

"বেশীক্ষণ না। তা' আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন?"

'না সত্যি, ভুলে যাওয়া আমার ভারী অন্যায় হয়েছে।'

"তাহলে আপনি বল্‌তে চান, ভুলে যাওয়া না যাওয়া মানুষের হাতধরা?"

প্রেমাংশু সমস্তদিন পর একটুখানি হাসিতে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল। বলিল—'আচ্ছা, তুমি এগোও, আমি আস্‌ছি।'

'আচ্ছা—' বলিয়া মিলনিকা অগ্রসর হইয়া, পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে ডাকিল—"প্রেমাংশুবাবু।"

'প্রেমাংশু বিস্মিত হইয়া উত্তর দিল—"কি মিলনিকা?"

"আপনি আমার বন্ধু ত? সেই অধিকারে জিজ্ঞেস কচ্ছি আপনার বেদনার কারণ আমায় বলুন। জানেন ত কারুকে বল্‌তে পারলে বেদনা অনেক কমে যায়।"

'প্রেমাংশুর মুখের উপর অন্তরের গূঢ় বেদনার ছায়া ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণে সে তাহার স্বভাবসিদ্ধ হাসির দ্বারা তাহা ঢাকিয়া বলিল—'পাগল না কি মিলনিকা? কিন্তু তোমার এ ধারণা হ'ল কেন বল ত?"

'প্রেমাংশুবাবু, পুষ্প পাষাণী, তাই দেখতে পায় না। কিন্তু আমি পুরুষ নই; জানেন ত এ সব বিষয়ে নারীর দৃষ্টি কি রকম তীক্ষ্ণ? হাসি দিয়ে যতই ঢাকুন আমায় ফাঁকি দিতে পার্‌বেন না।'

প্রেমাংশু সত্যই এই একান্ত শুভার্থিনী, স্নেহময়ী নারীর নিকট আত্মগোপন করিতে পারিতেছিল না, তাই ম্লান হাসিয়া বলিল—"কি হবে আমার কথা শুনে মিলনিকা? কিন্তু আমার দুঃখই বা কি বল ত? অতুল ঐশ্বর্য্য, অটুট স্বাস্থ্য, বাঞ্ছিতা সুন্দরী স্ত্রী, ফুলের মত মেয়ে, তোমাদের মত দুর্ল্লভ বন্ধু। আমার দুঃখ কি মিলনিকা?'

"সুখদুঃখের মাপকাঠি সকলের একনয়, প্রেমাংশুবাবু!"

"আচ্ছা মিলন তোমায় একদিন বলব। কিন্তু এখনও সময় আসেনি।"

"সময় হলে বল্‌তে দ্বিধা কর্‌বেন না—"বলিয়া মিলনিকা বাহিরে আসিল। বাগানে যাইবার পথে হঠাৎ পার্শ্বের কক্ষে চাপা কণ্ঠের কথাবার্ত্তা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। অন্যায় বুঝিয়াও মিলনিকা দাঁড়াইয়া রহিল, স্পষ্ট শুনিল পুষ্পলা বলিতেছে—"তুমি নিজে চোখে দেখেছ?

পুরুষকণ্ঠে কে বলিল—"নিশ্চয়ই, এইমাত্র দেখে এলাম দুজনে নির্জ্জনে আবার হাত ধরে—"

মিলনিকা আর শুনিল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া বাগানে স্বামীর নিকট আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরেই পুষ্পলা ও প্রলয়েশ আসিল। পুষ্পলা মিলনিকার দিকে চাহিয়া বলিল—"কিগো, ওঁর সঙ্গে গল্প হ'ল? এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে?" পুষ্পলার ঠোঁটের পাশে একটু বাঁকা হাসি খেলিয়া গেল!

মিলনিকা সমস্ত বুঝিয়াও হাসিমুখে বলিল—"কই আর হ'ল ? উনি ত ভুলেই গিয়েছিলেন আজ আমাদের আস্‌তে বলেছিলেন।" পুষ্পলা প্রলয়েশকে মিলনিকার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। প্রলয়েশ দেখিল মেয়েটী সুশ্রী বটে ; বর্ণ খুব উজ্জ্বল না হইলেও মুখখানি সুন্দর ; ভারী সুন্দর চোখদুটী। সহজ সচ্ছন্দ ভঙ্গী ; অথচ সংযতা এবং স্মিতমুখী।

মিলনিকার কিন্তু প্রলয়েশকে ভাল লাগিল না ; তাহার চোখদুটা অপূর্ব্ব ; অনবদ্য সুন্দর! কী মোহময় চাহনি ? সবই সত্য। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রেমাংশুর সহিত ইহার তুলনাই হয় না। মিলনিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল এই ভাবিয়া যে, পুষ্পলা সত্যই দুর্ভাগিনী না হইলে প্রেমাংশুকে ফেলিয়া প্রলয়েশকে—

তারপরই প্রেমাংশু আসিয়া তাহার প্রাণখোলা হাসির দ্বারা সে অসন্তোষের আবহাওয়াটা উড়াইয়া দিল। হাসিগল্পের মধ্যে আহারপর্ব্ব সমাপ্ত হইল।

কিছুক্ষণ পর মিলনিকা পুষ্পলাকে বাগানের অপর পার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল— 'তোর প্রশংসা করতে পারলাম না কিন্তু পুষ্পা। অমন শিক্ষিত, রূপবান্ স্নেহময় স্বামীর অসীম ভালবাসার অপমান করে, ভালবাস্‌লে কিনা একটা—

পুষ্পলা বাঁধা দিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—'তোমাকে আমি সে বিচার করতে ডাকিনি মিলি। কিন্তু আজ ওঁর হয়ে ওকালতী করছিস্ কেন বল ত ?'

"কেন ? সে তোর মত আত্মসুখীর বোঝ্‌বার ক্ষমতা নেই পুষ্পলা। কিন্তু তোকে বল্‌ছি, এত বড় একটা মহৎ প্রাণকে নষ্ট করার দুর্ভাগ্য যে কতখানি, তা' তুই একদিন বুঝ্‌বি। তুই সৌভাগ্যবতী, তাই না চাইতেই যা সকলে পায় না তাই পেয়েছিস্ আর তোর মত হতভাগীও নেই যে এতখানি পেয়েও নিতে পার্‌লি না। একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি না, যে সত্য অপরাধী সে কি করে একজন নিরপরাধীকে সন্দেহ করতে সাহস করে ? সন্দেহ করবার আগে একবার ভাবে না সে নিজে কি কচ্ছে ?" মিলনিকা সেখান হইতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

গৃহে ফিরিবার সময় চিরদিনের ন্যায় আজিও সে পুষ্পলাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—'তুই আমাকে ভাল না বাস্‌লেও আমি চিরকাল তোকে ভালবাস্‌ব। যেদিন বুঝ্‌বি আমার কথাগুলো মিথ্যে নয়, সেদিন আর রাগ করে থাক্‌তে পার্‌বি না।'

পুষ্পলা কোন উত্তর দিল না ; মিলনিকা চলিয়া গেলে স্বামীকে বলিল—"তুমি কি বল্‌তে চাও, এর পরেও আমাকে তোমার সঙ্গে বাস করতে হ'বে ?"

'বাস করার ইচ্ছা অনিচ্ছা তোমার। কিন্তু কিসের পরে ?'

'কিসের পরে ? জিজ্ঞেস্ করতে লজ্জা হ'ল না তোমার, ভণ্ড ?'

এতবড় তিরস্কারেও প্রেমাংশুর মুখে ভাবান্তর দেখা গেল না। শান্তকণ্ঠে কহিল— 'কিছুদিন থেকে তুমি আমায় সন্দেহ করচ্ বটে, কিন্তু কার সম্বন্ধে ঠিক বু—'

পুষ্পলা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল—'কার সম্বন্ধে? বিকেলবেলা আজ একলা ঘরে কাকে নিয়ে—' পুষ্পলা ক্রোধে, হিংসায়, জ্ঞান হারাইয়া এমন সব কথা বলিল যাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ভিত্তিহীন এবং পুষ্পলা নিজেও ভাল করিয়া তাহা জানিত। কিন্তু তখন সে জ্ঞান হারাইয়াছে।

প্রেমাংশুর মুখে একফোঁটা রক্ত ছিল না। কিছুক্ষণ মৃত্যুবিবর্ণ মুখে স্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'এতবড় মিথ্যা সন্দেহ তুমি ছাড়া আর কেহ কর্‌তে পার্‌ত না। এতবড় অপমান তুমি যখন কর্‌লে, আর এ বিশ্বাস যখন তোমার হয়েছে, তখন আমি তা' ভাঙ্গব না; তোমার বিশ্বাস তোমারই থাক। একটা কথা, তুমি এত বড় চরিত্রহীন মাতালের সঙ্গে বাস কর্‌তে পারবে না?"

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমি রাখতে চাইনা, দেখা শোনাও যাতে না হয়।'

"বেশ তাই হবে। কি করি? তারচেয়ে—"

'তারচেয়ে তোমার বিষয়ের অর্দ্ধেক আমার নামে লিখে দাও।'

প্রেমাংশু চোখ তুলিয়া স্ত্রীর পানে চাহিল। পুষ্পলা দেখিল—স্বামীর চির স্নিগ্ধদৃষ্টিতে আজ অসহ্য ঘৃণা ও জ্বালা ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছে। সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া সে চোখ নীচু করিল।

"পুষ্পলা, আজ তোমায় যেমন করে চিন্‌লাম, সাতবছরেও তেমন করে চিনিনি। ভাব্‌তে পারিনি তুমি এত হীন? বেশ তোমার নামেই বিষয় লিখে দিচ্ছি! স্মিতা ও খুকী? আমার অবর্ত্তমানে আমার যা থাক্‌বে তারা পাবে। তোমার বিষয় তোমারই থাক্‌বে; মনে হয় জীবনে তুমি অর্থকষ্ট পাবে না। তোমার ভার মা আমার উপরেই দিয়েছিলেন কিনা তাই। তা তুমি যখন তা চাও না, আমিও দায়িত্ব ত্যাগ কচ্ছি। বিদায়—এইবার বোধ হয় সুখী হয়েছ?"

প্রেমাংশু চলিয়া গেল। পুষ্পলা প্রাণহীনা পাষাণ প্রতিমার ন্যায় বসিয়া রহিল।

কি করিতে কি হইয়া গেল? সে ত ইহাই চাহে নাই। সে কি সত্যই এত হীন? তবে! মানুষ যে সত্যই কি চাহে, তাহা যদি বুঝিত!

(৩)

কিছুকাল কাটিয়া গিয়াছে। প্রেমাংশুকে দেখিলে এখন আর চেনা যায় না। যে প্রেমাংশু সুরার নাম শুনিলে পিছাইয়া আসিত, মদ্যপকে আন্তরিক ঘৃণা করিত, সেই প্রেমাংশু এখন দিবারাত্রি সুরায় ডুবিয়া থাকে। বন্ধুরা অত বেশী খাইতে নিষেধ করিলে বলিত—"তোরা কি মনে করিস্‌ মদ খাবার জন্যে আমি মদ খাই? আমি মদ খাই ভোল্‌বার জন্যে, মর্‌বার জন্যে।"

প্রেমাংশু তার বিষয়ের অর্দ্ধেক দান করিয়াছে; একটী অট্টালিকা দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য দিয়াছে। অবশিষ্টাংশ নিজের জন্য রাখিয়াছে।

মিলনিকা বহুবার তাহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু পারে নাই।

একদিন হঠাৎ প্রেমাংশু মিলনিকার গৃহে আসিয়া ডাকিল "মিলনিকা!"

মিলনিকা তাহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই কি প্রেমাংশু? তাহার সুগঠিত দীর্ঘ দেহ ন্যুব্জ, স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণ কালিমাখা, শরীর শুষ্ক, শীর্ণ, গালের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চোখে কি অদ্ভুত দৃষ্টি। দেখিলে ভয় করে। মানুষের যে ব্যর্থতা কত শীঘ্র পরিবর্ত্তন আনে মিলনিকা আজ বুঝিল। সে দেখিল প্রেমাংশু দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ধুঁকিতেছে। সে শশব্যস্তে তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিয়া, কাঁদিয়া ফেলিল, "প্রেমাংশুবাবু।"

প্রেমাংশু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"তুমিও কি আমায় ঘৃণা করবে মিলন?"

"আমার দাদার যদি আজ এ রকম হ'ত, আমি কি ঘৃণা কর্‌তাম? কিন্তু কেন এমন করে অমূল্য জীবনটা নষ্ট কর্‌লেন?"

"নষ্ট করেছি আমি? না মিলন, তা নয়। জীবনটা তো নষ্টই হচ্ছিল, অবশ্য ধীরে এবং গোপনে। আমি অত দেরী সহ্য কর্‌তে না পেরে এ পথ নিয়েছি। আমি নিজে না নষ্ট করলেও তা নষ্ট হতই মিল। এ জীবনে আর কোন পথই যে ছিল না। কিন্তু যাক্ সে কথা; আমি আজ তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি। পৃথিবীর দেনা-পাওনা শেষ না করেই চলে যাচ্ছি; তার আগে আমার অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী তোমায় বলে যাই।"

"কিন্তু আজ আপনার বল্‌তে ভয়ানক কষ্ট হবে যে? পরে বল্‌বেন না হয়।"

প্রেমাংশু হাসিল। সেই চির মধুর হাসি। বলিল—"পরে? আমার জীবনে আর 'পরের স্থান নেই। আজই সব শেষ কর্‌তে হবে। কিন্তু তুমি ঘৃণা কর্‌বে না? বিশ্বাস করবে আজ আমি আশ্রয়হীন কপর্দকহীন পথের মাতাল! মাতাল বটে, কিন্তু আজও আমি চরিত্রহীন হতে পারিনি, যার জন্য পুষ্পলা আমায়—

মিলনিকা চম্‌কিয়া বলিল—"হতভাগী আপনাকে এতবড় হীন সন্দেহ করতে সাহস করে?"

"হ্যাঁ; শুধু তাই নয়, আরও···বল্‌ছি সব। কিন্তু তার দোষ কি? সে আমায় ভালবাস্‌তে পারেনি, তাই সহ্য কর্‌তেও পারেনি। সে আমার ভালবাসা চায়নি, চেয়েছিল আমার তুচ্ছ বিষয়; তা সে পেয়েছে।"

প্রেমাংশু সমস্ত বলিবার পর বলিল—"আমি সব জেনেও তার উপর প্রতিশোধ নিতে চাইনি। কত চেষ্টা করেছি ফেরাবার, কিন্তু সে অনেক দূরে সরে যেত। কিন্তু সহ্য কর্‌তে পারলাম না যখন সে আমায় একেবারে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কি মর্ম্মান্তিক অপমান কর্‌লে! তাই ত বল্‌ছি আমার এ অবস্থা স্বেচ্ছাকৃত নয়। আমার ভেতরটা অনেকদিনই এ রকম হয়েছিল, কেবল বাইরেটা বজায় ছিল বলে কেউ জান্‌তে পারেনি। আচ্ছা বিদায় মিলন! দুঃখের দিনে তুমি ছাড়া আমার কেউ বন্ধু রইল না। আমার শেষ ভিক্ষা, আমার স্মিতাকে তুমি দেখো। আমার

জন্যেও ভারী কষ্ট পাবে। পৃথিবীর ঘৃণার বোঝা মাথায় করে যেতে হচ্ছে, তবু একজনেরও চোখের জল আমার জন্যে পড়্‌লে, আমার জ্বালাময় জীবনে শান্তি পাব। বিদায়…”

প্রেমাংশুর চলার পথের পানে চাহিয়া মিলনিকার চোখে জল ভরিয়া আসিল। সেই কেবল বুঝিল—কতখানি বেদনা অমন মানুষটকে এমন করিতে পারিয়াছে।

* * *

পুষ্পলা একখানা চিঠি হাতে জানলার কাছে স্তব্ধ বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রলয়েশের সমস্ত গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উঃ এত হীন প্রলয়েশ? পুষ্পলার হঠাৎ মিলনিকার একটা কথা মনে পড়িল। প্রলয়ের স্পর্দ্ধা সীমা ছাড়াইয়াছে চিঠিখানিতে কী প্রস্তাব তাহা ত পুষ্পলার অজানা নেই। সে শিহরিয়া চিঠিখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া বলিল “চিঠির সঙ্গে সঙ্গে তোমার অপবিত্র বিষাক্ত স্মৃতিকেও পুড়িয়ে ফেল্‌ছি। কিন্তু একথা কেন আগে জানিনি, বুঝিনি? তাহলে দুটো জীবন এমন জ্বলে পুড়ে ছাই হত না।”

হঠাৎ স্মিতা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—“মা, বাবা কি রকম কচ্ছেন; তোমায় একবার ডাক্‌ছেন, শীগ্‌গির যাও। এখনি চলে যাবেন আবার—”

পুষ্পলা নিঃশব্দ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামী তাহাকে ডাকিয়াছেন? এ কি সম্ভব?

পুষ্পলা স্খলিতচরণে প্রেমাংশুর কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। কতদিন পর সে আজ এ কক্ষে প্রবেশ করিল? প্রেমাংশু শুইয়াছিল, হঠাৎ তাহার মুখের একাংশে চোখ পড়িতেই পুষ্পলার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে টলিয়া পড়িতে পড়িতে দরজা ধরিয়া ফেলিল! কি স্তুতাহার চোখের সম্মুখে তখন সমস্ত দুলিতেছে! স্বামীর এ কী চেহারা সে দেখিল?

প্রেমাংশু পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল—“পুষ্পলা!”

পুষ্পলা আর সহিতে পারিল না। কতকাল পর স্বামীর এই আহ্বান তাহাকে আত্মহারা করিয়া দিল; সে ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

প্রেমাংশু নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বলিল—“আর কেন পুষ্পলা? যাকে জীবনে শুধু জ্বালা দিয়েছ, মরণের কূলে তাকে আর ফুলের মালা কেন? যে মনটাকে তুমি নিজের হাতে ঘা মেরে মেরে থেঁত্‌লে ভেঙ্গেছ, সে ত আর জোড়া লাগ্‌বে না! ভাল কথা, সেদিন তুমি আমায় যা মনে কর্‌তে আজ আমি সত্যিই তাই। কিন্তু মাতালের পায়ে মাথা রাখ্‌তে লজ্জা কর্‌ল না তোমার? ওঠ, দেখ, তোমার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছে।”

পুষ্পলা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—“না, না এ সত্যি না।”

“এ সত্যি পুষ্পলা। কিন্তু কাউকে কোন কিছু জোর করে বিশ্বাস করানো আমার অভ্যাস নেই। শোন, আজ তোমায় ডেকেছি কেন! আমার আর বেশী কিছু নেই, যা আছে স্মিতার নামে লিখে দিয়েছি। তোমার যা আছে জীবনে কষ্ট পাবে না বোধ হয়। বাস্, সব কাজ

আমার শেষ হ'ল। তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তাম না, কিন্তু বাধ্য হয়ে কর্‌তে হল ; ভুলে যেও শেষ অপরাধটা। এইবার শূন্যহাতে পথে বেরুতে পার্‌ব। বিদায়—''

"কোথা যাচ্ছ ? বিদায় কেন ?'' প্রেমাংশু হাসিল। সে হাসি দেখিয়া পুষ্পলার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল।

"কোথা যাচ্ছি ? আমার অবস্থা জান্‌লে ও কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে পার্‌তে না। জান কি, আজ পৃথিবীতে আমার দাঁড়াবার জায়গা নেই ; আজ আমি রিক্ত নিঃস্ব—''

"কে বল্লে নিঃস্ব ? দাঁড়াবার জায়গা নেই কেন বল্‌ছ ? আমায় যা দিয়েছ সে ত তোমারই, আমিও ত তোমার। আমার নিজের আলাদা কি থাক্‌তে পারে ?"

"জীবনের শেষ সময়েও তোমার কথাগুলি মিষ্টি লাগ্‌ল। কিন্তু এই কথাগুলো আগে বললে আমার জীবনের গতি এদিক ফিরত না। আর হয় না বড় দেরী করে ফেলেছ।"

"কেন হয় না ? তুমি যা দিয়েছ ফিরিয়ে নাও।"

"ফিরিয়ে নেব ? তবে আর দুঃখ কি ? তোমাকে যা দিয়েছিলাম, তুমি তা পাওনি, কিন্তু আমি কি তা ফিরিয়ে নিতে পেরেছি ? যদি পারতাম তাহলে আমার এ অবস্থা হত না। তোমাকে আমার ভালবাসা, আমার সর্ব্বস্ব দিয়েছিলাম পুষ্পা, কিন্তু তুমি তা চাওনি ; চেয়েছিলে আমার তুচ্ছ বিষয়, তা ত পেয়েছ, তবে আর কেন ?''

"আমার কোন কথা তুমি শুন্‌বে না ? আমায় ক্ষমা—"

"না পুষ্পলা তা আর হয় না। যা চলে যায় তা আর ফেরে না। কিন্তু তুমি অমন করছ কেন ? একদিন ত তুমি আমার মুখ দেখ্‌তেও ঘৃণাবোধ করতে, তবে যখন আমি সত্যই ঘৃণার পাত্র হয়েছি—''

"না, না, তুমি কখনও ঘৃণার পাত্র হ'তে পার না।"

'যদি আমার প্রতি এতটুকু করুণা হয়ে থাকে, আমার স্মিতাকে একটু দেখো। তার এই অযোগ্য বাপকে সে বড় ভালবাসে—'প্রেমাংশুর গলা ভাঙ্গিয়া আসিল ; সে দ্রুত কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

আর পুষ্পলা ? তাহার আর কি করিবার ছিল ? আজ এতদিন পর সে কি করিয়া বলিবে সে সত্যই স্বামীকে ভালবাসিত ?

হঠাৎ জননীর বাণী বিদ্যুতের ন্যায় চম্‌কিয়া উঠিল তাহার মনে—"অতবড় প্রাণটা যদি তোর অবহেলায় নষ্ট হয়, ভগবান তোকে ক্ষমা কর্‌বেন না।"

পুষ্পলা লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—"ভগবান, সত্যিই তুমি আমায় ক্ষমা করো না।''

পাপিয়া

শ্রীবাসন্তী সেন

পাপিয়া, ওগো পাপিয়া!
তোমার সুরের ধারা বহে মোর
পরাণের কূল ছাপিয়া।
পাতার আড়ালে থাকি
নিজেরে লুকায়ে রাখি
ক্ষণে ক্ষণে ওঠ ডাকি।
ওগো কোন দূরদেশী সুবিজন কাননের পাখী।

পাপিয়া, ওগো পাপিয়া
তোমার ওই সুরে ফুলবনে ফুল
আন্‌মনে ওঠে কাঁপিয়া।
সবুজ ধানের মঞ্জরী বলে
দুলায়ে আঁচলখানি
গানেতে তোমার মুগ্ধ হয়েছি
কণ্ঠে নাহিকো বাণী
চোখ গেল পাখী চোখ বুজে রয়, বলে—মোর সব জ্বালা
দূর হয়ে গেছে, বন্ধু আমার! পরগো বরণ-মালা।

সোনার কাঠি রূপার কাঠি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী—দেবী

'আয় পয়'

অজিতরা যখন বেড়াতে গেছে,—তখন প্রতিভার মায়েরা কলকাতায় এসেছেন। এবারে আর এপাত্রের লোভ প্রতিভার মা ছাড়তে দিলেন না। অজিতের ঠাকুর্দ্দা কিসের কারবারে অনেক আয় এবং সঞ্চয় দুইই করেছেন। সেকালে বনেদী ঘর, আবার হালের চালও আছে। তাতে একালের ছেলে। মেয়ে দিতে জানা-শোনা ঘর।

যথাসময়ে প্রস্তাব এলো।

মনে মনে সকলেই একথাটা ভাব্‌ছিলেন—পিতামহীও, কিন্তু সেটা যখন স্পষ্ট হয়ে এলো তখন আচম্‌কা একটু থমকে গেলেন। একটুখানি ভাবনায় পড়ে কর্ত্তার কাছে কথাটা উত্থাপন কর্‌লেন। তিনি তামাক এবং খাতা-পত্রের আড়াল থেকে গম্ভীর ভাবেই প্রস্তাবটা শুন্‌লেন। প্রথম কথাতেই কথার জবাব দেওয়া বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব নয়।

ঠাকুমা নানারকম ভণিতা করে বল্লেন, 'তা' আমরা ওবাড়ীর বীরেশ্বর বাবুর মেয়েটীর সঙ্গে কথা বলে ছিলাম।'

'কি রকম ? আমি তা জানিনা' নলটা মুখ থেকে নামিয়ে কর্ত্তা বল্লেন।

'না, তুমি জান না। মেয়েটী ভাল, বাপ থাক্‌তে আমি একবার বলেছিলাম।'

'তা কি পাকা কথা দিয়েছ নাকি ?'

'না, পাকা কোথায় ?'

'তবে আর কি'—কর্ত্তা কাগজ-পত্রে মনোনিবেশ করলেন।

মনের ভেতর খচ্‌খচ্‌ করে যেন কি একটা অশান্তি হয়। অজিতের ঠাকুমা তাঁর বধূ-মাতার কাছে যান।

অজিতের মা ভাঁড়ারের কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

বিয়ের প্রস্তাব তাঁরও কানে পৌঁছেছিল।

শাশুরী বল্লেন, 'বৌমা শুনেছ ? ওরা বলে পাঠিয়েছে ?'

'হ্যাঁ, শুন্‌লাম্।' কাজ রেখে মাথার কাপড় টেনে শাশুরীর কাছে এসে দাঁড়ালেন অজিতের মা।

'তা ওদের যে কথা বলেছিলাম তার কি করি ?' চিন্তিত ভাবে শাশুরী বল্লেন—'তারকের মা কি মনে কর্‌বে ?'

বড় বৌ কমলার মা ছিলেন সুমুখে, তিনি বল্লেন, কি আর মনে করবে মা ? ওদের মেয়ে তো তেমন নয় আর কথাই বা এমন কি ?

এবার অজিতের মা বল্লেন, 'মেয়েটার আয় নেই পয় নেই বিয়ের কথা উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই বাপ মরে গেছে।'

তা বটে ! কথাটা বিয়ের সম্বন্ধ ভাঙ্গাবার পক্ষে মজ্‌বুত বটে।

কমলার মা বড় বৌমা বল্লেন, নিজেদের বাড়ীর আয় পয়ও তো দেখ্‌তে হবে !

কর্ত্তা, পুত্র, আর বধূদের সঙ্গে খানিক জল্পনার পর নিষ্পত্তি হ'ল, ওদের চেয়ে এদের সঙ্গে কুটুম্বিতা বাঞ্ছনীয় যখন তখন ওদের কোনো ছুতো দেখাইলেই চল্‌বে। বেশী ধরাধরি করে কিম্বা মনে খুঁত থাকে তো ওদের মেয়ের বিয়ের সময় যৌতুক বলে কোনো গহনা বা কিছু দিলেই সাহায্য করা হবে। ভগবানের ইচ্ছায় ওঁদের তো কোনো অপ্রতুলই নেই।

চিঠি

'ওগো শুন্‌ছ' ?—বিছানার ওপরে সেদিনের কাগজ পাঠরত তারক কি ভেবে স্ত্রীকে ডাক্‌লেন।

আলোর কাছে কি গোছাতে ব্যাপৃত স্ত্রী জবাব দিলেন, 'হুঁ শুন্‌ছি'।

অর্থাৎ 'ওগো শুনছ' বলাটা তারকের মুদ্রাদোষ।

আর তার ঐ রকম জবাব দেওয়া তারকের স্ত্রী মণিকার মন থেকে এখন মুদ্রাদোষেই দাঁড়িয়েছে।

তারক খবর কাগজ খানা পাশে ফেলে একটু হেসে বল্লেন 'কি বল্‌ছি তা না জিজ্ঞেস করেই যে হুঁ বল ?'

দরজার পাশে একটা খসখস শব্দ হ'ল, পর্দ্দাটা নড়ে উঠ্‌ল, সুপ্রিয়া ডাকলে, 'দাদা'। তার হাতে দুতিনখানা চিঠি, মুখে ওদের কথা শুন্‌তে পাওয়ার মত অপ্রস্তুত হাসি। তার গম্ভীর দাদা এবং বৌদিকে ওরকম ভাবে তরল আলাপের ধরণ ও একদিনো দেখেনি।

অনেক লোক থাকে যেমন বর্ণচোরা আমের মত বাইরে নিতান্ত ভালমানুষ নিরতিশয় সাদাসিদে ধরণের লোক ; কাব্য কল্পনার ধার ধারেনা, রহস্য-পরিহাস মনে হয় যেন তারা কর্‌তে জানেই না। নিতান্ত সোজাসুজা, যে কাজে ব্যবসায়ী তাই দিনের পর দিন বয়ে যায় তারি মাঝে সংসার ধর্ম্ম বেশ ভালভাবেই প্রতিপালন করে। সংসার তাদের অতিশয় সহজভাবে নেয়। তারা তর্ক করে না, আলোচনা করে না, গল্প-গুজবে তাদের বিশেষ তৎপরতা ধরা পড়ে না। কিন্তু তাদের সঙ্গোপন জীবনের কোণে উঁকি মেরে যদি কেউ দেখে হঠাৎ দেখ্‌তে পায়—তারা রসজ্ঞও, বুদ্ধিমানও, ভাবগ্রাহিত্বও তাদের কম নেই ; শুধু তারা আপনাকে প্রকাশের সঙ্কোচে কেমন নিরীহ হয়ে থাকে।

তারক ছিলেন এই ধরণের। তাঁর বয়েসের ছেলেরা সব তরুণ দলের, তাঁর দলের ছেলেরাও তরুণ ভাবের; কিন্তু তারকের নিরীহতা সংগুপ্ত রসবোধ তাদের শুধু হাসি-রহস্যের বিষয় ছিল।

কাজেই বোনতো দাদাকে প্রায় ঠাকুরদাদার মত সম্মান কর্‌ত। আর ঘরে লেখাপড়া শেখা নিতান্ত ঘরোয়া বৌদিকেও গৃহিণীর সম্মানই দিত, সমবয়স্কার বা সম্পর্কের মত সঙ্গিনীর ভাবে নেয়নি।তাতে অবিবাহিতা বিবাহিতার বাধাও ছিল।

তারক ও সুপ্রিয়ার মতনই অপ্রস্তুত ভাবেই বল্লেন 'কিরে?'

সে বল্লে, 'তোমার চিঠি এসেছিল তুমি ডাকে বেরিয়ে যাবার পর'—

চিঠি খানতিনেক, একখানা কি কাগজ, সুপ্রিয়া ফিরে যাচ্ছিল।

তারক নামঠিকানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্লেন, 'ও এটা দেখছি গোপীমোহন বাবুদের আপিসের ছাপওয়ালা নাম (গোপীমোহনবাবু অজিতের ঠাকুর্দ্দা)। তারপর বোনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লেন, তোমার ননদের বিয়ে বুঝি লাগ্‌ল, স্ত্রীও উৎসুক হয়ে ফিরে দাঁড়াল। সুপ্রিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে বেরিয়ে গেল।

বেশ, ভারি চিঠি, তারক সব আগেই সেটা খুল্লেন, পড়্‌তে অনেকক্ষণ সময় লাগল।

উৎসুক দৃষ্টিতে মণিকা স্বামীর দিকে চেয়ে ছিল।

একবার পড়ে আবার এপাতা ওপাতা কর্‌তে দেখে সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—'কিসের কথা, কি খবর এত?'

তারক চিঠিখানা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বল্লেন, 'পড়'। তিনি অন্য চিঠিগুলি খুল্‌তে লাগ্‌লেন।

চিঠি অজিতের কাকার,—ঠাকুমা লিখ্‌তে বলেছেন, এই ভাবে আরম্ভ এবং মস্ত চিঠি।

যথারীতি বহুদিন যাবৎ সমাচার না পাওয়ায় চিন্তা, তারপর উৎকণ্ঠিত কুশল জিজ্ঞাসা,—তারপর নিজেদের বাড়ীর সব আধিব্যাধির ইতিহাস ইত্যাদির পর অজিতের মার বাল্যসখী ও তাঁর মেয়ে এবং তাদের অত্যধিক পীড়াপীড়ি এবং এপক্ষ থেকে পুরুষরা তেমন করে সুপ্রিয়ার কথা জ্ঞাত না থাকায় ঐ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দান,—তাছাড়া ওঁরাও অনেকদিন চুপচাপ ছিলেন (যেহেতু কালাশৌচোর পর আরও ৬ মাস গেছে) ইত্যাদি ইত্যাদি—, তাই ওঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলছেন, তারা সুপ্রিয়ার জন্য অনুরূপ পাত্রের সন্ধান করে দিতে চেষ্টা কর্‌বেন। আর সুপ্রিয়াকে যৌতুক স্বরূপ কিছু গহনা বা কিছু দেবেন। এতো ঘরেরই কথা, রমারই মত মেয়েই তো। ওরা যেন কিছু মনে না করেন, আপনার লোকের মত সহজভাবেই নেন। আর পরিশেষে ঠাকুমা ওদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করছেন, সুপ্রিয়ারও যাতে ভালো বিবাহ হয় এই ওঁদের কামনা। নিতান্তই এড়ানো গেল না, কথা দিয়ে ফেলে ফেরানোও গেল না। কি আর করা যাবে এই সব কথা। তারপরে

শেষের পরে এক ধাপে পুনশ্চ দিয়ে লেখা, নিশীথের সঙ্গে ওঁরা বল্লেই হয়ত বিবাহ হতে পারে,—তাতে ওঁদের কি মত ?

চিঠিতে যেমন ভদ্রতা তেমনি সৌজন্য, তেমনি বুদ্ধিমত্তা; সবই সত্বেও মণিকা খানিকক্ষণ উর্দ্দু ভাষার মত কিছুই বুঝ্‌তে না পারার মত সেটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল।

তারক কিছুই বল্লেন না আর।

মাঝে মাঝে তারকের হাতের খবরের কাগজের খচ্‌মচ্‌ শব্দ হয়।

মণিকা অনেক কথাই ভাব্‌ছিল, কলিকাতার ঘনিষ্টতা আত্মীয়তা রহস্য-পরিহাসের কথা, তারপরেও অজিতের এবারে আসা, বেশী করে আলাপ পরিচয়।

সুপ্রিয়া কি ভাবে নেবে এটাকে ?—অজিত কি ভাবে নিয়েছে ? ওঁদের চিঠির ভাবে তো মনে হল অজিত যেন কোনো আপত্তিই করেনি !—সেই কি সত্য ? তবে ? তা হলে ?

সুপ্রিয়ার বয়স তো প্রায় ১৮।১৯ হ'ল, নিতান্ত ছেলে মানুষ নয় তো !—মণিকা ভাব্‌লে, ভালবাসার কথা না হয় থাক যদি বা সেটা থাকে, কিন্তু যে অপমান তাকে করা হল বিমুখ করে,—তার কথাও কি ওরা ভাবেননি ?—যৌতুক গহনা সৎপাত্রের উল্লেখে কি আরও তাকে অসম্মান করা হয়নি ?

আবার পুনশ্চ দিয়ে—নিশীথের কথা !—

খোকা মশার কামড়ে ছট্‌ফট্‌ করে, মণিকা উঠে মশারী ঠিক করে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

অঘ্রাণের নিস্তব্ধ ঠাণ্ডারাত্রি, চারিদিকে হিমের প্রলেপে কুয়াসা ঘিরে ছেয়েছে। মণিকা মুড়ি দিলে।

তারক কাগজগুলো একটার পর একটা পড়ে যাচ্ছেন, শুধু খস্‌খস্‌ শব্দ হয়। না পড়া হলে দিনের সঙ্গে সম্বন্ধ ওর রাখা যাবে কি করে !

পাশের ঘরে মা আর সুপ্রিয়া শুয়ে।

সুপ্রিয়ার আলোটী তখনো জ্বল্‌ছিল, সেও দাদার মত পড়্‌ছিল, কাগজ নয় অবশ্য—কাব্য !

চিঠির সম্বন্ধে তার কৌতুহল পড়ার বই পড়তে দেয়নি, কেবলি স্বপ্ন দেখাচ্ছিল। যেন কত কি আশে পাশে বন নদী, শ্যামলা বাংলাদেশ, পরিচিত কতজন কারা।—স্বপ্নেরও সীমা সেই অবধিই থমকে যায়, আর এ এগোয় না। ঘুরে ফিরে আবার তাই ভাবে। পরীক্ষা সন্নিকট হলেও তারপর আর ইতিহাস মুখস্থ করা চলে না। ও পড়্‌ছিল বই, ভাব্‌ছিল কিন্তু বইয়ের কথা নয়। তবে কবিতার লাইনগুলি চমৎকার,—

হৃদয়ে সুর দিয়ে নাম টুকু ডাকা'—যেন মনে পড়ল, ওকে ও করে ঐ রকম ছোট নামে ডাকাটুকু।

কিন্তু চুরি করে চিঠি পড়া এই প্রথম!

অত্যন্ত কৌতুহ'ল আর নিজের বিষয়ে কৌতুহলই তাকে এই আশ্চর্য্য কাজ করিয়েছে।

সকাল বেলা, মণিকা স্নানের ঘরে। দাদা বাইরে। সুপ্রিয়া দাদার টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। চিঠি খোলাই পড়ে আছে, যেন ওরা আশ্চর্য্য হয়ে সেটা খামে রাখ্‌তেও ভুলে গেছে।

ও পড়্‌লে।

খুট্‌করে শব্দ হ'ল। স্নানের ঘর থেকে মণিকা বাইরে এলো।

কিরে? কি দেখ্‌ছিস্?

সুপ্রিয়ার হাতে সেই চিঠি। ও রাখলে, অপ্রস্তুত হয়ে গেল অবশ্য। বল্‌তেও কিছু পারলে না।

মণিকাও তেমনি অপ্রস্তুত ভাবে পিছন ফিরে আলনা থেকে শাড়ী জামা সেমিজ পর্‌তে লাগল।

ক্ষতিপূরণ

দিনের কাজ একটার পর একটা করে সারা হয়। মার সঙ্গে কি কথা হতে পারে সে কথা তারক মণিকাকে কিছুই বল্লেন না।

অঘ্রাণের রাত্রি খুব শীঘ্র আসে। সন্ধ্যার পরেই শীতের দেশ সব ঘরে ঢুকল।

মণিকা একটু অন্যমন গম্ভীর ভাবেই সারাদিন ছিল। যেন সুপ্রিয়ার সঙ্গে কি কথা কইবে ভেবে পাচ্ছিল না

সন্ধ্যাবেলা ননদ ভাজে ঘরে বসে কি দুখানা বই পড়্‌ছিল। মা পূজার ঘরে।

সুপ্রিয়া হঠাৎ বল্লে, বৌদি দাদা চিঠির কি জবাব দেবেন ঠিক করেছেন?

বৌদি একটু চুপ করে রইল, তারপরে বল্লে, 'কি জানি, উনি আমায় কিছু বলেন নি তো।'

সুপ্রিয়ার যেন আট ঘণ্টায় আট বছরের অভিজ্ঞতা গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হয়েছিল।

সেও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বল্লে, 'তোমরা কি খুব ব্যস্ত হয়েছ বিয়ে দেবার জন্যে?'

বৌদি কিছুই বল্লে না।

সে বল্লে, ওরা আবার পুনশ্চ দিয়ে নিশীথবাবুর নাম লিখেছেন। আর গহনা দেবেনও বোধহয় তোমাদের আমার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ! আমরা ওদের মত বড় লোক নই, গরীব, তাও জানেন তো; তাই ক্ষতিপূরণ দিয়ে বদল দিয়ে ওরা খেয়ালছলে যে কথা দিয়েছিলেন তার দায় মুক্ত হবেন। আর আমিও সোনার কাঠি রূপার কাঠির মতন জাগাতে ছোঁয়ালে জেগেছি, আর ঘুমাতে ছোঁয়ালে ঘুমব।

তুমি দাদাকে বোলো আমি ওচিঠি পড়েছি। আর ওদের নির্ব্বাচনে আমার দাদার বোনের বিয়ে দেবার দরকার নেই। কেননা নিশীথবাবু কিম্বা আরও সব সৎপাত্ররাও আমার চেয়ে আরও ভালো ভালো মেয়ে পেয়ে যেতে পারেন, আর তখন আবার হয়ত এই রকম চিঠি তাঁদেরও দিতে হতে পারে। ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়ে!—তুমি মাকে আর দাদাকে বোলো, আমি আরও পড়ব, বিয়ে দেবার চেষ্টা এখন যেন না করেন।

মণিকা একটু থেমে তারপর বল্লে, 'আচ্ছা, বল্‌ব। তা তোর তো পরীক্ষাও এলো, যা' পড়্‌গে। কেন আর মাথা গরম করিস্'

সুপ্রিয়া একটু হাসলে, বল্লে, না, মাথা গরম নয় তোমরা কি জবাব দেবে আমার ভাবনা হচ্ছে।

'কিন্তু অজিত বাবু হয়ত জানেনও না, তাকে আর কি জিজ্ঞাসা করে চিঠি লেখা হয়েছে?' মণিকা বল্লে।

সুপ্রিয়া উঠ্‌ল। তার মুখ দেখা গেলনা। সে যেতে যেতে বল্লে, 'তুমি কিন্তু মাকে আর দাদাকে বোলো, আমার বিয়ের জন্য ওঁদের মতামত বা যৌতুকের কথার জবাব যেন না দেন।

মনে এলো, না অজিতবাবু জান্‌তেও পারেন, না জান্‌তেও পারেন, তাতে কিছু আসে যায় না। ওঁদের কাছে ওঁদের নিজেদের প্রয়োজন হিসেবে মানুষের দাম, মানুষের অন্তরের সম্মান হিসেবে ওদের কিছু ভাব্‌বার নেই। মেয়েদের হিসেবে তো নয়ই!

সুপ্রিয়ার জানা হয়ে গেছে। আর বেশী জানাবার দরকার নেই।

মা বৌয়ের কাছে মেয়ের কথা এবং ছেলের কাছে চিঠির কথা শুন্‌লেন। চিঠিও পড়্‌লেন। কিন্তু জবাব দেবার কি আছে যে তা আর ভেবে পেলেন না।

আশ্চর্য্য হয়ে কি দুঃখিত হয়েও কিছু বলবার ক্ষমতাও তাঁর যেন ছিল না।

যথারীতি

অজিত আশ্চর্য্য, অবাক, বিরক্ত হয়ে গিয়ে ঠাকুরমার কাছে দাঁড়াল।

অজিত বল্লে, 'তবে ওঁদের সঙ্গে কেন কথা কইলে?'

অপ্রস্তুতভাবে ঠাকুমা বল্লেন 'কথা অমন হয়, বলে লক্ষ কথা হয়!'

অজিত মার কাছে গেল।

মা বল্লেন 'এ মেয়ে সব দিকে ভাল দেখেই তোমার দাদা মশাই কথা দিয়েছেন।'

অজিত বল্লে, 'ওরা কি অপরাধ কর্‌লে?'

মা বল্লেন, 'অপরাধ আর কি?'

'আমার দিক তোমরা কেউ দেখ্‌বে না' অজিত আর দাঁড়াল না।

মা বিরক্ত ভাবে স্বগত বল্লেন, ছোট জার কাছে, 'মা-বাপে যার সঙ্গে বিয়ে দেয় তাকে বিয়ে করেই সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌ছে—মন্ত্র পড়ে বিয়ে হলে আপনি সব ভালো লাগ্‌বে।—এতে আবার কথা! আর সুপ্রিয়া এমন কি সুন্দরী!

বাড়ীর ধরণে সবাই সেকেলে, আচার ব্যবহারে একচত্রা জ্যেঠাধিকার সম্পূর্ণ মাত্রায়, পুরুষরা সকলেই ছোট বড় সবাই পূরো অটোক্র্যাট মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে, মায়েরা ছোট ছেলেকেও ভয় করেন, বড় মেয়েকেও যা না করেন, আবার অটোক্রেসী পুরুষদেরও তেমনি সম্পর্ক, মান্যগণ্য হিসেবে কনিষ্ঠ জাতীয় পুরুষদের ওপর ও কম চলে না অর্থাৎ একটী ভাইপো বা ভাগিনেয়কে যাবতীয় কাকা জ্যেঠা মামা দাদা সকলের কাছেই তটস্থ থাকতে হবে। আর অজিতের দাদার জন তিনেক ভাই আছেন।

ভিতরে তবু কিছু বলাও যায়। বাইরে বিপত্তির মাত্রা বেড়ে গেল। শোনা গেল জ্যেঠামহাশয় যিনি অজিতকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন তিনি সস্নেহ হাস্যে অজিতের শ্রুতিগোচর করে নেপথ্যে তাঁর কনিষ্ঠকে অর্থাৎ অজিতের বাপকে বল্লেন, বিয়েটাকে এখনকার ছেলেরা বোঝেনা, ওটা হচ্ছে কনভেনস্যন আর কনটেন্টমেন্টএ মিশানো একটা বিরাট কমপ্রোমাইজ অর্থাৎ একটা জগাখিচুরী ব্যাপার আর কি।

সরিৎ এসেছিল বেড়াতে, শুনে সুপ্রিয়ার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত হ'ল! কিন্তু তাকে ডাকা হয়েছিল, অজিতকে বল্‌বার জন্যই; কেননা তার মতামত তো কেউ মান্‌বে না, বিয়ে করতেই হবে, মাঝে থেকে মতান্তর করে লাভ নেই।

সে বল্লে, 'ওহে, বিয়েটা করে ফেল। ও দিল্লীর লাড্ডুর আস্বাদ পাও, নইলে পৃথিবীতে ঐ বিয়ে আর প্রেম আর কোনো তত্ত্বের সন্ধান পাবে না।'

অজিত বল্লে, 'তার মানে?'

সরিৎ হাস্‌লে, 'বুঝ্‌ছ না, বিয়ে না করা অবধি ঐ প্রেম নামক কম্‌লিটী তোমাকে ছাড়্‌ছে না। ওকে নিয়ে বিবাহিত জীবনের ডাঙ্গায় ওঠ, দেখ্‌বে, ও:প্রেম ও কিছু স্বর্গীয় বস্তু নয়, নিতান্তই কাজের ব্যাপার—আর বিয়েও নিতান্ত প্র্যাক্‌টিক্যাল জিনিষ,—এবং স্ত্রীটীও মোটেই একটী সনেট বা লিরিক্ কিছু নয়, কিন্তু ভাল লাগবে এবং দেখবে ক্ষণকালের অদর্শনেই এমনি অসুবিধা হবে যে 'হিয়া দগদিগি' তো কিছুই নয়, 'দিন রাতিয়া' কাটানোই দুঃসাধ্য হবে। এই জামার বোতাম নেই, সার্টের কলার ময়লা, জুতোর ফিতে কাল বাঁধতে ছিঁড়ে গেছে,—কাছাকাছি কোন ফিতেও নেই! খাওয়ার পরে পাণ নেই,—থাকলেও তাতে তোমার পছন্দ মত মসলা নেই। পাণ না খাও তো মসলাতে দেখ্‌বে লঙ্কার বিচি মেথি মিসানো। কত কি! শরৎ কালের রাত্রে পরিষ্কার চাদরখানি বিছানায় পাবে না, শীতের সময় নরম বালাপোষখানি দেখবে খুঁজে পাবে না, বসন্তকালে মশারী ময়লা,'—

অজিতের পুরোনো তর্ক মনে পড়ে গেল, মৃদু ভাবে বল্লে,—তা হলে মান্‌ছ তো ঐ স্বাচ্ছন্দ্যের অভ্যেসই সব তো?

'আহা ওই একই কথা। কিন্তু অস্বচ্ছন্দ অনভ্যেস প্রেমতত্ত্ব চর্চ্চার কম্‌লিই কোন্‌ তোমাকে ছাড়্‌ছে!—অর্থাৎ আমার থিয়োরী হচ্ছে—বিষে বিষক্ষয়। অভ্যেস দিয়ে অনভ্যস্ত প্রেমতত্ত্ব চর্চ্চার নেশার কাঁটা তুলে একটু বাস্তব জগতে ফেরো।'

অজিত রাগ করে,—কিন্তু নিরুপায় ভাবে হাসি পায়,—বলে, 'তাহলে এবারে রাম শ্যাম যদু হরির মতন ঐ তোমাদের মতে বিয়ে করা বৌ, হুঁকো, খুকি, আরাম ব্যারাম এক করে দিন যাত্রা আরম্ভ করি।

সরিৎ অট্টহাস্যে বল্লে, 'অতটা নয়।—তবে তুমিই বলো কি কর্‌বে? লয়লা মজনু হবে, না বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মতন কবিতা লিখ্‌বে?'

অজিতের মনের আকাশে চকিতে সুপ্রিয়ার সাবিত্রী পাহাড়ে দেখা সিঁদুর টীপ-পরা সলজ্জ সঙ্কুচিত মুখখানি ভেসে উঠ্‌ল।—কিন্তু—আর তর্ক কেউ কর্‌লে না সরিতেরও মনে দুঃখ হচ্ছিল।

যথারীতি শুভকর্ম্মের দিন এগিয়ে এলো এবং যথোচিত সমারোহে উভয় পক্ষে আদান-প্রদান চলতে লাগল্‌।

বিয়ের জিনিষ-পত্র দেখে সকলেই প্রংশসা করলে।—এমনকি অজিতের বন্ধুরাও।

বরসভায় কে একজন বন্ধু বল্লে,—'না, অজিত তোমার ঠকা হয় নি, সবরকমেই—ভালই পেয়েছ!

নিশীথ চুপচাপ, বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। সে একটু হাসলে, বল্লে, 'না; ঠকা হয় নি বটে!'—

অজিতের দিকে চোখ পড়্‌ল। তার দৃষ্টিতে অজিতের যেন মনে হল, না ঠকা হয় নি, কিন্তু ঠকানো হয়েছে।

ক্রমশঃ

প্রফুল্ল-জয়ন্তী

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৫শে অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা টাউন হলে জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উৎসব-সভার সভাপতি ছিলেন বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রফুল্ল জয়ন্তী সমিতির অভিভাষণ পাঠ করেন মাননীয় শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার। তৎপর নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আচার্য্যকে অভিনন্দন ও উপঢৌকন প্রদান করা হয়। আজ আমরাও সমগ্র দেশবাসীর সহিত বাংলার গৌরব আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতেছি। প্রফুল্লচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা ও কর্ম্মধারা বাঙালীকে মানুষ করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। তাঁহার দান বাঙালীর জীবনে বহু বর্ষ সক্রিয় রহিবে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আচার্য্যদেবকে যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল :

"আমরা দুজনে সহযাত্রী।

কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁচেছি, কর্ম্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন,—কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে ছাত্র নিজেকেই পেয়েছে।

বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেচেন তার গুহানিহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানবান-তপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান্ করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্ম-বিসর্জ্জনের ইচ্ছা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করিলে এ কখনও সম্ভব হোত না। এই যে আত্মদান-মূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্য্যের এ শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ্। আচার্য্য নিজের জয়-কীর্ত্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়—প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

প্রথম বয়সে তাঁর প্রতিভা বিশ্ববিতানে মুকুলিত হয়েছিল; আজ তাঁর সেই প্রতিভার প্রফুল্লতা নানা দল বিকাশ করে দেশের হৃদয়ের মধ্যে উদ্ঘাটিত হলো। সেই লোককান্ত প্রতিভা আজ অর্ঘ্যরূপে ভারতের বেদীমূলে নিবেদিত। ভারতবর্ষ তাঁকে গ্রহণ করেছেন, সে তাঁর কণ্ঠমালায় ভূষণরূপে নিত্য হয়ে রইল। ভারতের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে আজ আমাদের সাধুবাদ মিলিত হয়ে তাঁর মাহাত্ম্য উদ্‌ঘোষণ করুক।"

জাপানী মেয়েদের সামরিক শিক্ষা

টোকিও সহর হইতে গত ১১ই নবেম্বরের একটি সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে:

"জাতীয়তার তরঙ্গ ও উহার আনুষঙ্গিক সামরিকতা জাপানী মেয়েদের অঙ্গেও আঘাত দিয়াছে। টোকিওর একখানি শ্রেষ্ঠ দৈনিকে প্রকাশ, ৬১টী বালিকা-উচ্চবিদ্যালয়ের ৩৫,০০০ হাজার ছাত্রীকে সামরিক শিক্ষা দিবার প্রস্তাব উক্ত শিক্ষালয়সমূহের অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইতেছে। যাহাতে প্রয়োজন হইলে মেয়েরাও দেশরক্ষার জন্য দাঁড়াইতে পারে, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা।

এই নিমিত্ত সমর-বিভাগ হইতে বিদ্যালয়সমূহ গ্যাস্-মুখোস, পিস্তল, রাইফেল ইত্যাদি ক্রয় করিবে। সমরবিভাগের অফিসারগণ মেয়েদিগকে শিক্ষাদান করিবে। সমর বিভাগের সহিত এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এবং আশা আছে শীঘ্রই এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে।"

মেয়েদিগকে যুদ্ধাদি কার্য্যে নিযুক্ত করা যদিও অনেকেরই মতবিরুদ্ধ, তথাপি আত্মরক্ষার্থে সামরিক শিক্ষায় সমর্থ হওয়া ছেলেদের মত মেয়েদের সকলেরই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাতে শারীর-চর্চ্চার দিক্‌টাও অবহেলার নয়। দুঃখের বিষয়, জাপানী মেয়েরা যাহা পারে, আমরা তাহা পারি না। ন্যায্য যাহা, সত্য যাহা, করণীয় যাহা তাহা জানিয়া বুঝিয়া মুখ বুজিয়াই থাকিতে হয়।

কলিকাতায় মেয়েদের পার্ক

প্রায় সহস্রাধিক মহিলার স্বাক্ষরিত একটি মানপত্র কলিকাতার পুরপতির নিকট প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতায় বিশেষভাবে মেয়েদের ও শিশুদের মুক্তবায়ুতে বেড়াইবার ও খেলা-ধূলা করিবার নিমিত্ত আটটি পার্ক পৃথক্ করিয়া দিবার জন্য উহা কর্পোরেশনকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে উহাতে যে কয়টি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। উহাতে লিখিত হইয়াছে:

"মুক্তবায়ু ও শরীর-চর্চ্চার অভাব বিশেষভাবে সহরের লোকবহুল অংশের মেয়েরা খুবই অনুভব করেন। ইহা সকলেরই জানা কথা যে মেয়েদের এবং শিশুদের মধ্যে যে সকল রোগ বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগের বৃদ্ধির কারণ আমাদের দিবারাত্রি অস্বাস্থ্যকর গৃহের মধ্যে অবস্থিতি। মেয়েদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা এখনও বিদূরিত হয় নাই, কাজেই পুরুষদিগকেই মেয়েদের জন্য মুক্তবায়ু ও ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রশস্ত প্রাঙ্গণের ব্যবস্থা করিয়া এ বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। আমাদের ভবিষ্য নাগরিকেরা যাহাতে জাতির যথার্থ সম্পদ্‌স্বরূপ হয় সেজন্য আমরা স্বাস্থ্যবান্ শিশু চাই।"

কলিকাতার মত জনবহুল সহরে আমাদের মেয়েদের এই অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতি প্রত্যেক দায়িত্বশীল নাগরিকের বহু পূর্ব্বেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে

এবং পুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ নাগরিক তৈরী করিতে হইলে মায়েদের কথাটিই আগে ভাবা উচিত। আশা করি, কলিকাতার পুরসভা এ বিষয়ে অবিলম্বে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

ছোট সহরগুলিতেও এইরূপ ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় এবং কোন কোন স্থলে একান্ত আবশ্যকীয় হইয়াও দাঁড়াইয়াছে। এই ঢাকা সহরের কথাই ধরা যাক্। সহরের মধ্য ভাগে এইরূপে এইটি মেয়েদের পার্ক একান্ত আবশ্যক। কয়েক বছর পূর্ব্বে দীপালি-সঙ্ঘ এজন্য স্থানীয় মিউনিসিপালিটির নিকট এক মানপত্র দিয়াছিল। কিন্তু তাহা কার্য্যতঃ এযাবত কিছুই হয় নাই। সত্যই মনে হয়, এদেশে জাতীয় কল্যাণ-প্রয়াসী দায়িত্বশীল পুরসভা প্রতিষ্ঠিত হইবার যথেষ্ট বিঘ্ন আছে। আমেরিকার মত দেশে প্রতি ১০০ জন লোকের জন্য ১ একর জমি হিসাবে ক্রীড়া-উদ্যানের ব্যবস্থা আছে। এমন কি পাঁচ হাজার অধিবাসীও যে সহরের আছে, তথায়ও পার্ক আছে। নাগরিক সভ্যতার প্রসারতার সঙ্গে আমাদের দেশেও কি এদিকে লোকের দৃষ্টি এখনও পড়িবে না ?

সর্দ্দা আইনের মর্য্যাদা-রক্ষা লঙ্ঘনেই পালনে নয়

বাল্য-বিবাহ-নিরোধ-আইনের প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত হরবিলাস শর্দ্দা সেদিন বড় আক্ষেপে বলিয়াছিলেন, 'দেখিতেছি সর্দ্দা আইন ভঙ্গ করিয়াই ইহার মর্য্যাদা রক্ষা হইতেছে, পালন করিয়া নহে।' (I see that the Sarda Act is honoured more in its breach than in its observance)। এ অভিজ্ঞতা বোধ হয় দেশের সকলেরই হইয়াছে। কাজেই আইন করিয়া এই প্রহসন করা কেন এবং ইহার সার্থকতাই বা কি ? আমরা যতদূর সংবাদ রাখি, অতি সামান্য কয়েকটি মামলা এই আইনের জন্য উপস্থাপিত হইয়াছে, অথচ ইহার অমান্যকারীর সংখ্যার হিসাব গণনার বাইরে। প্রতিনিয়তই আমাদের আশে-পাশে এই আইন অমান্য হইতেছে প্রকাশ্যে এবং সদম্ভে। কর্ত্তৃপক্ষের সামান্য একটু দৃষ্টি এদিকে থাকিলেই এ সব অনাচার আর অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে সরকার এখনও অবহিত হইবেন কি ?

দেওলী ও বহরমপুর

বন্দীনিবাসগুলির খবর পাওয়া আজিকার দিনে দুষ্কর এবং প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ মাঝে মাঝে কোন গোলযোগ উপলক্ষ্য করিয়া যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি সরকার পক্ষ থেকে জানা যায়, তাহাতে যথার্থ অবস্থা ত জানা হয়ই না, অধিকন্তু মন অনিশ্চিত সংশয় ও আশঙ্কায় ভরিয়া উঠে। এজন্য সবচেয়ে বেশী আঘাত পান বাংলাদেশের দুঃখিনী মায়েরা। এঁদের এই মানসিক নির্য্যাতন অনেকখানি কমিয়া যায় যদি সরকার পক্ষ মাঝে মাঝে বে-সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া এই সব বন্দীনিবাসগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন এবং যদি তাঁহারা মাঝে মাঝে এই সকল বন্দীদের অবস্থা দেশবাসীকে পরিজ্ঞাত করান। মানুষের প্রতি মানুষের যেটুকু কর্ত্তব্য ও ব্যবহার আমরা শুধু তাহাই আশা করি এবং বিশ্বাস হয় কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টই এই সাধারণ কর্ত্তব্য হইতে নিজেকে

অবনত করিবেন না। এই কিছুদিন পূর্ব্বেকার দেওলী ও বহরমপুর বন্দীবাসের গোলযোগ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট এইরূপ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া দেশবাসীকে যথার্থ ঘটনা পরিজ্ঞাত করিবেন কি? অন্ততঃ তাহা হইলে বাংলাদেশের চিন্তাক্লিষ্ট জননীরা একটু সোয়াস্তি পাইতে পারেন।

একনিষ্ঠ দেশকর্ম্মী ললিতমোহন দাশ

বিগত ১১ই পৌষ একনিষ্ঠ দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাশ মহাশয় পরলোক গমন করেন। এই ধর্ম্মপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান সরল ও প্রবীণ স্বদেশ-নায়কের মৃত্যুতে স্বাধীনতা-আন্দোলন একজন অকৃত্রিম বান্ধব হারাইল। যিনি যৌবনকালে স্বদেশী আন্দোলনে অশ্বিনীকুমার ও সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কংগ্রেস আন্দোলনে সকল দলাদলির ঊর্দ্ধে থাকিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যাঁহার নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মভীরু চরিত্র ও সরল জীবন সত্যই আদর্শস্থানীয় ছিল, আজ তাঁহার অভাব দেশবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিবে। রাজনীতিকে যাঁহারা ব্যবহারিক জগতের পঙ্কিলতা থেকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছেন মানবাত্মার প্রগতি-পথের সাধনরূপে, ললিতমোহন ছিলেন তাঁহাদেরই একজন। এঁদের সগোত্র আজিকার পৃথিবীতে ক্রমশঃই বিরল হইয়া আসিতেছে। তাই ললিতমোহনের মৃত্যু আমাদের জাতীয় জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি।

ছেলেদের কলেজে মহিলা-অধ্যাপক

কলিকাতা স্কটিশচার্চ্চেস কলেজের অধ্যক্ষ ক্যামেরন সাহেব কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবসে সহর্ষে বলিয়াছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যের নব-নিযুক্ত অধ্যাপক মিস্ লোগান সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম মহিলা যিনি এদেশের ছেলেদের কলেজে অধ্যাপনায় ব্রতী হইয়াছেন।

মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় মিস্ লোগান নামক মহিলা অধ্যাপক নিয়োগের কথায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে আরও লিখিয়াছেন যে, নাগপুর মরিস্ কলেজেও একজন ভারতীয় মহিলা-অধ্যাপকের কথা তিনি জানেন। এবং বছর দুই পূর্ব্বে শান্তি-নিকেতনেও একজন মহিলা-অধ্যাপক ছেলে ও মেয়েদের মিলিত ক্লাশে অধ্যাপনা করিতেন। কাজেই মিস্ লোগানই ছেলেদের কলেজে এদেশে সর্ব্বপ্রথম মহিলা অধ্যাপক নহেন। আমরা এই নব-নিয়োগের আন্তরিক সমর্থন ও প্রশংসা করি। ইহাতে ছেলে ও মেয়েদের সংমিলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসারতা লাভ করিবে এবং উভয়ের সাবলীল ও স্বাভাবিক জীবন গঠনে সহায়তা করিবে। ইহাতে মেয়েদের কর্ম্ম ও চিন্তাধারার পরিধিও প্রশস্ততর করিয়া তুলিবে। বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দিন দিনই যেরূপ মেয়ে-শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি, অতি শীঘ্রই এই সকল প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক মহিলা অধ্যাপকও নিয়োজিত হইবেন। ইহাতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা

যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রসারতা পাইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। দেশের চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিতেছি।

পুণা চুক্তি ও বাংলা

বিগত ২৭শে পৌষ কলিকাতা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে সর্ব্ব-দল হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশনে পুণা চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

"সম্মেলনের অভিমত এই যে, বাঙ্গালার হিন্দুদের সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং বাঙ্গালার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান সঞ্চয় না করিয়া বা ঐ সম্বন্ধে কোন বিবেচনা না করিয়া যে পুণা চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টির দ্বারা এবং তাহার ফলে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়কে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিবে। মহাত্মা গান্ধী এই অমঙ্গলেরই বিরুদ্ধে তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন। সংরক্ষিত সদস্যপদের সংখ্যা বাংলা প্রদেশের প্রকৃত প্রয়োজনের অনুপাত বিরোধী। পুণাচুক্তি অনুযায়ী বাঙ্গালা সম্পর্কে ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিবার জন্য এই সম্মেলন প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করিতেছেন। এই প্রদেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চুক্তি সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য এই সম্মেলন মহাত্মা গান্ধী ও পুণা চুক্তির স্বাক্ষরকারিগণকে অনুরোধ করিতেছেন।"

এই সভায় সার বিপিনবিহারী ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাটি প্রণিধানযোগ্য। পুণা চুক্তি যখন হয় তখন বাংলার কোন মত লওয়া হয় নাই এবং কোন বাঙালী প্রতিনিধি তথায় নিমন্ত্রিত হন নাই। শুধু মহাত্মাকে বাঁচাইবার উৎকণ্ঠায়ই একটা ব্যবস্থা অতি দ্রুত করা হইয়াছিল। বাঙালীর ভাগ্য নির্ণয় করিবে অবাঙালীরা যাহারা এদেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অজ্ঞ, ইহা যেমন অযৌক্তিক তেমনি অমর্য্যাদাকর। বাঙালীর আজ এম্নি শোচনীয় অবস্থাই বটে। যাহা হোক্, বাংলাদেশে যেহেতু অস্পৃশ্যতার কঠোরতা ও তীব্রতা অন্য প্রদেশের ন্যায় বিদ্যমান নাই, বিশেষতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহার কোন প্রতিবন্ধকই নাই, সেইজন্যই পুণাচুক্তি এদেশে একেবারেই অপ্রযোজ্য। যদিও আমরা মূলতঃ গোলটেবিলের ব্যবস্থা-বিধি ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ঘোর বিরোধী একথা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি, তথাপি সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা পুণাচুক্তির প্রতিবাদ করি ও বাংলার হিন্দুসাধারণের এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

ইঙ্গ-পারশিক তৈল-বিরোধ

ইঙ্গ-পারশিক তৈল কোম্পানীর সহিত বিরোধ চলিতেছে পারশ্য সরকারের। ইহা শুধু ব্যবসায়গত বিরোধ নয়, ইহাতে জড়িত আছে ইংরেজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি। ব্যাপারটি মোটেই ঘরোয়া নয়, এবং একটা আন্তর্জাতিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইবার ইহার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। ইঙ্গ-পারশিক গোলযোগের ইতিবৃত্তটি এই ঃ

"১৯০১ সালে পারস্যের তদানীন্তন শাহের নিকট হইতে মিঃ ডি আরি নামক জনৈক ইংরাজ মাত্র বিশ হাজার পাউণ্ড দিয়া উত্তরের পাঁচটি প্রদেশ বাদে সমস্ত পারস্যের যাবতীয় তেলের খনির একচেটিয়া ব্যবসা করিবার সুবিধা লাভ করেন। সে সময় কাজ্জার বংশীয় জনৈক ক্রীড়াপুত্তলি

শাহ পারস্যের স্বেচ্ছাতন্ত্রী নরপতি ছিলেন এবং বাণিজ্যজগতে তখন ইংরাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। মিঃ ডি আরির নিকট হইতে বর্ত্তমান ইঙ্গ-পারসিক তৈল-কোম্পানী এই সর্ত্তে উক্ত বাণিজ্যের অধিকার গ্রহণ করে যে, তাহারা পারস্য-রাজকে মোট লাভের শতকরা ষোলো পাউণ্ড করিয়া রয়াল্‌টি দিবে। তারপর পারস্যে রাজতন্ত্রের অবসান হইয়া প্রজাতন্ত্রের পত্তন হইয়াছে। এবং (বিলাতের "মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান" পত্রের ৭ই ডিসেম্বরের রিপোর্ট অনুযায়ী) যদিও ১৯০৫ সাল হইতেই ব্যবসায়ে লাভ আরম্ভ হয় তথাপি কোম্পানী সর্ব্বপ্রথম ১৯১৪ সালে মাত্র ৯ হাজার পাউণ্ড রয়ালটি দেয় এবং তারপর পর হইতে মহাযুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত আর একটি পয়সাও দেয় নাই। অবশ্য পেট্রল বিক্রি ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছিল এবং ১৯১৪ সালে যে কোম্পানীর মূলধন ছিল ২০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৩০ সালে তাহার মূলধন দাঁড়ায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। এদিকে লাভের পরিমাণ ক্রমেই কম করিয়া দেখানো হইতে লাগিল এবং কোম্পানী বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের এক-তৃতীয়াংশ রয়াল্‌টি দিবার আবদার ধরিল। গোলযোগের ইহাই সূত্রপাত।" [নবশক্তি]

এই সম্পর্কে মস্কোর সুবিখ্যাত দৈনিক ইস্‌ভেস্‌টিয়া (Isvestia) যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। উহাতে লিখিত হইয়াছে ঃ

"ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক যে এই সমস্যার সমাধান বৈধ আইনের উপর নির্ভর করে না, করে রাষ্ট্রীয় শক্তির সম্পর্কের উপর। পারস্য সরকার যে এই ব্যাপারে শুধু একটি তৈল-কোম্পানীর বিরুদ্ধতা মাত্র পাইবেন তাহা নহে, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে, কাজেই ডি আরি চুক্তি নাকচ করিবার সিদ্ধান্ত সত্যই অত্যন্ত সাহসের পরিচায়ক। পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুরবস্থায় ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন আধিপত্য লোপ পাওয়াতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। জগৎব্যাপী ইংরেজের যে বিশাল সৌধে ভাঙন ধরিয়াছে, প্রাচ্যের এই ব্যাপারে তাহা আরও জীর্ণ হইয়া পড়িবে।"

এই ব্যাপারে আরও একটা ভাবিবার কথা এই যে, রুশিয়ার বন্ধুত্ব এ বিষয়ে পারস্যকে অনেকখানি শক্তি দিয়াছে। গণতান্ত্রিক পারস্য নিজেকে কিছুতেই আর শোষিত হইতে দিবে না, ইহা ন্যায্য এবং স্বাভাবিক।

মন্দির প্রবেশ

গুরুবায়ূর মন্দির প্রবেশ লইয়া সমগ্রদেশে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। মহাত্মা স্বয়ং এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় মন্দির-প্রবেশ-আইন-বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য বড়লাটের অনুমোদনের প্রতীক্ষায় সকলেই উদগ্রীব। ওদিকে জামোরিনের বিরুদ্ধতা ও গোঁড়া সনাতনী হিন্দুদের প্রবলতা দিন দিনই বাড়িতেছে। সমগ্র জাতির দৃষ্টি ও শক্তি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এই আন্দোলনে।

এই সম্পর্কে একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। তাহা জাতীয় আন্দোলন হইতে জাতির দৃষ্টি ও কর্ম্মিষ্ঠতা অপসারিত করিয়া উক্ত আন্দোলনকে দুর্ব্বল ও পঙ্গু করিয়া দেওয়া। ইহার

জন্য দায়ী অবশ্য মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। আমাদের মনে হয়, জাতীয় আন্দোলনের এই পড়ন্ত অবস্থায় মহাত্মার এই পথচ্যুতি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছে। বাস্তবিক যদি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ব্যতীতও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গতি অব্যাহত থাকে এবং উহাতে প্রতিহত না হয় (অবশ্য বাংলা দেশে আমাদের এ বিষয়ে দাক্ষিণাত্যের অস্পৃশ্যতার কঠোরতা সম্বন্ধে ধারণা নাই বলিলেই চলে) তাহা হইলে এজন্য জাতির এই শক্তিক্ষয় অত্যন্ত ভুলেরই হইতেছে বলিতে হইবে। শাসন-ক্ষমতা হাতে আসিলে এই সকল প্রথা দূর করা কলমের একটি খোঁচাই যথেষ্ট হইবে, সেজন্য এই প্রাণান্তকর প্রয়াস শুধু অনাবশ্যক নয়, মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। এ বিষয়ে তুরস্কের নজিরই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। তুরস্কে নব্য শাসকের বিধানে সামাজিক ও ধর্ম্মীয় বিধি-ব্যবস্থা এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত একেবারে রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি, দেশবাসী আমাদের এই উক্তি বিশেষ চিন্তাশীলতার সহিতই গ্রহণ করিবেন।

ডি ভ্যালেরা ও আয়র্লণ্ডের নব-নির্ব্বাচন

গত ৩রা জানুয়ারী ডি ভ্যালেরা 'ডেইল' (আইরিশ পার্লামেণ্ট) ভাঙিয়া দিয়াছেন। ২৫শে জানুয়ারী আবার নব নির্ব্বাচন হইবে। সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আজ এই বীরোচিত স্বাদেশিকের কার্য্য ও সাফল্যের উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে।

ডি ভ্যালেরা কেন ডেইল ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের শক্তি পরীক্ষায় নামিলেন, সেই বিষয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। আয়র্লণ্ডের কৃষক-কুলের আর্থিক অবস্থা, ইংলণ্ডের সহিত আইরিশ সম্পর্কের পূর্ণ-বিচ্ছেদ, আনুগত্য শপথ ত্যাগ, শ্রমিকদের মনোবাদ ইত্যাদি নানা কথাই এই সম্পর্কে উত্থিত হইয়াছে। ডি ভ্যালেরা নিজে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান গণতন্ত্রী শাসকবৃন্দ দেশের আস্থা যথার্থই হারাইয়াছেন কিনা তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য এই নবনির্ব্বাচন আহ্বান করা হইয়াছে ডি ভ্যালেরার দলের বিরুদ্ধে উক্তরূপ অভিযোগ নাকি অনেকেই করিতেছিলেন। ইহাতে আরও একটি সুবিধা হইবে। কস্‌গ্রেভের দলের বিরুদ্ধতা এ পর্য্যন্ত ডি ভ্যালেরাকে যথেষ্ট পাইতে হইয়াছে। এক্ষণে যদি ডি ভ্যালেরার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া ডেইলে প্রবেশ করিতে পারেন তবে তিনি নির্ব্বিবাদে জাতীয় কল্যাণ সাধন করিবার সুযোগ পাইবেন। ডি ভ্যালেরাকে বিজয়ী দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় রহিলাম।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

কলিকাতায় ১১নং ওয়ার্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব কর্পোরেশনে গৃহীত হইয়াছে এবং বঙ্গীয় সরকারও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে, ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় মহারাজ মাণিক্যবাহাদুরের আদেশে মাঘের প্রথম হইতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে। এজন্য শিক্ষা-পরিষদ্ সংগঠিত হইয়াছে। আমরা এই সকল প্রচেষ্টার সাধুবাদ ও ভূয়সী প্রশংসা করি। এবিষয়ে চট্টগ্রামই বাংলাদেশে

অগ্রণী। আশা করি, দেশের অন্যান্য স্থানেও এই সদ্দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইবে। ঢাকার দীপালি-সঙ্ঘের উদ্যোগে মেয়েদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে, এবছর থেকে তাহা বহু-ব্যাপক হইয়া সফলতা লাভ করুক সহরবাসীর সকলের সহায়তার, এই কামনা করি। সহরের হতভাগ্য মেয়েগুলিকে একটু লেখাপড়া শিখাইতে পারিলে বেচারাদের জীবনগুলি হয়ত সামান্য সার্থকতার পথও পাইত। নাগরিকদের দৃষ্টি এ বিষয়ে পড়িবে না কি?

বিবদমান চীন ও জাপান

চীন ও জাপানের বিবাদ চলিয়াছে অনেকদিন যাবত। জাতিসঙ্ঘ হইতে লিটন কমিটির রিপোর্টও কোন মীমাংসা করিতে পারিল না। আবার জাপানীদের গোলাবর্ষণ শুরু হইয়াছে চীনাদের উপর। জাপানীরাই বা করিবে কি? তাহাদের লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, জায়গায় সংকুলান হয় না, শিল্প ও বাণিজ্যের বাজারও চাই, চীনের মাঞ্চুকু তাহার নইলেই নয়। চীন কাতরকণ্ঠে আবেদন জানাইতেছে জাতিসঙ্ঘের নিকট ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য। ওদিকে জাপানীরা জাতিসংঘকে হুম্‌কী দেখাইয়াছে এই বলিয়া যে, তাহাদের জনসাধারণের অনিচ্ছা দেখা যাইতেছে জাতিসংঘের মধ্যে থাকিতে। কাজেই জাতিসংঘ পড়িয়াছে বিষম মুস্কিলে। সাম্রাজ্যবাদী ও শক্তিশালী জাপানের বিরুদ্ধতা করার সামর্থ্য জাতিসংঘের নাই, কারণ উহারও পৃষ্ঠপোষকগণ মদগর্ব্বিত জগৎবিখ্যাত সাম্রাজ্যবাদীর দল। এই ঘটনায় জাতি-সংঘের মুখোস খসিয়া পড়িবেই যদি না প্রাচ্যখণ্ডের এই বিবাদ তাহারা মিটাইতে পারে। আমরা ঘটনার দ্রুত পরিবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

নিখিল ভারত নারী-সম্মেলন

গত ৩১শে ডিসেম্বর নিখিলভারত নারী-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন লক্ষ্ণৌসহরে সমাপ্ত হইয়াছে। এবারকার অধিবেশনে অন্যান্য বহু প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উল্লেখযোগ্য—বিবাহ-বিচ্ছেদ, জন্ম-শাসন, সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সম্পত্তি চাকুরী ও বেতনে নারীদের পুরুষের সম-অধিকার ইত্যাদি।

ডাঃ মথুলক্ষ্মী রেড্ডী জন্ম-শাসন বিষয়ক প্রস্তাব উপলক্ষে প্রতিনিধিদিগকে সোৎসাহে বলিয়াছিলেন, 'অন্ততঃ দরিদ্র পিতামাতাকে যাহাতে সন্তানের গুরুভার বোঝা বহন করিতে না হয় সেদিক দিয়াও এ প্রস্তাব অনুমোদন করা বাঞ্ছনীয়।' অথচ দরিদ্রের ঘরেই সন্তানের আগমন হয় বেশী এবং জন্মশাসন দ্বারা এ যাবত সন্তান-নিরোধ করিয়া আসিয়াছেন শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ই। ইহাতে মানবজাতি দুর্গতি বা প্রগতি কোন্ পথে যাইবে কে জানে? এ বিষয়ে জয়শ্রীর পূর্ব্ববতন প্রবন্ধগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

পুরুষের সঙ্গে নারীর তুল্য উত্তরাধিকার বিষয়ক প্রস্তাব রাণী লক্ষ্মীবাই রাজওয়াদে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, বিবাহে যৌতুকের মালিক হইবে নারী এবং

"স্ত্রীধনের" জন্য তাহাদের অভিযোগ করিবার অধিকার রহিবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নারীর উত্তরাধিকার বিল গৃহীত হইতে পারে নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে মহীশূরের আইনের প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে বরদা রাজ্যের আইনের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। উক্ত রাজ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে এই আইন পাশ হইয়াছে।

আগামী বর্ষের জন্য ডাঃ মুথলক্ষ্মী রেড্ডি সভানেত্রী ও রাণী লক্ষ্মীবাই সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। অন্যান্য সভ্য ও সম্পাদিকাও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

এই একটি প্রতিষ্ঠানই এদেশের নারীদের সংহত করিবার এবং তাহাদের কথা দেশে এবং বিদেশে জানাইবার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু ইহা বিশেষ ভাবে দক্ষিণ-ভারতীয় মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। ইহার স্থাপনাবধি মিসেস্ কাজিন্‌স্ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি য়ুরোপে যাইয়া আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও ভারতের জন্য যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি যথার্থ ভারতীয় করিতে হইলে ইহাতে সকল প্রদেশের নারীদের যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ ইহার কর্ম্মী বা কমিটির মধ্যে একজনও বাঙালী মহিলার নাম নাই। তাহাদেরও ইহাতে যোগদান সম্পূর্ণ ভাবে করা আবশ্যক। তাহা হইলে এই আন্দোলনকে সকল ও সার্থক করা সম্ভব। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে উদ্ধার না করিলে ইহা ও জাতির সকলের হৃদয়ে আসন পাইবে না। আশা করি, বাংলার নারীরা এ বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের ভগিনীদের চেয়ে বেশী প্রাগ্রসর ও উদ্যোগীই হইবেন।

আলোয়ারে কাশ্মীরের পুনরভিনয়

কাশ্মীরের ন্যায় আলোয়ারেও মুশলমান প্রজারই সংখ্যাধিক্য এবং তাহাদের ন্যায্য বা অন্যায্য অভিযোগের ওজুহাত লইয়া এই গোলযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে মিওগণ বহু-মন্দির অপবিত্র করিয়াছে, হিন্দুদের বাড়ীঘর লুঠ করিয়াছে এবং খুন গৃহদাহ অবাধে করিয়াছে। ইহার ইন্ধন যোগাইয়াছে বাহিরের লোক যাহারা কাশ্মীরের গোলযোগের মূলে ছিল, একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। আলোয়ার দরবার যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতেও লিখিত আছে :

"রাজ্যের বাহিরের আন্দোলনের জন্য মহারাজার গবর্ণমেণ্ট দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। গত কয়েক মাস ধরিয়া মিওগণের ভিতর গণ্ডগোল করিবার জন্য ফিরোজপুর জির্গাই দায়ী। জির্গা সম্মেলনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পেন্সনপ্রাপ্ত খানবাহাদুর রহিমবক্স সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে স্থির করা হইয়াছিল যে সোজাসুজি ভাবে কোন প্রতিবিধান করা হইবে না। মিও আন্দোলন প্রধানতঃ মহারাজার রাজ্যের বাহিরেই ইন্ধন প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।"

বর্ত্তমানে যে খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে গোলযোগের উপশম হইতেছে মনে হয়। ইহা আশার কথা। এই সকল গোলযোগ বিরক্তিকর ও হাস্যাস্পদ হইলেও হিন্দুদের ইহা ভাবিবার বিষয়। শুধু তাই নয়, জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণ, ও প্রগতি-প্রয়াসী প্রত্যেক ভারতবাসীরই

চিন্তার বিষয় ইহাতে আছে। গোলযোগের মূলে যে শক্তি সক্রিয় উহার মতলব অতি স্পষ্ট ও নিতান্তই সাধারণ। তাহাদিগের সতর্কিত ও অবহিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহার মূলোচ্ছেদ করা কোন প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের পক্ষে আদৌ কষ্টকর নয় যদি সেই সদভিপ্রায় তাহাদের থাকে। ভারত-গবর্ণমেণ্টকে এজন্য দোষ দিয়া লাভ নাই, কারণ তাহাদের স্বার্থ ও শাসিত উপদ্রুতদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন নয়। আলোয়ারের হিন্দুনিপীড়িতদের জন্য অবিলম্বে দেশবাসীর সাহায্য-হস্ত প্রসারিত হোক্।

গোলটেবিল বৈঠক

বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সভ্যগণ একে একে দেশে ফিরিয়াছেন ও নিজ নিজ ভাবে বিবৃতি প্রদান করিতেছেন। কেহ আশায় উৎফুল্ল হইয়া ভারতবর্ষ যে কিরূপ লাভবান হইবে তাহাই জানাইতেছেন, আবার কেহ কেহ নিরাশার বাণী শোনাইতেছেন। তাঁহাদের কাজ শেষ হইয়াছে, এখন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিবেন। প্রকাশ ২০শে জানুয়ারী পার্লিয়ামেণ্টরী হোয়াইট্ পেপার প্রকাশিত হইবে। তাঁহারা ভারতবর্ষকে কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বাধীনতা দান করিবেন তাহা জানাইবেন। যাঁহারা গোলটেবিল বৈঠকের সম্বন্ধে আস্থাবান তাঁহারা ২০শে তারিখ পর্য্যন্ত দোদুল্যবান্ অবস্থায় থাকিবেন। সময় সঙ্কীর্ণ বলিয়া বড়লাটের সহিত ভারত-সচিবের সর্ব্বদা পরামর্শ করা প্রয়োজন বলিয়া বড়লাট কলিকাতার টুর প্রগ্রেম কাটছাঁট করিয়া ত্রস্ততার সহিত নয়া দিল্লী যাইতেছেন। দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষে এমন একটা শান্ত অবস্থা চান, যাহাতে এই নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষে লোকমত অনুকূল হয়। আমরা গোলটেবিলে আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আস্থাবান্ নহি। কাজে কাজেই ইহার ফলাফল সম্বন্ধে কোনই ঔৎসুক্যও নাই।

কারাগারে বিবাহ

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রীযুক্ত যুগলকারের সহিত শ্রীমতী অম্বুকেশব বেহরীর বিবাহ মিরাট জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে জেলে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কারাগারে বিবাহ বোধ হয় আমাদের দেশে এই প্রথম। শুনিয়াছি আয়র্লণ্ডে ম্যাকসুইনীর বিবাহও জেলেই সম্পন্ন হইয়াছিল। রাশিয়ার পূর্ব্বতন সমর-সচিব ট্রট্স্কির বিবাহও জেলে হইয়াছিল। রাশিয়ার স্বাদেশিকদের জীবনে এরূপ ঘটনা বহু দেখা গিয়াছে। এখন ক্রিমিন্যাল ল্ব আমেন্‌মেণ্টের প্রভাব যেভাবে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কারাগারই লোকের বাসগৃহে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কাজে কাজেই জন্ম মৃত্যু বিবাহ আস্তে আস্তে সবই কারাগারেই হইবে।

আরমানীটোলা বালিকা বিদ্যালয়

ঢাকা সহরের আরমানীটোলায় বহু অবস্থাপন্ন ভদ্র লোকের বাস। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে মেয়েদের একটা কলেজ পর্য্যন্ত স্থাপন করিতে পারেন। আজকাল ভদ্র ঘরে আর্থিক

অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মেয়েদের স্কুলে ২৷৷০ টাকা করিয়া বাস ভাড়া দেওয়া প্রকৃতই কষ্টকর; এই স্কুল হওয়ায় ইহার চতুষ্পার্শবর্ত্তী মেয়েরা হাঁটিয়া আসিয়া পড়িতে পারিবে। অনেককে বাধ্য হইয়া শুধু বাসভাড়ার জন্যই মেয়েকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইতে হয়। স্কুলটা এই সময় স্থাপিত হওয়া খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। কারণ ইডেন ফিমেল স্কুল ও কলেজ বিভাগে ছাত্রীদের বেতন বাড়াইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ হইতে হুকুম আসিয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে যেরূপ আর্থিক সঙ্কটাবস্থা চলিতেছে, তাহাতে কোথায় স্কুল-কলেজে বেতন কমাইয়া শিক্ষার ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা হওয়া উচিত, তাহা না হইয়া আরও বৃদ্ধি করার কথা কর্ত্তৃপক্ষ কেমন করিয়া মনে করিলেন ইহাই আশ্চর্য্য। আমাদের মনে হয়, ঢাকার সমস্ত ছাত্র ও ছাত্রীদের অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য, বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বেতন কমাইবার জন্য সমবেত চেষ্টা করা।

দীপালি প্রদর্শনী

দৈনিক সংবাদ-পত্রে দীপালি প্রদর্শনী পুনরায় হইতে পারে এইরূপ বিজ্ঞপ্তি ও আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা এই: দীপালির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা ঊষারাণী রায়ের সঙ্গে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং উহার ফলে ম্যাজিষ্ট্রেটের নাকি ধারণা হইয়াছে যে দীপালির উদ্দেশ্য যথার্থতঃই মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা শিল্প ও কল্যাণ কর্ম্ম প্রচার। কাজেই আশা করা যায়, আবার হয়ত বা প্রদর্শনী খুলিবার অনুমতি পাওয়া যাইতেও পারে।

দীপালি মরে নাই, ইহা সুখের কথা। উহার শিখা আজও অনির্ব্বাণ রহিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ দীপালির বিরুদ্ধে যে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করিয়া পুনরায় প্রদর্শনীর অনুমতি দিলে তাহাও সুবুদ্ধির ও শুভবুদ্ধিরই পরিচায়ক হইবে। ইহাতে বিক্ষুব্ধ জনমতের নৈতিক সমর্থনও পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন। মিছামিছি এরূপ ভাবে লোকের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করা বিচক্ষণতারও কাজ নহে। বিশেষতঃ মেয়েদের শিক্ষা ও সামাজিক প্রগতির এই প্রতিষ্ঠানটির উপর খড়গহস্ত হওয়া মোটেই পৌরুষজনকও নয়।

প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন

এই সম্মেলনের দশম অধিবেশন গত পৌষ মাসে এলাহাবাদে হইয়া গিয়াছে। বিচারপতি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী। প্রত্যেক বিভাগেই যোগ্য ব্যক্তিগণ সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয় এবং তাঁহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়ও বটে। বাঙালীকে অবাঙালীর মধ্যে থাকিয়া বাঙালীত্ব রক্ষা করিয়া জাতীয়ত্ব পুষ্ট

করিতে হইলে এইরূপ একটি অবলম্বন ও আশ্রয় খুবই দরকার। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সৃষ্টি ও কার্য্য এইজন্যই জাতির পক্ষে পরম কল্যাণপ্রদ। এই নবসৃষ্টি বহির্বঙ্গে বাঙালীর কৃষ্টি ও সাধনার ভাব-বাহক। সে মর্য্যাদা যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে।

ঢাকা ইডেন স্কুলের অবাঙালী প্রিন্সিপ্যাল

ঢাকা ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ে কিছুকাল হইল একজন অবাঙালী মহিলা প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। এই বিষয় লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। বাংলা দেশে কি শিক্ষিতা যোগ্য মহিলা নাই? এদেশের মেয়েদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সহানুভূমি ও আন্তরিকতা থাকিলে শিক্ষা-মন্ত্রীর পক্ষে এরূপ অপ-নিয়োগ সম্ভব হইত না। আরও বক্তব্য এই, নূতন প্রিন্সিপালের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত শিক্ষালয়ের অস্বাভাবিক কঠোরতা ও নিত্যনূতন বিধিব্যবস্থায় মেয়েদের শিক্ষায় আতঙ্ক উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সহরবাসীর বহু অভিযোগ ও অসন্তোষ সর্ব্বদা কাণে আসিতেছে। সংবাদপত্রেও কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। সত্যই বাংলার মেয়েরা শুধু মন্দভাগ্য নয়, অভিশপ্তও বটে। যাহাদের শিক্ষার গতিধারা অতি ক্ষীণ ও সঙ্কীর্ণ, তাহাও যদি এইভাবে রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়, তবে পরিতাপের সীমা নাই।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন

গতমাসে কলিকাতায় এই সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে। এই সম্মেলনের বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিদের বক্তৃতাগুলিতে উদারতা ও স্বজাতির প্রতি সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার মুসলমান সমাজ মাতৃভাষার চর্চ্চায় উৎসাহী ও উদ্যোগী হইলে বাংলা সাহিত্য আরো শক্তিশালী ও প্রবলতর হইয়া দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই। আমরা মুসলমান সমাজের এই প্রচেষ্টার সাধুবাদ করিতেছি। এই উপলক্ষে মুসলমান মহিলাদেরও একটি সম্মেলন হইলে ভাল হয়। আমরা এ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও ভাল মুসলমান লেখিকার সাক্ষাৎ পাইলাম না। বাংলার মুস্লিম-নারীর প্রগতি-প্রচেষ্টায় মুস্লিম পুরুষগণ সাহায্য করিবেন না কি?

আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক বোধ করি। তাহা মুসলমান বালক-বালিকাদের পাঠ্যগ্রন্থের অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ভাষা। এ বিষয়ে মুসলমান সাহিত্যিকদের ও সাহিত্য-সম্মেলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই অস্বাভাবিকতা সৃষ্টিদ্বারা ছেলেমেয়েদের ভাষা শিক্ষার গতি ব্যাহতই হইতেছে, মনে হয়। সাহিত্য তাহার গতিপথ স্রোতোধারার ন্যায় আপনার সহজ বেগেই রেখাঙ্কিত করিয়া তোলে, জোর-জবরদস্তি দ্বারা উহা প্রতিরোধ সম্ভব নয়, সুন্দরও নয়। বাল্যের এই পাঁচ মিশেলি ভাষা পরবর্ত্তী জীবনের সাহিত্য-সাধনায় কোন কাজেই আসে না। আশা করি, বাংলার মুস্লিম সমাজের চিন্তাশীল হিতৈষীগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি দিবেন।

দীপালির শিক্ষা-সঙ্কল্প

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, দীপালি এবছর হইতে ঢাকা সহরে বিশেষভাবে বালিকাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইতেছেন। সহরের কতকগুলি পাড়ায় দীপালির অবৈতনিক শিক্ষালয় বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবছর যাহাতে এই বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বাড়ে, সেজন্য দীপালির পরিচালিকা-মণ্ডলী সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন। আশা করি, দীপালির এই পুণ্য-সংকল্পে সহরবাসী উদাসীন রহিবেন না।

ইহা ছাড়া দীপালি গ্রন্থাগারের একটি সম্পূর্ণ নূতন সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই গ্রন্থাগারের পুস্তক যাহাতে মেয়েরা বাড়ীতে বসিয়াই পাইতে পারেন, সেজন্য এবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। গ্রন্থাগারের কর্ম্মচারী প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী যাইয়া বই আনা-নেওয়া করিবে। ইহার ফলে মেয়েদের মধ্যে অধ্যয়নের চর্চ্চা বাড়িবে এবং গ্রন্থাগারটিরও যথার্থ সদ্ব্যবহার হইবে। আমরা এই সংকল্পের সাধুবাদ করিতেছি।

এই সম্পর্কে একটি কথা এই, গ্রন্থাগারটিকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে অর্থ সাহায্য আবশ্যক। আমরা আশা করি, দেশবাসী এই কার্য্যে মুক্তহস্তই হইবেন।

Printed & Published by Bibhabati Sen, 23 Wyer Street, Wari, from Wari Printing Works, Dacca.

সূচীপত্র

অমিতাভ

শ্রীসবিতা দেবী

দ্বিতীয় বর্ষ	ফাল্গুন, ১৩৩৯	একাদশ সংখ্যা

গোটা দুই কথা

শ্রীকমলা মুখার্জ্জি

বেশীদিন বিদেশে থাক্‌লে বাঙালীর যা স্বভাব হয়, আমারও হয়েছে তাই—বাংলা লেখা যা কিছু পাই তাই পড়্‌তে ইচ্ছা করে। সপ্তাহ দুই আগে দেশ থেকে একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকা এল। পত্রিকাখানি আগাগোড়া পড়েও যখন সখ্ মিট্‌লনা তখন বিজ্ঞাপনের পাতাগুলো পর্য্যন্ত একে একে উল্‌টাতে লাগ্‌লাম। কোথায় ভাল হারমোনিয়াম, কোথায় ভাল সাড়ী ও গয়না, কোথায় ভাল ফাউণ্টেন পেন, বই, মাথার তৈল, মুখের ক্রিম, কবচ ও মাদুলী, বিস্কুট ও ঔষধ ইত্যাদি পাওয়া যায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে, চোখে পড়্‌ল, ত্রিশূল হাতে ভারত-জননী তার শিশু-সন্তানকে ইংলণ্ডের তৈরী এক ঔষধ দিচ্ছেন, কারণ "ঔষধটা শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষণে নাকি অদ্বিতীয়!" ভারী দুঃখ হোল ভারত-জননীর কথা ভেবে, কিন্তু রাগ হ'ল তাদের উপর (তারা আমার নমস্য হলেও) যারা এই সব বিজ্ঞাপন দিয়ে ইংলণ্ডের জিনিষ কিন্‌বার জন্য দেশবাসীর চোখের সাম্‌নে ধর্‌ছেন। হয়ত কাগজওয়ালারা ব'লতে পারেন যে বিজ্ঞাপন না নিলে কাগজ চলেনা—কিন্তু সব বিজ্ঞাপন কি চোখ বুজে ছাপান উচিত?

জয়শ্রীতে গত আষাঢ় মাসের সংখ্যায় "আমাদের সামান্য বিষয় খরচ"য়ের যে অসামান্য তালিকা দেখ্‌লাম তাতে চুপ করে থাক্‌তে পারছি না। এই অর্থসঙ্কটের দিনে এ "সামান্য" খরচের তালিকা পড়ে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে ঐ রকমটা কেবল ভারত-বর্ষেই বুঝি সম্ভব হয়, আর কোথাও হয় না। বিদেশীকে প্রতি বৎসর যে সব "সামান্য" জিনিষের জন্য "অসামান্য" টাকা দিই তা দেখে কে বল্‌বে আমরা বাস্তবিকই গরীব, অন্নাভাবে জরাজীর্ণ, মরতে বসেছি? পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য আমি জয়শ্রীর থেকেই আবার

উদ্ধৃত করে দিলাম। একবার পড়্‌লেই বোঝা যাবে যে আমরা যে সব উপেক্ষা করে বলি, সে সব প্রকৃতই উপেক্ষা করার মত নয়, তাই আজ বিশেষ করে ভাব্‌বার সময় এসেছে।

১।	গঁদ	২১ লক্ষ টাকা
২।	চিঠির কাগজ ও খাম	৩৬॥ ,, ,,
৩।	ব্লটিং পেপার	৩॥ ,, ,,
৪।	জুতোর ফিতা	১৬॥ ,, ,,
৫।	জুতোর কালি	১৭ ,, ,,
৬।	সেলাই ও মোজার সূতো	৩০ ,, ,,
৭।	চুলের কাঁটা	১৫ ,, ,,
৮।	চুলের ব্রাস	৩॥ ,, ,,
৯।	টুথ্ ব্রাস	২॥ ,, ,,
১০।	পুঁতির আশ ও ঝুঁটা মুক্তা	৭৭ ,, ,,
১১।	তাস	২১ ,, ,,
১২।	লজেঞ্জেস	২৭ ,, ,,
১৩।	জমাট দুধ	১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
১৪।	শিশু খাদ্য	১ কোটি ১০ লক্ষ।

এই জিনিষগুলোর তালিকা দেখে সত্যই মনে হয় যে আমরা বড় শক্তিহীন, বড় অক্ষম, বড় পরমুখাপেক্ষী জাত। প্রতি বছর এই গরীব দেশ থেকে বিদেশীরা স্বচ্ছন্দে অগাধ টাকা নিয়ে যাচ্ছে, আর আমরাও অম্লানবদনে দিয়ে দিচ্ছি, কিছুই ভাবি না। একবার ভুলেও মনে করিনা যে এটা একটা মহা অন্যায় কাজ কর্‌ছি। গান্ধিজী বলেছেন, বিদেশী কাপড় পরোনা, স্বদেশী কাপড় তৈরী করে পর, তাই বিদেশী কাপড় আজকাল শুনি কম লোকে কেনে, কম লোকে পরে। কিন্তু এ সব নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলো কিন্‌তে যদি আমরা বিদেশীর শরণাপন্ন হই, তাহ'লে আর বিদেশী বর্জ্জন কি করে হ'ল? শুধু কাপড় নয়, কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ইংরাজি জিনিষ ও তৎসঙ্গে বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন করতে পার্‌লেই দেশের দরিদ্রতা কম্‌বে। ভাব্‌লে অবাক হতে হয় যে, দেশের এই দুর্দ্দিনে মেয়েদের চুলের কাঁটা থেকে শিশুখাদ্য পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিষ বিদেশ থেকে আস্‌ছে—আর আমরা স্বচ্ছন্দ চিত্তে তাই ব্যবহার করে আস্‌ছি, কিছুই ভাবিনা, ভাব্‌বার আর সময় আছে কি? কবি গেয়েছেন, "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে—যাবেনা ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।" কিন্তু কাজের বেলায় আমরা শুধু দিয়েই যাচ্ছি—নিতে আর পাচ্ছিনা—যা, না নিলে নিতান্ত প্রাণ বাঁচে না—তা নিতেই আমাদের প্রাণান্ত। আমরা বিশ্বপ্রেমের ফোয়ারা

তুলি, আর পাশ্চাত্য জগৎ আমাদের যা কিছু সম্পদ আছে লুটে পুটে নিয়ে যায়, দিয়ে যায়না কিছু। এক কণাও নয়। কোনও একটা অদ্ভুত কারণে আজ যদি সব বিদেশীরা বলে, "ভারতবর্ষ, তোমাকে আমরা "বয়কট" কর্‌লাম, তোমার বাজারে আমরা আমাদের এক কণা জিনিষও আর বিক্রী করবনা," তা'হলে আমরা কর্‌ব কি? আমাদের উপায় কি হবে? খুব জব্দ হব, না? দিয়াশলাইয়ের অভাবে হয়তো উনুনে হাঁড়ি চড়্‌বেনা। চুলের কাঁটার অভাবে এলোকেশী হব, জুতার ফিতার বদলে খড়ম পরব। এমন পরমুখাপেক্ষী জাতির উপায় কি? ভবিষ্যৎ কি? আমরা তা ভাবি কি?

আজকাল দেশে এই সব জিনিষের কোন শিল্প খোলা হয়েছে কি না, তা আমার জানা নাই, তবে নাই বলেই ধরে নিলাম—কেননা তা না হলে এত টাকা বিদেশে যেত না। আর যদি হয়ে থাকে তাহলে তাদের সর্ব্বান্তঃকরণে দেশবাসীর উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা দরকার। আর যদি না হয়ে থাকে তবে যাতে হয় তারই একান্ত চেষ্টা করা দরকার। বাঙ্গালীর কিসের অভাব? বুদ্ধির না ক্ষমতার? উদ্যোগের না অর্থের? ভেবে দেখ্‌তে গেলে মনে হয় আমাদের কোনটারই অভাব নাই, বরং প্রচুর পরিমাণে আছে, তবুও হয় না, কারণ কি? শুধু কয়েকটি জিনিষেই যখন কোটি কোটি টাকা বিদেশীর পকেট ভারি করেছে তখন স্বদেশী শিল্প খোলার জন্য কেন লোকের সাহায্য পাওয়া যায় না? এই সব জিনিষগুলির শিল্প খুলে দিলে দেশের বেকার সমস্যা কত কমে যাবে তা আমরা ভেবে দেখি কি? আমার মনে হয় প্রায় সবগুলি শিল্পই অল্পব্যয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে, অথবা অক্লেশে করা সম্ভব। এতে বহু দরিদ্রের অন্নের সংস্থান হবে এবং দেশের পয়সা দেশেই থেকে যাবে। এ সব বিষয়ে আমার মনে হয় আমাদের মেয়েদের অনেকখানি কাজ কর্‌বার আছে। কেবল বিদেশী (Englandয়ের) কাপড় বর্জ্জন করলেই কর্ত্তব্য শেষ হ'লনা, যে সব জিনিষের গায়ে বিদেশী ছাঁপ বা গন্ধ আছে, আজ আমাদের সেই সব জিনিষ প্রয়োজনীয় হ'লেও ছাড়্‌তে হবে। আমরা বিদেশীর কাছ থেকে আর কিছু কিন্‌বনা, কিছুতেই কিন্‌বনা। সাধ্য কি কেউ জোর করে আমাদের কেনাতে পারে? তা সে যা-ই হোক, জুতোর ফিতেই হোক আর চুলের কাঁটাই হোক, কেউ পার্‌বেনা। উপায়ান্তর না দেখে নিজের ঘরেই তখন আপনা থেকে এই সব তৈরী হবে।

টিকি রাখাটা খুব ধর্ম্মের কাজ হলেও চীনেরা যখন প্রকৃত স্বাধীনতা চেয়েছিল তখন একদিনে সকলে টিকি কেটে ফেলেছিল। তাদের নেতা সান্ ইয়াৎ সেন জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন "টিকি চাও, না, রিপাব্লিক্ চাও?" উত্তরে সমস্ত চীনা জাতটা টিকি কেটে নিঃশব্দে জানাল যে তারা স্বাধীনতাই চায়। আজ আমাদের মেয়েদেরও হয়ত চুল কাটার দরকার হয়ে পড়েছে, কারণ আমরা এখনো চুলের কাঁটা তৈরী ক'রতে শিখিনি! এক পয়সা, আধ পয়সা বা সিকি পয়সা দিয়ে চুলের কাঁটা কিন্‌তে কারোই গায়ে লাগেনা, কেউ কিছু ভাবেনও না; কিন্তু

এই এক, আধ, সিকি পয়সা করে আমরা বিদেশীকে কেবল চুলের কাঁটার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা প্রতি বছর দিয়ে থাকি! অথচ এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষটা দেশে তৈরী করার কথা ভুলেও ভাবিনা। চুল রাখ্‌তে হলে হয়তো চুলের কাঁটা দরকার, কিন্তু তাই বলে বিদেশী চুলের কাঁটা দিয়ে মাথায় কাঁটা ফুটিয়ে লাভ কি? বিনা কাঁটায়ও অনায়াসে চল্‌তে পারে। আজ যদি বাংলাদেশের মেয়েরা সংঘবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তবেই এ কাজ সম্ভব হতে পারে এবং একমাত্র মেয়েরাই এ কাজ কর্‌তে পারেন। যদি সব মেয়েরা সংঘবদ্ধ হয়ে জোর গলায় বলেন, আমরা মেয়েরা, যদি স্বদেশী চুলের কাঁটা না পাই তাহলে কেউ আর মাথায় চুল রাখ্‌বোনা। সাধ্য কি কোনও বাপ, ভাই, স্বামী চুপ করে বসে থাকেন? চুলের কাঁটার ফ্যাক্টরী (কারখানা) খুল্‌তে দেরী হবেনা, দেশের ১৫ লক্ষ টাকা দেশেই থেকে যাবে। আমরা কি এইটুকুও দেশের মঙ্গল কর্‌তে পারব না? অগত্যা যদি চুল না কাটি তবে বিনা কাটায় চুল বাঁধ্‌তে পারবনা কি?

ভারতবর্ষের মত এ রকম দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে—যে দেশে অভাবের তীব্র তাড়নায় মা তার সন্তান বিক্রী করে যে দেশে ক্ষুধিত স্বামী স্ত্রী কোমরে শক্ত দড়ি বেঁধে মৃত্যুর অপেক্ষায় ব'সে থাকে, যে দেশে খাদ্যের অভাবে শেয়াল কুকুরের মত পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট খাওয়ার লোকের অভাব হয় না, সেই দেশে পুঁতির থান ও ঝুঁটা মুক্তা ৭৭ লক্ষ টাকার বিক্রী! এ অসম্ভব কি করে সম্ভব হ'ল? একি বিশ্বাসযোগ্য কথা? দেশ স্বাধীন করতে চাচ্ছি, ঝগড়া কর্‌ছি, কত আলোচনা কর্‌ছি অথচ বিদেশীর কাঁচের জিনিষের লোভ সম্বরণ কর্‌তে পারছিনা। ঝুঁটা জিনিষে সৌন্দর্য্য বাড়াবার এত বড় আকাঙ্ক্ষা!! ধিক্ আমাদের এ নারীজীবন!!! যাহোক, যা হ'বার তা হ'য়ে গেছে এখন এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমরা যেন আর কখনো এসব জিনিষ না কিনি। আমরা যেন বিদেশীর ঝুঁটা বাক্যে ও জিনিষে দেশের লোকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে না দিই। জগতের সুসভ্য জাতের মত জাত হবার দাবি আমরাও রাখি, কিন্তু এভাবে চল্‌লে আরও কত যুগ?

মনে হয়, এই বিরাট সমরে মেয়েদেরই নেতৃত্ব নিতে হবে। তাদেরই পথ দেখাতেহ বে, জোর গলায় বলতে হবে, যতদিন আমরা স্বাবলম্বী না হই, যতদিন আমাদের আর্থিক উন্নতি না হয় ততদিন যে জিনিষই হোক আমরা আর বিদেশীর কাছ থেকে কিন্‌ব না। আমার স্বদেশী ভাই বোনের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজের সুখের জন্য, সখের জন্য, সৌন্দর্য্যের জন্য বিদেশী ঝুঁটা বা সাচ্চা জিনিষ আর কিন্‌বনা। বরং দেশে যাতে এই সব জিনিষের শিল্প খোলা হয় তার জন্য দেশের লোককে যথেস্ট সাহায্য ও উৎসাহিত করব। এই আর্থিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের দিনে এদিকে নজর দেওয়া বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে। ভারত-জননী যাতে নিজ শিশুকে ইংলণ্ডের নকল খাবার খাইয়ে মানুষ না করতে পারেন তারই চেস্টা নিতান্ত আবশ্যক। যতটা সম্ভব, যত

রকমে সম্ভব, বিদেশীবর্জ্জন দরকার, তা নইলে অনশনে অর্দ্ধাশনে, রোগে শোকে, পরাধীনতায় এ জাতির মঙ্গল নাই।

কেন পারব না? নিশ্চয়ই পারব। আজ আমাদের সকল রকমে বিদেশীর হাত থেকে বেঁচে থাকার যে রকম দরকার হয়ে পড়েছে এ রকম আর কখনো হয়নি। আমাদের দেশে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় স্থঁচ, সুতা, দিয়াশলাইয়ের কাটি থেকে যা কিছু বড় প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী হয় তার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টার দরকার। বিদেশীর অপেক্ষায় বসে দিন কাটালে চল্‌বে না! নিজেদের আত্মসম্মান জাগিয়ে তুলতে হবে, আত্মনির্ভরতা সেখানে হবে, জগতের অন্যান্য স্বাধীন জাতের সঙ্গে সমান হতে হবে, তাদের মত সবল, সক্ষম ও আত্মনির্ভর হ'তে হবে। দুর্ব্বিল ও অক্ষম ভেবে চুপ করে থাক্‌লে চল্‌বে না। পথ দেখ্‌তে হবে, এগিয়ে চল্‌তে হবে, পেছিয়ে থাকলে চল্‌বে না। ভারতবর্ষের সারা বাজারটা সস্তা জাপানী ও জার্ম্মেনীর জিনিষে ভরে গেছে। এর প্রতিকার অচিরে দরকার।

আমেরিকায় এই অর্থসঙ্কটের দিনে আজকাল কেউ সহজে বিদেশী জিনিষ কিন্‌তে চায় না, এদেশে আজ এমন উৎকট বেকার সমস্যা তিন বছর থেকে চল্‌ছে বলেই অনেকে বিদেশী জিনিষ কেনাটাকে অধর্ম্ম বলে মনে করে। বিদেশী জিনিষ যাতে লোকে না কেনে বা কম কেনে তার জন্য এদেশেও যথেষ্ট প্রচারের কাজ চল্‌ছে। অনেক কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় "আমেরিকাতে, আমেরিকার অর্থে, আমেরিকানদের জন্য এ বিষয় তৈরী"; কার সাধ্য এ রকম বিজ্ঞাপন পড়ে আর বিদেশী জিনিষ কেনে? তবু ত এটা স্বাধীনদেশ! বেকার সমস্যা যথেষ্ট থাক্‌লেও আমাদের মত এমন উৎকট অবস্থা নয়। এরা বিদেশী জিনিষ কিন্‌তে পারে, কিন্‌বার মত ক্ষমতা ও দাবী এদের আছে। কিন্তু—আমরা? সত্যই কী ভীষণ শক্তিহীন পরমুখাপেক্ষী ও অক্ষম জাত!

"আমি যে অমর হব"

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

তোমার অতীত গিয়াছে মরিয়া, আমার অতীত আছে,
স্মৃতির কোঠায় উজল মানিক হীরক যে রহিয়াছে।
বন্ধু, তোমারে বলি—
নিঠুর চরণে দূর সে অতীতে তুমি তো গিয়েছ দলি।
সুমুখের নয়নে লক্ষ্য রাখিয়া উল্কার মত ছুটি,
চলিয়াছ তুমি, কত যে পৃথিবী পদতলে পড়ে লুটি।
এমনি করিয়া পিছনে না চাহি চলার বেগেতে যাও,
সুমুখেতে তব অসীম আকাশ, সেথা কি দেখিতে পাও,
পায়ের তলায় যে পথ রয়েছে, জান না ফুরাবে কিনা—
জান না—বাজিতে থাকিয়া যাবে কি তোমার হৃদয় বীণা ?
একদা রজনী শেষে—
নিঃস্ব ভিখারী দাঁড়াইবে তুমি অতীতের দ্বারে এসে।
সে অতীতে আমি আগুলিয়া রাখি, দুয়ার পাশেতে থাকি
পিছনের পানে অচল রেখেছি আমার যুগল আঁখি।
আমি শুনি সেই অতীতের বুকে কত যে লাগিয়া তাকে
আমি দেখি—কত ফুটিয়াছে ফুল অতীতের শাখে শাখে।
দূর হতে শুনি নদীর বুকেতে কুলু কুলু মিঠে গান,
পান্থ চলিতে থেমে যায়—কোথা শুনি সে মধুর গান।
নিঃস্ব অতীত তব,
আমার অতীতে জাগাইয়া রাখি আমি যে অমর হব।
তোমার ও পথ শেষ হবে যবে পিছনে পড়িবে আঁখি,
সেদিনে বন্ধু, পরিচিত জনে খুঁজিয়া পাবে না ডাকি।

গোলক ধাঁধাঁ

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

(১৯)

কলেজে ভর্ত্তি হওয়া অবধি পূজার ছুটির মাঝখানে দিন কয়টা সত্যকামের তাড়াতাড়ি কাটিয়া গেল—একেবারে চোখের নিমেষে দেখিতে না দেখিতে। এক সপ্তাহ হইতেই সে দিন গুণিতেছে, কতকটা বাড়ী যাইবার আগ্রহে, কতকটা কলিকাতা ছাড়িবার আশঙ্কায়। আজ একেবারেই ছুটি আসিয়া পড়িল। আজই সত্যকামের বাড়ী রওয়ানা হইবার কথা। বৃদ্ধ পিতা দেশে, বারবার তাগিদ আসিতেছে, ছুটি হওয়ামাত্র দেশে চলিয়া যাইতে।

তিনটার সময় কলেজ হইতে ফিরিয়াই সত্যকাম দেখিল, প্রভা তাহার যাইবার দ্রব্যাদি সাজাইয়া গুছাইয়া পরিপাটি করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং সে স্বয়ং একেবারে নিশ্চিন্ত।

সুষমার ঘরে আসিয়া খাটের উপরে বসিয়া পড়িয়া সত্যকাম বলিল, 'আজকে যাচ্ছি বৌদি।'

"শুনেছি!—ভালো কথা, শোন ঠাকুরপো, তোমাকে একটা ফরমাস দিয়ে রাখি—'

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সত্যকাম অতি বিনয়পূর্ব্বক কৌতুক করিয়া বলিল, 'আজ্ঞা করুন!'

সুষমা হাসিলেন, 'দেওর হয়ে জন্মেছ, আজ্ঞা পালন কর্ব্বে না তো কি?—শোন, তোমাদের দেশে শুনেছি সুন্দর সুন্দর পাটের সূতোর আসন, সতরঞ্চ পাওয়া যায়? ফিরে আস্বার সময় আমার জন্যে দু'তিনখানা আসন আন্তে ভুলো না, পরে দাম দিয়ে দেব।'

সত্য কহিল, "যে আজ্ঞে।"

খানিক পরে মনে মনে ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শান্তাকে দেখ্‌চি নে যে?'

সুষমা বলিলেন, 'সে অতসীর বাড়ী বেড়াতে গেছে।'

সত্যর হঠাৎ অভিমান হইল। আজ কি বেড়াইতে না গেলেই চলিত না? আজ বিকালবেলা সে দেশে চলিয়া যাইবে, ইহা শান্তা জানে না?—কিন্তু জানিলেই বা কি? তাহার থাকা না থাকা লইয়া শান্তা তো মাথা ঘামায় না। সত্যকাম নিজের মূর্খতাকে মনে মনে ধিক্কার দিল। এই মেয়েটির নিকট হইতে সে কখনও বিরূপ ব্যবহার পায় নাই সত্য, কিন্তু সে তো তাহার স্বভাবের মাধুর্য্য! ইহাকে আশ্রয় করিয়া আরও অধিক দাবীর অধিকার তাহার যে একান্তই দুরাশা, এ জ্ঞানটুকুও তাহার নাই?

কতক্ষণ ব্যর্থ প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া সত্যকাম চলিয়া গেল।

পাঁচটার সময় যখন সে যাত্রা করিবার জন্য নীচে নামিয়াছে, কালু ও রেণু গাড়ীর সামনে ভীড় করিতেছে, এমনকালে অতসীদের মোটরকার আসিয়া থামিল। শান্তা নামিয়াই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চল্লে?"

"দেশে।"

'আজই?'

'দেরী করে লাভ কি?'

'কবে ফিরবে?'

সত্যকাম একটু হাসিয়া বলিল, 'যত দেরী করে ফিরি, ততই তোমার পক্ষে ভালো, না? ভয় নেই, তাই ফির্‌ব—একেবারে যেদিন কলেজ খুল্‌বে, সেদিন! এ ক'টা দিন তুমি স্বস্তিতে থাকতে পাবে।'

শান্তা হাসিয়া বলিল, "তুমি এত ঢং কর্ত্তেও পারো!"

সত্য বলিল, "সত্যি, আমি তোমাকে বড্ড জ্বালাতন করি!"

শান্তা ঠোঁট চাপিয়া একটু হাসিল মাত্র।

সেই বিশেষ ধরণের হাসি! সত্যকামের মন বিচলিত হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে এই সলীল হাসির আভাসেই সে আকৃষ্ট, বিমুগ্ধ অথচ বিমূঢ় হইয়া পড়ে। ইহা কি ব্যঙ্গভরা? না। ইহা কি অসরল? তাহাও নয়। ইহা কি অভিমান? না, না, হইতেই পারে না—অন্ততঃ সত্যকামের এমন দুরাশা করিতে ভরসা হয় না। তবে ইহা কি? এই হাসিটুকুর পশ্চাতে শান্তা কিসের ইঙ্গিত জানায় সত্যকাম অর্থ খুঁজিয়া পায় না। মুহূর্ত্তেকের এই ছটায় শান্তার অন্তরের কোনও নিভৃত কক্ষই তো তাহার সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে না! সত্য চাহিয়া চাহিয়া ভাবে; কিন্তু শান্তার প্রতিদিনকার পরিচিত আচরণের সঙ্গে ইহার কোনই সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না।

প্রভা নীচে আসিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া সত্যকাম প্রস্তুত হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী চলিল।

উপরে উঠিয়া শান্তা দেখিল, সুষমা ঘরে নাই—বোধ হয় ছাদে গিয়াছেন। তাহার আজ আর ছাদে যাইতে ইচ্ছা হইল না, হঠাৎ কেমন যেন অবসাদ ঘিরিয়া আসিয়াছে। বসিবার ঘরে আসিয়া জানালার কাছে একটা চেয়ার টানিয়া লইল। অসংখ্য ছাদের উপরে পরিষ্কার আকাশ দেখা যায়, গত দিনের এক পশলা বৃষ্টিতে কল কারখানার কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার রাশি আর জমাট মেঘের অন্ধকার অনেকখানি কাটিয়া গিয়া আজিকার আকাশটা বেশ তাজা হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে বেশ লাগে। কিন্তু তবু যেন তাহার চোখে স্তিমিত হইয়া দেখা দিয়াছে। চারিদিকে কী বিরাট্ নিস্তব্ধতা! আজ এত নীরব কেন? শান্তা অর্থহীন চোখে, চিন্তাহীন মনে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশের গভীর অতলতার মধ্যে কি আছে? শূন্য—শুধুই শূন্যতা?

"মহাযাত্রা শূন্য হতে শূন্যেতে প্রস্থান ?" হয়ত তাই। হয়ত সকলই নিরর্থক, নিরুদ্দেশ। শান্তা বুকের মধ্যে অনুভব করিল কেমন যেন ব্যথা ও ব্যর্থতা! অথচ কিসের জন্য ? কোনও অভাব তাহার নাই, কোনও ব্যর্থতা জীবনে আজ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই! ম্লান সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শান্তা ভাবিল, প্রকৃতির বিদায় বাসরের বিষাদ ঘন কালিমা অকারণেই তাহার মনে এমন করিয়া ছায়া ফেলিয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার পঙ্‌ক্তি মনে পড়িল।

কিন্তু নাঃ, আর ভালো লাগে না, বড় একা। কেহ একজন আসিয়া পড়িলেও তো পারে, অথবা অতসীর ওখানে আর কতক্ষণ থাকিলেও বেশ হইত!

বারান্দায় মৃদু পদশব্দ শুনিতে না শুনিতেই পর্দ্দা সরাইয়া বারীন্দ্র হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল। "বাড়ী শুদ্ধু কোথাও কারও সাড়া নেই যে ?"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "আছেন সবাই। তাঁরা সব ছাদে, না হয় ও বাড়ীতে। ঠিক সময়টিতে বারীনের আবির্ভাবে সে যেন আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বারীন বলিল, "অন্ধকারে একা একা বসে কি কচ্ছেন আপনি ?" শান্তা অগ্রসর হইয়া হাতের কাছের সুইচ্‌ টিপিয়া আলো জ্বালাইয়া বলিল, "অনেকক্ষণ এমনি ভাবে স আছি কি না. কখন অন্ধকার হয়ে গেছে টের পাইনি।"

বারীন বলিল, "আলো জ্বালিয়ে দিয়ে মাটি কর্লেন! আরও খানিকক্ষ :বেশ এমনিভাবে থাকা যেত। অন্ধকারটাই তো ছিল বেশ!"

শান্তা স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল তো ?'

বারীন্দ্র বসিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সসঙ্কোচ সারল্যের সঙ্গে বলিল, "প্রখর উজ্জ্বলতার চেয়ে আমি অস্পষ্ট ছায়াকেই কেন যেন বেশী পছন্দ করি, দিনের চেয়ে জ্যোৎস্নার আলোই সুন্দর, গানের চেয়ে তার রেশটুকু।"

শান্তা বিস্মিত কৌতূহলে তাহার মুখের দিকে চাহিল। কথা কয়টির মধ্যে যে গভীরতার আভাস ছিল, অনেকদিনের মধ্যে চারি পার্শ্বের আবেষ্টনে সে তাহা কোথাও পায় নাই। আগ্রহভরে কহিল, "সত্যি কিন্তু। আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ, জানো ?'

বারীন অপ্রাসঙ্গিক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যবাবু আজকে চলে গেছেন, না ?'

'এই ঘণ্টাখানেক আগে।'

বারীন বলিল, 'আমিও যাব কাল। তাই আজ আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলাম।'

মনে করিয়া যে দেখা করিতে আসিয়াছে ইহাও বারীনের পক্ষে অনেকখানি সহৃদয়তার পরিচায়ক মনে করিয়া শান্তা প্রসন্নমুখে হাসিল।

পশ্চিম দিগ্‌ভালে দ্বিতীয়ার বঙ্কিম চাঁদের রেখা ভাসিতেছে। একটুখানি যে আলো জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে সঙ্কোচে উঁকি দিতেছিল, ঘরের ভিতরকার অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুচ্ছটায় তাহা

একেবারে লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। বারীন কক্ষ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া নীরবে কতক্ষণ বাহিরের সেই চন্দ্রলেখার দিকে চাহিয়া রহিল। দুইজনে কেহ কোন কথা বলিল না। বিস্ময়ের সাথে শান্তা অনুভব করিতে লাগিল, কি মধুর এই নিস্তব্ধতাটুকু!

বারীন খানিক পরে উদারস্বরে বলিল, 'বড় ভালো লাগ্‌চে।'

অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িয়া শান্তা বলিল, "হুঁ।"

'এই যে ভরা অন্ধকারের বুকে একখানি আলোর রেখা, এ দেখে কি মনে হয় শান্তাদি?'

'কি মনে হয়?'

'এর মধ্যে কিসের ইঙ্গিত ভাবে বলতে পারেন?"

'কিসের?'

বারীন বলিল, আঁধার ঘনিয়ে এসে যখন দিশেহারা করে নেয়, প্রদীপের শিখা তার পরমুহূর্ত্তেই আসে। চিরকাল ধরে অন্ধ ও বন্ধ করে রাখা প্রকৃতির স্বভাবই নয়! আলোকে প্রিয় কর্‌বার জন্যেই এত অন্ধকারের আয়োজন। না? এই ক্ষীণ ধারাটুকু বেয়ে অসীম আলোর উৎসের সন্ধান পাব কবে?"

শান্তা অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিল। এ যে তাহারই বুকের গীতছন্দের প্রতিধ্বনি তাহারই আশৈশব স্বপ্নের প্রতিবিম্ব! বারীন এই স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে কবে হইতে? কৈশোরে যেদিন তাহাদের প্রথম পরিচয়, সেদিনও কি এই রঙ্গীন কল্পনা তাহার ছিল? সেদিনকার দুইচারিটি বিনয়নম্র সসঙ্কোচ বাক্যালাপের মধ্যে ইহার সন্ধান তো পাওয়া যায় নাই! যাইবেই বা কেমন করিয়া? তখন যে সে শুধু একটি অজ্ঞাত, অপরিচিত, নবাগত কিশোর কেবলমাত্র আপনার সরল মাধুর্য্যময় স্বভাবের আকর্ষণে তাহাদের সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। তখন তাহাকে যতটুকু জানা গিয়াছিল, তাহাতে সে সুন্দর; আজ আর একটি দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া সে যেন শান্তার চোখে সুন্দরতর হইয়া দেখা দিল।

সস্নেহে হাসিয়া শান্তা বলিল, 'বারীন, তুমি কবি?'

বারীন বিষম অপ্রতিভ হইয়া সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল, 'না না, এম্‌নি বল্‌ছিলাম। কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি, কবি হতে পারলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতাম।'

'তা তুমি হবে।'

'কি করে জান্‌লেন?"

'তোমাকে দেখেই আমি বুঝতে পারচি। তুমি কথা কও কম কিন্তু এক্‌প্রেস্ কর্ত্তে পারো বেশী; হাসি তোমার মুখে লেগেই আছে অথচ একটা যেন বিষাদের ছায়া—'

বারীন একটু হাসিয়া বলিল, 'বিষাদ জিনিষটা বেশ, না? Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."

কি অপূর্ব্ব সরলতা ও গভীর অনুভূতি মাখিয়া কথাগুলি বারীন্দ্র উচ্চারণ করিল—শান্তা অবাক্ হইল। তাহার চক্ষে বারীনের অন্তরলোকের চারিপাশে যেন রহস্যজাল জড়াইয়া উঠিল। রহস্য? না, রহস্য কিছুই নাই—সে নিজেও তো এখনই কত কথাই অনুভব করে। কিন্তু তবু—বারীনের মনের অতলে এতখানি গভীরতা? কী ভাবে সে? শান্তার মত তাহারও চিন্তার রশ্মি চিত্তের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর অবধি উদ্ভাসিত করিয়া দেখিতে চায়? তাহারও জাগ্রত জীবন বিশ্বজীবনকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াসী? চমৎকার!

বারীন জিজ্ঞাসা করিল, "মাসিমা আস্‌ছেন না তো এখনও? যাবার আগে দেখা না করে—"

শান্তা বলিল, "ডাক্‌ব?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বারীন বলিল, "থাক্ তাহলে। এলে তাঁকে বল্‌বেন আমার কথা।"

"আচ্ছা।"

চুপ করিয়া আর একটু বসিয়া থাকিয়া বারীন সলজ্জ মৃদু হাসিতে ওষ্ঠপ্রান্তে উজ্জ্বল করিয়া বলিল, 'এখন যাই তবে?'

বারীন চলিয়া গেল। শান্তা পূর্ব্বস্থানে বসিয়া পড়িয়া স্বস্তির সঙ্গে দেখিল—বিকাল-বেলাকার ভারাক্রান্ত মনটা কেমন লঘু হইয়া প্রাণময় আবেশে ভরিয়া উঠিয়াছে।

(২০)

লক্ষ্মী পূর্ণিমাতিথির বিশিষ্ট একটি গৌরব অস্বীকার করিবার মত দুঃসাহস হিন্দুপরিবারের মধ্যে বড় দেখা যায় না। আর সকল দেবতাকে বাদ দেওয়া গেলেও যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্ব সম্পদ্‌ময়ী দেবীটিকে অপ্রসন্ন করিতে বড় ভয়। এই আশঙ্কাটুকু ইন্দুমতীর হৃদয়ে চিরদিনই প্রবল, সুতরাং গৃহিণী হইয়া অবধি মহাযত্ন সহকারে নির্দ্দিষ্ট তিথিবারে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। পতিহীনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূজার সমারোহের সংস্থান একদিকে যেমন কমিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই দেবদ্বিজে ভক্তি দশগুণ বাড়িয়াছে, সুতরাং অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নিক্তির ওজন সমানই রহিয়া গেল। ফলে প্রতিবৎসরই রীতিমত আয়োজনসহ এই শারদীয় পূর্ণিমায় কমলার আরাধনা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। আত্মীয়বন্ধু দুই চারি জনের নিমন্ত্রণও প্রচলিত রীতির মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

শান্তার এই দিনটিতে বড় উৎসাহ। সম্পদের লোভে পড়িয়া লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য স্বীকার না করিলেও, শুভ্র আলিম্পনের রেখায় রেখায় যে শোভা ও শুচিতা বিকশিত করিয়া শ্রীর আবির্ভাব হয়, তাহাতেই মনের সম্পদ লাভ করা যায় অনেকখানি, ইহা সে অস্বীকার করিতে পারে না। এইটুকুর প্রতিই তাহার লোভ। ভোজনিমন্ত্রণের মধ্যে যে আড়ম্বর ও কোলাহলের প্রাধান্য দেখা যায় তাহার মধ্যে বিশেষ কোনও মাধুর্য্য নাই, কিন্তু আজিকার এই উৎসবের নিমন্ত্রণ যেন কেমন

একপ্রকার প্রাণের সৌহৃদ্য ও কল্যাণ সূচিত করে, ইহাই শান্তার ধারণা। প্রাতঃকাল হইতেই সে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। আল্‌পনার ভার আগ্রহ করিয়া নিজে চাহিয়া লইয়াছে। ঘরে ঘরে শ্বেতশতদল পাঁপড়ি মেলিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—মধ্যে মধ্যে কুসুমের রক্তাভায় উজ্জ্বল, মনোহর। বারান্দার দীর্ঘ দুই প্রান্ত বাহিয়া বরাবর সিঁড়ি পর্য্যন্ত ধানের ছড়ার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন। চিত্র সমাপ্ত করিয়া চারিদিকে ভালো করিয়া দেখিয়া আপনার শিল্পনৈপুণ্যে শান্তা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল।

অতসী অভ্যাগতরূপে উপস্থিত। পদার্পণ করিয়াই সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল, "পা ফেল্‌তে যে জায়গা রাখিস্‌নি ভাই!"

শান্তা বলিল, "জায়গা যদি নেহাৎ নাই পাও, তবে লক্ষ্মীর প্রতিনিধি হয়ে তাঁরই পায়ের ছাপে ছাপে পা ফেলে এসো কিছুমাত্র বেমানান হবে না তোমাকে!"

দুইজনে হাসিল।

"চমৎকার আল্পনা দিতে শিখেছিস্ কিন্তু সত্যি!"

কলাকুশলা বন্ধুর প্রশংসাবাদে শান্তা মনে মনে খুসী হইল। বলিল, "তোর মত মেয়ের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পাওয়া অবিশ্যি আমার পক্ষে গৌরবের কথা না ভাই? আচ্ছা, তোর গুণের ভাগ আমায় খানিক দিবি?"

অতসী হাসিল, গল্পপ্রসঙ্গে ইহাও জানা গেল সে বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছে। শান্তা বলিল, 'আচ্ছা বল্‌তো কোন্ বিদ্যেটা তুই জানিস্ না?'

'দেখ্ ভাই, অনেক কিছু শিখ্‌বার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সব হয়ে উঠ্‌ছে না। সময় পাইনে মোটে!'

'এত কি সময়ের অভাব ভাই?'

'বাঃ, এই তো ছাখ্ কতগুলো বই ষ্টাডি কর্ত্তে হচ্ছে; পরশুদিন আবার একখানা যুযুৎসুর বই আনিয়েছি। সেদিন জাপান থেকে যে যুযুৎসু-ওস্তাদ এসেছেন তাঁর সাথে একবার দেখা কর্ত্তে যেতে হবে। এই সব অনেক। তা ছাড়া শক্তিমন্দিরের আর সব অফিশ্যাল্ কাজ তো রয়েছে। তোর মত ফাঁকি দিয়ে কাজ করি কিনা?'

শান্তা হাসিয়া বলিল, 'কি করব, আমার একটু কুঁড়েমি আছে জানাই তো!'

'তা বৈ কি!'

শান্তা কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়া হাসিতে লাগিল, 'সাম্‌নের কমিটি মিটিংয়ে আমি রেজিগ্‌নেশন লেটার পাঠাব জানিস্?'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ ভাই সত্যি!'

'আমি পাঠাতে দিলাম আর কি ?'

'দেখ্ অতসী, আমি বাইরে থেকে যতটা সম্ভব তোকে সাহায্য করব কথা দিচ্ছি। কিন্তু কমিটির সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখ্‌তে ইচ্ছে কচ্ছে না।'

'আচ্ছা তোর হয়েছে কি বল দেখি ?'

নির্ব্বিকারস্বরে শান্তা বলিল, 'কিছু না।'

'কিছু না হয়ে পারেই না, আমি তো তোকে বরাবর জানি !'

শান্তা বলিল, 'আসল কথা কি জানিস্, কমিটির মেয়েদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে কাজ কর্ত্তে আমার কেমন যেন অসুবিধে হচ্ছে।'

'তাই বল্লেই পারিস্ !—কার সঙ্গে রে ?'

শান্তা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'সে আছে। তোর জেনে কোনও লাভ নেই তো ?'

অতসী কি ভাবিয়া মুহূর্ত্তখানেক শান্তার মুখের দিকে তাকাইল। 'আমি গেস্ কর্‌ব ?'

'তাতে কোনও লাভ হবে না। মোট কথা আমার ভাল লাগ্‌ছে না।'

অতসী এবার হাসিয়া বলিল, 'দূর্ বোকা, তার সঙ্গে রিজাইন্ দেওয়ার সম্পর্ক কি ? এখন তুই কম্বলকে ছাড়লেও অর্থাৎ রিজাইন্ দিলেও কি কম্বল তোকে ছাড়্‌বে ভেবেচিস্ ? এখন কমিটির ভেতরে আর বাইরে সমানই কথা যে রে !'

অর্থবোধ করিতে না পারিয়া শান্তা মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুষমা দুয়ারে দেখা দিলেন, 'কি গো ? এবারে তোমাদের উঠ্‌তে টুট্‌তে হবে না ?'

অতিথিগণ যথোচিত সৎকৃত হইয়া কখন বিদায় লইয়াছেন। বাড়ীর পরিজনবর্গও বহুক্ষণ হয় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া এখন নিদ্রামগ্ন, ভৃত্যদের শেষ কলরবও আর শোনা যায় না। মহানগরীর বুকের উপর নিদ্রাপরীর মায়ার কাঠির স্পর্শ লাগিয়া প্রতি অলিতে গলিতে স্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে শব্দমাত্র নাই। কর্ম্মশ্রান্ত দিনমানের অন্তে বিশ্রাম শান্তিতে সব নিস্পন্দ, নিঝুম ! কোথা হইতে একটা মটরকার হুস্ হুস্ করিয়া ছুটিয়া গেল—নিশীথ রাত্রিতেও মানুষের কাজ কি ফুরায় না ? হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ—চাকার বিস্ফোরণ ধ্বনি ! সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়হারা বিনিদ্র একটা পথের কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া তিরস্কার জানাইল।

শান্তার ঘুম ভাঙ্গিল।—ও কিসের শব্দ ? মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিতে দেখিতে শব্দ মিলাইয়া গিয়াছে। আর কোনও কিছু সাড়া পাওয়া যায় না। শান্তা বুঝিল—না, কিছু নয়। আবার সযত্নে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার উপক্রম করিল।

কিন্তু ঘুম একবার ভাঙ্গিয়াছে, আর চট্ করিয়া আসিতে চাহে না। একটুকাল চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকিয়া সে কি ভাবিয়া চোখ মেলিয়া একবার চাহিল।

বাঃ, কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। ঘরে বাহিরে একি অপরূপ ছবি ! ঝলকে ঝলকে জ্যোৎস্না

ছুটিয়া আসিয়া ঘরখানি একেবারে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। ঘর ও বাহির সব একাকার! খোলা জানালার মধ্যে কেবল গোটাকতক শিকের বাধা ভিন্ন আর কোথাও আলোকের গতি প্রতিহত হয় নাই—স্বচ্ছন্দে একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছে শান্তার শুভ্রশয্যার উপরে। শান্তার তন্দ্রার আবেশ টুটিয়া গেল। সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া সে শিয়রের বালিশটা একটু পিছনে সরাইয়া মাথার কাছের জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। এমন পরিপূর্ণ পূর্ণিমার অনাবৃত সৌন্দর্য্য এই বস্তুতন্ত্রের কঠোর কারখানার মধ্যে বসিয়া সে যেন আর কোনদিন দেখে নাই। আজ লক্ষ্মীপূর্ণিমা? তাই বটে! এই অকলঙ্ক যামিনীর অসীমব্যাপ্ত উদার সুনির্ম্মল হৃদয়মন উদ্ভাসিত করিয়া আজ যদি লক্ষ্মীর আবির্ভাব না হইবে, তবে আর ইহার চেয়ে শুভলগ্ন করে মিলিবে? ঘরের মেঝেতে ঐ আপনার শ্বেতপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে—ঐ তার মাঝখানে মায়ের পায়ের অধিষ্ঠান! এ তো শুধু কল্পনা নয়! চোখের সামনে ঐ যে জ্যোৎস্নার সুধাসমুদ্র মন্থন করিয়া বিশ্বের সমগ্র সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিমতী হইয়া নামিয়া আসিয়াছেন ধরাতলে, প্রতি মানবের প্রাণে প্রাণে, এই তো লক্ষ্মী!—কোজাগর পূর্ণিমাই বটে! আজিকার এই মহিমোজ্জ্বল দিব্য বিভা সারারাত্রি জাগিয়া যে না দেখিল, তাহার এ রাত্রিই বৃথা; অনন্তবিস্তারী আকাশ-সাগরের কোথাও আজ কোনও স্পন্দন নাই, শব্দ নাই,—অথচ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণু যেন প্রাণময় হইয়া রহিয়াছে, প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন কোন রহস্যময় বাণীর গুঞ্জরণ! নির্ব্বিকার নারায়ণের চিণ্ময় নীলবক্ষ, তাহাতেই বুঝি লগ্ন হইয়া হাসিতেছেন আনন্দময়ী লক্ষ্মী! শান্তার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে কাঁপিয়া উঠিল—আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে কোথা হইতে দেখা দিল অস্পষ্ট ছায়ার মত শুভ্রখণ্ডের একটুখানি আস্তরণ। গায়ে গায়ে জড়াইয়া জড়াইয়া আবার কোন্ প্রান্তে গিয়া অদৃশ্য হইয়া মিলাইয়া রহিয়াছে। এ যেন অপ্সরার বসনাঞ্চল। সুরসভাতলে নৃত্য করিতে করিতে বিবশা উর্ব্বশীর আলুলায়িত বসনপ্রান্ত লুটাইয়া পড়িল কি? ঐ যে তাহার অঙ্গের শতমাণিক্যের দ্যুতি, ঐ যে সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করি টুটিয়া ফুটিয়া পড়িতেছে তাহার অঙ্গের কিরণ! এত শোভা এই বিশ্বসাম্রাজ্যে আছে? কে এ অমৃতভাণ্ডারকে তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিল? এ যেন আকণ্ঠ পান করিয়াও তৃপ্তি হয় না। দূর হইতে দূরান্তরে তাহার চক্ষু দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল, স্বচ্ছ চন্দ্রালোকে ঢাকা ঐ গভীর অম্বরের গভীরতর অন্তররাজ্যে আরও কি আছে? শেষ সীমানা কতদূরে কোন্ আনন্দে দীপ্যমান? শান্তা অজানা আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। মনে হয়, আজ তাহার সব আকাঙ্ক্ষা বুঝি পূর্ণ হইয়াছে, আজিকার এই ভরা সৌন্দর্য্যের মধুসায়রে ডুব দিয়া সে যেন আপনার সব ভুলিয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া এমনই পড়িয়া থাকিতে পারে!

কিন্তু বড় যে একা! এতখানি আনন্দ, এতখানি প্রাণের আবেগ ক্ষুদ্র এই হৃদয়-টুকুর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে? এমন পরিপূর্ণতার মধ্যেও কোথায় একটু ফাঁক থাকিয়া

যায় যে! ইচ্ছা করে, আপনার সমস্ত আনন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রেমের উচ্ছল প্রবাহে বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে! ইচ্ছা করে, আপনার হৃদয়ের প্লাবনে সমস্ত প্লাবিত করিয়া দিই। একাকী এ অসীম ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া তৃপ্তি নাই। এমন আর একটি প্রাণ কি নাই, যে তাহারই মত আজ মুগ্ধ, আত্মহারা,—যে তাহারই মত আর একটি প্রাণ খুঁজিয়া ফিরিতেছে? কে আছে? কোথায় আছে? কাহাকে বুকের কাছে নিবিড় করিয়া পাইলে আজিকার আনন্দ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিত? সে কি অপার্থিব পুলক—দুইটি অনন্তপিয়াসী উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের বিপুল অনুভূতি—আত্মহারা ভালোবাসায় একীভূত, বিশ্বব্যাপী! অজানা সাথীর অপরূপ কল্পনায় শান্তা বিভোর হইয়া রহিল। অনন্ত অক্ষরের সুগভীর রহস্যতল ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার ধ্যাননেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—সত্যকামের মুখখানি!

শান্তার আবেশ টুটিয়া গেল। এ কি? ছি, ছি, ছি!! আপনার কাছে আপনার ছবি ধরা পড়িয়া শান্তা লজ্জায় মরিয়া গেল। এই তাহার কুমারীব্রত? তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও শক্তির গৌরবের তলে এমনই করিয়া সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া থাকে? সত্যকাম? ছিঃ! অসম্ভব, হইতেই পারে না। এ তাহার মস্তিষ্কের ভ্রান্তি। নূতন অনুভূতির অপূর্ব্ব পুলকে ও আপন দুর্ব্বলতার অকস্মাৎ আবির্ভাবে বেদনায় তাহার বুকের মধ্যে কি রকম করিতে লাগিল। নিদ্রার বিস্মৃতির মধ্যে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার প্রয়াসে সে তাড়াতাড়ি বালিশের মধ্যে আরক্ত মুখখানা লুকাইয়া ফেলিল।

(২১)

দুপুর বেলা শান্তা শুইয়া শুইয়া কাগজ পড়িতেছে, পাশে সুষমা মাণিককে লইয়া নিদ্রাগতা।

অর্দ্ধেক ভেজানো কবাট ঠেলিয়া প্রভা ঘরের মধ্যে একটুখানি উঁকি মারিলেন, "কই গো? সব একেবারে নিঝ্‌ঝুম যে।"

শান্তা খবরের কাগজখানা চোখের সম্মুখ হইতে নামাইয়া ধরিল। প্রভা লঘুপদে ঘরে ঢুকিয়া সুষমার কাছে আসিয়া আবার থামিলেন, "থাক্ গে, বিরক্ত করব না। কাকীমাকে বলিস্, ঘুম থেকে উঠেই আমার কথা শুন্‌তে যেতে।"

শান্তার হাতের কাগজগুলার খস্‌খস্ শব্দ এবং প্রভার কলকণ্ঠের ধ্বনিতে সুষমার পাৎলা ঘুম টুটিয়া গেল।

তন্দ্রালস চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "কি গো, দুপুর বেলা আবার আমার ঘুম ভাঙাতে এসেছ কি কর্ত্তে শুনি?"

প্রভা হাসিয়া বলিলেন, "শুধু দুপুরবেলা কেন, রাত্রের ঘুম মাটি কর্ত্তে চাই।"

"ব্যাপার কি, বল তো দেখি শুনি!"

ব্যাপারটি বিশেষ কিছু নয়। প্রভার আজ বায়োস্কোপ দেখিবার সখ হইয়াছে। স্বামীর কাছে কিছুক্ষণ আগে শুনিতে পাইয়াছেন, আজ পিক্‌চার প্যালেসে সুপ্রসিদ্ধ একখানা উপন্যাস দেখানো হইতেছে। সুতরাং সেখানে যাওয়া চাইই। কিন্তু সুষমা না গেলে তাঁহার আসর ভালো জমে না।

প্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাবে তো"।

ঘুম ঝাড়িয়া ফেলিয়া সোৎসাহে সুষমা খবরের কাগজখানা টানিয়া লইয়া বলিলেন, "দেখি, কি ফিল্‌ম্ আছে আজ?"

'ওমা, থ্রি মাস্‌কেটিয়ার্স!'

সুষমা নাচিয়া উঠিলেন, "যাব না আবার?—কিন্তু, চরণদারগিরি কর্ত্তে হবে কিন্তু তোমাদের কর্ত্তার, আমাদের ওঁকে দিয়ে হবে না।"

প্রভা বলিলেন, "তিনি রাজী।"

"তবে আর কি?"

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই মোটরের হর্ণ ফুঁকিয়া সকলে মিলিয়া রওয়ানা হইল। শান্তাও বাদ যায় নাই।

একেবারে বরাবর পিকচার প্যালেসের গোড়ায় গিয়া থামিল।

চারিদিকে লোকারণ্যের ভীড়ে দমবন্ধ হইবার উপক্রম, উগ্র আলোর ছটায় চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে চায়। সেন্ট্‌, পাউডার, সিগার সিগারেটের গন্ধ মিশিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের খোরাক জুটিল বেশ। শান্তার মজা লাগিল। ফিলমের দর্শনীয় ছবিখানির অপেক্ষা এগুলাও তাহার কম উপভোগের সামগ্রী নয়। অনেক দিন হইতেই মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় বড় নিঃসঙ্গ বোধ হইতেছিল। যাহা হউক তবু আজকার সন্ধ্যামন্ত্র সজীব চঞ্চলতার মধ্যে কাটিবে মন্দ নয়!

টিকিট করিয়া হলে ঢুকিয়া সুষমারা চারিখানা চেয়ার অধিকার করিয়া লইলেন।

সভার দীপদাম ম্লান হইয়া গিয়াছে, চিত্রপটের উপরে আলো ফুটিয়া উঠিল। ছবি পড়িতে সুরু করিয়াছে। দর্শকমণ্ডলীর সহস্র চক্ষু এক মুহূর্ত্তে একদিকে নিবদ্ধ হইল।

সময় কাটিয়া চলে। অকস্মাৎ শান্তার নিবিষ্ট মনের একাগ্রতায় যেন বাধা পড়িল। আপনার অগোচরে অন্যমনস্কভাবে ছবি হইতে চক্ষু ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, পাশের চেয়ারখানিতে অপরেশ। কোনও নির্ণিমেষ দৃষ্টি মুখের উপর বহুক্ষণ ন্যস্ত থাকিলে অজ্ঞাতেও মনের মধ্যে কেমন যেন সাড়া পাওয়া যায়, শান্তা অনেকবার তাহা দেখিয়াছে। আজও কি তাই?

হঠাৎ অনির্দ্দেশ্য এক অপ্রসন্নতা শান্তার মনটাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিল। সে চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

মৃত্যুর রূপ (রবীন্দ্রনাথ)

শ্রীসুপ্রভা দাস

"মরণ রে,

তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান !"

এই একটি কথাতেই কবি অজ্ঞাত মৃত্যু-রহস্যের যবনিকা তুলিয়া দিলেন।

রবীন্দ্র-কাব্যে মৃত্যুর যে রূপটি অপরূপ হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা এই সঘন শ্যাম-রূপ। সে রূপ প্রশান্ত, রমনীয় ও পরম তৃপ্তিতে সুনিবিড়। তাহার তাপ নাই, জ্বালা নাই, সে জীবনকে অমৃতে নিষিক্ত করে ; সে অনন্ত জীবনের প্রস্রবণ।

"মৃত্যু অমৃত করে দান !"

মরণ যে কবির একান্ত প্রিয়তম, তাই "শ্যাম-সমান" বলিয়াই পরক্ষণে বলিয়াছে,

"মরণ রে,

শ্যাম তোঁহারই নাম—'

* * * *

তুঁহু মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,

তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,

মরণ তু আওরে আও।"

কী অপূর্ব্ব ব্যাকুলতা ! তাপহরণ মরণের ছায়ায় পরম শান্তি লাভের এ কি ব্যাকুলপ্রয়াস !

—"মরণ তু আওরে আও !"

তাঁহার প্রতি প্রিয়তমের অসীম স্নেহ স্মরণ করিয়া কবি বলিতেছেন,

"হিয়—হিয় রাখবি অণুদিন অণুখণ,

অতুলন তোঁহার লেহ।"

যে প্রিয়তম সে কি কখনও ভুলিয়া থাকিতে পারে ? সে যে অহর্নিশ প্রেমের বস্তুকে বক্ষের ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিতে চায় !

যখন কবির দিবস ফুরাইবে, যখন আজন্মের বিরহ-তাপ-অবসানের পর মিলনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে, কবি সকল বন্ধন তুচ্ছ করিয়া মরণ-অভিসারে যাত্রা করিবেন। প্রকৃতি তখন দুলিয়া উঠিবে, তাহার শান্তি ঘুচিবে, তাহা প্রচণ্ড রুদ্র মূর্ত্তি ! তখন,

"গগণ সঘন অব, তিমির মগন ভব,

তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,

শাল তাল তরু সভয়—তবধ সব,

পন্থ বিজন অতি ঘোর—"

সেই দুর্য্যোগ-রজনীতে, জনহীন পথে, কবি একক যাত্রী। আজ তাঁহার কিসের ভয়? যে প্রিয়-সন্দর্শনে চলিয়াছে, সে কবে অপর সঙ্গীর অপেক্ষা রাখে?

—"একলি যাওব তুঝ অভিসারে।"

মরণ যাহার প্রিয়তম, সে যে সকল ভয়ের অতীত। ভয় বাধা তাহার চক্ষে অভয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে, যে পথখানি তাহার প্রিয়তমের নিকট পৌঁছিয়াছে, সখার ন্যায় তাহাকে সেই পথখানি দেখাইয়া চলিবে।

কবির চক্ষে মৃত্যু শুধু রমণীয় নহে; সে স্থির, প্রশান্ত। এই নিঃশব্দতা ও নীরবতার ভাবটি তাঁহার কাব্যে "প্রণয়ের ধরণে" ফুটিয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুর সহিত যখন তাঁহার মিলন হইবে, তখন কেহ জানিবে না, কোন মঙ্গলায়োজনে তাহার আগমন বার্ত্তা দিগ্বিদিকে ঘোষিত হইবে না। সে ধীরে, নিঃশব্দে, বিনা সমারোহে তাহার হিম-কোল প্রসারিত করিয়া কবিকে স্বপ্নে হরণ করিয়া লইবে।

প্রিয়জনের উপরে যে চিরন্তন অধিকার, সেই অধিকারের দাবী স্মরণ করিয়া কবি মরণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,

"তুমি কারে করিও না দৃক্‌পাত
আমি নিজে লবো তব শরণ
যদি গৌরবে মোরে ল'য়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥"

এই আত্মসমর্পণের পরম মুহূর্ত্তটি যদি বা ব্যর্থ হইয়া যায়, সেই আশঙ্কায় কবি বারংবার নানা ছন্দে তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। মরণ যেন তাঁহার সকল কর্ম্ম বিধ্বস্ত করিয়া দেয়, তাঁহার সকল সঙ্কোচ অপহরণ করে, বিজয় শঙ্খ প্রলয় শ্বাসে পূর্ণ করিয়া গম্ভীর নিনাদে তাঁহার সুখের স্বপ্ন, নিবিড় শান্তি ধূলায় ধূসর করিয়া দেয়। এই রুদ্র আহ্বানে কবি ছুটিয়া আসিবেন—যেখানে মৃত্যুর তরণী খানি বাঁধা রহিয়াছে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা, প্রদীপ্ত বিদ্যুৎ শিখা—প্রকৃতির কোন প্রতিকূলতাই তাঁহার যাত্রার গতিরোধ করিতে পারিবে না। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার সম্বন্ধে ভীতি নিরর্থক; এই কথাটিই কবি "মরণ কবিতায় সবশেষে বলিয়াছেন,—

"আমি ফিরিবনা করি' মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল:
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥"

"মরণ—দোলায়" কবির যে কথাটি আনন্দে হিন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মৃত্যুর আসা-যাওয়ার লীলার। এই অদ্ভুত দোল-লীলা কোন্ অশ্রুত গানের ছন্দে উঠিতেছে,

পাশের দিকে একটুখানি ঝুঁকিয়া অপরেশ মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনিও এসেচেন !"

শান্তা যেন এইমাত্র হঠাৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইল, "কে ? আপনি ! ও।"

"কেন ? চিন্‌তেই পারেন নি ?"

"অন্ধকারে ততটা লক্ষ্য করিনি।" বলিয়া শান্তা আবার মুখ ফিরাইয়া ছবি দেখিতে বসিল।

তা বটে ! অন্ধকারে লক্ষ্য করিতে পারে নাই। অপরেশ একটুখানি নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

পটের পরে পট পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। শান্তা অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত একমনে সেইদিকে চাহিয়া আছে। প্যারিশের বিচিত্র সৌধাবলী রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরের রহস্যনিকেতন, রাণী অ্যানের সম্মুখে ডিউক্ অব্ বাকিংহাম্—চক্ষুর সম্মুখে সব ভাসিয়া চলিয়াছে।

অপরেশ শান্তার কাণের কাছে মাথা আনিয়া আবার মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম লাগ্‌চে ? এন্‌জয় কর্‌চেন বেশ ?"

আবার বাধা পাইয়া শান্তা একটু অশান্তিবোধ করিল। সংক্ষেপে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, বেশ।"

অপরেশ বলিলেন, "আমার কিন্তু আর ভাল লাগ্‌ছে না—ছবির চেয়ে বাস্তব ভালো। আসুন তার চেয়ে গল্প করি।"

শান্তার এবার ভারি রাগ হইল। জবাব না দিলে অভদ্রতা হইবে হয়ত, কিন্তু জবাব দিবার মত কোনও কথা মুখে আসিল না।

অপরেশ ওকটু ক্ষুব্ধভাবে হাসিয়া নিজেই বলিলেন, "আমার সঙ্গে গল্প কর্ত্তে ভালো লাগবে না, না ?"

ভারী বিশ্রী ! শান্তা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, "আপনার সঙ্গে বলে নয়। তবে গল্প দেখ্‌তে এসে গল্প করে সময় কাটালে সময় নস্ট করা হবে, নয় কি ?"

"সময় নস্ট ? বাড়ীতে যখন আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যাই, তখনও নিচক কাজের কথাটি বাদে কোনও কথা বল্‌তে গেলে আপনার সময় নস্ট হয়, এখানেও দেখ্‌চি তাই। সময় তা হলে হবে না, কোনদিনই বলুন !"

নির্ব্বিকারস্বরে শান্তা বলিল, 'দরকার তো নেই।"

অপরেশ একটি মুহূর্ত্ত থামিলেন ; একবার সোজা হইয়া আবার হেলিয়া বসিয়া বলিলেন, "অথচ, জানেন—আপনার কাছ থেকে একটি বাজে কথা শুনতে গিয়ে যদি আজকের সমস্ত ফিল্‌মটা দেখাই মাটি হয়ে যায়, তাতেও আমি লোকসান মনে করি না, আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে আমার এত ভালো লাগে !"

শান্তা উত্তর দিল না। এই অস্বাভাবিক বাক্যালাপের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে দেরী হইল।

অর্দ্ধেক অনুনয়, অর্দ্ধেক দাবী মিলাইয়া অপরেশ বলিলেন, "কথা বল্‌বেন না ?"

সব আলোচনা এক নিঃশ্বাসে থামাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে শান্তা বলিল, "ছবি দেখুন।"

অপরেশ থামিতে পারিলেন না। আজ তাঁহার কি যে হইয়াছে, শান্তা তো বুঝিতে পারেই নাই, তিনি নিজেই পারিতেছিলেন কি না সন্দেহ। এই চিত্রশালার সুসজ্জিত সভাতলে, রাত্রির অস্পস্ট আলো আঁধারের মধ্যে বসিয়া কেমন যেন তাঁহার দেহমনে একটা আবেশ কাঁপিয়া উঠিতেছিল ; চক্ষের সম্মুখ দিয়া উপন্যাসের লীলাখেলা চিত্রের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে, চারিদিকে কল্পনার কী যেন এক মোহন আবেস্টন !

শান্তার উদাসীনতায় দৃক্‌পাত না করিয়া বলিয়া চলিলেন, "আপনাকে আমার কতখানি নিজের বলে মনে হয়, আপনি জানেন না। প্রথম যেদিন আপনাকে দেখি সেদিন থেকেই কেবলই মনে হচ্ছে, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় বহুযুগের, যেন পূর্ব্বজন্মান্তরেও আপনাকে পেয়েছিলাম। বলুন দেখি—"

শান্তা বাধা দিয়া বলিল, 'এ রকমটা আপনার কাছ থেকে আমি আশা করিনি, অপরেশবাবু।'

অপরেশ আহত হইলেন, "কেন আমি অন্যায় করেছি ?'

"ন্যায় অন্যায় বুঝ্‌বার মত বিচারশক্তি আপনার থাকা তো উচিত।'

অপরেশ মৌন হইলেন। শান্তার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া চেয়ারের বিপরীত হাতলের গায়ে ঠেস দিয়া চিত্রপটের দিকে তাকাইলেন।

শান্তার মনের মধ্যটা যেন একটু কেমন করিয়া উঠিল। সে কি অযথা রূঢ়তার পরিচয় দিয়া ফেলিল নাকি ? অপরেশ যাহা বলিতেছিলেন, তাহার মধ্যে সত্য সত্যই কি গর্হিত কিছু আছে ? তিনি তাহাকে স্নেহ করেন—এই তো ? স্নেহ তো কাকাবাবুও করেন ! তাহাতে তো সে রাগ করে না। —ছি ছি, নিজের মনের মলিনতায় অন্যকে মলিন ভাবিয়া তাহার উপরে আবার তাহাকে পীড়া দেওয়া ! বড় অন্যায় হইয়া গিয়াছে।

শান্তা নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে বসিল।

(ক্রমশঃ)

দৈন্য

শ্রীকমলা বসু

সোনার ফসল হেলায় ফলে,
আশ মেটে না ফ'ল্লে,
এই ভারতে দৈন্য আছে
কেগো তোমায় বল্লে ?
চ'ল্‌তে হ'লে দল'তে হয়
দূর্ব্বাদলের বক্ষ,
বায়ুতে যার অমর আয়ু—
মাটীতে মিলে মোক্ষ,
নীল আকাশে অসীম আলো,
মেঘের সুধাবৃষ্টি,
গঙ্গাজলে শীতল শীকর,
বিধির বিপুল সৃষ্টি,
নিশীথে যার উজল চন্দ্র—
রোহিনী আর চিত্রা,
ঝিল্লীতে যার ঘুমের সুর—
স্বপন-ভরা নিদ্রা,
দিনমানে দিনমণি—
পূব-পছিমের দীপ্তি,
সিন্ধু-বেলায় স্বর্ণরেণু—
রক্ত-স্রোতে তৃপ্তি,
শুনেছি যে পুরাণ বলে
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ,"
কুঞ্জে কুঞ্জে শিখীর কেকা
মধুরগায়ী পক্ষী,
হায় রে অবোধ, এমন দেশে
কোন্‌খানেতে দৈন্য ?
চোখ চেয়ে দেখ্‌ নিঃশ্বাসে এর
সবাই বুঝি ধন্য !

সাগর পারের যাত্রীরা এসে
এতেই হ'ল পুষ্ট,
যুগ-মানব এরই কাছে
কৃতজ্ঞতায় তুষ্ট
বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি এ যে
এই ত ক্রমকল্প !
নয়ত গো এ তুচ্ছ অতি
সামান্য বা অল্প !
মুনি-মণীষার কেন্দ্র এ যে
কীর্ত্তি-সাধনা-তীর্থ !
ধূলিপুঞ্জের কবিগুঞ্জন
স্বাস্থ্য-হাসি-নৃত্য !
চাও কি তুমি অবাক্ চোখে
খুঁজেই এস বিশ্ব !
পাবেনা ক' তুলনা এর—
এমনতর দৃশ্য !
অবোধ তুমি বাঁধ্‌লে গেরো
স্বর্ণ ফেলে অঞ্চলে,
মিছাই হ'ল জন্ম তোমার
দিনটা গেল জঞ্জালে।
ভাব-ভারতে কেনই এলে
চক্ষু কেন সিক্ত ?
দু'চোখ বুজে অন্ধ হ'লে !
রইলে চির রিক্ত।
পরশ-পাথর পাথার-তীরে
খুঁজে খুঁজেই মল্লে—
এই ভারতে দুর্ল্লভ তা
কেগো তোমার বল্লে ?

নামিতেছে, এ দোলায় কর্ত্তা নিজেই দুলিতেছে, ও দোলাইতেছে। ক্ষণেক আলোক, ক্ষণেক অন্ধকার—এই আলো ছায়ার অপূর্ব্ব মায়ায় মৃত্যুর দোল প্রবাহ ঘটিয়াছে ; কিন্তু এ আঁধার "আঁধার" নহে, ইহা আলোকের ন্যায় স্বচ্ছ।

—"সমুখে যেমন পিছেও তেমন,
মিছে করি মোরা গোল।"

মৃত্যুর যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মানুষ একান্তভাবে তাঁহারই নিজস্ব ধন। সেই একক দেবতা "সব রবি শশী কুড়ায়ে লইয়া" এই আপনার ধনটি আপনি হরণ করিয়া এক অপরূপ খেলায় মাতিয়াছেন। মানুষের অবুঝ অন্তর এই পরম সত্যটি সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া আকুল হয় তাহার মনে হয়, তাহারই সম্পত্তি হইতে কে যেন তাহাকে অন্যায় রূপে বঞ্চিত করিয়াছে।

"দেওয়া—নেওয়া তব সকলি সমান,
সে কথাটি কে বা জানে।
ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও,
বাম হাত হ'তে ডানে॥"

মৃত্যু পৃথিবীর কিছুই হরণ করেনা, করিবেও না। যিনি মরণ-দেবতা, তিনি তো আপনার ধনই আপনি গ্রহণ করেন।

"আছে তো যেমন যা' ছিলো,
হারায়নি কিছু ফুরায়নি কিছু,
যে মরিল সে বা বাঁচিলো।"

মরণ-দোলায় বিশ্ব-প্রকৃতি দুলিয়া উঠিয়াছে, এই আসা-যাওয়ার খেলার আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ধরণীর সকল আলো, সকল সঙ্গীত, সকল ভালোবাসা তেমনি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, আর ইহাদের ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঘিরিয়া

"এই মতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা॥"

মৃত্যুর পরে যে অনন্ত জীবন, কবির লেখনীতে তাহা পরম তৃপ্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"আজিকে হ'য়েছে শান্তি, জীবনের ভুল ভ্রান্তি,
সব গেছে চুকে।"

করুণ মরণ সকল ব্যথা, সকল সন্দেহ মুছিয়া দিয়াছে ; প্রকৃতির যত আলো, সব যেন নিবিড় স্নেহে পূর্ণ হইয়া সেই অনন্ত জীবনে অন্ধকার রূপে নামিয়া আসিয়াছে। নিখিলের গীতধ্বনি যেন সেই নিদ্রিত আঁখি পল্লবে নীরবতার চুম্বন স্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে।

* * *

মৃত্যু মানুষকে অমরত্ব দান করে; পৃথিবীতে সে অসীম, তাহার জীবন সহস্র আঘাতে চূর্ণ, বিদীর্ণ, বিকৃত; কিন্তু মৃত্যুর পরে,

—"অনন্ত জনম মাঝে গেছে সে অনন্ত কাজে, সে আর সে নাই।"

জীবনে যাহা মিথ্যা, অর্থহান, অসম্পূর্ণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, মৃত্যু তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া নিয়ন্ত্রিত, একত্র সমাবিষ্ট করিয়াছে—নিরর্থককে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। ধরণীর ধুলায় যে জীবন অনিত্য, চঞ্চল, নিস্ফল মনে হইয়াছিল, মরণের অতীত রাজ্যে সে জীবন অপূর্ব্ব, বিচিত্ররূপে কোন্ অজ্ঞাতে সফল হইয়া উঠিয়াছে! সেই অমর আত্মার দৃষ্টিতে অতীত—বর্ত্তমান, ক্ষুদ্র—বৃহৎ, ঘৃণা—প্রেমের আলোকে জ্যোতির্ম্ময়। পৃথিবীর সকল শিক্ষা জীবন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই খসিয়া পড়ে, তাহার সকল লজ্জা, সকল ভয়, সকল সংশয় চিতার অনলে নিমেষে দগ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যু নিরাভরণ, নিরাবরণ, সকল সংস্কারের অতীত—সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় নগ্ন, নিষ্কলঙ্ক। সে অনাদি, অনন্ত, উদার, নিত্য বিশ্ব-সঙ্গীতের সহিত অমর আত্মাকে মিলিত করে।

—"ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখ তারে সর্ব্বদৃশ্যে বৃহৎ করিয়া—" মানুষ বৃথাই প্রিয়জনকে বক্ষোমাঝে লুকাইতে চায়, বৃথাই সে তাহার জন্য অশ্রু বর্ষণ করে। তাহার প্রিয়জন যে অনন্তের ধন, পৃথিবীর পান্থশালায় তাই সে ক্ষণিকের অতিথি। এই ক্ষণিকের অতিথিটিকে শেষ বিদায় দিবার সময় কাহারও মনে যেন এতটুকু ক্ষোভের লেশ না থাকে, সকল দ্বন্দ্ব যেন চিরদিনের জন্য সেই ক্ষণটিতে অবসান হয়।

—"যা হবার তাই হোক্, ঘুচে যাক্ সর্ব্ব শোক,
সর্ব্ব মরীচিকা।
নিবে যাক্ চিরদিন পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্ত জন্ম-শিখা।
সর্ব্ব তর্ক হোক্ শেষ, সব রাগ সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বল' শান্তি বল' শান্তি, দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক্ ছাই।"

শিশু-পালন ও শিশু-রক্ষণ *

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী

ভদ্র-মহিলা ও ভদ্র-মহোদয়গণ, আপনাদের কাছে উপস্থিত হওয়ার এই সুযোগ পাওয়ার জন্য "কলিকাতা স্বাস্থ্য-সপ্তাহ" ও "ভারতীয় বেতার সঙ্ঘের" কর্ত্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। **"শিশু-সম্বন্ধে মাতার কি জানা প্রয়োজন"** এই বিষয়টা আজ আমাদের আলোচ্য।

শিশুর স্বাস্থ্য ও পরিণতি প্রধানতঃ তিনটী জিনিষের উপরে নির্ভর করে প্রথম, **বংশগত বৈশিষ্ট্য** দ্বিতীয়, **পারিপার্শিক অবস্থা**, ও তৃতীয়, **খাদ্য**। প্রথমটীকে পরিবর্ত্তন করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে কিন্তু দ্বিতীয়টী আংশিকরূপে এবং তৃতীয়টী সম্পূর্ণ ইচ্ছামতই বদলান যায়। শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা উপযোগী করতে গেলে, পিতামাতা বিশেষকরে মাতা ও চিকিৎসকদের মধ্যে সহযোগিতা থাকা দরকার। সন্তানকে দেহ ও মনে সুস্থ রাখ্‌তে হ'লে সন্তানবাৎসল্য ও অপত্য-স্নেহই যথেস্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে মা'য়েদের লালন-পালনের কাজটুকু চিকিৎসকদের কাছ থেকে শিখে নিতে হ'বে। এই লালন-পালনের নিয়ম কঠিন নয়। শিশু-খাদ্য ও শিশুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটামুটি দু'চারটী বিজ্ঞান-সম্মত কথা জেনে নিলেই যথেষ্ঠ।

শিশুর স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রথম কথা হ'লো **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা**। জামা-কাপড়, বিছানা-পত্র নোংরা হওয়া মাত্রই বদল করে দেওয়া উচিত এবং আপনারা তাহা করেও থাকেন কিন্তু এই সঙ্গে ধোয়াবার সময় সমুখ থেকে পেছনের দিকে ধোয়ানই শ্রেয়। কেন না এর ব্যতিক্রম হলে শিশুদের কঠিন ব্যারাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কানের পেছন, নখ, বগল ও উরুর ভাজ বেশ লক্ষ্য রেখে পরিষ্কার করা আবশ্যক। মা ও ধাত্রীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য। তাদের সর্দ্দি, কাশি বা অন্যকোন রোগ হ'লে শিশুকে ছোঁওয়া ত দূরের কথা, শিশুর ঘরে ঢোকাই নিষেধ। শিশুকে চুমো খাওয়া বা বুকে জড়িয়ে আদর করা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর।

পরিষ্কার রাখার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে শিশুকে নিয়মিত স্নান করান। জন্মের পর প্রথম স্নান পাশকরা ধাত্রী দিয়েই করান উচিত। নাভি পড়ে যাওয়ার পর রোজ স্নান করানই ঠিক—এ কদিন ঈষৎ গরম জলে গা মুছিয়ে দিলেই চল্‌বে। স্নান করাতে হবে এই ভাবে—প্রথমে দেখে নিতে হবে যে স্নানের পর পর্‌বার জামা-কাপড়, বিছানা, তোয়ালে ইত্যাদি ঠিক আছে, তারপরে

* ৩রা মাঘ "ভারতীয় বেতার-সঙ্ঘের" কলিকাতা বিভাগে পঠিত

তা'র পরের বারে। এইভাবে প্রত্যেকটী স্তন্য ৮ ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম পায়। মায়ের খাওয়া সম্বন্ধে কোন বাধকতা নাই তিনি শুধু এমন জিনিষই খাবেন যা সহজে হজম করতে পারেন।

শিশু **তোলা দুধ** দু' মাস বয়সে খেতে আরম্ভ করে তা' আগেই বলেছি। তোলা দুধ খাইয়ে ছেলে মানুষ করতে আমরা অল্পদিন কৃতকার্য্য হয়েছি কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই নয় যে নানা রকম "বিলাতি দুধ" খাওয়াতে হ'বে। ব্যবসাদারেরা এর যতই গুণ-গান করুন না কেন, তার দাম যেমন বেশী, তার চেয়েও বেশী ক্ষতিকর। এ গুলি সর্ব্বদাই সযত্নে বর্জ্জন করে চলতে আপনাদের একান্ত অনুরোধ করি। মায়ের দুধের পরে শিশুর পক্ষে গরুর দুধই শ্রেষ্ঠ ও সহজ-লভ্য অবশ্য যে গরুর দুধ খাবে তার কোন রোগ না থাকা চাই। কিন্তু খাঁটী দুধে চিনি জাতীয় জিনিষ ও জল না মেশালে একেবারেই অনুপযুক্ত এবং শিশুর পুষ্টির হানি করে। ছাগলের দুধ বা গাধার দুধ যে গরুর দুধের চেয়ে ভাল ইহা একেবারেই সত্য নয়। বরং ছাগলের দুধ খেলে শিশুদের সাংঘাতিক রক্তহীনতা দেখা যায়। গরুর দুধের সঙ্গে যে কোন একটা রবি-শষ্যের জল যেমন চাল বা যবের জল এবং চিনি মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। জন্মের পর কএকদিন রবি-শষ্যের জলের বদলে শুধু জল ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু চিনি চাই-ই। রবি-শষ্যের মধ্যে চালই সবচেয়ে ভাল ও অতি সহজে প্রাপ্য। পাঁচপোয়া জলে এক ছটাক চাল সিদ্ধ করে ফেন তৈয়ারী করা সকল ঘরেই চলতে পারে। বহুকালের পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে দুধের চিনি (Sugar of milk) আঁকের চিনি (Cane-sugar) এর চেয়ে বিশেষ গুণ সম্পন্ন নয়। এ অবশ্য ঠিক বুকের দুধে (Milk-sugar) আছে কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে এই চিনি অন্য দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে সমানভাবে হজম হবে। সত্য কথা এই যে Milk sugar খেলে পাতলা পায়খানা হয় ও বায়ু বাড়ে। এও দেখা গেছে যে milk-sugar দেহের ওজনের প্রতি ১০০ গ্রাম (gramme) এ একভাগ Dextrin মিশ্রিত এক বিশিস্ট চিনি ০·১৬ গ্রাম এবং ৪ ভাগ maltose এ একভাগ ০·১৬ গ্রাম, আঁকের চিনি ০·৭৬ গ্রাম এবং ৪ ভাগ maltose dextrin মিশ্রিত এক বিশিস্ট চিনি ১·৩২ গ্রাম শরীরে থাকে। তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে এই dextrin-maltoseই সবচেয়ে ভাল কিন্তু এর দাম বেশী বলে এবং আঁকের চিনির মারাত্মক কোন দোষ না থাকার দরুণ আঁকের চিনি নির্ব্বিবাদে দেওয়া যেতে পারে, তবে রুগ্ন শিশুদের জন্য dextrin maltoseই উপযোগী। গরুর দুধে যতখানি দুধ ততখানি ফেনের বেশী ফেন দিয়ে পাতলা করলে বা চিনি যোগ না দিলে একবারেই পুষ্টিকর হয় না। একসের দুধে ১½ ছটাক পর্য্যন্ত চিনি দেওয়া প্রয়োজন হয়।

শিশুরা তাদের ওজনের ১.৬ অংশ **তরল জিনিষ খায়**। তরল জিনিষের মাত্রা দিনে একসেরের বেশী কখনও হওয়া উচিত নয়। এই পরিমাণ খাদ্য তারা পাঁচবারে খাবে। এর বেশী খাওয়ালে বমি করে, বিছানা ভিজায় এবং ভাল খায় না। তোলাদুধ দু' মাস পর্য্যন্ত বোতলদিয়ে

খাওয়ানই উচিত কিন্তু বোতল ও চুষনি খাওয়ার অব্যবহিত পরেই ধুয়ে পরিষ্কার কর্‌তে হ'বে। এর পরে চামচ দিয়ে খাবে। শাকসব্‌জী, ফলের সার, নানারকমের জল ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিষে খনিজ পদার্থ, তেল, মাংসজাতীয় জিনিষ ও খাদ্যপ্রাণ যথেষ্ট আছে এইরূপ জিনিষ ঘন করে রেঁধে চামচ দিয়ে খাওয়াতে হয়। এই রকমে খাওয়ালে শুধু যে খাদ্যপ্রাণের অভাবে যে সমস্ত ব্যারাম হয় তারই নিবারণ হয় তা' নয়, বরং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। "পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শিশুর অত্যন্ত ক্ষতি হয় এবং ছোট বয়সেই এর বেশী। বার্লি (barley), ডিমের জল, ও মাখন তোলা দুধ খেয়ে বহু জীবনের এরূপ অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে যে মনে হয় একমাত্র বীজাণু ছাড়া অন্য কোন কারণে এত শিশু-মৃত্যু হয় নাই।"

ঠিক মত খাওয়ান হ'চ্ছে কি না বুঝ্‌তে হ'বে শরীর ও মনের বিকাশ দিয়ে। পানখানার ধরণ বা সংখ্যা দেখে শিশুর খাদ্যের পরিমাপ হয় না এবং হল্‌দে না হ'লেও দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই—যদি শিশু তা' সত্ত্বেও বেড়ে উঠে।

পরিশেষে বক্তব্য এই ভারতে বিশেষ করে কলিকাতায় **শিশু মৃত্যুর** হার অন্য সমস্ত সভ্য দেশের চেয়ে অনেক বেশী। গত ৪০ বছর ধরে কলিকাতার শিশুমৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ২৮০ টীর উপরে স্থানে স্থানে যেমন তালতলা অঞ্চলে ৫৩০। সেই জায়গায় ইংলণ্ডে হাজার করা ৬৩ ও নরওয়েতে ৫০। এর জন্য দায়ী আমাদের দেশের চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি সন্দেহ নাই। কেননা সেখানে শিশু-পালন ও শিশু-রক্ষণ সম্বন্ধে ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়ার বিন্দুমাত্র বন্দোবস্ত নাই। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এর জন্য ডাক্তারেরা ও জনসাধারণ কম দায়ী নন্। এ দেশের সর্ব্বসাধারণকে এ বিষয়ে সজাগ করা উচিত যে এই শিশুমৃত্যু নিবারণ করার পথ আছে। সকলের চেষ্টা সম্মিলিত হ'লে শিশুদের এই অপরিসীম দুর্গতির শেষ হয় এবং ইহা আরও আবশ্যক কেননা **এরাই দেশের ভবিষ্যৎ** ও **এরাই দেশের সম্পদ**।

খোকা খুকুরা যে স্নানের সময় কাঁদে তাতেই এদের **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া** হয় হাতপা ছোড়াটাও এরই সামিল। একটু বড় হ'লে অবশ্য তা'দের উপযোগী ডন করান যেতে পারে।

এক মাস বয়স হ'লে ছেলেকে **বাইরে বের করা** যায় কিন্তু যা'তে মাথায় হাওয়া ও চোখে রোদ্দুর না লাগে তা'র ব্যবস্থা করতে হয়। বাইরে কিন্তু মিনিট পনেরর বেশী কিছুতেই রাখা ঠিক নয়। যে ঘরে ছোট ছেলেরা ঘুমায় সেখানে খুব জোরে হাওয়া না লাগাই ভাল তবে হাওয়া চলাচল অবশ্য থাকা চাই।

চারিদিকে হৈ চৈ করলে এবং উত্তেজিত কর্‌লে ছেলেরা অনেক সময় অনবরত কাঁদে কেবল ক্ষিদে পেলেই যে কাঁদে তা' নয়। প্রথম দুই বছরে ছেলেদের মগজ যতখানি বাড়ে, বাকী সারা জীবনে ততখানি বাড়ে না। সুতরাং গোলমাল করে ছেলেকে শান্ত থাকতে না দিলে তা'র খোট মত চঞ্চল হয় এবং **মস্তিষ্কের বিকাশের** পথে গুরুতর বাধা দেয়। "ছোট শিশুকে নিয়ে

মোটরগাড়ী চড়া, বড় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে দেওয়া, জোর জবরদস্তি করে হাসান, কিম্বা নানারকম চক্‌চকে রং দেখিয়ে, আওয়াজ করে বা অন্য কোন রকমে খুসী করে তাকে চীৎকার করালে স্নেহবান্ বাপ-মা বা প্রশংসমান্ দর্শকের পক্ষে খুব আমোদের হ'লেও ছোট শিশুর অতিশয় ক্ষতি করে।' (হোল্‌ট্)

ছোট ছেলেমেয়েদের **নিয়মমত পাইখানায়** যাওয়ার অভ্যাস করা খুব শক্ত নয়। রোজ সকালে তা'দের 'পটে' বসিয়ে দিলে সে তা'রা চাক্ আর নাই চাক্ এ অভ্যাস সহজে হয়। বছর দেড়েক বয়স হ'লে তা'রা পরিষ্কার অপরিষ্কার বুঝ্‌তে পারে।

টিকে ছেলেপেলেদের দিতেই হ'বে দু' মাস কিংবা তা'র আগে দিতে পার্‌লেই ভাল।

জন্মদিনে

শ্রীলীলা নন্দী

কিবা চাহি, কি কামনা করি তব লাগি
জানিতে বাসনা তব? কেমনে বোঝাই?
কি কামনা নাহি করি, আমি তাই ভাবি!
এ জগতে কোন শুভ কাম্য মোর নাই—
তোমা তরে? তাই আজ তব জন্মদিনে
ভারে ভারে আনে সবে কত উপহার—
কত না কামনা করি, আমি ভাবি মনে—
সব দিতে পারি তারে—কিবা দিব আর?
ভাষা তাই হার মানে, মৌন হয়ে রই—
শুভ-ইচ্ছা উচ্চারিতে কথা বেধে যায়
নূতন করিয়া—আজ কিবা তারে কই—
এ জনম পূর্ণ যার শুভ কামনায়!
গাঁথিয়া এনেছি শুধু গীতি মালা খানি!
এই উপহার—কথিত সে বানী!

পূজারিণী

শ্রীনিখিলবালা সেনগুপ্তা

রাত্রি অধিক হয় নাই, একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে। মাঝে মাঝে দুই একটা শৃগাল চীৎকার করিতেছে। প্রকৃতি যেন গুম্ ধরিয়া আছে।

একখানি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী অরুণা, তাহার দক্ষিণ বাহুদ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া, একখানি পালঙ্কের উপর নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া আছে। ঘরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে, বৈদ্যুতিক পাখাও চলিতেছে। চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া তাহার অন্তরে এক তুফানের সৃষ্টি করিয়াছে। কত কথাই না তাহার মনে হইতেছে! আজ যদি তাহার মা বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে হয়ত তিনি এ বিবাহে সম্মতি দিতেন না। অরুণা ভাবিয়াই পাইতেছে না, তাহার পিতা রমানাথ কেমন করিয়া দরিদ্রের সন্তান বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার জামাতা মনোনীত করিলেন; তাহার কি দেখিয়া তিনি ভুলিলেন? সে বি-এ পাশ করিয়াছে? অরুণাও ত আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে। পিতা বলেন—বিনয়ের দেব দ্বিজে খুব ভক্তি, এমন সুপাত্র একালে মেলা ভার। পুতুলপূজা কি একটা কুসংস্কার নয় হিন্দুদের? পিতা সেকেলে লোক; তাঁহার সেকেলে ধরণ ধারণ অরুণা বরদাস্ত করিতে পারে। কিন্তু যাহাকে সে পতিত্বে বরণ করিবে, সেও হইবে এইরূপ কুসংস্কারান্ধ পৌত্তলিক, ইহা সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে? সে যে মনে মনে কত আকাশকুসুম গড়িয়াছে! যে তাহার স্বামী হইবে, সে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অথবা এমনই একজন কেহ হইবে, যাহাকে লইয়া নব্য জগৎ মাতিয়া উঠিবে! কিন্তু পিতা একি করিলেন? পিতার এই অভাবনীয় আচরণে অরুণার সমস্ত হৃদয়খানি যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে!

রমানাথ চট্টোপাধ্যায় গৌরীপুরের এক ধর্ম্মপ্রাণ, সমৃদ্ধিশালী জমীদার। অরুণা তাঁহার একমাত্র কন্যা। স্ত্রী বিয়োগের পর, 'মহাজন'দিগের পন্থা অনুসরণ করিয়া, তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই; মনে করিয়াছেন, কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে নিজের গৃহে আনিয়া রাখিবেন এবং পরিশেষে তাহাকেই তাঁহার সমস্ত জমীদারীর মালিক করিয়া যাইবেন। তাঁহার বাটীতে ৺মদনমোহন প্রতিষ্ঠিত। পত্নীর লোকান্তরপ্রাপ্তির পর তিনি কন্যাকে শিক্ষার্থ কলিকাতার বেথুন হোষ্টেলে প্রেরণ করেন। তখন হইতে তাঁহার সুখ-দুঃখের একমাত্র সঙ্গী এই ভাষাহীন ৺মদনমোহন ব্যতীত আর কেহই ছিল না। এই বিগ্রহের সেবা পূজার গৃহস্বামীর দিনগুলি শান্তিতেই কাটিয়া যাইত।

মাতৃহীনা কন্যাটীকে তিনি অতি যত্নেই মানুষ করিতেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিতে গিয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বৈগুণ্যে তাহার অন্তর হইতে যে হিন্দুধর্ম্মের চিরন্তন সংস্কারগুলি তিরোহিত হইতেছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইতেছিলেন।

পিতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অরুণা ৺মদনমোহনের গৃহে যাইত সত্য, কিন্তু নতশিরে প্রণাম ত সে তাঁহাকে করিতে পারিত না। ভগবান্—যিনি সর্ব্বব্যাপী, যাঁহার অঙ্গুলী হেলনে মুহূর্ত্তে প্রলয় হইতে পারে, তিনি কেমন করিয়া মনুষ্যসৃষ্ট ঐ ক্ষুদ্র পুতুলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন, ইহা সে ভাবিয়া পাইত না। মনে করিত, মানুষের কি স্পর্দ্ধা! সামান্য একটী পিপীলিকা সৃষ্টি করিবার যাহার ক্ষমতা নাই, সে কিনা সৃষ্টি করিবে ভগবান্‌কে! মজা মন্দ নয়!

কিন্তু এ সকল কথা বলিয়া অরুণা পিতাকে কখনও আঘাত দেয় নাই। যদি সে এই প্রশ্ন লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিত, তবে পিতা হয় ত বলিতেন—আরে পাগ্‌লি, হিন্দু যদি শুধু মূর্ত্তি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তবে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া সে একবস্ত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিত না। বিগ্রহের সম্মুখে অশ্রুধারায় বক্ষঃপ্লাবিত করিয়া 'দেখা দাও, দেখা দাও' বলিয়া রাত্রির পর রাত্রি অনশনে অনিদ্রায় কাটাইয়া দিত না; বরঞ্চ বিগ্রহের পর বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়া তাহার মাঝখানে বসিয়া চর্ব্ব-চুষ্য আহার করিয়া মজা লুটিত।

রমানাথ এতকাল কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করেন নাই; কিন্তু তাই বলিয়া একজন বিলাত-ফেরতের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া হিন্দুর শেষের সম্বল হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবেন, একল্পনাও তাঁহার চিত্তে কোন দিন স্থান পায় নাই। অরুণার হাব-ভাব, চাল-চলন দেখিয়া তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই, কারণ তিনি জানিতেন, বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের যতই স্বাতন্ত্র্য থাকুক না কেন, বিবাহের পর তাহাকে স্বামীর অনুগামিনী হইতেই হইবে। সুতরাং তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কেমন করিয়া একটি ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসী পাত্রের সঙ্গে কন্যাকে বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত করিয়া তাহার জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিবেন।

অনেক চেষ্টার পর রমানাথ মনের মত পাত্রের সন্ধান পাইলেন। হইলই বা বিনয় অর্থহীন, অর্থ তো তাঁহার ভাণ্ডারে যথেষ্ট আছে! বিনয় মাতাপিতৃহীন; এমন না হইলে তাঁহার গৃহে ঘরজামাই হইয়া থাকিবেই বা কেন? তিনিত সাধারণ লোকের ন্যায় জামাতার সম্বন্ধে তেমন কিছুই চাহেন না চাহেন মাত্র একটা ভক্ত-হৃদয়! তাহা ত বিনয়ের আছে। কীর্ত্তনে দরবিগলিত-ধারায় তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে ত রমানাথ অনেকদিনই দেখিয়াছেন, এবং এই সূত্র ধারাই যে বিনয় রমানাথের হৃদয়ের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তাহা ত অরুণা জানে না

রমানাথ একখানা আরাম-কেদারায় অলসভাবে বসিয়া আছেন। বিবাহের প্রস্তাবে দুহিতার ভাবান্তর তাঁহার চক্ষু এড়ায় নাই। তিনি মনে করিয়াছেন, অরুণার এই ছেলেমানুষী

দু'দিন পরেই সারিয়া যাইবে। বিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে; ইচ্ছা করিলে তিনি জামাতাকে আরও অনেক দিন পড়াইতে পারিবেন। বিনয় আর ২।১ টা পাশ দিলেই কন্যার অন্তরের মেঘ কাটিয়া যাইবে। তাঁহার বোধ হইতেছিল, এতদিনে বুঝি ৺মদনমোহন তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন এতদিন পরে বুঝি তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ সেবাইতের ব্যবস্থা করিলেন। আবার অরুণার মলিন মুখখানা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ডাকিলেন, "অরুণা।"

অরুণা—"যাই বাবা," বলিয়া ধীরপদক্ষেপে পিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মাথা নীচু করিয়া নিজের শাড়ীর আঁচলখানা ধীরে ধীরে খুঁটিতে লাগিল।

পিতা দেখিলেন, যে মুখে কখনও হাসি মিলাইত না, সেই মুখে কালিমার ছায়াপ ড়িয়াছে। তিনি একটু ব্যথিত হইলেন; বলিলেন, "মা, কেন এ পাগ্‌লামী তোর? তোকে হাত পা বেঁধে জলে ফেল দেব ব'লেই কি এতকাল বুকের রক্ত দিয়ে এমন ক'রে মানুষ করে আস্‌ছি? এ পিতাদ্বারা কি কখনও তোর কোন অমঙ্গল সাধিত হ'য়েছে? তবে আজ তোর এ অবিশ্বাস কেন মা?"

অরুণা কথা কহিল না। তাহার চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল মাত্র। পিতা কন্যাকে সাদরে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

আজ রমানাথের গৃহে আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে। তাঁহার যেখানে যত আত্মীয় স্বজন ছিল, বিবাহে সকলেই আসিয়া মিলিত হইয়াছে! আর আসিবেই বা না কেন? এইত রমানাথের প্রথম ও শেষ কাজ। সমস্ত বাড়ীখানি আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া ইন্দ্রপুরীর ন্যায় ঝল্‌মল করিতেছে। আকাশে অসংখ্য তারকা ফুটিয়া উঠিয়াছে;—তাহারাও যেন অরুণার বিবাহের কৌতুক দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। রহিয়া রহিয়া করুণস্বরে সানাই বাজিয়া যাইতেছে। বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে। গৃহের একটী প্রকোষ্ঠে আমোদ-প্রমোদ, হাস্যরসের পালা চলিয়াছে। দিদিশাশুড়ী ও শ্যালিকার দল বিনয়কে লইয়া নানা প্রকার ঠাট্টা-তামাসা জুড়িয়া দিয়াছে।

সুসজ্জিত বাসর-গৃহে বিবাহ-সাজে সজ্জিতা অরুণা একখানি সুদীর্ঘ দর্পণের নিকট একখানা কৌচে উপবিষ্টা। গৃহে অপর একটী প্রাণীও নাই। সকলেই বিনয়কে লইয়া মত্ত। দর্পণে আপনার রূপ দেখিয়া সে ভাবিতেছে, সে কি করিল?—জীবনের এত বড় একটা পরিবর্ত্তন সে অনায়াসে বরণ করিয়া লইল? এতটুকু শক্তি তার নাই? একবারও সে প্রতিবাদ করিতে পারিল না? তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি, রূপ-যৌবন, বিষয়-সম্পত্তি—সকলই সে বে-মালুম দান করিয়া বসিল? সে কি করিয়াছে, যে জগৎ তাহার সঙ্গে এত বড় একটা প্রতারণার অভিনয় করিল? এই সকলের বিনিময়ে সে কি পাইবে?

অরুণা কেবল বাহিরের দিকটাই দেখিল; মানুষের প্রকৃত সুখ কোথায়, তাহা সে বুঝিল না;—বুঝিবেই বা কেমন করিয়া? বিনয়ের হৃদয়ের সহিত ত তার পরিচয় হয় নাই। অরুণা মনে করিল, সে বড় ঠকিয়াছে। চাকুরে বাবুরা যেমন আফিসে সাহেবের নিকট অপমানিত হইয়া, গৃহে আসিয়া তাহার জের মিটাইয়া থাকেন, অরুণাও তাহাই করিবে স্থির করিল। সে মনে করিল, স্বামীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই সে রাখিবে না; তাহার নিঃসঙ্গ জীবনখানি নিঃসঙ্গই সে কাটাইয়া দিবে;—হঠাৎ দ্বারে একটা হাস্য-ধ্বনি শুনিয়া তাহার চমক্ ভাঙিল।

ভেজান দরজাখানি ধীরে ফাঁক করিয়া বিনয় কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। অব্যক্ত আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাহার হৃদয়খানি দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল; একটু আশঙ্কাও বুঝি তাহার অন্তরে ছিল—নবাগতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আশঙ্কা! আজীবন স্নেহের কাঙাল সে; বহুদিনের সঞ্চিত ব্যথার ভার আজ একটি স্নেহ-কোমল কর-স্পর্শে লঘু করিয়া লইবে, এই আশায় বুক বাঁধিয়া সে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু হায়! সে ত জানে না, ভগবান্ যাহাকে কাঙাল করিয়া সংসারে প্রেরণ করেন, তাহাকে যে তিনি কাঙালের বেশেই রাখেন।

অরুণার মুখখানি অস্বাভাবিক গম্ভীর; তাহাতে কোন ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। বিনয় মনে করিল, তাহার আসিতে দেরী হইয়াছে, তাই বুঝি অরুণার অভিমান হইয়াছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে ডাকিল, "অরুণা—"

কোচখানা সরাইয়া লইয়া অরুণা দৃঢ়স্বরে বলিল, "পিতার অশ্রুজলে আপনার সহিত বিবাহে সম্মতি দিয়েছি, কিন্তু আপনি পৌত্তলিক, আজ মনে হচ্ছে তাতে আমার নিজের উপর অন্যায় হোয়েছে, যা হোক, ভাগ্যকে আর ফেরাতে পারি না, আপনি এর বেশী আমার কাছে দাবী না কর্‌লেই আমি সুখী হব।"

বিনয়ের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। সহসা বজ্রপাত হইলেও বোধ হয়, সে এতটা আশ্চর্য্যান্বিত হইত না। তাহার উপবাসক্লিষ্ট দেহখানি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল, পৃথিবী তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে। বিনয় মেজেতে বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ সে একই ভাবে বসিয়া রহিল। অরুণাও কোন কথা কহিল না। সর্ব্বাপেক্ষা রাগ হইল তাহার শ্বশুরের উপর। তিনি এ বিদ্রূপ তাহাকে কেন করিলেন! সেত "বামন হ'য়ে চাঁদে হাত" দিতে চাহে নাই। অভিমানে তাহার হৃদয়খানি ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। গায়ের চাদরখানা শূন্য মেজেতে বিছাইয়া সে তার উপরেই শুইয়া পড়িল। অরুণা নিঃশব্দে পালঙ্কের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার নিদ্রা হইল না। ঢং করিয়া ঘড়ীতে ১টা বাজিল। বিনয়ের মনে একে একে তাহার অতীত জীবনের সকল দৃশ্যগুলিই উঁকি মারিতে লাগিল। মনে পড়িল তার মায়ের মুখখানি। পিতা তাহার অনেকদিনই চলিয়া

গিয়াছেন। তারপর এক বন্ধুর গৃহে সে আশ্রয় লইয়াছিল, সে আশ্রয়ও ত রহিল না। তাহার দেহ শ্রান্ত, আর যেন সে ভাবিতে পারিতেছিল না।

হঠাৎ তাহার নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, আজ সে ধনীর অট্টালিকার পালঙ্কের পার্শ্বে ভূমিশয্যায় শায়িত। এই বুঝি তার জীবনে দুঃখের চরম অবস্থা। মিথ্যাই সে এতকাল জগতের নিকট আশ্রয় চাহিয়াছে।

সহসা বজ্রের কড়্ কড়্ ধ্বনিতে সে চমকিয়া উঠিল। শুনিল শন্ শন্ শব্দে বাহিরে হাওয়া বহিতেছে, তার সঙ্গে বৃষ্টিও যোগ দিয়াছে। এতক্ষণ তাহার কর্ণে কিছুই প্রবেশ করে নাই। আর কতক্ষণ যে এইরূপে ভূমিশয্যায় শুইয়া থাকিবে? অরুণা ত তাহাকে ডাকিল না। সে কি তবে বন্ধুদের নিকট ফিরিয়া যাইবে? ছিঃ। তাহারা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তখন সে তাহাদিগকে কি বলিবে?—বলিবে কি যে, স্ত্রী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে? না, তাহা সে পারিবে না।

হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া সে উঠিয়া বসিল। বুঝিল, অরুণা নিদ্রিতা নহে, এ পাশ ও পাশ করিয়া সে ছট্‌ফট্ করিতেছে। কিন্তু আর নহে, আর ধনীর কৃপা বিনয় ভিক্ষা করিবে না,—প্রাণ গেলেও না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কক্ষ মধ্যে তখনও বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। বিনয় ডাকিল, "অরুণা—"

অরুণা উঠিয়া বসিল। মৃদুকণ্ঠে বিনয় বলিল, আমি পৌত্তলিক তা অসত্য নয়, কিন্তু তোমারও ভুল হোয়েচে, এ ভুল একদিন ভাঙ্‌বে, সেই আশা করেই যাব, তার আগে "তোমার কাছে আমার একটি মাত্র ভিক্ষা আছে—পিতার কথা আমার স্মরণ নাই, জগতে স্নেহ পেয়েছি একমাত্র মায়ের কাছ থেকে! সে দেবীমূর্ত্তি পূজা কর্ত্তে একদিন ও ভুলিনি। তোমাদের বাগানে ত ফুলের অভাব নেই, প্রতিদিন একটি করে ফুল আমার মায়ের চরণে দেবে কি? মায়ের ফটোখানি আমার ট্রাঙ্কে আছে। আমি চল্লুম্ অরুণা, আর—আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি সুখী হ'য়ো।"

এবার অরুণা কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবেন?"

"যে দিকে দুই চক্ষু যায়।"

"বাইরে যে জল—ঝড় হচ্ছে।"

"অন্তরে যার প্রবল তুফান উঠেছে, বাইরের ঝটিকায় তার কি কর্‌বে, অরুণা?"

সে আর দাঁড়াইল না, দরজা খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ঢং ঢং করিয়া ঘড়ীতে দুইটা বাজিল।

এই দুর্য্যোগে রাত্রি দুইটার সময় অরুণার বাক্য-বাণে বিদ্ধ হইয়া তাহার স্বামী গৃহত্যাগ করিল! সে ত কোন কথাই বলিতে পারিল না! কে যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

এতখানি যে হইবে, সে ও তা' কল্পনা ও করে নাই ! এতটা আঘাত যে সে দিয়া ফেলিয়াছে, তাহা ত সে বুঝিতে পারে নাই। অরুণা দুই হাতে মুখ লুকাইয়া বসিয়া রহিল।

* * * *

সকাল ৭টা বাজিল। অরুণা শয্যা হইতে উঠিল না। বাড়ীতে সকলেই যেন বিনয়ের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। অনিলা দৌড়াইয়া আসিয়া দেখিল, অরুণার দরজা খোলা ; জিজ্ঞাসা করিল, দিদি জামাই বাবু কোথায় রে ?" অরুণা বলিল, "জানিনা।"

বেলা ৮টা বাজিল ; বিনয়কে বাড়ীর কোন স্থানেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বাড়ীতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। গৃহে অরুণা চোরের ন্যায় বসিয়া আছে, তাহার মুখখানা সাদা, ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছে, "দাদার যেমন কাণ্ড, কোথাকার একটা অজানা-অচেনা দরিদ্রের ছেলে ধ'রে এনে মেয়েটার সর্ব্বনাশ কর্‌লেন।" কেহ বলিতেছে, 'দাদাবাবু রূপ দেখেই ভুলে গিয়েছিলেন।" আবার কেহ বলিল, 'ছেলেটাকে দেখে ত মনে হয় নি যে পেটে পেটে এত আছে'

রমানাথ বাবু নিজের কক্ষে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চিত্ত একটা আশঙ্কায় তোলপাড় করিতে লাগিল। সকলে বলিতে লাগিল, 'আহা, এমন সোণার প্রতিমা হতভাগা চিন্‌ল না!' অরুণা সবই শুনিতেছিল। তাহারই অপরাধের বোঝা সকলে বিনয়ের স্কন্ধে চাপাইতেছে, তাহার ইহা অসহ্য হইল। আলুথালুবেশে কম্পিতপদে সে পিতার কক্ষে উপস্থিত হইল। তাহার মুখ দেখিয়া রমানাথ বাবু চম্‌কাইলেন, কিন্তু ব্যাপার সবই বুঝিয়া লইলেন। গলবস্ত্র হইয়া অরুণা পিতার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল ; অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'বাবা, অপরাধী আমি।' পিতার চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। ভূলুণ্ঠিতা কন্যাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহে করুণকণ্ঠে বলিলেন, 'ভয় কি মা ? বিনয় আবার আস্‌বে। ৺মদনমোহনকে ডাক, অন্তরের গভীর প্রার্থনা তিনি কাহারও অপূর্ণ রাখেন না।'

* * *

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল ; বিনয় ফিরিল না, রমানাথ বাবু তাহার অনেক খোঁজ করিয়াছেন ; সহস্র সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ দিতে পারে নাই।

অরুণা রোজ পথের পানে চাহিয়া থাকে, যদি বিনয়ের কোন খবর সে পায়। কতদিন সে ডাকের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে, যদি বিনয় তাহাকে একখানা পত্র লেখে। কিন্তু ডাক চলিয়া যায় অরুণাও চোখ মুছিয়া নিরাশহৃদয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করে।

বিনয়ের মায়ের ফটোখানা অরুণা প্রতিদিন ফুল দিয়ে সাজায়,—বিনয়ের নিজের খানাও বুঝি বাদ পড়ে না। মাতৃমূর্ত্তির পানে সে নির্ণিমেষে চাহিয়া থাকে ; মনে করে, তাঁহার কতখানিই না ক্ষতি সে করিয়াছে। কিন্তু অবাক্‌বিস্ময়ে সে দেখে, একটুকু ভর্ৎসনার রেখাও সে মূর্ত্তিতে

ফুটিয়া উঠে না। তাঁহার হৃদয় যেন স্নেহ-সিক্ত, কোথাও দ্বিধার লেশমাত্র নাই। অরুণার বোধ হইল, এই ছবি তাহার বড় আপনার।—কিন্তু আজ মানুষের আসনে বসাইল সে ছবিকে? তবে আর হিন্দু দোষী কিসে? তাহাকে পৌত্তলিক আখ্যা দিয়া এ অবজ্ঞা কেন? ভক্তির আগুন—সে চকমকি ঠুকিয়াই জ্বালুক বা দীপ-শলাকা দিয়াই জ্বালুক, আগুন আগুনই থাকিবে। তবে তাহা নির্ব্বাপিত করিবার এ প্রয়াস কেন? যাহা গড়িতে জানে না, তাহা ভাঙ্গিবে সে কেমন করিয়া?

৺মদনমোহনের সেবার ভার অরুণা এক্ষণে নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রত্যহ বিগ্রহ সাজায়, তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে, মধ্যে মধ্যে ধ্যানস্তিমিতলোচনে তন্ময়ও হইয়া যায়। পিতা দেখিয়া দেখিয়া মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলেন, 'ঠাকুর তোমার পূজা তো তুমি করিয়ে নিচ্ছ, কিন্তু বড় আঘাত দিয়ে তাকে তুমি ফেরালে।'

অরুণা সংসারের কিছুই দেখে না—দিনের পর দিন তাহার ঠাকুর ঘরেই কাটিয়া যায়। অরুণার এক বিধবা মাসিমাতা আসিয়া সংসারের ভার লইয়াছেন। রমানাথ দেখিলেন, কন্যার বদন-মণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি মনে মনে বলিলেন, 'ঠাকুর অরুণার প্রাণে শান্তি দাও, ওকে তোমারই পূজারিণী করে নাও।'

এগার বৎসর কাটিয়া গিয়া প্রায় বার বৎসর হইতে চলিল, কিন্তু বিনয় ফিরিল না।

৺কাশীধামে অরুণার দিনগুলি বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ১২টা পর্য্যন্ত রমানাথবাবু কন্যাকে লইয়া মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া বেড়ান। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে, অন্নপূর্ণার মন্দির, দুর্গাবাড়ী—কিছুই তাহাদের দর্শন করিতে বাকি রহিল না। অনেক দিন হইতেই তিনি ভাবিতেছিলেন, একটু বাহির হইতে ঘুরিয়া না আসিলে কন্যার মনের ভার হাল্‌কা হইবে না। আর—তাহারও ত বয়স হইয়াছে; তাই বেড়ানও হইবে, তীর্থদর্শনও হইবে, এইরূপই একটা স্থান নির্ব্বাচন করিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীকে মুক্ত করিয়া দিলে, তাহার যেমন অনন্ত গগনে সঞ্চরণের অবধি থাকে না, অরুণারও তেমনি গৃহের অবরোধ হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া আর গৃহে ফিরিবার কথা স্মরণ থাকিত না। কোথায় নাগোয়ার হিন্দু ইউনিভার্সিটী কোথায় ব্যাস-কাশী, কোথায় সারানাথ—সকলই সে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রিতেও তাহার বিরাম ছিল না—চণ্ডীপাঠ, ভাগবত-পাঠ, এই সকলের মধ্যে সে একেবারে ডুবিয়া গেল। এত বাড়াবাড়ি রমানাথ বাবুর বৃদ্ধ হাড়ে সহিল না। তাঁহার দেহ যেন একটু ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সে দিন দুপুরে রমানাথবাবু অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শয্যার উপরে দেহখানি এলাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিলেন। কলিকার তামাক পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, তিনি অন্যমনস্কভাবে তাহাই টানিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "কি ছাই দিয়েছিস্?—সবই যে পুড়ে গেল।" ভৃত্য এস্তপদে আবার তামাক সাজিতে গেল। অরুণা

আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিল। পিতার দিকে তাকাইয়া বলিল, "বাবা, তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?" মাথায় হাত দিয়া দেখিল, তাঁহার কপাল বেশ গরম। চিন্তিতভাবে সে কহিল, "তোমার আমার সঙ্গে অত ঘুরে বেড়ান ঠিক হয় নি, বাবা।"

"ও কিছু নয়, একটু জ্বর হ'য়েছে মাত্র। তোকে ত এখনও সব দেখান শেষ হয় নি; জ্বরটা এসেই মাটি করলে।"

"তা হক্ বাবা, সে জন্য তুমি ভেবো না; তুমি সেরে উঠ্‌লে আবার সব দেখা যাবে।"

"আজ কি তবে আর বের হবি না, মা?"

"না, বাবা; তোমায় একা রেখে কোথায় যাব?"

* * * *

রমানাথবাবুর অসুখ ক্রমে বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। সকলের মুখেই চিন্তার রেখা পড়িয়াছে। বন্ধু-বান্ধব-বিহীন, বিভুঁই বিদেশে ভগবান্ কি করিবেন, তিনিই জানেন! আত্মীয়-স্বজন অনেককেই অরুণা তার করিয়া আনাইয়াছে। ডাক্তারের আনাগোনার বিরাম নাই। ডাক্তার বলিয়াছেন—রোগীর অবস্থা আশাপ্রদ নহে, কখন কি হয় বলা যায় না। অরুণার দেহের মধ্যে যেন একটা আগুনের প্রবাহ ছুটিল। দিনরাত সে পিতার পীড়িত-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকে।

* * * *

নিশুতি নিঝুম রাত। বারাণসী যেন মরণকাঠির পরশে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। বাহিরের জ্যোৎস্নার অস্ফুট আলোক মুক্তবাতায়নপথে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে শুধু একটা পেচকের বিকট চীৎকার। গৃহ-মধ্যে জাগিয়া একমাত্র অরুণা। রোগ-শয্যায় শুইয়া বৃদ্ধ রমানাথবাবু যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। শুশ্রূষাকারীরা যেন অবসন্ন হইয়া অজ্ঞাতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় রমানাথবাবু অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "অরুণা, একটা গান কর্‌না মা, অনেক দিন তোর গান শুনি নি।" অজ্ঞাত আশঙ্কায় অরুণার চোখে জল দেখা দিল। সে গাইল,—

"দয়াময়! এসময় তুমি আছ হে কোথায়?
দেখা দাও অবলায়! নহে বুঝি প্রাণ যায়।

* * *

শুনি তুমি কৃপাসিন্ধু, বিপদে সবার বন্ধু,
আজি বিতরিয়া কৃপাবিন্দু, রাখ, প্রভো, রাঙ্গা পায়।"

অকস্মাৎ রমানাথবাবু ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। বলিলেন, "দেখ্‌ছিস্ না, ৺মদনমোহন আস্‌ছেন? চুপ করে চেয়ে আছিস্? দে, দে—

সব সরিয়ে দে—রাস্তা পরিষ্কার ক'রে দে। আমায় উঠিয়ে একটু বসিয়ে দেত মা! একবার চ—র—ণ—" অরুণা বালিশের উপর বালিশ দিয়া পিতার মস্তক উঁচু করিয়া দিল; সে ডাক্তারকে খবর দিবার জন্য শশব্যস্তে উঠিয়া যাইতেছেন, পিতা ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। অরুণা পিতার চক্ষের ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিল;—তাঁহার অন্তর যেন কোন্ অজানা দেশের অচিন্ পথ বাহিয়া চলিয়াছে—এতক্ষণে অনেক লোক আসিয়া তাঁহার পাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধের মুখমণ্ডল যেন দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! তিনি একবার মুখ খুলিলেন, তাঁহার মুখে একটু গঙ্গাজল দেওয়া হইল। একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি চিরদিনের মত চক্ষু মুদিলেন, তাঁহার দেহখানি ধীরে ধীরে উপাধানের উপর এলাইয়া রহিল। সব শেষ হইয়া গেল!

অরুণা এতক্ষণ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিল। এবার সে উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিল, "বাবা, তোমার অরুণাকে কার হাতে দিয়ে গেলে? জগতে যে সবাই তাকে ছেড়ে চ'লে গেছে—তুমিও কি ছেড়ে চল্লে, বাবা?"

কিছুক্ষণ পর চেতনা লাভ করিয়া অরুণা উঠিয়া বসিল। পিতার দেহ সে স্বহস্তে কুসুমে সজ্জিত করিল। কাহারও নিষেধ সে শুনিল না—শ্মশানে সে যাইবেই। মানব-জীবনের পরিণতি সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে!

শব মণিকার্ণিকার ঘাটে নীত হইল। এই ত শ্মশান! ধনী-নির্ধন, জ্ঞানী-অজ্ঞানের বিচিত্র মিলন-ভূমি। উত্তরবাহিনী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা মানবের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না বক্ষে লইয়া কুলুকুলু রবে কাহার সন্ধানে ছুটিয়াছে।

দুইখানি বাঁশে বাঁধিয়া বাঁধিয়া শুভ্রবস্ত্রে মোড়া কত শব গঙ্গার জলে ডুবাইয়া তুলিয়া লইতেছে। হায়! যে সকল দেহ এতকাল কত যত্নে রক্ষিত হইয়াছে, এই কি তাহাদের পরিণতি? প্রকৃতির একি পরিহাস? সকলই ত পড়িয়া রহিল। এই ভিখারীর বেশে তাহারা কোন্ সুদূরের সন্ধানে যাত্রা করিল? অরুণা একবার অনন্ত নীলাকাশের দিকে তাকাইল, আবার নির্ব্বিকার গঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখিল। প্রকৃতির কোনই পরিবর্ত্তন নাই—শুধু তাহারই অন্তর ও বাহির শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। উদাসদৃষ্টিতে সে কেবল চাহিয়া রহিল।—দেখিল, কেমন করিয়া অনল-শিখা তাহার পিতার যত্নে সজ্জিত দেহখানি বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য করিতেছে। অরুণার সব ফুরাইল। আজ সংসার ও শ্মশানে তাহার নিকট কোন প্রভেদ নাই। ভগবান্ এমনি করিয়াই বুঝি তাঁহার ভক্তকে রিক্ত করিয়া কাছে টানিয়া লন।

(৪)

তুষারাবৃত হিমালয়ের শিখরদেশে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট একটী বৃদ্ধযোগী। তাঁহারই পার্শ্বে বসিয়া গৌরবর্ণ এক যুবক। যুবকের দেহ তেজঃপুঞ্জ, চক্ষু হইতে স্নিগ্ধজ্যোতি বিকীর্ণ

হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রণবধ্বনি থামিয়া গেল, তাহার প্রতিধ্বনিও হাওয়ার তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া দূরে—অতি দূরে—চলিয়া গেল। যোগিবর কথা কহিলেন; বলিলেন, "যোগানন্দ, ৺পিতার আদেশ, তোমাকে যাইতেই হইবে। চৌদ্দ বৎসর তপশ্চর্য্যা করিয়াও নিজের উপর বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছ না? আর—তোমার এসাধনা ত এক জীবনের নয়! তুমি না গেলে, কে তাহাকে দীক্ষা দিবে? একটি প্রাণ আলোকের জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে, করুণাময় কি তাহাকে পায়ে ঠেলিবেন? তুমি ত জান, তুমিই তাহার পূর্ব্বজন্মের গুরু।"

"আপনি ত জানেন, এই রমণীর জন্যই আমাকে যোগভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল; নচেৎ আমাকে ত আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইত না। আবার সেখানেই ফিরিয়া যাইব?"

"তুমি পাগল! তোমার যোগচ্যুতি জগৎপিতার ইচ্ছা; অরুণা তাহার নিমিত্তমাত্র। তোমরা যদি অত তাড়াতাড়িই তরিয়া যাইবে, জগৎকে উদ্ধার করিবে কে? প্রতিজন্মে যদি অন্ততঃ একটা প্রাণও উদ্ধার করিতে পার, কোটীবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিও, ইহাই তোমার গুরুর আশীর্ব্বাদ। আমার আদেশ, গৌরীপুরে চলিয়া যাও; কাজ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিও।"

যোগানন্দ বুঝিল, গুরু অটল। আদেশ তাহাকে পালিতেই হইবে। আর অরুণার নিকট ঋণী ও ত সে কম নয়! কোথায় থাকিত তাহার এই সাধন-ভজন, যদি অরুণা তাহাকে জোর করিয়া এপথে ঠেলিয়া না দিত। জীবনের এত বড় সুযোগ সে ত অরুণার জন্যই পাইয়াছে। সে ত প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কাজই করিয়াছে। আর সে স্বামীর কার্য্য অপূর্ণ রাখিবে? এত বড় স্বার্থপর সে? ছিঃ—অরুণাকে উদ্ধার তাহার করিতেই হইবে; অরুণা পড়িয়া থাকিলে যে তাহারও অগ্রসর হওয়া হইবে না। আহা না জানি অরুণা কত কষ্টই পাইতেছে। তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল।

* * * *

গৌরীপুরে রমানাথ বাবুর ঠাকুর-ঘরে বসিয়া অরুণা একা। রমানাথ বাবু আর ইহজগতে নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কন্যাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "মা, দীক্ষা গ্রহণ করিস্ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত ভগবদ্দর্শন হয় না।" অরুণা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বাবা, সদ্‌গুরু কোথায় পাব?' উত্তরে রমানাথ বাবু বলিয়াছিলেন, 'মা, জমী প্রস্তুত হ'লে ভগবান্ নিজেই গুরু প্রেরণ করেন। তার জন্য তোকে ভাব্‌তে হবে না; কেবল নিজের কাজ ক'রে যা।' হায়! আজ ত সে পিতা আর নাই। দুঃখে কে তাহাকে সান্ত্বনা দিবে? কে-ইবা তাহার অশ্রু মিলাইয়া সমবেদনা প্রকাশ করিবে? বিশাল সংসারে অরুণা যে আজ একা! ধন, ঐশ্বর্য্য—সকলই তাহার আছে; কিন্তু ইহা লইয়া সে কি করিবে? কই ভগবান্ ত তাহাকে দয়া করিলেন না? শান্তি লাভের আশায় তাহার প্রাণ যে হাহাকার করিতেছে! এত চোখের জলেও যে তাঁহার আসন টলিল না। এ দুর্ব্বহ জীবন-ভার আর কতকাল সে বহন করিবে? আজ চৌদ্দ বৎসর সে ঠাকুরের সেবা

করিয়াছে। তিনি তাহার সঙ্গে স্বপ্নে কথা বলেন বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ত তাঁহার সঙ্গে কোন আদান-প্রদানই অরুণার হয় না। দিনের পর দিন তাহার ব্যর্থই হইয়া যাইতে লাগিল!

* * * *

একদিন অরুণা শুনিল, গৌরীপুরে একজন সাধু আসিয়াছেন। সাধুটী বড় অদ্ভুত! দিনের বেলায় এক বৃক্ষতলে আসন করিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই—নিজের ভাবেই নিজে বিভোর; কাহারও সঙ্গে কোন কথাও বলেন না। রাত্রিতে যেন কোথায় চলিয়া যান, তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না।

অরুণার প্রাণটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সাধু?—তবে কি ভগবান্ এই সাধুকেই তাহার গুরুরূপে প্রেরণ করিলেন? বিনয়ের খবরও ত তিনি কিছু জানিতে পারেন, সাধুরা ত সর্ব্বজ্ঞ হ'ন।

অরুণা সাধুটার খোঁজ লইবার জন্য প্রতিদিন সেখানে লোক পাঠাইতে লাগিল, প্রতিদিনই লোক আসিয়া সাধুকে কোথায়, কিভাবে দেখিল ইত্যাদি সংবাদ তাহাকে দিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। সাধুকে তাহার অসাধারণ বলিয়াই জ্ঞান হইতে লাগিল। ইচ্ছা হইতে লাগিল, সাধুর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করে।

সে দিন রাত্রিতে অরুণা স্বপ্নে দেখিল; পিতা বলিতেছেন—মা, আর দেরী কেন? গুরু ত উপস্থিত; এবার দীক্ষা গ্রহণ কর্, আমি নিশ্চিন্ত হই। ঘুম ভাঙিলে তাহার প্রাণটা কেমন কেমন করিতে লাগিল।

অরুণা টাকা-পয়সা, ফল-মূল প্রভৃতি নানাপ্রকার উপহার দিয়া সাধুর নিকট লোক প্রেরণ করিল এবং একখণ্ড কাগজে লিখিয়া তাহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিল। লোক জন সাধুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাগজখণ্ড তাঁহার হাতে দিল! আজ সাধু কথা কহিলেন। বলিলেন, "দীক্ষার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রাখিতে বলিও, জমিদারকন্যাকে কাল দীক্ষা দান করিব।"

লোকে এতদিন সাধুর মুখের একটী বাণী শুনিবার আশায়, দিনের পর দিন আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট রহিয়াছে; কিন্তু কই তিনিত একটা কথাও কহেন নাই! তাহারা মনে করিল, বড় লোকের কাছে সকলেই মস্তক অবনত করে—সাধুও বাদ যায় না!

* * * *

দীক্ষার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। একখানি সুপ্রশস্ত কক্ষে দুইখানি আসন পাতা। ধূপধূনার গন্ধে গৃহখানি আমোদিত অপর কোন আয়োজন নাই। ইহাই অরুণার গুরুর আদেশ গুরু আরও বলিয়াছেন—একখানি আসনে বসিয়া অরুণা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার ইষ্টের ধ্যান করিবে। দীক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বে সে গুরুদর্শন করিতে পারিবে না।

দীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। অরুণা নিমীলিতনয়নে ইষ্টধ্যানে মগ্ন। ধীরে ধীরে গুরু কক্ষে প্রবেশ করিয়া পার্শ্বস্থিত আসনে উপবেশন করিলেন। গৃহের এককোণে অরুণার

মাসীমাতা উপবিষ্টা। যোগানন্দ অরুণার কাণে মন্ত্র দিলেন। তাহার অন্তরে যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল!

দীক্ষা শেষ হইয়া গেল। আজ অরুণার হৃদয়পূর্ণ। আভূমিনত হইয়া সে গুরুর চরণ বন্দনা করিল। মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে তাকাইল;—অরুণা এ কি দেখিল। এ-ই না সেই মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তি অরুণা এতকাল ধ্যান করিয়া আসিতেছে?—যাহার অদর্শনে কত দিন কত দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষ কাঁপাইয়া নৈশ গগনে মিলাইয়া গিয়াছে?—কত 'অন্তর্গূঢ় ঘন' ব্যথা তাহার অন্তরে বিলীন হইয়াছে? পুলকে অরুণার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। উদ্গত অশ্রুধারা সে দমন করিতে পারিল না; কাঁদিয়া স্বামীর পদমূলে লুটাইয়া পড়িল। বলিল, 'ওগো, বড় ব্যথা তোমায় দিয়েছি, আমায় ক্ষমা কর।"

বিনয় সস্নেহে অরুণার মস্তকে ও পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "অরুণা, আমি তোমার দীক্ষাগুরু, এ কথা ভুলে যেয়ো না। সংসারে কেহই আপনার নয় অরুণা, সব ভগবানের খেলা; দোষগুণও কাহারও নাই, সব তাঁরই ইচ্ছা—আমরা যন্ত্রমাত্র। আমার অত্রকার কাজ শেষ হইয়াছে অরুণা, আমি চলিলাম। প্রয়োজন হইলে, আবার দর্শন পাইবে।"

এবার অরুণা মুখ তুলিল; কিন্তু দেখিল, বিনয় নাই।

সে দিন হইতে আর গৌরীপুরে কেহ সাধুকে দেখিতে পায় নাই।

নারী-সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ

(শ্রীমীরা দেবী সঙ্কলিত)

মহাপুরুষ যখন আসেন, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাব-বিগ্রহরূপেই আসেন। নিয়া আসেন বজ্র ও বিদ্যুৎ, নিয়া আসেন জলভরা মেঘের প্রবল বারিধারা। দগ্ধ করেন জাতির স্থবিরতা, দূর করেন পথের কণ্টক, সিক্ত করেন জাতির মন, উজ্জীবিত করিয়া উর্ব্বর করেন জাতির জীবন।

ধ্যানী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ আসিলেন—জাতির জীবনে সে এক সন্ধিক্ষণ। সমগ্র জাতি যেন একটা আবর্ত্তে পড়িয়া বিভ্রান্ত হইয়া গেছে। নবযুগের পুণ্যপিঠ দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেখানে যুগচক্র প্রবর্ত্তন করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সেই নবচক্রের ভাব-বাহক হইয়া কর্ম্মকুণ্ঠ ও বিভ্রান্ত জাতির সম্মুখে এক নব আদর্শ স্থাপন করিলেন। ধন্য হইল পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। উহারই তীরে পত্তন হইল এই যুগপ্রবর্ত্তকের কর্ম্মকেন্দ্র। ইহাই ত বেলুড় মঠের সৃজনী-প্রেরণা।

জাতির বাঁচিবার পন্থানির্দ্দেশ স্বামীজি করিলেন, দৃষ্টি তাঁহার উদারও উন্মুক্ত ছিল। সন্ন্যাসী তিনি ছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসের উগ্রতা ও অহমিকা তাঁর ছিল না। এই জন্যই দেখিতে পাই, এদেশের নারীদের

সমস্যাগুলি আন্তরিকতা ও দরদ দিয়া তিনি বলিতে পারিয়াছেন। সর্ব্বোপরি যাঁহার গুরুদেব স্বয়ং মাতৃভাবের উপাসক ছিলেন, আপনার স্ত্রীকে পর্য্যন্ত মাতৃরূপে সম্বোধন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার দিগ্বিজয়ী শিষ্যের পক্ষে নারীকে মাতৃরূপে পূজা ও শ্রদ্ধা করা মোটেই বিচিত্র নয়।

স্বামী বিবেকানন্দের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। নারীসমস্যাগুলি সম্বন্ধে তার চিন্তা ও ধারণার সহিত পরিচিত হওয়াই এখানে আমাদের কাম্য। কৌমার্য্য ব্রত-ধারী বীর সন্ন্যাসীর নিকট নারীর মাতৃরূপই আদর্শস্থানীয় হইয়া দেখা দিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন "ভারতে যখন আমরা আদর্শ রমণীর কথা ভাবি, তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই আমাদের মনে আসে—মাতৃত্বেই তাহার আরম্ভ এবং মাতৃত্বেই তাহার পরিণতি। নারী শব্দ উচ্চারণেই হিন্দুর মনে মাতৃভাবের উদয় হয়। ভগবানকে তাহারা মা বলিয়া ডাকে।
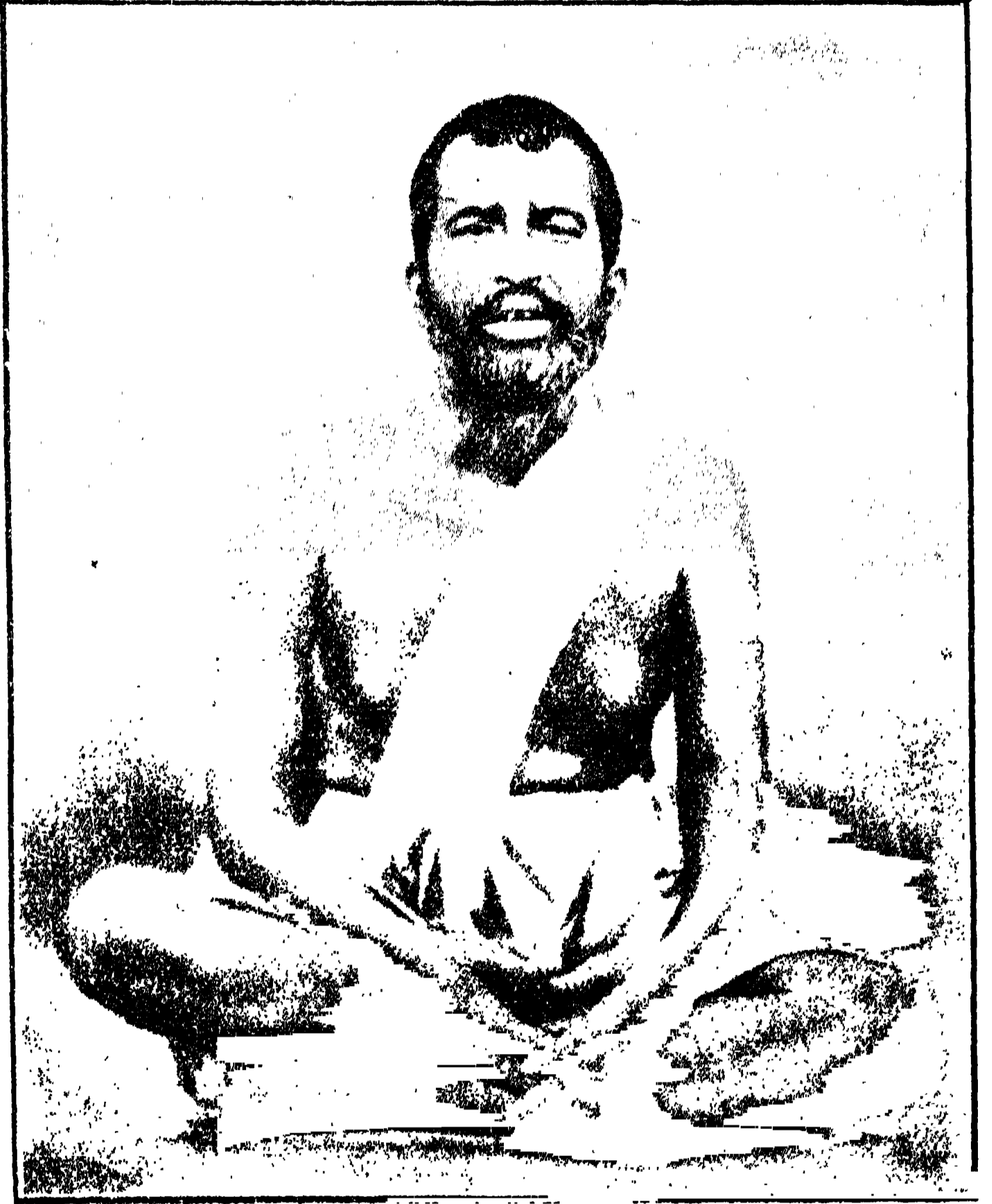
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতে নারীত্বের পরাকাষ্ঠা হইল মাতৃত্বে—সেই অপূর্ব্ব স্বার্থলেশহীনা, সর্ব্বংসহা, ক্ষমাস্বরূপিণী মাতাই আমাদের আদর্শ……ভারতীয় নারীর বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে মাতার আদর্শই শ্রেষ্ঠ, স্ত্রী অপেক্ষাও তাঁহার আসন উচ্চে। স্ত্রী তাঁহার পশ্চাদনুসারিণী ছায়া।"

নারীর ভারতীয় আদর্শের সহিত পাশ্চাত্যের আদর্শের তুলনা করিয়া স্বামীজি লিখিয়াছেন—

"পাশ্চাত্যে নারী স্ত্রীশক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে স্ত্রীশক্তিতেই কেন্দ্রীভূত। ভারতের একটা সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত নারীশক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত। পাশ্চাত্য স্ত্রী পরিবারকে শাসন করেন; পরন্তু ভারতের পরিবার মাতার শাসনাধীন।"

নারীত্বের এই মাতৃরূপই স্বামীজির নিকট চরম আদর্শ ছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন—"মাতৃত্বলাভই নারীর নারীত্বের একমাত্র সার্থকতা।...হিন্দুমতে মা হওয়াই নারীজীবনের চরম উদ্দেশ্য।"

নারীত্বের হিন্দু আদর্শের উপর স্বামীজি যেমন সশ্রদ্ধ ছিলেন, বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধেও তিনি ভারতীয় আদর্শের প্রতিই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"বিবাহসম্বন্ধে ভারত ও পাশ্চাত্যের আদর্শ ভিন্ন। পাশ্চাত্যে বিবাহ বলিতে শুধু আইনের বন্ধন, পরের যাহা কিছু তাহাই বুঝায়। ভারতের দৃষ্টিতে, বিবাহ স্ত্রীপুরুষের অনন্তকালের সম্বন্ধ ঘটাইবার একটা সামাজিক ব্যবস্থা। তাহাদের কেহ জীবনে অত্যধিক পিছাইয়া পড়ে তবে সেই স্ত্রী বা স্বামী যতদিন
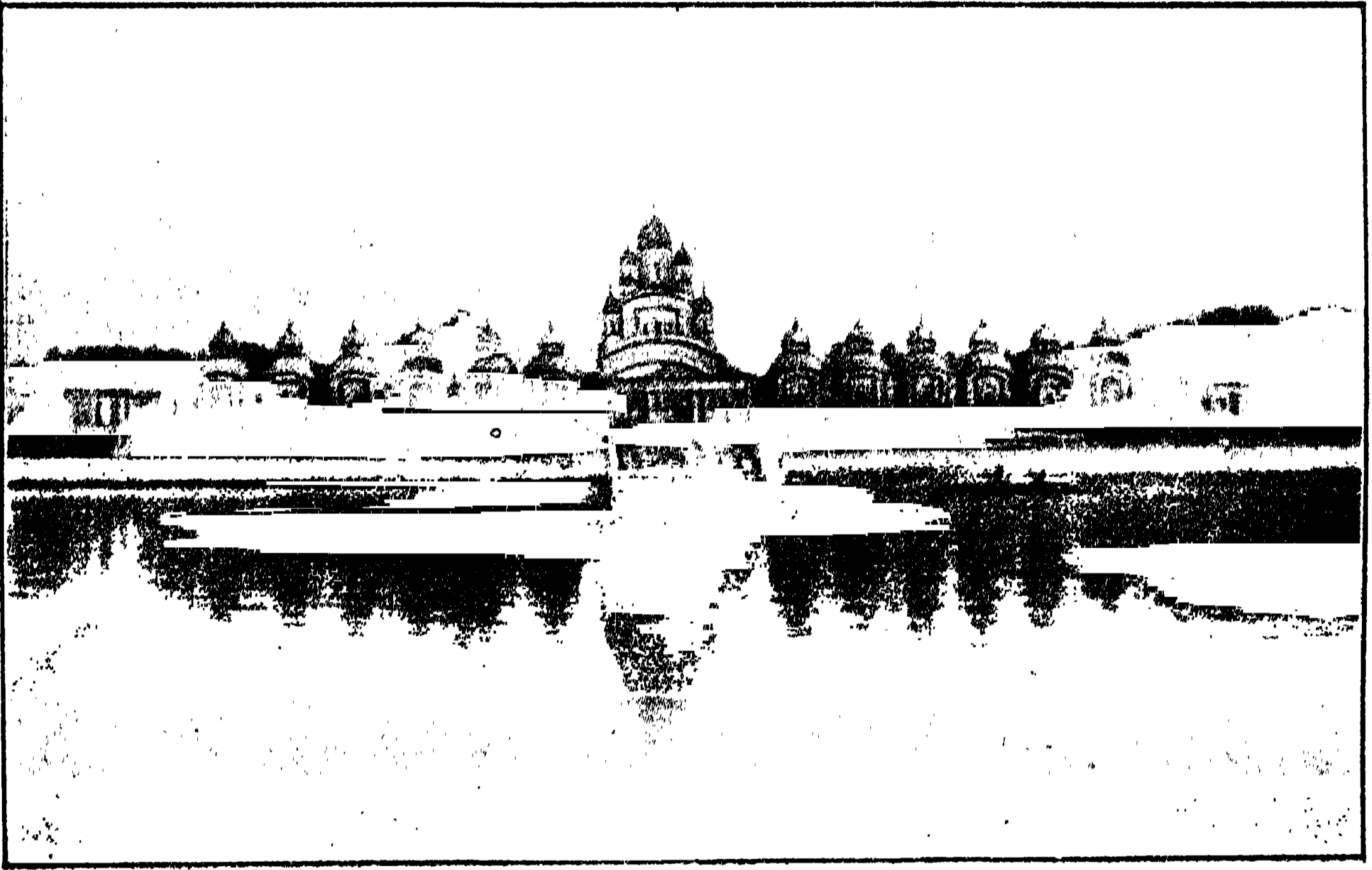
দক্ষিণেশ্বরের মন্দির

পর্য্যন্ত তাহার সহধর্ম্মী বা সহধর্ম্মিণীর সমকক্ষ না হইতেছে ততদিন অগ্রগামীর পক্ষে অপেক্ষা করিয়া থাকা ভিন্ন উপায় নাই।"

তাই ভারতীয় নারী-আদর্শের চরম বিকাশ সীতা ও সাবিত্রীর কথা স্বামীজির কম্বুকণ্ঠে বারবার ঘোষিত হইয়াছে। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধি-স্বরূপা; যেন মূর্ত্তিমতী ভারত-মাতা। সীতা নামটি ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, যাহা কিছু পুণ্য তাহারই পরিচায়ক। নারীগণের মধ্যে আমরা যে ভাবকে নারীজনোচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি, সীতা বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে।... সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন; প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। ভারতীয় নারীগণকে সীতারপদাঙ্কানুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে—ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।"

"হে ভারত ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে—ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে যখন আমাদের চিত্ত সংশয়াকুল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে আমাদের এই সামাজিক বিপর্য্যয়ের কথায় তিনি লিখিলেন :—

পরিব্রাজক

"একদিকে নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন, পতি-পত্নী নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত ; কারণ যে বিবাহ আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব ; অপরদিকে প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব তাহাই সমাজে প্রচলিত ; তুমি বহু জনের হিতের জন্য নিজ সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।"

"আমার পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাহাতে ইহাই ধারণা হইতেছে যে পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারতীয় সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রেই এদেশে নিস্ফল হইবে। যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না

করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে তাহা না মানিয়া, স্ত্রী পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অনুমাত্র ও সহানুভূতি নাই।"

স্বামীজি যখন আমেরিকা গেলেন, সেই সময়ে পাশ্চাত্য নারীর সহজ ও সলীল জীবনধারায় মুগ্ধ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের নারীদের দুর্দ্দশার কথা তাঁহার চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন—"প্রত্যেক আমেরিকান নারী লক্ষ লক্ষ হিন্দুললনা হইতে অধিক শিক্ষিতা। আমাদের মহিলাগণ কেন না উহাদের মত শিক্ষিতা হইবেন?

বীরবেশে

"এদের মেয়ে দেখিয়া আক্কল গুড়ুম। আমাকে বাচ্চাটির মত ঘাটে মাঠে দোকান হাটে লইয়া যায়। সব কাজ করে—আমি তাহার সিকিও করিতে পারি না। ইহারা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী — ইহারা সাক্ষাৎ জগদম্বা। এই রকম মা জগদম্বা যদি একহাজার আমাদের তৈরী করিয়া মরিতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিব।

"ইহাদের মেয়েরা কি পবিত্র! পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের কমে কাহারও বিবাহ হয় না, আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার হাট, রোজকার, দোকান, কলেজ, প্রফেসারী সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র। আর আমরা করি কি? আমরা মেয়ের এগার বৎসরে বিবাহ না হইলে খারাপ হইয়া যাইবে মনে করি। আমরা কি মানুষ? এদের স্কুলকালেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলের পথে চলিবার যো নাই।

আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি, তাহার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।” নারীকে পক্ষাঘাতে অবশ করিয়া জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সম্ভব নয়। তিনি বলিয়াছেন—

“ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরুগ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার, সেইজন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ।”

গোড়া সমাজসংস্কারকদের তীব্র কশাঘাত করিয়া বলিয়াছেন—“বলপূর্ব্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? কুসংস্কার শিখাইয়া পুণ্যকরাণই বা কেন? সমাজের জন্য যখন সমস্ত সুখেচ্ছা বলি দিতে পারিবে তখন ত তুমিই বুদ্ধ হইবে, তুমিই মুক্ত হইবে, সে ঢের দূরে। আবার তাহার
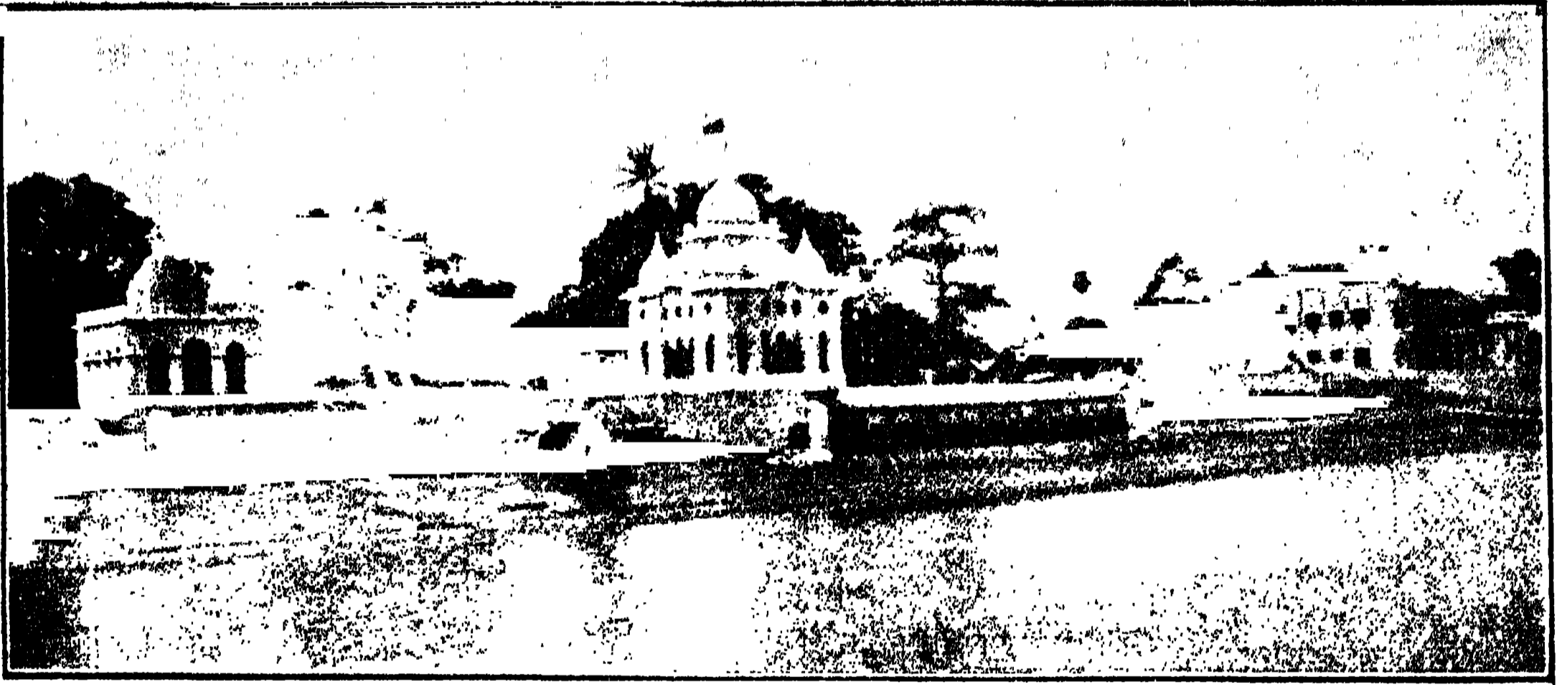
বেলুড় মঠ

রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়া? আহা!! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টান্ত, এমন রীতি কি আর হয়॥ আহা, বাল্যবিবাহ কি মধুর। সে স্ত্রীপুরুষে ভালবাসা না হইয়া কি যায়॥ এই বলিয়া নাকে কান্নার এক ধুয়া উঠিয়াছে। আর পুরুষের বেলা—।”

নারীকে খাটো করিয়া নীচু করিয়া আমরাই পতিত হইয়াছি। স্বামীজি সেকথার উল্লেখে তীব্র কণ্ঠে বলিয়াছেন—“প্রভো এখন বুঝিতে পারিতেছি। আমরা মহাপাপী—স্ত্রীলোককে ঘৃণ্য, কীট, নরকমার্গ—ইত্যাদি বলিয়া বলিয়া অধোগতি হইয়াছে। বাপ, আকাশ পাতাল ভেদ॥ প্রভু কি গপ্পিবাজিতে ভোলেন?” প্রভু বলিয়াছে, ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী।”

“দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন স্পন্দনহীন হইয়া তোমাদের মেয়েরা এখন যে কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা একবার পাশ্চাত্যদেশ দেখিয়া আসিলে বুঝিতে পারিতে। মেয়েদের ঐ

দুর্দ্দশার জন্য তোমরাই দায়ী। আবার, দেশের মেয়েদের জাগাইয়া তোলাও তোমাদের হাতে রহিয়াছে।”

আর সেজন্য চাই শিক্ষা। “আমাদের রমণাগণের মীমাংসিতব্য অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, ‘শিক্ষা’ এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে।

“তোমাদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোমরা লেখাপড়া করিয়া মানুষ হইতেছে, কিন্তু যাহারা তোমাদের সুখদুঃখের ভাগী, সকল সময় প্রাণ দিয়া সেবা করে, তাহাদের শিক্ষা দিতে, তাহাদের উন্নত করিতে তোমরা কি করিতেছ ?··· যাহাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণ হন, তাহাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়।”

সে শিক্ষা কিরূপ হইবে তাহা বলিতে গিয়া স্বামীজি লিখিলেন—“যে রকম শিক্ষা চলিতেছে, সে রকম নয়। সত্যিকার কিছু শেখা চাই! খালি বই পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না! যাহাতে গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই। ঐ রকম শিক্ষা পাইলে মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা আপনারাই সমাধান করিবে! আমাদের মেয়েরা বরাবর প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে। একটা কিছু হইলে কেবল কাঁদিতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শিক্ষা দরকার। এ সময়ে তাহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষা করা শিক্ষা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। দেখ দেখি, ঝান্সির রাণী কেমন ছিলেন।”

এ দেশের মেয়েদের যে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন তাহা এই কথা কয়টিতে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে; “এ সীতাসাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) মেয়েদের দেখিয়া আমার অনেক সময় স্ত্রী বলিয়াই বোধ হইত না—ঠিক যেন পুরুষ মানুষ! গাড়ী চালায়, আফিসে যায়, স্কুলে যায়, প্রফেসারী করে। একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জাবিনয় প্রভৃতি দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পাইয়াও তোমরা ইহাদের উন্নতি করিতে পারিলে না! ইহাদের ভিতর জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করিলে না!”

“আমি ধর্ম্মকে শিক্ষার ভিতরের জিনিষ বলিয়া মনে করি।” বাল্যবিবাহের উপর স্বামীজির যেন একটা জাতিক্রোধ ছিল বলিলেই চলে। লিখিয়াছেন—“বাল্যবিবাহের উপর আমার প্রবল ঘৃণা।... শিশুর বর জোটায় যাহারা, আমি তাহাদের খুন করিতে পারি।”

স্বামীজির মতে ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিকে বিবাহটা হওয়া দরকার, তাহা না হওয়ায় জাতির শারীরিক দুর্ব্বলতা আসিয়াছে। অবশ্য তিনি স্বধর্ম্মীদের মধ্যেই বিবাহপ্রচলনের কথাই বলিয়াছেন।”

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে স্বামীজির মত খুব অনুকূল না হইলেও প্রতিকূল নয়। কোন ব্যাপারেই তিনি গোড়ামি পছন্দ করিতেন না।—সমাজ-সংস্কারেও তাই। তিনি বলিতেন, “বাল্য-

বিবাহ তুলিয়া দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মাথা না ঘামাইয়া আমাদের কার্য্য হইতেছে স্ত্রীপুরুষ সমাজের সকলকে শিক্ষা দাওয়া; সেই শিক্ষার ফলে তাহারা নিজেরাই কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ সব বুঝিতে পারিবে ও আপনারাই মন্দটা করা ছাড়িয়া দিবে। তখন আর জোর করিয়া সমাজের কোন বিষয় ভাঙ্গিতে গড়িতে হইবে না।"

স্বামীজির উদার হৃদয়ে পতিতাদের জন্যও দরদ ছিল। তাহাদের উদ্ধারের পথে বাধা দেখিয়া বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া তিনি উষ্ণ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—'বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় ত কোথায় যাইবে ? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে। মেয়েপুরুষ ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধন, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি—নরকদ্বাররূপ বহুভেদ সংসারের থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ঐরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ ও নরকে ভেদ কি… যাহারা ঠাকুর ঘরে গিয়াও 'ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ-জাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক'—ভাবে তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যতই কম হয় ততই মঙ্গল।"

স্বামীজির প্রিয় শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ করিয়া মেয়েদের সম্বন্ধে কতকগুলি প্রত্যক্ষউক্তি নিবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। উহাতে স্বামীজির মতগুলি স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে, দেখিতে পাই। ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "তিনি (স্বামীজি) ভাবিতেন কতকটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হইবেই, এবং তৎসঙ্গে অধিক বয়সে বিবাহও হয়ত কতকটা নিজের পছন্দ মত পতি-নির্ব্বাচন, এ দুইটিও আসিবেই।

"নারীগণকে আধুনিক বিজ্ঞান শিখিতেই হইবে, কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মভাব খোয়াইয়া নহে।

"আগামী যুগের স্ত্রীগণের মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ থাকিবে।"

বিধবাশ্রম, বালিকাবিদ্যালয় বা কলেজের তিনি যে প্ল্যান করিতেন, তাহাতে বড় বড় হরিদ্বর্ণ শষ্পাচ্ছাদিত স্থানের ব্যবস্থা থাকিত। তিনি বলিতেন—'যাহারা তথায় বাস করিবেন, তাঁহাদের শারীরিক ব্যায়াম' উদ্যান সংরক্ষণ ও পশুচর্য্যা—এগুলি দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যে হওয়া চাই।

"স্বামীজির চক্ষে তাঁহার সন্ন্যাসের ব্রতগুলি যার-পর-নাই মূল্যবান্‌ ছিল। সকল অকপট সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার নিজের পক্ষেও বিবাহ বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যাপার মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত।…" কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে তিনি স্ত্রীলোক হইতে ভয় পাইতেন না, তিনি ভয় করিতেন প্রলোভনকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহাকে স্ত্রীলোকদিগের সহিত যথেষ্ট মিশিতে হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহার শিষ্য, কার্য্যের সহায়ক এমন কি বন্ধু ও খেলার সাথীও ছিলেন। তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের এই সকল বন্ধুদিগের সহিত ব্যবহারে তিনি প্রায় সকল সময়েই ভারতের পল্লীগ্রাম সমূহের প্রথা অবলম্বন করিতেন এবং তাহাদিগের সহিত কোন একটি সম্পর্ক পাতাইয়া লইতেন।"

নারী-সমিতি

শ্রীঅতুলানন্দ চক্র

ইতিমধ্যে নানা জায়গায় অনেক নারী-সমিতি হয়েচে তবু এই সম্পর্কে অনেক কথাই নতুন করে মনে আসে। মেয়ে মানুষের সমিতি! হঠাৎ যেন চমক লাগে, এ কি রহস্য না এক রকমের হালফ্যাসান্। কিন্তু বিস্ময়ের কথা ত কিছুই নেই। প্রথমতঃ, সভা আর সমিতি এঁরাই স্বয়ং মেয়ে মানুষ। (অথর্ব্ব ৭, ১২, ১) বেদ বলেন, এঁরা দুটী প্রজাপতির দুহিতা। দ্বিতীয়তঃ, সমিতির কাজ হচ্ছে অনেককে কুড়িয়ে এনে একত্রে মেলান। 'সমান'—'আকুতি' (ঋগ্বেদ, ১০,১৯১) এই দুই ভাবের মিলিত রূপ সমিতি। এক কামনায় অনেক মন রাঙিয়ে দেওয়া সমিতির রীতি নীতি! আর এই মেলান ব্যাপারই মেয়ে মানুষের প্রকৃতি। সংসারের সাথে উদাসী পুরুষ-চিত্তের মিলন রচনার লীলা-নৈপুণ্যে রমণী বলেচেন:—

"হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন মনে র'চ্‌বো ভুবন
ভাবের মোহে।"

(রবীন্দ্র—মহুয়া—মায়া)

তারপর থেকে, নিজের গড়া এই সংসারের ছোট বড় অশেষ কর্ম্মে অবিচলিত নিষ্ঠায় নিয়ত ত্যাগের মধ্যে আনন্দ লাভের যে নিবিড় মিলনসাধনা চলেছে তা একমাত্র মেয়েদের আত্মভোলা মনের দ্বারাই সহজ-সম্ভব:—

"হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হ'তে লহো জিনি,'—
চিত্তেরে তুলুক ঊর্দ্ধ্ব মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।"

(মহুয়া—প্রতীক্ষা)

মেলা'ন কাজ যে মেয়েদের নিতান্তই স্বভাবসিদ্ধ; বিপরীত জিনিষই যাঁরা এত বেমালুম মেলাতে পারেন তাঁরা আর সমিতির ক'টী প্রাণীকে এক সুরে মিলিয়ে নিতে পার্ব্বেন না! সব মন আর হুবহু এক হবে না, হওয়া ভালোও নয়। যেমন কোন বিশেষ যন্ত্রে বিভিন্ন পর্দ্দার পরস্পর মাখামাখিতে এক বিশিষ্ট সুর আলাপ হয়, আবার সুরজ্ঞানের অভাবে অতি অনায়াসেই তাকে প্রলাপে পরিণত করা যায় তেম্নি এই বহু মনের যোগ সফল করে একটী প্রাণবন্ত একান্ত অনুরাগ গড়ে তোলা যায়, আবার সহৃদয়তার

অভাবে তাকে বিরাগে বিলোপ করা যায়। বিধাতার আশীর্ব্বাদে নারী-সমিতিগুলি তাঁদের প্রত্যেকের মনের দুয়ার মুক্ত করুন যেন সেই উন্মুক্ত পথে মনোমালিন্যের সব সম্ভাবনা নিঃশেষে বেরিয়ে যায় "সো নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" (শ্বেত, উপনিষদ)

ইতিমধ্যে মেয়েরা এগিয়েছেন অনেক দূর। এখন গোড়াকার দু'একটী কথা মনে আসে। সে অনেক দিন। যখন প্রথম দু'চারজনা অসমসাহসিকা তাঁদের কচি কচি মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার আয়োজন কচ্ছিলেন, তখন বহুপ্রবীণের মাথা ঘন ঘন নড়েছিলো। এমন কি—ধর্ম্ম গেল—এ রবও যে না উঠেছিল তা' নয়। তারপর যখন বিবাহনির্দ্দিষ্ট বালিকাদের বয়স ক্রমে চড়্‌তে সুরু হ'ল—গৌরীদান-পুণ্য সঞ্চয়ের বাধায় তখনো আবার সমাজ ক্ষোভে ও শঙ্কায় নতুন ক'রে হাঁক দিলেন—ধর্ম্ম গেল। যাহোক, এবারে আশ্বস্ত হওয়া গেল—প্রথমবারের অপকর্ম্মে যে ধর্ম্ম তক্ষণি নিতান্তই যাওয়ার কথা, যেন কী মনে করে তিনি যাত্রা স্থগিত রেখে নিশ্চিত ঔদাসীন্যে অপেক্ষা কচ্ছিলেন দ্বিতীয় ডাকের জন্যে। এম্নি করে অনেকবারই ধর্ম্ম যাওয়ার অভিনব রব শোনা গেল; কিন্তু গেল না—মফঃস্বলে বিদেশ থেকে আগত সার্কাস কোম্পানীর শেষ রজনীর বিদায়ের মত। আর ধর্ম্মই বা কি বস্তু বোঝা একটু মুস্কিল বই কি! দেখা যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৬, ৪, ৭) মেয়েদের প্রয়োজন বিশেষে প্রহার কর্ত্তে ইতস্ততঃ করেন না; আবার মহানির্ব্বাণ তন্ত্র (৮ম, উল্লাস) মেয়েদের কাছে শৌর্য্য-প্রদর্শন বারণই করেন। শতপথ ব্রাহ্মণ একবার (৪, ৪, ২, ১৩) বলেন, মেয়েদের নিজ দেহের উপরও অধিকার নেই, আবার (৫, ২, ১, ১০) বলেন পরিবার সঙ্গে না নিয়ে কলাও ভাবে স্বর্গবিহার চলেই না। উল্টো পাল্টো এ সব ব্যাপার মানিয়ে নিয়ে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কর্‌বার মত সরু বুদ্ধি যাদের সব সময় থাকে না শাস্ত্রের কাছ থেকে তাদের উপদেশ নিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা।

শাস্ত্র ছেড়ে কবির কাছে অনেক সময় সত্যের সন্ধান যে না পাওয়া যায় তা' নয়। মনকে স্বাধীন চিন্তায় মুক্তি দেওয়ায় কবির কিছু কিছু হাত আছে। আমাদের দাশরথি সেকেলে রসিক কবি। তিনি যেন কি কারণে নারীর উপর অভিমান কর্‌লেন—

"নারীর নাই কোন ভার,
ভাবের মধ্যে বদন-ভার।"

মাঝারি কালের হেমবাবুর রীতিমত যশ। উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই তিনি নারীর স্তব গাইলেন—

"না জাগিলে হায় ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না!" তবু বল্‌তে হয়, এ প্রমীলা-স্তুতিতে নিছক নারী-বন্দনা নেই; কোন কাজ হাসিলের তাগিদে শরণ নিতে হয়েচে। ভারতের জাগরণ অবিশ্যি রামেশ্বর সেতুবন্ধনের চেয়েও বড় কাজ, এ কাজে লেগে নারী সার্থক হবেন নিঃসন্দেহে। তবু চিত্ত প্রসন্ন হয় না যেহেতু এতে নারীর প্রয়োজনের (utility) দিকই দেখান হয়েচে—তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি সুদৃষ্টি পড়েনি। এ কালের কবি দাবী কর্‌লেন—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা?" (মহুয়া, সবলা)

বিধাতার দরবারে নারীর নারীত্বের দাবী বেশ সবলে, বেশ সগৌরবেই পেশ হ'ল। বিদ্রোহের সুর কিন্তু এ নয়।

এ কেবল নারীর ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা চাওয়া। সেই পদার্থ পেলেই নারী নিজের কাছেও বড় হ'য়ে ওঠেন আর রসের যোগান পেয়ে তাঁর সকল সম্বন্ধ স্নিগ্ধ সজীব হয়। তখন তাঁর বড় কাজের পরিধি বাড়ে, ভাল কাজের সাফল্য বাড়ে। বিদ্রোহ প্রকৃতিও ত মেয়েদের নয়। ভিন্ন শক্তি ও সম্পদ তাঁদের। আমাদের দেশে মেয়েরা পুরুষের সমান না হয়ে সহচরী, গৃহস্বর্গ রচনায় আত্মহারা শিল্পী। সব রকম বিকাশের যোগে নারীর আদর্শের যে বিচিত্র সঙ্গতি আছে। সেটীর মূর্ত্তি অস্পষ্ট থাকতে দেওয়া আর চলে না। পুরুষের কর্ম্মে প্রেরণা, শক্তিতে চেতনা, আনন্দে জীবন জাগিয়ে, বিপুল সৃষ্টি সাধনায় তাঁকে পরিপূর্ণ অবকাশ দিয়ে, নিজের কমনীয় কল্যাণ করে সংসারকে সস্নেহ আবেষ্টনে রক্ষা করায় নারীর মূল পরিচয়। অপরদিকে, সন্তানকে পালন করা, প্রেম-শিশুনকে লালন করা, সংসারকে সাজিয়ে তোলা, এই সব আয়োজনেই যদিচ নারীর প্রধান আত্মপ্রকাশ তবুও প্রকৃতিগত সীমার মধ্যে তাঁর সৃজনের কাজও অল্প বিস্তর আছে। সেখানে তাঁর সার্থকতা ও আত্মগৌরব বোধ জাগ্রত করাই পুরুষের দায়িত্ব এবং গৃহসেবায় তাঁর সমস্ত শক্তি দেউলিয়া করায় পুরুষের ভাগ্য লাঞ্ছিত ও আনন্দ অপূর্ণ। সংসারের নিত্য কাজে—গৃহস্থালী পশুপালন, ফুল ফলের ফসল ফলান—অনেক ব্যাপারেই মানসিক মাধুর্য্য ও আর্থিক সার্থকতা আছেই। আর এ সব মেয়েরা অনেক কাল ধরে অনেক কুশলতার সঙ্গে করেও আসচেন তবুও যেন দেখা গেছে দেহে ও মনে শ্রীর অন্তর্দ্ধান রোধ করা যাচ্ছে না। মনে হয়, কল্পনাকে প্রসার করা, চিত্তকে জড়তা বিমুক্ত করা, সকল সমস্যায় নিজের অনুভূতি, নিজের ভাব নিয়ে ভাবনা করা—এই হচ্ছে পারমার্থিক অভাব। গীতা (৫, ১৫) ঠিক বলেন নি—ভগবান কারুর পাপও নেন না, পুণ্যও নেন না; মানুষ যে কষ্ট পায় সে কেবল অজ্ঞানের বশ হওয়ায়। তাই প্রার্থনা, "রঙীন পাখা উড়িয়ে পাখী যেমন যায় তেমনি ঋষিগণ ইন্দ্রদেবের নিকট সমবেত হ'য়ে মিনতি করলেন—হে দেব! অন্ধকার দূর কর, আলোয় আমাদের মুগ্ধ চোখ ফুটিয়ে তোল, অজ্ঞানের বাঁধন থেকে মুক্তি দাও।" (সামবেদ, ঐন্দ্রপর্ব্ব, ৩, ৯, ৭)

"নবশক্তি"

বৌদি
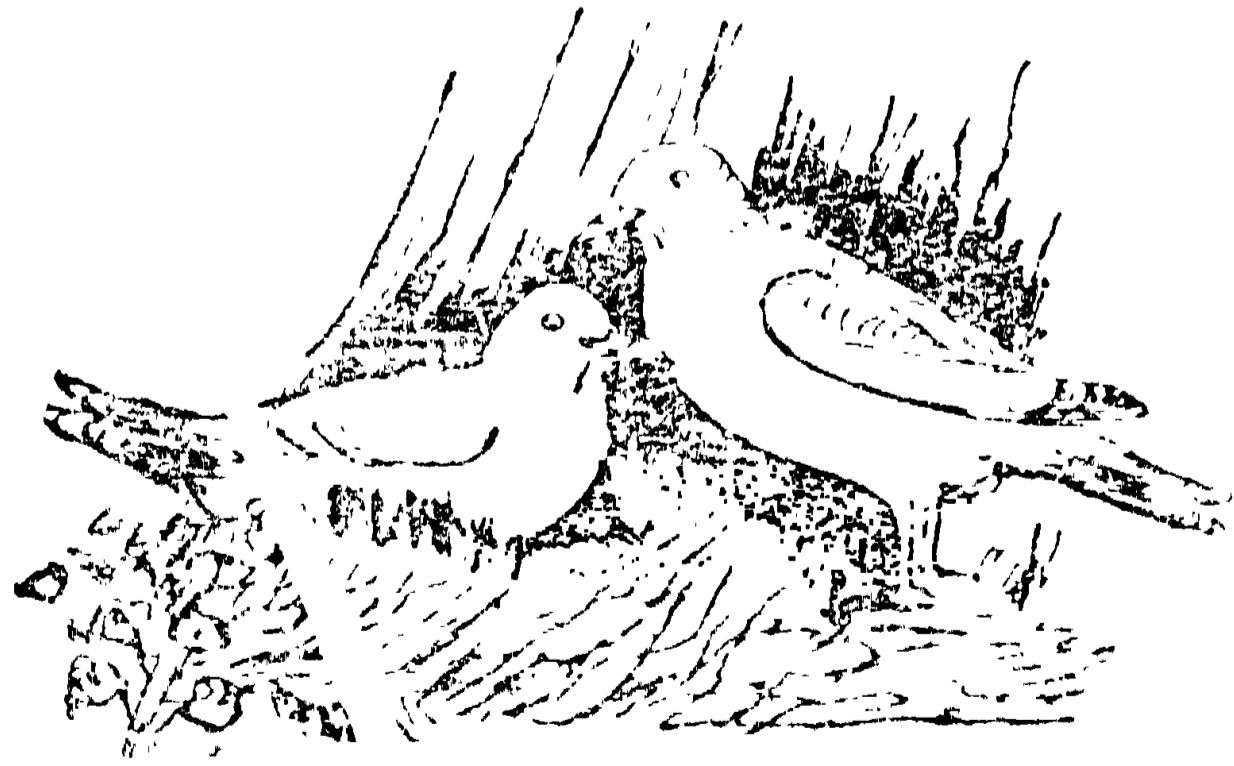
শ্রীবেলা দেবী

(বৌদি দুস্টু) দুস্টুমি চোখে তার, কথা কয় মিষ্টি,
কত তার গুণপনা করব কি 'লিষ্ট-ই' ?
মুখভরা হাসি তার টোল খাওয়া গাল,
বুক-পোরা ভালবাসা আছে চিরকাল,
কথাটি কয়না উঁচু, যেন উড়ো রথ
এই দেখি দোতালায়, ছোটে নানা পথ !
কখনও শোবার ঘরে, হেঁসেলের রাণী
ফিস্ ফিস্ কথা কয় কার সাথে জানি,
ঘোমটা আড়ালে তার লাজুক নয়ন
কোন্ সে স্বপন পারে ঘোরে অগণণ,
গালটিপে দেয় তার যখন-তখন
ধম্‌কে দেয় সে হাসি' 'দা ারে' এমন,
লুকোচুরি খেলে যেই দেখা হ'ল সাথে
"চুপ কর পোড়ামুখী" বলে নিরালাতে,
শুধাই যখন তারে কোথা বৌদি,
গিয়েছিলে তুমি, গো বলনা যদি,—
চোখ টিপে হাসে আর বলে কি জানো
আসুক 'হেমেন বাবু' কথা যদি মানো,—
এম্‌নি দুস্টু সে,—বলে যা'—তা',
কিছুই বুঝিনে তার কিযে কোন্ কথা !
তবু তার দুস্টুমি বড়ো ভালোবাসি,
রাঙা ঠোঁটে হাসি তার সুধা রাশি রাশি !

বাবার দাবার ঘর বুনে দেয় সে
ঠাকুমার মালা গাঁথে আচ্ছা আয়েসে,—

দুনিয়ায় আছে যত নানান খাবার
না জানে এমন কিছু,—জানেনা আবার,
পান সাজে, গান গায়, চুল বাঁধে, রাঁধে,
বিনানিয়া বেণী হায় অপরূপ ছাদে !
তাস খেলে কভু তুমি পার্‌বেনা হারাতে
খেলে নাকো একদিন জানে শুধু ভাড়াতে ;
এমন সেলাই জানে,—একজিবিসনে,
পেয়েছে 'মেডেল' দুটি বলত কেমনে !
ছবি আঁকে সুন্দর। সুপুরি কাটায়,
ফার্ষ্ট প্রাইজ পেতে পারে বাট্‌না বাটায়
ছোট্ট দুটিগো হাত এতই তফাত্‌
রাতকে দিন করে সে, নয় ঝুটা বাত্‌ !
চরকায় ঘড়্‌ঘড়্‌ সূতো কাটে সে,
সময় কেমনে বাঁধি বল রাখে সে !
যত তারে বকঝক তত তার হাসি,
রাঙা ঠোঁটে মৃদু হাসি আরো ভালোবাসি,
গরব নাইকো তার এমন স্বভাব,
সংসারে বুঝি নাই কিছুরি অভাব,
গয়না, কাপড় ভালো পরেনা, কারণ,—
পরিতে তাহার নাকি আছে গো বারণ !
বলে সে সবার কাছে পারেনা পরিতে
কত লোক পায় না যে পেটটি ভরিতে
পেটে নাই ভাত হায় কাঁদিছে সতত
অনাহারে, অনশনে মরে শত শত !
ভাত খায় একমুঠো, আর সব নিয়ে
বিলায় গোপনে সে যে,—খায় মায়ঝিয়ে,
আসে হায় দ্বারে যত ভিখারীর দল,
তখনি তাহার ঝরে নয়নের জল !
দাদাবাবু ডাকে তাঁরে প্রতিমা সোণার,
হেসে কভু বলে ওগো, বধূটি কোথার !

ভ্রূক্ষেপ নাই তা'তে হাসিটুকু লেগে
আছে ওই চোখে-মুখে, কাঁদে রাত জেগে !
পায়না খেতেগো যারা, পরেনা বসন
নীরবে ঝরিছে অশ্রু তাদেরি কারণ !
জানেনা অপর কেহ, জানে বারোমাস
চিলে ছাদ বাঁধাঘাট, আর পাতিহাঁস,
তারা শুধু হেরে ওই-কাজল চোখের
ঝরে যায় অবিরল বেদনাশোকের,—
এই মেঘ, এই রোদ, মুখখানি তার
কখনও শুকায়ে যায় অশ্রু-পাথার ;
কি বলে' প্রণাম করে দেবতার ঘরে,
বুঝি শুধু জগতের কল্যাণতরে,—
তুলসীতলায় নিতি মাথাটি ঠেকায়
শাঁখ ফুঁয়ে ব্যথা-শোক করিছে বিদায়,—
কত তার গুণপনা করিব গো "লিস্ট-ই" ?
(বৌদি দুষ্ট)—তবু বলি দুষ্ট,—কথা কয় মিষ্টি !
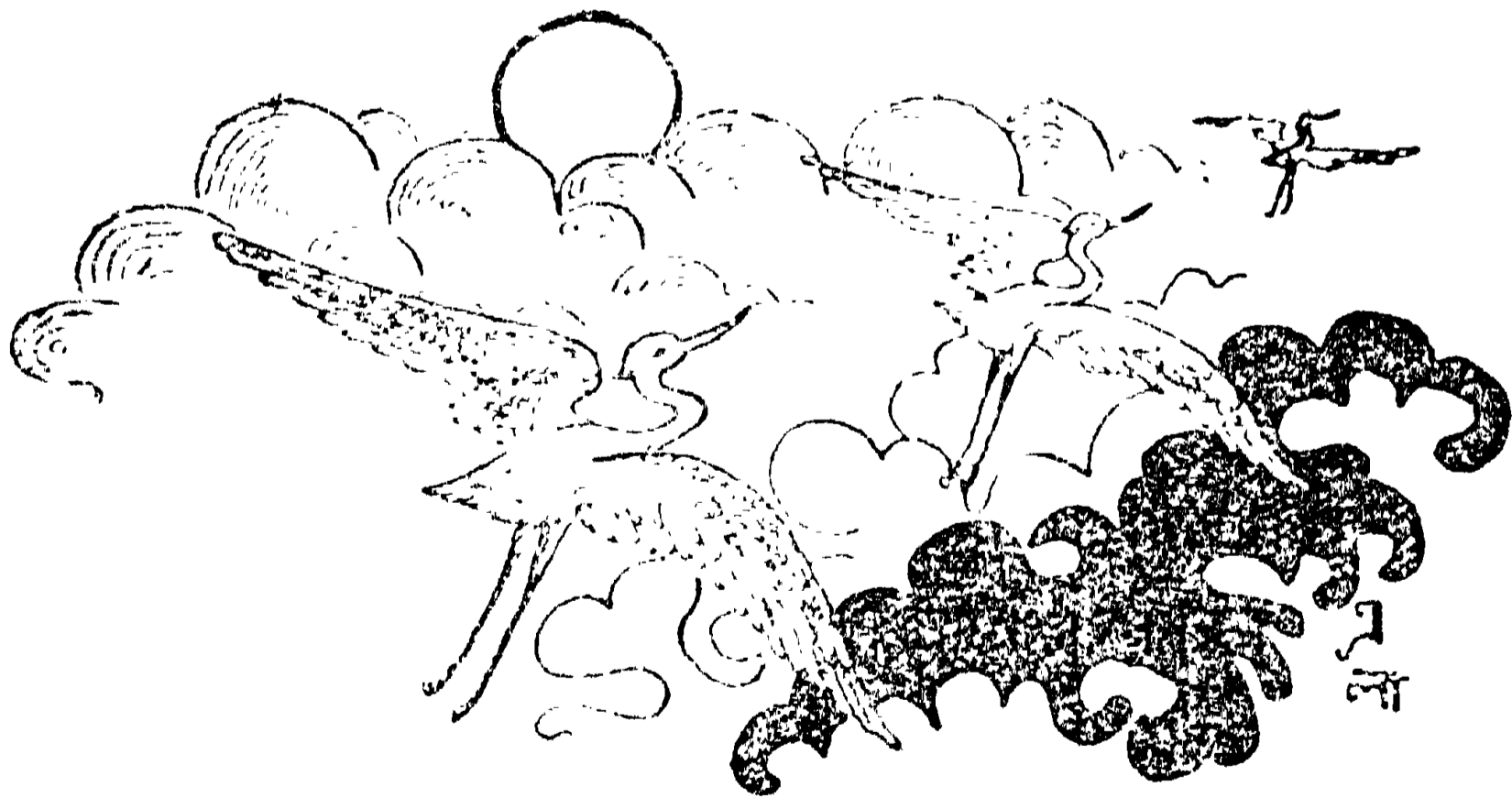
মৃগমদ

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

১২

পার্কে বেড়াইতে বেড়াইতে আভা জিজ্ঞাসা করে, অরু, কাল বুঝি তোর অ্যাট্‌হোম্‌? দু'জনে পাশাপাশি চলিতেছিল, অরুণিমা আভার হাত দোলাইতে দোলাইতে বলে, আজ্ঞে মশাই যা বলেন!

কাকে কাকে বল্‌বি?

কাউকে না।

কাউকে না?

শুধু একজনকে বল্‌ব।

কে রে সে একজন?

ও রকমকরে যদি জিজ্ঞাসা করিস্‌ তবে বল্‌ব না।

আভা হাসে, বলে, না মা, বল্‌, কাকে বল্‌বি।

অনুপমবাবুকে!

অনুপমকে! ও অতি পোষমানা প্রাণী তার জন্য এত?

বুঝিস্‌নে তুই! দশজন লোকের মধ্যে যদি ওঁকে বলি, তবে উনি কুঁক্‌ড়ে কেন্নো হয়ে যাবেন অথচ ওঁকে একটু প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজনটা কি বল্‌ দেখি!

সে এক মহৎ কাজ। জানিস্‌ ত পরীক্ষার রেজাল্ট্‌ এবার উনি কি রকম ভাল কোরেছেন—অথচ এর পর কি কর্ব্বেন—তা আজ পর্য্যন্ত উনি ভেবে দেখেন নি! বল্লেন, বাবা যা বল্‌বেন তাই হবে। ওদিকে বাবার অবস্থা হয়ত ওঁর চেয়ে ও শোচনীয়, কেরাণীর আফিসের বাইরে পা বাড়াতে ভরসাই পাবেন না।

আভা অরুণিমার কথা অনুমোদন করিয়া বলে, ভালই করেছিস্‌ ওকে একা বলে। বাস্তবিক, ও বড় ভালমানুষ গোছের ছেলে। মাথাটি নীচু করে থাকে, হুকুম মেনে যেতেই যেন ও এসেছে জগতে! ভারি মমতা হয় ওকে দেখ্‌লে! এসব নিরীহ লোকের স্বভাব হচ্ছে এই যে অন্যকে ঠেলা দেবার ভয়ে ওরা নিজেরাই ঠেলা খেয়ে মরে। চাপে পড়ে ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে যায়, সেইখানটাই ওদের পরম আশ্রয় বলে মেনে নেয়। দৈবকে ওরা এত বড় করে

দেখে যে আত্মশক্তির ওপর প্রত্যয় ওরা একেবারে হারিয়ে ফেলে। সেই অপ্রত্যয় আমি ঘোচাব। দুরাচার স্বপ্নে ওঁর চক্ষু দেব ভরে। আমি হ'ব ওঁর আত্ম-সাক্ষাৎকারের দূত।

আভা হাসে, বলে—এবারে ভাল কাজে হাত দিয়েছিস্!

আভা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, দেখ ভাই, জীবনের পথে আমরা চলেছি যেন ঘোড়া ছুটিয়ে। পথের দিকে চেয়ে দেখ্‌বার আমাদের তিলমাত্র অবসর নেই। সংসারে এত কাজ—এত কিছু কর্ব্বার; দেখ্‌বার বুঝ্‌বার রয়েছে—কিন্তু মন যায় না তার দিকে! এতখানি বয়স পর্য্যন্ত কি কর্ল্লুম তাই ভাবি আজ? চোখ বুজে শুধু নিজের সুখ ও আরাম খোঁজা—এই কি মানুষের জীবনের চরম সাধনা? মহত্তর লক্ষ্য বৃহত্তর বাসনা শুধু কল্পনা মাত্র?

সবে ত তোর সুরুরে, এখনি এত ঘাব্‌ড়াচ্ছিস্ কেন। মানুষের জীবনে দুটিমাত্র অধ্যায়—প্রথম হচ্ছে জানা—তারপর করা। আগে তোর প্রথম অধ্যায় সারা হোক্।

অরুণিমার মনে অনুপমের অনুন্নতদের মঙ্গলপ্রচেস্টার কথা ঘুরিতে থাকে। মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না কিছু। জীবনের নিরর্থকতার প্রতিবিম্ব কোন্ দর্পণে যে সে আজ অকস্মাৎ এমন পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাইয়াছে তাহা যদি সে বলে,—তবে আভা এখনই এমন এক হেতু আবিষ্কার করিয়া বসিবে,—যাহা বর্ত্তমানে তাহার মনের ধারে পারে ত নাই-ই—ভবিষ্যতেরও সুদূর সম্ভাবনার মধ্যেও যাহার অস্তিত্ব নাই!

আভা বলে, দিদি আজ বল্‌ছিল, নীরাদের কাল চায়ে বলা যাবে নাকি। আমি বল্লুম, থাক্। সত্যি কথা বল্‌তে কি বাপু, আমি নীরাকে যেন সহ্য কর্ত্তে পারি না।

অরু কতকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, চন্দ্রিমা মেয়েটি কিন্তু বেশ্। ওকে আমার বেশ্ ভাল লাগে। তা ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে পাবার আশা নেই। চন্দ্রিমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর্ত্তে গেলে, নীরার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর্ত্তে হ'বে আগে। ওমেয়ে পুরাদস্তুর একটি ফ্লার্ট। হাজার হোক্—বাঙ্গালীর মেয়ে ত, ওসব বিশ্রী বিলিতি চাল্ চোখে সূচ ফোটায়।

তোমার চোখে ফোটায় বলে জগতের সবারই চোখেও আর ফোটায় না। কারুর চোখে ওতে মধুবর্ষণ করে যে, এ খাঁটি।

সে মধু বিষ হ'তেও খুব বেশী দেরী হয় না। নীরাসুন্দরী আজকাল এদিকে ঘেঁষেন কম। শুন্‌ছি আসরে নব-নায়কের আবির্ভাব হয়েছে। দিগেন্দ্র লাহার সঙ্গে আজকাল তিনি ঘোরেন,—তা, লোকটির টাকা যতই থাক, আসল সম্পদ কতটা আছে ভগবান জানেন।

অরু বিস্ময়ভরা দুই চক্ষু মেলিয়া আভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

আভা বলে তুই অবাক্ হয়ে যাচ্ছিস্? তা হবারই কথা। উনি বলেন, নীরা-সুন্দরী অর্থহীনকে কদাচ কৃপা করেন না। ওঁর এক বন্ধু—বড়লোকের ছেলে তাকে নীরা-সুন্দরী কিছুদিন বেশ অনুগ্রহই দেখিয়েছিলেন; কিন্তু যাই তার বাপ দেউলে হয়ে গেল, অমনি সুন্দরীর

অনুগ্রহ ও অন্তর্দ্ধান কর্ল্ল। সে ছেলেটি ছিল সৎপ্রকৃতির, ওর আন্তরিকতায় এতটুকু খাদ ও মেশানো ছিল না—কাজেই এ আঘাত আজো সে সাম্‌লে উঠ্‌তে পারে নি।

মেজদাকে বলেছিলুম এ কথা। সে বলে, বিভীষিকার বিষদাঁত যৌবনের গায় বসে না। সে হচ্ছে বেহিসাবী—জমা খরচের খাতাও রাখে না; বিলিয়ে যাওয়ার আনন্দে ও দুহাত দিয়ে বিলিয়ে যায়—নিঃসম্বল হ'বার ভাবনায় হাত গুটোয় না কখনো। দীপশিখায় পুড়ে মরেই পতঙ্গের সুখ—করুণা ক'রে যে ওকে ওর থেকে বাঁচাতে যায় তার সে দয়া হয় নিষ্ঠুরতা!

দিগেন্দ্র লাহা আই সি এস্—তিনি যখন উদয় হয়েছেন, তখন তাঁর খরজ্যোতিতে প্রসূন শুকাল বলে! আমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে কি না দেখে নিস্।

অরু চুপ্ করিয়া থাকে। আভা হাসিয়া বলে, অবস্থা দেখে একটা শ্লোক মনে পড়্‌ল—

ভেকো ধাবতি, তং চ ধাবতি ফণী, সর্পং শিখী ধাবতি
ব্যাধো ধাবতি কেকিনং, বিধিবশাদ্ ব্যাঘ্রোঽপি তং ধাবতি।

ভেকের পিছনে ছুটেছে সাপ, সাপের পিছনে ময়ূর, ময়ূরের পিছনে ব্যাধ—ব্যাধের পিছনে ছুটেছে বাঘ। নিস্তার নেই সংসারে কারোই! তোমাকে যে ছোব্‌লাবে তাকে ছোবল্ দেবে অন্য কেউ। তুমি পরাক্রান্ত বলে যে নিশ্চিন্ত হবে সে উপায় নেই। তুমি নিরাশ করেছ এক বেচারীকে, তোমাকে করেছে আরেক জন, তাকে করেছে, আর কেউ—এবং সেই আর কেউর জন্য আরেক জন হয়ত বসে আছে।

অরু হাসিয়া বলে, তুমি দুঃখবাদী হলে কবে থেকে? আর যে-ই যাকে ছোবল দিক্ বিভাস বাবু যে তোমাকে ছোবল দেয় নি এ একেবারে অবিসম্বাদিত সত্য। চৌধুরীসাহেব ও বরুণাদিকে ছোব্‌লান নি, এ আমি জানি। সুতরাং সংসারে কেউ যে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না—একথা বলে তুমি শুধু সত্যের অপলাপ কচ্ছ।

আভা হাসিতে হাসিতে অরুর কোলে শুইয়া পড়িয়া বলিল, এই কয়েক মাসের ভিতর কি ভয়ানক বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়েছিস্।

১৩

ফটকের কাছে আসিয়া অনুপমের ভিতরে ঢুকিতে সাহসে কুলায় না।—দু'চার বার এদিকে ওদিকে ঘোরে, একবার ফিরিয়া যাইবে বলিয়া চলিয়া যায়, আবার ঘুরিয়া আসিয়া ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিতভাবে ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখে।

এমন সময় পিছন হইতে আসিয়া পড়িল প্রসূন।

প্রসূন অনুপমের পিঠ চাপ্ড়াইয়া বলে, এতদিন পরে কোত্থেকে হে?

অনুপম অপ্রতিভভাবে শুধু হাসে।

প্রসূন তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিতে চলিতে বলে, লাজুক বরটির মতন দুয়োর থেকেই চলে যাচ্ছ ভিতরে ঢুক্‌তে আর সাহস পাচ্ছিলে না বুঝি! রকমটা তোমার দূর থেকে দেখেই বুঝেছি! তারপর, কোথায় ছিলে এমন গা ঢাকা দিয়ে?

এখানেই ছিলুম না যে!

কোথায় ছিলে শুনি?

দেশে। তোমাদের মত দার্জ্জিলিং, সিমলা, মসুরী যাওয়ার ত সাধ্য নেই।

তোমার মত মানুষ একলা ওসব অজানা রাজ্যে যেতেও পারে না। আমরা গেলুম একদল কার্সিয়ং—জুটে পড়্‌তে যদি আমাদের সঙ্গে—দিব্যি স্ফূর্ত্তি করে আস্‌তে পার্‌তে। লজ্জায় তুমি পাতালে সেঁধিয়ে থাক্‌বে—তোমার আর কি হবে বল। লজ্জা জিনিসটাকে মেয়েরা আজকাল ওদের অলঙ্কারের ক্যাটিগরি থেকে দিয়েছে নাকচ করে—আবার তোমরা আছ একদল—যারা আস্তাকুঁড় থেকে কুড়িয়ে এনে অঙ্গে ধারণ কর্ত্তে সুরু করেছ।

প্রসূন অনুপমকে ড্রয়িংরুমে বসাইয়া বাড়ীর ভিতর আভাকে খবর দিতে গেল।

আভা বলিল, মেজদা বালিগঞ্জের ভোজের গন্ধ সেণ্ট্রাল এভেনিউতে কোন্ বৈদ্যুতিক তারে পৌঁছ্‌ল, খাবার প্লেটে সাজাতেই যে এসে হাজির!

প্রসূন ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলে, পার্টি দিচ্ছ বুঝি তোমরা? খবর যখন তোমরা দেবে না, তখন নিজেরই খবর করে আস্‌তে হয়। তা' থাকে যদি কিছু আমাকে এখানেই দাও, আমি তোমাদের পার্টিফার্টির জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে পার্ব্ব না। এক্ষুনি আমার বেরুতে হবে।

—ব্যস্ততা তোমার কিসের তা আমার জানা আছে, দীপশিখা আড়াল করে রাখার উপায় নেই, আলো লাগে সবার চোখেই।

বলিয়া আভা ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া যায়। প্রসূন বরুণার কাছে গিয়া বসে।

অনুপম বসিয়া বসিয়া মনকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকে, অরুণিমা ঘরে প্রবেশ করে হাসিয়া বলে, শেষ পর্য্যন্ত তা'হলে আস্‌তে পেরেছেন? ভাব্‌ছিলুম দুয়োর থেকেই না ফিরে যান্।

একটু দূরে একটা সোফায় অরু বসে। তাহার স্নিগ্ধ নির্ম্মল হাস্যদৃষ্টিতে অনুপমের মনের সব কুণ্ঠাসঙ্কোচ এক নিমেষে অপসৃত হইয়া যায়। দীনতার যে দুস্তর গ্লানি বিষাক্ত কীটের মত তাহার মর্ম্মচ্ছেদ করিতে থাকে, সহসা যেন তাহা শূন্যে খসিয়া পড়ে।

অরুণিমা জিজ্ঞাসা করে, পড়াশুনা ত সব সারা হয়ে গেছে, কি করেন এখন সারাদিন?

আমাদের মত লোকের কাজ কি আর কখনো কম থাকে! টিউশনি নিয়েছি দুটো—এক ভাই ম্যাট্রিক দেবে—তাকে কোচ্ করি, আরেকজন আই, এ তে লজিক নিয়েছে তাকে পড়াই। বাইরে আরো কত কাজ জোটে। অবসর জিনিষটাই আমাদের দুষ্প্রাপ্য।

নিজের দৈন্য ও ক্লেশময় জীবনের চিত্র অরুণিমার চোখের কাছে অনুপম জোর করিয়া মেলিয়া ধরে। মনে মনে সঙ্কল্প করে, তাহার সম্বন্ধে এতটুকু ভুল-ভ্রান্তি অরুণিমার মনে সে কখনো থাকিতে দিবে না। সহজভাবে সে যাহা পাইয়াছে, সহজ সীমার মধ্যেই তাহাকে সে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, জীবনের গহনারণ্যে পথহীন অন্ধকারে সহস্র জটিলতার ভিতর তাহা সে হারাইতে দিবে না। ইহাই হোক্ তাহার আরাধনা। ধরণীর বুকে সূর্য্যালোক যেমন করিয়া নামে—অবাধ উদার মুক্ত সর্ব্বস্পর্শী—অরুণিমার প্রীতি তেমনি করিয়া তাহার জীবনে অবতরণ করুক্। দুঃখের পাষাণের নীচে যে প্রাণাঙ্কুর শীর্ণ শুষ্ক মরণোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে,—সে আলোকে তাহার নব মঞ্জরী মুঞ্জরিত হইয়া উঠুক।

অরুণিমা বলে, তার পর ভেবে চিন্তে কি ঠিক্ কর্ল্লেন? অনুপম বলে, আপনার কথা মত দেখি একবার রিসার্চ্চ নিয়েই উঠে পড়ে লাগি।

অরু খুশী হইয়া বলে, তবে ত সব গোল মিটেই গেল। আপনি যে রকম ষ্টুডিয়াস্ ছেলে—ও আপনার হয়ে যাবে। আপনি হিষ্ট্রি ষ্টুডেণ্ট—এদিকে ও আপনার সুবিধে আছে।

অনুপমের আশা-উৎসাহলেশহীন নিস্তেজ মনে অরুণিমার দীপ্ত মনের ছোঁয়াচ লাগে। তাহার অন্তরে জমাট নির্ভরসার অন্ধকার পূর্ণিমার সন্ধ্যার মত নব বিভাবের জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া স্বচ্ছ হইয়া ওঠে।

অরু কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলে, স্কলারসিপ্ নিয়ে আপনি বিলেত যেতে পার্ব্বেন এ আমি আশা করি। ভাবনা হচ্ছে এই যে ওখানে গেলে আপনার অবস্থাটা কি রকম হবে।

অনুপম সস্মিতমুখে বলে, মাঠে নামলে কৃষাণের বুদ্ধি,—সেখানে গেলে হয়ত এমন হয়ে যাব যে আপনারাই দেখে অবাক্ হয়ে যাবেন। মানুষ যে রকম পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পড়ে তার মতি এবং গতি তারি মত গড়ে ওঠে।

অরুণিমা বলে, আপনি এক কাজ করুন বাড়ীতে থাকা ছেড়ে দিন, মেসে এসে পড়ুন। বাইরের হাওয়া তবু তাতে আপনার গায়ে লাগ্বে। সেইটেই আপনার মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে সব চেয়ে বেশী দরকার। লতায় চাপা পড়া গাছের মত আপনি চাপা পড়ে আছেন—ওর থেকে আগে নিজেকে মুক্ত করুন। মানুষ মাত্রেরই আত্মরক্ষার সর্ব্ববাদাসম্মত এবং স্বাভাবিক দাবী আছে।

ইতস্ততঃ করিয়া অনুপম বলে, হঠাৎ কি তা হ'য়ে উঠ্বে, এতদিন গেছে আর দুটো বছরও যাবে অম্নি। আগেই যদি হাল ছেড়ে বসেন—তবে জান্বেন নৈব নৈব চ। ভয় ভাবনায় সঙ্কোচে কাজ হয় না। সঙ্কল্পের জোরে বাধা কাটুন। বেরিয়ে পড়ুন, আপনি বাইরে বেরিয়ে পড়ুন, বিশ্বাস করুন, নিজের ক্ষমতায়, নিজের শুভবোধে, নিজের স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্ত্বাতে। যারা আপনাকে শুনিয়েছে, আপনি কিছু নন, আপনার দ্বারা কোনো কাজ হবে না,

আপনি অপদার্থ ছ্যাক্‌রা গাড়ীর ঘোড়ার মত, কুব্জপৃষ্ঠে জীবনের দুর্ভর বোঝা নীরবে বয়ে যাওয়াই আপনার কাজ—তারা আপনার আত্মবোধকে বিষ খাইয়ে অচেতন করে রেখেছে, তাদের কবল থেকে আপনি তাকে উদ্ধার করুন। অসুরের সুরলোক থেকে যে অমৃত হরণ করিয়াছিল সে মানুষের এই আত্মচেতনা। যে তা হারিয়েছে—সে সব হারিয়েছে—নিজেকে সে একেবারে বিনষ্ট কোরেছে। কেন আপনি চোখ বুজে এ আত্মহত্যা কচ্ছেন।

অরুণিমার উৎকণ্ঠিত দীপ্ত স্বর অনুপমের বক্ষে ঝঙ্কার তোলে, তাহার মনের আবেগময় স্পন্দন তরঙ্গের মত অনুপমের মনে সঞ্চারিত হয়।

সে ফিরিয়া চায় তাহার রস-বঞ্চিত ব্যর্থ নিস্ফল অতীতের দিকে, ঊষরের মত যাহা রৌদ্র-দাহনই শুধু বহন করিয়াছে,—জীবনের আনন্দের ফসল ফলায় নাই কখনো।

জীবন! কি তাহার সে জানিল, কতটুকু তাহার সে দেখিল, তবু এই কল্লোলময়, গীতিময়, ছন্দোময়, রহস্যময়; ঝঞ্ঝায় বিলোড়িত, বিদ্যুৎ বিলসিত, তরঙ্গোত্থিত আবর্ত্ত-ঘূর্ণিত এই ফেণিল, উজ্জ্বল, তটবিপ্লাবী, প্রচণ্ড;—এই অপরূপ অনবদ্য, সুন্দর, ভাস্বর, এই অশেষ অনাদি অগাধ অপার জীবন তাহার অনন্তে আবল্যে কি মোহই বিস্তার করিয়া আছে।

আজ যৌবনের রথ স্বাধীনতার তূর্য্য নিনাদে তাহার দুয়ারে দাঁড়াইয়াছে—আজো কি শঙ্কিত সংশয়ে অক্ষম নৈরাশ্যে মাটিতে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া থাকিবে?

অরুণিমা বলে, জানি আপনার তরফে এর বিরুদ্ধে ঢের যুক্তি আপনার জমা করা আছে, এবং সেগুলো নেহাৎ বাজে কথা ও নয়। কিন্তু মানুষ নিরপক্ষ ভাবে কখনই কাজ কর্ত্তে পারে না। অনেক পরস্পর বিরোধী ধারার ভিতর দিয়ে তাকে চল্‌তে হয়। তবু দৃষ্টি তার অচল রাখ্‌তে হয় সেই পরম লক্ষ্যে—যা তাকে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুর্গম দুরতৎয়া' প্রগতির পথে অগ্রসর হ'তে নিরন্তর নির্দ্দেশ কচ্ছে। জীবনে এই হচ্ছে শাশ্বত সত্য আর সব ভূয়ো। হাসিকান্না সুখদুঃখ সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য—রৌদ্রবৃষ্টি ঝড়বাদলের মত আসে যায়, ঢেউএর পরে ঢেউ এক অখণ্ড প্রবাহকে সৃষ্টি করে—চলেছে সেই মহাসাগরের দিকে—যেখানে অনাদি কাল থেকে এনিখিল জগৎ এগিয়ে চলেছে! আমি আপনার কাণে বিদ্রোহের মন্ত্র পড়্‌ছি—কিন্তু এই হচ্ছে জীবনের মন্ত্র—মৃত্যুকে ধ্বংস করার মন্ত্র, দশের অশিব যজ্ঞভঙ্গ করার মন্ত্র। ন্যায্য পাওনা দুনিয়ায় যার যা আছে—তা দেবেন যেমন, নিজের ন্যায্য পাওয়া ও দাবী কর্ব্বেন সঙ্গে সঙ্গে।

মাঝখানে আভা আসে, বলে—অনুপমবাবু?

১৪

বৈশাখ মাস, ছুটি আসন্ন। গ্রীষ্ম যাপন করিতে কোন্ দিকে কে যাইবে, ঠিক হইয়া গিয়াছে। বিভারা যাইবে দেরাদুন, প্রসূন যাইবে প্রতিবেসিনী ভিক্টোরিয়া আইচদের সঙ্গে কার্সিয়ং, নীরা দিগেন্দ্র-

লাহার সঙ্গে কাশ্মীর যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, নীরার বাবা যাইতে চাহেন দার্জ্জিলিং। দুই বাড়ীতে কথাবার্ত্তা চলিতেছে বিস্তর, এবং আয়োজন হইতেছে বহুল।

মাঝখানে চন্দ্রিমা আছে চুপ করিয়া, চারিদিকে পরিব্যাপ্ত এই উৎসাহ ও আনন্দের খরস্রোতের মধ্যে সে রহিয়াছে অচল ও নির্লিপ্ত। নিরুৎসুক ভাবে সে চাহিয়া থাকে, কাজের মাঝখানে ঔদাসীন্য দেখা দেয়, যে রশির টানে এই সংসারটাকে সে কেন্দ্রানুগ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আসে হাতে ঢিল হইয়া।

নীরা রেহাই দেয় না—খোঁচা দিয়া বলে, চাঁদ, তোকে কোন্ মেঘে ঢাক্‌ল? তোর আলোতেই আমাদের পথ-যাত্রা—সে আলো লুকাস্ যদি—আঁধারে বেঘোরে সব মারা যাব যে!

চন্দ্রিমা হাতের খসিয়া পড়া বইখানা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলে,—চাটুবাক্য খুব শিখেছ দেখ্‌ছি। কার আলোতে পথ-যাত্রা এবার—তা জানা আছে সবার। দিক্‌পতি আছেন তোমার সর্ব্বদিক্ আলোকিত করে,—আমরা এখন খদ্যোতের দলে!

চন্দ্রিমার হাসির ভিতর শ্লেষের রেশ বাজে।

নীরা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলে, এ তোর হিংসুটে কথা। শুধু বাবা মার সঙ্গে দেশ ভ্রমণে যাওয়া আর পুলিশ পাহারা নিয়ে যাওয়া একই কথা! মা নিজে ত চিররোগী—, ভাবেন আমরাও তাঁরই দলে—আবার বাবা গতবার নিমোনিয়ায় ভুগে উঠে এমন সাবধানী হয়েছেন যে ঠাণ্ডা না লাগার যত কিছু উপায় ও ওষুধ আছে সব দিয়ে নিজেকে ফর্টিফাই ত করেছেন-ই, আমাদের শুদ্ধু তার ভেতর পূর্‌বার চেষ্টায় থাকেন। কাশ্মীরে শীত ত তেমন কিছু নেই, তবু সতীশ রাজ্যের গরম কাপড় প্যাক কর্চ্ছে, পার্ব্বতীকে বাবা হুকুম দিয়েছেন আমাদের ট্রাঙ্কে গরম কাপড় ভর্ত্তি করে দিতে। বাবার এ অতি সতর্কতা থেকে বাঁচাতে কেউ যদি সঙ্গে না থাকে—তবে আমরা কি দুর্ভোগে পড়্‌ব তা তোমার জ্ঞান আছে বাপু।

চন্দ্রিমা সস্মিতমুখে বলে, বাস্তবিক, কাকা কিছু খুঁৎখুতে হয়ে উঠেছেন? সে হিসাবে বেড়াতে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াই ভালো ছিল। ওঁর মনে কেবল ভয়,—পাছে আবার কোন রকমে কোথাও ঠাণ্ডা লেগে যায়। সেলুন কার্ ছাড়া খোলা গাড়ীতে বার হন না পর্য্যন্ত। এবার না হয় বেড়ানোটা ছেড়েই দেওয়া যাক্ না! নীরা ঝঙ্কার দিয়া বলে, হ্যাঁ, তোর কথায় এই গরমে এখানে বসে বসে সিদ্ধ হই আর কি! মা যে বড় নড়্‌তে চান্ না,—গরম পড়েছে অবধি মাও বেরিয়ে পড়্‌বার জন্য ছট্‌ফট্ কর্চ্ছেন।

আভাদের সঙ্গে চল না কেন! কোথায় কাশ্মীর কোন্ সীমান্তে—সাতদিনের রাস্তা পার হয়ে ছোট সব সেইখানে। যা ট্রেণ কলিশনের ডিরেইলমেণ্টে্‌এর ধুম—মারা না যাই পথেই একখানে!

নীরা চোখ টান করিয়া বলে, যার জন্যে তোর আভাদের সঙ্গে যাওয়ার সাধ, সে ত এবার দেশে পাড়ি দেবে! চন্দ্রিমা হাসিতে থাকে, বলে, কে বলেছে অরুণিমা দেশে যাবে? কখনো ত শুনিনি ওর মুখে ওদের দেশের কথা! কোথায় ওদের দেশ?

কে জানে কোথায়! শীলার কাছে আরো খবর পেলুম—

কি খবর পেলে?

অরু দেশে শুধু বেড়াতেই যাচ্ছে না,—দেশ সেবার জন্যও ভয়ানক পণ করেছে! আভারা ওকে কত টান্‌ছে—কিছুতেই ও টল্‌ছে না। দেখ্ একবার তুই টেনে। নয় আমাদের সঙ্গে কাশ্মীরই নিয়ে চল্। তুই ত অন্ততঃ সুস্থ থাক্‌বি!

চন্দ্রিমা বিশ্বাস করে না সব কথা,—বলে। 'এ কেউ গল্প ফেঁদেছে ওর নামে। ক্লাসে দেখা না হোক্, কমন্ রুমে আড্ডা ত চলে,—সত্যি হলে বুঝি শুন্‌তুম না ওর কাছ থেকে কি আর কারু কাছ থেকে!

গল্প করে বেড়াবে—সে সেই মেয়ে কি না! চুপচাপ্ থাকে, রাটি করে না—কিন্তু গোটা কলেজের মধ্যে ঐ একটি মেয়ে। তুই ত বাপু এত বড় ভক্ত ওর—

যে ভাল—তাকে যদি বলা যায় যে সে ভাল—তা হ'লেই তার ভক্ত হোল—বেশ ত! অরুণিমাকে আমি ছাড়া আরো অনেকেই প্রশংসা করে থাকে,—এ জেনো।

জানি গো জানি তা। অত ত কাছে কাছে ঘোর—জান কি অরুণিমা বিবাগিণী হ'তে বসেছে?

চন্দ্রিমার হাতের বই পড়িয়া যায় সোফার উপর সোজা হইয়া বসিয়া বলে, কি হ'তে বসেছে?

বিবাগিনী গো বিবাগিনী। বৈরাগিনী—সোজা কথায়?

নীরা তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। বলিয়া চন্দ্রিমা নত হইয়া মাটি হইতে বইটা ওঠায় এবং খসিয়া পড়া বুকমার্কটা খোঁজে। নীরা কথায় একটু ঝাঁজ মিশাইয়া বলে, মাথা খারাপ কার তা দেখা যাবে পরে। অরুণিমার বেশবাসে যে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে—তা তুই ছাড়া বোধ হয় আর সবাই লক্ষ্য কোরেছে। এই গরমের মধ্যে মেয়ে খাদি সাড়ী পরে—কাণপুরী নাগরাই পায় দেয়। সোনার পিনের বদলে রূপোর পিন লাগায়।

খাদি পরার দোষটা কি হোল? কত মেয়েই ত পরে খাদি!

সে ত লোকদেখানো পরে? সাধ ক'রে আর ক'জন পরে। যা ছালার মত মোটা আর ভারী! খাদি হচ্ছে বৈরাগ্যের প্রতীক। খাদি-পরা লোক দেখ্‌লেই আমার মনে হয় ওর জীবনের রং সব ধুয়ে গেছে!

তোমার মুখে খাদির নতুন ব্যাখ্যা শুন্‌লুম যা হোক্!

বাগানের রাস্তা ঘুরিয়া দিগেন্দ্রলাহার অষ্টিন গাড়ী অগ্রসর হইতে দেখা গেল। চন্দ্রিকা বলিল, তোমার জীবনের রং ফলাবে সেই বর্ণকার তোমার হাজির নীরা।

বাবা, মেয়ে মেটাফর ছাড়া আজকাল কথাই কন্ না। বর্ণকার কে, দেখি—বলিয়া নীরা উঠিয়া জানালার কাছে গেল, তাহার পর হাসিতে হাসিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

মন্দোদরী

শ্রীহাসিরাশি দেবী

লোক চক্ষে যবে তুমি প্রকাশিলে, দানব-দুহিতা !
সেদিন যৌবনতীরে
অতি ধীরে
জ্বলে তব কৈশোরের চিতা।
জলধি বেষ্টিত পুরী স্বর্ণলঙ্কা সমুন্নত শিরে
বহে তব জয়ের পতাকা ; সিন্ধু গাহে ধীরে
তোমারে শুনাতে গান ; হে লঙ্কেশ্বরী !
তোমারে তুষিতে বায়ু পারিজাতগন্ধ আনে হরি'।
অনন্ত সৌন্দর্য্য মাঝে তবু দুটি স্নেহ ঝরা আঁখি
দিবসে নিশীথে রহে জাগি,
অত্যাচারী উচ্ছৃঙ্খল পতির লাগিয়া ;
দুরু দুরু হিয়া,—
নিতি করে
কল্যাণ কামনা তার তরে।
প্রহরে প্রহরে
সতর্ক প্রহরীর প্রায়
তাহারে রাখিতে চায়
আপন অন্তর মাঝে বাঁধি
কত স্নেহে, কত সাধি—সাধি।
স্বামী তব দুর্দ্দম দুর্ব্বার,—
তার লাগি কত আঁখিধার
মুছিয়াছ, ওগো প্রেমময়ি !
তবু তুমি জেনেছিলে,—একা তুমি জয়ী
বিশ্বজয়ী স্বামীর হৃদয়ে।

রক্ষঃকুল রাজমাতা হয়ে
পুনঃ যবে দেখা দিলে জননীর অতুল গৌরবে,—
শ্রদ্ধানত সরে
তোমার মূরতি হেরি, ওগো গরিয়সি !
ত্রাসে কাঁপে স্বর্গ-মর্ত্তবাসী
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
জিনিল অমর-
-পুরী— পুত্র তব যবে লয়ে আশীষ পতাকা
জননীর সে বিরাট শক্তি মাঝে ঢাকা
পড়িল সকল শক্তি সব আয়োজন ;
ত্রিভুবন-জয়ী পুত্র বহে মাথে তোমার কেতন।
আর একদিন
শঙ্কা ভীতি-হীন
মন ল'য়ে—হাসিমুখে সাজাইয়া পুত্রেরে তোমার
বীরসাজে পাঠাইলে মহারণে ; আর,—
স্বামীরে সাজায়ে যোদ্ধৃবেশে, দিলে নিজহাতে
ঢাল তরবারী তুলি—উজ্জ্বল কিরীট দিলে মাথে
যতনে পরায়ে পুত্রেরে দানিলে স্নেহে শেষের চুম্বন,—
স্বামীরে দানিলে আলিঙ্গন।
তারপর শোকক্লান্ত দীন হিয়া ধরি,—
হে লঙ্কেশ্বরী
লুটাইলে পথধূলিপরি,
জীবনের শেষপ্রান্তে অস্তাচলে গেল যে ভাস্কর
হৃদি রক্তে চুমি ; শুধু তব বক্ষের উপর
চিরদিন তরে জ্বলি উঠিল যে রাবণের চিতা,
নিশিদিন
তন্দ্রাহীন,—
বিশ্বে সবে পাঠ করে—অভিনব সেই শোক-গীতা।

স্বভাব ও সমাজ

শ্রীনীলিমা দাস

(১)

স্বভাবের নিয়মে দেখি এক, সমাজের নিয়মে দেখি আর। স্বভাব যে-পথে চলে, সমাজ তার বিপরীত পথে অগ্রসর হয়। স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিবার দম্ভ লইয়াই সমাজের জন্ম হইয়াছিল বুঝি! কিন্তু তাহা সম্ভবপর নয় বলিয়াই আজ আবার প্রতিক্রিয়ার যুগ আরম্ভ হইয়াছে,—সমাজ-শাসন স্বভাবের গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। সকল দেশেই একদিন এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। সামাজিক শাসন যেখানে যত কঠোর হইয়াছে, সেখানেই দেখা গিয়াছে,—তার তলে-তলে মানুষের বাধা-প্রাপ্ত স্বাভাবিক বৃত্তি সংযমহীন উচ্ছৃঙ্খলতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

দেহ-ধর্ম্মের স্বভাবই আলাদা। তাহাকে অস্বীকার করা চলে না। তাহার আপনার জগতে এমন কতকগুলি অভাব আছে, যাহা পূরণ করিয়া নেওয়া একান্ত প্রয়োজন,—নতুবা অনর্থ ঘটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সমাজের নিয়মে দেখা যায়, ঠিক ওই জায়গাটিতে কেবলি বাঁধুনীর পর বাঁধুনী,—নিয়মের গ্রন্থী শত-সহস্র পাকে মনকে অনুক্ষণ বেষ্টন করিয়া আছে। যৌনসম্বন্ধে সামাজিক-বিধানের এই কড়াকড়ির মূলে কি আছে? *

সভ্যতার শৈশবে, যখন আমাদের শাস্ত্রানুশাসন তৈয়ার করার প্রয়োজন হইল, তখন দেখিয়াছি—দৈহিক-বলে বলীয়ান্ পুরুষ লালসায় উন্মত্ত হইয়া সুন্দরী-নারীকে ভোগেচ্ছায় অপহরণ করিয়াছে। তারপর নিতান্ত ভয়ে—পাছে অন্য কোনও মাংস-লোলুপ পুরুষ তার ভোগ্যবস্তু সেই রকমই ভোগের লিপ্সায় হরণ করে,—তাই সহস্রপ্রকার সামাজিক-বিধান, আচার, নিয়ম, সূত্র প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। এ-ক্ষেত্রে ভোক্তা-পুরুষের কাছে নারী কোনই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই,—সে যে একটা সাধারণ ভোগ্যবস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। ইঁট-পাথরের মতোই সে ঘর-তৈয়ারীর প্রয়োজনে এবং ঘরের মালিকের দৈহিক দরকারের দাবী মিটাইবার প্রয়োজনে নিজের দাবীকে বলি দিয়াছে। এক কথায় নারীকে একান্ত নিজস্ব করিয়া ভোগ করিবার জন্যই আদিম-যুগের পুরুষ সামাজিক নৈতিক-সূত্রের সৃষ্টি করিয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার পথ কোথায়?

ক্রমে সভ্যতার বয়স যখন বাড়িয়া চলিল, পুরুষের এই স্পষ্ট সাদাসিধা মনোভাবটা যেন তাহাকেও লজ্জা দিতে লাগিল; তখন সে নিরুপায় হইয়া নারীকে কতকগুলি কাল্পনিক ভূয়া

* মূল অনুসন্ধান করিতে গেলেই প্রথমতঃ একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই সামাজিক-বিধানের স্রষ্টা কে?—পুরুষ, না নারী? এবং নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি এই বিধানসমূহ সমানভাবে প্রযোজ্য কিনা? এ সম্বন্ধে আমি 'জয়শ্রী'র বিগত আশ্বিন সংখ্যায় 'নর-নারী' প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

আদর্শের সম্মুখীন করিয়া দেবীত্বের লোভ দেখাইতে সুরু করিল এবং সেখানে আলো এতটা ফেলিল যে, নিজের পঙ্কিল মনের কুৎসিৎ কদর্য্যতাটা তাহাতে নারীর দৃষ্টির লক্ষ্য হইতে অনেকটা সরিয়া গেল। নারীর চোখ সেই দেবীত্বের আদর্শে ঝল্‌সিয়া গেল; পুরুষ হাঁফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং দিনের পর দিন ধরিয়া সে অনুশাসনরচনায় আত্মনিয়োগ করিল। নির্ব্বিচারে চলিতে লাগিল, কর্ত্তৃত্বের অত্যাচার, মন্ত্রের অত্যাচার,—নারীত্বের অন্তরাত্মার অপমান, নারী-মর্ম্মের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ।

নারীর দুঃখের ইতিহাস এপর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। সে কাজ পুরুষের দ্বারা হয় নাই—হইবে না। সে কাজ নারীরই। সে-ইতিহাস যদি কোনোদিন রচিত হয়, তবে দেখা যাইবে—এই পুরুষ-সৃষ্ট বর্ত্তমান সভ্যতার মূল্য কি ?

(২)

কিন্তু একথা ঠিক যে, দুঃখই মানুষকে তার বন্ধনসম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলে। এই যে বন্ধনের চেতনা,—ইহা হইতেই মানুষ আপনার ব্যক্তিত্বকে, আপনার অন্তরাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার দুর্জ্জয় শক্তি লাভ করে। বলিতে হয়, যুগের হাওয়া আজ উল্টা বহিতে সুরু করিয়াছে। নারী তার যুগ-যুগান্তের বন্ধনসম্বন্ধে এবং মানুষের সমাজে তাহার স্থানসম্বন্ধে অনেকটা সচেতন হইয়াছে।

স্বর্গ ও মোক্ষ-প্রাপ্তির লোভ দেখাইয়া পুরুষ এতদিন নারীর ভোগ্যবস্তুতা সম্বন্ধে নারীর মনে এমন একটা সহজ সংস্কারের শিকড় বসাইয়া দিয়াছিল যে, তাহারা আপনাদের সেই অবস্থাকে গৌরবের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ শতাব্দীর বন্ধন-প্রপীড়িতা নারী তাহার জবাব দিতেছে,—আমি তোমার ভোগের জিনিষ যদি হই, তুমিই বা আমার ভোগের জিনিষ নও কেন ? আমার বেলায় একনিষ্ঠার দোহাই, অথচ তোমার বেলায় প্রয়োজনের দাবী,—এ বৈষম্য কেন ? প্রয়োজনের দাবী কি নারীর থাকিতে নাই ?

দেখা যায়, বিবাহকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করা হইয়াছে, একমাত্র নারীর দিক হইতেই। পুরুষ আপনার দৈহিক প্রয়োজনবোধের মর্‌জিতে একাধিকবার একাধিক নারীর পাণিকে পীড়ন করিতে পারে, অথচ নারীর বেলায়—বিবাহিত জীবনের বাহিরে দৈহিক সম্বন্ধ-স্থাপন একেবারেই ঘৃণার্হ।

ইহাতে মনে হয়, বিবাহকে যেন প্রধানতঃ যৌন-সম্বন্ধ বলিয়াই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অর্থাৎ কিনা স্পষ্ট করিয়া পুরুষকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, যাহাকে তুমি স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবে, তার সঙ্গে তোমার মনের যোগের সম্বন্ধ মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। শুধু দেখিয়া নাও—তার দেহের মধ্যে তোমার দৈহিক ভোগের সব উপাদান আছে কিনা ? না থাকে, কুছ্‌পরোয়া নেই—আবার বাছাই করিয়া লও। কিন্তু দেখিও সাবধান,—তোমার প্রত্যাখ্যাতা, অবজ্ঞাতা স্ত্রী-টির একনিষ্ঠতা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়! অর্থাৎ নারী যে পুরুষেরই সমধর্ম্মী—একথা যেন

কার্য্যতঃ কোথাও ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না পায় !—তা' মুখে যতই কেন না তাহাকে সহধর্ম্মিণী আখ্যা দেওয়া হৌক্।

কিন্তু শিকারী পুরুষের ধাপ্পাবাজী আজ নারীর চোখ ফুটাইয়া দিয়াছে। বিভিন্ন দেশে মানব-সমাজে নারী বর্ত্তমানে যে অবস্থায় রহিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রবল আপত্তি নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মনুষ্যত্বের অধিকার ও দায়ীত্ব আজ নারী তাহার নিরপেক্ষ বুদ্ধিদ্বারা বিচার-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে চাহে।

(৩)

জীর্ণ পুরাতন ইমারতের উপর নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করা যায় না,—একথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে বেশী বুদ্ধি খরচ করিতে হয় না। পুরাতন ইমারতকে ভিত্ হইতে উপ্ড়াইয়া যখন ফেলি, নূতন গৃহ-স্থাপনার জন্য তখন কি সেটাকে আমরা একটা দারুণ দুর্ঘটনা মনে করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করি ? বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য,— সকল সঙ্কীর্ণ সংস্কার, একদেশদর্শী দেশাচার, মিথ্যা শাস্ত্রানুশাসন সমূলে ধ্বংস করা।ধ্বংসের পরেই আসে সৃষ্টি।—সে সৃষ্টি পুরাতন ইমারতের উপর ক্ষণস্থায়ী নূতন ইমারত সৃষ্টি নয় ; নূতন মাল-মশ্লায়, সবল কাঠামের উপর নূতন করিয়া যুগোপযোগী সৃষ্টি।

আমাদের সনাতনপন্থী সমাজ কিছু ভাঙ্গার নামে আগেই শিহরিয়া ওঠেন। জোরা-তালি দিয়া গুটি-সুটি মারিয়া বসিয়া থাকিতেই সে অভ্যস্ত। কি জানি-কি-হয়,—এর ভয়ে প্রাচীন কোটর আঁক্ড়াইয়া থাকিতে দুনিয়ার আর কোনো দেশের সমাজ তাহার মত অভ্যস্ত নয়। পদে পদে তার ভয়-ভাবনা লাগিয়াই আছে,—যদি ভুল হয়, যদি ভাঙ্গিয়া যাই, যদি লাভে মূলে হারাই !

আজ নারীকে 'কি জানি কি হয়' এর ভাবনা বিসর্জ্জন দিতে হবে। মনে করিতে হইবে,— চেষ্টা যেখানে, সেখানেই ব্যর্থতা ; সেখানেই ভ্রান্তি। পণ করিতে হইবে,—বারম্বার ব্যর্থ হইব, ভুল করিব, তবু মৃত্যুর নিশ্চেষ্টতা ও নিস্ক্রিয়তা গ্রহণ করিব না। স্বাধীনতার জন্মভূমি বিপ্লবের মন্ত্রদাতা ফ্রান্সের মনীষার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে,—

—Only those who attempt nothing, never make mistakes. But error struggling on towards the living truth is more fruitful and more blessed than dead truth.

—যারা কোনো চেষ্টাই করে না, কেবল তারাই কখনো ভুল করে না ! গুপ্ত প্রাণহীন সত্যের চেয়েও, যে ভুল পদে পদে নিষ্ফল হইয়াও জীবন্ত জাগ্রত সত্যের পানে চলিয়াছে, তাহাই সার্থক ও বরণীয়।

আজ্ নারীকে নিজের কার্য্যক্ষেত্র নিজেই রচনা করিতে হইবে। পুরুষের মুখ চাহিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী তো কাটিয়া গেল, 'না জাগিলে সব ভারত-ললনা'—ধরণের ঔদার্য্য- সঙ্গীতও বহু শোনা গিয়াছে,—ফলে যাহা হইয়াছে, নারীর বর্ত্তমান অবস্থাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আজ যখন দুনিয়া জোরা একটা আলোড়নের ঢেউ বহিতেছে,—এই শুভ-মুহূর্ত্তে বাঙ্‌লার নারীকেও বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সমাজের নিগড় ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে হইবে—দুর্ব্বার প্রাণ-শক্তির পথে। ইন্দ্রিয়াতীত পরকালের লোভে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহকালটাকে পঙ্গু করিলে চলিবে না।

(৪)

মনে রাখিতে হইবে, সমস্ত প্রতিক্রিয়াই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের নিয়মানুসারে আসিয়া থাকে। প্রথম প্রাবল্যের সময় তাহার মধ্যে কোনো একটি বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য থাকে না বলিয়াই তাহা প্রথমতঃ একান্তরূপে বিসদৃশ ও বিরুদ্ধাচারী বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার মধ্যে একটি সহজ ও সাবলীল সুসঙ্গতি দেখা দেয়,—তাহা পরিমিত হইয়া একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে।

সুতরাং বর্ত্তমান বিক্ষোভের রূপ দেখিয়া ঘাব্‌ড়াইয়া যাওয়ার কোনোই মানে নাই। পঞ্চ-বার্ষিক-সঙ্কল্পের (Five-year plan) লীলাক্ষেত্র রুশিয়ায় আজ কী হইতেছে? সেখানে মানব-মন একেবারে নূতন করিয়া ভাবিতেছে, পড়িতেছে,—কোটি-শতাব্দীর পুঞ্জিত সমাজ-বিধান আজ চোখের উপর লুপ্ত হইয়া গেল। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে আজ তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধ্বংসপ্রিয় ও সৃজনপ্রিয় জাতি। তারা ভাঙ্গে গড়িবার জন্য, গড়ে ভাঙ্গিবার জন্য। চিন্তা এবং জীবন লইয়া অহরহ তাদের খেলা; নিয়ত তাহারা ভালো করিয়া—নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবার জন্য পুরাতনকে আবর্জ্জনার মতো পরিহার করে।

আমাদের স্থবির সমাজের চোখে—বিবাহ না করিয়া ভালোবাসা চরম দুর্নীতি, ভালোবাসিয়া বিবাহ করা পরম অপরাধ, বিবাহ করিয়া ভালো না-বাসা ঘৃণার্হ। অর্থাৎ যে ভাবেই ধরা যাক্ না কেন, নারীর কার্য্যকলাপ পুরুষের মর্‌জি ও খেয়াল পরিতৃপ্তির অন্তরায় না হয়,—এটাই হইল সামাজিক নৈতিক ধর্ম্মের মূল-নীতি। এভাবেই নারীর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে মারিয়া তাহাকে প্রাণ-শক্তি-রহিত একটা জড়পিণ্ডে পরিণত করা হইয়াছে। দৈনিক উদরান্নের বিনিময়ে স্বামীর সংসারের যাবতীয় কষ্টসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করা এবং স্বেচ্ছাচারী স্বামীর উপহৃত অসংখ্য অপ্রার্থিত স্বাস্থ্যহীন স্বল্পায়ু সন্তানের প্রতিপালন—এসব তাহার নারী-জীবনের আদর্শ কর্ত্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা কোনো অংশেই ক্রীতদাসীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলা চলে না।

(৫)

পশ্চিমে ব্যক্তি বড়, সমাজ ছোট। আমাদের দেশে ব্যক্তি ছোট,—সমাজ বড়। পশ্চিমের লোকেরা ব্যক্তির জন্য সমাজ ভাঙ্গে, আমরা সমাজের জন্য ব্যক্তিকে খর্ব্ব করি। ও-দেশে প্রেম বড়, আমাদের দেশে আচার—অনুষ্ঠান। ওরা মানে স্বভাব,—আমরা মানি সমাজ।

পশ্চিম নর-নারীর মিথুন-সম্বন্ধাশ্রিত প্রেমে বিশ্বাস করে বলিয়াই নাকি তাহাদের বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থায়ী ও সুখকর হয় না! কিন্তু আমাদের বিবাহানুষ্ঠানটা না জানি কোন্ সম্বন্ধাশ্রিত? "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'—না জানি কোন্ দেশের শাস্ত্র-বচন? যেন বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থায়ী হওয়ার উপরেই আমাদের দৈহিক-মানসিক সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে! কিন্তু পুরুষের বেলায় এতখানি যুক্তি ব্যয় করিতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না।

আসল কথা কি, পশ্চিমে জোড়াতালির কারবার নাই। যাহা ভাঙ্গিবেই, তাহাকে জোর করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার মত অতিরিক্ত করুণা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। তা'ছাড়া উহারা বিবাহটাকে মনে করে, স্বাভাবিক ইচ্ছার স্বাভাবিক পূর্ণতা। মানবের স্বাভাবিক-ধর্ম্মের মধ্যে পশুভাব ও primitive ভাব থাকেই,—বিবাহের সঙ্গে খোলাখুলি-মনে ও দুটিকে যোগ করিতে উহারা লজ্জা বোধ করে না। উহারা যাহা খোলাখুলি-ভাবে স্বীকার করে, আমরাও অন্তরে অন্তরে তাহা স্বীকার করি,—কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে গেলে সমাজ-ধর্ম্ম রসাতলে যায়!

সমস্ত জীবন ভরিয়া হৃদয়ের সমস্ত প্রেম একজনের উদ্দেশেই উৎসর্গ করিতে হইবে, কিংবা একবার একজনকে ভালোবাসিলে, পরবর্ত্তী জীবনে আর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারা যাইবে না,—এই রকম কতকগুলি কুসংস্কার আমাদের সমাজে আছে। আমরা ভুলিয়া যাই,—প্রেম, ভালোবাসা বা আসক্তি, যাহাই ধরা যাক্—সবই ব্যক্তিগত মানব-রুচির উপর নির্ভর করে। একই রুচি যে চিরকাল থাকে না, আমাদের মত ঔদরিক জাতিকে তাহা বোধহয় স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না।

মনের উপর চোখ রাঙ্গানো যায়; কিন্তু সে যাহা ভাবে, বোঝে বা করে,—তাহা রোধ করা যায় না। তার উপর আরও বিপদ, মন সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল! শুনিয়া মূর্চ্ছা যাইবার কোনও হেতু নাই—হ্যাভ্‌লক্, এলিস্, এলেন্ কেই প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ আজীবনস্থায়ী প্রেমে বিশ্বাস করেন না।

একদা নারী অসঙ্কোচে যার কাছে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিবে, মনের খুশীতে সে আবার আর একদিন নির্ভয় আত্ম-নির্ভরে তার কাছ হইতে নিজেকে ফিরাইয়া লইবে,—ইহাই তো মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আগা-গোড়া সে থাকিবে—সজাগ, আত্মস্থ। প্রেমের আবেগে তার সহজ বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন না হয়। মনে রাখিতে হইবে,—বিবাহটা সামাজিক নয়, ব্যক্তিগত। তাহার মন সে কাহাকে দিবে, তাহার দেহ সে কাহাকে দিবে, সেকথা,—সমাজের জন্য নয়—নিজের জন্য হাজারো বার সে যাচাই করিয়া দেখিবে।
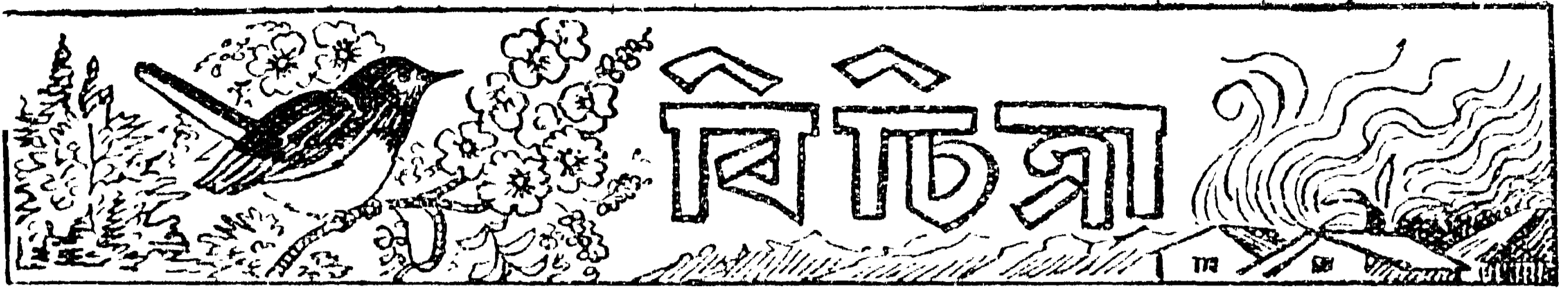
আমেরিকায় শ্রীযুক্ত প্যাটেল—

জাতীয় ব্যবস্থাপরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মিঃ ভি, জে প্যাটেল ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্বন্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রচার কার্য্য করিতেছেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় ভারতবাসীদের দুঃস্থ অবস্থার কথা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিকট বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহার আলোচ্য বিষয় তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অনুসৃত নীতি পরিবর্ত্তন না করিলে জগতে শান্তি স্থাপন অসম্ভব। (২) ইংলণ্ডের অস্ত্র-হ্রাস করিবার অভিলাষ নাই। (৩) ইংলণ্ড ভারতের ধনভাণ্ডার শোষণ করিয়া লইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিলেই আমরা ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিব। তিনি বলেন—ব্রহ্মের কৃষকগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শষ্য উৎপাদন করে, ইংলণ্ড বেশ আরামে বসিয়া খায়। ইংলণ্ড পারস্যের সাহ্‌কে লণ্ডনে আমন্ত্রণ করে। তাহাকে মহার্ঘ পারিতোষিক দানে তুষ্ট করে, কিন্তু এই ব্যয় বহন করে পারস্যের অধিবাসীরা। ইংলণ্ড ভারত জয় করিল, কিন্তু যুদ্ধের ব্যয়ভার চাপাইয়া দিল ভারতের উপর।

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে এযাবৎ ভারত হইতে প্রায় তিন হাজার কোটী টাকা গিয়াছে; কিন্তু ইংলণ্ড বলে, যে সে ভারতে খাটাইতেছে প্রায় দেড় শত কোটী টাকা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইংলণ্ড নিজের হিতার্থে লইয়াছে বহু বেশী। ইংলণ্ডকে আমরা যত দেই ততই আমাদের নিকট শুধু দাবী করে বহুদিন যাবৎ শুধু এই ব্যাপারই চলিতেছে।

নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"জগতের জাতিসমূহ যুদ্ধ-সম্ভার ও অস্ত্রহ্রাস না করিলে শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বন্ধুগণ, যতদিন পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন অস্ত্রহ্রাসের কথা বলা বৃথা। কিন্তু যতদিন ইংলণ্ড দুনিয়ার বাজারে একচেটিয়া অধিকার দাবী করিবে ততদিন কোন জাতিই অস্ত্রহ্রাস করিবে না। ইংলণ্ড চায় তাহাদের রণতরীর সংখ্যা হ্রাস করুক, কিন্তু নিজে অজুহাত দেখায় যে ৮৫ হাজার মাইল সমুদ্রোপকুল রক্ষা করিবার জন্য তাহার যথেষ্ট রণতরীর প্রয়োজন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই "সমুদ্রোপকুল সমূহ কাহাদের?" নিশ্চয়ই পরাধীন জাতিসমূহের।"

ভারতে শোষণ-নীতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন —

"এখন ভারত সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলিব। আজ দেড়শত বৎসর যাবৎ ইংলণ্ড ভারতে অধিকার স্থাপন করিয়াছে। ভারতে ইংলণ্ড কড়া আইন জারী করিয়াছে, যে তথায় ইংরাজের অনুমতি ভিন্ন কেহই বন্দুক রাখিতে পারিবে না, সত্য বলিতে গেলে, ইংলণ্ড ভারতের সকলকে অস্ত্রহীন করিয়া আসিয়াছে!"

"তাহা ছাড়া ইংলণ্ড ভারতে সর্ব্বদা ৬০ হাজার বৃটিশ সৈন্য রাখিতেছে। তারপর ভারতে ইংরেজ প্রতিনিধিদের বেতনের কথা শুনুন। ভারতে বড় লাটের বেতন ৫০০০, ডলার (প্রায় ১২½ হাজার টাকা) এবং

অন্যান্য ব্যয়বাবদও প্রায় এই পরিমাণ টাকাই পাইয়া থাকেন। উচ্চতন সকল কাজই ইংরাজদের জন্য সংরক্ষিত। যদি আপনাদের বলি যে, প্রতি ভারতীয়দের গড়ে আয় ছয় পয়সা, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, এরূপ উচ্চ বেতন ভারতের অর্থ কিরূপে শোষণ করিতেছে।"

নারী-শিক্ষা সমিতি

গত ২রা মাঘ কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরীর গৃহে নারী শিক্ষা সমিতির ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্বায়ত্ব-শাসন বিভাগের মন্ত্রী লেফ্‌টান্ট কর্ণেল বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়।

ইহার কার্য্য বিবরণী হইতে জানা যায়, এই সমিতির চেষ্টায় কলিকাতা ও পল্লীঅঞ্চলে ৫০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও তাহাতে প্রায় ২০০০ মহিলা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সমিতির জন্য স্থায়ী বাস-ভবন প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু অর্থাভাবে সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না।

এই অধিবেশনে শ্রীযুক্তা শান্তা নাগ নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা পাঠ করেন। তাঁহার পঠিত বক্তৃতা হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"আধুনিক গৃহের মাতা, বধূ কি গৃহিনী হউক, দেশসেবিকা কি সমাজহিতব্রতা হউক, ব্যবসাবাণিজ্য কি অন্য কোন কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সহকর্ম্মী কি প্রতিদ্বন্দ্বী হউন, তাঁহাকে দশের শতের অথবা সহস্রের চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার নারীত্বের ও মনুষ্যত্বের পরীক্ষা সর্ব্বত্র দিতে হইবে। সমস্ত পৃথিবীটাই আজ মানুষের এতকাছে আসিয়া পড়িতেছে যে ঘরের কোণে লুকাইয়া আপনার গৌরব লইয়া আস্ফালন করিবার আর উপায় নাই। মানুষের মূল্য যাচাই করিতে এবং নিক্তি হাতে তাহার তুলনামূলক সমালোচনা করিতে হাজার জহুরী খাড়া হইয়া আছে। আত্মশাসন ও আত্মপরীক্ষার এ যুগের নারীর এতটা প্রয়োজন আছে বলিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার আজ বিশেষ ডাক পড়িয়াছে। সর্ব্বক্ষেত্রে যাহার অধিকার প্রসারিত হইতেছে তাহাকে সর্ব্বক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইবে। নারী আজ স্বাবলম্বী হইতে বাধ্য। স্বাবলম্বনের জন্য বিভিন্ন রকমের অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন আছে। শিশুপালন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, সংসারের সাহায্যের জন্য সকল কারণে সকল দিকদিয়া মেয়েদের শিক্ষা যে আরও সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া উচিত ইহা বুঝিয়া তাহার প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি মেয়েদের শিক্ষা দিবার দিন আসিয়াছে। যুগ পরিবর্ত্তনের গতি দ্রুততালে চলিতেছে। আমরা যদি তাহার প্রয়োজন বুঝিয়া রসদ না যোগাইতে পারি, অন্ধ চক্ষু ও খঞ্জ চরণ লইয়া আমাদেরই সমূহ ক্ষতির বোঝা বহিতে হইবে।"

মিসেস্ কাজিনসের কারাবরণ

আইরিশ মহিলা মিসেস্ কাজিনস্ আজ সতের বৎসর যাবৎ ভারতের নরনারীর সহিত একযোগে কার্য্য করিতেছেন। কয়েকবৎসর বহির্ভারতে ঘুরিয়া তিনি বর্ত্তমানে মাদ্রাজ ফিরিয়া আসিয়াছেন।

মাদ্রাজ সহরে গত ৩রা ডিসেম্বর গোখেল হলে ও ৭ই ডিসেম্বর তিলকঘাটে দুইদিন বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা আপত্তিজনক জানাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার উপর এক আদেশ করেন যে একবৎসর তিনি নীরব থাকিবেন এই মর্ম্মে তাঁহাকে ১০,০০০ টাকা ও দুইজন ব্যক্তিকে জামিন থাকিতে বলেন। কিন্তু মিসেস্ তাহাতে রাজী হন নাই। কাজেই ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে এক বৎসর বিনাশ্রম কারাভোগের আদেশ দিয়াছেন।

মিসেস্ কাজিনস কোর্টে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম এখানে উদ্ধৃত করা হইল তিনি বলেন — "আমি যে আজ কোর্টে আনীত হইয়াছি ইহা মোটেই আকস্মিক নয়। সতের বৎসর

ভারতের ভাইভগ্নীদের সহিত যে একান্ত আন্তরিকতা লইয়া কাজ করিয়াছি ইহাই তাহার ফল। আমি এবং আমার স্বামী তাঁহাদের সহিত এত ঘনিষ্ঠতার ফলে উপলব্ধি করিয়াছি বিদেশী শাসনের জন্য তাহারা কিরূপে নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত হইতেছে।

ব্রিটেন একদিকে ভারতে স্বাধীনতা দেওয়ার ভাণ করিতেছে, অন্যদিকে ভারতকে স্বায়ত্ব-শাসন হইতে বঞ্চিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। স্বাধীনতা দিবার পরিবর্ত্তে ভারতগবর্ণমেণ্ট অর্ডিনান্স জারি করিয়া স্বাধীনতা দমন করিবার চেষ্টার ক্রটি নাই।

একটি দেশের "প্রতিনিধি-সঙ্ঘ" আমাকে এদেশবাসীকে জানাইতে বলিয়াছে "নিপীড়িত ভারতবাসীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে এবং ভারতে যে দমন-নীতির প্রচলন হইতেছে আমরা তাহার নিন্দা করি"

পরিশেষে তিনি বলেন, আমি আয়ারল্যাণ্ডের মেয়ে বলিয়াই পরিচিত হইতে পারিব না যদি না আমি বর্ত্তমান কংগ্রেসকর্ম্মীদের সহিত একত্র কাজ করিতে পারি। গবর্ণমেণ্ট ৩০,০০০ টাকা জামিন দ্বারা আমার স্বাধীনতার মূল্য ধার্য্য করিয়া আমাকে ঠিকই কংগ্রেসের পরমবন্ধু সাব্যস্ত করিয়াছেন।

তাঁহারা কি আশা করেন যে আগামী বৎসরের মধ্যে দেশের সকল নেতারাই নীরব থাকিবে? এই যদি তাঁহাদের নীতি হয় তবে আমি সগর্ব্বে ভারতের স্বাধীনতার সমর্থন করি এবং ইংরেজের বর্ত্তমানে অত্যাচার নিপীড়নের নীতিতে লজ্জিত হইয়াছি।"

তাঁহার বক্তৃতার শেষে তাঁহাকে দণ্ডাজ্ঞা জানান হয়।

এদেশের ও বিদেশের সংবাদপত্র

আমাদের দেশ শিক্ষায় আজও অনেকের পশ্চাতে রহিয়াছে। অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের দেশের সংবাদ-পত্রের সংখ্যার একটা তুলনা করিলেই আমাদের শিক্ষার স্বল্প বিস্তারের পরিচয় পাই।

১৯২৯-৩০ সালে নিম্নোলিখিত সংখ্যার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

মাদ্রাজে—৩০৯; বোম্বেতে—৩১৪; বাংলা—৬৬৩; যুক্তপ্রদেশে—১২৬; পাঞ্জাবে—৪২৫; ব্রহ্মদেশে—১৬১; বিহার ও উড়িষ্যায়—১৩৬; মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে—৫৫; আসামে—৪৭; দিল্লীতে—৮৮; উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে—১৩।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের প্রকাশিত সংবাদ পত্রের তালিকা হইতে আমাদের দেশের সহিত অন্য দেশের পার্থক্য বুঝিতে পারি। ১৯৩০ সালে কানাডায় ১৬০৯ খানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে দৈনিক ছিল ১১৬ খানা ত্রৈসাপ্তাহিক - ৫, সাপ্তাহিক—৯৬৬, অর্দ্ধ সাপ্তাহিক—২১, মাসিক—২৮৮, অর্দ্ধ-মাসিক—৬৬ এবং অন্যান্য কাগজ ছিল ৫৭টী।

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের যেখানে লোকসংখ্যা ১২২ কোটি ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সেখানেও ১৯৩০ সালে ২২৯৯টি দৈনিক পত্র ৬৫ খানা ত্রৈসাপ্তাহিক ১২৮২৫ খানা সাপ্তাহিক ৪৮৭, অর্দ্ধ মাসিক ৩৭০৪, মাসিক ২৮১ অর্দ্ধ-মাসিক, ৯৫৬ খানা অন্যান্য সাময়িক পত্র সর্ব্বসমেত সংবাদ-পত্র সংখ্যা হইল ২০, ৭৪২ এবং ১৯৩১ সালে ২৪১৫ দৈনিক সংবাদ পত্র, ১১৫২৪ সাপ্তাহিক সর্ব্বসমেত ২১, ১৯১টি প্রকাশিত হয়।

১৯২৯ সালে জাপানে ২১১১১ মৌলিক পুস্তক এবং ৯১৯১ খানা মাসিক সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়।

পাশ্চাত্য দেশ শিক্ষায় অনেক বেশী অগ্রসর বলিয়া তাহাদের সংবাদ পত্রের কাট্‌তি ও আয় যথেষ্ট। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্র "টাইম্‌সের" ১৯৩১—৩১ সালে খরচবাদে লাভ ৩১৫৩ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৪ হাজার লক্ষ টাকা। ১৯৩০—৩১ সালে ১৩১৩৪৩ পাউণ্ড প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা এবং ১৯২৯—৩০ সালে ২৩৬৩৭৩ পালণ্ড প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা।

গত পৌষ সংখ্যার বিচিত্রায় যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা জাপান সংবাদপত্রের কথা জানিতে পাই—"চার্চ্চ-মিশনারী সোসাইটির রেভাঃ মারে ওয়াল্‌টন্‌ প্রচার কার্য্যোপলক্ষে কিছুদিন জাপানে ছিলেন। জাপানী সংবাদ-পত্রকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানকার দৈনিক পত্রগুলি প্রতিদিনই নয়টি পর্য্যন্ত সংস্করণ বাহির করে। দুইটী জাতীয় পত্রিকার প্রচার সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ এবং অন্য পাঁচ ছয়টি প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের মধ্যে প্রচারিত হয়। সংবাদ-সংগ্রহের জন্য ইহাদের নিজেদের এরোপ্লেন আছে এবং ৩৬০ মাইল ব্যবধানযুক্ত ওসাকা ও টোকিওর মধ্যে টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতীত পায়রাও ব্যবহৃত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা সংবাদদাতার কার্য্য করিয়া থাকেন এবং সহরের মধ্যে ছাত্ররাই সাধারণতঃ সংবাদ-পত্র বিলি করিয়া থাকেন।

জাপানের অর্দ্ধেক সংখ্যক পরিবার একটি করিয়া দৈনিক সংবাদ পত্র গ্রহণ করে এবং দেশে দৈনিকের সংখ্যা তিন শতেরও ওপর। আর ডাক বিভাগ মাত্র অর্দ্ধপয়সারও কম টিকিটে এগুলি গ্রহণ করে।

শিক্ষাই মানুষের অন্তরের জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি করে। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সংবাদ-পত্রের আবশ্যকতা সম্যক উপলব্ধি করেন। বিলাতে শিক্ষা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ প্রত্যেক অভিভাবক ছেলেমেয়েদের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বাধ্য। সেজন্য সে দেশে ধনী-দরিদ্র, নরনারী, বালক-বৃদ্ধ সকলেই শিক্ষিত। শিক্ষিত জনসাধারণ সংবাদ-পত্রের প্রয়োজনীয়তা বোঝে বলিয়া সেখানে ইহার কাট্‌তি ও যেমন আয় ও তেম্‌নি প্রচুর।

ভারতবর্ষে শিক্ষা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ৩৫ কোটী লোকের মধ্যে সবেমাত্র আড়াই কোটী সামান্য শিক্ষা পাইতেছে। এদেশে যখন শিক্ষা সর্ব্বসাধারণে বিস্তৃত হইবে তখনই সংবাদ পত্রের কাট্‌তি ও বৃদ্ধি পাইবে। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সর্ব্বসাধারণে শিক্ষাবিস্তারে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

অন্ধছাত্রের কৃতিত্ব

কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান সুবোধচন্দ্র রায় ১৯২৭ সনে প্রবেশিকা পাশ করিয়াছিলেন। এবার তিনি বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ পাশ করিয়াছেন।

প্রদ্যোতের ফাঁসি

ডগলাস হত্যাকাণ্ড মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামী প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্যের ফাঁসী গত ১২ই জানুয়ারী প্রত্যূষে পাঁচটার সময় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ জানা যায় যে, প্রদ্যোৎ ভোরবেলা স্নান করে; স্নান করিবার পর সে গীতাপাঠ করিতেছিল, এমন সময় ফাঁসীমঞ্চের দিকে যাইবার জন্য তাহাকে ডাকা হয়। সে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়। তাহার দুই ভ্রাতাকে যখন জেলের ভিতর লওয়া হইল, তখন তাঁহারা গিয়া দেখিল যে, প্রদ্যোৎ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। অবিলম্বে তাহাকে ফাঁসমঞ্চে উঠিতে বলা হয়, সে অবিকম্পিত পদক্ষেপে ফাঁসীমঞ্চের উপর গিয়া উঠে; তৎপর ফাঁসীর রজ্জু চুম্বন করিয়া জল্লাদের হাতে আত্মসমর্পণ করে।

—জনশক্তি

গৌরীশঙ্কর অভিযান

আগামী মার্চ্চমাসে একদল বৃটিশ গৌরীশৃঙ্গে অভিযান করিবেন। ইহাঁরা সংখ্যায় ১৪ জন, নানাপথে তাঁহারা দার্জ্জিলিঙে উপস্থিত হইবেন। ১৫ই মার্চ্চ তারিখে তাঁহারা তিব্বতের মধ্য দিয়া গৌরীশঙ্করের গাত্রে ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৬৫০০০ ফুট উচ্চে তাঁহাদের ঘাঁটি নির্ম্মাণের উদ্দেশে যাত্রা করিবেন।

রাজবন্দীদের পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি প্রদান

গত ২ শে জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা বহরমপুর, হিজলী, বক্সা, দেউলী প্রভৃতি বন্দীনিবাস ও জেলে অবস্থিত ১০৪ জন রাজবন্দীকে নন-কলিজিয়েট ছাত্রহিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী পরীক্ষাসমূহে উপস্থিত হইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এতন্মধ্যে শ্রীমতী কমলা মুখার্জ্জি নামে স্কটিস চার্চ্চ কলেজের একজন বি এ ক্লাশের ছাত্রীও আছেন; ইনি বর্ত্তমানে হিজলী বন্দীনিবাসে আটক রহিয়াছেন।

প্রশংসনীয় দান

শ্রীমতী শ্যামনন্দিনী দেবী বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক সহস্র টাকা এককালীন দান করিয়াছেন। এছাড়া স্কুলের জন্য ২০০০৲ টাকা মূল্যের জমি দান করিয়াছেন। পত্রপ্রেরক জানাইতেছেন যে, এই গ্রামে প্রায় চারি শত গ্রাজুয়েট থাকিলেও একটিও গ্রাজুয়েট বা ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে নাই। মেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকা হয়ত ইহার অন্যতম কারণ। যাহাই হউক এই মহিলার স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারকল্পে এই সদিচ্ছা প্রণোদিত দান ও উৎসাহ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

—বাংলার বাণী

বিশ্বভারতীতে পারস্য অধ্যাপক

সুবিখ্যাত পারস্য মনীষী কবি আগা পোরে দেভায়ুদ বিশ্বভারতীতে পালেবী চেয়ারের অধ্যাপক পদে পারস্য সরকারকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পারস্য সভ্যতার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ইংরাজীতে নিয়মিত বক্তৃতা প্রদান করিবেন ও পারস্য-সাহিত্য পড়াইবেন।

মীরাট মামলা

গত ১৯২৯ সনের ১২ই জুন হইতে মীরাটষড়যন্ত্র মামলা চলিতেছে। দীর্ঘ তিন বৎসর দশ মাস পর মীরাট মামলার অবসান হইল। এই মামলার মোট আসামী ত্রিশ জন। তন্মধ্যে বেকসুর খালাস পাইয়াছেন তিন জন—কিশোরী ঘোষ, শিবনাথ ব্যানার্জ্জি ও বিশ্বনাথ মুখার্জ্জি। আর বাকি সাতাশ জন দীর্ঘকাল কারাবাসের পরও কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। একজনের দ্বীপান্তর এবং অন্যান্যদের বার হইতে তিন বৎসরের মধ্যে বিভিন্নকালের কারাবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আইনের বিচারের উপর কাহারও কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু এতখানি কঠোর দণ্ড না দিলেও হয়ত আইনের মর্য্যাদার কোনপ্রকার হানি হইত না। এতদিন কারাবাসই ত যে কোন আসামীর পক্ষে যথেষ্ট দণ্ড। এই মামলায় নাকি সরকারের ব্যয় হইয়াছে মোট ষোল লক্ষ টাকা। অপরাধীকে শাস্তি দিবার জন্য এত টাকা ব্যয় করিয়া এত বড় আয়োজন আর কখনও বোধহয় হয় নাই।

স্বদেশের ও বিদেশের গ্রন্থ-প্রকাশ

ভারতে ১৯৩০—৩১ সালে ৩৯০৩ খানি পুস্তক ও ১৪২০ খানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ৩৯০৩ খানি পুস্তকের মধ্যে ৩৭৫৮ খানি নূতন, ১৪৫ খানি পুনর্মুদ্রন বা অনুবাদ। শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা ১৭৫৬ খানি।

১৯৩১ সালের অক্টোবর হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ১৫, ৫৬৩ ইহার পূর্ব্বের বৎসর প্রকাশ হইয়াছিল ১৪, ৮৭৬ খানা।১৯২৯—৩০ সালে ভারতবর্ষে ইংরাজী এবং ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষায় ছাপা হইয়াছে ১৪৮১৫ খানা পুস্তক।

সাহিত্য ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে বাংলাদেশের স্থান কম নয়। ১৯৩০ ৩১ সালে মুদ্রিত গ্রন্থাদির সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৫৩২৪ তন্মধ্যে ৩৯০৩ খানা পুস্তক এবং ১৪২১ খানা সাময়িক পত্র। পুস্তকের মধ্যে ৩৭৫৮ খানা নূতন প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্ব বৎসর শিক্ষা-বিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা ছিল ১৭৫৬ এবং এবার সংখ্যাবৃদ্ধি দাঁড়াইয়াছে ২১৬৬। অন্যান্য সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ২২৪১ হইতে ২১৪৭এ দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক পুস্তকের মধ্যে অধিকাংশই স্কুল ও কলেজের পাঠ্যপুস্তক কাজেই প্রকৃত সাহিত্যের প্রসার লাভ করিয়াছে ২১৪৭টি পুস্তক মাত্র।

জার্ম্মাণীর প্রকাশিত পুস্তকের একটী তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

১৯২৭—৩১,০২৬ খানা পুস্তক। ১৯২৮ ২৭, ৭৯৪, ১৯২৯—২৭, ০০২, ১৯৩০—২৬, ২৬১, ১৯৩১ —২৪, ০৭৪ খানা পুস্তক।

জার্ম্মাণীতে ২২০৬৬ খানি পুস্তক জার্ম্মাণ লেখক কর্ত্তৃক লিখিত এবং অবশিষ্ট ইংরজী ফরাসী ও রাশিয়ার ভাষা হইতে অনুদিত অথবা বিদেশী ভাষায় অর্থাৎ ফরাসী, ইংরাজী, ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। এই তালিকা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে দেশে শিক্ষায় যত বেশী অগ্রসর সেই দেশে সাহিত্য, সংবাদপত্র তত বেশী আদৃত ও বহুল প্রচারিত।

ভারতে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী

১৯১৩—১৪ সালে ভারতে বিদেশী কাপড় আমদানী হিসাবে আমরা দেখি ১৫৩ কোটী ৪২ লক্ষ গজ কোরা কাপড়, ৭৯ কোটী ৩৩ লক্ষ গজ ধোলাই কাপড় এবং ৬০ কোটী ১৮ লক্ষ গজ রঙ্গীন ও ছাপা প্রভৃতি কাপড় আমদানী হইয়াছে। (১৯ বৎসরে আমদানী কমিতে কমিতে গত ১৯৩১—৩২ সালে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী দাঁড়াইয়াছে—২১ কোটী ৯ লক্ষ গজ কোরা কাপড় ১৭ কোটী ৯৭ লক্ষ গজ ধোলাই কাপড় এবং ২২ কোটী ৩২ লক্ষ গজ রঙ্গীন ও ছাপার কাপড়।

প্রধানতঃ বিদেশীয় বস্ত্র বর্ত্তমানে ভারতে ইংলণ্ড ও জাপান হইতে আমদানী হইতেছে। বস্ত্র ব্যবসায়ে ইংলণ্ডই ভারতে একপ্রকার একাধিপত্য করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তিন বৎসর যাবৎ জাপানই ইংলণ্ডকে বিতাড়িত করিয়া আপন ব্যবসায় বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহার হিসাব পাওয়া যাইবে—

	১৯২৯—৩০ (শতকরা ভাগ)		১৯৩০—৩১ (শতকরা ভাগ)		১৯৩১—৩২ (শতকরা ভাগ)	
	ইংলণ্ড	জাপান	ইংলণ্ড	জাপান	ইংলণ্ড	জাপান
কোরা কাপড়	৫৬’২	৪২’৫	৩৯’২	৫৯’৮	২৩’৯	৭৪’৩
ধোলাই কাপড়	৯২’১	২’৯	৮৪’৬	১০’৩	৭৪’০	২১’৪
রঙ্গীন কাপড়	৫৭’৬	৩১’৯	৬০’০	৩০’২	৪৯’৪	৪২’৪

টাকার হিসাব করিলে দেখা যায় যে ১৯২৯—৩০ সালে ভারতে মোট ৫০ কোটী টাকার বিদেশী কাপড় আমদানী হইয়াছিল। ইহা কমিয়া ১৯৩০—৩১—৩২ সালে ভারতে মাত্র ১৪ কোটী ৭০ লক্ষ টাকার বিদেশী বস্ত্র আমদানী হইয়াছে। ফলে মূল্যের দিক দিক ১৯২৯—৩০ সালের তুলনায় ভারতে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী শতকরা ৭১ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ২৯৩১—৩২ সালে বিদেশ হইতে যে প্রকার কম কোরা কাপড় আমদানী হইয়াছে, গত ৩০ বৎসরের মধ্যে এরূপ হয় নাই।

দেশবন্ধু স্মৃতিসৌধ

গত ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় দার্জ্জিলিঙ্গে মহাপ্রয়াণ করেন। কলিকাতায় সাহানগর শ্মশানঘাটের বহিরে আদি গঙ্গার তীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার নশ্বর দেহ যে স্থানে পঞ্চভূতে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থানটী চিহ্নিত করিয়া উপযুক্ত একটী স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণদ্বারা দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত ও বিরাট ত্যাগ সমুজ্জ্বল জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

স্মৃতিরক্ষা কমিটি কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে সমাধির চতুঃস্পার্শাস্থিত পাঁচ কাঠা পরিমিত স্থান বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্মৃতিসৌধের জন্য ভারতীয় আদর্শে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার জন্য ব্যয় হইবে প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

প্রায় ৯ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৫ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। এই টাকা কোষাধ্যক্ষের নামে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় জমা রাখা হইয়াছে। এই কার্য্য শেষ করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আশা করা যায় দেশবন্ধুর গুণমুগ্ধ দেশবাসীগণ যথাসাধ্য দান করিয়া ইহাকে সার্থক করিয়া তুলিবেন। বিচারপতি অনারেবল মিঃ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কমিটীর সভাপতি, সার এন্, এন্ সরকার সহসভাপতি, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

তহবিলের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় সলিসিটার কলিকাতা ১৩নং কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট – এই ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রেরিত হইবে।

কুমারী কল্পনা দত্ত

কুমারী কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম পাহাড়তলী দুর্ঘটনা-সংশ্লিষ্ট মামলায় ধৃত হইয়া হাজার টাকা জামিন এবং হাজার টাকা করিয়া মোট দুই হাজার টাকার ব্যক্তিগত মুচলেকায় মুক্ত ছিলেন। কুমারী কল্পনা দত্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচারার্থ হাজির হন নাই বলিয়া ২১শে তারিখে জামিনদারদিগের প্রত্যেককে হাজার টাকা করিয়া দিতে হইবে। নিরুদ্দিষ্টার খোঁজ এখনও নাকি মিলে নাই।

শিশু-আইন

রয়েল কমিশনারের আবেদনে ভারত গবর্ণমেণ্ট গত ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিশু-আইন পাশ করিবার অনুমোদন করেন।

আমাদের দেশে অনেক সময়ই দেখা যায়, পিতামাতা বা অভিভাবকগণ শিশুদের বন্ধক রাখেন। অর্থাৎ কারখানার মালিকগণ অপ্রাপ্ত বয়স্কছেলেমেয়েদের নির্দ্দিষ্ট বৎসর খাটাইয়া লইবার চুক্তিতে উহাদের পিতা-মাতাকে এককালীন বা সাময়িক অর্থ দিয়া থাকে। এই নাবালক বেচারাগুলি একরকম ক্রীতদাসের ন্যায়

কাজ করিতে বাধ্য থাকে। রয়েল কমিশন অমৃতসর আমেদাবাদ ও মাদ্রাজের বিভিন্ন মিল ও ফ্যাক্টরীতে এই প্রথার প্রচলন দেখিয়াছে। ইহার উচ্ছেদসাধনের জন্য এই মর্ম্মে এক আইন পাশ করা হইবে যে পনের বৎসরের নিম্নে কোন শিশুকে অভিভাবক বা ব্যবসার মালিক বন্ধক দিতে পারিবে না। অভিভাবক দিলে তাহার ৫০৲ টাকা জরিমানা হইবে আর ব্যবসার মালিক বন্ধক দিলে ৫০০৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

আসামের চা-বাগান

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ গত বৎসরের শেষভাগে আসাম প্রদেশে মোট ৯৯৭টা চা-বাগান ছিল। উহার মধ্যে ভারতবাসীর বাগান ছিল মাত্র ২৪৭টী বাকী বাগান সব ইউরোপীয়ানদের সম্পত্তি। এই বৎসরে ৩টী নূতন বাগান খোলা হয় এবং ১৮টী বাগানে কোন কাজ হয় নাই।

সুভাষচন্দ্র

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আজ বহুদিন যাবৎ চর্ব্বণপীড়ায় ভুগিতেছেন। সিউনী, জব্বলপুর, মাদ্রাজ, ভাওয়ালী এবং সর্ব্বশেষে লক্ষ্ণৌয়ে ক্রমাগতঃ শ্রীযুক্ত বসুর যে চিকিৎসা হইয়াছে তাহাতে তাঁহার রোগের কোন প্রকার উপসমের লক্ষণ দেখা যায় নাই। দেশবাসী তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থার কথা পুনঃ পুনঃ দাবী করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এতদিন তাহা গ্রাহ্য করা হয় নাই। শ্রীযুক্ত বসুর এক বন্ধুর নিকট লিখিত এক পত্রাংশ হইতে আমরা তাঁহার স্বাস্থ্য কতদূর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে জানিতে পাই। এতদিন ক্রমাগত পীড়িত থাকায় তাঁহার ওজন প্রায় ৫৩ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা বেলায় দেহের তাপ কোন দিনই ১০০ ডিগ্রীর নীচে নামে না উপরেও হয়। তিনি খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন ভাওয়ালী স্বাস্থ্য নিবাসের মেডিকেল লাক্ষ্ণৌয়ের সিভিল সার্জ্জন জানাইয়াছেন শ্রীযুক্ত বসু টিউবার কিউলিস্ রোগে ভুগিতেছেন, চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ইউরোপে পাঠান উচিত। অবশেষে ভারত-গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, সুভাষচন্দ্র চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যাইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে যাইতে দেওয়া হইবে। তাঁহার উপর ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেসন জারী আছে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে এবং আরও জানাইয়াছেন তাঁহার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নিজেরই বহন করিতে হইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দিলেন বটে, কিন্তু আমরা ইহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। আরও পূর্ব্বেই তাঁহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের প্রয়োজন ছিল। দেশবাসীর দাবী যদি পূর্ব্বেই রক্ষা করা হইত তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের আইন লঙ্ঘনও হইত না—বসু মহাশয়ও সুস্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেন। এখন আমাদের প্রার্থনা সুভাষচন্দ্র সুচিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়া উঠুন।

মহাযুদ্ধে ভারতের ব্যয়—

ব্যবস্থা পরিষদের প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ, ১৯৩২ সনের ১০ই সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবানুসারে ইউরোপের যুদ্ধের নিমিত্ত ভারতে সংগৃহীত সৈন্যের নিমিত্ত ১৩,৬০৩,০০০ পাউণ্ড ভারত সরকারের তহবিল হইতে খরচ হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারত যুদ্ধ বাবদ ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড প্রদান করিয়াছে।

চাষীর ঋণ—

আসাম—২২ কোটি টাকা, বাংলা—১০০ কোটি, বিহার ও উড়িষ্যা - ১৫৫ কোটি, বোম্বাই—৮১ কোটি **মধ্য প্রদেশ**—৩৬ কোটি, মাদ্রাজ—১৫০ কোটি, পাঞ্জাব—১৩৫ কোটি, যুক্ত প্রদেশ—১২৪ কোটি।

পরলোকে দানী বাবু

কিছুদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ১২ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৯) সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানী বাবু) পরলোক প্রস্থান করিয়াছেন। নব্য বঙ্গের অভিনয়ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ একজন অদ্বিতীয় অভিনেতা ছিলেন।

তিনি স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের একমাত্র উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) পিতার ন্যায় অভিনয়-কলায় নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হয়। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে বালক সুরেন্দ্রনাথের সুমধুর আবৃত্তি শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেন। পরবর্ত্তী কালে বহু প্রসিদ্ধ নাটকের কঠিন ভূমিকায় নিপুণতার সহিত অভিনয় করিয়া তিনি দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন মিনার্ভা ও মনোমোহন থিয়েটারের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ অভিনয় ক্ষেত্রে দানীবাবু নামে পরিচিত। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা একজন নটশ্রেষ্ঠ হারাইল।

চট্টগ্রামকলেজে জরিমানা

গত ৩রা জানুয়ারী তারিখে কে বা কাহারা কলেজের প্রাচীরে বিপ্লবাত্মক ইস্তাহার লাগাইয়াছিল। সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ না পাওয়া যাওয়াতে চট্টগ্রামকলেজের অধ্যক্ষ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর 'ক' শাখার প্রত্যেক ছাত্রকে তিন টাকা জরিমানা করিয়াছেন।
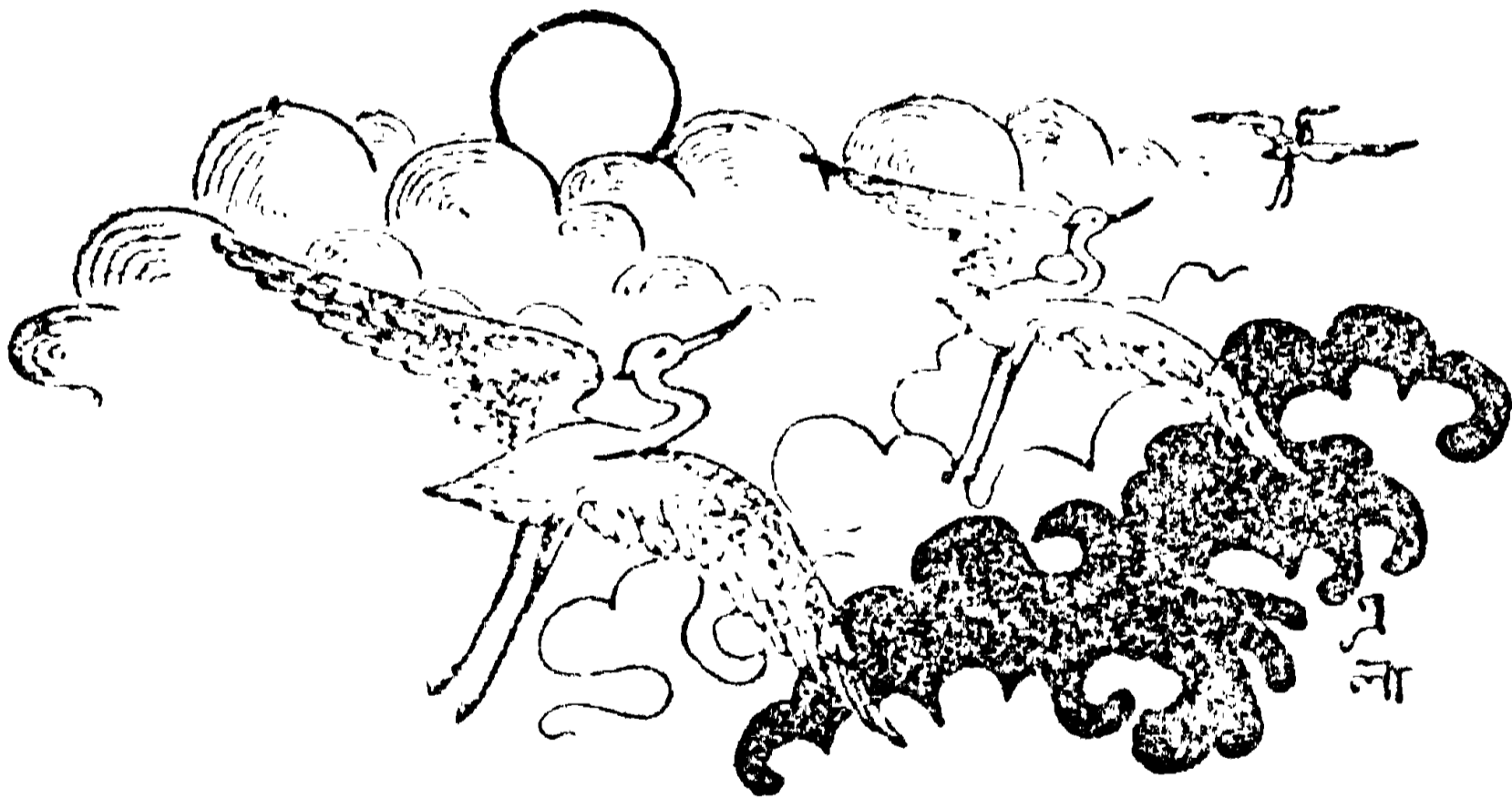
রাশিয়ার নারী

শ্রীরমা দাস

রাশিয়ার নারী প্রগতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই জার আমলে তাহাদের অবস্থা আমাদের দেশের নারীজাতির মতই শোচনীয় ছিল—সে দেশের নারী সমাজেও গৃহপরিবারে পুরুষের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। তখন নারী ছিল পুরুষের হাতের পুতুল ও পুরুষের জাতীয় সম্পত্তি।

"কুক্কুট পক্ষীশ্রেণী ভুক্ত নহে এবং নারীও মনুষ্য শ্রেণী ভুক্ত নহে" এরূপ রাশিয়ার সমাজ মনে করিত। সকাল সন্ধ্যায় পুরুষের অন্নের ব্যবস্থা করাই তাহাদের(নারীদের) একমাত্র কাজ। এই হতভাগ্য দেশের নারীজাতির ন্যায় সে দেশেও নারী শৈশবে পিতার ও পরে স্বামীর অধীনে থাকিত এবং তাহার নিজস্ব সত্বা বা ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছুই ছিল না। সে সময়ে রাশিয়ার ধর্ম্মপুরোহিতেরা এই আদেশ ও উপদেশ দিতেন যে স্ত্রী স্বামীকে ভয় করিবে এবং সকল অবস্থায় তাহাকে অনুসরণ করিবে। বিবাহিতা নারী যদি স্বামীকে যে কোন অবস্থায় অনুসরণ না করে তবে আইনতঃ আদালতের সাহায্যে স্বামী স্ত্রীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবে। স্বামীর বিনানুমতিতে নারীর চাকরী কিম্বা কোন কার্য্যেই প্রবেশাধিকার ছিল না। স্ত্রী স্বামীকর্তৃক নির্য্যাতিত ও উৎপীড়িত হইলেও আইন মতে সে স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারিবে না।

নারী তখন অজ্ঞাত ও অন্ধসংস্কারের পঙ্কিলে ডুবিয়াছিল। সে দেশের শিশুমৃত্যু সংখ্যাও আমাদের দেশের মত অত্যন্ত অধিক ছিল। গড়ে প্রায় শতকরা ২৭, কোথায় ৫০ কি ৭৫টী শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। অপরিস্কার, অস্বাস্থ্যকর গৃহকোণে শিশুরা অশিক্ষিতা ধাত্রীর সাহায্যে জন্ম-গ্রহণ করিয়া অকালে প্রাণ হারাইত।

বিবাহ ব্যাপারেও সে দেশে ক্রয়বিক্রয় প্রথাদি আমাদের দেশের বরপণ প্রথার ন্যায় প্রচলিত ছিল অর্থাৎ কন্যার পিতা যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ দিতে পারিবেন তাহার কাছেই কন্যাকে সমর্পণ করিতেন। বিবাহের পরে স্ত্রীর সকল সম্পত্তি স্বামীর অধিকারভুক্ত হইত। আর মেয়ে পৈতৃক সম্পত্তির মোট ১৪ ভাগের এক ভাগের উত্তরাধিকারিণী এবং ছেলে বাকী সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হইত।

উচ্চ শ্রেণীর নারী ব্যতীত প্রায় সমগ্র নারীই তখন নিরক্ষর ছিল। যদি শিক্ষা কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় আভিজাত্য সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকে তবে তাহাতে দেশেরও জাতির কোনই কল্যাণ হয় না। বিগত মহাযুদ্ধে রাশিয়ায় যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল সেই বিদ্রোহানলে শত শত

বৎসরের দৃঢ় সমাজ-সংস্কার বন্ধন দগ্ধ হইয়া গেল। আজ সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজ নারী ও পুরুষ লইয়া গঠিত। এখন ধনীর দরিদ্রের উপর অযথা অন্যায় উৎপীড়ন ও নিষ্পেষণ এবং পুরুষের নারীর উপর অন্যায় অত্যাচার ও আধিপত্য নাই। পুরুষ ও নারী সকল ক্ষেত্রে সহযোগী ও সহকর্ম্মী।

সে দেশের নারীশক্তি আজ কতদিকে, কত ক্ষেত্রে আপনাদের উন্নতির জন্য সজাগ ও সচেষ্ট। তাহারা শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে ও স্বাস্থ্যে যে কত উন্নত তাহার ইতিহাস যখন আমরা আলোচনা করি, তখন বুঝিতে পারি একটা জাতি যখন উন্নত হয় তখন সে সকল ক্ষেত্রেই আপনাদের সবল, সতেজ ও প্রাণবন্ত করিয়া তোলে। অধুনা রাশিয়ার নারী সমাজের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

এক সময় রাশিয়ার শ্রমিক নারীদের বার, চৌদ্দ ঘণ্টা কাজ করিতে হইত এবং প্রাণহীন জড় কলকারখানার মতই তাহারা একটানা কাজ করিয়া যাইত সে কাজে কোন আনন্দ ছিল না আর আজ তাহারা সানন্দে প্রফুল্ল মনে আন্তরিক ভাবে কাজ করিতেছে কারণ তাহারা জানে কলকারখানা ও উহার উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক তাহারাই।

আজ তাহাদের বার, চৌদ্দ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে মাত্র আট ঘণ্টা কাজ করিতে হয় এবং শিল্পদ্রব্য অধিক উৎপন্ন হইলে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি হয়। পুরাতন আলোকবিহীন অন্ধকার গৃহের পরিবর্ত্তে আজ তাহারা স্বাস্থ্যকর আলোবাতাস পরিপূর্ণ গৃহে বাস করিতেছে।

কলকারখানাসংলগ্ন শিশু-পালনাগার (nursery) শিশু-বিদ্যালয় (kindergarten) বৃহৎ লাইব্রেরী, তাহাদের শিক্ষাগৃহ, উপযুক্ত সরঞ্জামসজ্জিত ব্যায়ামাগার, চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। মানুষের জীবনকে সতেজ ও স্বাস্থ্যযুক্ত করিবার সমস্ত আয়োজন রহিয়াছে।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট রাশিয়ার নারী-শ্রমিকদের জন্য আইন করিয়া কতকটা সে সুবিধা দিয়াছেন। রাসায়নিক শিল্পে অর্থাৎ যে সকল শিল্পে সীসের পাউডার নাকে যাইবার সম্ভাবনা তাহাতে স্ত্রীলোকদের নিযুক্ত করা হয় না। অন্তঃসত্ত্বা নারীদের রাত্রে ও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের বেশী কার্য্যভার দেওয়া নিষিদ্ধ। সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে তাহাদের চার মাস ছুটী দেওয়া হয়। প্রসূতিদের শিশু পালন করিবার জন্য সাড়ে তিন ঘণ্টার কার্য্যের পর অর্দ্ধ ঘণ্টা ছুটী দেওয়া হয়।

তারপর (Maternity Insurance) অর্থাৎ মাতৃ জীবনবীমা করা হইয়াছে। যখন মেয়েদের অস্বাস্থ্যকর অন্ধকার কলকারখানার কার্য্য করিতে হয় তখন আট ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ছয় ঘণ্টা করিবার ব্যবস্থা আছে এবং বিশেষভাবে দুগ্ধ ও মাংসাদি খাদ্য দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে মাত্র কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নারীদের নিযুক্ত করা হইত। আজ অনেকক্ষেত্রেই নারী প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে এবং নারীশ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বালিকা ও অন্তঃসত্ত্বা নারীদের নেওয়া হয় না। কোন পুরুষ যদি কোন কারণে কার্য্যচ্যুত হয় তবে নারীকেও সেই কারণে কার্য্যচ্যুত করা হয়—কেবল নারী বলিয়া কাহাকেও বিদায়

করা হয় না।শ্রমজীবীরা যাহাতে বিশ্রামসময়ে বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে সেজন্য ক্লাব বা সমিতি আছে; সহস্রাধিক নারী শ্রমিক ক্লাবের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া নানা নারীহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সর্ব্বক্ষেত্রেই রাশিয়ার নারী আপনাদের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে সচেতন ও সচেষ্ট।

রাশিয়ার বিভিন্নক্ষেত্রে কত নারী নিযুক্ত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিভিন্নক্ষেত্রের নাম	শতকরা নারী সংখ্যা
সেলাই ও দরজীকার্য্যে	৯৪.৪
সঙ্গীত	৫৭.৩
লাইব্রেরী	৫০
শিক্ষা ও সাহিত্য	৪২.৯
অভিনয়	৩৮.৭
সাধারণ শিক্ষা (General education)	৩৫.৮
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	৩৩.৪
শরীরচর্চা	৩১.৪
শিল্প	৩০.৬
শ্রমিকদিগের বিজ্ঞানসম্মত সংগঠন (Scientific organization of Labour)	৩০.৪
প্রাথমিক রাজনীতি	২৯.৫
মার্ক্স্‌মতাবলম্বী	২৮.৩
লেনিন-মতাবলম্বী	২৮.২
বণিকসঙ্ঘ-আন্দোলন	২৭.০
ধর্ম্মবিরোধী (Anti-religious) আন্দোলন	২৩.২
দাবাখেলা	৭.২

প্রত্যেক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে প্রাচীর-সংবাদপত্র (Wall Newspaper) আছে অর্থাৎ প্রতিদিনের বিশেষ সংবাদগুলি গৃহের দেওয়ালে এরূপভাবে সন্নিবেশিত যে কার্য্যরত শ্রমিকেরা কার্য্যের ভিতরেও তাহা দেখিয়া যাইতে পারে। রাশিয়ায় বিশেষ পারিবারিক সম্মিলনী আছে। সে সম্মিলনীতে পুরুষেরা আপনাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের লইয়া আসেন এবং সেখানে নানাবিষয়ের আলোচনা হয় এবং পৃথক একটি গৃহে নারীরা শিক্ষিত নার্সের সাহায্যে শিশু-পরিচর্য্যাসম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করেন।

শ্রমিক-সম্মিলনীর সাহায্যে আজকাল কলকারখানা কেবলমাত্র কার্য্যের স্থান বলিয়া গণ্য হয় না—সেখানে এখন সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানই স্থাপিত হইয়াছে। যেমন—খেলার-ঘর, চিকিৎসালয়, থিয়েটার, লাইব্রেরী ইত্যাদি।

মানুষ জীবনে যাহাতে কার্য্যের ভিতরেও পরিপূর্ণ আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে তাহার সমস্ত ব্যবস্থা আমরা সোভিয়েট রাশিয়ায় দেখিতে পাই।

কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সুখসুবিধার জন্য অনেক সুব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন শ্রমিকের সামান্য একটু অসুখ করিলে তাহাকে স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠান হয় এবং সেখানে উপযুক্ত পথ্য ও শুশ্রূষার দ্বারা সুস্থ ও কর্ম্মী হইয়া উঠে।

মহাসমরের ফলে রাশিয়ায় একদল নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সবল, নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা। আজ আর সোভিয়েট নারী পুরুষের পদানত ও অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে—তাহারা আজ আত্মসম্মানে ভূষিত এবং জ্ঞান ও শক্তি আহরণে উদ্‌গ্রীব ও সচেষ্ট। তাহারা বুঝিয়াছে, নারীর স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা ও তাহাদের উন্নতি তাহাদেরই করিতে হইবে। যদিও এরূপ নারী সংখ্যান্যূন কিন্তু ইহারাই বর্ত্তিকাস্বরূপ রুশের নারী-সমাজকে পথ দেখাইয়া উন্নতি সোপানে আরূঢ় করিবে।
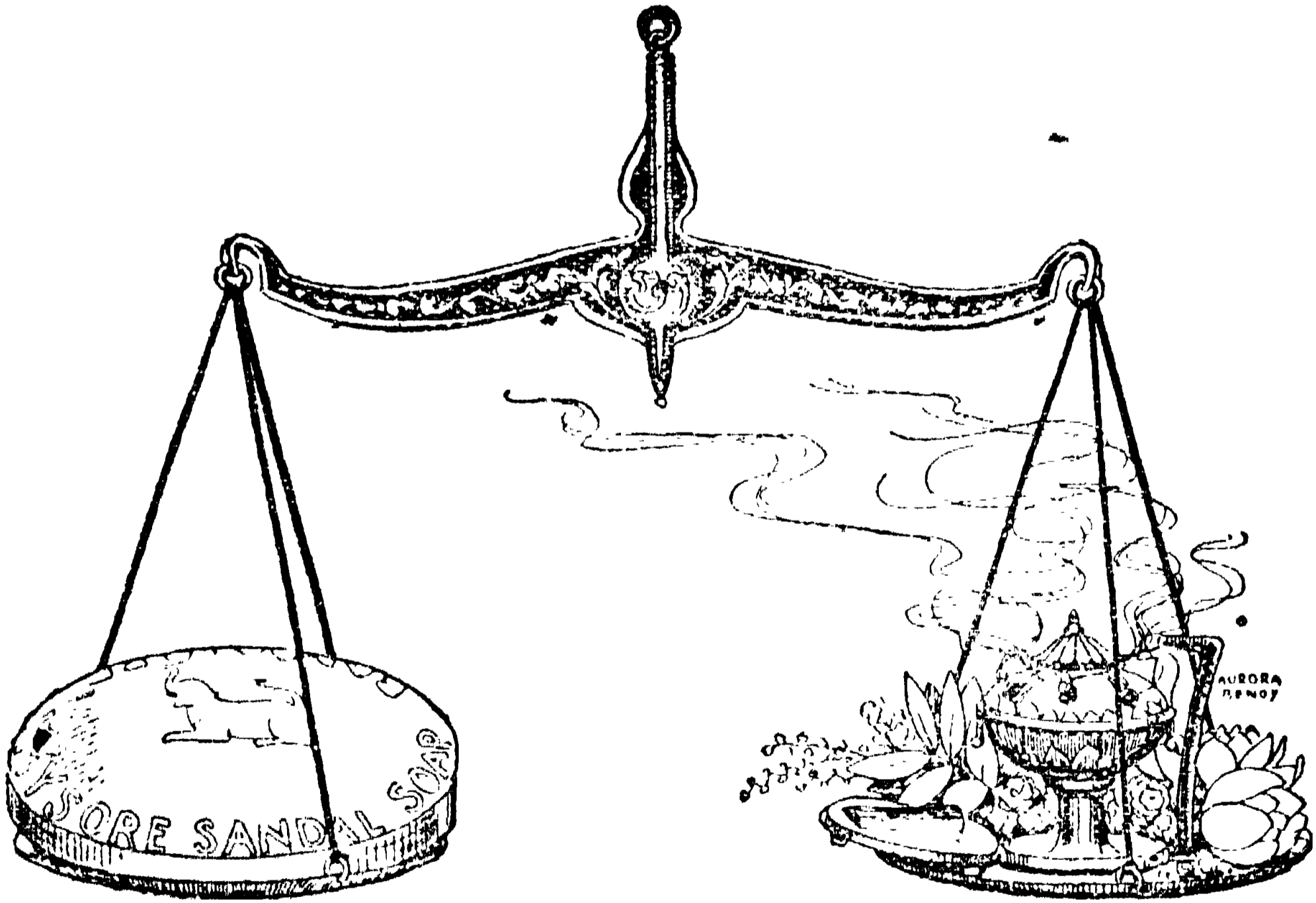
সোণার-কাঠি রূপার-কাঠি।

শ্রীমতী——দেবী

অজিত

যথারীতি সব শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়ে যেতে লাগ্‌ল।

যে বাড়ীর যে আবহাওয়ার মধ্যে অজিত প্রতিপালিত তাতে যে চিরকালকার মেনে নেওয়ার স্বভাব ছিল, সেটাই ছিল তার স্বভাবে প্রবল; আর যে শিক্ষায়, যে আধুনিকতায়, পড়ায়, তর্কে তৈরী আবেষ্টন সে তার চার পাশে রচনা করে—কল্পনা, আর ভাবলোকে, মায়ালোকে বিচরণ কর্‌ত; যা'তাকে নানা বিষয়ে নানা মত দিতে শিখিয়েছিল; সেটা ছিল তার নিতান্তই বাইরের জিনিষ—চিনিমাখানো ঔষুধের বড়ির মত—যেমন ঘা পড়া ভেঙ্গে চুর হয়ে—সেই বাধ্যতাবাধ্য—বালক অজিত বেরিয়ে এল। তার তর্কের মুখের কথা, আলোচনা তার মেলামেশা, কারুর যে ক্ষতি করে এলো, সেটা দেখ্‌তেও তার ভরসা হ'ল না। চিন্তাশীলতাহীন, মেরুদণ্ডহীন সাধারণ বাঙ্গালীর ছেলের মতই প্রেম, বিবাহ,—বিবাহপ্রথা, নারী, নারীর হৃদয় নিয়ে সে অত্যন্ত অগভীরভাবে ভেবেছিল, অলোচনা করেছিল। সেই আলোচনা যে অল্পবয়সের মনোধর্ম্মের মুগ্ধতার মোহে কারুকে তার প্রতি আকৃষ্ট কর্‌তে পারে, সে তার ভাব্‌তে ভালই লেগেছিল। তাতে সাহায্য করেছিলেন বাড়ীর সবাই।—বিশেষ ক'রে সুপ্রিয়াকে তার মাঝে এনে যেন ছোট-বেলায় খেলা-ঘরের পুতুলের বিয়ের গম্ভীর অনুষ্ঠান করা হ'ল। তাতে খেলার ভাবও ছিল আবার সত্য স্বপ্ন দেখার সুযোগও ছিল। গুরুতরভাবেও যেমনি, আবার সত্য-মনে করারও বাধা ছিল না এম্‌নিভাব।

কাজেই তার বইপড়া তর্কপরায়ণতা, আলোচনা যেমন খসে পড়্‌ল সাম্‌নে নতুনতর রোমান্সে দেখে,—সে মেয়েদের মতই নতুন আবেষ্টনে বেশ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলে। আর তার সাধারণ বন্ধুরা সাধারণ বিয়ের 'বাজার' ও বাজার দর হিসাবে তার যে কতখানি বস্তুগত লাভ হয়েছে তারই হিসেব কর্‌ত।

প্রতিভার বাপের দেওয়া কাঠকাঠ্‌রা জিনিষ, ঘরে সাজাবার টেবিল, চেয়ার, আলমারী, পালঙ্ক—গহনা যেমন, সস্তা বিলীতি গাল্‌চে সুজ্‌নী, তার দাম তার সৌখীনতা; সচরাচর যেমন লোক আলোচনা করে—খতিয়ে দেখে তাই বল্‌ত।

অর্থাৎ সেই ঠকা হয় নি। যেন পাওয়া আর না পাওয়াটাই বিয়ের ব্যাপারে চরম এবং হিসাব নিকাশ করে দেখ্‌লে জিনিষের দাম এবং দর তারই—তত্ত্ব এবং তথ্য যেন বিবাহের প্রধান বিষয়।

থাক্‌তে না পেরে নিশীথ শুধু একদিন বল্‌ছিল, 'যখন শ্বশুরের দেওয়া ঘড়ি আংটী শাল না'হলে তোমরা পর্‌তে পাওনা, আর তত্ত্বর থালা না হলে বাড়ীর লোকে খুসী হয় না, তখন ঠকা তো হয় নি নিশ্চয়! সব বিষয়ে যখন তোমরা লাভক্ষতির কথা ভাব; লেখাপড়ার লাভ কি—বই-পড়ার লাভ কি—বড়লোকের ছেলের শিক্ষায়—মেয়েদের শিক্ষায় লাভ কি, তখন এতো বড় একটা বিষয়—তাতে লাভ লোকসান না দেখে করা তো উচিতই নয়! ঠক্‌বে কেন? ঠিকই তো!'

অজিতের বন্ধুরা চুপ করে গেল।

অজিত তিক্ত বেদনায় নিশীথের কথা অনুভব কর্‌লে।

মনে মনে নিজের ক্ষতি হয়নি ভাব্‌লেও আর কার যে ক্ষতি হয়েছে, সুপ্রিয়াকে যে অসম্মান করা হয়েছে, সে কথা অন্তরের কোন এক জায়গায় কাঁটার মত বিধ্‌তে থাকে।

মনের দিকে কিন্তু সত্যই কি ক্ষতি কোনোই হয় নি? নিতান্তই কি দেনা পাওনার লাভ-ক্ষতির ব্যাপার এটা? অজিত ভাবে এক একবার। অবশেষে ক্ষতিপূরণ করে দেবার ব্যাকুল চেষ্টায় পিতামহীর আর প্রস্তাবের মত করেই সুপ্রিয়ার সঙ্গে বিয়ের কথা নিশীথকে বল্লে।

নিশীথ অবাক্‌ হয়ে গেল, তারপর বল্লে, এখন কি? তোমার মতে বিয়ে কথাটা বিয়ের নিমন্ত্রন্ন খাওয়ার সামিলই মনে হয়? খুব সহজ এবং সোজা ব্যাপার? তা'হলে তোমার মত্‌ বদলেছে!

অজিত অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্লে, 'না, তা নয়—ভেতরে বল্‌ছিলেন তোমার সঙ্গে হ'তে পারে তাই' বাধা দিয়ে নিশীথ বল্লে, 'তুমি বিয়ে কর্‌তে পার্‌লে না তার মানে বুঝি, তোমার বাড়ীর লোকদের মত নেই। কিন্তু তোমার সঙ্গে না হলেই যে, আমার সঙ্গে হতে পার্‌বে তার কি মানে আছে? আর আমি বিয়ে কর্‌ব বল্লেই তাঁরা রাজী হবেন কেন? শাস্ত্রে বিকল্পে মধুর বদলে গুড়, অন্নের বদলে চিঁড়ে,—দুধের বদলে জল চলে হয় তো। কিন্তু অজিতের বদলে নিশীথ—বন্ধুর বাগদত্তার আর এক বন্ধুকে বিয়ে করা চলে নাকি? অত পরোপকার আর করিস্‌ নি। তোদের এখন তার দিক একেবারে না ভাবাই তার পক্ষে বেশী মর্য্যাদার!'

নিশীথ আর বস্‌ল না, আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

প্রবাসিনী

আলো প্রচুর ছিল যেমন আগে থাক্‌ত, আজমীর মারোয়াড়ার প্রান্তরে তার শীত-গ্রীষ্মের সুতীক্ষ্ণ হিম, তীব্রদাহ; স্বল্প ঘন বনে পাতা ফুল গাছও তেমনি চুপ্‌চাপ্‌ পৃথিবীর দিন যাপনা দেখ্‌ত।

সুপ্রিয়ার একে একে বি, এ পরীক্ষাও হয়ে গেল। ওদের এদিকে আসা আর হয়নি।

মা কেবলি ভাব্‌তেন কত কি। আর গম্ভীর স্বল্পভাষিণী সুপ্রিয়ার মনের কথাও বুঝ্‌তে পারতেন না।

মণিকার খোকাখুকী, সুপ্রিয়ার পড়াশোনা, বিভাসবাবুর মার ছেলের বিয়ের ভাবনা এই সব কথা কাহিনীতে সুপ্রিয়ার মার দিন তবু কেটে যায়।

এমন সময়ে সুপ্রিয়ার দিদির মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ এলো। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি এলো, 'মেয়ে যে কত বড় হয়ে উঠল্ মা কি সেকথা ভুলে গেছেন? এমন ক'রে মেয়ে রাখ্‌লে লোকে যে অনেক নিন্দে করবে। পাত্রের কি অভাব আছে নাকি বাংলাদেশে? তোমরা একবার এসো এবারে দিদি চেষ্টা কর্‌বেন; 'টাকা ছড়ালে' কি না হয়? সুপাত্র পাওয়া যায় কি না' ইত্যাদি।

সুপ্রিয়া মৃদুহাস্যে বল্লে,—'দিদি যে আহ্বান দিয়েছেন আমার কলকাতায় যেতে ভয় কর্‌ছে।'

ভাজ বল্লে, 'ভালইতো।'

মা বল্লেন, 'হ্যাঁ'—সত্যিইতো!

সুপ্রিয়া একটু হেসে মার কাছ ঘেঁসে বসে বল্লে.—'কেন মা, আমাকে তোমরা না হয় মনে করনা কেন বিধবা মেয়ে?

'ষাট্ বালাই! তোদের সব কি মুখ!'

'তা'হলে কুমারী মেয়ে করে রাখ',—তার পরেই ছোট ভাইপোকে এমন কাঁদিয়ে ক্ষেপিয়ে এমন ব্যস্ত করে তুল্লে যে তাকে সে না থামালে আর কেউ থামাতে পার্‌লে না। গম্ভীর আলোচনায় বাধাপড়ায় মা খুব রাগ করে বল্লেন, 'তুই যেন দিন দিন খুকি হচ্ছিস্ খুকী'।

খুকী সহজ-হাস্যে সাম্‌নে থেকে চলে গেল। পাহাড়ের গায়ের ছোট ছোট সাদা সাদা বাড়ীগুলো বাকা আর শ্যাওলা পড়া নীল পাহাড়কে নীল জল বলে ভাইপো ভাইঝিকে দেখাতে।

মণিকা বল্লে, শাশুরীকে, 'মা ওর অস্বস্তি হয় তাই চলে গেল।'

নিজেদের জন্য না হোক, সুপ্রিয়ার জন্য না হোক, দিদির মেয়ের বিবাহে সকলকেই আস্‌তে হ'ল। জীর্ণ-পুরানো বাড়ীখানি আরও পুরাতন হয়ে গেছে—আবেষ্টনও নতুন মনে হচ্ছে। রমাও বাড়ীতে ছিল; ছাতে উঠিতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অপ্রস্তুত মুখে প্রচুর আনন্দের হাসি নিয়ে রমা এসে কুশল জিজ্ঞাসা কর্‌লে সখিকে।

শ্রাবণের শ্যাওলা ভরা ছাতে সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে বেড়িয়ে দুটী পুরোণোবন্ধু কত কথা গল্প কর্‌লে—ঠিক নেই তার। রমার বুঝি দুটী ছেলে।

সুপ্রিয়া সখিকে সব কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—রমা কিন্তু সখিকে তার নিজের কথা একটীও জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারলে না।

একবার শুধু বল্লে, আরও পড়্বি ?

সুপ্রিয়া বল্লে, 'ভাব্ছি তো।'

তবু পুরানো দিনের মধুর স্মৃতিতে, স্কুলের গল্পে নিতান্ত শৈশবের গল্পে সন্ধ্যা শেষ হয়ে এলো।

রাত্রি হয়ে গেলো।—সুপ্রিয়া নেমে এসে জানালার ধারে শুয়ে পড়্ল। পুরানো শোবার ঘরখানি। মা আর বৌকে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে কাজে ডেকেছে তারা গেছেন। ভাইয়ের খোকা আর খুকী তার পাশে ঘুমচ্ছিল। সে ক্লান্ত ব'লে যায় নি।

প্রতিভা

প্রেম জিনিষটা যে আসলে কি—মানুষের মনের সঙ্গে এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে এর কতখানি সম্বন্ধ, আর দাম্পত্য জীবনের ধরাবাঁধার মধ্যেই বা সেটা কতটা স্ফূর্ত্তি পায় বা চাপা পড়ে; পূর্ব্বরাগ অনুরাগ অথবা সেবা-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই বা সেটা কেমনতর ভাবে বেঁচে থাকে; সে সবই আসলে হ'ল তর্কের কথা, অন্ততঃ অজিতের কাছে বিষয়টা তাই ছিল বোধ হয়—সুতরাং আর কথা ওঠে না। রাম শ্যাম সকলের মতই রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রথমে 'যার অদৃষ্টে যেমন জুটুক তোমরা সবাই ভালো হয়ে' ৺সুকুমার রায়ের 'কিন্তু সবার চাইতে ভালো পাঁউরুটী আর ঝোলা গুড়ই বোধ হয় শেষটা দাঁড়াল'।

এখন অজিতের কাব্য, অজিতের প্রেমতত্ত্ব, অজিতের কল্পনা, ভাবনা, আরও নিজস্ব করে যে আধার পেয়েছে, তাতে জলের ওপর ছায়ার মত তারই মতামত, তারই কথা আলাপ তারই ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ প্রতিভা সাধারণ বৈশিষ্ঠ্যহীন মেয়েদের মতই অজিতের কথাই সাজিয়ে গুছিয়ে বল্বার চেষ্টা করে। আর সকলেই এবং অজিতও বাঙ্গালী স্বামীর মতই তার বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করে। যদিও খানিকক্ষণ পরেই সে কথায় আর রস থাকেনা, কেননা তখন সেটা প্রতিভার কথা হয়ে যায়।

কিন্তু আসলে প্রতিভার বুদ্ধিবিদ্যার দরকার কার জন্য ? কাহারই তো নয়! ও যেটুকু লেখাপড়া জানে, তা'না জান্লেও বা কি ক্ষতি আর জানাতেই বা কি লাভ ? এই যে মতবাদ, এই বিপুল সৃষ্টিভরা জনমত, এর বিরুদ্ধে কার কি বলবার আছে যে, অজিত বল্বে ? আর কিবা বল্বে ? এবং বলবেই কি করে ? যারা চিরদিন সন্তানের মা হবে, সন্তানকে ভালমন্দ যেভাবে হোক্ মানুষ করবে, মেয়েলী ধরণে ছোট হীনকথা কইবে আশেপাশের লোকদের ওপর, এবং সেজন্য যত পুরুষআত্মীয়রা স্বামী-পুত্র-ভাই-স্বজনরা তাদের অবজ্ঞা করবে, তাচ্ছিল্য কর্বে, তা সত্ত্বেও তারা কিছুদিন বেঁচে থেকে তারপর যথাকালে বিধবা হবে কিম্বা সন্তান হতে গিয়ে মরে যাবে, নিজেদের প্রাকৃতিক কর্ম্ম শেষ করে, এই যাদের গন্তব্য আর লক্ষ্য তারা লেখাপড়া শিখেই বা কি কর্বে ? এবং না শিখিলেই বা কি ক্ষতি হবে ?

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

পৃথিবীব্যাপী এই বিপুল জনমতকে অজিতও অজানাতেই সকলের মতই আস্তে আস্তে মেনে নিচ্ছিল। আর তেমনি সাধারণ সবার মতই সব মেয়েদের মতই প্রতিভারও তাতে ক্ষোভ বা দুঃখ ছিল না, অসম্মানের বেদনাও ছিল না! অর্থাৎ প্রতিভা ধনীর দুলালীর মতই পাশ করেছিল পিতার খেয়ালে। যার আভ্যন্তরিক অর্থ হয় সৎপাত্রে বিবাহ, বাইরের অর্থ হয় সভ্যসমাজে অন্তর্ভুক্তিতা, শিক্ষাও নয় জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার উৎকর্ষতাও নয়।

সুতরাং তেমনি ভাবেই প্রতিভা প্রথামত নিয়মমত অভ্যাসমত সকালবেলা থেকে সন্ধ্যা অবধি ধনীগৃহের বধূদের মত সৌখীন কাজ করে, সৌখীন সেলাই করে, এবং নিতান্ত রস-চর্চ্চাযুক্ত গল্প গুজব করে, সমবয়সীদের সঙ্গে। তারপর রাত্রে যথারীতি শোবার ঘরে গিয়ে পান খায়, পান রাখে, স্বামীর জন্য; খোকার ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে জানালা দরজা বন্ধ করে; এম্‌নি এটা সেটা করে—হয়ত বা গল্পারম্ভ করে কারুর। নতুবা মাসিকপত্র এলে হয়ত গল্পও পড়ে। আর তখন কোনদিন হয়ত কোন বই পড়্‌তে পড়্‌তে অজিতের মনে হয়, কাকে যেন শোনাবে সেটা। আর ওকে শোনায় কেননা প্রতিভা পাশ করেছিলো।

তা প্রতিভা শোনে—যেমন করে স্বামীর জন্য অতি যত্নে পান সাজে, এবং পানের ভালো সাজার গর্ব্বও মনে রাখে; যেমন করে স্বামীর বালিশের ওয়াড়ে সেলাই করে ফুল তোলে, ঠিক তেমনি ভাবে শোনে। রস-বোধ দিয়ে নয় মনোযোগ দিয়ে। স্বামী বিদ্বান এবং রসিক বলে খ্যাতি আছে, আর ওকে তিনি শুন্‌তে ডেকেছেন, বলেছেন, এইভাবে নিবিষ্ট হয়ে শোনে। তার একটা লাইনও সে হেসে বা হাল্‌কা কথা হলেও হাল্‌কাভাবে উপভোগ করে না। এবং মাঝে মাঝে সেটা মনে রাখারও চেষ্টা করে। কোনো সময় হয়ত গর্ব্বিতভাবে সঙ্গিনীদের কাছে বলে যেতে পার্‌বে।

আর অজিত শোনায় বটে, আনন্দ পায় না

কিন্তু স্বামিত্বের, অধিকারিত্বের মোহ তো আছে, সে মোহ তো আর অধিকারবাদে কম জিনিষ নয়! প্রতিভা তার জিনিষ, একান্ত তারই, বুদ্ধি আছেই অবশ্য, কেনইবা না বুঝ্‌বে!

কিন্তু অজিত সেদিন আর পড়ে না হয়তো পড়তে ভাল লাগে না। সম্ভবতঃ তার অজ্ঞাত চেতনায় মনে হয় বা ভয় হয়, প্রতিভা যদি রূপকথার জোলার ছেলের মত বলে, 'আর একটা বলো।'

সেদিন শ্রাবণের রাত্রি। অহেতুকী বর্ষণ মানুষের মনকে অনর্থক উতলা করিয়া তোলে। পুরাতন রসমাধুর্য্যের উপলব্ধির চেতনা জাগাতে তারা অনেকখানি। অজিতের হাতের কাছে ছিল একটা কবেকার মানসী ও মর্ম্মবাণী। পাতা উল্‌টাতেই সে পড়্‌ল একটী কবিতা-রবীন্দ্রনাথের।

প্রথম ক'লাইনের পর অজিত মুগ্ধ হয়ে বল্লে, শোনো শোনো, কি সুন্দর—

—সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,

প্রতিভা একটু হেসে বল্লে, কবে ?

অজিত পত্নীর আকস্মিক সরস মন্তব্যে আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হল, জিজ্ঞাসা কর্‌লে, পড়েছ ? এবার প্রতিভা বল্লে, না। কিন্তু জানো, ও বাড়ীতে সব ওরা এসেছে—সুপ্রিয়ারা গো, তোমাদের ও'নাকি খুব কবিতা বোঝে ? আচম্‌কা অপ্রত্যাশিত খবরে এবং প্রশ্নে অজিত একটু থম্‌কে গেল। প্রশ্নকে এড়িয়ে সে প্রশ্ন কর্‌লে, কে বল্লে তোমায় ? "ওই ঠাকুঝির সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলে ছাতে। তেমন ফর্‌সা ত নয়, আর কি লম্বা যেন—।" প্রতিভা খোকার বিছানা ঠিক কর্‌তে লাগল।

অজিত চুপ করে রইল। মনে পড়ল,—না, সুপ্রিয়া ফর্‌সা নয় তত, রোগাও, লম্বাও।

প্রতিভা সন্তুষ্ট হয়েছিল। সে আবার বল্লে, বিয়েও হয়নি।—আর পুরোনো ঝিটা বল্লে কি জানো, বল্লে, আহা দিদিমণির কবে বা বিয়ে হল, কবে বা কি হল!—তার মা নাকি শুনে খুব ষাট্‌ ষাট্‌ করেছেন।'—প্রতিভা নিজের অবজ্ঞাতেই একটু হাস্‌লে। হাসি ওর স্বভাব, ওকে নাকি হাস্‌লে বেশ ভালো দেখায় কে বলেছিল।

অজিত নীরবে পাতা উল্টাতে থাকে। প্রতিভা আপনমনে দু একটা কথা কয়। ছেলেকে আদর করে। অজিত চুপকরে বই হাতে শুয়ে শুয়ে ভাবে। প্রতিভা পাশের বিছানায় ঘুমে।

হাঁ সে সুপ্রিয়ার চেয়ে ফর্সা, সে দেখ্‌তে ভালো, সে ধনী পিতার আদরিণী মেয়েও ; অজিত অন্যমনে তার চিন্তাশীলতাহীন, ভাবহীন, বুদ্ধির দীপ্তিশূন্য, স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিশুর মত গোলগাল মুখের দিকে চায়! হাঁ, শিশুর মতই সময় কাটাবার জিনিষ। প্রায় ভুলে যাওয়া আর একটা মুখ মনে পড়ে পাশাপাশি। তীব্র আগ্রহে মনে হয় সুপ্রিয়া কি তেম্‌নি আছে।—ওকি সত্যই সুপ্রিয়ার ক্ষতি করেছে!

সঙ্গে সঙ্গে কি এক কষ্টে বেদনায় যেন মনে হয়, শুধু কি সুপ্রিয়ারই ক্ষতি করেছে, তার ঘুম আসে না। কোমল পল্লব-ঘন দুটি নয়নের মধুর সরল দীপ্তি মনে পড়ে। আর সাবিত্রীপাহাড়ের কথা। সুপ্রিয়াকে দেখ্‌বার কুতুহল হয়।

কিন্তু ওর আর সুপ্রিয়ার দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌বার সাহস নেই। ঘুরে ফিরে যেন মনে জাগে, কবেকার কোন্‌ কয়েকটা দিনের কথা। কয়েকটা দিন মাত্র, কিন্তু তার গাঁথুনী কি জমাট নিরেট মনে আছে আজ!

আবার সুপ্ত প্রতিভার দিকে দৃষ্টি পড়ে। হাঁ প্রতিভাকে সুন্দরী বল্‌তে হল ; কিন্তু বাইরের অন্ধকার পৃথিবীভরে বৃষ্টি প'ড়তে থাকে।

শ্রাবণের বর্ষণ, মনের প্রলাপ, ভাবনা, পুরোনো স্বপ্ন মিলিয়ে কেবলই মনে আসে,

"সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো।"

বোঝা যায় না, সেদিনের প্রলাপমুগ্ধ মন সত্য না আজকের সংসারযাত্রা-তৃপ্ত হৃষ্ট অজিত, অথচ এই ব্যাকুল অজিত সত্য ?

আলো নিবিয়ে অজিত শুয়ে পড়্‌ল। অৰ্দ্ধেক ঘুমে জাগায় ভোর হয়ে গেলো!

স্তিমিত আলো, ভোরে ঘুম ভাঙ্‌তে উঠেই চোখ পড়্‌ল পাশের বাড়ীর জানালায় বসে একটী মেয়ে। নীচু মুখে পথের দিকে চেয়ে আছে। আধখানি মুখ, স্নিগ্ধ ঈষৎ পাণ্ডুর উজ্জ্বল শ্যাম রংটী, পরিষ্কার কপালখানির আধখানা তার উপর রাত্রের এলোমেলো চুল দু' একটা পড়েছে, নত চোখের পাতা গালের ওপর ঘনছায়া রচনা করেছে।

সে সুপ্রিয়া—

অজিত ব্যাকুল হয়ে সরে গেলো, সে দেখ্‌তে পায় নি।

কৰ্ম্মময় সকাল, কলিকাতার একঘেয়ে বিশ্রী সেই সকাল, সেই খবরের কাগজওয়ালার বিচিত্র উচ্চারণ, চন্দ্রপুলিওয়ালার, খাবারওয়ালার একসুরে ডেকে চলে যাওয়া, ছোট ছেলেদের মিষ্টি মধুর কোলাহল সকল বাড়ীর বারান্দায় রকে, কলের জলের নিরবচ্ছিন্ন শব্দ, রকের ওপর সংবাদপত্রের পাঠক-সভা, সব অতিক্রম করে অজিতের থেকে থেকে সুপ্রিয়াকে মনে হতে লাগ্‌ল। ও যেন তপস্বিনী উমা, ললিত দীর্ঘাঙ্গী, কৃশ তনু-দেহখানি যেন একটী প্রদীপের দীর্ঘ শিখা। ও যেন সাধারণ নারী নয়। নিতান্তই খেলা করার মত, অবজ্ঞা করার মত, অবহেলা করার মত নারী নয়। ওকে অপ্রাপ্য প্রিয়া দয়িতা মনে করে ধ্যান করা যায়, কিন্তু ওর তপস্যা ভঙ্গ করা যায় না। ও যেন নিজেও পূজারিণী, আবার পূজা করতেও হয়।

সুন্দরী, হৃষ্টপুষ্ট দেহ, লঘু-হাস্যমুখী প্রতিভাকে নিয়ে ঘর করা চলে, কিন্তু সুপ্রিয়া ?

না, সুপ্রিয়া—যেন আরতির মন্ত্রের ছন্দ। সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে গোধূলি আরতির জন্য জ্বালা কর্পূরের শিখার আলো। ও যেন ধ্যানের জন্যই।

অভিভূত মোহ-বেদনায় অজিত ধ্যান করে।

দিদি

নিজের কন্যাদায় মুক্তির পর নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলে সুপ্রিয়ার দিদি সন্ধ্যা বেলা মার সঙ্গে পরামর্শ কর্‌ছিলেন।

দিদি বল্লেন, "এ মাসে আরও চারটে বিয়ের দিন আছে। এই একুশে, পঁচিশে, তারপর আটাশে আর বত্রিশে। এর মধ্যে মা, আমি খুকীর বিয়ের সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

মা আশ্বস্ত হচ্ছিলেন এবং সুপ্রিয়া হাস্‌ছিল।

দিদি বল্লেন, "আমার ননদের একটী ভাসুরপো আছে এইবারে এম, এ পাশ করেছে একবার তার খোঁজ নিয়ে দেখি তারা পছন্দ কর্‌বে মেয়ে, খুকী এখনো বেশ ছোট আছে।"

সুপ্রিয়া মৃদু হাস্যে বল্লে, "দিদি, আমি যে আস্‌ছে বছর এম, এ, দেব। আমি যদি তাকে পছন্দ না করি ?"

তারক হাস্‌ছিলেন! ছোট বোনটীর অমনি খেয়ালখুসীমত কথাশোনা তাঁর অভ্যাস ছিল। সবগুলো সত্য হোক্ আর না হোক্।

দিদি চোখ কপালে তুলে বল্লেন, "শোনকথা! তুই পছন্দ কর্‌বি কিরে ?"

"হ্যাঁ দিদি, এবার আমি তাদের জিজ্ঞেস কর্‌ব। কত মাইনে পায়; কেমন স্বভাব সব!"—

মা বল্লেন, "খুকী, থাম্ দিকি বাছা!"

সুপ্রিয়া মৃদুহাস্যে উঠে গেল।

দিদি বাংলাদেশের নানাবিধ সুপাত্রের যথোচিত গুণ ব্যাখ্যা কর্‌তে লাগলেন। ভালো ছেলের অভাব তো নেই-ই, উপরন্তু তারা 'পণ' কম নিয়ে বিয়ে করতে পারে। যদি দিদি আর 'ইনি' অর্থাৎ দিদির স্বামী চেন্টা করেন।

সুপ্রিয়া ঘরে যেতে মণিকা এদিক ওদিক অনেক কথার পর জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ঠাকুঝি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব ?"

"বল না, কি এমন কথা, যে অনুমতি চাচ্ছ ?" সুপ্রিয়া হাস্‌লে।

"তোর কি সত্যই অজিতবাবুকে ভালো লেগেছিল ?' অনেক ইতঃস্তুতকরে ভাষাটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে মণিকা প্রশ্ন কর্‌লে!

সুপ্রিয়া চুপকরে রইল একটু। মণিকা একটু অপ্রতিভ হয়ে বল্লে, "তুইকি—

এবার সুপ্রিয়া চমকে উঠল, একটু অপ্রস্তুতভাবে হেসে বল্লে, "না, না, আমার কোনো অমনতর অদ্ভুত জিনিষ মনে নেই। তবে অজিতবাবুকে ভালো লাগা ? হয়ত ছোট ছিলাম, তোমরা দেখিয়ে ছিলেও, তাই একটু ওসবধরণের স্বপন দেখেছিলাম। সে তো আমার মনেও নেই। কিন্তু এখন ? নাঃ আমার কিছু ভাব্‌বার নেই।'

মণিকা বল্লে,—'তবে তুই বিয়ে কর, এবার আর কতদিন এমনি করে থাক্‌বি।'

'কেন বৌদি কি মন্দ আছি ? বিয়ে কর্‌লেই বা আমার কি চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে।'

মণিকা—"কর্‌তে তো হবে একদিন।"

"তা হয়ত হবে, কিন্তু এখনি কি তার তাড়া! আমি এম, এ দিয়ে নি।"

মণিকা হাসলে, 'পাশ কর্‌লেই বা তোর কি চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে ? আমরা তোর জন্যে নিশীথ বাবুদের সঙ্গে কথা কই ?"

সুপ্রিয়ার কান লাল হয়ে উঠ্‌ল, একটু থেমে তারপরে বল্লে, "অর্থাৎ নাকের বদলে নরুণ তোমাদের চাই ই। যেন তেন প্রকারেণ তোমরা রাজপুত্র কোটালপুত্র করে সকলেরই বিয়ে একটা একটা দিয়ে নটে গাছটি সুখে স্বচ্ছন্দে মুড়োতে চাও-ই।"

মণিকা অপ্রস্তুত হয়ে গেল কিন্তু তার কথায় হেসে বল্লে, "তা নটে গাছ মুড়োতে হবে বৈকি ! আর কোটালপুত্র হবে না, ভালই হবে ক'রে দেখ। ওকে তুই তো দেখেছিস্।"

সুপ্রিয়াও হাসলে, 'হ্যাঁ, আমি তো ক'রে দেখি। আর ফির্বে নাতো, তখন ! হ্যাঁ, আমি অজিতবাবু নিশীথবাবুকে দেখেছি এবং আরও অনেক বিয়ের বর আর সৎপাত্রের কথা শুনেছি। তারা ভালো এবং ভালো ছেলেও, আর অনেক ভালো ভালো মেয়েও তাদের জন্য আছে। তারা বিয়ে থাওয়া করে সংসারের নটেগাছ স্বচ্ছন্দে মুড়িয়ে দিতে থাকুক, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে তারা সুখে স্বচ্ছন্দে রাখ্তে পারবে না। সে রিস্কে আমারো কাজ নেই।"

"তাহলে তোর মতটা কি ?"—মণিকা জিজ্ঞাসা করলে।

"মত আমার বিশেষ কিছুই নেই। তবে আমাকে আর তোমরা সাজিয়ে গুছিয়ে কনে দেখিয়ে কিম্বা বড়লোক গহনা গাটীর লোভ দেখিয়ে বাংলাদেশভরা এই রকম সৎপাত্র দেখিয়ে বিয়ে দিতে পার্বে না। আমি যদিই কোনোদিন বিয়ে করি ও রকমের সৎপাত্রকে কর্ব না, পুরুষমানুষকে কর্ব !"

মণিকা হাস্লে, "মানে ? ওরা কি সব মেয়ে মানুষ ?"

ঈষৎ গম্ভীর দুঃখিত হাস্যে সুপ্রিয়া বল্লে, "না, তারো চেয়ে বেশী, ওরা ছেলেমানুষ। ওরা এখন স্বপ্ন দেখুক, আমি ওদের ভাবনা ভাব্তে পার্ব না। থাক্ বৌদি—আর কথা আছে ?"

মণিকা দুঃখিত হাস্যে বল্লে "না"।

ক্রমশঃ

গল্প-প্রতিযোগিতা

ছোট গল্পের জন্য এবার আমরা একটি পুরস্কার দিব। যে লেখিকার লেখা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাকেই পুরস্কার দেওয়া যাইবে। গল্প ১০ই চৈত্র মধ্যে আমাদের আফিসে পৌঁছান চাই। পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিতার জন্য যে গল্প দিবেন "প্রতিযোগিতার জন্য" লিখিয়া দিবেন। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত গল্প প্রকাশের অধিকার পত্রিকার থাকিবে।

মনস্বিনী সরোজিনী নাইডু

শ্রীলতিকা দেবী

ভারতনারীর জীবনাদর্শের দীপ্ত-শিখা হাতে লইয়া যে কল্যাণীর আবির্ভাব হইল, তিনিই আমাদের জনপ্রিয়া সরোজিনী দেবী। ভারতের বহুদিনের নির্ব্বাপিত দীপ-স্বরূপ নারী-জীবনগুলির মাঝে এই একটি মাত্র দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল ভারতের গৃহগুলি। নারীর সুপ্ত-জীবনে চেতনা দিলেন দেশবরেণ্যা দেবী, নারী-জীবন পাইল বাঁচিবার মানুষের অধিকার লাভের পন্থা—তাঁহারই আগমনীতে মূক ভারত-নারীর ক্লিষ্ট জীবনগুলি যেন পাইল তাঁহাদের সঞ্চিত বেদনার করুণ কাহিনী প্রকাশের ভাষা! এ কল্যাণীর আবির্ভাবে ধন্য হইল দেশ—ধন্য হইল শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনাপূর্ণ ভারতের গৃহ।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী কেবল মাত্র গৃহলক্ষ্মীর আসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি প্রবেশাধিকার করিয়া লইয়াছেন—জ্ঞান-মন্দিরে, কবির কাব্য-কুঞ্জে, রাজনীতির বিরাট রঙ্গমঞ্চে। তাঁহার নারী-জীবনকে পঙ্গু করিয়া ক্ষুণ্ণ করিয়া নিঃশেষ হইতে দেন নাই—তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন সকলের সমক্ষে। শ্রীযুক্তা নাইডুর বহুমুখী প্রতিভাই তাঁহাকে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বোপরি এই দেশপ্রেমিকার আত্মত্যাগের নিদর্শনই দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছে—তাই দেশবাসী যোগ্যতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহাকে দেশ-নেত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। নেতৃত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তিনি নারী-জীবনকে সম্মানিত করিয়াছেন। গুণ-মুগ্ধ দেশবাসী, বিজয়-গীতি গাহিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে খ্যাত করিয়াছে। শুধু দেশবাসীর নিকটই তিনি পরিচিত নন, তাঁহার কাব্য-সাহিত্যের জন্য পাশ্চাত্য দেশেও ভারত-নারীর গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার ক্রমবিকাশের ধারার সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যানুরাগী পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে ও চেষ্টাতেই তিনি শিক্ষা লাভ করিয়া জীবনকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করিয়াছেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হায়দ্রাবাদের একজন শিক্ষাবিশারদ ছিলেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁ গ্রামেই তাঁহার পৈত্রিক নিবাস। ১৮৫১ সালে এই পৈত্রিক নিবাসেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এডিনবরায় বি-এস্-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার পর রসায়ন পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'হোপ' পুরস্কার লাভ

করিলেন। তিনি জার্ম্মানীর 'বন্' বিদ্যালয়েও কিছুকাল রসায়ন-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন। ১৮৭৭ সালে তিনি সম্মানের সহিত ডি-এস্-সি উপাধি লাভ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি-এস্-সি বলিয়া জানা যায়। তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হায়দ্রাবাদে নিজাম কলেজ এবং কলিকাতায় ও হায়দ্রাবাদে অনেকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জীবনের অধিকাংশই তিনি শিক্ষা-বিস্তারে ব্যয়িত করিয়াছেন।

অঘোরনাথ হায়দ্রাবাদ অবস্থানকালেই সরোজিনী দেবী ১৮৭৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অষ্টম সন্তানের মধ্যে সরোজিনীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। অঘোরবাবুর প্রত্যেকটি সন্তানই পিতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। পরাধীন জাতির স্বাধীনতার প্রচেষ্টা অপরাধ। সরোজিনীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ একুশ বছর বয়সে ১৯০১ সাল হইতে সেই অপরাধে নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতেছেন এবং সাম্যবাদীদলে যোগদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ নিজাম সরকারে সহকারী রাজস্ব-সচিব ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা রণেন্দ্রনাথ। চতুর্থ ভ্রাতা হারীন্দ্রনাথ বিখ্যাত গায়ক ও কবি। হারীন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীযুক্তা কমলা চট্টোপাধ্যায় দেশনেত্রীরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয়া ভগ্নী সুনলিনী দেবী। তৃতীয়া ভগ্নী মৃণালিনী দেবী কেম্ব্রিজের অধ্যাপনা সমাপ্ত করিয়া 'শ্যামা' পত্রিকার সম্পাদন করিতেছেন। চতুর্থ ভগ্নী সুবাসিনী দেবী বার্লিনে 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এণ্ড ট্রেড্ রিভিউ অফ্ এশিয়া' পত্রিকার সম্পাদিকা। তাঁহার ভগ্নীরাও সরোজিনীর ন্যায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সরোজিনীর বাল্য-প্রতিভাই তাঁহার পরবর্ত্তী বিকাশোন্মুখ জীবনের পরিচয় দেয়। অতি শৈশবকালেই মাত্র বার বৎসর বয়সে তিনি মান্দ্রাজ-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকালেই তিনি উর্দ্দু, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৯৫ সালে সরোজিনী দেবীর ইংরাজী ভাষায় রচিত একটি ক্ষুদ্র নাটিকা অঘোরনাথ নিজাম বাহাদুরকে উপহার দান করেন। বালিকার অসামান্য প্রতিভার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া নিজাম তাঁহাকে একটি পুরস্কার দিবার সঙ্কল্প করেন। তখন সরোজিনী দেবী বিদেশে যাইবার জন্য একটি বৃত্তি প্রার্থনা করিলেন নিজাম বার্ষিক ৩০০ শত পাউণ্ড বৃত্তি দিয়া তাঁহার বাল্য-প্রতিভাকে সম্মানিত করেন। এই সময়ে তিনি মাত্র ষোল বৎসরের বালিকা। অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ড গমন করিয়া ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত সরোজিনী দেবী সেখানে ছিলেন। তিনি প্রথমে কিংস্ কলেজে ও পরে গার্টানে অধ্যয়ন করেন। তিন বৎসর অধ্যাপনা শেষ করিয়া ১৮৯৮ সালে ইতালী ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে ডাক্তার মোতিয়ালা গোবিন্দ রাজুলুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। জীবনের সকল দিক্ পূর্ণ করিয়া তিনি তাঁহার সাংসারিক জীবনকে সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে ভরিয়া তুলিয়াছেন। সরোজিনী দেবী যে কবিতা রচনা করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন ইহাও তাঁহার বাল্যের কল্পনা-প্রবণ অন্তরের পরিণতি। শৈশব হইতেই তিনি কল্পনাপ্রিয় ছিলেন। বাল্যেই তাঁহার

কবি-সুলভ মনোবৃত্তির স্ফুরণ হয়। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল, কন্যাকে বিজ্ঞানে ও অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শী করিবেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরের সরস কবিজনোচিত চিত্ত বৃত্তির নিকট বিজ্ঞানের নীরসতা ঠাঁই পাইল না।

তাঁহার বাল্যের কাব্যরচনার পরিচয় দিয়া তিনি বলিয়াছেন—"শৈশবেই অত্যন্ত কল্পনাপ্রিয় হইলেও সে সময়ে কবিতা লিখিবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পিতামাতার (তরুণ বয়সে আমার মা কয়েকটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন) নিকট হইতে যে কবিতানুরাগের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলাম, তাহাই বিজ্ঞান-শিক্ষার চেষ্টার উপর প্রাধান্যলাভ করিল। আমার এগার বৎসর বয়সের সময় একদিন বীজগণিতের একটা আঁক কসিতে না পারিয়া বিমর্ষভাবে ভাবিতে ছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আঁকটা শুদ্ধ করিয়া কসিতে পারিয়াছিলাম না। সে সময় হঠাৎ একটা কবিতা মনে আসিল, তাহা আমি লিখিলাম। সেই দিন হইতেই কবিজীবনের সূত্রপাত। তের বৎসর বয়সে ছয়দিনে তের শত পংক্তির একখানা কবিতা পুস্তক লিখিলাম। সেই বৎসরই অসুখের সময় ডাক্তার বলিলেন, আমার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছে, বই ছুঁইতে পাইব না। তাঁহার কথার প্রতি অনাস্থা প্রকাশের জন্য একখানা নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং দুই সহস্র পংক্তিতে তাহা সম্পূর্ণ করিলাম। এই সময়েই চিরকালের তরে আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। বিদ্যালয়ের পড়া বন্ধ হইল, কিন্তু বাড়ীতে আমি খুব পড়িতে লাগিলাম, চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসরের মধ্যেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছি। এই সময়ে আমি একখানা উপন্যাস লিখিয়াছিলাম, অন্যান্য লেখাও অনেক লিখিয়াছিলাম।" তাঁহার উক্তি হইতেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ও কবিত্ব-শক্তি বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজীতে কবিতা রচনা করিয়া আর একটি বঙ্গনারী কুমারী তরু দত্তও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে সরোজিনী দেবীর প্রতিভাই অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য কবিদের আদর্শে ও অনুকরণে সরোজিনী দেবী কবিতা লিখিতেন। কিন্তু পরে তাঁহার কবিতা ভারতীয় ভাবে, আদর্শে, অনুপ্রেরণায় ও পারিপার্শ্বিকে উজ্জ্বল মধুর ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাব্য-রচনা ইংরাজীতে হইলেও সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে পূর্ণ। তাঁহার কবিতায় প্রাচীন ভারতের আদর্শ ও নব্য ভারতের বাণী রূপ পাইয়াছে। তাঁহার তিনখানা কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—"দি গোল্ডেন্ থ্রেস্‌হোল্ড্" (The Golden Thresh-hold) 'দি বার্থ অব টাইম্' (The Birth of Time) এবং 'দি ব্রোকেন্ উইঙ্গ' (The Broken Wing)।

কুমারী তরু দত্তের ন্যায় এই ভারতীয় মহিলার প্রতিভার সহিত পাশ্চাত্য জগতের পরিচয় করাইয়া দেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক-এডমাণ্ড গ্যাস্। সাহিত্য জগতে নাইডুর প্রতিভার পরিচয় দিয়া এড্‌মাণ্ড গ্যাস্ বলিয়াছেন—

"আমি মনে করি ভারতের বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষায় কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে সরোজিনী শ্রেষ্ঠ। যে সকল ভারতীয় কবিরা আমাদের ভাষায় কবিতা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। আমি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে পারি হিন্দুস্থানের সকল কবিদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভান্বিতা মৌলিক রচয়িত্রী।" গ্যাঁসের এই সশ্রদ্ধ উক্তি হইতেই আমরা তাঁহার কাব্য-প্রতিভার গৌরব উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহার কাব্যালোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগৎ আজ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

সরোজিনী আজ শুধু কবি-রূপেই পরিচিত নন, ওজস্বিনী বক্তারূপে, সমাজসেবিকা, দেশ-প্রেমিকারূপেও তাঁহার খ্যাতি যথেষ্ট। সমাজের উন্নতি-প্রচেষ্টায় এবং শিক্ষা-বিস্তারেও তাঁহার আত্মোৎসর্গের পরিচয় পাই। ১৯১০ সালের মুসীনদীর বন্যায় প্রপীড়িত হায়দ্রাবাদের সহস্র সহস্র গৃহহীন অধিবাসীকে তিনি আশ্রয়দান করিয়া, রুগ্নের সেবা করিয়া প্রাণদান করিয়াছেন। তাঁহার সেবা-পরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া সরকার বাহাদুর প্রথম শ্রেণীর "কৈসর-ই-হিন্দ" পদক দানে সম্মানিত করিয়াছেন। হায়দ্রাবাদের মহিলাসমাজের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

১৯১৩ সালে ২২শে মার্চ্চ লক্ষ্ণৌ সহরে হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের চেষ্টায় মুশ্লিমদিগের বিখ্যাত অধিবেশন হয়—এই সভায় সরোজিনী প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে স্যার এস্, পি, সিংহের সভানেতৃত্বে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি স্বরাজ-প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা দেন। ১৯১৭ সালে কলিকাতায় শ্রীযুক্তা এ্যানি বেশান্তের সভানেত্রীত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা দেন। ১৯১৮ সালে তিনি কঞ্জিবেরামে মান্দ্রাজ প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রীত্ব করেন। তাঁহার বাগ্মিতায় সমগ্র দেশ মুগ্ধ হইয়া গেল।

স্বাধীনতা-সংগ্রামক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া সরোজিনী দেবী জাতীয় আন্দোলনকে ঋদ্ধ ও পুষ্ট করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যে নারী-শক্তির অভাব জাতীয় আন্দোলনের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহার আন্তরিকতায় সেই অভাব পূরণ হইয়া জাতির মুক্তি-প্রচেষ্টাকে শক্তিময়ী করিয়া তুলিল। ১৯১৯ সালে মহাত্মার নেতৃত্বে যে বিরাট অসহযোগ আন্দোলন সুরু হইল, জাতির বাঁচিবার সেই বিপদ সঙ্কুল গতি-পথে প্রাণ-প্রদীপ জ্বালিয়া এ কল্যাণময়ী নারী ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সজীবতা দান করিলেন।

নারীর ভোটাধিকারের পক্ষ সমর্থন করিবার সঙ্কল্পে তিনি নিখিল-ভারতীয় নারী-সমিতির প্রতিনিধিরূপে বিলাত যাইয়া ইহার জন্য যথেষ্ট আন্দোলন করেন। পাঞ্জাবে অত্যাচারের যে তাণ্ডব-লীলায় বহু নির্দ্দোষী ভারতবাসীর প্রাণ বিসর্জ্জন হইল, সেই শ্মশান-শয্যার পরিণতি

এই দেশপ্রেমিকার প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়াছিল। ১৯২০ সালে যখন তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন তখন এই অমানুষিক অত্যাচারের কথা মর্ম্মস্পর্শী বাণীতে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। তারপর দক্ষিণ-আফ্রিকায় যখন ভারতীয় উপনিবেশিকগণ শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছিল, তখনও প্রবাসী দেশবাসীর জন্য তাঁহার দরদী-প্রাণ কাঁদিয়া ফিরিয়াছিল—তাই ১৯২৪ সালে সরোজিনী আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশবাসী যথেস্ট উপকৃত হইয়াছিলেন।

১৯২১ সালে বোম্বাই কংগ্রেস কমিটিতে তাঁহাকেই সভানেত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। ১৯২৬ সালের নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রীয় মহাসভার কার্য্য তাঁহারই অধিনায়কত্বে সম্পন্ন হয়। ১৯৩১ সালে আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু করিবার ফলে মহাত্মা-গান্ধী যখন কারারুদ্ধ হইলেন, তখন মহাত্মার প্রাণান্তকরী প্রচেস্টাকে ফলবতী করিবার সারথি হইলেন সরোজিনী। কিন্তু রাজরোষে তাঁহার আর সারথ্য বেশী দিন করিতে হইল না—অবিলম্বেই তাঁহারও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ঠাঁই মিলিল। নিপীড়িত জাতির ইহাই পুরস্কার—তাই সরোজিনীদেবীও এ পথের নির্য্যাতন হাসিমুখেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। গত গোলটেবিল-বৈঠকে তিনিও মহাত্মার সহিত বিলাত গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার পর তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হইয়াছেন। মুক্তি-পথ-যাত্রীর নির্য্যাতননিপীড়নই পাথেয়, তাই তিনিও কারাবরণকে দেবতার আশীষরূপে মাথা পাতিয়া লইয়াছেন, এই কণ্টকময় বন্ধুর পথে চলিয়াছেন অবিচলিত অস্খলিত পদে। ভারতের জাতীয়-জীবন আজ মুক্তিপথে অগ্রণী হইয়া এই দেশ-প্রেমিকার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ হইয়াছে। এই মহীয়সী মহিলার জীবন দীর্ঘতর হইয়া জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলুক, তাঁহার জীবনাদর্শের দীপ্ত-শিখা ভারতের প্রতিটি নারীর জীবনে জীবনে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নারীশক্তিকে জাগ্রত করিয়া জাতিকে কল্যাণের পথে লইয়া চলুক, ইহাই প্রার্থনা।

বঙ্গ-বিধবা

শ্রীসরযূ সেন

(১)

বিলাস-বিহীন-দেহ তাপসিনী নারী,
শুভ্র-বসনা !
ধুতুরা ফুলের মত থাকি শিব-শিরে,
ধেয়ানে মগনা ।

(২)

নাহি হেথা কেহ তার ভালবাসিবার,
তবু হৃদে সুধা,
ঝরিছে নিয়ত দীন অনাথের তরে,
নিবারিতে ক্ষুধা ।

(৩)

গৃহহীনা অনাথিনী স্নেহের কাঙ্গাল,
তবু গৃহবাসী,—
অযাচিত সেবারতা ত্যজি প্রতিদান
অনিমেষে বসি !

(৪)

তারতরে ধরণীর সুখ, কোলাহল,
মৌন, চিরমূক,
তবু তার বিরামের নাহি অবসর—
অগণিত যুগ !

(৫)

কেহ তার এধরায় নহে আপনার,
বিশ্ব তার সব,
একটু মমতা ঢেলে কেহ নাহি চাহে,
তবু সে নীরব !

(৬)

সদা স্মিতমুখে রত আপন করমে,
অবিচার সহি'
সবার কুশল-কামী, সবাকার হেয়—
আপনারে দহি' ।

বাঙ্গালা ছন্দ *

শ্রীমৃণাল দাশ-গুপ্ত

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় বাঙ্গালাছন্দ সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার রচনা সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি যে শুধু বাঙ্গালা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাহা নহে, বাঙ্গালাভাষা ও ছন্দের ধ্বনি প্রভৃতির কতকগুলি মূল সূত্রের আবিষ্কার করিবার প্রয়াসও করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া প্রবোধবাবু যখন প্রথমে রবীন্দ্র-যুগের বিবিধ নূতন ছন্দধারা প্রবর্ত্তনের আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন সেরূপ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা ছিল, এবং সেইজন্য তাঁহার প্রবন্ধগুলিও আদৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথাগুলির সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি আছে, কিন্তু প্রবন্ধকার অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি নূতন তত্ত্ব শুনাইয়াছেন। বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই কিন্তু এবিষয়ে দু'একটি কথা বলা আমরা আবশ্যক মনে করি। কারণ, আমাদের মনে হয় যে, যে-কোনও কাব্যরসিক পাঠক, যিনি শুধু অক্ষর গুণিয়া বা বিশ্লেষণের সাহায্যে নয়, কাণে ও প্রাণের মধ্যে বাঙ্গালা ছন্দধ্বনির উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি এই সকল সিদ্ধান্ত কোনও মতে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

মাত্রাবৃত্তের ও তথাকথিত স্বরবৃত্তের পার্থক্য ও এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধকার যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই, কিন্তু এই দুই জাতীয় বাঙ্গালা ছন্দের মধ্যে যে ভাষাগত, ভঙ্গীগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে তাহা গ্রন্থকার অস্বীকার করিয়াছেন। একথা সত্য যে, সুর-বহুল গীতিকবিতার উপযুক্ত বাহন হইলেও, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কৃত্রিম উচ্চারণ প্রণালীর মধ্যে বাঙ্গালা উচ্চারণ পদ্ধতির প্রকৃতরূপ ধরা পড়ে না; কিন্তু হসন্তের প্রাচুর্য্যে, ভাষা ও জাতির লঘুতায় স্বরবৃত্তেও যে তাহা "অখণ্ডরূপে" ধরা যায় তাহাও ঠিক নহে। 'স্বরবৃত্ত' এই সংজ্ঞাটিও উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। Syllable এই শব্দটির প্রতিশব্দ স্বর নহে, অক্ষর। 'স্বর' অর্থে যদি ইংরাজি syllable instant বা অক্ষরসংঘাতের ধ্বনি হয়, (যাহাকে প্রবন্ধকার পর্ব্বধ্বনি বলিয়াছেন) তাহা হইলেও, এই "পর্ব্বধ্বনি" একমাত্র এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য নহে; মাত্রাবৃত্তের মাত্রানির্ণয়ের মধ্যেও অখণ্ডধ্বনি

* শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন-প্রণীত 'বাঙ্গলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' প্রবন্ধের সমালোচনা।

পর্বের রূপ দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, এই ছন্দের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ইহার প্রাকৃতিক ভাষাগত ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও বিষয়গত প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যে রহিয়াছে। হসন্তের আধিক্যই তথাকথিত স্বরবৃত্তের শক্তির মূল উৎস নহে; বরং হসন্তের আধিক্যের দ্বারা স্বরসমষ্টির নহে, ব্যঞ্জনধ্বনির সামর্থ্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। চেষ্টা করিলে অনেক সময়ে স্বরবৃত্তকে মাত্রাবৃত্তে অথবা মাত্রাবৃত্তকে স্বরবৃত্তে পরিণত করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা একথা প্রমাণ হয় না যে, এই দুই ছন্দের কোনও প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই, কারণ, এরূপ একজাতীয় বৃত্তকে অন্য জাতীয় বৃত্তে পরিবর্তিত করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গীর পরিবর্তন অপরিহার্য্য।

প্রবন্ধকার অক্ষরছন্দ সম্বন্ধে (বিশেষতঃ পয়ার সম্বন্ধে) যাহা বলিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হয়, ছন্দের উপর তাঁহার যে একটি অবজ্ঞার ও অশ্রদ্ধার ভাব আছে শুধু তাহা নহে, তিনি এই ছন্দের প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইঁহার মতে; রবীন্দ্র পূর্ব্বযুগের কবিরা "শুধু অক্ষর গুণেই ছন্দ রচনা করেছেন" এবং "রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবিরা বহুশত বৎসর নানা প্রয়াস ও সাধনার ভেতর দিয়ে" অগ্রসর হইয়াও, বাঙ্গালা ছন্দের মূলতত্ত্বের আবরণ উন্মোচন করিতে পারেন নাই। মাইকেলের ছন্দকুশলতা সম্বন্ধে প্রবন্ধকারের কোনও শ্রদ্ধা নাই। ভারতচন্দ্র প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, ছন্দধ্বনির যে অসামান্য কলাবিদ্ বাঙ্গালা পয়ারকে প্রথম পঙ্ক্তিমুক্ত করিয়া বাঙ্গালা মহাকাব্যের আকাশে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এবং যিনি বিদেশী ভাষার অত্যুত্তম উৎকৃষ্ট ও কঠিন ছন্দকে অবলীলাক্রমে আয়ত্ত ও আত্মসাৎ করিয়া তদানীন্তন দুর্ব্বল ও অপরিণত বাঙ্গালা কাব্যের দেহে (শুধু অক্ষর গণিয়া নহে, অনুভূতির মধ্য দিয়া) ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারও ছন্দোভিশক্তির নিকটেও নাকি "এছন্দের প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়েনি।" প্রবন্ধকার মাইকেলের পয়ারে যতিদোষ দেখাইয়া এককথায় তাঁহার ছন্দনৈপুণ্যকে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এরূপ যতিদোষ অল্পবিস্তর অনেক শ্রেষ্ঠ কবির রচনাতে পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের রচনাও এই দোষ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত নহে, এবং প্রবন্ধকার স্বয়ং সে কথা গোপন করিতে না পারিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দেও "দু'একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়।" মাইকেল হইতে উদ্ধৃত সবগুলি উদাহরণই যে যতিদোষদুষ্ট তাহাও আমরা স্বীকার করিতে পারি না। "চলি গেলা যবে যমপুরে অকালে"—এস্থলে হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া প্রবন্ধকার যতিস্থাপনের ত্রুটি দেখাইয়াছেন, কারণ তাঁহার মতে পয়ারের যতি না কি অসমসংখ্যক অক্ষরকে স্বীকার করে না। ছন্দজ্ঞান হিসাবে, হেমচন্দ্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথকে সকলেই অধিকতর কুশলী স্বীকার করিবেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা পয়ার গ্রাম্যহীন জীবের মত, তাহাকে যেখানেই কাটা যায় সেইখানেই কাটা পড়ে, কিন্তু ইহার গতি ও জীবনীশক্তি অব্যাহতই থাকিয়া যায়। বদ্ধপয়ারে অসমসংখ্যক অক্ষরে যতি অনুপযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু অমিত্রাক্ষরের মুক্তপয়ারের

যতিস্থাপনা ইহার সমগ্র বাক্য বা পদের বিভিন্ন অংশের ঝোক্‌ বা stress স্থাপনের উপর নির্ভর করে—অক্ষর গণনার উপর নহে।

এ কথা বলিলে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের অসম্মান করা হয় না যে, যখন রবীন্দ্রনাথ প্রথম অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহার পূর্ব্বেই মাইকেলের প্রতিভা, বাঙ্গলা ছন্দের মেরুদণ্ড স্বরূপ পয়ারের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ধ্বনি বৈচিত্র্যের সমস্ত সম্ভাব্যতারই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। ছন্দকুশলী হিসাবে মাইকেলকে খাটো করা পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক। আসল কথা, অক্ষরবৃত্তের (বিশেষতঃ পয়ারের) প্রকৃতিই প্রবন্ধলেখক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাঁহার দোষদর্শী চক্ষে কেবল "ইহার কৃত্রিমতা ও অসম্পূর্ণতাই" পতিত হইয়াছে। স্বপ্রতিভার অনুকূল ও উপযোগী গীতিচ্ছন্দের পক্ষপাতী হইলেও, যে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা ভাষা ও ছন্দধ্বনির সর্ব্বপ্রকার রস-রূপ অভ্রান্তরূপে অনুভব করিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, পয়ার ভিন্ন "অন্য কোনো ভাষার কোনো ছন্দে এ রকম স্বচ্ছন্দতা এতটা পরিমাণে আছে বলে আমি জানিনে।"

অক্ষর বৃত্তের উপর এরূপ অদ্ভুত বিদ্বেষ বা গুণগ্রাহিতার অভাবের জন্যই বোধ হয়, আলোচ্য প্রবন্ধে কয়েকটি অতি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত দেখা যায়। যথা—(১) অক্ষরবৃত্ত আসলে একটি মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ'—অর্থাৎ, ইহা 'মাত্রা' ও 'স্বরের' একটি মিশ্রছন্দ। (২) অমিত্রাক্ষর পয়ারের আসল কথা মিল ও অমিলের কথা নহে; "এ ছন্দ অমিলও হতে পারে, মিলও হতে পারে"; প্রবহমানতা নাকি ইহার মূলতত্ত্ব। (৩) "অক্ষরবৃত্তে যত রকম ছন্দোবন্ধ রচনা করা যায়, স্বরবৃত্তেও সে সমস্তই স্বচ্ছন্দে চালানো যায়" এবং "বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দকেও ওরকম মহাকাব্যজাতীয় কবিতার বাহন করা অসম্ভব নয়।" প্রবোধবাবুর এই উক্তিগুলি পড়িয়া আমরা সত্যই হতাশ হইয়াছি। তাঁহার ছন্দ-গণনাতে নৈপুণ্য ও বিশ্লেষণ শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু ছন্দের কাণ বা অনুভূতি আছে বলিয়া মনে হয় না। অক্ষরবৃত্ত বা পয়ারজাতীয় ছন্দের মূলকথা অক্ষর-গণনা বা quantity নহে; ইহার ধ্বনিবৈচিত্র্য নির্ভর করে—অক্ষর-নির্দ্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে ইহার ঝোঁক্‌ (stress) ও যতিস্থাপনার বৈচিত্র্যে, ইহার ভাষা ও ভঙ্গীর গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তায়, গীতিপ্রবণতাবর্জ্জিত অনায়াস-গতি পাঠের উপর। মাত্রাবৃত্ত বা প্রাকৃতিক স্বরবৃত্তের মধ্যে গীতিপ্রবণতা সুস্পষ্ট; সেইজন্য ইহাদের যতিস্থাপনা নির্দ্দিষ্ট এবং ইহাদের পাঠে গীতি-সুরের ভঙ্গী অবশ্যম্ভাবী। পয়ার এই নির্দ্দিষ্ট যতি-বন্ধন ও গীতিপ্রবণতা হইতে বিমুক্ত, সেইজন্য ইহার গতিও প্রকৃতির মধ্যে যত স্বাচ্ছন্দ্য আছে এবং ইহার পাঠে যেরূপ অব্যাহত স্রোত রহিয়াছে, তাহা অন্য দুই জাতীয় বাঙ্গালা ছন্দে নাই,—এই কথাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উল্লিখিত মন্তব্যে বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, "প্রবহমানতা" ইহার মূলতত্ত্ব নহে, ইহার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। কিন্তু মিল ও অমিলের কথা এইজন্য আসে যে,

ইংরাজী blank verseএর মত "অমিত্রাক্ষর পয়ার" সমিল হইতে পারে না, কারণ মিল থাকিলেই পাদান্তে যতি স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া পড়ে এবং ছন্দ প্রবাহকে ব্যাহত না করিয়া যাইতে পারে না। মিলের ঝঙ্কার ও আহার্য্য মাধুর্য্যের মধ্যে যে ফাঁকটি রহিয়াছে, তাহার দ্বারা এই বৃত্তের ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকৃত রূপটি পরিস্ফুট হয় না। রবীন্দ্রনাথ যে, 'প্রবহমান সমিল পয়ার' লিখিয়াছেন তাহা blank verseএর লক্ষণাক্রান্ত নহে, কারণ তাহার ধ্বনিস্বরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির। পয়ার শুধু চৌদ্দ অক্ষরের মধ্যে কেন সীমাবদ্ধ থাকিবে, এ কথা প্রবন্ধকার উত্থাপন করিয়াছেন। বিস্তৃত পয়ার বা পয়ার জাতীয় ছন্দ যে সম্ভব, তাহা কেহ অস্বীকার করে না, কিন্তু blank verseএর পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরই যে মানস্বরূপ তাহা মাইকেলের অপূর্ব্ব ছন্দোনুভূতির নিকট স্বতঃই প্রতিভাত হইয়াছিল। কারণ blank verseএ পয়ার ইহার অপেক্ষা বিস্তৃত হইলে কতটা ছন্দপ্রবাহের ব্যাঘাত করে, তাহা বোধ হয় কোনও ছন্দরসিককে বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

প্রাকৃতিক স্বরবৃত্তের প্রতি পক্ষপাতিতার জন্যই বোধ হয় প্রবোধবাবু পয়ারের স্বরূপ ও শক্তির ধারণা করিতে পারেন নাই; নতুবা তিনি এরূপ বিচিত্র কথা কেন বলিবেন যে, স্বরবৃত্তে অক্ষরবৃত্তের সমস্ত ধ্বনিবৈচিত্র্য প্রকাশ করা যায়। বাঙ্গলা ছন্দ-আলোচনায়, বিভিন্ন ছন্দে প্রযুজ্য ও উপযুক্ত ভাষা এবং ভঙ্গীর কথা ভুলিলে চলিবে না এ কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত—বাঙ্গালা ছন্দের এই তিনটি রূপ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়, তাহা শুধু ইহার অক্ষর বর্ণ অথবা মাত্রা গণনায় ধরা পড়িবে না। যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে পয়ার বা পয়ারজাতীয় ছন্দ রচিত হয়, তাহার ধ্বনি প্রকৃতি অন্য দুইটী বৃত্তের ভাষা ও ভঙ্গীর ধ্বনিপ্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং যতিস্থাপনার বৈচিত্র্য ইহার মূলে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই, ইহার অসংখ্যপ্রকার ধ্বনিমাধুর্য্য অন্য দুইটি বৃত্তের মত নিয়ন্ত্রিত নহে। মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত গীতিকবিতার স্বাভাবিক বাহন এবং শেষোক্ত প্রাকৃতিক বৃত্তের মধ্যে একধরণের প্রাণবান্ স্বচ্ছন্দতা আছে, যাহা শুধু ক্ষিপ্রগতি ও চটুল বিষয় নহে নিত্যপরিচিত সাধারণ মর্ম্মস্পর্শী বিষয়েরও বাহন হইতে পারে; কিন্তু এই বৃত্তের নির্দ্দিষ্ট চাল ও চলন অল্পসময়ের মধ্যে একঘেয়ে হইয়া পড়ে, এবং এই ধ্বনির বৈচিত্র্যের অভাবের জন্যই ইহা বিশাল কল্পনামূলক রচনার স্বাভাবিক বাহন হইতে পারে না। বাঙ্গালা ছন্দের এই ত্রিবিধ ধ্বনি-রূপের ভাব ও বিষয়ানুযায়ী নিজস্ব সার্থকতা আছে, কিন্তু একটি অন্যটির স্বভাব দখল করিতে পারে না। এই ত্রিবিধ রূপকে অস্বীকার করিয়া একাকার করিতে চাহিলে, শুধু বাঙ্গালা ছন্দের অস্থিপর্ব্বের সংস্থানের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়, ইহার অন্তঃস্থিত স্বভাবিক ধ্বনিবৈচিত্র্য প্রাণে বা কানে অনুভূত হয় না।
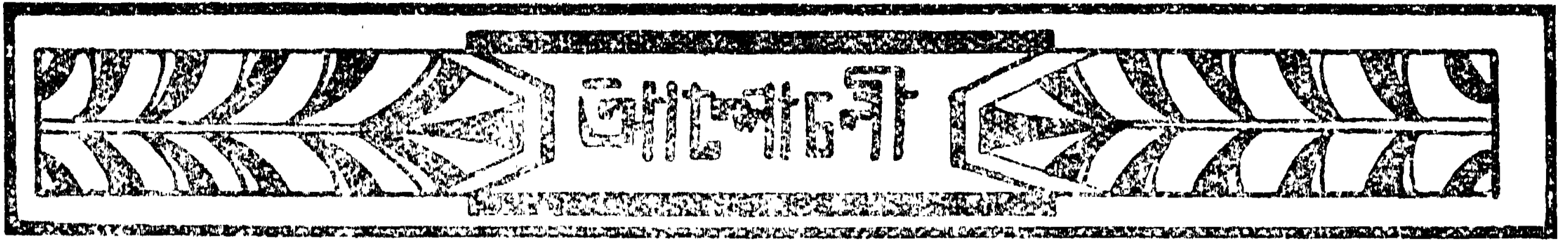
পল্লীধ্বংসের কারণ

দক্ষিণ-ভারতের বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কে, এস্, বেঙ্কট রামন গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শান্তি-নিকেতনে "পল্লীর আহ্বান" নামে একটি চমৎকার বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে উহাতে তিনি নিম্নলিখিত উক্তি করিয়াছেন—

"ভারতীয় পল্লীগুলির ধ্বংসের কারণ হইতেছে ব্যয়বহুল কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে পোষণ করার জন্য গুরুভার, আমদানী দ্রব্যের উপর জনসাধারণের কৃত্রিম অনুরাগ এবং কৃষির বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিতে জনসাধারণের আর্থিক অক্ষমতা। দেশের ধন-সম্পদের এই অভাব লোকের শক্তি হ্রাস করিয়া দিয়াছে। প্রতিভাদীপ্ত মানুষ যাঁহারা, তাঁহারা পল্লী ত্যাগ করিয়া নগরে যাইয়া মসীজীবী কেরাণীতে পরিণত হইয়াছেন এবং উহাতেও তাঁহারা কোন নব-সম্পদ দিতে পারেন নাই।"

ক্ষয়িষ্ণু পল্লীসমূহের উন্নতি কল্পে শ্রদ্ধেয় বক্তা মহাশয় অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটি নূতন ও অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, "ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রচারের তিনি পক্ষপাতী। বৈদ্যুতিক শক্তি মানুষকে বহু শ্রম ও শারীরিক ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিয়া শিক্ষা ও চিত্তপ্রকর্ষের জন্য অবসর প্রদান করে।

"বাষ্পীয় শক্তি নগরে লোকদের কেন্দ্রীভূত করিয়া জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তি পল্লীর সভ্যতা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে। পল্লী-সংগঠনের জন্য এই প্রকার দশ-সালা নীতি অবলম্বন করা হইলে একমাত্র উহাই ভারতবর্ষে নবযুগ ফিরাইয়া আনিবে।"

যে দেশের শতকরা ৮৯জন লোক গ্রামে বাস করে এবং যাহাদের শতকরা ৬৬ জনের উপজীবিকা হইতেছে কৃষি, সে-দেশের পল্লী-সংরক্ষণের জন্য দেশবাসীর উদাসীনতা জাতীয় ধ্বংসের সমতুল্যই বলিতে হয়। আশাকরি, দক্ষিণী কবির এই প্রস্তাবে সকলেই অবহিত হইবেন। বিশেষতঃ চোখের উপর সোভিয়েট রাশিয়ার মূক মানবের দ্রুত উন্নতির দৃষ্টান্ত পন্থাপ্রদানে যথেষ্ট সহায়তা করিবে, সন্দেহ নাই। সেই বিশালতম দেশের দূরতম প্রান্তসীমায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বৈদ্যুতিক শক্তি, কলের লাঙল ও জনশিক্ষার বিস্তার উহাদের পাঁচ-সালা ব্যবস্থারই ত ফল।

দেশের আর্থিক দৈন্য

বঙ্গীয় ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলার আর্থিক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে বাংলার বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকারের কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

উহাতে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"পৃথিবীব্যাপী মন্দার ফলে কৃষিপ্রধান দেশসমূহই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শিল্পজাত দ্রব্য অপেক্ষা কৃষিজাত পণ্যের মূল্য অনেক অধিক হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় কৃষকদের দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র কৃষকদের অবস্থা এইরূপ হইলেও বাংলার প্রধান ফসল পাটের মূল্য অভূতপূর্ব্ব হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় তথায় কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে।

"কোনও দেশ কৃষির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হইলে উহা আর্থিক হিসাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আর্থিক সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে বহু শিল্প-ও-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পত্তন করিতে হইবে। বাংলার এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আরো অধিক, কারণ এখানে শিল্প-ব্যবসায় বাহিরের লোকের হস্তগত।

"কিন্তু বাংলায় শিল্প ও ব্যবসায় করিতে হইলে ব্যক্তিগত চেষ্টায় হইবেন না। উহার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি অনুযায়ী সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োজন।

সেজন্য "ধনবিজ্ঞান পরিষদ্ নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন আবশ্যক। বিগত মহাসমরের পর ইউরোপের অনেক দেশে অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য এইরূপ ধনবিজ্ঞান পরিষদ্ গঠিত হইয়াছে। বাংলায় এইরূপ প্রতিষ্ঠান একান্ত প্রয়োজন।" এই পরিষদ্ তথ্য সংগ্রহ করিবে, গবেষণা করিবে, অর্থ সাহায্য করিবে।

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত উপায় এই লিপিতে লিখিত হইয়াছে।

(১) নানা কারণে বাংলার বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্য বাহিরের লোকের হস্তগত হইয়াছে। ইহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ। তাহাদিগকে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের অনেক অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

(২) কৃষকদের সাহায্য সরকার তিন উপায়ে করিতে পারেন। যথা—(১) শস্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য উন্নত প্রথা অবলম্বন; (২) অধিকতর লাভজনক শস্যের আবাদের ব্যবস্থা; (৩) রেলের ভাড়া হ্রাস এবং অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা শস্য বাজারে চালান দিবার সুবিধা প্রদান। ইহা ছাড়া কৃষকগণ যাহাতে কৃষির আনুষঙ্গিক পশুপালন, দুগ্ধব্যবসায়, হাঁসমুরগীপালন, মৎস্য চাষ, ও তরকারীর চাষ ব্যবসায় অবলম্বন করে তজ্জন্য উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য। (৩) কৃষকদের ক্রমবর্দ্ধমান ঋণভার হ্রাস। (৪) বাংলার সেচ-ও-ব্যবস্থা ও জলপথ সমূহের উন্নতি। (৫) কুটীর-শিল্পের প্রচার, উন্নতি ও বিক্রয়ের উন্নত ব্যবস্থা। (৬) ধ্বংসমুখী লোন আফিসগুলির রক্ষার ব্যবস্থা। (৭) জমিদারদের জন্য বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন। (৮) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তীব্র বেকারসমস্যা দূর করিবার জন্য শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার ব্যবস্থা।

দিন দিন আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় রূপে নিম্নগামী হইতেছে, চারিদিক্ হইতে যে ভয়াবহ কষ্টের সংবাদ পাইতেছি তাহাতে এইরূপ একটা ব্যবস্থা অবিলম্বে না করিলে জাতির বাঁচিবার উপায় আর থাকে না। জীবন্মৃত অর্দ্ধাশন বা অনশনক্লিষ্ট কঙ্কালসার মানবযূথ লইয়া জাতি বাঁচিতে পারে না, তার দিন গুজরাণ হয় মাত্র। তারও সীমা আছে।

বালিকা-শিক্ষা

১৯৩০-৩১ সালের ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা ও পরীক্ষা প্রদান বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বালিকা-বিদ্যালয় ও বালিকা-শিক্ষা অধিক বিস্তারের সঙ্গে বালক-বালিকাদের একত্র শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে।

"আলোচ্য বৎসরে বালিকা-বিদ্যালয় ও ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাভাব এবং রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। ইন্‌সপেক্টে্রসদের মতে বালকবালিকার একত্র শিক্ষার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে। **বোম্বাইএ বালিকাদের মধ্যে শতকরা ৩৪ জন বালকদের স্কুলে শিক্ষা লাভ করে।**

মেয়েদের মধ্যে বিপুলভাবে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে ছেলেদের সঙ্গে একত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে, নচেৎ বর্ত্তমান অবস্থায় অন্যতর ব্যবস্থায় মেয়েদের শিক্ষাবিস্তার সম্ভব নয়। একথা আমরা বহুবার বলিয়া আসিতেছি। এই প্রসঙ্গে আর একটি সংবাদ উল্লেখ করিতেছি :—

"কুষ্ঠিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির এক সভায় সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে, উক্ত বিদ্যালয়ে বালিকাদের জন্য ৪র্থ হইতে ১ম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইবে এবং উহাদের শ্রেণীতে সকালে পড়াইবার বন্দোবস্ত হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে আবশ্যক অনুমতি পাওয়া মাত্র বালিকাদের ভর্ত্তিকার্য্য আরম্ভ হইবে।" —ফ্রী প্রেস

মফঃস্বল স্কুলগুলিতে বালিকাদের পড়াইবার এইরূপ ব্যবস্থা খুবই প্রশংসনীয়। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন এ সকল স্কুলগুলি পাইবে। এদৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র অনুসরণ ও গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাংলার স্কুলগুলি কি এখনও এ বিষয়ে মনোযোগী হইবে না? আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেদের স্কুলে মেয়েদের ক্লাশ খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন।

বোধনা-সমিতি

জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য গুটিকয়েক মূক-বধির বিদ্যালয় ব্যতীত এদেশে কোন আলাদা প্রতিষ্ঠান নাই। এই হতভাগ্য ছেলেমেয়েরা সারাজীবন পরিবারের গলগ্রহ ও অশান্তিরূপে এবং সমাজের অনুর্ব্বর আগাছার মতই জীবন কাটাইয়া যায়। অথচ সুযোগ ও সুবিধা থাকিলে এবং সহানুভূতি পাইলে ইহারাও কর্ম্মক্ষম হইতে পারে, সংসারের বোঝা না হইয়া আনন্দের কারণ হইতে পারে। দেশের এই একান্ত-হিতকর কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন বোধনাসমিতি। ইহার কথা পূর্ব্বে অনেক পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। মাঘ মাসের প্রবাসী ও ফেব্রুয়ারীর মডার্ণ রিভিউতে উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে এইরূপ জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পের কথা বলা হইয়াছে। সেজন্য মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে বিস্তৃত জমি তত্রত্য জমিদারমহাশয় প্রদান করিয়াছেন। এখন উপযুক্ত অর্থ পাইলেই গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইবে। আশা করি, এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য মিলিবেই। অর্থাদি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ২।১ টাউনশেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল

হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল পূর্ব্বে একবার ব্যবস্থাপক সভায় উঠিয়াছিল। ইহার পরিণাম কাহারো অজানা নাই। সম্প্রতি ২রা ফেব্রুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ গৌর তাঁহার হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। এই উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় ভারি হাস্যকর ব্যাপারের অবতারণা হইয়াছে। একটু উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; "জলযোগের পর পরিষদের অধিবেশন পুনরায় চলিলে কোরামের অভাবে সভার কার্য্য অগ্রসর হইতে পারে না। ডাঃ গৌরকে সদস্যগণের খোঁজে লবীতে, ধূমপান ঘরে, পাঠাগারে ও ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।" পরে উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। দায়িত্বসম্পন্ন ভারতীয় সদস্যদের এরূপ ব্যবহার ক্ষোভের বিষয়।

সভায় প্রশ্নোত্তরের একটু নমুনা দিতেছি—

"সার হরি সিং গৌর (বিলের প্রস্তাবক)—এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে কি স্বামী অপর দারপরিগ্রহ করিতে পারে না?

মিঃ ঝাঁ—স্বামী তখন আর একটি পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হন।

[এই গোঁড়া পণ্ডিতই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—হিন্দুবিবাহ পবিত্রতা ও অবিচ্ছেদ-নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।]

রামকৃষ্ণ রেড্ডি—স্ত্রীও কি অনুরূপ আর একটি পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে?

মিঃ ঝাঁ—না, কিন্তু উহাই প্রচলিত প্রথা।

অবশেষে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবটি ১১-১২ ভোটে গৃহীত হয়।

বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে গত মাসে জয়শ্রীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্তা অনিন্দিতা দেবীর প্রবন্ধের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি, তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় যাহাতে গৃহীত হয় তাহাই ভারতবর্ষের অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোকের আকাঙ্ক্ষা ও অভিমত। গৃহীত হইয়াও যাহাতে ইহা কার্য্যকরী আইন হয়, সেদিকেও সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু

আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু য়ুরোপ যাত্রা করিবেন সরকারের অনুমতি লইয়া। বাংলায় আসিয়া মরণাপন্ন পুত্র রুগ্ন পিতামাতার পদধূলি লইবারও অধিকারটুকু বিদায়-বেলায় পাইলেন না, ইহা বড়ই আক্ষেপের। য়ুরোপের জলবায়ুতে নিরাময় হইয়া তিনি যেন আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন, দেশবাসীর ইহাই কামনা এই সম্পর্কে আমাদের একটি অনুরোধ, এইরূপ ক্ষয়রোগী রাজবন্দীদিগকে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সরকার যেন ইঁহাদের জন্য যথোচিত সহৃদয় ব্যবস্থা করেন। তাহা হইলে দায়িত্বপূর্ণ সভ্য গভর্ণমেণ্টের মানবোচিত কার্য্য হইবে।

একত্র শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেদের হাইস্কুলগুলিতে মেয়েদের জন্য ক্লাশ খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের একত্র পড়ানো সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় এই অভিমত দিয়াছেন যে, স্থানীয় আপত্তি না থাকিলে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উহা প্রবর্ত্তন করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক হাইস্কুল হইতেই নাকি অনুরোধ আসিয়াছে, মেয়েদের ক্লাশ খুলিবার অথবা রীতিমত ছেলেমেয়েদের একত্র পড়ানোর ব্যবস্থার অনুমোদনের জন্য। এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় এই সঙ্কল্প করিয়াছেন। ফরিদপুর, বালুরঘাট, উত্তর পাড়া প্রভৃতি জায়গা থেকে এইরূপ অনুমতির জন্য অনুরোধ আসিয়াছে।

অনেকদিন হইতেই আমরা জয়শ্রীতে এ বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলাম। আজ তাহারই কিছুমাত্রও সফলতায় সত্যই আনন্দ হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাধু সংকল্পের জন্য জাতি চিরকাল ঋণী রহিবে। নারীশিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যাহারা জাতির অর্দ্ধাঙ্গকে সবল ও সক্ষম মানুষ করিয়া তুলিতে সহায়তা করিতেছেন, তাহাদের দান স্মরণীয় হইয়াই রহিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা এজন্য সাধুবাদ জানাইতেছি এবং অনুরোধ করিতেছি, তাহারা অনতিবিলম্বেই একত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রনয়ণ ও প্রবর্ত্তন করুন। আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ডি ভ্যালেরার অক্ষুণ্ণ-প্রাধান্য

যাহা আশা করা গিয়াছিল তাহাই হইয়াছে। আয়র্লণ্ডের নবনির্ব্বাচনে মিঃ ডি ভ্যালেরা জয়ী হইয়াছেন। এক্ষণে তিনিই মন্ত্রীদল গঠন করিয়া স্বদেশকে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন ও সমৃদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইবেন অব্যাহত গতিতেই। একদিন যে লোকটি ইংরেজের কারাকক্ষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী ছিলেন, আজ তাঁহারই এই গৌরব ও সাফল্য অভাবনীয় হইলেও আশ্চর্য্যের নয়। যিনি একদিন ম্যানচেষ্টার কারাগৃহ হইতে কৌশলে পলায়ন করিয়াছিলেন, ছদ্মবেশে জাহাজে কয়লা ঠেলিতে ঠেলিতে আমেরিকায় গিয়াছিলেন, আজ তাঁহার এই গৌরব তাঁহার প্রতিযোগীদের মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার করিবে না ত? ডি ভ্যালেরার দলের মুখপত্র "আইরিশ প্রেস" কিন্তু টিপ্পনী কাটিয়াছেন 'ফায়নাফেল দলের (ডি ভ্যালেরার দলের নাম) সাফল্য মিঃ টমাস ও ডাউনিং ষ্ট্রীটের (অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর) নিকট তিক্ত ফলের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে।" হইতেও বা পারে।

জর্ম্মণ-চ্যান্সেলার হার হিট্‌লার

নাজীদলের নেতা হার হিট্‌লার জর্ম্মণীর চ্যান্সেলার-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অনেক দিনেরই প্রত্যাশার বিষয়। নবনিযুক্ত চ্যান্সেলার (প্রধান মন্ত্রী) পার্লামেণ্ট গৃহে প্রথম প্রবেশ করিয়া পত্রিকা-প্রতিনিধির এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"কম্যুনিষ্ট ও কার্লমার্কস

পন্থীরা সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল জর্ম্মণীর শাসন-রজ্জু ধারণ করিয়াছিল। আমি মাত্র চারিটি বছর চাই। চারিটি বছর পরে জাতি আমাকে কার্য্যের বিচার করিয়া মতামত প্রকাশ করিতে কিংবা ইচ্ছা করিলেও আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করিতে পারিবে।"

তাঁহাকে রক্তপিপাসু ও অনলবর্ষী বলা হয়, এ অভিযোগ করিলে তিনি উহা অস্বীকার করিয়া বলেন—"আমি শান্তি ও স্বস্তির জন্য চীৎকার করিতেছি। আমি যুদ্ধ-বিগ্রহকে অপর যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করি। কিন্তু আমি পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির ন্যায় জর্ম্মণ জাতির জন্যও উপযুক্ত স্থান ও মর্য্যাদা চাই।"

হার্ হিট্‌লারের নির্ব্বাচনে অনেকেই অনেক কিছু আশঙ্কা বা আশা করেন। ইতিমধ্যে নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে হিটলারের দল ও কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে রীতিমত রক্তপাত আরম্ভ হইয়া গেছে!

বিচ্ছেদ-বিরোধী ব্রহ্ম

ব্রহ্মে ব্যবস্থাপক সভায় বিচ্ছেদ-বিরোধী দলের জয় এবং দিল্লীতে ব্রহ্ম-নেতৃবৃন্দের মিলন-বৈঠক ইহাই সূচিত করে যে, ব্রহ্ম ভারতের সঙ্গেই যুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক। বলপ্রয়োগে সাধারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রহ্মকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্রের চাপে ফেলিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ব্যবস্থাপক সভার ভারতীয় সভ্যগণ এ সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের উদারতা ও সহৃদয়তারই পরিচয়। উহা সময়োচিত এবং যুক্তিযুক্তও বটে। জাতিকে চারিদিকেই যেরূপ নানাবিধ পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইতেছে, এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ ও প্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যেন সকল সমস্যার মীমাংসা করা হয়। নচেৎ ক্ষুদ্রতার পঙ্কিল প্রবাহে স্বার্থও ডুবিবে, জাতিও মরিবে।

আত্মরক্ষণশীলা নারী

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী কাটিহাটি গ্রামের সুখদেবী নাম্নী একটি অল্পবয়স্কা হিন্দু বিধবা সামসুদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে হত্যাপরাধে সেসন আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ্দ হন। ঘটনা এই—প্রকাশ যে, সামসুদ্দীন রাত্রিতে সুখদেবীর ঘরে ঢুকিয়া বলপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়, এবং সুখ দেবীও রামদা দিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলে। বিচারে জুরীরা একবাক্যে সুখদেবীকে নির্দ্দোষী বলেন এবং বিচারপতি তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া তাহাকে খালাস দেন।

বাংলাদেশে মেয়েরা আত্মরক্ষায় অক্ষম দেখিয়াই দিন দিন এই শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এখন সুখদেবীর মত সংখ্যায় কয়েকটী স্ত্রীলোক দেখিলেই, তাহাদের সংখ্যাও কমিয়া আসিবে এবং এইরূপ দৃষ্টান্তে একদিকে দুর্ব্বল বাঙালীর মেয়ের মনে সাহসের ও অন্যদিকে অত্যাচারীর মনে ভয়ের সঞ্চার করিবে।

এই বিচারের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, জুরীদের মুখপাত্র ছিলেন একজন মুসলমান ভদ্রলোক। তিনি সুখদেবীর সাহসও বীরত্বের প্রশংসা করিয়া এই রমণীকে পুরস্কার দেওয়ার

জন্য জজের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন। উপর্য্যুপরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং এই জাতীয় অপরাধীগণের প্রতি ভদ্র শিক্ষিত মুসলমানগণও তাহাদের কৃতকর্ম্মের গুরুত্ব অনুভব না করা—দেখিয়া আমরা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি যে মুসলমানগণ আমাদের সমান সুখদুঃখের অংশভাগী প্রতিবেশী, এই ঘটনায় প্রায়-ভুলিয়া-যাওয়া দিকটা মনে পড়িল এবং তাঁহার এই সাধারণ মনুষ্যোচিত ব্যবহার দেখিয়াও অপরিসীম আনন্দ হইতেছে।

পণ্ডিত মতিলালের স্মৃতি-তর্পণ

পণ্ডিত মতিলালের মৃত্যুবার্ষিকী ভারতবর্ষের নানাস্থানেই উদ্‌যাপিত হইয়াছে এবং নানাস্থানে সভা করিয়া সমবেত জনসম্প্রাদায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। কেবল মাত্র তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র এলাহাবাদেই তাহা হইতে পারে নাই। কারণ স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সভার পূর্ব্বাহ্নে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া পুরুষোত্তম পার্ক, যেখানে সভা আহুত করিবার কথা ছিল, সেখানে সভা করা বন্ধ করিবার জন্য নোটিস দেন; ফলে আর সভা করা হয় নাই। তেজ বাহাদুর সাপ্রু এই সভার সভাপতি হইবেন নির্দ্দিস্ট ছিল। এই সম্বন্ধে সার তেজ বাহাদুর একটা বিস্তৃত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে জানাইয়াছেন যে, এই রকম একটি ব্যাপার এই ভাবে শেষ মুহূর্ত্তে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া বন্ধ করায় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও সাধারণের মধ্যে অনাবশ্যক ও অকারণ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া বিরুদ্ধ ভাব বৃদ্ধি করা হইয়াছে মাত্র। আরও বলিয়াছেন, এখন ইহা বুঝিবার সময় হইয়াছে যে, এই জাতীয় ব্যাপারে জন-সাধারণের মনে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তাহারও একটা সীমা থাকা উচিত।

বাংলার অনুন্নত-জাতি

বাংলায় ব্যাবস্থাপক সভার ত্রিশটী আসন রক্ষিত হইয়া থাকে' তথাকথিত অনুন্নত হিন্দুজাতির জন্য। এই বিশেষ ব্যবস্থা করিবার পক্ষে সরকার হইতে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে অবনত শ্রেণীর স্বার্থ উচ্চশ্রেণী হইতে সতন্ত্র সুতরাং তাহাদের স্বার্থ-রক্ষার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ প্রতিনিধি রাখা প্রয়োজন। সম্প্রতি বাংলা গভর্ণমেণ্ট ১৯শে জানুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে হিন্দু-সমাজের অবনত জাতিদের একতালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে ৮৭টী জাতিকে অবনত শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। সরকার হইতে প্রকাশ সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা-ই এই বিভেদের মানদণ্ড। এই বিশেষ ব্যবস্থার অন্তরালে জাতির গভীর অমঙ্গল নিহিত আছে বলিয়া আমরা মনে করি সুতরাং সর্ব্বত্র বিশেষভাবে অনুন্নত শ্রেণীদের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। হিন্দু-সমাজ একেই তো ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, তাহার মধ্যে আবার 'উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীভেদ বিশেষভাবেই হইতে চলিল, ইহাতে জাতির বলক্ষয় হইবে। অন্যান্য দেশের মত এই বিভাগ আমাদের দেশেও আছে, আর সেজন্য আমাদের দুঃখ ও লজ্জার কারণ আছে, কিন্তু এত পরিস্ফুটভাবে সীমারেখা টানিয়া সেই বিভাগ চিরস্থায়ী করিলে দুঃখের মাত্রা বাড়িবে বই কমিবে না। মুসলমান ও খৃষ্টানসমাজেও শ্রেণীগত মর্য্যাদাভেদ

ও উন্নতিভেদ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে তো এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না, তাহাদের অবনতশ্রেণীর স্বার্থ শ্রেণীনির্ব্বিশেষে উপযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা রক্ষিত হয়, হিন্দুদের ও উহা হইতে পারিবে না কেন? প্রকৃতপক্ষে এতদিন উহাই তো হইয়া আসিয়াছে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ অনুন্নতশ্রেণীদের উন্নতিমূলক কাজ তাহাদের অপেক্ষা কম করেন নাই, এবিষয়ে ইতিহাসেই সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

আর এই বিভাগ বড়ই কৃত্রিম ভিত্তির উপর করা হইয়াছে, কোন্ লক্ষণ থাকিলে 'অবনত' পর্য্যায়ে পড়িবে তাহা নিসংশয়রূপে বলা যায় না, একথা সরকারও স্বীকার করেন। দক্ষিণভারতে অস্পৃশ্যতাকে এই ভেদের মাপকাঠীরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু বাংলাদেশে অস্পৃশ্যতা প্রায় নাই, সুতরাং অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে, একই দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশের এ বৈষম্য কেন! ইহাতেই মনে হয়, হিন্দুজাতিকে দ্বিধাবিভক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থার উদ্ভাবনা। একই জাতি সামাজিক মর্য্যাদায় উন্নত আবার রাজনৈতিক প্রগতিতে হীন হইতে পারে, সুতরাং সংজ্ঞা-অনুসারে মীমাংসা করাও প্রায় অসম্ভব। বিবরণীতে প্রকাশ তেলী, কলু প্রভৃতি কয়েকটী জাতি সুস্পষ্ট আপত্তি করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে অবনত শ্রেণীভুক্ত
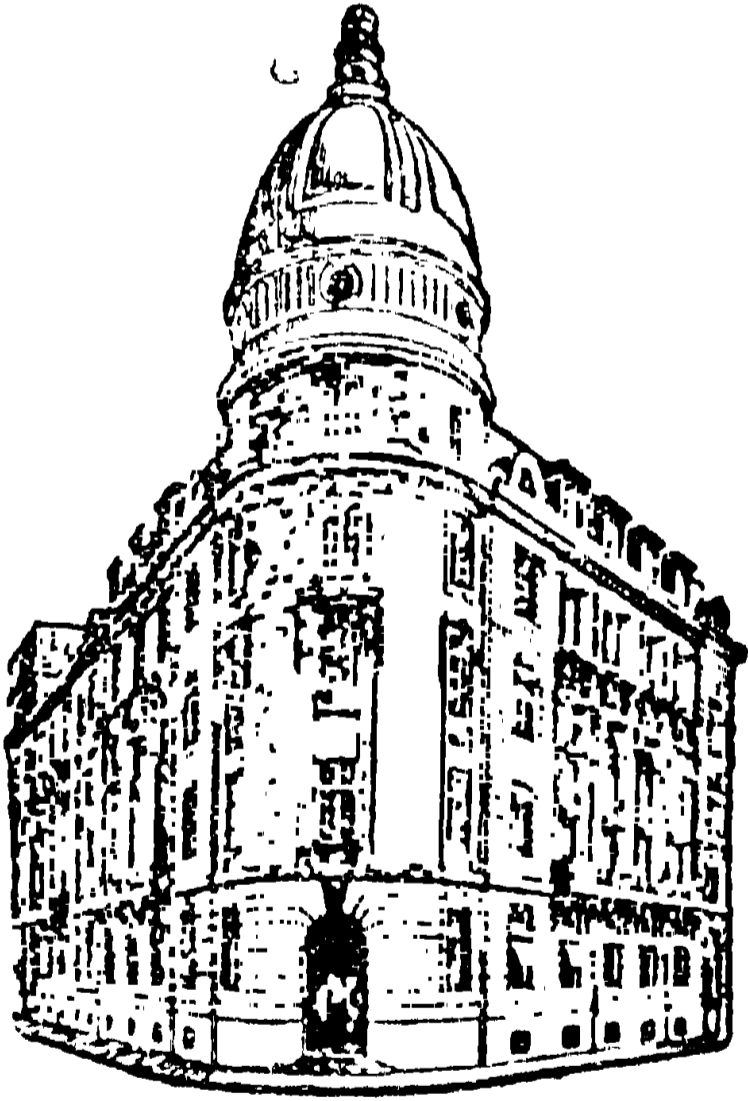
করা হয় নাই, কিন্তু আবার তেমনি রাজবংশীদের আপত্তি সত্ত্বেও বাদ দেওয়া হয় নাই, সুতরাং চূড়ান্ত মীমাংসার ভার সরকারের হাতেই রহিয়াছে দেখা যায়, কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ না থাকাতে উহা স্বৈরাচারমূলক হইতে বাধ্য। সরকারের পক্ষে প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক ব্যবস্থার উপর এরূপ হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যক কিনা, তাহাও বিবেচ্য।

এসব কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু আত্ম-মর্য্যাদার দিক দেখিলেও এবিভাগ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ব্যক্তিগতভাবে যেমন জাতিগতভাবে ও তেমনি একটা মর্য্যাদাজ্ঞান থাকা মানুষের উচিত, নিজেকে অবনত, হীন বলিয়া স্বীকার করিয়া সুখ-সুবিধার অধিকারী হইতে চাহিবে, আত্ম-সম্মানশীল কোন্ ব্যক্তি? সমগ্রজাতিকে অপমানের পঙ্কে ডুবাইয়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদের লোভ করা অতি ঘৃণ্য মনোবৃত্তি। উপযুক্ত হইয়া জাতিকে সম্মানিত করিয়া যাহাতে সর্ব্বপ্রকার সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারা যায় তথাকথিত অনুন্নতজাতির সেই চেষ্টাই করা উচিত। অপমানপুষ্ট দয়ার দানে তাহাদের কাজ কি? আর চিরকাল সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া নূতন করিয়া বাইরের চাপে আত্ম-কলহ সৃষ্টি তাহারা কেন করিবে? যিনি যোগ্য, প্রতিনিধিত্বে তাহারই অধিকার, দেশের দশের জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে তাহাতেই মঙ্গল, তাঁহার জাতি-নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া লাভ নাই।

বঙ্গশ্রী

আগামী মাঘ সংখ্যা হইতে 'উপাসনা'র নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'বঙ্গশ্রী' রাখা হইবে। উপাসনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না। 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদনভার গ্রহণ করিবেন 'প্রবাসী' ও মডার্ণ রিভিউ-এর ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস।

বৈশাখ হইতে যাঁহারা উপাসনার এক বৎসরের গ্রাহক হইয়াছেন তাঁহারা উপাসনার চাঁদাতেই মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত 'বঙ্গশ্রী' পাইবেন। 'বঙ্গশ্রী'র মূল্য বেশী ধার্য্য হইলেও তাঁহাদিগকে তাহা দিতে হইবে না।

'বঙ্গশ্রী'র বৎসর আরম্ভ মাঘ হইতে, 'উপাসনা'র গ্রাহকেরা বৈশাখ হইতে গ্রাহক হইবেন। প্রতি মাসের প্রথম তারিখে 'বঙ্গশ্রী' বাহির হইবে। প্রতিখণ্ড 'বঙ্গশ্রী'র মূল্য ৵০ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, বার্ষিক ৪॥০, বার্ষিক সডাক ৫৸০ ষাণ্মাসিক ২।০, সডাক ২৷৵০।

'বঙ্গশ্রী'র বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার পরিবর্ত্তিত হইল, উপাসনার বিজ্ঞাপনদাতাগণের মধ্যে যাঁহাদের সহিত চুক্তি করা আছে তাঁহারা চুক্তি না শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ঐ হারেই 'বঙ্গশ্রী'তে বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন।

লেখক ও চিত্রকরগণ যথারীতি পারিশ্রমিক পাইবেন। লেখা চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

সূচীপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ	চৈত্র, ১৩৩৯	দ্বাদশ সংখ্যা

ব্যাকুলতা

শ্রীমমতা মিত্র

আর যে তুমি চপল পায়ে
আস না মোর ঘরে,
আমার প্রাণ যে কেমন করে।
সকাল কাটে, সন্ধ্যা আসে,
তোমায় ত' মা পাই না পাশে,
বক্ষে তোমায় ফিরে পেলে
বক্ষ আমার ভরে,
আমার প্রাণ যে কেমন করে।

স্তব্ধ রে আজ আমার কাছে
মিঠে মুখের বোল,
ওরে শূন্য আমার কোল।
চম্‌কে দিয়ে হঠাৎ এসে
জুড়ায় না আর ভালবেসে,
নীরব হ'য়ে গিয়েছে হায়
হাসির কলরোল,
ওরে শূন্য আমার কোল।

জড়িয়ে ছিলি আমায় যে রে
ভালবাসার ডোরে,
আমি ছাড়াই কেমন করে ?
ছিলি রে মোর দিনে রাতে
আমার দুঃখ সুখের সাথে,
শূন্য আমার হৃদয় খানি
ছিলি রে তুই ভরে,
আমি ছাড়াই কেমন করে ?

কোন্ সুদূরে রইলি মা গো
আয় রে কাছে আয়,
আমার পরাণ কাঁদে হায়।
আজকে এই পাটল সাঁঝে
আয় রে আমার বুকের মাঝে
তোরেই শুধু চায়,
আমার পরাণ কাঁদে হায়।
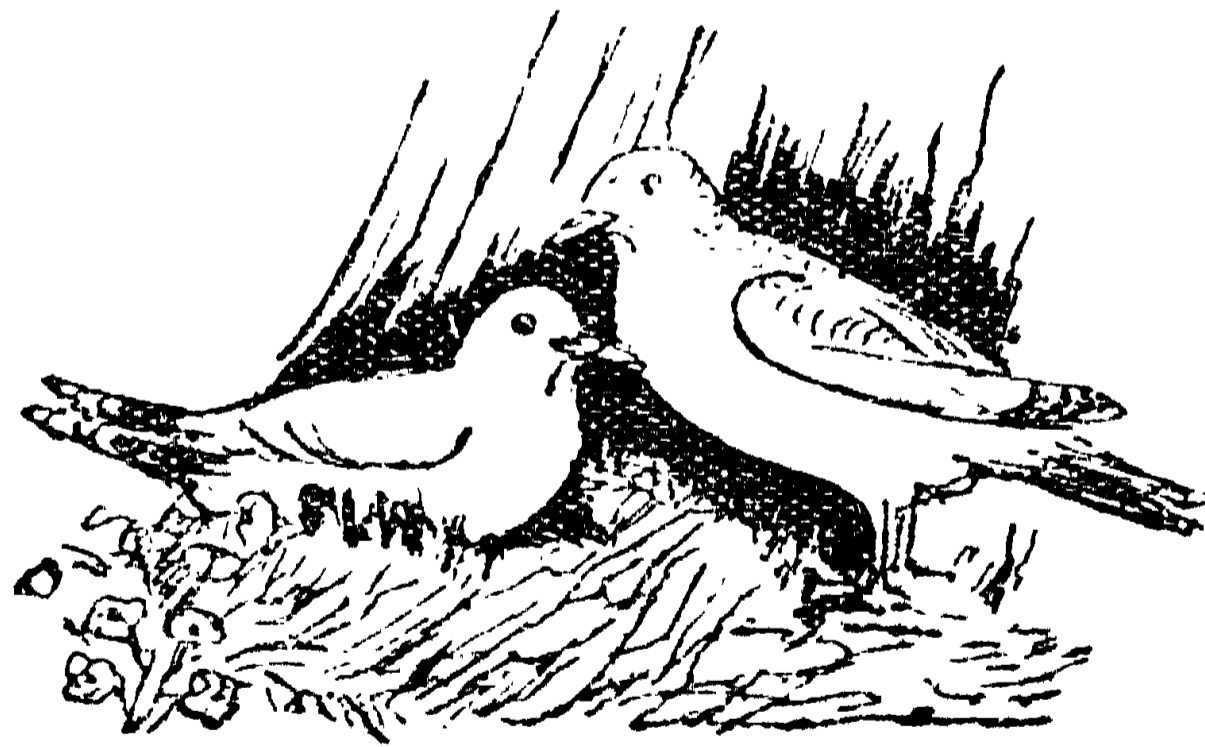
বার-বনিতা-বৃত্তি-দমন আইন

শ্রীকমলা মুখার্জ্জি

খুব বেশী দিনের কথা নয়, বাংলাদেশ থেকে সদ্য-আগত একটী বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্র-লোককে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মশায়, কলিকাতায় এত শিক্ষিতা সুগায়িকা মেয়ে থাক্‌তে, "রেডিয়োতে" মাত্র ২।৪টী মেয়ের গানছাড়া কেবল গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজানো হয় কেন? আমেরিকার মেয়েদের মত আমাদের দেশে ও তো অনেক মেয়ে রিডিয়োতে কথা, গল্প, গানবাজনা দিয়ে দেশের কাজ ও নিজেদের জন্য দু'পয়সা উপায় করবার পথ দেখ্‌তে পারেন।" এর উত্তরে তিনি বল্লেন "আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না আমাদের দেশের কথা, কলিকাতায় "রেডিয়োতে" যারা গানবাজনা 'ব্রড্‌কাষ্ট" করে তারা সব পতিতা, কাজেই আমাদের ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়েরা সেখানে যেয়ে গান বাজনা ক'র্‌তে পারেন না।" তর্কে যখন আমি ওঁর মতের সমর্থন কর্‌লাম না, তখন তিনি বল্লেন যে, "অগত্যা যদি পতিতাদের জন্য একদিন আলাদা বন্দোবস্ত হয় এবং ঘরের মেয়েরা তাদের সংস্পর্শে না আসে, তবে শিক্ষিতা মেয়েরা হয় তো সেখানে গান বাজনা ক'রতেও পারেন।" ভদ্রলোকটী "আলোকপ্রাপ্ত", বিদেশে অনেকদিন ছিলেন, পশ্চাত্যের অনেক কিছু দোষ শুনে গেছেন, তবু এরকম মনের ভাব ঠিক বজায় আছে। এক ছাতের তলায় বা একঘরে ভদ্র মেয়েদের সঙ্গে পতিতাদের ২।৪ মিনিটের জন্য রাখ্‌তেও ভীষণ আপত্তি, কথা বলাতো দূরে থাক্! অথচ একটু তলিয়ে দেখ্‌লে মনে হয় যে ঐ পতিতাদের পতিত অবস্থার জন্য দায়ী আংশিক-রূপে ভদ্রলোকেরাই।

দেশের দৈনিক সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রিকাতে কিছুদিন আগে দেখেছিলাম বারবনিতা-বৃত্তিদমন আইন চালাবার জন্য একটা বিশেষ আন্দোলন উঠেছে। এই আন্দোলনের সপক্ষে ছাড়া বিপক্ষে কেউ আছেন বলে কাগজ পড়ে মনে হোল না। বাংলা দেশের বহু নামজাদা সমাজ-সংস্কারকদের বক্তৃতা প'ড়ে মনে হ'ল আজ আমাদের ঘর পরিষ্কার করবার বাস্তবিকই সময় এসেছে। সমাজের যত দোষ ও গলদ আছে তা আমরা ভুলে থাকতে চাইনা না, ফেলে রাখ্‌তে ও চাইনা, প্রকৃতই ঘরে বাইরে পরিষ্কার করতে চাই। কাগজে দেখ্‌লাম, কেবল কলিকাতা সহরেই ৫৩ হাজার হিন্দু, ৫ হাজার মুসলমান ও শত জাপানী, চীনা, ইউরোপীয়, ইহুদী, ও আর্ম্মেনিয়ান বার-বনিতা আছে। কলিকাতার জনসংখ্যাহিসাবে পতিতাদের সংখ্যা খুব বেশী নয় কি? এই বৃত্তি-দমন আইন প্রচলন হ'লে ইহাদের পরিবর্ত্তন কি ভাবে, কেমন করে হবে এবং সমাজের কোন কোণে কি ভাবে এদের স্থান হবে এই রকম কতকগুলো প্রশ্নই আমার মনে হয়েছে, তাই এ সম্বন্ধে দু'কথা না লিখে পার্‌ছিনা।

কলিকাতা সহরে ২৫৮,৩০০ শত পতিতার মধ্যে তিপান্ন হাজার হিন্দু পতিতার কথাই আমি বেশী ক'রে ভাব্‌ছি। তার কারণ, আমি হিন্দু বলে নয়; তাদের সমস্যা ব'লে। আর বাকী যে পাঁচ হাজার তিন শত, তাহাদের সমস্যা অত বেশী নয়, কেননা, তাদের সামজিক আইন হিন্দু আইনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী উদার ব'লে আমার মনে হয়। বেশ্যাবৃত্তি-দমন আইন পাস হ'লে, উদার মুসলমান সমাজ কলিকাতার পাঁচ হাজার হতভাগ্য নারীকে তার সমাজে স্থান দিতে হয় তো দ্বিধা বোধ ক'র্‌বেনা। মুসলমানরা এ সব বিষয়ে উদার, জাত হারাবার বা নরকে যাবার ভয়ও তাদের নাই, কাজেই মনে হয় মুসলমান পতিতাদের একটা উপায় ও ব্যবস্থা করা খুব কঠিন হবেনা। আর বাকী যে নানা দেশীয় তিন শত আছে, তারাও তাদের সমাজে একটা না একটা স্থান ক'রে নিতে পারবে কাজেই সেটা তেমন বেশী সমস্যা নয়।

বাংলা দেশে হিন্দুর চাইতে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, অথচ এক কলিকাতা সহরেই যদি তিপান্ন হাজার হিন্দু পতিতা হয় তবে সমস্ত বাংলাদেশে যে কত বেশী হবে (মুসলমানের তুলনায়) তা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু বেশ্যা হয় কারা? তারা কি কোন সমাজের কোন নারীর চাইতে কিছু তফাৎ? তাদের জন্ম, শারীরিক গঠন, প্রবৃত্তি, আশা, আকাঙ্খা, স্নেহ, ভালবাসা সবই অন্যান্য নারীর মতই নয় কি? মুসলমান বেশ্যার তুলনায় হিন্দু বেশ্যার সংখ্যা এত বেশী হওয়ার তিনটী প্রধান কারণ আমার মনে হয়, বাল-বৈধব্য, দৈব পতন, ও দারিদ্র্য। অন্য সমাজে নারীরা এসব কারণে কঠোর শাস্তি পেলেও সমাজচ্যুত হয় না; একবার স্খলিত হ'লেও পরে যদি ভাল-ভাবে সমাজে থাকৃতে চায় তবে সমাজ তাকে একেবারে পায় ঠেলেনা। কিন্তু হিন্দুর সমাজে তা কখনো সম্ভব হয় না। একবার যে ভুল ক'রেছে তার ক্ষমা হিন্দুসমাজে কিছুতেই নাই। হিন্দু তার কেতাবে পুঁথিতে নারীজাতিকে মা বল্‌বে—কিন্তু সে মাকে কখনও ক্ষমা কর্‌বে না। সে নরকের কীট, অথচ তাকে যিনি ঐ পথে টেনে আন্‌লেন তিনি হয় তো সমাজের এক মস্ত বড় নেতা! উঠ্‌তে বস্‌তে জয়ধ্বনি উঠে; রাশি, রাশি, বিজয় মাল্য গলায় দোলে।

যাক্ সে কথা—সমস্ত ভারতবর্ষের এমন কি সমস্ত বাংলা দেশের পতিতাদের নিয়েও আলোচনা করার স্পর্দ্ধা আমার নেই, তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। আমি কেবল ভাব্‌ছি, একমাত্র কলিকাতার অন্ধকার জায়গার তিপান্ন হাজার হতভাগ্য নারীর কথা। এই তিপান্ন হাজার "নারী সৈন্য" আজ যদি আইনের জোরে "ব্যবসা" বন্ধ ক'রতে বাধ্য হয়, তবে এরা ক'রবে কি? খাবে কি করে? যাবে কোথায়? তিপান্ন হাজার নারীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান যোগাড় হবে কি করে, কর্‌বে কে? এ দায়িত্ব তো এক দিনের বা এক মাসের জন্য নয়, বহু কালের জন্য। হিন্দু-সমাজ এই সব নারীকে কোথায় স্থান দিবে? কি ভাবে? কি অবস্থায়? আইন করে সমস্ত বেশ্যা সমাজ-থেকে কখনো তুলে দেওয়া সম্ভব হতে পারে কি না এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। পাশ্চাত্যের এ সমস্যাটিও কিছু কম নয়। এরাও এ নিয়ে অনেক ভেবেছে ও এখনও ভাব্‌ছে। আইনতঃ

অনেক দেশে বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করা হয়েছে সত্য কিন্তু কার্য্যতঃ বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ হয় নাই; অনেকের মতে বেড়েছে। এখানে আমি একটু আমেরিকার কথা বিশেষ ক'রে না ব'লে পার্‌ছি না। সমস্ত আমেরিকায় ও মদ ও এই বৃত্তি-দমন আইন করার জন্য মহা-আন্দোলন হয় ও পরে আইন পাশ হয়। কাজেই আইনতঃ এদেশে মদ বা বেশ্যা না থাকার কথা। কিন্তু যদি কেউ এর যে কোনও একটা, বা দুটোই চায়, তবে তার যে কখনো অভাব হয় না বরং প্রচুর পরিমাণে জোটে, এ যারা এদেশে দেখেছেন তারা কেউ অস্বীকার করবেন না। আমেরিকার ছোট বড় যে কোন সহরেই হোক, এ দৃশ্যের অভাব হয় না। অনেক সহরে পাড়াকে পাড়া শুদ্ধ সাদায় কালায় এ "ব্যবসা" চালাচ্ছে। অনেক সহরে যদিও আগের মত "বেশ্যা পাড়া" নাই, তবে তারা এমন ভাবে ছড়িয়ে থাকে যে, যারা চায় তাদের বেশী খুঁজ্‌তে হয় না। রাস্তা, ঘাটে বায়স্কোপে ও তার প্রমাণ ঢের পাওয়া যায়। অনেকে হয় তো ভাব্‌তে পারেন, যে আমেরিকায় মেয়েরা তো কথায় কথায় সমাজচ্যুত হয় না, সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন কর্‌বার ও ঢের উপায় ও ব্যবস্থা আছে, তবে এ দেশে এত বেশ্যা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত, তবে দেখে শুনে আমার মনে হয়, এই যে, এদেশের মেয়েরা, যারা ঐ ব্যবসা কর্‌ছে, তারা অনেকে নিজের বাসনায় যতটা না হৌক অভাবে ও বিলাসিতার মোহে প'ড়ে কর্‌তে বাধ্য হচ্ছে। তা ছাড়া এ দেশে যার টাকা আছে তার খুব আছে; এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বড় কম—যাদের টাকা কম তাদের সংখ্যা খুব বেশী, অথচ সখ উভয়েরই সমান। সুতরাং এই সখ মেটাবার জন্য অনেকে বাধ্য হয়ে "উপরি" উপায় ক'রতে লজ্জা মনে করে না। এ দেশে সাধারণ লোকের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা দিন দিন অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ছে। যে গরীব সে দিন দিন গরীবই হচ্ছে; আর এ বছরকার মত এই উৎকট বেকার সমস্যার দিনেও ধনী তার টাকা সহজে খরচ ক'রতে চাচ্ছে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই সব অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত নারীদের জন্য এ দেশের সমাজ ও যথেষ্ট ক'রছে না। আইন করে "ভাল হও" বল্‌লেই সে আর ভাল হ'তে পারছে না, কারণ সমাজ তার সমস্ত অভাব পূরণের জন্য নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিষ, খাওয়া দাওয়া, গরম জামা কাপড় পাউডার, রুজ্‌, ক্রীম, গরম ঘর আসবাব পত্রও সব সময় সরবরাহ করতে পার্‌ছে না; কাজেই তাকে অন্য পথ দেখ্‌তে হয়। এ ব্যবসায় জঘন্য হইলেও এর মূলধন রূপ, যৌবন ছাড়া আর কিছু দরকার হয় না, কাজেই নিজের আর্থিক উন্নতি ও বিলাসিতা বাড়াবার জন্য এ ব্যবসা করতে বাধ্য হয়। আইন ক'রলে কি হবে? এ দেশের পুলিশ ও সাধারণ পুলিশ জাতির ধর্ম্ম রাখ্‌তে জানে অর্থাৎ ঘুষ খেতে বড় ভালবাসে, কাজেই বিনা বাধায় বা কম বাধায় এ ব্যবসায় ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। তাই ব'লে কেউ যেন মনে না করেন এ দেশের এই সব মেয়েরা আইন লঙ্ঘন করেও সচ্ছন্দে এই ব্যবসায় চালিয়ে দিচ্ছে। তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, মাঝে মাঝে পুলিশের ধর পাকড় ও বেশ হয়; (পুলিশ বোধহয় তখন ঘুষ কম পায়!) এবং তাদের বয়স ও অপরাধের গুরুত্ব, লঘুত্ব

বুঝে সেই রকম শাস্তি দেওয়া হয়। যাদের বয়স অল্প তাদের "Reformatory" তে পাঠিয়ে রুচি অনুসারে নানা কাজের শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে পরে তারা ভালভাবে নিজে উপার্জ্জন ক'রতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া নানা নারী-মঙ্গল সমিতিও এই সব মেয়েদের নানারূপ শিক্ষা দিয়ে উপার্জ্জনের পথ অনেক করেছেন, তবে যথেষ্ট নয় এই যা দুঃখের বিষয়। আমেরিকায় মেয়েদের ছেলেদের মতই নানাক্ষেত্রে কত কাজের সুবিধা আছে এবং ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে সমাজে সে তার জায়গা দাবী করতে পারে অথচ তবু সে পেরে উঠ্‌ছে না! তাই ভাব্‌ছিলাম, আমাদের সমাজ থেকে হঠাৎ সমস্ত বেশ্যা একেবারে তুলে দেওয়া সম্ভব কি না! সব তুলে দেওয়া সম্ভব না হোলেও যারা আবার স্বাধীন জীবিকা উপায় ক'রতে চায় ও সংসারী হতে চায় তাদের সে অধিকার দিলে দোষ কি? আমি বেশ বুঝি যে স্ত্রী জাতির এটা একটা বড় কলঙ্ক এবং পুরুষেও এর জন্য অনেকটা দায়ী, কিন্তু আবার ভাব্‌ছি ঐ আইনের কথা। আইনের ফল হবে কেমন? যদি সত্যই আইন ক'রে সমস্ত বেশ্যাকে ভাল করা সম্ভব হয় তবে আমার আনন্দ খুব বেশী হবে কিন্তু তিপান্ন হাজার বেশ্যা শুধু এক কলিকাতায় যাদের ভাল হবার সুযোগ, সুবিধা আমরা ভুলেও করে দিইনি, সময় থাক্‌তে যাদের শিক্ষা দিইনি, অথচ ক্ষমা করতেও শিখিনি। যাদের এক বেশ্যাগিরি ছাড়া অন্য কোনও কাজ শেখাইনি, আজ যদি আইনতঃ হঠাৎ তাদের জীবনের একমাত্র ব্যবসা বন্ধ করি তবে, আমি ভাব্‌ছি, তারা যাবে কোথায়? খাবে কি করে? আবার ভাব্‌ছি আমাদের হিন্দু সমাজের কতজন পুরুষ, বেশ্যা বিয়ে করে সংসার ক'রতে রাজী হবে কি কেউ? না তারা বেশ্যাগিরি ছেড়ে ঝি চাকরাণীর কাজ নেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে বেশ্যার ব্যবস্থা ক'রবে? কেউ যেন মনে না করেন আমি বেশ্যাকে সমাজে চাইনা—চাই বলেই আজ বড় আগ্রহে আমাদের সংস্কারকদের জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, আমরা কি তাদের ক্ষমা ক'রতে পার্‌ব না? যদি ক্ষমা কর্‌তে না পারি তবে তাদের উপায় হবে কি? উপায় যদি না করে দিতে পারি তবে এ আইন করে কি হবে?

সমাজ-সংস্কার দরকার নিঃসন্দেহ, আইন করে এ বৃত্তি বন্ধ হউক এ সকলেই চায়, কিন্তু তারপর? হিন্দুরা কি তখনও গোঁড়ামী বজায় রেখে তাদের আলাদা করে রাখ্‌বে, না সবার সঙ্গে সমান স্থানে বস্‌বার অধিকার দেবে? মুসলমান তার স্বধর্ম্মী মানুষকে কোনদিন সমাজচ্যুত করেনি কাজেই মুসলমান নারীর স্থানের অভাব হয়ত হবে না, কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সব নারীর স্থান কোথায়? হিন্দুর মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন (খুব কঠিন হলেও) বিশেষ দরকার নতুবা এ রকম সংস্কারে সমাজের কোন কল্যাণ সাধন হয় না। বরং অনেক সময় অকল্যাণই সম্ভব। হিন্দু-সমাজ যদি বেশ্যা তুলে দিতে চায়, তবে তাকেও একটু বেশী উদার, ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমাশীল হ'তে হবে। শুধু আইন করে যদি এই বৃত্তি বন্ধ হয়, অথচ এই সব মেয়েদের উপায়ের কোন বন্দোবস্ত না হয় তবে আমার মনে হয় সমাজের ব্যভিচারিতা বাড়্‌বে বই কম্‌বে না। কেবল উচ্ছৃঙ্খলতা ও কুৎসিৎ ব্যারাম সমাজকে ঘিরে দাঁড়াবে।

তাই ব'লে কি এ আইন স্থগিত রাখা উচিত? কখনও না, বরং যাতে অন্যান্য সমাজ সংস্কারক আইন ও সঙ্গে সঙ্গে হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। সমস্যাটা মস্ত বড়, মীমাংসা তার চেয়েও বড়, একদিনে হবার নয়, হবার আশা করাও অন্যায়। এই আইন যত শীঘ্র পাশ হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর মানসিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন আরো বিশেষ দরকার। মুখে ও কাগজে কলমে যেমন প্রচার করা দরকার কার্য্যতঃ জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখানও তেমনি দরকার। আমরা যে প্রকৃতই নিজেদের ঘরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করতে চাই, এটা আগে নিজেদেরই ভাল ক'রে বোঝা, কাজে দেখান দরকার, নারীকে শাসন করতে আজ আইনের চেয়ে শিক্ষারই বড় প্রয়োজন, এবং এ শিক্ষাই তাকে আর উপযুক্ত স্থানে বেছে নিতে সাহায্য করবে, আইন নয়।

মৃগমদ

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

(১৫)

দিগেন্দ্র লাহা সুপুরুষ না হইলেও কুৎসিৎ নয়। লোকটি লম্বা, গৌরবর্ণ, মুখের গড়ন মঙ্গোলীয়, কেশ কুঞ্চিত, চোখ ছোট ও তীব্র, সুন্দর ভ্রূ, ঠোঁটচাপা, মানুষটি দেখিতে বলিষ্ঠ। চালচলন কথাবার্ত্তা ও তাহার ক্ষমতার একটা ঝাঁঝ আছে। বন্দরের বুকে সে যেন এক মানোয়ারী জাহাজ—মানুষের দৃষ্টিকে সে স্বতঃ আকর্ষণ করে। লাহা কথা বলিতে জানিত। মক্ষিকা মনের সুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, কাছে বসিয়া তাহার ঊর্ণনাভ-উজ্জ্বল শুভ্র ঊর্ণার কোমল কমনীয় জাল বোনে। মুগ্ধ মক্ষিকা সুখময় শয্যা কল্পনা করিয়া উড়িয়া গিয়া বসে,—ভুল তাহার তখন ভাঙ্গে।

দিগেন্দ্র কথার জাল বুনিত তাহারই মত। তাহার কাছে ধরা দিয়াছে অনেকেই—কিন্তু নিজে সে ধরা পড়ে নাই কোনো জালে। না পড়িবার কারণও ছিল যথেষ্ট। তুলনায় মেয়েরা তাহার কাছে শিশুর মতন। বিদ্যায়, অভিজ্ঞতায় জ্ঞানে, বুদ্ধিতে কে তাহার সমকক্ষ; বয়সের পার্থক্যও ত নেহাৎ কম নয়; জালে যদি সে কখনো পড়েও, কালো ভোমরার মত কঠিন দুই পক্ষের সাহায্যে নিমেষে সে দেয় তাহা ছিঁড়িয়া উড়াইয়া।

আগে সে যা-ই থাক্ বর্ত্তমানে কমলা দিয়াছে স্বহস্তে তাহায় কণ্ঠে প্রসাদ-মাল্য পরাইয়া! সে শুধু আই-সি-এস্‌ই নয়—ভারতের জনপদের ক্ষুদ্র এক গ্রাম হইতে সুরু করিয়া বিলাতে অক্সফোর্ডের আঙ্গিনা পর্য্যন্ত—অকৃতকার্য্যতা কাহাকে বলে সে জানে নাই। সে সফলকর্ম্মা ও

সফলজন্মা পুরুষ—সে যাহা চাহিবে—তাহা সে চাহিবে নৃপতির মত গর্ব্বের সহিত, স্পর্দ্ধার সহিত। লইবে সে বলে, দিবে সে অবহেলে অবজ্ঞায়!

বাড়ীশুদ্ধ লোক—দিগেন্দ্রের যতই গুণমুগ্ধ হোক্ না কেন, চন্দ্রিমার চোখে তাহার মুখের মদ-স্পর্দ্ধিত আত্মশ্লাঘার ভাবটি ছাপা ছিল না। সুতরাং দিগেন্দ্রকে সর্ব্বপ্রযত্নে সে পরিহার করিয়া চলিত। নীরা ভাবিত, লজ্জা, দিগেন্দ্র ভাবিত, তাহার ব্যক্তিত্বের প্রখর ছটায় চন্দ্রিমা ম্লান হইয়া গিয়াছে। মুখে তাহার হাসি ফুটিত, গর্ব্বে ও আত্ম-প্রসাদে।

নীরাদের সঙ্গে কাশ্মীর যাওয়ার প্রস্তাবে দিগেন্দ্রের ছিল চন্দ্রিমার উপর এক চাল চালিবার মৎলব। চন্দ্রিমা স্পষ্টভাবে তাহা না বুঝিলে ও তাহার প্রতি তাহার স্বাভাবিক বিমুখতা বশতঃ প্রস্তাবটা একেবারে পছন্দ করে নাই। কিন্তু নীরা চন্দ্রিমাকে ছাড়ে না। চন্দ্রিমাকে নহিলে তাহার চলে না। পুষ্পবনে পরিমল-বিলাসী প্রজাপতি পক্ষ নাচাইয়া ফিরে, নির্ভাবনায়। কিন্তু মানুষের বিলাস-লীলার পশ্চাতে থাকে বিস্তর তোড়জোড়। সেখানে শুধু সতীশ ও পার্ব্বতীকে দিয়া সব প্রয়োজন সমাধা হয় না।

দিগেন্দ্র ড্রয়িংরুম জমকাইয়া বসে, চন্দ্রিমা মনের অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিবার জন্য বাগানে ঘুরিতে থাকে। ফটকের দিক্ হইতে গুঞ্জন একটা ভিজিটিং কার্ড হাতে করিয়া আসে। চন্দ্রিমা থামিয়া বলে, কাকা ত বেরিয়ে গেছেন গুঞ্জন,—আচ্ছা দাও, নামটা দেখে নি।

চন্দ্রিমা স্বাগত পড়ে,—ক্যাপ্টেন কুমুদকান্ত মহলানবিশ···কিংশুককান্তি মিত্রর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। গুঞ্জন হুকুমের অপেক্ষা করিতে থাকে। চন্দ্রিমা ভাবিয়া বলে, আচ্ছা, একে নিয়ে এস।

শ্যামবর্ণ ছিপ্‌ছিপে লম্বা ত্রিশ বত্রিশ আন্দাজ বয়স, ললিত মুখশ্রী, একজন লোক গুঞ্জনের সঙ্গে অদূরে দেখা দেয়। কাছে আসিয় নমস্কার জানাইয়া অতি বিনীতভাবে বলে,—কিংশুক কি এখানে থাকে?

চন্দ্রিমা বলে, থাকেন, এখন নেই।

নেই মানে,—অন্য কোথাও চলে যায় নি আশা করি।

ছেলেটির স্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

চন্দ্রিকা বলে, না, বেড়াতে গেছেন, কি কোনো কাজে গেছেন।

দেখুন, আমি আস্‌ছি করাচী থেকে। চলে যাব পরশু। কিংশুক আমার ক্লাশমেট্, একসঙ্গে কলেজে ঢুকেছি এবং একসঙ্গে বেরিয়েছি ও। ওর সঙ্গে দেখা হওয়া আমার নিতান্ত প্রয়োজন। আমার আরেকজন বন্ধুর চিঠিতে আমি জান্‌লুম যে ও আপনাদের এখানে আছে। বছরখানেক হোল চিঠিপত্রও বন্ধ করে দিয়েছে, লাহোরে ওদের বাড়ীতে চিঠি লিখে কোনো উত্তর পাই নি—এই মাত্র জানি যে ওর মা মারা গেছেন।

চন্দ্রিকা বলিবার কোনো কথা পায় না, চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতে থাকে।

ছেলেটি বলে, গতবার এজন্যেই বোধ হয় ওর যে পরীক্ষাটা দেওয়ার কথা ছিল, তা দিতে পারে নি। ওর মা যে কি আদর্শ মহিলা ছিলেন তা আর আমি কি বল্‌ব; অত বড়লোকের স্ত্রী—অহঙ্কার ছিল না একটু ও! নিজের বিলাস ব্যসন ত্যাগ করে জনসেবা করে গেছেন। দেশের যতগুলি সৎশিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে, প্রভুত দান করে গেছেন তাতে। তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ওঁদের নিজেদের দেশে একটি পাঠাগার স্থাপন কোরে গেছেন। জানেন বোধ হয় আপনি সে সব—আমি অযথা বকে যাচ্ছি!

চন্দ্রিমা এবার একটা কিছু বলবার পায়, বলে, না, আমি জানি না! কিংশুকবাবু কখন ফির্বেন বলা ত যায় না, চলুন, ঘরে বস্‌বেন।

না, তার ঘরে কি কর্ত্তে যাব, ঘণ্টাখানেক পরে বরঞ্চ ঘুরে আস্‌ব। কিংশুকের মা কিম্বা বাবাকে আপনি চেনেন না?

কাকা হয়ত চেনেন, বল্‌তে পারি না।

আমি ভেবেছিলুম আপনাদের সঙ্গে ওঁদের কোনো আত্মীয়তা আছে। কাগজে পত্রে ওঁর নাম ও ছবি ও হয়তো দেখেছেন—শ্রীমন্দাকিনী দেবী হচ্ছেন কিংশুকের মা।

হ্যাঁ, ওঁর নাম শুনেছি। ছবি ও দেখেছি।

কিংশুকের বাবাকে চেনেন বোধ হয়?

হাসিয়া চন্দ্রিমা বলে, না!

তাঁকে ও চেনেন না? বাঙ্গালার মধ্যে উনি বড় মিলওয়ালা। ওখানকার কাপড়ের কল ওঁর নিজস্ব, ওঁর নামেই নাম, শোনেন নি কি? বিজয় মিল। কিংশুক এখানে এত দিন আছে—আর আজ আমি এসে আপনাদের পরিচয় দিলুম? মন্দ নয় যে আপনি জানেন না—আপনার কাকা নিশ্চয় সব জানেন। তারপর ও এখানে কি কচ্ছে?

চন্দ্রিমা এ কথার সহসা কোন উত্তর দিতে পারে না, কথা উল্টাইয়া বলে, ওঁর সঙ্গে যদি আপনার দেখা না হয়, কোথায় আছেন সে ঠিকানাটা কার্ডের পিছনে বরঞ্চ লিখে রেখে যান।

কথা বলিতে বলিতে দুজনে ফাটকের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। কুমুদ পকেট হইতে আরেকটা কার্ড বাহির করিয়া তাহার পিছনে ঠিকানা লেখে। এমন সময় গেট ঠেলিয়া কিংশুক ঢোকে। কাপড় তার আধ ময়লা, হাতে গোটা তিনেক কলমের গাছ, অন্য হাতে বাগানের একটা নূতন যন্ত্র। পাঞ্জাবীর হাতায় মাটির দাগ, পায়ের স্যাণ্ডেল ধূলায় চর্চ্চিত।

মাথা তুলিয়াই তাহাকে দেখিয়া কুমুদ সানন্দে বলে, এই যে তুমি এসে পড়েছো। আমার বরাত জোর বল্‌তে হবে। তারপর—একি হে, একি তুমি না তোমার প্রেতাত্মা? পয়লা নম্বর

বাবু তুমি—এ কি বেশ তোমার! ধাঙ্গড়দের নায়ক হোয়েছ নাকি, না বল্‌শেভিকদের দলপতি? এ সব চারা ফারা হাতে কেন? ওটা আবার কি?

চন্দ্রিমার ইঙ্গিতে গুঞ্জন জিনিষগুলা লইয়া যায়, অপ্রস্তুত কিংশুক কি বলিবে ও কি করিবে ঠাহর না পাইয়া ঘামিয়া উঠিতে থাকে। কুমুদ তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলে, প্ল্যানটা কি তোমার শুনি। এ বেশে এখানে করা হচ্ছে কি? আজ কি কোথাও মালীসমাজের অধিবেশন ছিল, তুমি কি সেখানে বক্তৃতা দিয়ে এই প্রীতিউপহারগুলি নিয়ে এলে, কুমুদ হা হা করিয়া হাসিতে থাকে।

কিংশুকের দুরবস্থায় চন্দ্রিমার হাসি পায়। অতি কষ্টে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া চন্দ্রিমা বলে, ওঁর পাগলামির কথা আর বলেন কেন! চলুন এবারে বস্‌বেন, চলুন। চন্দ্রিমা অগ্রগামিনী হয়, কুমুদ কিংশুকের বাহুতে বাহু নিবদ্ধ করিয়া পশ্চাদনুগমন করে। কুমুদ অনর্গল বকিয়া বলে, কিংশুক কখনও অস্পষ্ট উত্তর দেয়, কখনও দেয়ই না, লজ্জায় তাহার সমস্ত মন সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সে কিছুতেই আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারে না। চন্দ্রিমা কুমুদ ও কিংশুককে চৌধুরী সাহেবের বসিবার ঘরে নিয়া বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কিংশুক পড়িল আরেক বিপদে। কৌচে বসিতে সে সাহস পায় না—যে বাড়ীতে সে ভৃত্য সাজিয়া আছে, সেখানে মুনিবের বসিবার আসনে সে বসে কেমন করিয়া অপর পক্ষে কুমুদ এ যাবৎ যখন ভিতরের কথাটা জানে নাই—তখন যাচিয়া তাহাকে এ কথাটা সে জানায়ই বা কি করিয়া দ্বিধায় দোলায়িত চিত্ত কিংশুক কুমুদের পাশে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে থাকে।

কুমুদ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলে, বোস না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কওয়া কি! মনে হয় যেন তুমি এখনই চলে যাবার উদ্যোগে আছ?

কিংশুক নিজের মাটিমাখা জামার আস্তিন দেখাইয়া বলে, এ নিয়ে আর এখানে বসে না!

ছেড়ে এসো তবে ওসব। যাও এক্ষুনি যাও। তুমি বেশ শান্ত ছেলে ছিলে হে, এমন হ'লে কবে থেকে? এখানে এ ভাবে কি করে থাক—বুঝ্‌তেই পাল্লুম না! লেডিজ্‌ রয়েছেন—তাঁদের সামনে এমনি বর্ব্বরবেশে বেরোও কি করে!

কিংশুক কোনো কথার উত্তর না দিয়া ঘরে গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসে। খানিক পরে দিগেন্দ্র লাহা নীরাকে লইয়া গাড়ীতে বাহির হইয়া গেল। চন্দ্রিমা গেল জল খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে। চিন্ময় কুমুদকে বলিল কাকা বাড়ীতে নেই, কাজেই অতিথি সৎকার আমি কর্চ্ছি। একটু চা খেয়ে যান।

টেবিলে মুখামুখী দুজন খাইতে বসে। লজ্জায় কিংশুক ওঠে কিংশুকের মত লাল হইয়া, খাদ্য ওর গলাধঃকরণ হয় না। না চাহিয়াও চন্দ্রিমার দৃষ্টি মুখের উপর সে অনুভব করে মনের ভিতর তাহার সব তাল গোল পাকাইয়া যাইতে থাকে। কুমুদের কথা কতক সে শুনিতে পায় কতক

পায় না। তাহার কেবলই ভয় হইতে থাকে পাছে বাড়ীর আর কেউ আসিয়া তাহাকে এ অবস্থায় দেখিয়া ফেলে। বাড়ীর ঝি চাকররা—কি চৌধুরী সাহেব নিজে কোনো দৈবে যদি আসিয়া পড়ে—কী তাহারা ভাবিবে!

চন্দ্রিকার দিকে চাহিয়া কুমুদ সহাস্যে বলে, মানুষের জীবনে কত রকম অবস্থা যে ঘটে—তা বলা যায় না। চিরকাল শুনে এসেছি 'স্বভাব যায় না মলে' কিন্তু আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি এখন এক জীবনেই মানুষ বদ্‌লে হরেক রকম হ'তে পারে। এই কিংশুকের লাহোর ইউনিভার্সিটিতে, ষ্টুডেণ্টস্‌ ইউনিয়নে দেখেছি এক চেহারা, ওদের বাড়ী কৌমুদীলজে দেখেছি এক চেহারা—আর আজ আপনাদের বাড়ীতে ওর দেখ্‌ছি আরেক চেহারা! সেই কিংশুক বলে ওকে আর চিন্‌বার উপায় নেই! যেই ওর কথার চোটে কথা কইতে পারে নি কেউ—সেই আজ কথা কইতেই ভুলে গেছে।

কুমুদ মুক্তকণ্ঠে হাসে। সে যত হাসে, কিংশুক তত ম্রিয়মান হইয়া ওঠে। চন্দ্রিমার মুখ দেখায় উজ্জ্বল। কিংশুক ভাবে—একি গগন-পথ-ভ্রষ্ট অস্তরাগের আলো?

(১৬)

কুমুদ চলিয়া গেলে কিংশুক নিজের ঘরে আসিয়া মাথা গুঁজিয়া বসিয়া থাকে। পায়ে তাহার পাম্পশু, গায়ে মুর্শিদাবাদী সিল্কের পাঞ্জাবী, পরণে শান্তিপুরী ধুতী। একদিন সে আত্মরক্ষা করিয়াছে তাহার অতীতকে গোপন করিয়া, আজ তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইল তাহার বর্ত্তমানকে গোপন করিয়া। বোঝা তাহার ক্রমশঃ ভারী হইয়া উঠিতেছে আর সে ইহা বহিতে পারে না!

ক্লান্ত কাতর মন তাহার ব্যাকুল কণ্ঠে শুধায়—কতদিন, আর কত দিন এ মিথ্যা চাতুরী আশ্রয় করিয়া এই দীনতায় তাহার দিন যাপন করিতে হইবে! এ বিপুল বিশ্বে তাহার আর কি কোনো অবলম্বন নাই, কর্ম্মচেস্টা নাই, উঠিয়া দাঁড়াইবার কোনো সোপান বা পথ নাই? হীনতার দুস্তর পঙ্কে এমনি করিয়া তিলে তিলে মগ্ন হইয়াই সে মরিবে? তাহার সকল আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যমের এই কি পরিসমাপ্তি? সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগে গৃহের স্মৃতি। তুষারমরু গলিয়া তাহার অন্তরে তরঙ্গ বিস্তার করিতে থাকে—চক্ষে তাহার ধারা নামে।

সহসা মনে হয় কে যেন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চরণে তাহার শব্দ নাই, ভূষণে ঝঙ্কার নাই, অঞ্চলে চাঞ্চল্য নাই, রাত্রির আকাশ যেমন করিয়া নীরবে অগণিত তারকা চক্ষু মেলিয়া তিমিরাচ্ছন্ন ধরণীর দিকে চাহিয়া থাকে,—সন্ধ্যার ঘনায়িত অন্ধকারের মধ্য দিয়া সে তেমনি করিয়া করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু কিংশুক ধীরে মাথা ওঠায়।

চন্দ্রিমা তেমনি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকে।

শশব্যস্তে কিংশুক দাঁড়ায়, মুখ ফিরাইয়া চোখের জল জামার আস্তিনে মুছিয়া ফেলে। কি সে বলিবে, কি করিবে ঠাহর করিতে না পাইয়া অভিভূত হইয়া নির্ব্বাক হইয়া থাকে।

চন্দ্রিমা জিজ্ঞাসা করে সুইচ্‌টা কোন্ দিকে? কিংশুক তাড়াতাড়ি বাতি জালিয়া দেয়। চন্দ্রিমা হাসিয়া বলে, বসুন, ব্যস্ততার কোনো দরকার নেই। এখানেই এলুম কেননা, ওখানে যদি বসি, কেউ না কেউ আসবেই—আপনি স্থির হয়ে থাক্‌তে পার্‌বেন না।

কিংশুক কোনো দিকে না চাহিয়া ধপ্ করিয়া তাহার বিছানায় বসিয়া পড়ে। চন্দ্রিমা টেবিলের নিকট হইতে চেয়ারটা টানিয়া নিয়া বসে, তাহার পর কোনো ভূমিকা না করিয়া বিনা আড়ম্বরে বলে, আপনার এ অজ্ঞাতবাসের কারণ কি, আমি শুন্‌তে এসেছি।

কিংশুক মুখ তুলিয়া চন্দ্রিমার দিকে তাকায়। আশ্বাসে ওর মন ভরিয়া ওঠে, সঙ্কোচ শঙ্কা যায় দূর হইয়া। এ দীর্ঘকাল ধরিয়া ও যেন এই আহ্বানখানির জন্য মহাশূন্যে কাণ পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

একটুখানি হাসিয়া কিংশুক বলে, মালশুদ্ধু ধরা পড়েছি, যখন সাক্ষী পর্য্যন্তও পাওয়া গেছে, তখন স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় কি কুমুদের কাছে আমার পরিচয় ত পেছেনই, শুধু অজ্ঞাতবাসের কারণটা অজানা। সে অতি সাধারণ ঘটনা। আমার মা মারা গেছেন—দুবছর হোল। ইতিমধ্যে বাবা আমার অজ্ঞাতসারে বিয়ে করে বউ নিয়ে এলেন। ঘটনাটা অন্যের তেমন কিছু নয় হয়ত—কিন্তু আমার কাছে ও বাড়ীতে থাকা আর অসম্ভব। এর আগে মা শুধু দেহ ত্যাগ করেছিলেন—তিনি মিশে ছিলেন ও বাড়ীর মাটিতে দেয়ালে, ঘরে দরজায়, উঠানে আঙ্গিনায়—ওর আকাশে বাতাসে ওর প্রত্যেকটি জিনিসে—ওর অণুতে কণাতে—কিন্তু সেদিন মায়ের প্রকৃত মৃত্যু হোল। অসহ্য সে দৃশ্য—অসহ্য সে যন্ত্রণা দিনের পর দিন মুখ বুজে তাই দেখা আর মাথা পেতে স্বীকার করে নেওয়া—আমার সাধ্যের অতীত, শক্তির অতীত।

নূতন স্ত্রীকে নিয়া বাবা যখন বাড়ী এলেন,—আমি ছিলুম, দরজায় দাঁড়িয়ে। বাবা ডাক্‌লেন-বল্লেন—তোর নতুন মা, পরিচয় করে নে। সহ্য হোল না—কাণে যেন কে জ্বলন্ত শীষা ঢেলে দিল, বেরিয়ে পড়্‌লুম সেদিনই বাড়ী ছেড়ে……। কিংশুক আর বলিতে পারে না, কতকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। ঘরের পাশে দেবদারু গাছটা বাতাসে শির্ শির্ করিয়া ওঠে, পূবে এক পল্লব নীড় হইতে কোন অচেনা পাখী ডাকে। রাস্তা দিয়া কে হাঁটিয়া যায়, তাহার পায়ের শব্দ শোনা যায়।

গলা পরিষ্কার করিয়া কিংশুক বলে, ব্যাপার দাঁড়াল শেষে বেশ সঙ্গীন। বিছানায় শুয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে যে জগৎকে দেখেছি—সেই জগতে বেরিয়ে এসে যখন দাঁড়ালুম,—তখন দেখি তার চেহারা আরেক রকম—এবং তার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয়ই নেই। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে লড়্‌বার মত মনের অবস্থাও ছিল না, রাস্তাও ছিল না—কাজেই যা হাতের কাছে পেলুম তাই নিলুম।

কি করে যে আমি কাজ কোরেছি তা যদি আপনি জান্‌তেন। শুধু বই কিনে কিনে তারি

জোরে আন্দাজী সব চালিয়েছি। দক্ষতা বা যোগ্যতা দুটার একটাও আমার ছিল না, এ সম্বন্ধে আপনাকে আমি নির্ঘাত ঠকিয়েছি। চন্দ্রিমা ঈষদ্‌হাস্যে বলে, যা ঠকিয়েছিলেন,—সুদে আসলে তার শোধ দিয়েছেন ত!

কিংশুক স্মিতমুখে বলে, অনেস্ট্‌লি এটুকুই বল্‌তে পারি।

চন্দ্রিমা চুপ করিয়া থাকে, চোখের পাতা তাহার নীচু হইয়া যায়, কপোল ওঠে রক্তিম হইয়া। তবু জোর করিয়া বলে, তারপর!

সেইটাই ত এখন ভাব্‌বার কথা। অজ্ঞাতবাস ত অকস্মাৎ অবসান হয়ে গেল, এর পরের অধ্যায়ে কি হবে কে জানে! এখন এল সেই অনাগতের ধ্যানের পালা!

চন্দ্রিমা উসখুস্ করিতে থাকে, যেন সে কিছু বলিতে চাহিতেছে, অথচ তাহা বলিতে পারিতেছে না। অবশেষে বলে, আপনার কাছে যদি কেউ কিছু ভিক্ষা চায়—আপনি কি করেন?

বিস্ময়ভরা দুই চক্ষু মেলিয়া কিংশুক বলে—আমার কাছে ভিক্ষে চাইবে কে?

ধরুন, আমি-ই যদি চাই।

কিংশুকের মাথা ঘোলাইয়া যায়, অবিশ্বাসের সঙ্গে সে বলে,—আপনি চাইবেন!

চন্দ্রিমা হাসিয়া বলে, বিশ্বাস হচ্ছেনা? ভাল। চাইলে ত অস্বীকার কর্বেন না—কথা দিন্ আগে।

কিংশুকের মুখে কথা জোগায় না, নীরবে সে চাহিয়া থাকে।

চন্দ্রিমা বলে, আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন্,—আমার অনুমতি ছাড়া আপনি এখান থেকে কোথাও চলে যাবেন না।

গভীর আবেগে কিংশুকের চক্ষু আসে বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া। বলে, আমি তা'লে আপনার বন্দী?

ধরা যখন পড়েছেন, তখন কিছু শাস্তি পেতেই হবে। আমি শুধু ভাবি এতদিন আপনি এ অবস্থায় রইলেন কি করে! চেষ্টা কর্‌লে যা হোক করে যেমন তেমন একটা কাজ কি আপনি পেতেন না?

তা পেতে পার্ত্তুম বোধ হয়।

চেষ্টা করেন নি আপনি!

না।

কেন?

মনে ও কথা উদয় হয় নি।

উদয় হয় নি? কি আশ্চর্য্য লোক আপনি! আমার কিন্তু সর্ব্বদাই মনে হয়েছে—বলিয়াই চন্দ্রিমা নিজের অনবহিত স্বীকারোক্তিতে লজ্জিত হইয়া থামিয়া যায়।

কিংশুক জিজ্ঞাসা করে, কি মনে হয়েছে?

চন্দ্রিমা সে কথার উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, যাক্, আজ থেকে আপনি বৃহন্নলা নন্, আপনি সব্যসাচী—এইটুকুই শুধু আমার বলার ছিল।

চন্দ্রিমার সঙ্গে সঙ্গে কিংশুকও উঠিয়া দাঁড়ায়।

হঠাৎ চন্দ্রিমা 'গুড্‌নাইট' বলিয়া কিংশুকের দিকে হাত বাড়াইয়া দেয়। কিংশুক থর-কম্পিত হৃদয়ে হাতখানি গ্রহণ করে। সুরে সুরে শত বীণা তাহার চারিদিকে রণিত হইয়া ওঠে, মাটির পৃথিবী অপার্থিব রূপে ধারণ করে। আত্মহারা কিংশুক হাতখানি ছাড়িয়া দিতেও ভুলিয়া যায়। চন্দ্রিমার মুখ ওঠে রক্তিম হইয়া। আপনি সে হাত ছাড়াইয়া নিয়া ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া যায়।

ক্রমশঃ

গান

শ্রীবেলা দেবী

যেথায় আমি সুখের বাসা বাঁধ্‌বো জানি,
বিকায়ে ছিলাম স্বপনভোরে তরুণ হৃদয় খানি।
তারই কাছে পেলাম ছাড়া, দিলে নাকো প্রাণের সাড়া,
শুকাল আজ নয়ন ধারা নীরব হ'ল বাণী।
চোখের জলে বল্‌বো তারে আবার হ'লে দেখা,
চল্‌বো বেয়ে ব্যথার তরী অচিন দেশে একা,
কেন তুমি নদীর কূলে ডাকো মোরে মনের ভুলে,
নিয়েছি আজ বাঁধন খুলে ফির্‌ব না আর জানি।

'শরৎচন্দ্র'

শ্রীবিভা বক্‌সী

"এখনো স্তব্ধ হবার অবকাশ নেই তোমার, ফলশস্যবহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সমুখে আহ্বান কর্‌চে। দাঁড়িটানা সময় তোমার নয়। এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান কর্‌বে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি কর্‌তে থাক্‌বে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠ্‌বে তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিমাকাশে সর্ব্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক্‌।"

(শরৎ-বন্দনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের পত্র)

সাহিত্যে যাঁদের বড়ো নাম হয়—তাঁদের জীবন সম্বন্ধে লোকের থাকে অসীম কৌতূহল।

তাঁর জীবন সম্বন্ধে ও অনেক দুর্ণাম বাইরে থেকে আগে শোনা যেত। আপন দেশের লোক তাঁর ললাট কলঙ্ক-কালিমাতে লিপ্ত করেছিল। নানা পত্রে ও পত্রিকাতে তাঁকে কর্‌ত কটূক্তি—নানা সভায় কর্‌ত অসম্মান ও অপমান। তাঁর পুঁথির চরিত্র আলোচনা ক'রে যত কিছু চরিত্রহীনতার ও কদর্য্যতার আভাস লোকে পেত সবই তাঁর ওপর আরোপ ক'রে উপহাস কর্‌ত।

লোকের কাছে তাঁর বিগত জীবন রহস্যময় হ'য়ে উঠেছিল, এই জীবনের যা কিছু পরিচয় যা কয়েকজন লেখকের লেখাতে পেয়েছি তাই জানাব।

তাঁর সম্বন্ধে জনসাধারণের হীন ধারণার উল্লেখ ক'রে একস্থানে কোন একটী ছেলেকে তিনি বলেছিলেন, "দেখ, আমি লিখি কিন্তু বুড়োরা আমাকে গালিগালাজ করে। একজন লেখক আমার লেখা দেখে বলেছিলেন যে, শরৎ কি মাথা মুণ্ডু লেখে, ওর লেখা পড়্‌তে আমার ঘৃণা বোধ হয়। যখন আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, আপনি ক'খানি আমার লেখা বই পড়েছেন, তিনি বল্লেন, আমি একখানা ও পড়িনি। পরে অবশ্য তিনি আমার 'দেনা ও পাওনা' পড়ে বলেছিলেন শরৎকে এখন আমার নারায়ণজ্ঞানে প্রণাম কর্‌তে ইচ্ছে করে।'

এই রকমই হয়। লোকে যা' জানেনা যা' বোঝেনা তার সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাওয়াতেই অভ্যস্ত। গাল দেওয়াটা তখন ফ্যাশান হ'য়ে দাঁড়ায়।

এ ভাবটা কেটে গিয়েছে—আজ লোকে তাঁকে চিনেছে তাঁকে বুঝেছে এবং শ্রদ্ধা করেছে।

যারা প্রকৃত রসবেত্তা,—যদিও তাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প তারাই সেইসময়ে তাঁকে উৎসাহিত করেন। লোকের কটূক্তি বর্ষণের দিনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একটী পত্রে দিলীপকুমার রায়কে জানিয়েছিলেন "...প্রথম থেকেই আমি তাকে প্রশংসা করে এসেছি। অনেকে গল্প রচনাতে শরৎকে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ ব'লে থাকে তাতে আমার ভাবনার কারণ এইজন্যে নেই যে,

কাব্যরচনা সম্বন্ধে আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে কথা অতি বড় নিন্দুক ও অস্বীকার ক'র্তে পারবেনা।"

তাঁর সাথে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ও সুবিধে হয়নি। তাঁর গত জীবন অন্ধকার ছায়ায় প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। তাঁর ভিতর জান্বার কৌতুহল নিয়ে অনেক খোঁজ খুঁজি করে যা' কিছু জান্তে পেরেছি তাই প্রকাশ পাবে। লোকের মুখে ও অনেক কিছু শুন্তে পেয়েছি যা' এ লেখার অনেক কিছু সাহায্য করেছে।

মানুষের চতুর্দ্দিকের পরিবেষ্টনী সাধারণতঃ মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে, এবং জীবনে কর্ম্মে ও চিন্তায় তারই প্রকাশ হ'তে দেখা যায়। একটী জীবনকে জান্তে হ'লে সে যে আব-হাওয়ায় মানুষ তারই বিশেষ পরিচয় থাকা দরকার।

বাংলার বাইরে ভাগলপুরে তিনি মানুষ। সেখানে অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী পরিবার বাস ক'র্ত। তাঁর শৈশব এখানেই কাটে। তার ছোটবেলার যে চিত্র আমরা যে সম্মুখে পাই তাতে দেখি শিক্ষারম্ভ তাঁর সেই খানেই হয়। যেখানে তাঁর পাঠে মনযোগ ছিল,—খেলাতে ও তেমনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মার্ব্বেল খেলাতে তাঁর জুড়ি ছিলনা। মার্ব্বেল জিতে তিনি অকাতরে সবাইকে তা' বিলিয়ে দিতেন। কোন বস্তুর ওপর তাঁর যেন মমতাই ছিলনা। যেমন মার্ব্বেলে পাকা তেমনি লাড়ুতে। বাড়ীর কর্ত্তাদের অত্যাধিক শাসন ছিল, কিন্তু তার ভেতরেই তিনি তাঁর স্বল্প কয়েকজন আত্মীয় মিলে এক প'ড়ো ভূতের বাড়ীতে ব্যায়ামের আখ্ড়া খুলেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর দলের ভেতর অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন। তাঁদের দলের সবাই বিপদের সময় একটী রক্ষামন্ত্র জপ কর্তেন। সেই মন্ত্রটা 'সংসার-কোষ' নামক বই থেকে নেওয়া।

শরতের নির্ভীকতার আর একটা ঘটনা ঘটেছিল তা' এরকম,—'সংসার-কোষ' বই ঘেটে সর্পসম্মোহন বিদ্যে শরৎচন্দ্র বের করেন। বইখানিতে এ রকম লেখা ছিল যে, একহাত প্রমাণ বেলের শেঁকড় যদি কোন বিষধর সর্পের সুমুখে ধরা হয় তবে সেই সর্প মৃতবৎ মাথা নীচু ক'রে পড়ে থাক্বে। কিন্তু অসমসাহসিক শরৎচন্দ্র তা' প্রমাণ কর্তে গিয়ে কপাল জোরে বেঁচে গিয়েছিলেন। হয়ত তাঁর শৈশবের এই নির্ভীকতা যৌবনে উলঙ্গ সত্যপ্রকাশের সাহস এনে দিয়েছেন।

বাপ মা'র প্রভাব শিশুর জীবনে অনেক বেশী। মতিবাবু শরৎচন্দ্রের পিতা। তিনি খুব সাদাসিদে প্রকৃতির লোক ছিলেন। শিশুদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অসীম, চারুশিল্পের প্রতি তাঁর টান ছিল অফুরন্ত। তাঁর প্রধান অপরাধ এই ছিল যে, তিনি কোন দিনই লক্ষ্মীর বরপুত্র হ'তে পারেননি। সাহিত্যসেবাই তাঁর প্রধান এবং প্রিয়কাজ ছিল। তিনি বঙ্কিমের বইগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছিলেন—এমন কি তখনকার মাসিকপত্র 'বঙ্গ দর্শন' ও তাঁর নিকট চিরপরিচিত ছিল। মতিবাবু সমস্ত কাজেই হাত দিতেন কিন্তু সেগুলো সমাপ্তির দিকে ন ।

গিয়ে অসমাপ্তই র'য়ে যেত—কি যেন একটা অভাববোধ তাঁকে সর্ব্বদাই পীড়া দিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যা' বলেছেন তা' এই—"......মেঘের বিদ্যুৎ যেমন মানুষের কাজে আসেনা ক্ষণেকের জন্য চোখ ধোয়াইতে পারে মাত্র, মণিদাদার প্রতিভাও বিশেষ কোন কাজেই আসে নাই। তিনি কবিতা আরম্ভ করিয়া কোন দিন বোধকরি শেষ করেন নাই! ভারতবর্ষের প্রকাণ্ড মানচিত্র আঁকিতে সুরু করার সময় তাঁহার উৎসাহের মূর্ত্তি বেশ মনে পড়ে, কিন্তু তাঁর শেষ করিবার ধৈর্য্য রহিলনা! তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি কিছুরই অভাব ছিলনা; অভাব ছিল, সেইগুলিকে কর্ম্ম কেন্দ্রে নিয়োজিত করিয়া কিছু একটা গড়িয়া তোলা।

তাঁহার অসমাপ্ত লেখাগুলি পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই তাই সে সম্বন্ধে মতামত দিতে পারিনা। শরৎচন্দ্রের নিকটে শুনিয়াছি যে, সেইগুলি পাঠ করিয়া তাঁর তখনই মনে হইত,—সবই আছে, কিন্তু যেন কিসের অভাব!

কোন কাজ শেষ করিবার ধৈর্য্য যে ছিলনা, তাহার কারণ, বোধ করি তাঁহার আদর্শ ছিল উচ্চাঙ্গের, যাহা মনে করিতেন, কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া অতৃপ্তির তিক্ততায় সেটিকে অচিরে পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিয়া যাইতেন।"

(কল্লোল—১৩৩২, ভাদ্র)

তাঁর মা'র সম্বন্ধে এই জানা যায়,—তিনি অতি ভক্তিমতী, বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানী ছিলেন। পরকে আপন করিবার তাঁর আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। হিংসা, দ্বেষ তাঁর মনে কখন ও স্থান পেতনা। মাঝে মাঝে তিনি শরৎবাবুদের মজ্‌লিসে সাহিত্যালোচনা ক'রতেন—অবশ্য তাঁর যখন সাংসারিক গৃহকর্ম্ম থেকে অবসর জুট্‌ত।

এই বাড়ীর আবহাওয়ার জন্য হয়ত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের দিকে ঝোঁক গিয়েছিল—এইখানেই হয়ত যে বীজ রোপিত হয়েছিল কালে তা' ফুলে ফলে শোভিত হয়েছে! শৈশব ও কৈশোরের পালা শেষ ক'রে শরৎচন্দ্র ভাগলপুর থেকে কিছুদিনের জন্য বিদায় নেন। এই সময় তাঁদের বৃহৎ পরিবারের নানা অশান্তি আসে এবং সেজন্য বাধ্য হয়েই তাঁদের ভিন্ন হতে হয়। তারপর শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে আবির্ভূত হন—প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছু আগে। এখন তিনি সুরোদস্তুর নতুন সাহিত্যিক—মাথায় তাঁর লম্বা চুল এবং চালচলনে সাহিত্যিক ভাবভঙ্গি। তখনকার যে ছবিটি পেয়েছি তা' এরূপ—

"...বাহিরের বাড়িতে জ্যেঠামহাশয়ের যে পূজার ঘরটি ছিল—শরৎ সেইখানে নিজের বাসা বাঁধিয়া ছিল। ঘরখানি খুব ছোট, একটী দড়ির খাট ও টেবিল রাখিবার পর আর নড়িবার চড়িবার স্থান ও ছিলনা। পূর্ব্বের দিকে জানালা, উত্তর-পশ্চিমে ঘরে ঢুকিবার দরজা। টেবিলের উপর কেতাবদান; সকলের উপর তাকে গোটা কয়েক কাফির টিন সাজান ছিল।

টেবিলের উপর একরাশি খাতা-পত্র! তাহাতে ছোট ছোট অক্ষরে শরতের হাতের

লেখা। মনে আছে, খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে সেদিন আমি তার ঘরে গিয়া বসিলাম। সে প্রসন্নমনে তার লেখা-পড়ার কথা আরম্ভ করিয়া দিল।

সর্ব্বপ্রথমে কফির পাত্রগুলি দেখাইয়া বলিল, যদি পাশ করি ত' ওরই জোরে।

কেন?

দেশে থাক্‌তে কি কিছু করে ছিলাম? এখানে এসে দেখি সবাই দিচ্ছে পরীক্ষা। তখন উঠে প'ড়ে লেগে গেলাম, কফি খেয়ে সমস্ত রাত জেগে পড়্‌লাম, আর প্রসাদীর সেবা কর্‌তাম। প্রসাদীর তার বড় মামার একমাত্র কন্যা। সেই বৎসর কালাজ্বরে তার মৃত্যু হয়।

পাশ হবে ত?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দেখি কি হয় এখন। তার চোখ দুইটীর মধ্যে কিন্তু— "তাতে বোধ করি কোন সন্দেহ নেই"। এমনি একটী কথাই প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু মুখে সে বিনয় করিয়া বলিল, বড় শক্ত, কি জানি কপালে কি আছে!

শরৎকে সেই দিন আমি প্রথম তামাক খাইতে দেখিলাম। তামাক-সেবন যে মহা অপরাধ এমনি একটা সংস্কার বোধকরি শিশুকাল হইতে আমরা পোষণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছিলাম! তাই আমার মনে বড় কঠিন ধাক্কা লাগিয়াছিল! কিন্তু কিছু বলিতে সাহস হয় নাই। সেদিন সে এক মনে তামাক খাইতে লাগিল এবং আমি টেবিলের খাতাগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম। একখানা খাতার মলাটের উপর স্পষ্ট বড় অক্ষরে লেখাছিল "কাক বাসা।" উপন্যাস লেখার এই বোধ করি আদি চেষ্টা। এখানি পড়িবার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু সে সময়ে এখানি লিখ্‌তে তাহাকে বহু সময় ব্যয় করিতে দেখিয়াছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত—সে মহা-নিবিষ্ট মনে লিখিয়াই চলিয়াছে।"

তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তেজনারায়ণ কলেজে ভর্ত্তি হন। সেই সময়ে তাঁর সাহিত্য-চর্চ্চা চল্‌ছিল এবং বোধহয় এ সময়েই "কাক বাসার" তৃতীয় খাতা লেখা হয়। এ সময় তিনি গ্যানোর ফিজিক্স ও ইংরাজী উপন্যাস পড়্‌তেন। মিসেস্ হেনরি উড্ ও ডিকেন্সের বই পড়্‌তে তিনি খুব ভালবাস্‌তেন। এই সময় রাজুর সঙ্গে তার আলাপ হয়। শরতের জীবনে রাজুর একটী বিশেষ স্থান আছে। প্রায়ই রাজুর সঙ্গে তিনি ডিঙ্গিতে উধাও হ'তেন এবং ফির্‌তে রাত হ'ত।

'শ্রীকান্তে ইন্দ্রনাথের চরিত্র সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত নয়—এই বাক্যটী আমরা তাঁর বন্ধু শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে পেয়েছি। এই চরিত্রটীতে বাস্তব এবং কল্পনার এক অপূর্ব্ব সমাবেশ হয়েছে। শরৎচন্দ্রের জীবনে ইন্দ্রনাথের প্রভাব অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তিনি বলেছেন……"ইন্দ্রনাথ একটী কাল্পনিক নাম। ইন্দ্রনাথকে আমরা রাজেন্দ্র বলিয়া জানি। তাহার ডাক নাম ছিল রাজু। ……তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশা সম্ভব হয় নাই; তবে দূরে থাকিয়া তাঁহার বীরত্বের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে এবং আনন্দে বিমোহিত হইতাম মাত্র।"

(কল্লোল—কার্ত্তিক, ১৩০২)

আমি এখানে রাজুর বীরত্বের বিষয় কিছু বল্‌ব—একটী ইতিহাস দিলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে,—কারণ 'শ্রীকান্ত' পড়ে আমরা তাঁর বিষয় খুব ভালভাবে জান্‌তে পারি।

একদিন কয়েকজন মহিলা গঙ্গার ঘাটে স্নান ক'রছিলেন এমন সময় কয়েকজন খোট্টা এসে জলে নাম্‌ল। মহিলাদের স্নান-আহ্নিক দেখে তারা পরস্পর হাসা-হাসি ও জল ছিটাছিটি ক'রতে লাগল। ঘাটে কয়েকজন বয়স্ক লোক ছিলেন কিন্তু তাঁরা এগুলো দেখেও দেখ্‌লেন না বা প্রতিবিধানের চেস্টা করলেন না। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে রাজু এসে উপস্থিত হল। আর তক্ষুনি সেই হিন্দুস্থানীগুলোকে জলে চুবিয়ে নাস্তানাবুদ করে ছাড়্‌ল—শেষ: পর্য্যন্ত তারা ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছিল। শরৎবাবুর এরূপ বাস্তব জিনিষকে রূপ দেবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখে আমরা অবাক্ হয়ে যাই।

তিনি নিজেই তাঁর জন্মদিনের প্রতিভাষণে এই কথাগুলো বলেছিলেন, এখানে তাই উদ্ধৃত ক'রে দিলাম—

"......এম্‌নি দিনে একজন মনীষীকে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি; তিনি স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন আমাদের ছেলে বেলায় স্কুলের শিক্ষক। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এই নগরেরই পথের ধারে। ডেকে বল্লেন, শরৎ তোমার লেখা আমি পড়িনি, কিন্তু লোকে বলে সেগুলো ভালই হচ্ছে, একদিন তোমাদের আমি পড়িয়েছি। আমার আদেশ রইলো যা' সত্যিই জানোনা তা' কখনও লিখোনা, যাকে যথার্থ উপলব্ধি করোনি, সত্যানুভূতিতে যাকে আপন ক'রে পাওনি, তাকে ঘটা ক'রে ভাষার আড়ম্বরে ঢেকে পাঠক ঠকিয়ে বড় হ'তে চেয়োনা।"

তাই আমরা তাঁর লেখা পড়ে জান্‌তে পাই যে, তিনি শুধু কল্পনা-প্রসূত চিত্র পাঠক পাঠিকাদের সুমুখে ধরেন না—অন্ততঃ এর কিছু সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন বা সংসারে এর কিছু কিছু আভাষ পেয়েছেন।

তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল—এর দু' একটী উদাহরণ আমরা তাঁর কোন বন্ধুর লেখা থেকে পাই। ঘটনাটি এই যে, কোন পরীক্ষার একদিন পূর্ব্বে তিনি পরীক্ষার নোটিশ পান—তখন তাঁর কিছুমাত্র পড়া ছিলনা—কিন্তু তাঁর একাগ্রতা এম্‌নি ছিল যে সেই রাত্রেই তিনি প্রকাণ্ড বইখানি শেষ করে আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। আর সেই পরীক্ষাতে তিনি এত ভাল করেন যে অধ্যাপক পর্য্যন্ত বিস্ময়াবিস্ট হয়েছিলেন। এখনও তিনি তাঁর স্মৃতির কথা কোন কোন লোককে এমন কি কোন কোন সভাসমিতিতে ও বলে থাকেন। তিনি বলেন যে, যা' তিনি গল্পে লেখেন তার Details আগে থেকেই ঠিক হয়ে তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে থাকে। এই তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি উত্তর কালে তাঁর সাহিত্য সাধনার কতখানি সহায়ক হ'য়েছিল তা' এর থেকে বোঝা যায়। তাঁর জীবনের যতকিছু স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা তাঁর মনের ভেতর ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়েছিল তাই আজ সাহিত্যাকাশে নানারূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

এই সময় শরৎচন্দ্র লোকচক্ষুর অন্তরালে সাহিত্যসাধনা ক'র্‌ছিলেন। এখানেই তাঁর কলেজপড়া সাঙ্গ হয়, প্রথম কারণ ফিএর অভাব, এবং দ্বিতীয় কারণ বোধ করি তাঁর মায়ের মৃত্যু। মায়ের মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র ভাগলপুর থেকে খঞ্জনপুরে চলে যান, এবং সেখানে গিয়ে তিনি একটী চাকুরীতে ভর্ত্তি হন। কলেজে থাক্‌তেই তিনি 'অভিমান' নামক এক উপন্যাস লেখেন—সেই লেখা পড়ে তাঁদের তখনকার কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় খুব প্রশংসা করেন এবং এ কাজে ব্রতী হবার জন্য উৎসাহ দেন। এখনো সে বই অপ্রকাশিত। শুন্‌তে পাওয়া যায় 'অভিমানে' 'ইষ্টলীনের' ছায়া আছে।

এ সময় তিনি দৈনন্দিন আফিসে গিয়ে তাঁর চাকরীর কাজ সেরে আস্‌তেন—কিন্তু তাঁর মন প'ড়ে থাক্‌ত সেই সাহিত্যসাধনার ভেতর। ঠিক এম্‌নি সময় তাঁর চলার পথের যাত্রী দু'জন জোটে—একজন পুঁটু (শ্রীবিভূতি ভট্ট), অপরটী বুড়ী (শ্রীনিরুপমা দেবী)।

তাঁদের সাহিত্যসভার জন্ম হয় এই সময়েই। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্ট, শ্রীনিরুপমা দেবী, শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—এঁরাই ছিলেন এ সভার সভ্য। সভাটি উন্মুক্ত আকাশের তলে, নিস্তব্ধ প্রান্তরে প্রতি শনি রবিবারে বস্‌ত। প্রত্যেকেই আপন আপন লেখা পাঠ কর্‌ত কেবল শরৎবাবু নিরুপমা দেবীর লেখাটি পাঠ কর্‌তেন। সভাপতি প্রত্যেকটী লেখার সমালোচনা ক'রে নম্বর দিতেন। এখান থেকে একটী মাসিক 'আলো' নাম নিয়ে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত ক'রে বেরোত কিছুদিন পর এঁদের এক লেখকের মৃত্যুতে মাসিকটীর নাম হ'য়েছিল 'ছায়া'। কালিমা ঢাকা শরীরটিতে দুঃখের চিহ্ন বহন করিলেও এই পত্রিকা অন্যের সমালোচনার কোনো দিন ত্রুটি করে নি। ওদিকে কল্‌কাতা ভবানীপুরেও একটী সাহিত্যসমিতির প্রতিষ্ঠান হয় সেখানে 'তরণী' নাম নিয়ে একটী মাসিক বেরোত। সেটা সব সময়ই উপরি উক্ত পত্রিকাটির সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর্‌ত। এতে দু'পক্ষেরই অল্পবিস্তর লাভ হয়েছিল। ভবানীপুরে যাঁরা লিখতেন যেমন, শ্রীযুত সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সাহিত্যিক হিসাবে বেশ নাম করেছেন। আর ভাগলপুরে যাঁরা লিখ্‌তেন তাঁদের ভেতর শরৎচন্দ্র ঠিক শরতের চাঁদ হয়েই লোকসমক্ষে প্রকাশ হ'য়ে পড়েছেন—যিনি এখন শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী নির্ভীক ঔপন্যাসিক ও অপরাজেয় কথাশিল্পী ব'লে সর্ব্বজন বিদিত।

পরে 'ছায়ার' অনেক লেখা 'যমুনা' মাসিকপত্রে ছাপা হ'য়েছিল—তা'তে শরৎচন্দ্রের দু'তিনটি গল্প ও প্রবন্ধ ছিল। সে সময়ের সাহিত্যসাধনার ইতিহাস এই—(এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না) প্রথমে 'কাকবাসা' লেখা সুরু করেন সে সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। তারপর 'অভিমান' এটা কলেজ প্রসঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে। এরপর 'পাষাণ'—বইখানি সুরেন গাঙ্গুলী মশা'য়ের কাছে ছিল—এখন কোথায় তার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তারপর লেখা হয় 'বাগান' তিনখণ্ড। প্রথম খণ্ডে ছিল

কয়েকটী গল্প 'বোঝা', 'কাশীনাথ' ও 'অনুপমার প্রেম'। দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল, .'কোরেল', 'বড়দিদি' ও 'চন্দ্রনাথ' এবং তৃতীয় খণ্ডটী 'দেবদাস'! 'শুভদা' বলে আর একখানি অসমাপ্ত বই এসময়ে লেখা হয়।

অন্যদিকেও তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য দেখা যেত। তিনি ভাগলপুরে সঙ্গীত ও অভিনয়ে সবাইকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছিলেন—এম্‌নি ছিল তাঁর প্রতিভা।

তাঁর সত্যপ্রকাশের সাহস এবং সংস্কারবিহীনতার মূল খুঁজ্‌তে গেলে দেখা যায় যে, তিনি এরূপ ভাবের আবহাওয়ার মধ্যে গড়ে উঠেছিলেন—কোন ক্লাবের সাহায্যে,—যা'তে করে তাঁকে সংস্কারবিদ্রোহী হ'তে বাধ্য করা হয়েছিল। এই ক্লাবটির নাম ছিল 'আদমপুর ক্লাব'। শরৎচন্দ্র এর প্রধান না হলেও অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন! তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, গোঁড়ামীর উচ্ছেদ সাধন করা—সমাজের সকল আইনকানুন, বাধা-বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করা। এসব ছাড়া এই দলের আরও প্রয়োজনীয় কাজ ছিল—এখানে শুধু বইপড়া বা নাট্য অভিনয় হোত না—শারীরিকচর্চ্চাও করা হ'ত। এজন্যে তাঁদের লাঞ্ছনাও কম ভোগ কর্‌তে হয় নি। তাঁরা মরা পোড়াতেন ব'লে ঘরে ঘরে দলাদলি সুরু হ'য়ে গিয়েছিল—এমন কি তাঁদের একঘরে মতও করা হয়েছিল। এরকম একটা ঘটনা শোনা যায় যে তিনি কোন বাড়ীতে পূজোপলক্ষে পরিবেশন কর্‌তে গিয়ে তাঁকে সেই সময় পতিত ব্রাহ্মণ ব'লে অপমান ও নির্য্যাতন করা হয়েছিল। এসব আবহাওয়ার মধ্যে যাঁরা মানুষ তাঁরা যে 'পল্লীসমাজ' ও 'চরিত্রহীন' লিখ্‌বেন না—সেই ত আশ্চর্য্য।

ভাগলপুর বাসের পালা শেষ হ'লে তাঁর কিছুদিন ভবঘুরে জীবনযাত্রার সুরু হয়—তার কোন ইতিহাস নাই। শরৎবাবুর জীবনের এই অংশটী প্রায় অজ্ঞাতবাসেরই মত, কোন চিহ্ন কি কি কোন ইঙ্গিত এর পাওয়া যায় না। তাঁর সম্বন্ধে যিনি জান্‌তেন—সেই সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় মশাইও আর কিছু লেখেন নি, তবে তাঁর বাংলাসাহিত্যের আকস্মিক এবং বিস্ময়কর আবির্ভাব সম্বন্ধে গিরীণ গঙ্গোপাধ্যায় যা' লিখেছেন তা এই,—

"...বাণীর যে মন্দিরে নিয়মিতই চল্‌ছে এই উৎসব; সেখানে যে ভাগ্যবানগণ প্রবেশের অধিকার পেলে তার মধ্যে একজন শরৎচন্দ্র। বছর বারো কি তেরো আগে বাংলা-দেশ এর নামও জান্‌তোনা, এবং এই সত্যিকার ভব-ঘুরেটি ঘুর্‌তে ঘুরতে ভবের যে স্থানে পৌঁচেছিল, সেখানে আর যাই সুপ্রাপ্য হোক বাংলাসাহিত্য নয়। গুটি দু'তিন লোক জান্‌ত এর প্রতিভার মর্ম্ম, এবং তারাই তার তখনকার লিখিত অযত্ন বিক্ষিপ্ত এইগুলি সযত্নে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে! প্রতিভার প্রতি এমন অবহেলা আর কোনদিনই দেখিনি।

সেদিনকার এই বাহিরের আলোক-ভীরু লোকটীর 'নারীর মূল্য' বেরোলো ছদ্মনামে, এবং বাংলার এক মাসিকে যখন শরৎচন্দ্রের একান্ত অনিচ্ছায় কিন্তু তার সেই গুটি দুয়েক বন্ধুর অবাধ্যতায় 'বড়দিদি' বেরোলো, সেদিন এক মুহূর্ত্তেই বংলাদেশ চিনেছিল তার ভেতর কতখানি প্রতিভার ছাপ পড়েছিল।

তারপর ঘট্‌ল একটা অত্যন্ত পার্থিব ঘটনা। সাহিত্যের এই রসিকটী চাকুরী পেয়েছিল, রেঙ্গুনের সরকারী হিসাবের দপ্তরে অর্থাৎ একাউন্টেট্‌ জেনারেলের আপিসে! সাধারণের নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ কোনও কারণে হয়ে গেল ছোট সাহেবের সঙ্গে ঘুসোঘুসি, এবং তার ফলস্বরূপ কিছুদিন পরে শরৎকে সেই চাকুরীতে ইস্তাফা দিতে হ'ল! এমনি করে বহু চেষ্টার পর ভগবান এই অবাধ্য ভবঘুরেটীকে অবশেষে ফেরালেন তার ঘরের পানে।

তারপর এই বারো তেরো বৎসরে বাঙ্গলার সাহিত্যনদীতে শরৎচন্দ্র রসের কি বাণই না ডাকালে! বই এর পর বই, লেখার পর লেখা, উপন্যাসের পর উপন্যাস! বাংলার পাঠকের দল তাদের সাদরে গ্রহণ কর্‌লে, শরৎচন্দ্রের বইএর জন্য, লেখারজন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কোন বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক তাঁর জীবিতাবস্থায় বইএর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এত আদর পেয়েছেন কিনা জানিনা। এ যেন পড়ে গেল একেবারে উৎসবের মেলা, আনন্দের হুড়াহুড়ি। হোলির দিনে ফাগের রঙ্গে আকাশ বাতাস একেবারে লালে লাল হয়ে উঠ্‌ল। (কল্লোল—১৩৩২)

সুদূর বর্ম্মা দেশে অনেকদিন কাটানোর পর শরৎচন্দ্র ফির্‌লেন ঘরে। নিজের শক্তির ওপর এতটা ঔদাসিন্য আমাদের সাহিত্যে বিরল। তারপর কবি বাইরণের মত তিনি এক নির্ম্মলদিনে জেগে উঠে দেখ্‌লেন যে তিনি নাম করেছেন এবং যুগপৎ দুর্ণাম ও করেছেন। দুর্ণাম ও নামপ্রচারের যথেস্ট সাহায্য করে এটা অতি সত্য কথা। এসময় শুনি তিনি বাসা বেঁধেছিলেন শিবপুরে এখানে অনেকদিন তিনি কাটিয়ে যান।

এখানকার জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাষ শ্রীযুত সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখার ভেতর পাওয়া যায়—তিনি 'কালিকলমে' এ সম্বন্ধে লিখেছেন। আর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীমনীন্দ্ররায়ের লেখাতেও পাওয়া যায়। তিনি 'নবশক্তিতে' এ সম্বন্ধে কিছু লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের কুকুর প্রীতি একটা অপরূপ ব্যাপার। সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ভেলী কুকুরের গল্প সাহিত্যে বিশেস্ট জায়গা নিয়েছে। যারা কালি কলমে এই গল্প পড়েছেন তারাই জানেন। হয়ত তাঁর এই পশুপ্রীতি থেকে 'মহেশ' গল্পটীর উৎপত্তি। পশুর প্রতি নিবিড় ভালবাসা এই স্বল্পদেহ গল্পটীতে সুন্দরভাবে ধরা দিয়েছে। আর একটী কুকুরের কথা সম্বন্ধে শ্রীমনীন্দ্র রায় মহাশয় লিখেছেন—এ কুকুরটিকে তিনি এত ভালবাসতেন যে, এই কুকুরটী মারা যাওয়াতে প্রিয়জনের মৃত্যুর মত মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। কুকুরটীকে চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালেও পাঠানো হয়েছিল। এর জন্য শরৎচন্দ্রকে ইন্‌জেক্‌শন্ নিতেও হয়েছিল। (যেহেতু এই কুকুরটী তাঁকে কাম্‌ড়ে দিয়েছিল) শোনাযায়, এই কুকুরটী তাঁর একটী মূল্যবান লেখাও ছিঁড়ে ফেলে দেয় তবু শরৎচন্দ্র একে কোন শাস্তি দেন নি। কেবল বলেছিলেন, ও জানে না।

তারপর এই তথাকথিত অশ্লীল সাহিত্যের গুরু শিবপুর থেকে এসে রূপনারায়নের তীরে বাস কচ্ছেন। এটা নিতান্ত পাড়াগাঁ। এখানে ঠিক পাড়াগেঁয়ে জীবন তিনি যাপন কর্‌ছেন।

এখানে তাঁর একটী লাইব্রেরী আছে—তিনি পড়েন বেশী, লেখেন অল্প। পাড়াগেঁয়ে লোকেরা তাঁর কাছে আসে। তাদের সঙ্গে দাবাপাশা খেলেন। তাদের সুখদুঃখের কথা শোনেন ও প্রতিকারের চেষ্টা করেন। এমনি যায় তাঁর সময় সহরের পঙ্কিলতা থেকে অনেক দূরে।

উঠোনে তাঁর ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ভেলী কুকুরের বংশধরেরা। আর খাঁচায় শিষ্ দেয় পোষা পাখীর দল। সবগুলিই তাঁর পরম প্রিয়জন। তাঁর গৃহাঙ্গনে সমস্ত সভ্যাগত জনের জন্য একটী অতি আন্তরিক ও সুমধুর আতিথ্যের আয়োজন রয়েছে—সেখান থেকে কেউ বিমুখ হয় না। সবাই তৃপ্ত মুগ্ধ হয়ে আনন্দচিত্তে ফিরে যায়। এ রকম চল্‌ছে তাঁর জীবন। নানা পত্রিকায় দূতদলের আক্রমণ চলে সেখানে। কিন্তু এ লেখকটীকে মত করানো বড়ই শক্ত। যখন লেখেন না কেউ তাঁকে কলম ধরাতে বিশেষ চেষ্টা করেও পারে না। এরও অনেক গল্প শোনা যায়।

তাঁকে দেখিনি কারণ, উত্তর বাংলার এই সহরে তাঁর পায়ের চিহ্ন পড়েনি, তার সম্বন্ধে আমার দাদার কাছে যা শুনেছি তাই দিয়ে এ প্রবন্ধের উপসংহার করি—এ প্রবন্ধে যতটুকু লেখা হ'ল তার চেয়ে না-লেখা অংশই থাক্‌ল বেশী কারণ, তার জীবনের সমস্তটুকু এখনো লোকচক্ষুতে ধরা পড়েনি এবং তারও কারণ, অনেকটাই তার না জানার অন্ধকারে বিলীন।

.........দাদা বল্‌লেন—দেখ্, তাঁকে দেখ্‌বার ইচ্ছে অনেকদিনই ছিল। সুযোগ যখন ঘটেছে—সময় হয়নি—সময় যখন হ'য়েছে—তখন আলস্য এসেছে। তারপর সময় হ'ল।

কলিকাতায় আছি তো অনেক দিনই। তাঁকে প্রথম চাক্ষুস দেখেছিলাম—কি একটা occasion এ। য়ুনির্ভাসিটি ইনষ্টিটিউটে—বোধহয় দিলীপসম্বর্দ্ধনা উৎসব, সে দেখা দূর থেকে, দেখ্‌লাম—কিন্তু মনে হ'ল এই শরৎচন্দ্র,—একটা surprise এই সাদাসিদে পোষাকপরা লোকটী —হাতে এক লাঠি। যাক্—জলসার ভেতর একেবারে ডুবে গেলাম—তারপর কখন তিনি উঠে গিয়েছেন লক্ষ্য করিনি।

তারপর কতদিন গেল, মেসের একটী ছেলে শুন্‌লাম তাঁর বাড়ীতে যাওয়া আসা করে। সে একজন ভীরুসাহিত্যিক এবং গোপন ও বটে, শুন্‌লাম সে একটা নাকি নাটক লিখেছে—অনেকটা যোড়শীরই জুড়ি। তখন ষোড়শীর পালা নাট্যমন্দিরে চল্‌ছে। তার উৎসাহ তখন thermometerর অনেক ডিগ্রী উঁচুতে। কাজেই ছোটাছুটি চল্‌ছে শরৎ চাটুজ্জের ওখানে তিনি নাকি কিছু কিছু correct ও কর্‌ছেন।

এরকম ও শুন্‌লাম—সে Drama stage করার সাহায্যও তিনি কর্‌বেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তা' staged ও হ'লনা—তার লেখা ও ছাপার অক্ষরে দেখলাম না। যাক্‌গে—। এই ছেলেটির সাথে হয়ত শরৎ চাটুজ্জেকে দেখ্‌তে যেতে পার্‌তাম—কিন্তু মানসিক অবসাদে এবং নানাকারণে হলেনা। তারপর কিছুদিন গেল—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বড় হোষ্টেলে এসেছি। অ—মামা প্রেসিডেন্সি কলেজের 'শরৎ-বঙ্কিমের সেক্রেটারী হ'লেন। হঠাৎ একদিন এসে ধর্‌লেন—৩১শে

ভাদ্র আস্‌ছে—অভিনন্দন লিখ্‌তে হবে—কার না শরৎ চাটুজ্জের, ভাব্‌লাম—সাহিত্যের এক দিক-পালের উপযুক্ত অভিনন্দন লিখ্‌বার সুযোগ ও কোথায় ঘটে।

জানিস্ ত' লিখ্‌বার অভ্যাস, এই লাইনের ভেতর ঢুকে' প্রায় তুলেই দিয়েছি। অল্পছিল সময় তবু অনেক কষ্টে লিখ্‌লাম ভাল করেই—ভাল এই বলেই বলি যে, এর পাঠের সময় স্মিতহাস্য শরৎ বাবুর মুখ রঞ্জিত করেছিল। যাঁকে উদ্দেশ করে লেখা তিনি খুশী হলেন।

তারপর তাঁকে দেখ্‌লাম—অতি কাছে। সাধারণ দু'একটী কথা ও হ'ল। দেখ্‌লাম একটী সাদাসিদে মানুষ গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন তাঁর মুখ একটু লম্বা ছাঁচের, আমাদের দেশের বামুন পণ্ডিতের মত। কাশের মত শুভ্র অযত্নবিন্যস্ত তার চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে অনেকটা উদাসীর মত, তাঁর সুমুখের দাঁত একটু ফাঁক সরলতার পরিচায়ক। গলাবন্ধ কোট, গায়ে, পায়ে তার সস্তা জুতো। এইই সেই মানুষটী, গৃহদাহের সুরেশ, চরিত্রহীনের সতীশ, কিরণময়ী, দেবদাসে, আর নতুন বেরোন শেষ প্রশ্নের কমলের স্রষ্টা। আশ্চর্য্য ঠেকে। তাঁর চালচলনে একটু pose আছে। দেখলাম সহজ তিনি নন্ যেন affected. মনে পড়ে তাঁকে আমরা প্রণাম করেছিলাম কিন্তু তিনি একবার চাইলেন ও না। অপর দিকে তাকিয়ে কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে চল্‌তে লাগলেন। এটা একটা pose ছাড়া আর কি বলা যায়? তাঁর কথা শুন্‌লাম। প্রতিভাষণ পড়াও শুন্‌লাম তিনি পড়েন ধীরে ধীরে, তাঁর উচ্চারণে ওদিকের পাঁড়াগেয়ে সুর আছে ব'লে মনে হ'ল। এ হয়েছে হয়ত তাঁর পাড়াগেয়ে থাকার ফলে।

মনে করেছিলাম হয়ত মানুষটীকে বড়ো দেখবো যেরকম বড়ো কল্পনায় দিনে দিনে গ'ড়ে তুলেছিলাম। হয়ত তা দেখ্‌তে পেলাম না। যাক্, তাতে ক্ষোভ নেই। মানুষকে ছাড়িয়ে যায় তার সৃষ্টি, সৃষ্টিই হচ্চে মানুষের সত্যকারের পরিচয়। সাজাহানের তাজমহল, সাজাহানের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়—তার জীবন যাত্রার ছবিগুলি নয়।

তাই অভিনন্দনে প্রণাম ক'রে এই কথাই এই রূপকারকে বলেছিলাম :—

"স্বর্গের অমৃতের মত অনির্ব্বচনীয় প্রেমের অনাস্বাদিত রস আমাদের পান করাইয়া মুগ্ধ করিল কে? সে ত' তুমি; লাঞ্ছিত মানবাত্মার অতিসজল কাকুতি আমাদের জানাইয়া দিল কে? সে ত' তুমি! রক্তচক্ষু অত্যাচারী সমাজের নিপীড়ন যুগ যুগ ধরিয়া নর-নারীকে অন্তরে বাহিরে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে—তাহার দিকে আমাদের চক্ষু ফিরাইল কে? সে ত' তুমি!

হে মানুষের পরমাত্মীয়,—শতচিত্তের অভিনন্দন লহো॥

নারীকে অভিনব মর্য্যদা ও গৌরব দিয়াছে তোমার লেখনি—সেই লেখনীকে নমস্কার। সুখদুঃখ, ভালোমন্দের সংঘাতের মাঝে বহ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত—মানবাত্মাকে প্রকাশ করিয়াছে তোমার লেখনী—সেই লেখনীকে নমস্কার। পদদলিত দুঃখ-দৈন্যহত নতশির সহস্র মানবাত্মার মুক্তির স্বপ্ন ও আকাঙ্খাকে রূপ দিয়াছে তোমার লেখনী—সেই স্বর্ণ লেখনীকে বারম্বার নমস্কার।

হে পরম রূপকার,
শতচিত্তের অভিনন্দন লহো॥"

"লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল"

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পাঞ্চালী যখন হাসনাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিল তখন গ্রামের লোকে মনে করিয়াছিল, এবার সে নিশ্চয়ই শান্তভাবে চলিবে, পূর্ব্বের মত উচ্ছৃঙ্খলভাবে আর চলিবে না, উপদ্রব করিয়া দেশের ছোট বড় সকলকে পাগল করিয়া দিবে না।

কিন্তু পাঞ্চালীর স্বভাবে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। বরং তাহার উপদ্রব যেন আরও বাড়িয়া গেল,—যেন যতদিন সে এখানে ছিল না ততদিনের পাওনা কিছু সুদে আসলে আদায় করিয়া লইতে চায়। তের চৌদ্দ বৎসর বয়স হইল এখনও তাহার স্বভাব সংযত হইল না, মা বুঝাইয়া তাহাকে সংযত করিতে পারেন না।

মাঝে জামাতা সুরেশ আসিয়া দুইদিন থাকিয়া গেল। পাড়ার লোকে সে দুইদিনই তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে মেয়েটিতে সে বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রকৃতি কিরূপ, অবশেষে কেহ কেহ সঙ্কেতে ইহাও বলিয়া দিল, বৈরাগীদের ছেলেটার সহিত পাঞ্চালীর বড় ভাব অত বড় মেয়ে হইয়াছে, দিনরাত ওই ছোঁড়াটার সহিত মিশিলে লোকে কি বলিবে। আর ওই বাসুদেব ছোঁড়াটাও ভারি বদ, এই বয়সেই বিড়ি খায়, টেরি কাটে, ঠুংরী গান করে ইত্যাদি।

সুরেশ সব শুনিয়া গেল, একটী কথাও বলিল না। চলিয়া যাইবার দিন স্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি বাসুর সঙ্গে বেরাও, এখন ও খেলা কর ?"

সদর্পে স্ত্রী উত্তর দিল, "হাঁ, বেড়াই, খেলা করি তাতে তোমার কি ?"

বিকৃতমুখে সুরেশ বলিল 'আমার কি ? তোমার তাতে একটু লজ্জা করে না গাঞ্চালী ?"

পাঞ্চালী উত্তর দিল, লজ্জা কিসের ? বাসু তো আমাদের পর নয় যে ওর সঙ্গে খেল্‌তে লজ্জা কর্‌বে।"

সুরেশ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "লোকে কি রকম নিন্দে কর্‌ছে জানো ?"

পাঞ্চালী অবহেলার সঙ্গে বলিল, "যারা গরীব তারাই লোকের নিন্দের ভয় করে, আমার বাবা তো গরীব নন, আমার ভয়ও নেই।"

ইহার উপর আর কথা বলা চলে না, নিঃশব্দে সুরেশ চলিয়া গেল।

দরিদ্র সে তাই ধনীকন্যার স্পর্দ্ধাজনককথা তাহার বুকে বড় বাজিয়াছিল। পাঞ্চালীর পিতা ভবতোষ বাবু তাহার যাবজ্জীবনের ভার বহন করিবেন এবং তাঁহার অন্তে সেই তাঁহার অতুল বিষয় সম্পত্তির মালিক হইবে এই আশা দিয়া কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। সুরেশের মাতা পুত্রের ভবিষ্যৎ পানে চাহিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। পিতা মাতা কন্যাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চরিত্রে সংযম আসিল না।

হাসনাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিয়াছিল বাসু এবারবাঁশি বাজাইতে শিখিয়াছে। সামান্য বাঁশের বাঁশি, তাহার মধ্য হইতে বাসু যে সুর বাহির করে, সে সুর শুনিয়া পাঞ্চালী একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। গোপনে বাসু তাহাকেও একটা বাঁশি তৈয়ার করিয়া দিল এবং অখণ্ড মনোযোগের সহিত পাঞ্চালী ও বাঁশি বাজাইতে শিখিতে লাগিল।

জামাই ষষ্ঠিতে নূতন জামতাকে নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও সে আসিল না।

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া ভবতোষ বাবু বলিলেন, 'ছোট লোক কোথাকার'

পাঞ্চালীর মা শুষ্ক হাসিলেন মাত্র। কন্যাকে শাসন করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না, তাহাতে স্বামীর তাড়না তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত। দূর ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, কবে সে দিন আসিবে সে দিন পাঞ্চালীর জন্য লোকের কথা তাঁহাকে শুনিতে হইবে না।

পাঞ্চালী যখন বাঁশি শিখিতে মন দিয়াছে, সেই সময় হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল, সুরেশ নাই,—কলেরায় সে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

বাড়ীতে কান্নাকাটি লাগিয়া গেল—পাঞ্চালীর হাতের বাঁশি খসিয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই তাহায় চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল বিধবার মূর্ত্তি, মনে পড়িয়া গেল সে বিধবা হইয়াছে। মা সেই এক আছাড় খাইয়া পড়িলেন আর তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। ভবতোষ বাবু দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, পাঞ্চালীর পানে তিনিও একটীবার চাহিলেন না।

পিসিমা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে স্নান করাইয়া সিঁথার সিঁদুর তুলিয়া দিলেন হাতের লোহা খুলিয়া শাঁখা ভাঙ্গিয়া দিয়া ঘরে আনিলেন। প্রথম প্রথম পাঞ্চালী একেবারে মুস্ড়িয়া পড়িল, কি এক ব্যাপার ঘটিয়া গেল তাহা যেন সে বুঝিতেই পারে না! মা প্রস্তাব করিলেন, এখন হইতেই পাঞ্চালীকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া হোক। কপালই যখন পুড়িয়াছে, তখন আর সাজসজ্জার দরকার কি ?"

পিতা বলিলেন, ক্ষেপেছ, এই মাত্র পনের বছর বয়স এখনই ওকে থান পরাতে হবে, ওর গায়ে গহনা থাকবে না, দেখ্‌ব কি করে, তুমিই বা সইবে কি করে ? বয়স হলে আপনিই যখন জ্ঞান হবে নিজেই সব ছেড়ে দেবে।"

মা কন্যাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, বাসুর সঙ্গে আর মিশ্‌তে পার্‌বি নে পাঞ্চালী; আবার যদি ওর ওদিকে যাবি তা হলে তোর মোটেই ভালো হবে না।

পাঞ্চালী কেবল মাথাটা কাত করিল মাত্র।

সংসারে আছে বাসুর মা দুলালী, সে যে কোথা হইতে এখানে আসিয়াছে তাহাও কেহ জানে না। গ্রামের মাধব দাস একবার বৃন্দাবন গিয়াছিল, সেখান হইতে সে আসিবার সময় দুলাল ও ক্ষুদ্র শিশু বাসুকে লইয়া আসিয়াছিল।

বাসু যখন মাধবদাদাকে বাবা বলিয়া ডাকিত তখন সকলেই জানিত। বিজয় বৈরাগী তামাক টানিতে টানিতে বলিত—"বেটা কোথা থেকে এসে কাকে বাবা বল্‌লে দেখ। যাক্, মনিবের কাজটা করবে ও-ই।"

মনিবের শেষ কাজ সত্যই বাসু করিয়াছিল, দুলালী ও বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক কাঁদিয়াছিল, তাহার পর আবার ধৈর্য্য ধরিয়া উঠিয়াছিল। আর যাহাই হোক—মাধব বাবাজির কীর্ত্তন গান দেশের মধ্যে বিখ্যাত ছিল, এবং সেই জন্য অনেক স্থানে তাহার ডাকও আসিত। দুলালীকে কীর্ত্তন শিখাইবার জন্য প্রয়াস সে করিয়াছিল, তাহার পর বাসুকে শিখাইয়াছিল। মাধবদাসের নাম বাসুই রাখিয়াছে। আজকাল সে-ই কীর্ত্তন গাহিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করে, দুলালীকে আর ভিক্ষা করিবার জন্য বাহির হইতে হয় না।

গ্রামের অনেকেই অন্তরে অন্তরে তাহাকে ঘৃণা করে তাহা বাসু ভালই জানে, সেই জন্যই সে কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে এ পর্য্যন্ত মিশে নাই। তাহার চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল এই মেয়েটী,—পাঞ্চালী। বাল্যবধি যাহা করিতে নিষেধ থাকিত পাঞ্চালী তাহাই করিয়া বসিত, আর এই গুণটী থাকার জন্যই সে বাসুর প্রিয়পাত্রী হইয়াছিল।

পাঞ্চালী অপেক্ষা বাসু দুই বৎসরের বড় ছিল, তাহা ছাড়া বুদ্ধিটাও তাহার বড় তীক্ষ্ণ ছিল। গ্রামের সমস্ত ছেলে মেয়েরাই এই তীক্ষ্ণ ছেলেটীর প্রভুত্ব মানিয়া লইয়াছিল,-- পাঞ্চালী বাসুর প্রভাব এড়াইতে পারে নাই।

যে দিন পাঞ্চালীর বিবাহ হইল সেদিন বাসু গ্রামেই ছিল না, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কোন কুটুম্বের বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। পাঞ্চালী তাহাকে সেইদিনটী থাকিয়া বিবাহ দেখিয়া পর দিন যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু বাসু কিছুতেই থাকে নাই;—এ জন্য পাঞ্চালী বড় কম ক্ষুব্ধ হয় নাই। পাঞ্চালী যে কয়দিন গ্রামে ছিল না বাসু সে কয়দিন গ্রামে আসে নাই। পাঞ্চালী ফিরিলে সে ও ফিরিয়া আসিল।

কুটুম্বের বাড়ীতে সে বাঁশি শিখিয়া ছিল, মহোৎসাহে পাঞ্চালীকে সে বাঁশি বাজানো শিখাইতে লাগিল, ঠিক এই সময়েই সংবাদ আসিল, সুরেশ মারা গিয়াছে।

স্বার্থপর বাসু ইহাতে এতটুকু কষ্ট পাইলনা সেদিন ঘাটে পাঞ্চালীকে দেখিয়া মহোৎসাহে বলিল, "বেশ ভালই হয়েছে পাঞ্চালি, তোকে আর সেখানে যেতে হবে না, সে এসে আর তোর বাঁশি বাজানোও বন্ধ করে দিতে পারবেনা।"

পাঞ্চালী একটু হাসিয়াছিল,—কেবল তাহার বাঁশি বাজানোর সুযোগ দিতেই যে হতভাগ্য নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, তাহার কথা ভাবিয়া সত্যই তাহার মনে একটু কষ্ট হইয়াছিল, গোপনেই সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল।

দু দিন বাদেই সে কষ্ট তাহার মন হইতে দূর হইয়া গেল,--সে যে বিধবা তাহার যে বিবাহ হইয়াছিল তাহাও সে ভুলিয়া গেল।

পার্শ্ববর্তী বাড়ীতে পাঞ্চালীর বন্ধু অমিয়ার বিবাহ।

রোগশয্যাশায়িনী মা বলিয়া দিলেন, "বিয়েবাড়ীতে তুই যাস্ নে পাঞ্চালী,—"

পাঞ্চালী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, মায়ের নিষেধ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—"কেন মা সকলেই তো যাচ্ছে, আমি গেলে কি হবে?"

সে গেলে কি দোষ হইবে মা তাহা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিলেন না, তাঁহার দুইটী চোখ দিয়া কেবল দর দর ধারে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল মাত্র। পাঞ্চালী গেল না, কিন্তু কৌতুহল দমন করিতে পারিল না, ত্রিতলের ছাদের অট্টালিকার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিবাহবাটির ব্যাপার দেখিতেছিল। পিসীমাকে বিবাহ বাড়ীতে দেখিয়া সে আর থাকিতে পারিল না, মায়ের নিষেধ ভুলিয়া সে ছুটিল। চঞ্চল প্রকৃতির মেয়েটাকে পিসিমা বড় বেশীক্ষণ সংযত করিয়া রাখিতে পারিলেন না। সেখানে পিড়ি, শ্রী প্রভৃতি ছিল—বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও সে সেখানে গিয়া দাঁড়াইল—

মুহূর্ত্ত মধ্যে ভীষণ কোলাহল পড়িয়া গেল—ওমা, কি হবে গো, কোথায় যাব, ভবতোষ রায়ের বিধবা মেয়ে পাঞ্চালী মঙ্গলের জিনিষ সব ছুঁয়ে দিলে। মাগো, অত বড় মেয়ে, হলোই বা বড়লোকের মেয়ে, তা বলে শিক্ষা পায় নি যে বিয়ের জিনিস ওকে ছুঁতে নেই? যা কর্‌বে তাই মানিয়ে যাবে না, এ জ্ঞান পনের যোল বছরের মেয়ের নেই? বাপমায়ের আদরে মেয়ের পরকাল একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে গো—নইলে এমন হয়? হতো আমাদের মেয়ে, বোষ্টমের ছেলের বোষ্টুমী হওয়ার সাধ ঘুচিয়ে দিতুম—"

বিহ্বলা পাঞ্চালী কেবল হতবুদ্ধির মত করিয়া তাকাইয়া রহিল; এখানে আসিয়া দাঁড়ানোতে এমন কি অপরাধ হইয়াছে, যাহাতে সকলেই তাহাকে দু পাঁচ কথা শুনাইল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। পিসীমা আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাড়ী চল পাঞ্চালী—" পিসীমার মুখের পানে তাকাইয়া পাঞ্চালী দেখিল তাঁহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে। নির্ব্বাকে সে পিসীমার সঙ্গে চলিল।

পথে চলিতে চলিতে থামিয়া গিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ওরা অমন করে বল্‌লে কেন পিসীমা, আমি তো কিছুই করি নি।" অপমানের তীব্রদহনে তাহার বুকখানা জ্বলিতেছিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পিসীমা বলিলেন, "তুই যে বিধবা মা।"

পাঞ্চালীর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, "বিধবার ওখানে যেতে নাই কেন, ও সব ছুঁতে নেই কেন পিসীমা?"

পিসীমা বলিলেন, "বিধবা যে অকল্যাণ নিয়ে আসে মা, মঙ্গলের কোন কাজে তাই তাদের অধিকার নেই।"

"বিধবা অকল্যাণ নিয়ে আসে—"

পাঞ্চালী নীরবে চলিল।

সমস্ত রাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না—কেবল পিসীমার কথাটাই তাহার মনে জাগিতেছিল—'মঙ্গলের কোন কাজে বিধবার অধিকার নাই।'

আজ বড় বিশেষ করিয়াই মনে পড়িতে লাগিল সেই লোকটীকে যে তাহাকে মঙ্গলজনক সকল কাজের অধিকার দিয়া আবার কাড়িয়া লইয়া গেল, একমুহূর্ত্তে তাহাকে কল্যাণের আসন হইতে টানিয়া অকল্যাণের মধ্যে বসাইয়া দিয়া গেল। কিন্তু তাহার তো কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, সে তো যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে, তবে এরূপ হইল কেন?

জ্যোৎস্নাসিক্ত রাত্রে দূরে কোথায় কে বাঁশিতে কীর্ত্তনের সুর ধরিয়াছিল, বোধ হয় বাসু—সে ছাড়া আর কেহ এত সুন্দর বাঁশী বাজাইতে পারে না।

আজই প্রথম বড় আঘাত পাইয়া পাঞ্চালী সচেতন হইয়া উঠিল, আজই প্রথম সে নিজের জীবনটাকে আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিল। চোখের জল যতই মুছা যায় ততই ঝরিয়া পড়ে। কাঁদিতে কাঁদিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

(২)

সুদীর্ঘ সাতটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ভবতোষ বাবু পত্নী ও কন্যা সহ দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তিন বৎসর পরে যখন তিনি আবার দেশে ফিরিলেন তখন সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে।

পত্নী বৈদ্যনাথে দেহত্যাগ করিয়াছেন, সংসারে এই বিধবা কন্যাটী ছাড়া পিতার কেহ নাই, কন্যারও পিতা ছাড়া আর কেহ নাই। প্রয়াগে গিয়া পিতার অনভিমতে জোর করিয়া পাঞ্চালী সমস্ত চুল কাটিয়া ফেলিয়াছে, গায়ের গহনা সব খুলিয়াছে ও থান পরিয়াছে। পিতার চোখে জলধারা রহিয়াছে, তিনি বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই একটী দিনের গ্লানি পাঞ্চালীর মনের মধ্যে জমিয়াছিল, পিতার বাধা তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না।

তিন বৎসর পূর্ব্বে গ্রামের যাহারা পাঞ্চালীকে দেখিয়াছিল তাহারা এখন তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সেই চপলা চঞ্চলা পাঞ্চালী যে এমন ধীর স্থির হইবে তাহা কেহই ভাবে নাই।

গ্রামের সকলেই দেখা করিল, দেখা করিল না বাসু। পাঞ্চালী গ্রামে ফিরিয়া অনেকের বাড়ীতেই গেল, গেল না কেবল বাসুর কুটিরে। গ্রামে ফিরিয়া সে গোপনে বাসুর খোঁজ পাইয়াছিল। বাসুর মা মারা গিয়াছে, বাসু এখন বাসুদেব বাবাজি হইয়াছে,—বাড়ীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেবাদাসীও কয়েকটী পাইয়াছে। ঘৃণায় পাঞ্চালীর সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সত্যই—ক্ষেত্রানুযায়ী গাছে ফল ফলে, এ কথা আজ সে অসঙ্কোচে মানিয়া লইল। পিতামাতার রক্তই তো বাসুর দেহে বহিতেছে, সে মহৎ হইবে কেমন করিয়া, উহার পিতামাতার কামনা বাল্যে উহার মধ্যে লুপ্ত ছিল, এখন স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

নিজের উপরও রাগ হইল বড় কম নয়। ওই লোকটার মধ্যে সে কি দেখিয়াছিল যে লোক নিন্দা তুচ্ছ করিয়া উহার মুখের দুইটা প্রশংসার কথা পাইবার আশায় সে কি না করিয়াছিল? আজ মনে পড়ে তাহার স্বামী তাহাকে উহার সহিত মিশিতে খেলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহাতে সে কি উত্তর দিয়াছিল। আরও মনে পড়ে অমিয়ার বিবাহের দিনে যখন মেয়েরা নানা কথা বলিতে সুরু করিয়াছিলেন, তাহাদেরই মধ্যে যে কেন এই বৈষ্ণবের ব্যাপার লইয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল। সে দিনের কথা মনে করিতে আজ ও পাঞ্চালীর সমস্ত মুখ লাল হইয়া যায়।

নিজের সেই গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার জন্যই সে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে লাগিল।

গ্রামের লোকের মুখে প্রশংসা ধরে না।

মেয়েরা একমুখে বলিতে লাগিল, "আহা, মেয়ে বটে আমাদের পাঞ্চালী, অমন নিষ্ঠার সঙ্গে বিধবার ব্রত পালন কর্‌তে আর কেউ পার্‌বে না। নিত্য পূজো পর্ব্বণ আছেই, সকাল হতে গীতা বেদ পড়ে। সকাল বেলা অমন মেয়ের নাম করলেও পুণ্যি হয়।"

পুরুষেরা ভবতোষ বাবুর কাছে শত মুখে প্রশংসা করেন—"এই বয়েস মা লক্ষ্মীর, তবু কি রকমভাবেই না ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্‌ছেন। শুনেছি বটে সেকালে মেয়েরা এম্‌নি করে চল্‌তেন এ ঠিক তেমনি। তা আর হবে না? মা লক্ষ্মী কার মেয়ে, কার শিক্ষা পেয়েছেন।'

পিতৃহৃদয় কন্যার প্রশংসায় বিগলিত হয়। কন্যার কৃশ দেহখানার পানে তাকাইয়া তিনি স্বর্গগতা পত্নীকে স্মরণ করেন—"তুমি ওকে বাঁচিয়ে রেখো, ওকে রক্ষা করো।"

বাসুদেব বাবাজির কানে ও ভবতোষ বাবুর কন্যা পাঞ্চালীর ত্যাগের কথা আসে, বাসু চোখ মুদিয়া হাসে মাত্র। সে একটা দিনও পাঞ্চালীর নাম মুখে আনে নাই, পাঞ্চালী নামে একটী মেয়ে যে ছিল সে কথা যেন তাহার মনেই নাই।

গভীর রাত্রে বাঁশি বাজিতেছিল। সাত আট বৎসর পূর্ব্বেও এমনই জ্যোৎস্না রাত্রে বাঁশি বাজিতেছিল মনে পড়ে। সে দিন বাঁশি কি গান গাহিতেছিল কে জানে, আজ বাঁশিতে যে গান হইতেছিল সে গান পাঞ্চালী জানে।

যুগ যুগান্ত পূর্ব্বে কে গাহিয়াছিল—
এসো হে ফিরে এসো—
বঁধু হে ফিরে এসো,
আমার সব সুখ দুখ মন্থনধন
অন্তরে ফিরে এসো—

আজ রাত্রে বাঁশির সুরে তাহার সেই ভাবটীই ভাসিয়া উঠিতেছে, এসো হে এসো, আমার অন্তরে এসো, আমার জীবন মরণে এসো—।

পাঞ্চালীর দুই চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সে স্বামীকে চিন্তা করিতে গেল, অন্তরে জাগে ও কাহার মূর্ত্তি—

অভাগিনী মেঝের উপর আছ্‌ড়াইয়া পড়িল—"দেবতা আমায় রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর, আমায় ধ্বংস করো না, আমার ধর্ম্ম অটুট রাখ।"

সমস্ত রাত্রি মেঝের উপর পড়িয়া থাকিয়া কাটিয়া গেল।

সকালে স্নানান্তে শুদ্ধদেহে পবিত্রমনে সে যখন পূজার ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময়ে শুনিতে পাইল, বাসুদেব বাবাজি বাহিরে কীর্ত্তন গাহিতেছে। আপনার অজ্ঞাতসারে সে কখন দরজার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

বাসুদেব গাহিতেছিল—

আমি নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মানিক হারানু হেলে।

স্পন্দনবিহীনা পাঞ্চালী। এই গানটি অহোরহ তাহার বুকের মাঝে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার স্বপনে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। বাসুদেব এ গান পাইল কোথায়?

গান কখন থামিয়া গেল, বাসুদেব ভিক্ষার ঝুলি পাতিল—"ভিক্ষা পাব কি?"

পাঞ্চালী অকস্মাৎ চমকাইয়া উঠিল।

এ কি দৃষ্টি বাসুদেবের চোখে?

তখনই সে চোখ যেন সজল হইয়া উঠিল, মৃদু আর্দ্রকণ্ঠে সে ডাকিল—"পাঞ্চালি—"

পাঞ্চালী পিছাইয়া গেল। দ্রুতপদে নিজের গৃহের দিকে চলিতে চলিতে দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "বাবাজিকে ভিক্ষে দিয়ে আয় তরি, চার্‌টে পয়সা ধরে দিস্ অমনি।"

ভিক্ষা লইয়া বাসুদেব চলিল।

উপরের গৃহের দরজা জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পাঞ্চালীর কানে বাসুদেবের মৃদু গানের সুর আসিয়া পৌঁছাইল।

বাসুদেব খঞ্জনীতে মৃদু টোকা দিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

সখি, কি মোর করমে লিখি,
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি।

(৩)

পাঞ্চালী দীক্ষা লইতেছে।

কাশী হইতে কুলগুরু আসিয়াছেন আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল সকলে আসিয়াছে।

গ্রামের ছোট বড় কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে বাদ দেওয়া হয় নাই, কেবল বাদ পড়িয়াছে বাসুদেব বাবাজি।

ভবতোষ বাবু নিমন্ত্রিতদের তালিকা দেখিয়া বলিয়া ছিলেন—বাসুকে বাদ দিলি মা, ভাল কর্‌লিনে। ছেলেটী বেশ কীর্ত্তন গায়, ওর গান শুনলে আর কোন শোক দুঃখ মনে হয় না।

পাঞ্চালী দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিল, "না বাবা, বাসুদেব বাবাজিকে আমি বলব না। যার বাপের ঠিক নেই তাকে নেমতন্ন করা উচিত কি ?"

ভবতোষ বাবু মৃদুকণ্ঠে বলিতে গেলেন, "সে কথা ধরে ও মানুষটাকে বাদ দিলে যে অনেকটাই বাদ দেওয়া হয় পঞ্চু। আমাদের ও সব দেখ্‌বার দরকার কি,—আমরা দেখব শুধু ওই মানুষটাকে মানুষ হিসাবে,—সত্যি কি না বল।"

পাঞ্চালী মুখখানা লাল করিয়া বলিল, না বাবা, উদারতা সব সময়ে খাটে না;—দান অনেক সময় কুফল উৎপন্ন করে, তাই দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার করে দান করা দরকার। এতে পাপেরই প্রশ্রয় দেওয়া হবে বলে আমার বিশ্বাস হয়, সেই জন্যে ওকে আমি বাদ দিতে চাই।"

কিন্তু বাদ দেওয়া সত্ত্বেও এই লোকটী সেদিনে নিজেই আসিয়া আসর জমাইয়া বসিল।

পানের পর গান, তাহার গান যেন ফুরাইতে চায় না। চারিদিকের সব লোক বাসু বাবাজির কীর্ত্তন শুনিতে ঝুঁকিয়া পড়িল।

আজ গানের সুরে ফুটিতেছিল বাসুর হৃদয়ের জমাট বাধা কান্না, সে যেন বুকের মধ্যে আর চাপা থাকে না, আজ যেন তাহার প্রিয়তমের সমাধি সে নিজহস্তে রচনা করিতেছে।

মন্ত্র পড়িতে কেবলই ভুল হইয়া যাইতেছিল।

পাঞ্চালী ভৃত্যকে আদেশ দিল, বাবাজিকে এখন যেতে বলে দাও, সন্ধ্যের দিকে গান হবে।"

বাসু গান থামাইল না

চোখের জলে ভাসিয়া সে তখ নগাহিতেছিল—

—বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে
দেখা তো হতো না পরাণ গেলে—

সামনে দাঁড়াইয়া পাঞ্চালী ডাকিল "বাসু—"

বাসু চমকাইয়া মুখ তুলিল।

অঙ্গুলী নির্দ্দেশে পথ দেখাইয়া পাঞ্চালী বলিল, "যাও, আমার দীক্ষার ব্যাঘাত দিয়ো না।"

বাসু হাসিবার চেষ্টা করিল—

হাসি ফুটিল না, মুখটাই তাহার বিকৃত হইয়া উঠিল।

একবার চারিদিকে তাকাইয়া সে দেখিল—কেহ নিকটে নাই!

আর্দ্রকণ্ঠে সে বলিল, "দীক্ষা নিচ্ছ—কিন্তু কিসের দীক্ষা পাঞ্চালী? আত্মসংযম কর্‌তে পেরেছ কি? তা যদি না পেরে থাক, বাইরের এই আবরণ টেনে লাভ কি?"

পাঞ্চালী একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

উপরের জানালাটা দেখাইয়া বাসু বলিল, "কত রাতে তোমায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি পাঞ্চালি, উজ্জ্বল আলোয় কত রাত তোমার চোখে জলও দেখেছি—

বাধা দিয়া দৃপ্তকণ্ঠে পাঞ্চালী বলিল, "তুমি যাও—যাও বল্‌ছি।"

"আমি যাব না পাঞ্চালী, আমার সর্ব্বস্ব আমার অগোচরে পুড়ে ছাই হতে দেব না, আমার সামনেই পুড়ে যাক, আমি দেখি।"

সে গানের সুর তুলিল—

বঁধু, মথুরা নগরে ভালো তো ছিলে—

দুই চোখে আগুন লইয়া পাঞ্চালী ফিরিল—

বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল—বাসুদেব বাবাজি পাঞ্চালীকে অপমান করিয়াছে, অকথ্য কত কি বলিয়াছে।

সমস্ত লোক মার মার করিয়া ছুটিয়া গিয়া বাসুর উপরে পড়িল।

দ্বিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া পাঞ্চালী,—

তাহারই চোখের উপর বাসুর উপর অজস্র কীল, চড়, লাথি পড়িতে লাগিল; তাহার পর সংজ্ঞাশূন্য বাসুকে টানিতে টানিতে বাহিরে লইয়া গেল।

নির্ব্বাক পাঞ্চালী দাঁড়াইয়া শুধু দেখিতেছিল।

সে বলিতে পারিল না বাসু নিরপরাধ,—সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। বাসু তাহাকে অপমান করে নাই, অপমান করিতে পারে না কারণ সে পাঞ্চালীকে ভালবাসে। অপবিত্রা জননীর সন্তান হইলেও সে যে ভালবাসা পাইয়াছে তাহা নির্ম্মল, পবিত্র। সে ভালবাসা মানুষকে দেবতা গড়ে স্বর্গে স্থান দেয়।

পাঞ্চালী আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল। বারাণ্ডায় কে যেন বলিতেছিল—"আহা লোকটা আজ এই সকাল বেলাটায় মারা গেল গো,—"

বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল—

মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া পাঞ্চালী ডাকিল, "কি হয়েছে হরুর মা, কে মারা গেল?"

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া হরুর মা বলিল, "ওই আমাদের বাসু বাবাজি দিদিমণি,—আজ সকালেই মারা গেল। অতিরিক্ত বাড় হয়েছিল গো, নইলে সতী সাবিত্রীকে যা না তাই বল্‌তে পারে? তেমনি হাতে হাতে ফল পেলে গো, আজ দশ রাত গেল না, সব শেষ হয়ে গেল।"

বাসু নাই—সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

পাঞ্চালীর বুকের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। সতী সাবিত্রীকে সে যা না তাই বলিয়াছে সেই পাপে তাহাকে দশটা রাতও বাঁচিতে হইল না।

সতী সাবিত্রী ?

কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

বুকের ভিতরে কি কথা লুকাইয়া আছে, তাহা কি কেহ জানে ? যে জানিয়াছিল সে নাই, সে তাহারই জন্য প্রাণ দিল ?

দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পাঞ্চালী মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

পাপ কাহার ? ঠাকুর, তুমি তো সবই জানো—এ পাপের দণ্ড ভোগ করবে কে—সে না বাসু ?

পাঞ্চালীর চোখের জলে মেঝে আর্দ্র হইয়া উঠিল—

আজ সে আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিতেছিল—"তুমি ফিরে এসো—আমায় একবার ক্ষমা চাইবার অবকাশ দাও—আমায় ক্ষমা করে যাও।"

গল্প-প্রতিযোগিতা

ছোট গল্পের জন্য এবার আমরা একটি পুরস্কার দিব। যে লেখিকার লেখা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাকেই পুরস্কার দেওয়া যাইবে। গল্প ১০ই চৈত্র মধ্যে আমাদের আফিসে পৌঁছান চাই। পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিতার জন্য যে গল্প দিবেন "প্রতিযোগিতার জন্য" লিখিয়া দিবেন। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত গল্প প্রকাশের অধিকার পত্রিকার থাকিবে।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন

বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, বি-এ

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন সম্পর্কে দু-কথা বল্‌তে হবে, কিন্তু বল্‌বার কথা খুঁজে পাচ্ছি না। বল্‌তে গেলে বহু কথা আছে,—কতদিনের কত তুচ্ছ কথা, কত খুঁটিনাটি স্মৃতি আজ মনের মধ্যে ভিড় করে আস্‌ছে, কিন্তু গুছিয়ে বলবার আজ সামর্থ্য নাই। শুধু আমাদের কেন, বাংলার গোটা মুসলীম নারীসমাজের হৃদয় স্পন্দন আজ থেমে গেছে—বাংলার মুসলমান পুরুষ নারী সকলেই আজ বজ্রাহত।

রক্তের বন্ধন যে সব চেয়ে বড় কথা নয়, হৃদয়ের যোগ যে তার চেয়ে কত বড় জিনিষ এ-কথা আজ প্রথম ভাল ক'রে উপলব্ধি কর্‌লাম। রক্তের সম্পর্ক, দেহের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে আমার ছিল না কিন্তু তাঁর অমৃত-সরস, স্নেহ-সুকুমার হৃদয়খানির উত্তপ্ত স্পর্শ আমাদের চেয়ে আর কে বেশী অনুভব করেছিল! তিনি ছিলেন গোটা সমাজের—অথচ তিনি ছিলেন আমাদের প্রত্যেকের। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় চিঠিপত্রে এবং মাসিক পত্রিকার ভিতর দিয়ে। দশ বছর বয়সেই যখন স্কুল ছেড়ে পর্দ্দানশীন হই, তখন থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য মনে একটা আগ্রহ জেগেছিল,—আর তাই ছিল বেগম রোকেয়ার কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ। বাংলা দেশের কোন্ নিভৃত পল্লীতে কোন্ অবরোধরুদ্ধা বন্দিনী মেয়ে লেখা-পড়া শিখ্‌বার জন্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখিয়েছে,—সে-ই ছিল তাঁর সবচেয়ে আপন; তারই সঙ্গে ছিল তাঁরই প্রাণের যোগ সবচেয়ে বেশী।

সবাই জানেন বেগম রোকেয়া একটি স্কুল করেছেন। সবাই জানেন সাখাওয়াৎ মেমোরিয়েল গার্লস্ হাই-স্কুলের তিনি প্রতিষ্ঠাত্রী। কিন্তু কেমন করে ঐশ্বর্য্য-লালিতা এই অবরোধবাসিনী—এই সর্ব্বভোগত্যাগিনী বিধবা স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাড়ান, কেমন ক'রে পাঁচটি মেয়ে নিয়ে স্কুল আরম্ভ করেন, আর কেমন করে পঁচিশ বৎসর পরে সেই স্কুলকে একটি হাই স্কুলে পরিণত করেন—সে-কথা অনেকেই জানেন না।

প্রথম যখন স্কুল সুরু করেন, তখন লেখাপড়া তিনি জান্‌তেন না বেশী। সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরের মেয়ে ছিলেন তিনি—যাঁদের পক্ষে ইংরাজী বা বাংলা লেখা ত্রিশ বছর আগে একেবারেই হারাম ছিল। আজ আমরা মনে করি লেখাপড়া শিখ্‌বার জন্যে আমাদের অনেক কষ্ট ক'রতে হয়েছে, সমাজের অনেক সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে তবে আমরা লেখাপড়া শিখেছি। কিন্তু তুচ্ছ মনে হয় আমাদের কষ্ট, আমাদের বাধাবিঘ্ন, যখন তুলনা করি সেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে বেগম রোকেয়ার যখন শিক্ষা সুরু হয় তখনকার যুগের কুসংস্কারের সঙ্গে। আজ আমরা হয়ত পুরুষের সামনে পর্দ্দা করি, কিন্তু তখন কুলবালারা পর্দ্দা ক'রতেন মেয়েদের সঙ্গেও। বেগম রোকেয়া বলেছেন, তাঁদের পরিবারের অবিবাহিতা মেয়েরা অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ির চাকরাণী ছাড়া অন্য কোন মেয়েমানুষের সাম্‌নে বেরুতেন না। তাঁহাদের শুধু দেহই পর্দ্দানশীন ছিল না—পাছে পরপুরুষের

চোখে পড়ে তাঁদের হাতের লেখার বেপর্দ্দা হয়, এই ভয়ে লেখাপড়া শেখাই তাঁদের পক্ষে ছিল একেবারে নিষিদ্ধ। সেই আঁধার যুগে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বুকে জ্বলেছিল জ্ঞানের আলো—আর সেই আলো সঞ্চারিত হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার সেই অবরোধরুদ্ধা বন্দিনী বালিকাটির ক্ষুদ্র হৃদয়ে। তিনি বলেছেন—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একদিন একখানি বড় ছবিওয়ালা ইংরাজী বই আমার সামনে খুলে ধ'রে বললেন—"বোন্, এই ইংরাজী ভাষাটা যদি শিখতে পারিস, তবে পৃথিবীর এক রত্নভাণ্ডারের দ্বার তোর কাছে খুলে যাবে।" ভাই নিজেও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ছিলেন না; কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র বোনটিকে সেদিন যে নতুন পথের সন্ধান দিলেন, যে নতুন আশার বাণী শোনালেন—সে যুগে সত্যিই তা এক বিচিত্র বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। এমনি করে সেই পরম স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে তাঁর প্রথম শিক্ষারম্ভ হয়। গভীর রাত্রে পৃথিবীর অন্ধকারে ঢেকে যেত—আর সেই সঙ্গে জ্বলে উঠ্‌ত দুটি কিশোর-কিশোরীর শয়নকক্ষে স্তিমিত দীপশিখা। চোখ মুছে সেই নীরব নিশীথে দু-ভাইবোনে বস্‌তেন পড়াশোনা নিয়ে। জ্ঞান দান করতেন ভাই—আর বালিকা ভগ্নী সেই জ্ঞানসুধা আকণ্ঠ পান করতেন।

তারপরে জীবন-যৌবনের বাসন্তী উষায় আশা, সুখ, ঐশ্বর্য্যের প্রীতি পরিবেষ্টনের মধ্যে তিনি যখন স্বামীকে হারালেন, তখন থেকে সুরু হ'ল তাঁর কঠোর ত্যাগ-সাধনা—সেই দিন থেকে সুরু কর্‌লেন তিনি অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম, স্বামীর দেওয়া শেষ সম্বল দশ হাজার টাকা নিয়ে তিনি যখন ঘরের বা'র হলেন তখন তিনি জানতেন না স্কুল কি জিনিষ—কাকে বলে স্কুল। তিনি বলেছেন—"প্রথম যখন পাঁচটি মেয়ে নিয়ে স্কুল আরম্ভ করি তখন ভারী আশ্চর্য্য ঠেকেছিল এই কথা, যে একই শিক্ষয়িত্রী কেমন ক'রে একসঙ্গে একই সময়ে পাঁচটি মেয়েকে পড়াতে পারেন।" এম্‌নি অনভিজ্ঞতা নিয়ে কাজে নেমেছিলেন পঁচিশ বছর আগেকার সেই কিশোরী বিধবা—বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। তারপরে তাঁর পঁচিশ বছরের কর্ম্মজীবনের কাহিনী সে একটা বিরাট ব্যথার কাহিনী, একটা বিপুল সংগ্রামের ইতিহাস। পঁচিশ বছর আগে - পঁচিশ বছর আগেই বা বলি কেন—এখনও অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান আছেন যাঁরা স্কুলে মেয়ে পাঠানোকে একটা মস্ত বড় পাপের কাজ বলে মনে করে। যিনি মেয়েকে লেখাপড়া শিখ্‌তে দিয়েছেন তিনি মনে করেছেন 'আমি বেগম রোকেয়াকে ধন্য করলাম।' আর যিনি স্কুলের ছুতানাতা ধ'রে, পান থেকে চুণ খস্‌বার অপরাধে মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছেন, তিনি মনে করেছেন—'বিরাট শাস্তি দিলাম বেগম রোকেয়াকে।' স্কুলে মেয়েদের ব্যায়ামচর্চ্চা করবার, গানবাজনা শিখ্‌বার বন্দোবস্ত করলেন—পরদিন থেকে সুরু হ'ল উর্দ্দু কাগজসমূহে তাঁর শ্রাদ্ধ, তাঁর স্কুলের শ্রাদ্ধ; তাঁর সাতপুরুষের শ্রাদ্ধ। প্রথম মোটর বাস তৈরি করালেন—সে হ'ল "moving Blackhole" প্রথম দিন 'বাসে'র ভিতর অন্ধকারে মেয়েদের ভয়ে মূর্চ্ছা হ'ল - গরমে হল ফিট। সুরু হল অসংখ্য বেনামী উর্দ্দু চিঠি। লেখাপড়া শেখাবার নামে মেয়েদের তিনি মেরে ফেল্‌তে চান নাকি? তার পরে বাসের দুপাশের খড়খড়ি ফেলে দিয়ে রঙীন কাপড়ের পর্দ্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল; এবারে অভিযোগ আসতে লাগল—পর্দ্দা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে মেয়েদের বেপর্দ্দা করে। বড় দুঃখে তিনি 'অবরোধবাসিনী'তে বলেছেন—'এত ভারী বিপদ। না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ।' রাজার আদেশে একদিন নয়, দুদিন নয়—পঁচিশ-পঁচিশ বৎসর কেউ বোধ করি এমন করে জীবন্ত সাপ ধ'রতে পারেনি।

সমাজের এ-সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তিনি আঘাতের পর আঘাত পেয়েছেন,—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিল তিল করে নিজের প্রতি রক্তবিন্দু বিসর্জ্জন দিয়েছেন। তিনি

জন্মেছিলেন যে অধ্যবসায়, যে দৃঢ়তা আর লাঞ্ছনা সহ্য করবার যে অমানুষী শক্তি নিয়ে—দুনিয়ার যে কোন বড় সৈনিক, যে-কোনো সংস্কারের শক্তির সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে,—এ-কথা আজ আমি বড় গলায় ব্‌লতে পারি। জীবনে যাঁরা তাঁকে বোঝেননি, মরণের পরে আজ তাঁদের বিচার করবার সময় এসেছে—কত বড় সৈনিক, কত বড় যোদ্ধা ছিলেন এই বেগম রোকেয়া, কত ক্ষতবিক্ষত, কত জর্জ্জরিত হয়েছিলেন তিনি এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরব্যাপী সংগ্রামে।

আগেই বলেছি, এই অল্প সময়ে এত অল্প কথায় বেগম রোকেয়ার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা ভুল শুধু একটা স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী বললে কিছু বলা হল না—স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন বললেও অনেক কথাই বলা বাকী থেকে গেল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শাজাহানকে বলেছেন—তোমার কীর্ত্তির চেয়ে, তোমার তাজমহলের চেয়ে তুমি ছিলে মহত্তর।' ঠিক বেগম হোসেন সম্পর্কেও এই কথাই বলা চলে। তাঁর কীর্ত্তির চেয়ে—তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন ঢের ঢের বড়। বাংলার মুসলমান নারী প্রগতির তিনি ছিলেন অগ্রনায়িকা - স্ত্রীশিক্ষার ছিলেন সর্ব্ব প্রথম নিশানবরদার।

> 'তুমি আলোকের, তুমি সত্যের ধরার ধূলার তাজমহল,
> রৌদ্রতপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল।
> বন্ধকারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয়-নিশান,
> অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।'

কবির এই কথার সত্যিকারের সার্থকতা যদি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তা পাওয়া গিয়েছিল একটি মাত্র নারীর জীবনে; তিনি এই মেগম রোকেয়া।

ভারতে মুসলমান রাজত্বের অবসান হ'ল। মুসলমানের রাজ্য গেল, ক্ষমতা গেল, ঐশ্বর্য্য গেল—সেটা তত দুঃখের কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা তাঁদের জ্ঞানের বাতি নিবল ;—সেদিন থেকে মুসলমান মেয়েরা বিশেষ ক'রে বাংলার মেয়েরা হ'লেন খাঁচার পাখী, সেই অন্ধকার যুগে কেমন ক'রে তাঁর মনে জেগেছিল জ্ঞানের পিপাসা, কেমন করে ঢুকেছিল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—অন্ধকারের কুঁড়িতে কেমন ক'রে তিনি ফুটে ছিলেন আলোকের শতদল পদ্মের মত, সে-কথা আজও আমাদের কাছে একটা বিরাট রহস্যই রয়ে গেছে। অজ্ঞানতার অন্ধকারে, কুসংস্কারের নিবিড় তিমিরে দীপ জ্বালালেন তিনি জ্ঞানের, আলো দেখালেন মুক্তির, বাণী শোনালেন স্বাধীনতার। এই যে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলমান মেয়েরা 'চলি চলি পা পা' ক'রে মুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছেন—এর গোড়ার কথা খুঁজতে গেলে কি বল্‌তে হয়? বলতে হয়—এর জন্য বেশ অনেকখানি দায়ী মিসেস্‌ হোসেনের সাধনা—তাঁর দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সংগ্রাম। মেয়েদের জন্য তিনি করেছিলেন স্কুল। আর মেয়েদের মায়ের জন্য করেছিলেন এক নারীসমিতি। তাঁদের অনেককেই তিনি এই সমিতির ভিতর দিয়ে তিলতিল ক'রে প্রেরণা জুগিয়েছেন। দিনের পর দিন চেষ্টা করে ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁদের মুখের ঘোমটা খসিয়েছেন, হাত ধ'রে ধ'রে তাঁদের ঘরের বার করেছেন। আর যাঁরা সাক্ষাৎ ভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত নন—প্রত্যক্ষে যাঁরা তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পাননি, তাঁরাও প্রত্যেকে তাঁর কাছে ঋণী। এ-কথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নাই, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বাংলার প্রত্যেকটি মুসলমান মেয়ে তাঁর দর্শনে অনুপ্রাণিত হ'য়েছে; প্রত্যেকেরই তিনি ছিলেন—friend, philosopher and guide.

বেগম রোকেয়ার প্রতিভা ছিল বহুমুখীন প্রতিভা। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস্‌ স্কুলের আর-এস, হোসেনকে হয়ত অনেকে জানেন; কিন্তু "মতিচুরে"র আর-এস্‌ হোসেন, "পদ্মরাগে"র আর-এস, হোসেন

আজও অনেকের কাছেই অপরিচিতা। তাঁর "মতিচুর", "পদ্মরাগ", "সুলতানার স্বপ্ন" প্রভৃতি পুস্তক বহুদিন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন অধিকার ক'রে থাকবে, সহজ, সরল, সাবলীল অথচ তীক্ষ্ণ, জোরালো ভাষার জন্য বাংলা সাহিত্যসেবী তাঁকে বহু দিন স্মরণ করবে। আজ বাংলার মুসলমান বাংলাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করতে শিখেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন তাহারা হোসেন শাহ, নসরত শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতির কথা ভুলে গিয়েছিল। বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দিতে তাঁরা অপমান মনে করত, বাংলা ভাষায় কথা ব'লতে ঘৃণাবোধ করত।

তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ কেটেছিল ভাগলপুরের ও কলকাতার উর্দ্দুভাষী সমাজে। গোঁড়া উর্দ্দুভাষী সমাজের মধ্যেই তাঁর জ্ঞানের বিকাশ হ'য়েছিল। তা সত্ত্বেও কেমন ক'রে যে তিনি আজীবন মনে প্রাণে বাঙালী ছিলেন সে-কথা ভাবলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। বাংলার মাটিতে তাঁর জন্ম— বাংলার বায়ু, বাংলার জলে তিনি মানুষ, এ কথা ভোলেননি তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও। তিনি ছিলেন গজনভী পরিবারের অতি নিকট আত্মীয়া; কিন্তু বাংলার প্রতি ধূলিকণার সঙ্গেই ছিল তাঁর নাড়ীর যোগ। ইরাণী, তুরাণী, গজনভী 'খবাব' তিনি কখনও দেখেন নি—আরবী, আফগানী স্বপ্নেও কখনও বিভোর থাকেন নি। তিনি ছিলেন Bengali first, Bengali next and Bengali always.

বাংলায় তিনি কথা বলেছেন, বাংলার চিন্তা করেছেন এবং বাংলা রচনার ভিতর দিয়েই তাঁর সত্যিকারের প্রকাশ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করেছে। বাংলার অভিশপ্ত উৎপীড়িত মুসলিম নারীসমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা, তাঁদের ব্যথা বেদনা তাঁর "মতিচুর" "পদ্মরাগের" প্রতি পাতায় পাতায় প্রতি ছত্রে ছত্রে। মেয়েরা শুধু লেখা পড়া শিখ্‌বে—বড় জোড় ম্যাট্রিক পাশ ক'রবে—এই-ই তাঁর আদর্শ ছিল না। এর চেয়ে ঢের ঢের উঁচু ছিল তাঁর ideal, ঢের ঢের বড় ছিল তাঁর dream। মেয়েরা শুধু good mother and good wives হবে এইখানেই তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি হয়নি। পঁচিশ বছর আগে তিনি কল্পনা করেছিলেন—"lady magistrates, lady barristers এবং lady legislators" মতিচুরের "মুক্তিফল" প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন—মেয়েদের সহায়তা না হ'লে একা পুরুষের প্রচেষ্টায় দেশ-জননীর স্বাধীনতা অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। "সুলতানার স্বপ্নে" তিনি এর চেয়েও অনেক অনেক উঁচু আদর্শের অবতারণা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন—এক অপূর্ব্ব, অদ্ভুত নারী-রাজত্ব। পুরুষ সেখানে পর্দ্দার আড়ালে গৃহকোণে আবদ্ধ। আর নারীরা এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃতিকে বশীভূত ক'রে নিয়ে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত কাজ চালাচ্ছেন। দুনিয়ার যত পাপ, তাপ, যুদ্ধবিগ্রহ সব-কিছুর জন্য তিনি দায়ী করেছেন পুরুষকে। তাঁর কল্পিত নারীস্থানে—পুরুষ যেখানে অবরোধরুদ্ধ সেখানে দুঃখকষ্ট অশান্তির সব লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই; সেখানে চারিদিকে খালি শান্তি আর শান্তি। তাঁর এই স্বপ্ন সফল হ'তে হয়ত বহুদিন লাগ্‌বে, হয়ত এই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। কিন্তু তাঁর এই একটি মাত্র স্বপ্ন থেকেই মানুষ বহু বহু কাল পরে ও এক নিমেষেই বুঝতে পার্‌বে—তাঁর নারীত্বের আদর্শ কত উঁচু ছিল—নারীর শক্তিতে তাঁর বিশ্বাস কত পর্ব্বতপ্রমাণ ছিল। তাঁর এই স্বপ্ন থেকেই যুগে যুগে বাংলার নারী অনুপ্রেরণা পাবে; এই আদর্শ সম্মুখে রেখেই যুগে যুগে তারা উন্নতির পথে, মুক্তিপথে অগ্রসর হবে।

কবির কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলি—

Mrs. R. S. Husain is no more. Long live R. S. Husain.

———

(প্রবাসী)

হিন্দুবিবাহে বিচ্ছেদপ্রশ্ন

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী

হিন্দু বিবাহবিধির অন্তর্গত কতকগুলি সন্দেহ দূর করিবার জন্য (মুখবন্ধ) ডাঃ গৌর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিবাহবিচ্ছেদমূলক বিল উপস্থিত করেন। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ঐ বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, হিন্দু বিবাহে সন্দেহমূলক কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাঁহার মতে হিন্দু বিবাহ একটি সংস্কার এবং ইহা একটি অচ্ছেদ্য মিলন। বলা বাহুল্য গোঁড়া মতাবলম্বী সকলেই এই মত পোষণ করেন।

এ স্থলে দেখিতে চেষ্টা করিব, সত্যই বিবাহবিধিতে বিচ্ছেদমূলক প্রশ্ন উঠিতে পারে কিনা।

বর্ত্তমান হিন্দু বিবাহ ব্রাহ্মণ্য প্রভাবান্বিত বিধি। ইহার মূলে বলা হইয়াছে—

হিন্দু বিবাহ একটি সংস্কার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইহার সহিত ধর্ম্মের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান (শুন্দ্র বাই বনাম শিবনারায়ণ—বোম্বাই)।

কলিকাতা হাইকোর্ট এই মূলনীতি স্বীকার করিয়া স্থির করিয়াছেন—

হিন্দুবিবাহে লৌকিকতা অপেক্ষা ধর্ম্মনিষ্ঠাই বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। বিবাহে যে মিলন গ্রন্থী রচিত হয় তাহা অবিচ্ছেদ—কারণ এ মিলনের সহিত নর নারীর মজ্জাগত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।...স্বামী হইবেন স্ত্রীর আরাধ্য দেবতা স্বরূপ এবং স্ত্রী হইবেন স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী।...স্বামী ব্যতীত স্ত্রী কখনও স্বতন্ত্রভাবে কোনও উৎসর্গ বা ধর্ম্মাচার পালন করিবার অধিকার পাইবেন না (তিকাইত মনোমোহিনী বনাম বসন্ত কুমার—কলিকাতা)।

অর্থাৎ এই মূলনীতি অনুসারে হিন্দুবিবাহ একবার সম্পন্ন হইলে, তাহার কোনও প্রকার বিচ্ছেদপ্রশ্ন উঠিতে পারে না। বলা বাহুল্য এই বিবাহ রীতি পরবর্ত্তী কালে সৃষ্টি হয়।

সাধারণ বিচারবুদ্ধি বা ন্যায়নিষ্ঠার দিক দিয়া ইহার উপর প্রশ্ন করা চলে না, সে কথা পরে বিচার করিব। এ স্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব, যে এই মূলনীতি হিন্দু জাতির সর্ব্বাবস্থায় অনুসৃত হয় নাই।

ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের আদি স্তরে বিবাহ বিধি সম্পর্কে মনু প্রভৃতির অভিমত বিচার করিলে মনে হন, উক্ত বিবাহ বিধিতে ধর্ম্মাচরণ অপেক্ষা লৌকিক দৃষ্টিই বেশী পরিমাণে বিদ্যমান।

বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, মনু প্রভৃতি ক্লীবের বিবাহ সমর্থন করে নাই। কারণ নপুংসক বা ক্লীবের পুত্রোৎপাদন শক্তি নাই। এই স্থলে স্পষ্টতঃ দেখা যায় মনু প্রভৃতি পুত্রোৎপাদনকেই বিবাহের আদি ও মূল উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করেন। অবশ্য সকল ঋষিই ক্লীবত্বকে বিবাহের পরিপন্থী বলিয়া নির্দ্দেশ্য করেন নাই—কারণ ক্লীব স্বামীর পত্নী কুলপুরোহিতের সহিত সহবাস করিয়া (নিয়োগ) পুত্রোৎপাদন করিবার অধিকার পাইতেন। অতএব উপরোক্ত আলোচনা করিলে এ কথা জোর করিয়া বলা চলে যে, পুত্রোৎপাদনই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য ও প্রাণবস্তু। পরন্তু "নিয়োগ" প্রথার প্রচলন দেখিয়া বিবাহের ধর্ম্মাভিষেক ও অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থীর পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহমূলক প্রশ্ন করাও চলিতে পারে।

নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল,—ইহা অধুনাতম বিবাহের মূলনীতি বিরুদ্ধ। বর্ত্তমান বিবাহের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পবিত্রতামূলক কল্পনার সহিত এই দৃষ্টান্তগুলি মোটেই সঙ্গতি রক্ষা করে না।

মনু রাক্ষসবিবাহ সিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। রাক্ষস বিবাহ এইরূপ—

যেথানে কন্যার আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া বরপক্ষ নিরুদ্দমান কন্যাকে জোর করিয়া হরণ করে সেরূপ ক্ষেত্রে বরপক্ষ রাক্ষস বিবাহ মতে কন্যাকে বিবাহ করেন।

রাক্ষস বিবাহের এত বর্ব্বরতা ও অপবিত্রতা সত্বেও সে যুগে ইহা সিদ্ধ বিবাহরূপে অনুমোদিত হইয়াছিল।

মনু পৈশাচ বিবাহের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন—

যদি কোনও যুবতীর ঘুমন্ত অবস্থায় বা অসতর্ক অবস্থায় কেহ তাহাকে (যুবতীকে) বলাৎকার করে, সে স্থলে পৈশাচ বিবাহ মতে উভয়ে সংযুক্ত হইবার অধিকারী।

এই দুই প্রকার কদর্য্যতম বিবাহের অনুমোদন দেখিয়া মনে হয়, মনু কখনই বিবাহকে একমাত্র সংস্কাররূপে গ্রহণ করেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে স্পষ্টই বোঝা যায় প্রাচীন কালে বিবাহ একটী লৌকিক অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত। এই দুই প্রকার বিবাহই সমসাময়িক অবস্থার সহিত আপোষ করিবার জন্য অনুমোদিত হয়।

অতএব এই দিক দিয়াও ডাঃ গৌরবের ন্যায় আরও অনেকে হিন্দুর বর্ত্তমান বিবাহের মূলনীতি সম্পর্কে প্রশ্নোত্থাপন করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে বলিতে পারি দেশ কাল এবং পাত্র ভেদে বিবাহ বিধির পরিবর্ত্তন বা উক্ত বিধির সহিত আপোষ নিষ্পত্তি করিবার অধিকার পর্য্যন্তও মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহই তাহার নজির।

প্রাচীনকালে মনু প্রভৃতি বিবাহকে একমাত্র অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বলিয়া লক্ষ্য করেন নাই। কতকগুলি ক্ষেত্রে বিষ্ণু বিবাহকে অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—খঞ্জ, বামন, জন্মান্ধ, নপুংসক, কুব্জ, দুখী ও রোগজীর্ণ ব্যক্তি চিরজীবন ধরিয়া বিবাহ করিবে না—বিষ্ণুর এই উক্তি অপর দিক হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদমূলক একটি ইঙ্গিত দানের পথ করিয়া রাখিয়াছে।

বশিষ্ঠ স্পষ্টভাবে আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন—

স্বামী যেখানে ভিন্ন জাতি, পতিত, নপুংসক, পাপাত্মা, সগোত্র, অথবা যাপ্য রোগাক্রান্ত, সেরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর জীবিতাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রীকে অপর পুরুষের নিকট দান করা যাইতে পারে।

বশিষ্ঠের এই উক্তির পর বিচ্ছেদ সম্পর্কে কোনও আপত্তিই উঠিতে পারে না।

নারদ ও পরাশর স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছেন, যে পঞ্চবিধ দুর্দ্দশায় স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণের অধিকার পাইতে পারেন—

স্বামী যেখানে অজ্ঞাত অথবা মৃত অথবা ভিন্ন ধর্ম্মী অথবা নপুংসক বা পতিত, পত্নী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের অধিকারিণী।

পূর্ব্বোক্ত ঋষিবৃন্দের মতাবলী আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, তাঁহারা হিন্দুর বিবাহ বিধিকে একমাত্র সংস্কার হিসাবে গণ্য করিতে চাহেন নাই। ইঁহাদের প্রচারিত বিবাহ বিধিতে যথেষ্ট লৌকিক উপাদান মিশ্রিত আছে। ক্ষেত্রে বিশেষ এবং অবস্থা বিশেষে ইহাতে বিচ্ছেদমূলক বিধান সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা বিবাহিত স্ত্রীর একটি স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইঁহাদেরই ঘোষিত বিবাহের সহিত বর্ত্তমান অচ্ছেদ্যতামূলক বিবাহের সামঞ্জস্য রক্ষা করা দুরূহ। বর্ত্তমান বিবাহ পুরুষের যথেচ্ছ নিষ্ঠুরতা ও সুযোগবাদিতার নামান্তর। এই বিবাহে স্ত্রীর স্বামী নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব বা দেহগত সত্বার পর্য্যন্ত বিলোপ সাধন করা হইয়াছে।

ইহারই সহিত মনু প্রভৃতির মতাবলী আলোচনা করিলে, স্বভাবতই বর্ত্তমান বিবাহের বিচ্ছেদ্যবাদের মূলে সন্দেহের প্রশ্ন উত্থিত হয়।

ডাঃ গৌরের এই বিচ্ছেদপ্রশ্ন তাঁহার স্বকপোল কল্পিত ব্যবস্থা নহে—ইহা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের একটা অধুনালুপ্ত প্রচ্ছন্ন বিধান মাত্র। (নবশক্তি)

মেয়েলি ও পুরুষালি শিক্ষা *

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী

কলিকাতা ও ঢাকায় মেয়েদের বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ সভায় সেদিন Oaten সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোন কোন কথার সম্বন্ধে বলিবার থাকিলেও তিনি যে মেয়েদের শিক্ষার ভার লইবার জন্য মহিলাদের আহ্বান করিয়াছেন, তাহা খুবই সঙ্গত হইয়াছে। যেদিক দিয়াই মেয়েদের জন্য যাহা কিছু করিবার চেষ্টা পাওয়া যায়, সবই শেষকালে তাঁহাদের শিক্ষার উপরই আসিয়া ঠেকে। এই শিক্ষার, বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার একান্ত অভাবেই তাঁহাদের জন্য কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাঁহাদের কাছে পোঁছানই যায় না, কোন কাজের ক্ষেত্রই মিলে না। কিন্তু এই শিক্ষার দৈন্য যে ঘোচে না, তাহারও প্রধান কারণ তাঁহাদের আপনাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের অভাব। পুরুষ শিক্ষিতেরা মেয়েদের শিক্ষার নাম হইলেই সাধারণতঃ তাহা এমন একটী অদ্ভুত জিনিষ মনে করেন, যে কল্পনা জল্পনা হইতে হইতে তাহার মধ্য হইতে "শিক্ষা" বস্তুটী ক্রমেই লোপ পাইয়া অবশেষে তর্ক বিতর্কেই মিলাইয়া যায়। আকার দিবার মত কোন পদার্থ আর তাহাতে বড় থাকে না। মেয়েদের শিক্ষা যে এত বড় "সমস্যা" হইয়া আছে, আর তাহা যে কিছুতেই অগ্রসর হয় না, তাহার কারণ তাঁহাদের শিক্ষার ভাগ্যবিধাতা পুরুষেরা। কেবল স্কুলকলেজের কর্তৃপক্ষ নহেন, বাড়ীর অভিভাবকেরাও। তাই প্রাইমারী পর্য্যন্ত যদিই বা মেয়েরা কোনমতে ছাড়া পায়, তাহার উপরে গেলেই সকলে দিশাহারা হইয়া পড়েন। মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে Oaten সাহেব যে "বিষম অনিচ্ছা ও সন্দেহের (grave dislike &distrust)" কথা বলিয়াছেন, মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে কর্ত্তাদের মনোভাব সম্বন্ধেই তাহা খাটে। "parent" বলিতেও প্রকৃতপক্ষে

* এই নিবন্ধটী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "ভারতী"র জন্য লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু "ভারতী" ঠিক ঐ সময়ই বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সম্ভবতঃ উহা তাহাতে প্রকাশিত হয় নাই (অন্ততঃ চোখে পড়ে নাই)। লেখাটিতে পুরুষমতের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে অনেকে হয়ত তাহাতে দুঃখিত ও বিরক্ত হইতে পারেন। কিন্তু পুরুষমতই প্রধান চলিত লোকমত বলিয়াই বলিতে হয়। মেয়েদের মত ত তাহার প্রতিধ্বনি মাত্র। তারপর পুরুষের মধ্যেই শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় মেয়েদের সম্বন্ধেও উক্তমতের লোক তাঁহাদের মধ্যেই সংখ্যায় বেশী আছেন সন্দেহ নাই। তবে মেয়েদের মন খুলিতে পাইলে যাহা হইয়া থাকে বা হইতে পারে স্বভাবতঃই ঠিক ততখানি বোঝা বা আগ্রহ তাঁহাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই হওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে মেয়েদের কাছ হইতেও তাঁহারা গ্রহণ করিতে থাকিয়া উভয়ের চিন্তার সমন্বয় সাধিত হইলে এবং জগতের যাবতীয় দুঃখ সমস্যার সমাধানেই নরনারী উভয়েরই ভাবনা ও প্রয়াস নিযুক্ত, গৃহীত হইলেই কিছু বলিবার থাকে না। তারপর শিক্ষিতারাও ইহাতে উল্লিখিত Oaten সাহেবের কথাতেই বিশেষরূপে উদ্বোধিত হইয়া মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারও যে গতি পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে কিছু সতর্কতা আবশ্যক বলিয়াও লেখাটী পুরাতন হইলেও প্রকাশিত হইল।

পিতাকেই বোঝায়। কারণ মাতার অনিচ্ছা তাঁহার অজ্ঞতার জন্য মাত্র। পিতার সত্য ইচ্ছা থাকিলে তাহা এমন কিছু প্রতিবন্ধকও হয় না। কিন্তু শিক্ষিত মেয়েরা যদি বড় বড় হোমরা চোমরার কথায় না ভুলিয়া নিজেরাই ভাবিয়া মেয়েদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে মেয়েদের কি:শিক্ষা দিতে হইবে না হইবে তাহা লইয়া এতটা মাথা ঘামাইতে হয় না। কারণ বিদ্যা বিদ্যাই, সকলকে তাহা এভাবেই লাভ করিতে হইবে। তাহার জন্য আগে হইতে স্বতন্ত্র মহাভারত সৃষ্টির দরকার করে না। তবে শিক্ষিত হইলে মেয়েরা আপনাদের জন্যই হউক বা সকলের জন্যই হউক, শিক্ষাবিজ্ঞানেও নানা দান দিতে এবং শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষেও যথেষ্টই সাহায্য করিতে পারেন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্যদেশে Montessori ইত্যাদি অনেকেই যেমন করিতেছেন।

"শিক্ষিতা"দেরও কাহাকেও কাহাকেও মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধতা করিতে দেখা যায় না এমন নয়। কর্ত্তাদের প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহারাও—"শিক্ষা ভাল, কিন্তু স্কুলকলেজের শিক্ষা, বই পড়া শিক্ষা ভাল নয়;—তাহাতে মেয়েরা পুরুষ বনিয়া যায়" ইত্যাদি বুলিই ছাড়িতে থাকেন। অথচ মুগ্ধ হইয়া বড়ই নূতন মেয়েলি মত আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। আর এক শ্রেণীর শিক্ষিতারা দেশের সাধারণ মেয়েদের হইতে এতই তফাতে পড়িয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের বিষয়ে ঠিক নিজেদের মত করিয়া ভাবিতে পারেন না। ঐসব মেয়েদের অবস্থার কোন দিকেই কূল কিনারা না দেখিয়া শিক্ষার অতি হোমিওপ্যাথিক মাত্রাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে সাধারণের বিরুদ্ধভাব এতই বেশী যে তাঁহারা বোধ হয় মন খুলিয়া কিছু বলিতে ভয়ও পান। তাই লোকপ্রিয় মত প্রকাশ করিয়া সকলকে খুসী করিবার প্রলোভনও হয়ত সম্বরণ করিতে পারেন না! ইহাও দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, ইঁহাদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যের মনই মেয়েদের সম্বন্ধে জাগিয়াছে বলা যাইতে পারে। সমস্ত নারীর সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি, অভিব্যক্তির বর্ত্তমান আদর্শের বিষয় তাঁহারা তেমন অনুভব, অনুশীলন করিয়াছেন বোধ হয় না। কাজেই শিক্ষিত হইলেও মেয়েদের বিষয় নিজেরা ভাবিতে অভ্যস্ত না হওয়ায় তাঁহাদেরও অনেকেই প্রচলিত মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকেন।

মেয়েদের এই সেকালেই টানিয়া রাখার চেষ্টায় অনেকে বলেন, পুরুষনিজে এ কাল গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ভাল কিনা সে সম্বন্ধে এখনও নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। সেইজন্যই মেয়েদের উহাতে ভয়। সে নিজে যাহাই করুক, মেয়েদের কাছেই যেন তাহার তবু আশ্রয় আছে, তাই তাহা আগলাইয়া রাখিতে চায়। নরনারীর অবিকাশের বৈষম্যমূলক সব কথারই ত এই শেষ যুক্তি। কিন্তু কথা হইতেছে, এই যে আর একজনকে আট্কাইয়া রাখিবার তাহার ভাগ্য নির্ণয় করিবার তুমি কে? তাহাপেক্ষা তাহাকেই তাহার বিষয় ভাবিতে দিলে হয় না! নিজে মন্দ হইয়া অপরের পুণ্যে তরিয়া যাওয়ার আশাইবা তুমি কি করিয়া করিতে পার? তাহাপেক্ষা ভালমন্দের মধ্য দিয়া উভয়েই হাত ধরিয়া চলিলে ক্ষতি কি? দু'জনাই দেখিতে থাকিলে পথের সন্ধান আরও

সহজে মিলিবারই সম্ভাবনা। আর তোমার পথে আসিলেই সে পথ সুপথ কি কুপথ দেখিতে পাইয়া তোমাকে সে বাঁচাইতে পারে। নতুবা তুমি বিপথে গড়াইয়া গেলে ঘরে বদ্ধ হইয়া তোমাকে সে কিরূপে রক্ষা করিবে? তুমি গড়াইয়া গেলে হাত, পা বাঁধা হইয়া ঘরে পড়িয়া থাকিয়া সে আপনাকেই বা বাঁচায় কি করিয়া?

ইঁহারা ভাবেন পুরুষই বরাবর নূতন নূতন পরীক্ষার মধ্য দিয়া নব নব জ্ঞান আহরণ করিয়া চলিবে, তারপর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যতটুকু সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন হইতে পারিবে, মেয়েদের ততটুকুই অগ্রসর হইতে দিবে। কিন্তু মেয়েরা ত চিরদিন পুরুষের পুচ্ছ ধরিয়া সে তাঁহাদের হিতচিন্তা করিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে তাহাই মাথায় করিয়া চলিতে চাহেন না, এখন তাঁহারা জীবনযাত্রায় উভয়েই একসঙ্গে চলিতে চান। নব নব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া নিজে নিজের আবার উভয়েই উভয়ের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া পরস্পরের মিলিত চিন্তায় সব বিষয়ের মধ্য হইতে গ্রহণ, বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইতে চান।

মনে পড়িয়া গেল পুরুষদের শিক্ষা না দিয়া মেয়েদের শিক্ষা দেওয়াকে কোথায় যেন ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ান বলিয়া তুলনা দেওয়া হইয়াছিল। এ পরিকল্পনা কোথাও হইতে ত শোনা যায় নাই। তবু উত্তরে বলিতে হয় মেয়েকে শিক্ষা দিলেও ঘোড়াকেই ঘাস খাওয়ান হইয়া থাকে। আর ঘাস খাওয়ানটা ঘোড়া, ঘোড়ী দু'য়েরই সমান আবশ্যক। বরং ঘোড়ীকে ঘাস খাওয়ানই বেশী লাভজনক মনে হইতেও পারে। এদিকেও দেখা যায় পিতা যতই জ্ঞানী, গুণী হউন, মেয়েকে গোমুর্খ করিয়া রাখিতে অনায়াসেই পারেন। কিন্তু শিক্ষিতা মাতা ছেলের সম্বন্ধে ওরকমটা করিতে পারিবেন মনে হয় না। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষা দিলে অতটা অপচয় না হইবারই সম্ভাবনা।

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত আরও ২।৪টী মতের বিষয় মনে আসিতেছে। বিশেষ দল ব্যতীতও এক শ্রেণীর পাশ্চত্য শিক্ষিতেরা বলিয়া থাকেন "মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করুক কিন্তু, তাহা যেন পাশ্চত্য শিক্ষা না হয়।" ইহার সাদা অর্থ এই দাঁড়ায় যে অন্য ইয়োরোপীয় ভাষা দূরে থাক, ইংরাজীও যেন মেয়েরা না শেখে। তাঁহারা ইহার যুক্তি দেন যে, "স্কুল কলেজে ছেলেরাই বা কতটুকু শিখিয়া থাকে। স্কুলের মেয়েরাও ইংরাজী ভাষামাত্রই সামান্য শেখে, কিন্তু মনের কর্ষণ তাহাতে কিছুই হয় না। উহাপেক্ষা কেবল বাঙ্গালা শিক্ষায় শিক্ষা বেশী হয়। স্কুলে সামান্য কিছুদিন ইংরাজী পড়া অপেক্ষা বাঙ্গলাই ভাল করিয়া শিখিলে শিক্ষা বেশী হইতে পারে।" কিন্তু "সামান্য কিছুদিন" মাত্রই মেয়েরা চিরকাল পড়িবে কেন? আর স্কুলের শিক্ষা যতই অপ্রচুর হউক তাহাতে সব বিষয়েই কিছু শেখাইবার চেষ্টা থাকে বলিয়া যাহার যে বিষয়ে ইচ্ছা করে আরও উন্নতি করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কেবল বাঙ্গলা শিখাইলে (তাহাই বা কোথায় কতটুকু শেখান হয়?) আপাততঃ যতই শিক্ষালাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হউক, তাহা একান্তই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। একেবারেই জানা না থাকায় অন্য ভাষা শিক্ষাদিও বিশেষ কঠিন হয়। আর শুনিতে যতই

খারাপ লাগুক, কেবল বাঙ্গলা শিখিয়া তেমন উচ্চশিক্ষা সত্যই কি সম্ভব? সব বিষয়ে উপযুক্ত পুস্তকের সংখ্যার অল্পতা বা অভাব ছাড়াও বিশ্ব পৃথিবীর কিছুই যে তাহাতে ঠিকমতভাবে কানে আনিতে চোখে পড়িতে পায় না। সব বিষয়েই পরের মুখে ঝাল খাইতে ও কোনমতে যাহা চোয়াইয়া আসে তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়। মজা এই, এই সব যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিজেরা কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষিত। আর ছেলেদেরও পাশ্চাত্যশিক্ষার মুখে যতই দোষ দিন, তাহা বন্ধ করিবার কোন লক্ষণই ত দেখা যায় না।

অনেকের আবার মেয়েদের এই তথাকথিত পাশ্চাত্য বা আধুনিক শিক্ষা একান্তই সৌখীন পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস। তাঁহারা বলেন "মেয়েরা সমাজের প্রয়োজনীয় সভ্য" (useful members of the society") হয়, ইহাই তাঁহারা চান বলিয়াই এরকম শিক্ষায় তাহাদের আপত্তি। এ যুক্তিটা একটু অদ্ভুত বটে। কারণ স্কুল কলেজের শিক্ষা যদি প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে উচ্চস্থানলাভ নাও করে, তাহাতে মেয়েদের অন্ততঃ কাজকর্ম্ম চালাইতে সক্ষম বেশীই করিয়া থাকে। "প্রয়োজনীয়" বলিতে ইহারা বোধ হয় শুধু রান্না ঘরের কাজই বোঝেন। তাই স্কুল, কলেজের মধ্যেও তাহা ঢুকাইবার জন্য ব্যস্ততা দেখা যায়। কিন্তু রান্না, ঘরের কাজের জন্যই কি যত ঠেকিয়া থাকে? যেখানে উহা যতটা আবশ্যক সেখানে সকলেই তাহা করেন না কি? কিন্তু অর্থোপার্জ্জন ছাড়াও অর্থব্যবহার, যথোপযুক্ত সঞ্চিত অর্থের রক্ষণ, তাহা ঠিকমত আদায় কিম্বা ব্যবসা ও বিষয়সম্পত্তির পরিচালন হইতে সামান্য টেলিগ্রাম ও মনিঅর্ডারের মত অতি ছোট ছোট কাজের জন্যও মেয়েরা কতটা অসহায়, অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকেন ও প্রবঞ্চিত হন ইহা কি তাঁহারা দেখিতে পান না? কাজেই মেয়েদের useful memebers of the society করিতে হইলেই বরং তাঁহাদের আধুনিক শিক্ষা ভালরকমে দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। আর শিক্ষিত হইলেই মেয়েদের বেশভূষার "বিলাসিতার" কথাও যে এতদিন সর্ব্বত্র শোনা যাইত, এখন তাহা বলিবারও আর কোন ক্রমেই উপায় নাই। কারণ আজকাল বেশভূষা এমন কি আধুনিক বেশভূষাও সকলেই করিতেছেন। বাস্তবিক ঘরের কাজ ও বেশভূষা প্রধানতঃ অবস্থার উপর নির্ভর করে, মেয়েদের বেলা একথাও তর্ক করিয়া বলিতে হয়!

আর একশ্রেণী যাঁহারা আধুনিক বলিয়া পরিচিত হইতে ভালবাসেন। মেয়েদের একটু হারমোনিয়াম টুং টাং করা আর ইংরাজী কহিতে কিম্বা যড়জোর উক্ত ভাষায় বাঁধিগতে চিঠি লিখিতে পারাই তাঁহারা মস্ত বড় জিনিষ বলিয়া মনে করেন। সত্য শিক্ষা, মনের কর্ষণ ও জাগরণের জন্য ইঁহাদের কোনও মাথাব্যথা নাই। অধিকন্তু ঐ রকম "শিক্ষিত" মেয়েরা যতই অশিক্ষিত হউক তদপেক্ষা শুধু বাঙ্গলা জানা হইলেও সহস্রগুণে শিক্ষিত মেয়েদের অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ইঁহারা আগের শ্রেণীরই অপর পিঠ। কথা হইতেছে এই যে রান্না, দেশীভাষা শিক্ষা আবশ্যক, গান, বাজনা, ইংরাজী বলা কহাও আবশ্যক, কিন্তু ইহার এক একটীকেই চরম বলিয়া দেখা হয়

কেন? বড় ক্ষেত্র দিয়া শক্তি, প্রকৃতি, প্রয়োজনানুসারে শরীর, মনের কাজ করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে মেয়েদের বাড়িতেই দেওয়া হউক না।

এইসব তর্কবাদে ইহাই প্রমাণ পায়, সত্যই মেয়েদের শিক্ষায় লোকের মন নাই আর তাই উহার জন্য অর্থও মিলে না। আর এ দু'য়ের অভাবে কোন প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিতে পায় না। ছেলেদের শিক্ষার জন্য সরকারের কাছ হইতে আদায় করিতে হয়, মেয়েদের জন্যও তাহা ত করিতে হইবেই, সাধারণের কাছ হইতেও তেমনি আদায় দরকার। কিন্তু তাঁহাদের হইয়া তেমন করিয়া এসব করে? তাই ত শিক্ষিত মেয়েদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এ সব কাজে আসা এত বেশী আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া এতই বেদনা বোধ হয় যে মেয়েদের মধ্যেও মুষ্টিমেয় যে ২।৪ জনার মাত্র এসব কাজে দান করিবার মত অবস্থা আছে, তাঁহাদের অর্থও ধর্ম্মের নামে অপচিত ও নানাভাবে প্রতারিত হইয়াই নষ্ট হয়। নিজেরা মান্ধাতার আমলেই থাকিয়া যাওয়ায় তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্মও সেই যুগেই আবদ্ধ রহিয়াছে। এইজন্য মেয়েরাই সর্ব্বাপেক্ষা অভাব ও দৈন্যগ্রস্ত হইলেও মেয়েদেরও অর্থ বা কল্যাণেচ্ছা কিছুই তাহাদের দিকে আসিতে পারিতেছে না। শ্রদ্ধেয়া হরিমতী দত্তের অনুরূপ দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল।

ইহাও আবার দেখা যায়, মেয়েদের শিক্ষায় চারিদিকে বিরুদ্ধতা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঔদাসীন্যাদি থাকিলেও কোন ভাল বিদ্যালয় হাতের কাছে পাইলে অনেকেই তাহাতে মেয়েদের পাঠাইয়া থাকেন। আর তাহার অভাবেই অনেক ইচ্ছা থাকিলেও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন না। অথচ কাহারও এতটা বেশী আগ্রহ নাই যে, তাহার জন্য নিজেরাই কোন উদ্যম উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইবেন। বিশেষতঃ যাহাদের ইচ্ছা আছে তাহাদের অনেকেরই হয়ত অর্থ ও সময়ের অভাব। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকেরাই ত নূতন কোন বিষয় আগে গ্রহণ করিয়া থাকেন! কিন্তু সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ধনীদের সাহায্য না পাওয়ায় তেমন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। বিস্তৃতভাবে সর্ব্বত্র মেয়েদের ভাল রকম শিক্ষায়তনই তাই আগে গড়িয়া তুলিতে হয়। তাহা হইলেই শিক্ষার বিস্তার আপনিই হইতে থাকিবে। তবে প্রথমে এই মাটী খোঁড়ার কাজটাই অবশ্য বিশেষ কঠিন। মেয়েদের মধ্যে যাঁহাদেরই মন এতটুকু খুলিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে তাঁহাদেরই তাই যে, যে রকম পারেন এ বিষয়ে প্রয়াস পাইতে হয়।

আপনাদের সব বিষয়ই অতি সাবধানতার সহিত বুঝিয়া দেখা মেয়েদের এখন বড়ই বেশী আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ সকল মুক্তিরই প্রথম ও প্রধান সোপান শিক্ষা। তাই সর্ব্বাগ্রে ইহার দিকেই অবহিত হইতে হয়। বিশেষ সতর্কতার সহিত চারিদিকের বুলিকে জয় করিতে ও সবই ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে। নিজেরা নিজেদের বিষয় ভাবিবেন বলিয়া অবশ্য মেয়েদের জন্য বেড়া দেওয়া বিশেষ রকম কোন পদার্থ সৃষ্টি করিবারও দরকার নাই। মনে রাখা উচিত শিক্ষাই হউক, স্বাধীনতাই হউক, মেয়েদের হইলেই তাহা স্বতন্ত্র বস্তু বনিয়া যায় না।

এক রকম চলিত মুদ্রাতেই সকলের কাজ চালাইতে হয়। সোনারূপাদি কিছুই ছেলেদের কাছে একরূপ, মেয়েদের কাছে অন্যরূপ ধরে না। কোন কিছুর মূল্য লইতেও মেয়েদের কাছে কেহ গিনির স্থলে পয়সায় ছাড়িয়া দেয় না। মনের বাজারেও যদি বাহিরের দামে কোন মতে ওজনে খাঁটি সোনার কম দিয়া তাঁহারা পার পাইয়াও যান, জীবন ভরিয়া সহস্র রকমে তাহার সুদ শুদ্ধ শোধ করিতেই হইবে। তখন রিক্ততার, লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। এই বুঝিয়া বিদ্যার খাঁটি সোনা তাঁহারা যতটা আয়ত্ব করিতে পারেন, সেই দিকে বড়ই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইহাতে তাঁহাদের মেকি দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা যে কত সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে প্রবল তাহা বলিবার নয়। সেইজন্য মেয়েদের বর্জ্জন করিতে হইবে, তাঁহাদের সম্বন্ধে এতদিনকার বুলি। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা আপনাদের অনধিগত তাহাতে পরের লইব না, নিজে গড়িব—বলা মূর্খতার চরম মাত্র। জগতের কোন কর্ম্মের শিক্ষা একদিন পুরুষেরই আয়ত্বে থাকায় তাঁহাদেরই তাহাতে অভিজ্ঞতা আছে, এজন্য মেয়েদের উহা পুরুষের কছে হইতেই লইতে হইবে। কিন্তু নিজেরা কি কতটা করিবেন না করিবেন তাহা আপনারাই ভাল জানেন ও বোঝেন বলিয়া সে বিষয়ে পুরুষের মতবাদের অপেক্ষা তাঁহারা রাখিবেন না।

বিশেষ রকম মেয়েলি শিক্ষার সহিত technical বা বিশেষ বিশেষ বৃত্তি শিক্ষার সাদৃশ্য আছে। তাহাতেও সাধারণ শিক্ষাকে গালি দিয়া ঐরকম বিশেষ শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে গেলেই দেখা যায়, সেই অতি নিন্দিত জিনিষটী নহিলে কিছুই হয় না। শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে জাতীয় বা ধর্ম্ম মূলক করিতে গেলেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। এই রকম সব চেষ্টার পরই আবার সেই একই রাজপথ ধরিতে হয়। উহাদের তবু সকল সখ ও পরীক্ষাই মানাইতে পারে; কিন্তু মেয়েরা একবার শিক্ষায় নিম্নতর মান মানিয়া লইলে আর রক্ষা থাকিবে না। অমনি দ্বারে অর্গল পড়িয়া যাইবে, পরে আর কিছু পাওয়া আরোই কঠিন হইবে।

বেড়া দিয়া বিশেষ রকম মেয়েলি শিক্ষার সৃষ্টি দূরে থাক এখন বরং সহ-শিক্ষার (co-edneation) দিকেই আসিতে হইবে। শিক্ষায় ঐ আদর্শটীই যে ঠিক ও মিতব্যয়িতামূলক তাহা ক্রমেই প্রমাণিত হইতেছে। আর এই শিক্ষার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের রাজ্যে নরনারীর সহযোগিত্ব জীবনের প্রথম হইতে আরম্ভ হইলেই তবে অন্য সকল বিভাগে তাহা সম্ভব ও সহজ হইবে। মেয়েদের সম্বন্ধে সংস্কারের দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ভেদ করিবারও ইহার প্রধান উপায়।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর যখন যাহা কিছু দোষ চোখে পড়ে, নরনারীর মিলিত চেষ্টায় তাহা দূর করিতে হইবে। যেখানে শক্তির অপচয় অত্যধিক চাপ ইত্যাদি আছে, তাহা নিবারণ করা চাই। শিক্ষা অপেক্ষা পরীক্ষার ঘটা অহিতকর ও হাস্যস্পদ। কিন্তু পরীক্ষা জিনিষটীও কতকগুলি আবশ্যকীয় কারণেই জন্মিয়াছে। পরীক্ষায় ছেলে মেয়েদের কিছু শক্তির অপচয় ও অনর্থক দুঃখ আছে। কিন্তু তবু উপাধি পুরস্কারাদি তাহাদের শিক্ষালাভে উৎসাহিত করে।

আমাদের মন সব স্থলেই কৃতকর্ম্মের একটা প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে চায়। আপন ক্ষমতাবলে সকলের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করার ইচ্ছাও মানুষের আছে। তাই বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কষ্ট থাকিলেও এবং তাহা অনেক বিষয়ে অনিষ্টকর হইলেও ছেলেমেয়েরা সকলেই আপনাপন শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রও কিছু পাইয়া থাকে। আর তাহার জন্যই আপনাদের পরিপূর্ণ শক্তি খাটাইতেও প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাস না থাকায় এই ভাবে কাজ করিতে বর্ত্তমানে মেয়েদের কাহারও কাহারও কিছু অসুবিধা হইতে পারে, তবু তাহারাও ইহাতে সমানই উৎসাহিত হইয়া থাকে। এই রকম মার্কা থাকিলে কাজ চালাইবার পক্ষে মানুষের মোটামুটি বিচার করাও কতকটা সহজ হয়। জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে আসিলেই মেয়েদেরও তাই এই মার্কার দরকার হয়। নরনারীর যখন এক পৃথিবীতেই বাস করিতে হয়, তখন এক ভাবেই তাঁহাদের মূল্য ও মার্কা না থাকিলে উপায় নাই। তবে পরীক্ষা মূলক প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাপেক্ষা শিক্ষার উৎকৃষ্টতর প্রণালীর সন্ধান এখন পাওয়া যাইতেছে। তাহাই ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরীক্ষার হুড়াহুড়ি দূর করিতে হইবে।

কোন শিক্ষাভিজ্ঞ বলিয়াছিলেন, ছেলেমেয়েরা যাহাতে সদাত্মা ও উত্তম নাগরিক (good soul and good citizens) হয়, সেই রকম শিক্ষাই তাহাদের দেওয়া উচিত। আর যে পরিমাণে আমরা তাহাতে কৃতকার্য্য হইব, সেই পরিমাণেই তাহারা আপনা হইতেই ভাল ছেলে বা ভাল মেয়ে হইয়া উঠিবে। শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাই মোটামুটি আদর্শ হইতে পারে।

এখনকার শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে অবশ্য অনেক দোষ আছে। বিশেষতঃ মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নানাভাবে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার কারণ আরও বেশী থাকায় বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। তবে Oaten সাহেব স্কুলে পড়ার পরেই মেয়েদের বিবাহ যতটা খারাপ বলিয়াছেন, তেমন কিছু হয় না। অনেক মেয়েরই ত পরীক্ষার পরই বিবাহ হইতেছে, তাহাতে কেবল পরীক্ষার পর বিবাহের জন্যই বিশেষ রকম কিছু অনিষ্ট ঘটিতে দেখা যায় না। প্রতিকূল অবস্থায় ও নানা কারণে যাহার যে পরিমাণে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, সেই পরিমাণে ক্ষতি তাহার সব বিষয়েই হইয়া থাকে। ইহাও ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছে যে, যে সব মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ে না, তাহাদের স্বাস্থ্যও খুব ভাল এমন নয়। ঘরের মধ্যে গড়াইয়া চলায় সব সময় তাহা ততটা চোখে পড়ে না মাত্র। শিক্ষিত মেয়েদের উপর কার্য্যক্ষেত্রে দাবী পড়াতে উহা এতটা প্রত্যক্ষ হয়। কাজেই মেয়েলি শিক্ষার নামে শিক্ষাকেই অসার ও পঙ্গু করিয়া না তুলিয়া পরিপূর্ণ শিক্ষার সহিত পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের চেষ্টাই মেয়েদের জন্য ভাল করিয়া করা দরকার।

পরিপূর্ণ শিক্ষায় অবশ্য মেয়েদের জীবিকার্জ্জনের যোগ্যতা লাভও বুঝাইবে। সেইজন্য শিক্ষা ও সদ্ভাবের আব হাবহাওয়ার মধ্যেও যেমন ছেলেমেয়েদের রাখিতে হইবে, ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতাও সকল রকম অবস্থার মধ্যে আপনাকে চালাইবার ক্ষমতা যাহাতে তাহারা লাভ করিতে পারে, তাহাও দেখিতে হইবে। এই রকম স্বাবলম্বনের শক্তি থাকিলে মেয়েদের মনোমত বিবাহের

সম্ভাবনাও বাড়িবে। নতুবা বিবাহের জন্যই মেয়েদের বিশেষ রকম পঙ্গু করিয়া তৈরা করিতে থাকিলে বিবাহের আশাও তাহাদের কমিয়াই যাইতে থাকে। এখন জীবন সংগ্রামের কাঠিন্যের জন্য ছেলেরা বিবাহের দায়িত্ব লইতে ক্রমেই ভয় পাইতেছে। সেইজন্য উপার্জ্জনের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বিবাহ করিতে গিয়া ছেলেদের বিবাহের বয়স অনেক স্থলে আবঞ্ছনীয় রূপেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এদিকে শুধু বিবাহের আশায় বসাইয়া রাখিলে মেয়েদের লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়াই কন্যাপক্ষ মেয়ের বিবাহের জন্য আরও বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়েন। গরজ বেশী বলিয়া তাই বরপণাদিতে অপরপক্ষকে তাঁহাদের ঘুষও দিতে হয়। বরকন্যার শিক্ষাদীক্ষা; বয়সের পার্থক্য ও ইহাতে ক্রমেই বাড়াইয়া তুলিতেছে। মেয়েদের অর্থার্জ্জন ক্ষমতা হইলে ছেলেদের বিবাহভীতিও যেমন কমিতে পারে, মেয়েদের অভিভাবকেরাও তাহাদের সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া অপেক্ষা করিতে পারেন।

মেয়েদের অর্থার্জ্জনের কথা হইলেই সাধারণতঃ চরকা সূচীশিল্পের নামই হইয়া থাকে। সূচীশিল্পটী মোটামুটি শেখা সকলেরই আবশ্যক হইলেও চরকাদিতে অর্থাগম কতটুকু হইয়া থাকে? যাহাদের আর কিছু শিখিবার সম্ভাবনা নাই (এমন মেয়েও অবশ্য অনেক আছেন) তাহাদেরই উহা অবলম্বন হইতে পারে। মেয়েদের সব কাজই প্রায় ঘরে বসিরা বদ্ধভাবে করিতে হয়, সুতরাং যাঁহারা মেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতির কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা সে কি করিয়া আবার শুধু ঐগুলিই মেয়েদের ঘাড়ে চাপাইতে চাহেন, বোঝা কঠিন। ইহাপেক্ষা ব্যবসায়ের মত করিয়া ফুল, ফল শাক সব্জির চাষও অনেক স্বাস্থ্যকর ও মনের স্ফূর্ত্তিজনক। বিশেষতঃ ফুলের বাগান ও নানা রকম পুষ্পশিল্প, উৎসবাদিতে পত্র পুষ্পের দ্বারা ঘর সাজান ইত্যাদির শিক্ষায় মেয়েরা একসঙ্গে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যচর্চ্চার অনুকূল কাজ পাইতে পারেন। গান, বাজনা ভালরূপে শিখিলেও একটী উৎকৃষ্ট কলানুশীলনের আনন্দলাভের সহিত উহার শিক্ষাদানে আজকাল তাঁহারা উপার্জ্জনও ভালই করিতে পারেন বলিয়া মনে হয়। চিকিৎসা, উন্নত প্রণালীর শুশ্রূষা এবং সাধারণ শিল্পদানের বিস্তৃত ক্ষেত্র ও পড়িয়াই রহিয়াছে। চিত্রবিদ্যার বিবিধ বিভাগ এবং ফটোগ্রাফিতেও আমাদের মেয়েরা এখনও হাত দেন নাই বলিলেই হয়। এই রকম আরও অনেক দিকেই শরীর, মনের চালনার সহিত অর্থার্জ্জনের ক্ষেত্রও আছে। শিক্ষার জন্য ছেলেদের পাশ্চাত্যদেশে পাঠান খুবই প্রচলিত হইয়াছে। আপাততঃ কিন্তু মেয়েদেরই তাহা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল স্বাধীন দেশের হাওয়ায়, জ্ঞান কর্ম্মের সচলতার মধ্যে শিক্ষালাভ করিতে না পাইলে আমাদের মেয়েদের বদ্ধতা ও জড়ত্ব ঘুচিবার নয়। তবে আগে যাঁহারা পাশ্চাত্য দেশে বা পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত হইতেন, তাঁহাদের মত পাশ্চাত্য সভ্যতার বুদ্বুদের মধ্যেই অবশ্য ইহারা সন্তরণ করিয়া বেড়াইবেন না। পাশ্চাত্য নব নব জ্ঞান কর্ম্মের শিক্ষাকে নিজস্ব করিয়া লইবার মত শক্তি ও মনুষ্যত্বের খোরাক তাঁহাদের থাকা চাই।

মেয়েদের মুষ্টিমেয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন জ্ঞানী, গুণীর, শুভাগমন ঘটিলে বরাবরই তাহাদের বিদ্যার উন্নতিতে কিছুমাত্র উৎসাহ না দিয়া এমন কি নিন্দা, অবজ্ঞা, অনুৎসাহ দেখাইয়া কেবল রান্না, সেলাই বা ধর্ম্মশিক্ষার নামে পূজা অর্চ্চনার শ্লোকপাঠকেই যে শুধু আকাশে তোলা হয়, ইহাও কি কম দুঃখের বিষয়! এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যে ২।৪টী মেয়ে এই সকল প্রতিষ্ঠানে আসে, তাহারা কি বিদ্যাবিষয়ে এতটা অবহেলা পাইবার যোগ্য? রান্না ও সেলাইয়ের দরকার আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে সাধারণ বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষাই মেয়েদের কাছে অনেক বেশী দুর্লভ ও কঠিন হইয়া নাই কি?

অজানা

শ্রীজয়শ্রী দেবী

অজানা সে! বড় সে আপন।
অলখ চরণ পাতে,
আসে সে নীরব রাতে,
ঘুমালে জাগায় মোরে
চুমিয়া নয়ন।
জানিনা কোথায় থাকে,
কেন নাম ধরে ডাকে,
সে কেন ভরিয়া রয়
আমার স্বপন।
কী যে তার ভালবাসা,
কি তার নীরব ভাষা,
বুঝিতে পারিনে তবু—
জুড়ায় বেদন,
কি কোমল! কি করুণ!
নিঠুরো এমন!

কি জানি কেমন করে
বাঁধিতে সে চায়—
আপনি কাঁদিয়া কেন
আমারে কাঁদায়।
আমারে বুকের কাছে
প্রতি পলে পলে যাঁচে
তবু সে দেয় না ধরা
আড়ালে লুকায়!
সারাটী জনম ভ'রে
ব্যাকুল করিলে মোরে
কি রূপ তোমার বঁধু
দেখাও আমায়!
নিঠুর মরমী মোর!
এত কি কাঁদায়!

গোলক ধাঁধাঁ

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

(২২)

বিকালবেলা বসিবার ঘরে তর্ক চলিয়াছে। সত্যকাম আসিয়াছে, বারীন আসিয়াছে, আর শান্তা ও সুষমা। বারীন বলিতেছে, "লক্ষ্য কি তা জানিনে। কিন্তু লক্ষ্য একটি নির্দ্দিস্ট না থাক্‌লে পথে চলা অসম্ভব এটা ঠিক। তাই তো খুঁজ্‌তে চেষ্টা করি।"

সুষমা বলিলেন, "অত বড় বড় কথা বুঝিনে ভাই। বিশ্বসৃষ্টির লক্ষ্য আর অর্থ নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার অবকাশ নেই। দরকারই বা কি? সোজা বুদ্ধিতে যা ভাল বলিয়া মনে করি তাই করে যাব। ব্যস্‌।"

যা ভালো বলিয়া মনে করি!—শান্তা মনে মনে একটু হাসিল। ভালোই বা কি মন্দই বা কি—সেই কথাটা জানিবার জন্যই তো এত বাক্‌বিতণ্ডা! একনিঃশ্বাসে সুষমা কেমন করিয়া তাঁহার জীবনযাত্রাপথের সকল ভালোমন্দ নির্ণয় করিয়া ফেলিতে পারিতেছেন সে তো ধারণা করিতে পারে না। তাহার যে প্রতিপদক্ষেপে ছোটখাট খুঁটিনাটি সর্ব্ববিষয়ে জটিল সমস্যার উদয় হয়। কতদিন এমন হইয়াছে—একটা ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে গিয়াও সে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে, সাগ্রহে উপাদেয় ভোজ্য মুখে তুলিতে গিয়াও প্রশ্ন জাগিয়াছে, লোভের এ তৃপ্তিসাধন কিসের জন্য? অন্যের চক্ষে এসব অত্যন্ত হাস্যকর প্রশ্ন। কিন্তু শান্তা যে ইহা লইয়াই বিব্রত হইয়াছে। যাহা উচিত তাহার এক পা এদিক ওদিক সে কিছুতেই পা বাড়াইবে না, এই সঙ্কল্প। অথচ উচিত-অনুচিত খুঁজিয়া বাহির করিতেই যে জীবন কাটিয়া যায়।—শান্তা ভাবিতে লাগিল।

সুষমার একনিমেষের সমাধানের উত্তরে বারীন আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বলিল, "সে হয় না কাকীমা। আচ্ছা শান্তাদি, আমার কেমন যেন মনে হয়, জগতের আদি থেকে অন্ত জুড়ে আছে একটিমাত্র সূত্র—প্রেম, একটা সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, সর্ব্বব্যাপী প্রেম। মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে লুকিয়ে থেকে সেই-ই সবাইকে সাম্‌নের পথে প্রেরণা দিচ্ছে।"

শান্তা অন্যমনে তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। প্রেম? তাই কি? অসম্ভব নয়। এই প্রেম বস্তুটিকে সেও বড় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের চক্ষে দেখে! তাহার নিজের মনের মধ্যেও এ যেন কেমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। ছেলেবেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত সে যেন কাহাকেও ভালো না বাসিয়া পারে নাই। পাছে কাহারও মনে একটু ব্যথা লাগে, এই আশঙ্কায় সে নিজের স্বাভাবিক ভালোলাগা-মন্দলাগাকে ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া রাখিয়া সকল সময় সকলকে আচরণের মাধুর্য্যে স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সত্যই, প্রেম কি অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি! শান্তার মনে হইল, এই

অমৃতরসে চিরকাল ডুবিয়া থাকিতে পারিলেই সে নিজেকে সার্থক মনে করে। কিন্তু তাই কি? আর সকল প্রেরণা বিদায় দিয়া শুধু একমাত্র এই প্রেম কি তাহার সারাজীবনখানি ভরিয়া রাখিতে পারে? ভালোবাসিলাম আর ভালোবাসা পাইলাম—তাহাতেই কি সব? আরও যে কত ফাঁক থাকিয়া যায়। প্রাণের সকল অভাব তো পূর্ণ হয় না! শান্তা প্রাণপণে একবার নিজের মধ্যে তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিল—কি সেখানে আছে, আর কি নাই। কি পাইলে সে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে!—তৃপ্তি? তৃপ্তি হইলে যে সব ফুরাইল! আর তো করিবার কিছু থাকে না, চলিবার পথ থমকিয়া দাঁড়ায়। তাহাতে তাহার কি সুখ?—ঠিক্! শান্তা যেন হঠাৎ কিনারা খুঁজিয়া পাইল। ঠিক বটে! থামিয়া থাকাতে জীবনের সার্থকতা নাই, মানবাত্মার আছে অনন্তাভিমুখী গতি। তাই তাহাকে রুদ্ধ করিতে তাহার হৃদয় বেদনা পায়; তাই শুধু প্রেম লইয়া সে পূর্ণতার অনুভূতি পায় না। প্রেম যেন কেমন নিষ্ক্রিয়। সে যেন আলসে আবেশে মানুষের মনটাকে নেশার মত জড়াইয়া রাখে। সাম্‌নে চলিতে বড় দেয় না। ভারি স্নিগ্ধ, ভারি মধুর! কিন্তু বাঁধিয়া যে রাখে সেই তো তাহার দোষ! প্রেম ছাড়া আরও যে সহস্ররকম প্রবৃত্তি তাহার মনকে ক্ষণে ক্ষণে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদের সার্থকতা হইবে কিসে? তাহাদের প্রতি অন্ধ থাকিতে তো সে পারে না! বিশ্বপ্রকৃতি যখন তাহার চক্ষুর সম্মুখে আপনার বিচিত্র দুর্ব্বোধ প্রশ্নরাজি লইয়া আসিয়া দাঁড়ায়, সে তো তাহার প্রহেলিকা ভেদ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, সমস্ত দেহমন যেন মস্তিষ্কের মধ্যখানে ধীরূপে একত্রিত হইয়া উঠিতে চায়! জ্ঞানের অফুরন্ত পিপাসা থামাইয়া রাখিবার নয়। তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনখানির পদে পদে যখনই ছোটবড় নানাবিধ বাধা আসিয়া ভ্রূকুটি করে, তাহার সত্তার অণুতে অণুতে অমনই যেন শক্তিপ্রচেষ্টা পুঞ্জীভূত হইতে থাকে সেগুলিকে দলিয়া চলিয়া যাইবার জন্য! যতই অক্ষম হইয়া পড়ে, যতই আপনার দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়, ততই তাহাকে অতিক্রম করিবার জন্য লিপ্সা যেন আরও বাড়িয়া ওঠে, পরের কাছেই হউক, নিজের কাছেই হউক, পরাজয়ের অপমান সে যেন সহ্য করিতে পারে না! ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডারে কি অপরিমেয় প্রচণ্ড শক্তিই না খেলা করে! সে কেন তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবে না। পারুক বা নাই পারুক, চেষ্টার বিরাম নাই, সাধনা চলুক্। জ্ঞানের জন্য, শক্তির জন্য এই সাধনা ও সংগ্রামের মধ্যে সে যত আনন্দ পায়, শুধু প্রেম লইয়া সে আনন্দ সে তো পায় না। তাহাতে তাহার জীবন অসম্পূর্ণ। বারীনের মত যাহারা শুধু প্রেমকেই হৃদয়ের রাজা বলিয়া মানিয়াছে, সে তাহাদের একজন নয়। তাহার জীবনের অলক্ষ্য লক্ষ্য—সীমাহীন জ্ঞান, অপরাজেয় শক্তি, অগাধ প্রেম। কোনও একটিমাত্রকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া বরণ করিতে পারে না। সুদূরগামী বন্ধুর তাহার চলিবার পথ, 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' প্রেম তাহার সেই যাত্রাপথে মলয়ানিল হইয়া পথের দুর্গমতাকে একটুখানি অপসারিত করিয়া দিবে, এই মাত্র।

শান্তা বলিল, "না ভাই, সে আমি মনে কর্ত্তে পারিনে। শুধু ভালোবাসা দিয়ে জগৎ-রহস্যের মূল পাওয়া দুষ্কর। আমি তো অন্ততঃ পাচ্ছিনে। জানো, প্রেম যেন জ্যোৎস্নার মত

শুধু স্নিগ্ধই করে, কিন্তু যথেষ্ট আলো দেয় না। তাতে করে জীবনের সবখানি কাজ চলে না, প্রখর রোদেরও একটু দরকার।"

বারীন উত্তর করিল না।

শান্তা আবার বলিল, "আচ্ছা, সত্যি বল তো—তুমি কি চিরকাল এম্‌নি অস্পষ্ট আলো আঁধারে তৃপ্ত থাক্‌তে পারো?"

একটুখানি হাসিয়া বারীন বলিল, "বোধহয় পারি।"

সত্যকাম এতক্ষণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। শান্তার প্রতি কটাক্ষ করিয়া হাসিয়া সুষমাকে বলিল, "আসুন বৌদি, আমরা ক্যারম্‌ খেলি। ওসব দার্শনিক বক্‌বকানি আর বরদাস্ত হচ্ছে না—আমার ধাতে সয় না।" ঘরের ওপাশে দেয়ালের কোণ হইতে ক্যারম্‌বোর্ডটি টানিয়া গুটিগুলি উবুড় করিয়া ঢালিয়া সত্যকাম বলিল, "আসুন বৌদি।"

শান্তা ফিরিয়া তাকাইয়া একটুখানি হাসিল। বারীন বলিল, "দেখুন শান্তাদি, জীবজগতের মনস্তত্ব খুঁজে দেখ্‌লে কি পাওয়া যায় বলুন তো?"

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "কি পাওয়া যায়?"

"আমি বলি—আনন্দ। আনন্দাদেব খল্বিমাণি ভূতানি জায়ন্তে।"

"ঠিক, তাই বটে!"

"তবে?"

"তবে কি?"

"সেই জন্যেই তো বল্‌চি, জীবনের মূল হচ্ছে প্রেম। প্রেম আর আনন্দ একই তো জিনিষ—ঠিক যেন দুধ আর ক্ষীর। একটা আর একটার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। নয়?"

শান্তা হাসিয়া একটু মাথা দোলাইয়া বলিল, 'ঠিক বল্‌তে পারি না। প্রেমে আনন্দ অনেক্‌খানি আছে জানি, কিন্তু সবখানিই আছে, একথা কি করে বলি বল? অন্ততঃ আমার নিজের কথা তো বল্‌তে পারি—আমার আনন্দের জন্যে আরও অনেক কিছুর দরকার।"

একটু থামিয়া আবার বলিল, "জানো বারীন, ভালো আমিও বাসি, বড় বেশী ভালোবাসি মানুষকে। কিন্তু সেইজন্যেই তো বুঝ্‌তে পারি, শুধু প্রেমে হয় না। মানুষ আনন্দ খোঁজে। সে আনন্দ আমি তাকে দেব কেমন করে? শুধু ভালোবেসে? তা কি হয়! আনন্দবিধানের পথটি খুঁজে বার কর্ত্তে গিয়েই তো আমার সুস্পষ্ট জ্ঞানের দরকার। কি করে পৃথিবীর এই দুর্গম বনজঙ্গল সাফ করে তার মধ্যে দিয়ে ঐ পথ কেটে বার করে আলোর সন্ধান দেব, সেইজন্যেই তো আমার দুর্দ্দম শক্তি চাই। বুঝতে পারো না? শেলীর স্কাইলার্কের মত শুধু ভালোবাসার নেশায় মস্‌গুল্‌ হয়ে ভাবের আকাশে বিচরণ কর্লে তো চলে না! চাই সূক্ষ্ম চিন্তা, কঠোর শক্তি!"

দেখিতে দেখিতে কথার স্রোত মুখ ফিরাইল, দর্শনের গবেষণা সাহিত্যের চর্চ্চায় নামিয়া আসিল। বারীন আরম্ভ করিল শেলী। শেলী কবিতা তাহার কণ্ঠস্থ, কথায় কথায় আবৃত্তি। অনেকখানি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বারীন আবার বলিল, "ইংরেজ কবিদের মধ্যে শেলীকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি।'

শান্তা বলিল 'আমিও বাসি খুব।'

কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বারীন বলিল, 'ওর একটা কবিতা যা চমৎকার—আমার কাছে সবচেয়ে বেশী অ্যাপীল করে সেইটে।'

'কি বল তো ?'

আপনি বলুন দেখি !'

'আমি কি করে জান্‌ব ?'

'আন্দাজ ?'

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শান্তা বলিল, 'ওড্ টু দি ওয়েষ্ট্ উইণ্ড!'

মাথা নাড়িয়া বারীন বলিল, না। ওসব আপনার ফিলজফিতেই ভালো লাগ্‌বার কথা, আমারটা অন্যরকম।'

'তবে জানি না।'

"বলুন !"

'তুমি বল।'

বারীন হাসিয়া বলিল, 'না থাক্, বল্‌ব না।'

'কেন ?'

কথা না বলিয়া সে শুধু মৃদুহাস্যে শান্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বারীনের এই সরল অথচ সলজ্জ হাসিটুকু শান্তার বড় ভালো লাগে।

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাই, বল না ?'

জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বারীন বলিল, 'টু এ লেডি উইথ্ এ গিটার।'

শান্তা হাসিয়া বলিল, 'ও !'

সুষমা ততক্ষণে খেলা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন, যাই দেখি একবার প্রভার ওখানে। রেণুর জ্বরটা ছেড়েচে ঠাকুর পো ?'

সুষমা চলিয়া গেলেন। বারীন ও উঠিয়া দাঁড়াইল, 'যাই আজ সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

শান্তা বলিল, 'এসো।"

আকাশে রেখার মত একটু চাঁদ উঠিয়াছে। জানালা দিয়া ফুর্‌ফুর্ করিয়া হাওয়া আসিল। শান্তা উঠিয়া গিয়া দাঁড়াইল—মনটা বেশ ভালো লাগিতেছে আজ। সেই মৃদু জ্যোৎস্না, সেই

মলয় বাতাস বহিয়া আসিয়া অনাবিল একটা প্রেমের স্পর্শ যেন গায়ে বুলাইয়া যাইতেছে। ঠিক তাহার কল্পনার জগৎটি যেন! সত্যকাম পিছন হইতে ডাকিল, 'শান্তা!'

অন্যমনস্কভাবে সে জবাব দিল 'কি বল।'

পরিহাসের সুরে সত্য বলিল, 'থাক্ দরকার নেই। অমন মুখ ফিরিয়ে 'হঁা, না' শুন্‌বার জন্যে আমার কথা বল্‌বার কিছু এমন দায় পড়েনি!'

শান্তা একটু হাসিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের উপরের ফুলদানী হইতে একটি ক্রাইসেন্থিমাম্ তুলিয়া লইয়া দোলাইতে দোলাইতে সত্যকাম বলিল, 'এসো একটু দার্শনিক গবেষণা করি। কেমন?'

হাসিয়া শান্তা বলিল, "দর্শন শাস্ত্রে তোমার যে রকম সূক্ষ্মবুদ্ধি! অনর্থক কথা বলে বাজে সময় নষ্ট করি না আমি কখনো।"

'ও বাবা!'

একটু চুপ করিয়া আবার সত্যকাম বলিল, না, সত্যি! আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। আমি তোমাকে প্রশ্ন করি, তুমি উত্তর দিয়ে সমাধান করে দাও। হ্যাঁ?'

'তোমার আবার সমস্যা? কি শুনি?'

'কেন, আমার থাক্‌তে নেই? আচ্ছা শোন—'

'বল।'

ভালো করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সত্যকাম প্রশ্ন করিল, 'তুমি তো বিশ্বপ্রেমিক?—

আশ্চর্য্য হইয়া শান্তা বলিল, 'কে বল্লে?' "তুমিই। আমার কাণ নেই বুঝি? ক্যারমের গুটির চটাপট্ শব্দের মধ্যেও তোমার কথাগুলো সেখানে গিয়ে পৌঁছে!"

শান্তা হাসিয়া বলিল 'ভালো।—কিন্তু তুমি ভুল কর্‌ছ। আমি বিশ্বপ্রেমিক এমন কথা তো কক্ষণো আমি বলিনি, তবে পার্লে ভালো হত; সেই চেষ্টা কর্চ্ছি।'

'তবে তাই। তাতেই যথেষ্ট! কিন্তু আমার প্রশ্নটা কি জানো—'

একটু কুতূহলী হইয়া শান্তা বলিল, 'কি?'

'তোমার বিশ্বের পরিধি কতটুকু জান্তে পারি কি?"

শান্তা অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিশ্বের পরিধি? সে আবার কি? সত্যকাম তাহার জিজ্ঞাসু চোখের উপর আপনার গাঢ় দৃষ্টিখানি স্থাপন করিয়া বলিল, 'বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

'না।'

'তবে থাক্।'

শান্তা বলিল 'থাক্‌বে কেন? হেঁয়ালী ছেড়ে সোজা ভাষায় বল, তাহলেই বুঝ্‌তে পারব।'

অকস্মাৎ সত্যকামের মুখশ্রী যেন কেমন হইয়া উঠিল। ধীরে সে মাথাটা একটু নামাইল। অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় ও আগ্রহে শান্তার বুকের মধ্যেও দুলিয়া উঠিল—সত্যকাম কি কথা বলিবে কে জানে? সত্যের ঠোঁট দুখানি যেন একটু কাঁপিল, আনত মুখখানি তুলিয়া এবার জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমারে বিশ্বের মধ্যে—আমি—আমার একটু খানি স্থান আছে কি?

শান্তা চমকিয়া উঠিল। লজ্জায় রাঙ্গা মুখখানি সত্যকামের উদগ্রীব দৃষ্টি হইতে লুকাইবার জন্য সে হঠাৎ বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইল। নীচে বারান্দায় কেহ আসিল কিনা, তাহাই দেখিবার জন্য ব্যস্ত।

তাহাকে ঘিরিয়া ধীরে ধীরে পলে পলে সত্যকামের হৃদয়ের মধ্যে যে একখানি প্রেমকুঞ্জ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা সে অনেকদিন হইতেই মাঝে মাঝে অনুভব করে যেন। সত্যর প্রত্যেক বাক্য ভঙ্গী, দৃষ্টির মধ্যে কি যেন সরসতা ও গোপন মাধুর্য্য প্রচ্ছন্ন থাকে। শান্তা বুঝিতে পারে, উহা তাহারই জন্য। কিন্তু তাহা নিজের কাছেও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। সত্যকাম তাহাকে ভালো—, না, না, অসম্ভব! হইতেই পারে না। অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়।—সত্য আজ তাহাকে কি প্রশ্ন করিল? ছিছি, সে ইহার কি উত্তর দিবে? সে তো জানেও না তাহার মন কি উত্তর দিতে পারে। জানে না? সত্যকামের সম্বন্ধে তাহার অন্তর কিছুই কি বলে না? শান্তা জোর করিয়া নিজের কাছে উত্তর দিল,—না।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সত্য জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রশ্নের জবাব দেবে না?,

শান্তা ফিরিয়া দাঁড়াইল। স্বাভাবিক হাসি মুখে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'এ কী রকম প্রশ্ন ভাই?'

সত্য বলিল, 'অত্যন্ত সোজা।'

শান্তা মাথা নাড়িয়া সহাস্যে বলিল, 'অত সোজা নয়।'

সত্যকাম তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সেই সলীল চাহনি যাহা তাহাকে ক্ষণে ক্ষণেই কাছে টানিয়া আবার পরমুহূর্ত্তেই দূরে ঠেলিয়া ফেলে। এর অর্থ কি?

'তোমার দার্শনিক বুদ্ধি যে তাহলে আমার মতই সূক্ষ্ম দেখ্‌চি। একটা সোজা কথার উত্তর দিতে পারছ না?"

শান্তা ব্যস্ততাসহকারে বলিয়া উঠিল, 'যাও, যাও, অনেক রাত হয়েছে। আর বাজে বোকো না।"

'এই যাচ্ছি। কিন্তু জবাব আমার চাই-ই।' বলিয়া সত্যকাম কটাক্ষক'রে হাসিয়া ঘর হইতে বাহিয়া হইয়া গেল।

(২৩)

দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প করিয়া যাইতেছিল। শান্তা কিছু অন্যমনস্ক। অতসী বলিল, 'তোকে তো ভাই আমি আজ অবধি কখনো রূঢ় হতে দেখিনি। তুই যে কারো সঙ্গেই রূঢ়লি ব্যবহার কর্ত্তে পারিস্ এও আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি নে।'

শান্তা একটু হাসিয়া বলিল, "আমিও বিশ্বাস করিনে।"

কৌতুকভরে চাহিয়া অতসী জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে ব্যাপারটা কি শুনি?"

"কি করে বল্‌ব ভাই, আমি তো জানিনে।"

অতসী একটু হাসিল। আবার বলিল, "অনেকদিনই মিঃ মিত্র অনেক কিছু কথাবার্ত্তা বলেন, সেদিনও এসেছিলেন,—বল্লেন—শুন্‌লাম।"

কি কি বলিলেন সে কথা জানিবার জন্য একটিবার শান্তার কৌতূহল হইল, কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করিল না। অতসীর প্রসঙ্গ তাহার আদৌ পছন্দ হইতেছিল না, প্রশ্নোত্তর করিয়া অথবা কথা বাড়াইবার প্রবৃত্তি নাই। সে চুপ করিয়া রহিল।

অতসী নিজেই বলিল, "অনেক দুঃখ কর্‌ছিলেন। বলছিলেন—এই তেত্রিশ বছর বয়সে সংগ্রামই শুধু কর্‌লাম, শান্তি পেলাম না একটা দিনের তরেও। শুধু তিক্ততা আর রিক্ততা! যারই কাছে উন্মুখ আশা নিয়ে যাই, বিমুখ হয়েই ফিরে আসি।"

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তাঁর দুঃখ কিসে?"

"জানিস্ না?"

শান্তা মাথা নাড়িল।

"পারিবারিক অশান্তি আর কি! বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, মা, ভাই বোন থেকেও কেউ নেই।"

"তার মানে?"

"অর্থাৎ অপরেশবাবু তাঁদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন আছেন—একত্র থাক্‌তে পারছেন না।"

শান্তা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এমনটা হল?"

"বুঝ্‌তে পারি না। তবে অপরেশ বাবুর নিজের মুখ থেকে শুনেছি—তাঁদের গোঁড়া সংস্কারবদ্ধ পরিবারের মধ্যে তাঁর অত্যাধিক অ্যাড্‌ভান্সড্‌ আইডিয়াস্ ঠিক খাপ খাওয়ানো গেল না, প্রতি পদে পদেই বিরোধ! সুতরাং ফলে তাঁকে পরিবারের সম্পর্ক ছাড়্‌তে হলো; তা তিনিই নিজে থেকে ছেড়ে আসুন, কিম্বা মা ভাই বোনই ছাড়্‌তে বাধ্য করুন, ঠিক বল্‌তে পারিনে।"

শান্তা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। ইহার বিন্দুবিসর্গ কোনও খবরই সে জানিত না, জানিবার ইচ্ছা হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "আর তাঁর স্ত্রী?"

অতসী হাসিয়া উত্তর দিল, "স্ত্রী কোথায়? বিয়ে তো হয়নি! কেন, তুই এও জানতিস্ না নাকি?"

"খোঁজ নিতে তো যাইনি।"

অতসী আবার পরিহাসভরে হাসিল, "একেবারে নির্ব্বিকার ব্রহ্মচারিণী দেখ্‌চি!"

শান্তা উত্তর করিল না।

অতসী বলিল, অপরেশ বাবু একেবারে নিঃসঙ্গ ও নিসহায় বলেই বাইরে দশ রকম কাজকর্ম্ম নিয়ে সব সময় এত বেশী ব্যস্ত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ কিনা, অশান্তি ভুল্‌বার জন্য কোনও রকমে মনটাকে ব্যাপৃত রাখা।"

শান্তা নিঃশব্দে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। বাস্তবিক, দুঃখ মানুষের কত রকমেরই না থাকে! সত্য বটে, অপরেশ বাবুকে তাহার আদৌ ভাল লাগে না, কাছে আসিলে, কথা বলিলে মন যেন তাহার অস্বস্তিতে ভরিয়া ওঠে। কিন্তু তবু তাঁহার দুঃখও তো দুঃখ বটে! তাঁহারও তো মানুষের হৃদয়! শান্তা একটুখানি বেদনা অনুভব না করিয়া পারিল না।

বলিল, "সত্যি ভাই, দুঃখেরই কথা। আমি তো এর কিছুই জান্‌তাম না আগে।"

"জানলে কি করতিস্‌?"

"কর্‌তাম আর কি?—দেখ ভাই, জগতে দুঃখ এত বেশী অথচ দূর কর্‌বার সাধ্য আমাদের এত কম!" অতসী দার্শনিক দুঃখতত্ত্বনিরূপণের কাছ দিয়া আদৌ গেল না। অর্থভরা চাহনী ও হাসি মিলাইয়া বলিল, "সাধ্য কম নাকি তোর? আমার বিশ্বাস, মিঃ মিত্র ঠিক তার উল্টোটাই মনে করেন—অন্ততঃ তাঁর নিজের বিষয়ে!"

শান্তার রাগ হইল। বারবার এই পরিহাস তাহার পছন্দ হইল না। সে বলিল "মিঃ মিত্র কি মনে করেন বা না করেন, সে বিষয়ে তোমাকে তাঁর মুখপত্র নিযুক্ত করেছেন নাকি?"

অতসী খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। "নারে না, মুখে বলবার কথা হলে তো মুখপত্র? এ তাঁর একান্ত মনের কথা যে! তবে দুদিকেই বহুদিনের ঘনিষ্ঠতার দরুণ আমি একটু একটু বুঝ্‌তে পারি।"

শান্তা নির্ব্বিকার কণ্ঠে বলিল, "তাহলে বুঝ্‌তে থাক তোমার যত খুসী! আমাকে বলার তো দরকার নাই!"

অতসী হাসিয়া বলিল, "থাক্ তবে!"

সন্ধ্যাবেলা অতসী বিদায় লইলে শান্তা চুল বাঁধিতে বসিল। মনটা বড় বিশ্রী হইয়া আছে। অপরেশের সম্বন্ধে কখনও সে বড় একটা ভাবনা করে নাই, তাহাকে চিন্তার অপব্যয় বলিয়াই মনে হয় যেন। আজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রসঙ্গ মনে আসিয়া বিরক্ত করিতেছে। অতসীর ঐ পরিহাসভরা ইঙ্গিত যতবারই মনে হয় ততই অপ্রীতিতে মন ভরিয়া উঠিতে চায়। ছিঃ, বিশ্রী! অপরেশের প্রতি বিরূপ মনটা আরও কঠোর হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ছবিটি! অতসী আজ প্রসঙ্গক্রমে যাহা উদ্‌ঘাটন করিয়াছে, তাহা তো কখনও সে জানে নাই। অপরেশের বাহিরের আবরণ ও আবরণের পশ্চাতে কতখানি দুঃখচ্ছায়া জমাট্ হইয়া আঁধার করিয়া আছে, কে জানে! চট্ করিয়া শান্তার মনে পড়িয়া গেল, অপরেশ কবে যেন তাহাকে বলিতেছিলেন—তাঁহার এই শ্রান্তজীবনে

একটু স্নেহসরস বিশ্রাম মিলিলে তিনি বাঁচিতেন। তখন তাহার অর্থটি ঠিক সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, আজ পারিল।

কিন্তু পারিয়াই বা কি হইবে ?

কতগুলি অপ্রীতিকর অনুভূতি মনের মধ্যে এলোমেলোভাবে মাথা জাগাইয়া শান্তাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। এত ভাবনা কেন আসে ? প্রয়োজন কি ? সংসারে থাকিয়াও চিরদিন সংসার হইতে সে দূরে সরিয়াই আছে, ইচ্ছা করিয়াই নিজের মনটাকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য চেষ্টার তো অবধি নাই, তবু কেন ইহার সংস্পর্শের আঘাত হইতে মনকে বাঁচাইতে পারে না ? আঘাত তাহাকে মানুষ দিতে আসে কেন ? সে কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত করে না, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অন্যেরই বা কি কাজ ? ভারি অন্যায় !

সত্যকাম ঘরে আসিল। "কি চুপটি করে বসে যে ?"

হাসিয়া শান্তা বলিল, "এম্‌নিই।"

অপ্রসন্নতা পাৎলা হইয়া গিয়া মন যেন কতকটা খুসী হইয়া উঠিল। চুলোয় যাক্ কত সব অবান্তর বাজে কথা! সে সোজা হইয়া ফিরিয়া বলিল, "বোস।"

"অনুমতি না দিলেও জোর করে বস্‌তাম।"

"সে তুমি পারো জানি।"

কৌতুকভরে সত্য বলিল, "তাতে তুমি দোষ নাও না নিশ্চয়ই—সেটুকু অধিকার আছে বোধহয় আমার ?"

স্নিগ্ধহাস্যে শান্তা উত্তর করিল, "গায়ের জোরে দখল কর্‌লে বাধা দেয় সাধ্য কার ?"

"তবু একবারটি মুখ ফুটে 'হাঁ' বল্‌বে না। কি শক্ত মেয়ে তুমি !"

"'হাঁ' আর 'না'—দু'টো বড্ড সংক্ষিপ্ত জবাব! ওতে গল্প ভালো জমে না। না ভাই ? সব কথা অত সংক্ষেপে সেরে ফেল্‌ব, তাই চাও নাকি ? তাহলে বল।"

উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া সত্যকাম বলিল, "নমস্কার তোমার রসনাকে! যাক্, আমি হার মান্‌লাম।"

উচ্ছ্বসিত স্রোতে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনর্গল বাজে গল্প চলিল। শান্তার মনের মেঘ একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। সত্যই সত্যকামের আবির্ভাবের একটা ঐন্দ্রজালিক মাধুর্য্য আছে। শান্তা মনে মনে স্বীকার করে, ইহাকে ভাল না বাসিয়া পারাই যায় না। সুন্দর!

জানালার গরাদে কোথা হইতে একটা সবুজ রঙের পাখী আসিয়া উড়িয়া বসিল। টেবিলের উপরে সত্যকামের হাতের কাছে ছিল এক টুক্‌রা কাগজ। গল্প করিতে করিতে সেখানা হাতে মুচ্‌ড়াইয়া গোলে পাকাইয়া তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। পাখী উড়িয়া পালাইল।

শান্তা সস্নেহ ধমক্ দিয়া বলিল, "ওকি হল ? ভারি চঞ্চল তুমি! একটা সামান্য সৌন্দর্য্যজ্ঞানও নেই।"

সত্য ঠাট্টা করিয়া বলিল, "কেন, ওটি রাজকন্যার সোনার পাখী নাকি? রাজপুত্রের বার্ত্তা বয়ে আন্‌ছিল?"

"অসম্ভব কি?"

"ও, তাই বল। তাহলে আমার নেহাৎ অন্যায় হয়ে গেছে!"

মুহূর্ত্ত কয়েক দুইজনেই চুপ করিল।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে উত্তর দিলে না তো?"

"কিসের উত্তর?"

"ভুলে গেছ?"

"মনে পড়্‌ছে না তো?"

সত্যকাম বক্রোক্তি করিয়া বলিল, "মনে খুব ভালোই পড়্‌চে, আমি জানি। বল্‌বে না তাই বল?"

হাসিয়া শান্তা বলিল, "ভারি বিপদ্ তো!"

সত্যকাম গম্ভীর হইয়া বলিল "আবার রিপিট্ করব? তাহলে উত্তর দেবে?"

শান্তার বুকের মধ্যে আশঙ্কা দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

সত্য বলিল, "শোনো তবে।—আমি তোমার বিশ্বপ্রেমের সীমানার বাইরে না ভেতরে? শুধু এই একটি কথা।"

কথা একটি! কিন্তু তাহার মধ্যেই যে সবখানি। শান্তা বিচলিত হইয়া উঠিল। বার বার তাহাকে এ প্রশ্ন কেন? তাহার রক্তিম মুখখানা গম্ভীর হইল। ভর্ৎসনাভরা দুইটি চক্ষু সত্যকামের মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "আবার!!"

সত্যকাম এই মুখব্যঞ্জনার অর্থ বুঝিতে পারিল না, আশাও করে নাই। সে মুহূর্ত্তে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মাপ করো! আর কখনো এ প্রশ্ন কর্‌ব না।"

শান্তা চুপ করিয়া রহিল।

সত্য চাহিয়া চাহিয়া দেখে। ঐ মুখখানা কি বুঝাইতে চায়? তাহার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ কপোল দুখানি যে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, তার পরক্ষণেই সে কান্তি মিলাইয়া গিয়া ঐ মৌন তিরস্কারের সামঞ্জস্য কোথায়? এক একবার সলাজ প্রেম, আবার প্রাণহীন কঠোরতা!

শান্তার বুকের মধ্যে হিল্লোল উঠিয়াছে। ছোট্ট তাহার মানসতরীখানি একাকী প্রাণপণ শক্তিতে পৃথিবীর বুকের উপরে দিয়া সহস্র সহস্র ঘাতপ্রতিঘাত বাঁচাইয়া বহিয়া চলিতেছিল, এবার বার বার সত্যকামের প্রেমে দোলা লাগিতে লাগিতে সে হাল ঠিক রাখিতে পারিবে তো? বড় যে শঙ্কা হয়। অবিরত ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে, তরীখানি নাচিয়া নাচিয়া ওঠে। নৌকার মুখ বারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতে চায়, স্রোত বড় প্রবল! সত্যকাম কেন এমন করিয়া তাহাকে আকর্ষণ

করে? করে যদি, সে নিজে বা কেন তাহার গতিরোধ করিতে পারিতেছে না? কেন পারে না? শান্তার হৃদয়ের মধ্যে অকস্মাৎ পুলকের প্রবাহ স্পন্দিত হইতে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া অপূর্ব্ব আবেশে আপনার সমস্ত অনুভূতিটুকু পান করিল।

অকস্মাৎ তাহার চেতনা হইল। ছি, ছি, ছি! সে কি আপনাকে ভুলিয়া গেল নাকি? এই দুর্ব্বলতা!!

মৌনভঙ্গ করিয়া শান্তা সত্যকে বলিল, "বাইরে বেড়াতে যাবে না?"

(ক্রমশঃ)

নির্ব্বাসিতা

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

আমার জীবন-ভরা সকল পরশে
নিমেষ পরশ তব, অনিন্দ্য অতুল,
আমার জীবন-ভরা সকল দরশে
তুমি শুধু সত্য বন্ধু, আর সব ভুল।

এ মোর মরম-ভরা স্মৃতি স্বপ্ন দলে,
পরশ রতন খানি, কোথা নিমগন,
তুমি উঠেছিলে জেগে প্রলয়ের জলে
কমলা-সেবিত-বিভু, মঙ্গল লগন।

অনন্ত শয়ান তব, অনন্ত প্রয়াণ
আমি শুধু নির্ব্বাসিতা জলধি অতলে
বুভুক্ষিত তনুমন, তৃষিত নয়ান
ক্ষণ-মিলনের লাগি ভাসি অশ্রু-জলে।
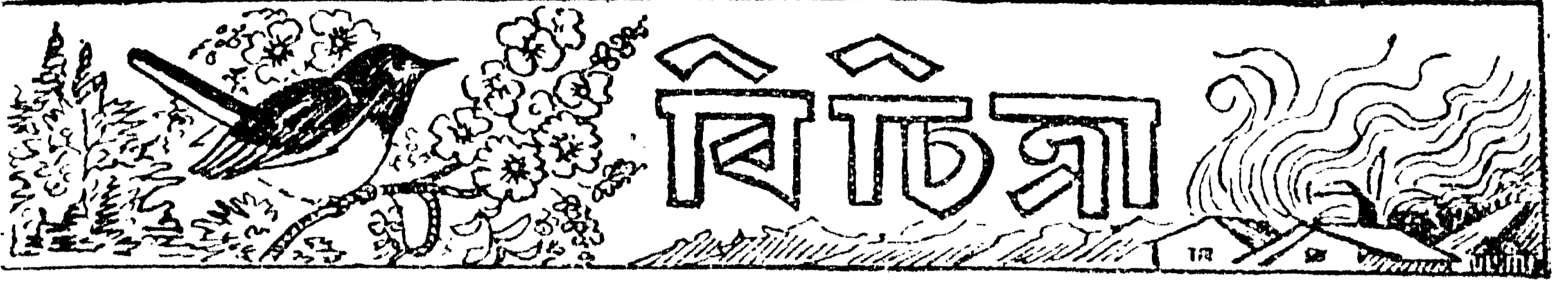
মেয়ে-শ্রমিকদের জাগরণ

কিছুদিন যাবৎ টালিগঞ্জ অঞ্চলের ধানকলসমূহের মেয়ে-শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া আসিতেছে। কল-ওয়ালারা ইহাদের মজুরী হ্রাস করিয়াছেন। গরীব মজুররা রুটি চায়, মালিকরা চাহেন ইহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে, তাই এই ধর্ম্মঘট। ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। আমরা যতদুর অবগত আছি, বাংলায় মেয়ে শ্রমিকদের ইহাই বোধহয় প্রথম ধর্ম্মঘট। ইহাদের এই জীবনযুদ্ধে আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি। তবে ভাবনা যারা এই ধর্ম্মঘট করিতেছেন তাহাদের লইয়া। —শ্রমিক

কর্পোরেশনে স্থাপত্য বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা

কলিকাতা কর্পোরেশন একটি স্থাপত্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান যুগের ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের আদর্শকে সঞ্জীবিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। নব্যবঙ্গে স্থাপত্যশিল্পের নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে পাশ্চাত্য জগতের উৎকৃষ্টতম স্থাপত্যশিল্পের আদর্শ ও পরিগ্রহ করা হইবে।

কর্পোরেশনের এই নূতন উদ্যোগে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প পুনরুজ্জীবিত হইবে সন্দেহ নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা।

চট্টগ্রামে অতিরিক্ত অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায়

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম অতিরিক্ত অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। এই মামলার আসামী ছিলেন অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী, সরোজকান্তি ও হেমেন্দ্র বিকাশ দস্তিদার। অম্বিকাচরণ প্রাণ দণ্ডে এবং সরোজকান্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। হেমেন্দ্র প্রকাশ নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইয়া মুক্তি পাইয়াছেন।

ম্যালেরিয়া দূর করার নূতন বন্দোবস্ত

বাংলার গবর্ণর বর্দ্ধমানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ম্যালেরিয়া বিনাশ করিবার একটি বিবৃতি দেন। জার্ম্মানীর বিখ্যাত বেয়ার কোম্পানীর কারখানা হইতে "প্ল্যাজ্ঞমোচিন" নামক একটি ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়ার বীজাণুনাশক। চিকিৎসকগণ এই ঔষধকে কুইনাইনের সহযোগে ম্যালেরিয়া বিনাশের মহৌষধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার একটি গ্রাম ইহার পরীক্ষা কাজের জন্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যের জন্য একজন এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এবং ছয়জন সাব এ্যাসিষ্টাণ্ট সংক্রামক রোগবিভাগ হইতে নিয়োগ করিবেন এবং এই কর্ম্মের জন্য গবর্ণমেণ্ট ২০ হাজার টাকা দিবেন। উহার মধ্যে ১০ দশ হাজার টাকা দিয়া প্ল্যাজ্ঞমোচিন এবং ১০ দশ হাজার টাকা দিয়া কুইনাইন ক্রয় করা হইবে।

ত্রিপুরা হিতসাধনী সভার ষষ্ঠিতম জুবিলী-উৎসব

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার কলিকাতা এলবার্ট হলে ত্রিপুরাহিতসাধনী সভার ষষ্ঠিতম জুবিলী-উৎসব হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের মন্ত্র নিয়াই ত্রিপুরার কতিপয় দূরদর্শী মনীষী ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ১২৭৮ বঙ্গাব্দে এই হিতসাধনী সভা স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—"ত্রিপুরার মহিলাসমাজে বিশেষতঃ অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের মন্ত্র নিয়াই সভা স্থাপন হয়। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরা বা বাংলার অন্য যে কোন জেলা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বড়ই পশ্চাৎপদ ছিল। স্ত্রীশিক্ষাকে খুব কম লোকেই ভাল চক্ষে দেখিতেন। সেই সময় মাত্র ব্রাহ্মসমাজ হইতেই নব যুগের নূতন আলোক বিকশিত হইতেছিল। সভার প্রতিষ্ঠাত্রীগণ দিব্যনেত্রে দেখিলেন যে, দেশের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির জন্যও বহুকালের বদ্ধমূল কুসংস্কার দূরীকরণার্থ শিক্ষিতা জননী ও ভগিনীর বিশেষ প্রয়োজন"।

ষাট বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে নারী-শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করা হইয়াছিল। সমাজের দারুণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থা দূর করিবার প্রচেষ্টায় যাঁহাদের উদ্যোগে এই সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—আমরা সেই উদ্যোগী মনীষীদের প্রচেষ্টাকে সত্যই প্রশংসা করি। তাঁহাদের উদ্দেশ্য আজ সফলতা লাভ করিতেছে।

খদ্দর-সংরক্ষণ বিল

শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ সিং ব্যবস্থাপরিষদে তাঁহার খদ্দর-সংরক্ষণ বিল পেশ করেন। বাণিজ্যসচিব সার জোসেফ ভোর বিলটি সাধারণ্যে প্রচারের প্রস্তাব করাতে বিলটির আলোচনা স্থগিত রহিল। জোসেফ ভোর বলিয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষের ইহাতে বাধাদানের ইচ্ছা নাই। কিন্তু তাহারই প্রস্তাবনায় বিলটির আলোচনা বাধাপ্রাপ্ত হইল। জাপানী এবং অন্যান্য বিদেশী সস্তা দরের নকল খদ্দরের আমদানীতে বিশুদ্ধ খদ্দরের কাট্‌তি ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। বিলটি সাধারণ্যে প্রচারার্থ যতদিন স্থগিত থাকিবে ততদিনে বিদেশী ব্যবসায়ীরা আরও সুযোগ করিয়া লইবে—আমাদের এই কুটীর শিল্পটি আরও চরম দুর্দ্দশায় পরিণত হইবে। এই শিশু-শিল্পটীকে বাঁচাইয়া রাখিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ সিং বিলটি পেশ করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের সহৃদয়তায় তাহাও বাধাপ্রাপ্ত হইল!

প্যাটেল ও সণ্ডারল্যাণ্ড

শ্রীযুক্ত প্যাটেল কয়েক মাস যাবৎ আমেরিকায় আছেন। তিনি স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতের যুক্তি আমেরিকাবাসীদের নিকট বলিয়াছেন। ডাঃ জে, টি সাণ্ডারল্যাণ্ড ভারতের এই মনীষী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"তিনি ভারতবর্ষের একজন মহা তেজস্বী নেতা এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতার একজন শান্তিকামী সংগ্রামকারী। তিনি নভেম্বর মাসে এখানে আসিয়াছেন এবং এখনও এখানে আছেন। ভারতে কারাগারে অবস্থান করার সময় তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং পীড়ার জন্যই তাহাকে ইউরোপে আসিতে হয়। যদিও তাঁহার জীবন-রক্ষার জন্য চারিবার অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে তথাপি তিনি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতভাবে পরিভ্রমণ করিয় ভারতে মুক্তির জন্য প্রভূত কার্য্য করিতেছেন। ভারতের অপর কোন মনীষী ব্যক্তি এই প্রকার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন নাই। আমাদের দেশের নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, বোষ্টন, ডেট্রইট, ওয়াশিংটন ও অন্যান্য বৃহৎ নগরীর মেয়র শ্রীযুক্ত প্যাটেলকে বিশিষ্টরূপে বহু সম্মানের সহিত বিপুল অভ্যর্থনা করিয়াছেন। বোম্বাই নগরীর মেয়র, জাতীয় মহাসভার সভাপতি ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতিরূপে ভারতের সেবাকল্পে

তাঁহার কার্য্যাবলী ও তাঁহার প্রতিকৃতি আমাদের দেশের সকল বিশিষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমেরিকার যে সকল জায়গায় তিনি গিয়াছেন, তথাকার ভারতীয় ছাত্রগণ ও ভারতীয় অপরাপর ব্যক্তিগণ বিপুল উল্লাসসহকারে তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্যাটেলের মহৎ উদ্দেশ্য ও কার্য্যের সহায়তায় তাহাদের যথাসাধ্য করিয়াছেন। আমাদের দেশের বিদ্যামন্দির, রঙ্গমঞ্চ, সভাগৃহ, গির্জ্জা এবং সমিতিসমূহে যেখানেই তিনি বক্তৃতা দিয়াছেন সেখানেই তিনি স্বাধীনতা ও সায়ত্বশাসন লাভের জন্য ভারতের কথা ও মুক্তি নির্ভীক চিত্তে স্পষ্ট ভাষায় ও দক্ষতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশের নারীদের উচ্চশিক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির ভাসার কলেজের তাহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সভায় তিনি এমন গভীর ভাবের সঞ্চার করিয়াছিলেন যে, বক্তৃতা শেষে যে প্রশংসা-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল উহা আর থামিতেই চাহে নাই। তাঁহার কার্য্য ও মনীষার এই একটি উদাহরণ।

১০ই জানুয়ারী তিনি শিকাগো গমন করিয়া বিশটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি কিছুকাল ক্যালিফর্ণিয়া অঞ্চলে থাকিয়া বক্তৃতা প্রদান করিবেন এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই মহান্ ভারতীয় নেতার আমেরিকা আগমন দীর্ঘকাল যে আমেরিকাবাসীদিগের স্মরণ থাকিবে ইহা উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অপর কোন ভারতীয় মনীষী এই প্রকার সম্মান আমেরিকায় আর অন্য কোথাও আর লাভ করেন নাই। তাহার বক্তৃতা ও সাক্ষাৎ লোকের অন্তরে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। নিশ্চিতরূপে ইহা সত্য যে, শ্রীযুক্ত প্যাটেলই একমাত্র সহস্র সহস্র আমেরিকাবাসীদের মনে এই ভাব ও ধারণা সুস্পষ্টরূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন যে, এই বিচিত্র অতীত গৌরবসম্পন্ন মহান্ ঐতিহাসিক জাতি বর্ত্তমানে নিজের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম এবং তাঁহাদের অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত।"

গ্রাম্য নারীর দান

উত্তর হাতিয়ার বিখ্যাত ধনী ভবানী চরণ সাহা পরলোক গমন করিলে তদীয় সহধর্ম্মিনী তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য বহু পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। স্মৃতিরক্ষা কল্পে তিনি একটী নূতন হাই স্কুল স্থাপনের জন্য ১০০০০ টাকা দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য নিরক্ষর স্ত্রীলোকের এবম্প্রকারের কার্য্যাবলী নিরতিশয় প্রশংসার্হ বটে। স্কুলটী ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। —বঙ্গবাণী

ভারতের শিক্ষার অবস্থা

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা নিম্নে প্রকাশিত হইল :--

ব্রহ্ম	হাজার করা		৩৮৬ জন	লেখাপড়া জানে
বাংলা	"	"	২২০ জন	" "
মাদ্রাজ	"	"	১০৮ জন	" "
বোম্বাই	"	"	১০২ জন	" "
মধ্য প্রদেশে	"	"	৬০ জন	" "
আসাম	"	"	৯১ জন	" "
পাঞ্জাব	"	"	৫৯ জন	" "
যুক্তপ্রদেশ	"	"	৫৫ জন	" "
বিহার ও উড়িষ্যা	"	"	৫২ জন	" "

—সঞ্জীবনী

পরলোকে কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী আরিয়ল গ্রামে ৭৫ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। নববিধান সমাজে রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এবং আরও কয়েকজনের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান। শ্রদ্ধেয় শারদানন্দ ও রামকৃষ্ণানন্দের সহিত তিনিই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরিচয় করাইয়া দেন।

বারোদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি পটলডাঙ্গা অঞ্চলের নানাস্থানে নৈশ বিদ্যালয় ও সাধারণ বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে পটলডাঙ্গার মাষ্টার মহাশয় বলিয়া ডাকিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি আরিয়ল ও বিদ্‌গ্রামে স্কুল পরিচালনা করিতেন। তাঁহার বন্ধু জগৎকিশোর আচার্য্য ও অন্যান্য শিষ্যবর্গ তাঁহাকে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

বাঙ্গালী যুবকের বিমানযোগে পৃথিবী ভ্রমণ

মিঃ কে, এল চৌধুরী নামে জনৈক উনিশ বৎসর বয়স্ক বালক বিমানপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মিঃ চৌধুরী একজন কলেজের ছাত্র। সম্প্রতি তিনি দমদম 'ফ্লাইং ক্লাব' হইতে প্রথম শ্রেণীর লাইসেন্স পাইয়াছেন।

প্রকাশ, এই উদ্যমশীল বাঙ্গালী যুবকের সাহায্যার্থে অর্থ-সংগ্রহের জন্য একটী কমিটী গঠন করা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টায় প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। —বঙ্গবাণী

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের স্বদেশে আসিবার অনুমতি

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আজ সতর বৎসর যাবৎ নির্ব্বাসিত। তিনি বহুবার স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য ভারতগভর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াও সাফল্যলাভ করেন নাই। এমন কি মহাত্মা গান্ধী যখন দ্বিতীয় গোলটেবিলে যোগদানের জন্য ইংলণ্ড গমন করেন তখন তাঁহার সহিত ইংলণ্ড যাইবার অনুমতি চাহিয়াও পান নাই। বর্ত্তমানে তিনি পুনরায় ভারতে আসিবার অনুমতি চাহিতেছেন। এই বিষয়ে তিনি ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মিত্রের নামে নিউইয়র্ক হইতে এক পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন "আমি যতদূর অবগত আছি তাহাতে লণ্ডনস্থ কর্ত্তৃপক্ষ সম্মত আছেন। এক্ষণে শুধু ভারত ও বাঙ্গলা সরকার সম্মত হইলেই আমার পথ পরিষ্কার হয়। আমি বহুবার সঙ্গত সর্ত্তাধীনে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু আমি ছাড়পত্র পাই নাই।" তাঁহার এই পত্রাংশ হইতেই স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তিনি সঙ্গত সর্ত্তাধীনেই আসিতে রাজী আছেন। কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তিজনক কোন কাজ তিনি করিবেন না। ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যে বা গঠনমূলক কোনও কার্য্যে আত্মনিয়োগ করাই তাঁহার ইচ্ছা। বৃটিশ সরকার তাঁহাকে ছাড়পত্র দিতে সম্মত আছেন কিন্তু ভারত ও বাংলার সরকারের অনুমতি না পাওয়াতে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিতেছেন না। সতর বৎসর যাবৎ যাঁহার সহিত স্বদেশের কোন যোগাযোগ নাই কর্ত্তৃপক্ষ তাহার উপর এই কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করিতেছেন কেন বুঝা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-কলেজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটী কৃষি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবনা চলিতেছে। দেশের বর্ত্তমান বেকার সমস্যার ও কৃষির উন্নতি প্রচেষ্টাই ইহার উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে বিবেচনার জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র

রায়, মিঃ ওয়াট্‌সন্‌, ডাঃ নীলরতন সরকার ও আরও কয়েকজন সদস্য লইয়া একটী কৃমিটি গঠিত হইয়াছে। স্যার ডানিয়েল হামিলটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাঁহার সম্পত্তি দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। প্রথম শিক্ষার্থীদের এক বৎসরকাল সমবায় পদ্ধতি, কৃষি ও পল্লী-শিল্প শিক্ষালাভের পর কোন একটা নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নূতন প্রস্তাবনায় দেশের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে আশা করা যায়। ইহার উদ্দেশ্য সফল হউক।

জন গল্‌সোয়ার্দ্দি

গত ৩১শে জানুয়ারী ৬৬ বৎসর বয়সে জন্‌গলসোয়ার্দ্দি পরলোক গমন করেন। তিনি ইংলণ্ডের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণের অন্যতম ছিলেন, গত বৎসর তিনিই নোবেল প্রাইজ পান। যে উপন্যাখানির জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পান, উহা লিখিতে তাঁহার ২২ বৎসর লাগিয়াছিল। এই উপন্যাসখানির নাম ফরসাইৎ সাগা।

ইতিমধ্যে তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিয়েছিলেন এবং সমালোচকবৃন্দ সেগুলির অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করেনি। সে-যুগের ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়াধ্যক্ষ মিঃ বেসিল ডিন যখন ডুবিতে বসিয়াছিলেন তখন গলসোয়ার্দ্দির "Skin Game" ও "Loyalties" তাঁকে অর্থ ও প্রতিপত্তি আনিয়া দেয়। তবে তাঁর নাটকগুলির মধ্যে বোধ হয় "Strife" ও "Justice"ই শ্রেষ্ঠ। তাঁর নাটকগুলি নানা ভাষায় অনুদিত হইয়া ইউরোপের নানাদেশে অভিনীত হইয়েছে, এবং এবং সেই সব স্থানে তিনি আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের সব চেয়ে বড় প্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে Escape নামক নাটকখানাই সর্ব্বপ্রথম মুখর চিত্রে অভিনীত হয়।

তিনি তাঁহার নাটকে যাহাদের চিত্র আঁকিয়াছেন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের জাতীয় বৈশিষ্টে প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই তাঁর লেখায় আমরা তাঁর সমসাময়িক সমাজের একটা সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি পাই। অথচ আসলে তিনি ছিলেন ভাবুক। তবে তাঁহার নাটকে জীবন্ত মানুষদেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় আর তিনি যে সব সমস্যা তাহাদের সামনে উপস্থিত করিতেন তার সমাধান ভেবে ভেবে দর্শকদের আর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকিত না। সেগুলো ধনিক ও শ্রমিক, বা প্রাচীনপন্থী ও নব-পন্থীদের মধ্যে বিরোধ।

তাছাড়া তিনি প্রবন্ধ ও কবিতাও লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতার বইয়ের নাম "Mood, Songs and Doggerels"।

তিনি পশু, পক্ষী এমন কি চোর ডাকাতের উপর দয়া দেখাইতে বলিতেন এবং শিকার ও মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী ছিলেন। তাঁকে যখন স্যার উপাধি দেওয়া হয় তিনি তা গ্রহণ করেন নি। গৃহ-নির্ম্মাণে রুচির অভাব তাঁকে পীড়া দিত।

তাঁর মৃত্যুতে সাহিত্য-গগনের যে একটি জ্যোতিষ্কপাত হইল একথা বলাই বাহুল্য।

—অর্চ্চনা

'অল্প-শিক্ষিত ভদ্রমহিলার জীবিকা উপায়ের পন্থা' বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী প্রবন্ধের জন্য ২০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রেরিত প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত হইলে প্রকাশিত হইবে।

সোনার কাঠি রূপার কাঠি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী—দেবী

সুপ্রিয়া পাঞ্জাবের কোন এক কন্যাগুরুকুলের কাজ নিয়েছে। মার মত একেবারে না থাক্‌লেও। মা বুড়ো হয়েছেন এবং যত বয়স বাড়্‌ছে, তাঁর ততই দুঃখও বাড়্‌ছে। একি 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' হয়ে রইল সুপ্রিয়া! ছুটীতে সে আসে, আর শুনে হাসে সে বলে, 'মা কোনটা দেবায় আর কোন্‌টা ধর্ম্মায় ?'

মা আরোই রাগ করেন। স্পষ্টই বলেন, বুড়ো হলে পাকা চুলের কথা বুঝ্‌বি। আর বিভাস বাবুর জননীর কাছে তাঁর ছেলের আর নিজের মেয়ের ভারতছাড়া এক গুঁয়েমীর কথা বলেন এবং মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর অনেক দোষ দেন। বিভাস বাবুর জননীর ও অনেক দুঃখ। ছেলেমেয়ে যেমনই মানুষ করা হোক্ না, বিয়ে দিতে না পারা কি কম দুঃখ ? বিভাসের কি অভাব ? ওদের অবিবাহিত থাকার কোনো মানেই হয় না! সুপ্রিয়ার কিন্তু মনে হয় সে বেশ আছে!

কন্যাগুরুকুলের বিশেষ ধরণের পড়া, নানা জাতীয়া ছাত্রীমণ্ডলী, তার মনে পড়ে সেই ঈর্ষাকৌতুহলভরে অজিতের বর্ণনীয় কবেকার শোনা মেয়েদের কথা। পাঞ্জাবী, শিখ, ক্ষেত্রী, রাজপুত, ভাটিয়া, বেণিয়া ব্রাহ্মণ, কাশ্মীরী, নানাবিধ উচ্চ-অনুচ্চ বর্ণের ঘরের বালিকা, সেই সব মেয়েদের নিয়েই তার কাজ। উজ্জ্বল বর্ণ, দীর্ঘ-ছন্দ তনুশ্রী, দীপ্ত দৃষ্টি, অনতিপক্কস্বভাবা, সরল তেজস্বী মুখ, অজানা ভাষাভাষিণী নানাবিধ শ্রেণীর বালিকা তারই ছাত্রী আজ। মনে মনে সে অজিতের কথা সমর্থন করে এখন।

এরা যেন সব গৌরী পার্ব্বতীর দল। বিবাহের বাজারের জন্য মা-মাসী-পিসিদের বা অন্য স্বজনদের সহায়তায় এদের একাধারে বিরুদ্ধ, অবিরুদ্ধ, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় নানাবিধ বিদ্যায়—সেলাই, গান, রান্না, বাজনা, লেখাপড়া নাচ এবং অন্য অনেক রকম ন্যাকামীতে সুদীক্ষিত পারদর্শিণী করে তোলা হয় নি। কচি কচি কিশোর মুখগুলি আজো যেন কুমারী গৌরীর মত অপরূপ করে আছে। যেন সব দুহিতা! দায়গ্রস্তের কন্যাভার নয়।

এই একরূপ কমলা, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সুশীলা, লছমী, গৌরীর দল নিয়ে তার কাজ।

মিষ্ট স্বরে তারা হাসে। অজানা অতিজানা ভাষায় তারা কথা কয়, লঘু চঞ্চল আনন্দ লীলায় ঘুরে বেড়ায়। সুপ্রিয়ার তাদের ওপর মোহ স্নেহের অবধি ছিলনা। যেন মনে হয় ঐ একটী একটী মেয়ে তারই কোন বিশেষ আপনার আত্মায়'; তারই অভিভাবকতায়, তারই দায়িত্বে তারই হাতে মানুষ হয়ে উঠ্‌বে। সঙ্গে সঙ্গে কোন্ অজ্ঞাত মধুর স্নেহ রসে বেদনায়—কুমারী নারীর

অজানার মোহে তার অন্তর ভরে ওঠে। ঝগড়া ক'রে তারা ওকে অভিযোগ জানায়, খুব ছোটরা এসে জড়িয়ে ধরে আদর করে, অন্যকে আদর করলে অভিমান করে। সুপ্রিয়ার সমস্ত ধ্যান আর কাজ যেন এক হয়ে ওঠে তাদের নিয়ে। পুরুষদের মত অবসর কালের জন্য মোহকে মমতাকে, কাজের সময়ের জন্য নিতান্তই কাজকে, বাস্তব কর্ম্ম দক্ষতাকে; প্রয়োজনের জন্য প্রয়োজনকে, সে পৃথক করতে পারলে না। তার নারীর মধুর মন, যা নিতান্ত শুকিয়ে যায় নি, গভীরতর হয়ে অন্যায়ের মাঝে সংগুপ্ত হয়ে ছিল, সেটা যেন অকস্মাৎ কুমারী কন্যাদলের মধ্যে খানিকটা মোহ, খানিকটা স্নেহ, খানিকটা আপনার কিশোর স্বপ্নের আকার ধরে ওকে ওদের মাঝে মিশিয়ে দিলে।

স্কুলের কন্যারা অসুস্থ হলে পীড়িত হলে ও দেখতে যায়, খবর নেয়, তারা ওকে ভালবাসে তাদের মধ্যে কৌশল্যার পিতামহী ওকে খুব স্নেহ করেন। নানারকম কথা সেকেলে গৃহিণীর মত জিজ্ঞাসা করেন। কিজন্য কাজ নিয়েছে, মা বাপ আছেন কিনা, ভাই আছেন কিনা, সাহায্য করতে হয় কিনা—বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার কিরূপ ইত্যাদি। হাতির দাঁতের মত সাদা রং, একমাথা পাকা চুল, একহাতে কি সব গহনা পারিবারিক কোন শোকের চিহ্ন স্বরূপ, অন্য হাত খালি, ক্ষেত্রাণী বুড়ী সুবিধা পেলেই দেখা হলেই বসে বসে অনেক কথা কয়। বাঙ্গালী ঘরের অজানা দেশের এই তন্বী শ্যামা তরুণীটিকে নিয়ে তার কৌতূহলের অবধি ও স্নেহের অভাব ছিলনা।

সুপ্রিয়া তাদের ঘরের কটি শিশুদের নিয়ে আদর করে, খেল দেয়। বুড়ী হাসে। নানা কথা কয়। বলে, তোমার মা তোমাকে কেমন করে ছেড়ে আছেন কিছু বলেন না? সুপ্রিয়া হাসে জবাব দেয় না।

হঠাৎ বুড়ী বলে বসে, বেটি, সাদি নেই করোগী?

সুপ্রিয়া লাল হয়ে ওঠে, ওদের ভাষায় বল্লে, 'না, সে কথা ভাবিনি'।

বুড়ী হেসে চুপ করে যায়। আবার বলে 'বয়স কত?' সেকেলে মানুষ লজ্জা সঙ্কোচ করে না। সুপ্রিয়া বলে, পঁচিশ।

বুড়ী বলে না আর কিছু, তবু ভাবটা এই যে, তা হলে তো বড় হয়েছ। স্বামীসন্তানপুত্র-পৌত্রাদি পরিবৃত সংসার যাত্রার মধুরতা তিক্ত থেকে যে নারী দূরে রইল, তার জন্য তার সহানুভূতির অন্ত নেই, তার মা কেমন?

ছুটীর দিনে সে আজমীরে যায়। মার অনুযোগ-অভিযোগ-অভিমান-স্নেহে ভাইয়ের তাজেদের আদরে দিন কেটে যায়। বিভাস বাবুর মা ও নেই, তাই আরও দুঃখ।

বিভাস বাবু ভর্ত্তি হয়েছেন কাছাকাছি কোন ক্যাণ্টেনমেণ্টের হাসপাতালে। মাঝে মাঝে এক আধদিন এসে তাঁরা ওদের ওখানে অতিথি হয়ে কাটিয়ে যান। বিভাস বাবু সোজাসুজী অর্থাৎ কাঠখোট্টা মানুষ। অত সম্ভ্রম, কাবা, সমাহ-সঙ্কোচের ধার ধারেন না, ঈষৎ শিথিল পর্দা, প্রবাসে

খুব সম্মান ক'রে মেয়েদের আপনি বলে কথা ক'ন, অথচ ছেলে মানুষের মত কথাবার্ত্তা। মণিকা হাসে স্বামীকে বলে, 'ডাক্তার বাবুটী তোমার বেশ লোক।

বিভাস বাবু কি কাজে এদিকে এসেছেন। বর্ষার রাত্রি। পাহাড়-নদী-নগরী-প্রাণী-পৃথিবীর অস্তিত্ব শুধু গুটীকতক দূর পথের আলোয়—বাড়ীর আলোয় পর্য্যবসিত। সবটা অন্ধকার।

বিভাসবাবুর মাও এসেছেন। দুই জননীতে অন্তঃপুরের মাঝে বসে সুখদুঃখের চিরন্তন কাহিনী কথা কইছিলেন। মণিকা আর সুপ্রিয়া নিজেদের বসার ঘরে সেলাই আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে। পাশের ঘরে রাত্রে কাজফেরৎ তারক আর বিভাসবাবু দুজনে সেই ঘরেই তাস নয়তো দাবা নিয়ে একটু বসেন। দাবার গজ বাজী রাজা মন্ত্রী সমারোহের মাঝখানে একবার হঠাৎ মুখ তুলে তারক জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুসী, তোর স্কুল করে খুলছেরে?'

সুপ্রিয়া ভাইটির গল্প থামিয়ে দরজার পর্দ্দা সরিয়ে এসে দাঁড়াল, সেপ্টেম্বরে, কেন দাদা? দাবার চাল থেকে মুখ না তুলেই তারক বল্লেন, 'মার মত নয় তুই আর যাস্ এবার বিয়ের ব্যবস্থা কর্‌বেন বলছেন।' তারকের মনে নেই সামনে আছেন বিভাসবাবু!

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে সুপ্রিয়া বল্লে, সে কি দাদা?

মণিকা এসে দাঁড়াল।

বিভাসবাবুও চুপ করে অবাক্ হয়েই একটু সুপ্রিয়ার দিকে চেয়েছিলেন। এতটা ঘনিষ্ঠতা ওঁদের সঙ্গে হয়নিও বটে, খানিকটা আছেও বটে; কিন্তু তবু বিয়ের কথা! আর কিনা সুপ্রিয়ার!

মণিকা কি বল্‌তে গেল। তারক সে কথায় মনোযোগ না দিয়ে বল্লেন, 'মা বলছিলেন আর পড়ে গিয়ে কাজ নেই—বিয়ের ঠিক কর্।'

সুপ্রিয়া লজ্জিতভাবে হাস্‌লে, বল্লে, বিয়ের দরকার কি দাদা? বেশতো দিন চলে যাচ্ছে।'

দাবা থেকে মুখ না তুলেই দাদা বল্লেন, মা বুড়ো হয়েছেন।'

'তাতে আর কি দাদা? আমার জন্যে আর কি ভাবনা,—খাওয়া পরারতো আমার কোনো অভাবই নেই।' সুপ্রিয়া অপ্রস্তুতভাবে হাস্‌ছিল।

এবার তারক, মণিকা, বিভাসবাবুও হাসলেন।

মৃদুহাস্যে মণিকা বল্লে, বিয়েটা খাওয়া পরার জন্যেই—না-রে?

মৃদু হাস্যে সুপ্রিয়া বল্লে, 'নয়ত কি! তোমরা তো তাই বল, দেখ্‌বে কে—চিরদিন খাওয়াবে কে?' ঈষৎ হাস্যে এবার বিভাসবাবু বল্লেন 'অর্থাৎ আপনার মতে বিবাহের প্রয়োজন অন্নসমস্যার মীমাংসার জন্যই?'

সুপ্রিয়া একটু লজ্জিত হ'ল। কিন্তু কথাটা দাদা এমন অবুঝের মত বাইরের লোকের সামনে হঠাৎ আরম্ভ করে দিয়েছেন যে কি আর পাশ কাটাবার উপায় নেই।

কিন্তু ঈষৎ হাস্যে অপ্রতিভভাবে সে বল্লে,—'অনেকটা তাই। কেন না দেখ্‌তে পাই আপনারা চিরকাল আমাদের অন্নদানের পুণ্যসঞ্চয় করেন, আর আমরা প্রাণ ধারণের ঋণ সঞ্চয় করি। আর অনেকটা সেইজন্যই তো আমাদের নিয়ে রকম রকম দায় আর বিপদের সীমা থাকে না—আত্মীয়দের।

সকৌতুক মৃদুহাস্যে বিভাসবাবু বল্লে, তাই বলে আপনি নিরাকটা সবটাই একেবারে দান ঋণের ব্যাপারই মনে করেন না নিশ্চয়!

সহাস্যে মণিকা বল্লে, 'না, সবটা নয় একটুখানি মহাজনী গোছ ব্যাপার মনে করা যায় আর কি! এই যেন আপনারা সবাই কো-অপারেটিভ ঋণদান সমিতি খুলে বসেছেন আমাদের মত দীন-দুঃখীদের হিতার্থে—'

মণিকা স্বামীর দিকে চেয়ে একটু হাসলে। বিভাসবাবুও হাস্‌লেন।

সুপ্রিয়া একটু হেসে বল্লে, 'আর আমরা চক্রবৃদ্ধিহারের সুদের ভারে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে চিরঋণী হয়ে থাকি! মাথা থেকে পা অবধি বিকিয়ে।'

বিভাসবাবু, তারকও মেয়েরা সকলেই হাস্‌লেন, কিন্তু বিভাসবাবু বল্লেন, 'এটা কিন্তু আমাদের উপর অবিচার করে বলা হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে।'

তারক শুধু হাস্‌লেন। অকস্মাৎ এবার তাঁর মনে পড়ে গেল, বিভাসবাবুর সাম্‌নে কথাটা বড় বেশী হয়ে গেল! আর দাবার চাল ভুল যাচ্ছে। সুতরাং কথাটা চালে চাপা পড়ে গেল।

অতিথিরা চলে যাবার ক'দিন পরে রাত্রে খাবার সময়ে মণিকা আর সুপ্রিয়া গল্প কর্‌ছিল।

মণিকা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, আচ্ছা তোর কেমন লাগেরে এখানে?

'কেন বেশ!' সুপ্রিয়া অবাক্ হয়ে জবাব দিলে।

'না, সে বেশ বল্‌ছিনে, ফাঁকা ঠেকে না?'

'মাঝে মাঝে কি রকম মনে হয় বৈকি। এই পুরোণো মেয়েগুলো যখন বিয়ে হয়ে সব চলে যায়, তখন ভারি মন কেমন করে। এই সেদিন কৌশল্যা বলে একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েটার যেমন রূপ তেমনি গুণ!' সুপ্রিয়া আলোর ওপর জলের আঁক কাটে। দুজনে খাওয়া আর তারপরের ছোট ছোট কাজ সেরে শোবার ঘরের দিকে যায়।

মণিকা আবার বল্লে, 'মেয়েদের তুই খুব ভালবাসিস্ না?

এবার সুপ্রিয়া বল্লে, খুব। যেন মনে হয়, ওরা আমার ভারি আপনার। বলেই নিজের উচ্ছ্বাসে একটু লজ্জিত হয়ে থাম্‌লে।

মণিকা একটু হেসে বল্লে, 'তাই তোর অত মন কেমন করে! তারপর একটু হেসে বল্লে, 'তা' কিন্তু এবারে তুই গিয়ে চাকরী ছেড়ে দিয়ে আয়।'

'কেন বৌদি?' একটু অশান্তির ভাবে সুপ্রিয়া প্রশ্ন কর্‌লে।

'আর পরের ছেলেকে আদর করে পরের মেয়ের জন্যে মন কেমন করে কত কাল কাটাবি ?

সুপ্রিয়া চুপ করেই রইল।

মণিকা খানিক চুপ করে থেকে আবার বল্লে, 'দেখ্ ঠাট্টা করে যা বলিস্ 'খাওয়াপরা' বল্। কিন্তু ঘরসংসার-স্বামীসন্তান ঠিক ভালো মন্দের মাপ কাঠিতে বিচার করা যায় না। খাওয়া-পরাও নয়। কোনো খানে বা একটু সত্যি আছে, কোনো খানে বা নেই। কিন্তু মানুষের বিশেষ করে মেয়ে মানুষের কি নিয়ে আর থাক্‌বার আছে ? অবিশ্যি হয়ত দুঃখের গ্লানি আছে, ভাবনা কষ্টের বোঝাও কম নেই, চোখের জলও অজস্র আছে হয়ত, অনেক জায়গায় অবিচার ও আছে ; কিন্তু সংসারকে একেবারেই বাদ দিয়েই বা কি আছে ? আমার অবিশ্যি তোর মত বুদ্ধি বিদ্যে নেই', মণিকা কি বলতে গিয়ে একটু থাম্‌লে, তারপর বল্লে, আমার কিন্তু এই সব ওদের ছাড়া আমাকে কল্পনা কর্‌তেই যেন মনে হয় চুরমার হয়ে ভেঙ্গে যাবো !

সুপ্রিয়া অন্য মনে শুনছিল, একটু হাস্‌লে।

মণিকা বল্লেন জানি আজ কাল অনেকে থাকেন, পারেন, তাঁদের শক্তি আছে, সাধনাও আছে হয়ত অন্য কিছুও আছে। কিন্তু তুই তো তেমন কোনো বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে কি উদ্দেশ্য নিয়ে পড়ছিস্ না। আর আর একজনের অভদ্রতায় কি সবাইকে অবিচার করে সন্ন্যাস নিয়ে থাক্‌বি ?' কথাটা বলে মণিকা যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল।

সুপ্রিয়া চুপ করে উদাসীন ভাবেই রইল।

মণিকা আবার বল্লে, এখনো ঠিক বুঝতে পার্‌বিনি, কিন্তু একটা সময় আসে।

আমাদের যখন আর সামনে এগোবার পথ থাকে না।—পুরুষদের যা' হয় না। একেবারে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে যায়। কিছু ফেলে এসেছিস্ পেছনে, আর সামনে বাকিটা নষ্ট কর্‌বি ? সম্মান মর্য্যাদা রাখবার মত শিক্ষা তো তোরা পেয়েছিস্—এখন আর তোর আপত্তি কি ?—'

সুপ্রিয়া আচম্‌কা শেষকথার পর বল্লে,—'বৌদি থাক্, ঘুম পাচ্ছে।'

'যাচ্ছি। শোন্—বিভাসবাবু এঁকে তোর কথা জিজ্ঞাসা করেছেন।'

এবার সুপ্রিয়া অভিভূতের মতন চেয়ে রইল। তার ঘুম, তার ক্লান্তি কোথায় মিলিয়ে গেল। সে অবাক্ হয়ে মণিকার দিকে চেয়ে রইল।

'হ্যাঁ, আশ্চর্য্য হবার কথা। ওঁরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু উনি নাকি সত্যি করেই বলেছেন—'

সুপ্রিয়া বল্লে, 'আজকে আমি শুইগে বৌদি।'

সুপ্রিয়া মার ঘরে এসে শুয়ে পড়ে।

অভিভূত মনের ভেতর জটপাকিয়ে অতীতে বর্ত্তমানে মিশিয়ে কি হিজিবিজি লেখা হ'তে থাকে। পড়তে পারা যায় না, বুঝতেও হয়ত না। শুধু অকারণে চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে। না, জননীর বুকের কাছের আশ্রয়ে তার আর সে বাল্যের মত সান্ত্বনা মেলে না। মার ঘুম ভেঙ্গে যাবার

ভয়ে দূরে বিছানা করে শোয় সে। বই পড়্তে ইচ্ছা হয় না, কঠোর জ্ঞানের সাধনায় তা ডুবে যেতে পারে না। কাব্য? না, যে ক্ষেত্রে দুঃখের মধ্যে আনন্দের বিকাশ আছে সেখানে কাব্য পড়া চলে। এই নিরতিশয় নির্ম্মম বেদনাবোধের মাঝে কোনখানে তার কিচ্ছু সান্ত্বনা নেই। ও অধীর হয়ে ওঠে।

বিভাসবাবু কি বলেছেন? মন একেবারে সঙ্কুচিত লজ্জিত হয়ে ওঠে। কি? কি বলেছেন? আবার ওকে নিয়ে ওঁরা কথা কয়েছেন? না থাক্ ওর সামনের কিচ্ছু, না থাক্ ওর পেছনের সঞ্চয়! না, না, না, ওঁরা যেন আর ওকে দয়া কর্তে না আসেন। ওর চোখ জলে ভরে ওঠে।

ওরা কি ওকে সামান্য শান্তিতেও থাক্‌তে দেবে না? সামান্যই ওর প্রয়োজন, জীবিকা ওর চলে যাবে। ও আর কারুর মুষ্টি ভিক্ষা চায় না। ওর বেদনাময় অভিজ্ঞতার পৃথিবী ওর বুকের ভেতর লুকোনো থাক; ও সেখানে কারুকে চায়না, ও জান্‌তেও দিতে চায় না কারুকে, কোনোদিন জান্‌তে দেবেও না। পুরুষমানুষের শ্রদ্ধা দয়া, মুষ্টিভিক্ষার প্রসাদ, নিত্যকার গ্রাসাচ্ছাদন ও চায়না!

ওর তাদের দেওয়া ঐশ্বর্য্যের ওপর লোভ নেই; তাদের অর্জ্জিত ধনের বিলাসশালার বিলাসের ওপর মোহ নেই; স্বজনরচিত পান্থশালার—সম্পর্কের—পদভেদের কর্ত্রীত্বের মোহও ওর নেই। ওকে শুধু ওরা শান্তিতে থাক্‌তে দিক্। ওর, মানবাত্মার—ভিক্ষার দয়ার অপমান অনেক হয়েছে, আর কাজ নেই!

সুপ্রিয়া চোখ-ছাপিয়ে আসে।

ওকে যেন আর কেউ কিছু না বলে। ওকে সতীধর্ম্ম রক্ষার জন্য, সামাজিক প্রথার নিয়মের জন্য কারুর রক্ষণাবেক্ষণ কর্‌তে আগ্‌লাতে হবে না; ওকে কোন স্বজনের অন্ন দিতে হবে না; বেঁচে থাক্‌বার মত জীবিকার উপায়ও নিজেই পার্‌বে। ও দাদাকে ভালবাসে, তার কাছে আস্‌বে, থাক্‌বে, ওর ভাইপো ভাইঝিদের নিয়ে ছুটীতে দিন কাটবে।

সুপ্রিয়া উঠে জল খায়। বেরিয়ে আসে একবার।

দাদার ঘরের মৃদু আলো জানলার পর্দ্দার আড়াল থেকে দেখা যায়। দাদার ভারি গলায় হাসি শোনা যায় আর বৌদির মিষ্টি সুরের মৃদু হাসির শব্দ।

বাইরের অন্ধকার তখনো তেমনি ঘন হয়ে আছে।

সামনের রাস্তায় আলো, আর ছাউনির দিকের বৃষ্টিতে ঝাপসা আলোগুলো সমান জ্বল্‌ছে।

কি বেদনায় উদাসীন চোখে সে অন্যমনে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ মনে হয় 'কি বলেছেন বিভাসবাবু?' এবার আর অত রাগ হয় না, যেন কৌতুহল হয় শুন্‌তে। বিভাসবাবুর সেদিন সরল সকৌতুক দৃষ্টিতে 'বিবাহটা তাই বলে আপনার মতে সবটাই অন্নসমস্যা নয়?' একথাও মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কবেকার অনেক কথা মনে পড়ে যেন

স্বপ্নের বিভীষিকার মতন, মৃত্যুভয়ের মতন কি রকম।……না, না, ওদের কথা আর নয়। ওরা সবাই এক।…

সুপ্রিয়ার ছুটী শেষ হয়ে যায়। গুরুকুলের কন্যাদের মাঝে দিন কাটে আবার।

বুড়ী কৌশল্যার ঠাকুমা, গঙ্গার মা কাবেরীবাইয়ের দিদি সবাইয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আবার হয়। কৌশল্যার দিদির সঙ্গে আলাপ হয়। অত্যন্ত সুশ্রী সুন্দরী। দুটী সন্তানের মা। কন্যাগুরুকুলে সেও নাকি কিছুদিন পড়েছিল। কৌশল্যাও বেশ বড় হয়েছে মনে হ'ল! বৌদির আলোচনা হবার পর এবারে সকৌতুহলে, সকৌতুকেও বটে—সুপ্রিয়া ওদের দেখে। কৌশল্যাকে তার বেশ ভালই লাগে। পূরাতনী ছাত্রীর প্রতি মোহ মায়া স্নেহ সমানই থাকে।

দিদি? যেন প্রতিমা। যেমন উজ্জ্বল রং, তেমনি সুশ্রী মুখ, বর্ষার আনন্দিত নতুন লতার মত তেমনি পল্লবিত তনুশ্রী। কিন্তু সুপ্রিয়া যেন আরও কি খুঁজ্‌ছিল। বুদ্ধিতে প্রতিভায় দীপ্ত একখানি মুখশ্রী যে তেজস্বিতা ওদের মুখে বাল্যে থাকে, যা' ওদের জাতের প্রায় সকলের মুখের ভাবে আছে সেটী কোথায় গেল? ব্যক্তিত্বহীন, দীপ্তিহীন অতি সাধারণ মুখভাব, ঐ অত্যন্ত অসাধারণ রূপের সঙ্গে যেন মানায় না।

সুপ্রিয়া ভাবে, সংসার যাত্রার সঙ্গে ঐ দীপ্তির প্রতিভার কি এতই বিরোধ? যেন অত্যন্ত হৃষ্ট অলস বিলাসী জীবনযাত্রা। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, গাম্ভীর্য্য, ভবিষ্য-স্বপ্নের ধ্যানমগ্নতা? না, কিছুই নেই। মাধুর্য্যও নিতান্তই দৈহিক, সূক্ষ্মতা অথবা মানসিকতাশূন্য! ওর বেশীকরে কথা কইতে ইচ্ছা হয়, কথা কয়, আলাপ করে। ভুল হয়েছে ভাবে। কিন্তু, না, হাঁ নিতান্ত হৃষ্ট, সুখপুষ্ট, তৃপ্ত জীবন। স্বামী, সন্তান, স্বাচ্ছন্দ্য সংসারযাত্রা, অর্থ, তার ছোট সুখ তৃপ্তি,—অন্য পরিজন তাদের সঙ্গে প্রত্যহের সংঘাত, তাদের কথা—ইত্যাদি। লেখাপড়া? হাঁ, সে জানে।

সে 'সরস্বতী' পড়ে, 'মাধুরী' পড়ে। তাতে গল্পও থাকে। "আর কি কাজ? আর কি? কি দরকার তার আর?

সুপ্রিয়া চুপকরে যায়। তারা 'বেবীউইক' এও যায় প্রতিবৎর।

সুপ্রিয়া অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। এরই জন্যে বৌদি বল্‌ছিল? বিনষ্ট করবে সে? কি ক্ষতি হবে তার? ওরা যা' নিয়ে আছে, তা' ওর মনেই লাগে না। কৌতুহলভরে যে পরিবারেই সে যায় সকলের পানেই চায়।

তার মনে আছে, দিদির মেয়ের বিয়েতেও সে ঐ রকম অনেক মেয়ে দেখেছিল। ওর যাদের দেখে মনে হয়নি, বুদ্ধি বা দীপ্তি তাদের কোনোদিন ছিল বা কখনো দরকার আছে! তারা কথা কয় নিশ্চিন্ত লঘুভাবে, অতি অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে। তাই নিয়ে তর্ক—তারপর মনোমালিন্য কর্‌তেও তাদের বাধে না; সেজন্য দুঃখিত বা লজ্জিতও তারা হয় না; কোন ভাবনাই তাদের নেই। তাদের—তাদের মা'দের—তাদেরও আত্মীয়স্বজনদের সকলেরই একই ধরণের কথা আর তার

আলোচনা আবৃত্তি করে বেশ সংসারযাত্রা চলে যায়। তারো চেয়ে যারা একটু সমৃদ্ধ তারা শাড়ী গহনা, মোটর, সেলাই, আলোচনা নিয়ে দিন কাটিয়ে দেয়। মানসিকতার গভীর আলোচনার সভায় তারা কেউ নয়, রসজ্ঞতার তারা ধার ধারে না, চিন্তাশীলতা তো দূরের কথা, চিন্তা কর্‌তে জানে কিনা সন্দেহ হয় সুপ্রিয়ার।

আর পুরুষরা তাদের নিয়ে ঘর করে; পুতুলের মত সাজায়; প্রয়োজন মনে কর্‌লে আবার নিরাভরণ করে দেয়। একটু বড় শিশুদের মত ওই ওদের—সমক্ষেত্রে নিজেদের নাবিয়ে এনে ওদেরই মত হাল্‌কা কথাও কয় মাঝে মাঝে। কিন্তু শ্রদ্ধা কোথা? সম্মান কোনখানে? সম্ভ্রম কই?

এই ঘরকর্‌ণা, এই সংসার, এই ছেলেখেলার খেলনা হয়ে থাক্‌বার জন্য মা ওকে বলেছেন, বৌদি ওকে বলে, আর দাদার ভাবনা? এই না হ'লে ওর জীবন বৃথা হয়ে যাবে? ও কি নিয়ে থাক্‌বে? ওদের অস্তিত্বের স্থূল বস্তুটীকে নিয়েই যে জীবনযাত্রা,—যারা খেলা কর্‌বে—আর বাকিটা লুপ্ত করে দিতে চেয়ে অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা করে; তাদের একজনকে নিয়ে ও জীবনকে সার্থক করে তুল্‌বে?

এই আপনার প্রতি শ্রদ্ধাহীন অস্তিত্ব?

এই না হলে ওর কি হবে?

না, এর ওপর ওর লোভ নেই।

সবাই করেছে ব'লে, ওকেও করতে হবে?—পুরুষমানুষের কাপুরুষতা, আর নারীর ত্যাকামী? ও কাকে শ্রদ্ধা করবে? ওর শ্রদ্ধা আসেই না। যারা পুরুষই নয়, তাদের বল্‌তে হবে পুরুষ, আর যারা পুতুল তারা হবে নারী!

সমস্ত জীবন ওর পরের হাতের খেলনা হয়ে থাক্‌তে সাধ নেই।

তবু আশ্চর্য্য হয়ে সুপ্রিয়া দেখে, ওদের অনেকের মুখে দীপ্তি না থাক্‌, তেজস্বিতা না থাক্‌, আনন্দের আভা আছে, কিসে ওরা ওই আনন্দ পেলে? ওই আনন্দ আর বুদ্ধির উজ্জ্বলতা কি একসঙ্গে থাকতে পারে না? সুপ্রিয়া তা' দেখেছে মনে পড়ে না। অনেকের মুখে নীরব বেদনার ইতিহাস আছে, তাতে চিন্তাশীলতার ছাপও আছে।—কিন্তু তাদের আনন্দময়ী মূর্ত্তি কই!

কৌশল্যার দিদির ছেলেদের নিয়ে সুপ্রিয়া আদর করে, খুব ভাল লাগে তার। কিন্তু ওর মনে হয় যেন দিদিকেও ওদের চেয়ে কিছু বড় মাত্র। ওই পর্য্যায়েই ফেলা যায়। এক এক সময় ও ভাবে এ কথা! শেষে মনে হয়, এই যখন সাধারণ তখন এই বোধহয় স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ওর অন্তর যেন দুঃখিত হয়ে ওঠে সেকথা ভাব্‌তে।

হঠাৎ মনে হয় একটী ব্যতিক্রম পৃথিবী পরিচালনা কর্‌তে পারে। আজ একজন শান্ত সৌম্যশ্রী অৰ্দ্ধনগ্ন মহামানব কোটী কোটী লোকের পথনিয়ন্তা নহেন কি? ঐ ক্ষীণ জীর্ণ শীর্ণ মানুষটী

আসমুদ্রহিমাচলবেষ্টিত অগণ্য জনমনের দেবতা। যারা নিজেকে নগণ্য মানুষও মনে করতে সাহস করে নি, নিরীহ গৃহপালিত পশুর মত ভীত ত্রস্ত হয়ে জীবনের পথের এক কোণের পথে পড়ে গড়িয়ে গুঁড়ি মেরে হামাগুড়ি যাত্রা করেছিল, করছে; তাদের মধ্যে যিনি প্রাণ দিতে পারেন, তাদের মনের দেবতাকে জাগিয়ে তুলেছেন, তিনিও তো একজনই! মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্রস্রষ্টা তো একজনই হয়; সমস্ত জগত তা-ই উচ্চারণ করে কৃতার্থ হয়, আবৃত্তি ক'রে আরতি ক'রে আপনাকে সার্থক করে।

ব্যতিক্রমই তো সাধারণকে আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করে।

কিন্তু ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ওদের মধ্যে সে ব্যতিক্রম সেই চেতনা-আনন্দময়ী কেউ কি আজো আসেন নি? আসবে না? যে দেখাবে, নারী শুধু খেলনা নয়, উপকরণ নয় কিন্তু সংসারের, সর্ব্বশুদ্ধ সম্পূর্ণ মানবী।

(ক্রমশঃ)

মহিলা-প্রতিষ্ঠান

(১)

পুরী-মহিলা-সমিতি

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী

গত ২৪শে পৌষ স্থানীয় তিনকোণিয়া বাগানের গাছপালাফুলে ভরা সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে প্রশস্ত ক্ষেত্রে বৃহৎ চন্দ্রাতপে পুরী-মহিলা সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন ও তদুপলক্ষে উদ্যানসম্মিলনী হইয়াছিল। সমিতির সদস্যগণ এবং নিমন্ত্রিতা মহিলা ও বালক বালিকা মিলিয়া বৃহৎ সভাস্থানটী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।
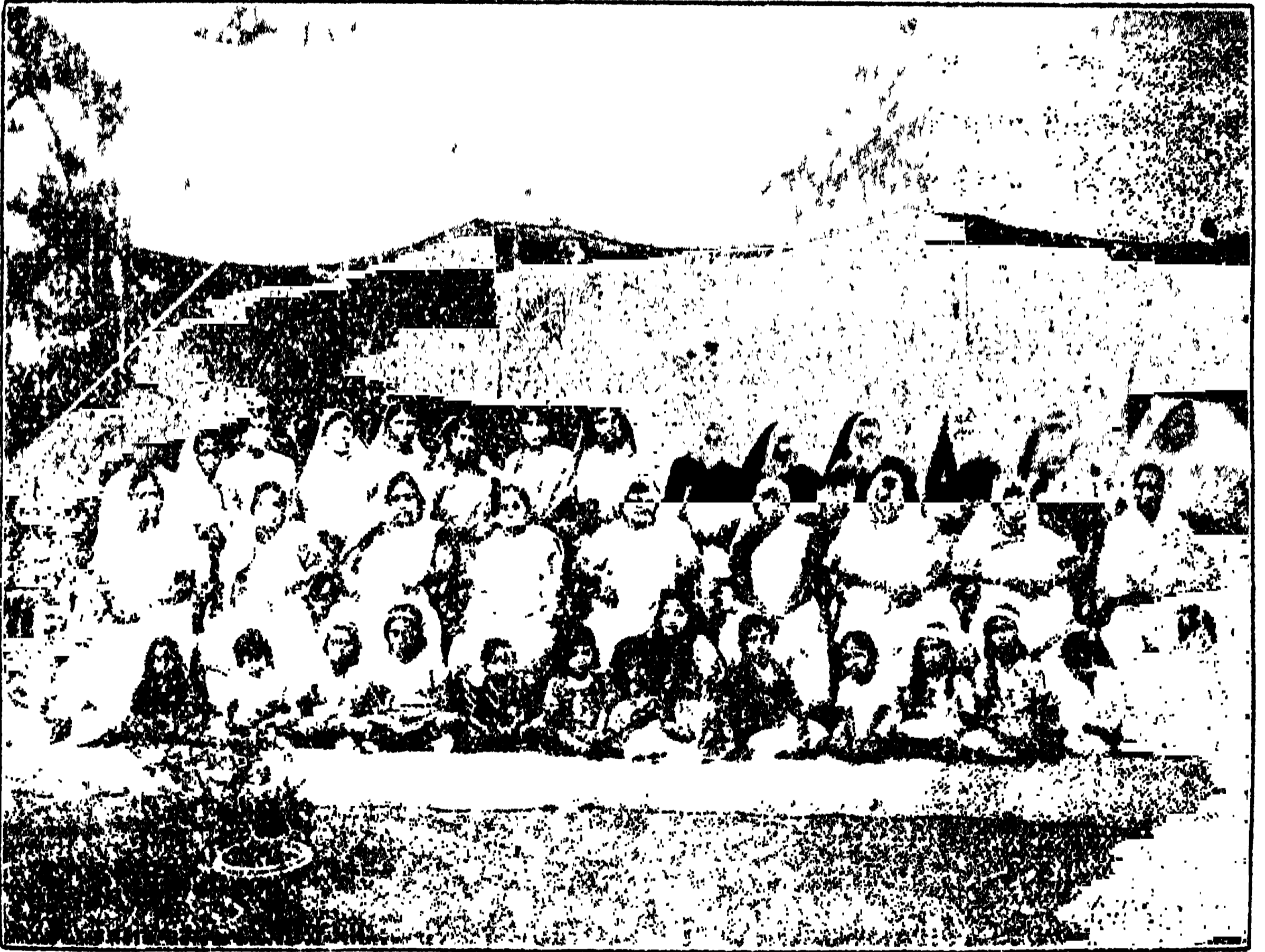
ডি, গুহের সৌজন্যে

শ্রীযুক্তা নবনিধি খাতানি মহোদয়া সভানেত্রীত্ব করিয়াছিলেন। প্রথমে সমিতির সদস্য ও নিমন্ত্রিত মহিলাদের কয়েকজন মিলিয়া একটী গ্রুপ ফটো তোলা হয়। পরে একটী বৈদিক মঙ্গলাচরণ পঠিত হয় এবং সম্পাদিকা

সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন। ইহার পর সমিতির মুদ্রিত নিয়মাবলী সকলের মধ্যে বিতরিত হইল। অস্পৃশ্যতা নিবারণকল্পে যৎকিঞ্চিৎ সহায়তার জন্য রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতা-দূর বিষয়ের নূতন পুস্তিকা সমাগত মহিলাদের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য সমিতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। মহিলারা অনেকেই তাহা ক্রয় করিয়া উহাতে আপনাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। ঐ অর্থ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী সংস্কার-সমিতিতে প্রেরিত হইবে। তাহার পর একটী সুদক্ষ ওস্তাদের সেতার বাজনা হইল। বালিকারাও কয়েকজন গান করিল। শেষ জলযোগান্তে সভাভঙ্গ হয়। দীপাবলীর অভাব না থাকিলেও শুক্লা দ্বাদশী তিথি বলিয়া সন্ধ্যার পর চারিদিক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত হইয়া উৎসবটী আরোই উপভোগ্য হইয়াছিল। সভ্যেরা সকলেই বিশেষ উৎসাহের সহিত নিজেরাই সব করিয়া ইহাকে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী যাহা পঠিত হইয়াছিল দেওয়া গেল :—

ভগবানের কৃপায় আর একটী বৎসর পূর্ণ হইয়া সমিতি এখন পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। আরও কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই ইহার অস্তিত্বের আরম্ভ হইলেও তখন ইহার ঠিকমত প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সুতরাং ১৯২৯ সালের জানুয়ারী হইতেই এই সমিতি জন্মলাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। এতদিন ইহার কোন বাৎসরিক আলোচনা, অনুষ্ঠান হইতে পারে নাই। কিন্তু এবার বর্ষশেষে সমস্ত বৎসরের অবস্থা পর্য্যালোচনা এবং নব জন্মদিনে বিধাতার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ ভিক্ষার সহিত বৎসরকার নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যে বাঁচাইয়া রাখার জন্য তাঁহার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা নিবেদনও যেমন আবশ্যক, সর্ব্বসাধারণের শুভকামনা এবং সহযোগও তেমনি প্রার্থনীয়। কারণ পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন কিছুই সফল না হইলেও মানুষ যেখানে সচেতন, যত্নশীল সেই খানেই তাঁহার কল্যাণহস্ত প্রসারিত হইয়া থাকে। সেইজন্য সর্ব্বসিদ্ধিদাতার উদ্দেশে বন্দনার্ঘ দিয়াই আমরা সমাগত মহিলাবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। তাঁহাদের স্নেহলাভ করিলেই আমাদের প্রয়াসে বিধাতার করুণাও বর্ষিত হইবে। উপস্থিত অনুপস্থিত যে সকল মহিলার শ্রম, অনুরাগ ও সহায়তায় সমিতি জীবন লাভ করিয়া এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তাঁহাদের সকলের উদ্দেশেও আমরা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। বলা বাহুল্য ইহার মধ্যে সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীযুক্তা গৌরী দেবী ও স্বর্গগতা সম্পাদিকা ননীবালা দাস গুপ্তের কথাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের স্মরণে আসিতেছে। মাননীয়া গৌরীদেবী এখনও আমাদের গৌরবস্থল হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু ননীবালা যে লোকে সেখানে আমাদের কোন প্রার্থনাই পৌঁছে কিনা মানুষের অজ্ঞাত। তবে তাঁহাদের প্রভাব চিরদিনই আমাদের প্রেরণা দিবে সন্দেহ নাই।

এইবার সমিতির গত বার্ষিক কর্ম্মজীবনের ইতিহাস আরম্ভ করা যাউক। গত পূর্ব্ব বৎসরের নবেম্বর মাস হইতে অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুল-গৃহে সমিতির অধিবেশন হওয়া আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে রামচণ্ডীসাহী বালিকা বিদ্যালয় গৃহেই সমিতির অধিবেশন হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সমিতির লাইব্রেরীর জন্য এই সময় একটী আলমারী ক্রীত হয় এবং উক্ত বিদ্যালয়ে তাহার স্থান না হওয়াতেই এই পরিবর্ত্তনে বাধ্য হইতে হয়। এই বৎসর সমিতির লাইব্রেরীতে প্রায় ২৫৲ মূল্যের পুস্তক ক্রয় করা হয় এবং চারিখানি মাসিক পত্র লওয়া হইতেছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের শেষ দিকেই প্রায় ২৯৲ টাকার পুস্তক আনা হইয়াছে এবং মাসিকপত্র ও বই বাঁধাইয়েও কিছু ব্যয় হইয়াছে। দুঃখের বিষয় সমিতির একটী নিজস্ব গৃহ না হইলে কোন কাজই সুশৃঙ্খল, সুব্যবস্থিত বা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য তাহা অর্থসাপেক্ষ। সে পরিমাণে সমিতির সঞ্চয় এ পর্য্যন্ত অত্যল্পই হইতে পারিয়াছে। বিশেষতঃ সমিতি সুপরিচালিত হইতে হইলে যে স্থায়ী নিয়মিত আয় আবশ্যক তাহার পরিমাণও

এখনও সামান্যই। সুতরাং সঞ্চয় ব্যয় করিয়া কিছু করা একান্তই অসমীচীন। এই বহুকষ্টসঞ্চিত অত্যল্প অর্থ নানা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য ও দান দাতব্যে ব্যয়িত করার প্রস্তাবও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমিতির উন্নতি তাহার অর্থবল এবং লোকবল বৃদ্ধির উপরই নির্ভর করে। সমিতিকেই রিক্ত করিয়া ফেলিলে তাহার সমস্ত উন্নতি ও ভবিষ্যতের মূলেই কুঠারাঘাত হয়। উহার শ্রীবৃদ্ধির সহিতই মাত্র আমাদের যে কোন সৎকার্য্য সম্ভব। সমিতি এক দিনের বা এক জনার নহে। আমরা যাহার ভিত্তিমাত্রের অতি সামান্য আয়োজন করিতেছি, দেশের ভবিষ্যকন্যারা তাহাতেই যেন বিপুল সৌধ গড়িয়া তুলিতে পারেন, সেইজন্য আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে কোনরূপ সঙ্কীর্ণ আদর্শ বা অবিচারিত কার্য্যে আমরা যেন তাঁহাদের বাধা অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া না যাই।

দান দাতব্য সমিতি হইতে সাধ্যমত হইয়াও আসিতেছে। ঢাকার দাঙ্গায় অভাবগ্রস্তদের সাহায্য, পূর্ব্ববঙ্গের প্লাবনে সাহায্য, বালকবালিকাদের মুক্তবায়ুভ্রমণসমিতিতে সাহায্য ইত্যাদি সমিতি হইতে করা হইয়াছে। কিন্তু এইসব বিষয়েই সমিতির আয় হইতে যথাসম্ভব কম অর্থব্যয়ে অথচ সমিতিকে অবলম্বন করিয়া ও সমিতির নামেই সভ্যেরা আপনাদের মধ্য হইতে স্বতন্ত্র চাঁদা তুলিয়া সাহায্য করিয়াছেন। ইহাতে সমিতির ক্ষতি না হইয়া এবং কাহারও একার অধিক ব্যয় না হইয়াও সমিতির গৌরববর্দ্ধন এবং সৎকার্য্যের তৃপ্তি সকলেরই লাভ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন একটী দরিদ্র বিধবা বালিকাকে বিধবাশ্রমে শিক্ষার সাহায্য এবং একটী দুঃস্থ মহিলাকে মাসিক সাহায্যও সমিতি হইতে করা হইতেছে।

গত পূর্ব্ব বৎসর ডিসেম্বরে সমিতির তহবিলে ৭৮২৷৵ ছিল। গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত খরচ বাদে ১১১১।৵০ আছে। ইহার মধ্যে গত ১২ই মার্চ্চ সমিতি হইতে যে একটী আনন্দবাজার হইয়াছিল, খরচ বাদে তাহাতে ৮৮১৷৶১০ লাভ হইয়াছে। বাকি সভ্যদের চাঁদা হইতে সংগৃহীত।

গত এপ্রিল মাসে পূর্ব্ব সম্পাদিকা শ্রীযুক্ত সরযূবালা কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং ২৫শে এপ্রিল হইতে সম্পাদিকার কার্য্যভার আমার উপর অর্পিত হয়। এভার ও দায়িত্ব আমার ক্ষুদ্র শক্তির পক্ষে একান্তই গুরুতর। মাননীয়া সভ্যদের সকলের এবং সর্ব্বসাধারণ মহিলাবৃন্দের কৃপাদৃষ্টি ও সানুগ্রহ সাহায্যের উপর ভরসা করিয়াই মাত্র আমি এই গুরুভার গ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছি। আমার সকল ত্রুটি, বিচ্যুতি আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া সারিয়া লইবেন ইহাই প্রার্থনা।

সভ্যাদিগের প্রস্তাব ও মতানুসারে গত জুনমাসে সমিতিতে সেলাই শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। সেইজন্য সমিতির অধিবেশন প্রতি রবিবারে হইয়া মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। বেতনের অর্থ যাঁহারা সেলাই শিখিবেন তাঁহারাই আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন স্থির হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্য্যতঃ ইহাতে সকলে তেমন যোগ দিতে পারেন নাই। সেইজন্য জুলাই হইতেই তাহা বন্ধ হয় এবং সমিতির অধিবেশন পূর্ব্ব নিয়মমত মাসে দুইবারই হইতে থাকে।

সমিতির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী না থাকায়ও অভাব এবং অসুবিধা বোধ হয়। সেইজন্য গত মে মাসে একটী সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও সব বিষয় বিশদভাবে না থাকায় আর একটী নিয়মাবলী গঠিত এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু নিয়মাবলী প্রস্তুত কঠিন নহে, তদনুযায়ী কাজই কঠিন। তাই আমরা ইহার সার্থকতা ও সফলতার জন্য সমস্ত মহিলাদেরই অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। কারণ সভ্যদের উপরেই যেমন মুখ্যতঃ সমিতির সাফল্য নির্ভর করে, তেমন অন্য মহিলাগণ সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া তাহার বলবৃদ্ধি করিলেই তবে উহা সার্থক হইতে পারে। বিশেষতঃ গত বৎসর কার্য্য

পরিচালনায়-পরিবর্ত্তনের-আনুষঙ্গিক গোলমাল ব্যতীতও অনেকগুলি উৎসাহী সভ্যাই তাঁহাদের স্বামীর বদলীর জন্য পুরী ছাড়িয়া যাওয়ায় সমিতির সভ্যসংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্তা মুলতা দত্তের নাম উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার অভাবে সমিতির বিশেষ বলহানি ঘটিয়াছে। সম্প্রতি আবার শ্রীযুক্তা নিরুপমা চৌধুরীও আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছেন। তাই এই আনন্দের দিনেও দুঃখভারাক্রান্তহৃদয়ে তাঁহাকে আমরা বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতেছি। প্রার্থনা করি দূরে গেলেও তিনি সমিতিকে ও আমাদের দয়া করিয়া মনে রাখিবেন এবং তাঁহার স্নেহ ও শুভকামনা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।

আজকার অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া যাঁহারা আমাদের উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদের আবার আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

স্বপ্ন-ভঙ্গ

শ্রীআশালতা দেবী

(১)

অরুণা বোস তার শোবার ঘরের আরাম কেদারায় আধশোয়াভাবে হেলান দিয়ে বসে আছে। মনে মনে কবিতার একলাইন গুঞ্জন করে ফির্‌চে।

কাল কলেজের ইতিহাসের ক্লাশ পালিয়ে সে কয়েকটি মেয়ের সাথে ডালহৌসি স্কোয়ার দিয়ে বাসে চড়ে অনেকটা ঘুরে এসেচে। দুপুরবেলাকার ক্লান্তির দৃশ্য, যে নগরী এতব্যস্ত তারও অতিব্যস্ততার মাঝে একটা যতি পড়ে, এইটে দেখ্‌তে তার একটা অসম্ভব মোহ রয়েচে। লোকে যে কেমন করে দুপুর বেলায় ঘুমোয় (অবিশ্যি যাদের স্কুল, কলেজ, অফিস নেই আর তারাই ত ঈশ্বরের কাছে উত্তরাধিকারী হয়ে এসেচে দুপুরের এই রৌদ্রোজ্জ্বল আলস্যময় মাদকতাকে সমস্ত মন দিয়ে উপভোগ কর্‌তে)। কিন্তু অরুণা বোস তাদের মধ্যে একজন নয়, এখনই তার ঘড়ীতে ন'টা বাজে। এর পর যথাসময়ে স্নানাহারের তাড়া আছে, এবং তার পর কলেজ, আর মনে কর্‌তে মনটা কেমন ভারী হয়ে আসে। আর রোজই ত কলেজ পালান যায় না।

অরুণা একটা কথা অনেক সময় ভারি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে, পুরুষদের না হয় টাকা রোজগারের একটা তক্‌মা নিতে কলেজে পড়তেই হবে, কিন্তু যতক্ষণ অবধি না মেয়েদেরও সেই তাগিদ সর্ব্বব্যাপী হয়েচে ততক্ষণ তাদের এই হাস্যকর কাজে নাম্‌বার দরকার? আজকালকার দিনে রোজ কয়েক ঘণ্টা করে লেকচার শোনা এবং ভীড় করে পড়্‌তে আসা এটা শুন্‌তেই কি হাস্যকর লাগে না? আগেকার দিনে যখন ছাপাখানা ছিল না, একটা বই প্রকাশ কর্ত্তে হলে, হাতে লিখে কষ্ট করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায়ই ছিল না, একটা বই-এর দাম এত ছিল যে এখনকার লোকে তা কল্পনাও করতে পারে না, তখনকার দিনে লোকে ভালো বই পড়তে না পেয়ে বাধ্য হয়ে লেকচার শুন্‌ত। কিন্তু আজ? যে কোন একটা আপন পছন্দমত মাঝারী লাইব্রেরীতে বস্‌লেই কি জগতের সকল শ্রেষ্ঠ চিন্তার এবং যে কোন বিষয়ের জ্ঞান পাওয়া যায় না? মানুষে একলা বিয়ে করে, সকলে একসাথে ভীড় ক'রে করে না, একলা বই লেখে, একলা গান করে (নেহাৎ তৃতীয় শ্রেণীর কোরাসের গান ছাড়া অবিশ্যি) তবে বিদ্যা অর্জ্জন কর্‌তে হলেই তা রোল কলের নম্বর সাজিয়ে একসাথে জটলা করে কর্‌তে হবে কেন? আসলে এটা হচ্চে মানুষের পরিবর্ত্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতার অভাব। মনে মনে সে অত্যন্ত ভীতু, যে প্রয়োজনের সমস্ত কাজ বহুপূর্ব্বেই নিঃশেষ হয়েচে, তাকেও সে ভয়ে ভয়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেল্‌তে পারে না। তাই আজও বিয়ের বেলায় (এই ত সেদিন তার বন্ধু রমার বিয়েতে নিমন্ত্রণে খেয়ে কী-ইনা বিভ্রাট দেখে এসেচে, এতে একমাত্র অপরাধ ছিল, যে ছেলেটিকে রমা ভালোবেসে বিয়ে করছিল সে বারেন্দ্র শ্রেণীর না হ'য়ে

রাঢ়ী শ্রেণীর ছিল।) একদা যখন ট্রেণ, ষ্টিমার এয়ারোপ্লেন ছিল না লোকের দূর চলাচলের পথে পদাতিক হওয়া বা গরুর গাড়ীর অতিথি হওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না তখন তারা আপন সুবিধামত আপোষে একটা বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল, সেই বন্দোবস্ত যে আজও পরিত্যক্ত হোলো না এ দোষ কি তার সেই ভীরু সদাই সশঙ্ক খুঁৎখুঁতে মনেরই নয়? কিন্তু অরুণার আল্‌গা মন এতদূর জল্পনা করে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল। এসে,কর্‌চে কি? এমন করে ফিলজফির হাতে ছেড়ে দিলে এত জাবর কেটে চল্‌বেই। কারণ এর চেয়ে মানসিক আরাম মনের পক্ষে আর কি হতে পারে। অথচ ঘড়ীতে দশটা বাজে। কলেজ কি নেই?

আর, এন, বোসের দু'টিমাত্র কন্যার অন্যতমা হচ্চে অরুণা বোস। তার একম্‌প্লিশ্‌মেণ্টের জন্য তার মা গর্ব্বিতা, বোন ঈষৎ লজ্জিতা। সেদিন আর্ট পেপারে ছাপা হয়ে ওর কবিতার বই বেরিয়েচে "ধূপছায়া"। বাঙালী পাঠকসমাজে তা কেমন চাঞ্চল্য তুলেছে, আমরা এখনো খবর পাইনি। কিন্তু বালীগঞ্জের এবং লেকরোডের সমাজে তা যে একটা হিল্লোল বইয়ে দিয়েছে একথা সকলেই জানে। সুন্দরী, শিক্ষিতা, ধনী এবং তার সাথে অপর একটা বিশেষণ কবিণী এ মনে মনে আওড়ালেই ত জিভ্‌ দিয়ে জল আসে। ইতিমধ্যেই অনেকে তাকে বলেচে, আপনি বাঙলার এলিজাবেথ ব্যারেট এবং এই সুন্দর কমপ্লিমেণ্টটি গ্রহণ করবার সময় গ্রহণকারিণীর মুখে যে সলজ্জ সরক্ত আভা দেখেচে, তাই দেখে তারা সবাই কল্পনা করেচে, রবার্টব্রাউনিঙ হোতে আর তাদের এখনো ক'মাস বা ক' সপ্তাহ দেরী।

(২)

রবার্টব্রাউনিঙএর দুরূহ পদমর্য্যাদা লাভের জন্য যারা মনে মনে নানা কল্পনা করেছিল প্রমথ তাদের সকলকে এগিয়ে এলো। সেদিন অরুণাদের বাড়ীতে একটা পার্টি গোছের বসেচে। যারা একত্র হোয়েছে তারা সকলকেই লেকরোড এবং বালীগঞ্জ অঞ্চলের লোক। ভবানীপুরের ও দু'একজন আছে কিন্তু আভিজাত্যের লাইন এর চেয়ে নীচ দিয়ে আর কাটা যায়নি। বাগানেই সুসজ্জিত চেয়ার-টেবিলে বস্‌বার ব্যবস্থা হোয়েছে, কিন্তু অরুণা একটু দূরে গিয়ে রুমাল পেতে বসে ক্লান্তভাবে একটি হাল্কা জাপানী হাতপাখায় নিজেকে হাওয়া দিচ্ছে, তার উঁচু করে বাঁধা খোঁপার শেষ প্রান্তভাগ থেকে ছোট ছোট নরম চুল ঘাড়ের উপর এসে পড়েচে হাওয়াতে তাই একটু একটু করে কাঁপ্‌চে। প্রমথ কিছু দূরেই বসেছিল। অরুণা বল্‌ল, যারা এসেচে তাদের দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, তারা সকলেই এত বেশী languid কি করবে ভেবে ভেবে আরো languid হয়ে পড়েচে। এদের ভাবখানা তর্জ্জমা কর্‌লে এই রকম দাঁড়ায়—

"—কি কর্‌ব? একটা রবিঠাকুরের গান গাই। কিন্তু যা গরম পড়েচে—তার চেয়ে একদান পিং পং খেলা যেতে পারে। আর খোঁপার চুলগুলো এই গরমে কিছুতেই বাঁধা মানে না, কিন্তু সকলের চেয়ে বড় সমস্যা কি করা যায়?—সময় কাটাবার জন্যই? মনে হয় আমাদের

সভ্যতা আমাদের কি বানালো? ঠোঁটের আগার চেয়ে বেশি গভীরভাবে ভাব্‌বার ক্ষমতা আমাদের নেই, কৃত্রিমতা ও তুচ্ছতাকে পালিশ করে করে অলঙ্কার তৈরী করুচি? কেন? একে গলার হার করে রাখ্‌বো বলে? কিন্তু যাক্‌গে এ নিয়ে বেশি ভাব্‌তে বসলে দস্তুরমত দুঃখবাদী হয়ে উঠ্‌বো। তার চেয়ে বলুন আপনার নতুন উপন্যাসের আর কতটা বাকী।"

প্রমথ মনে মনে একটু হাস্‌ল, এওকি একটা ফ্যাশান নয় নাকি অরুণা বোস? যে সভ্যতার এত মর্ম্ম-বিশ্লেষণ, মাছ যেমন জলকে আশ্রয় করে তেম্‌নি করেই যে তোমরা একে আশ্রয় করেচ। বালীগঞ্জের সভ্যতা যে কাদার মত তোমাদের চারিদিকে সেঁটে গিয়েছে, এর থেকে বেরিয়ে একটা দিনও সহ্য করতে পারবে?" যাক্‌, এটা ওর স্বগতোক্তি, মুখে বল্‌ল, "যা বল্‌ছেন তা এক হিসাবে ঠিক, কিন্তু আপনার মত করে ভাব্‌তে পারে ক'জন মেয়ে?"

অরুণা শুনে সুখী হোল। তার সকল দুঃখবাদের ভাবনা সত্ত্বেও কমপ্লিমেণ্ট পেয়ে খুসী হবে না এমন স্তরে যেয়ে সে আজও পোঁছায় নি। তা ছাড়া প্রমথর মত লোকের মুখে, যার উপন্যাসের খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়িয়েচে। প্রমথ বলে চল্‌ল, "যদি আপনার মত মেয়ের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার পূর্ব্বে হো'ত, তবে বেশ হোত—" এতটা অবধি বলে সে থেমে গেল, বাকীটা যেন অরুণা অনায়াসে কল্পনা করে নিতে পারে। কিন্তু অরুণা বাকীটা শুন্‌তে চায়, অনুমান করে সে তৃপ্ত হবে না। তার সাদা মান্দ্রাজী শাড়ির জড়ির পাড়ে সূর্য্যের লাল আলো এসে পড়েচে। শেষ ফাল্গুনের মত উষ্ণ অথচ সুখকর বাতাস, এমন আলোয় দুটো মিথ্যে কথা শুন্‌তে কার না ইচ্ছে করে? যে অরুণা বোস রাত্রিতে ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় রাসেলের Road to Freedom পড়ে নানা সমস্যায় নানা চিন্তায় মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে, সে মেয়ে কি বুঝ্‌তে পারে না, কোন কথার কি মানে দাঁড়ায়, তবে সে এখন এমন মুগ্ধভাবে আছে (আর তারই বা দোষ কি, এত অপর্য্যাপ্ত লাল আলো যে তার চুল সোণার পাতের মত জ্বলচে, তার বাহু, তার মুখ, কপোল চিবুক সব আরক্ত-আভায় অপরূপ হয়ে গেছে।) যে মিথ্যে কথা শুন্‌লেও তা নিয়ে বিশ্লেষণ করবে না, কেবল পান করবে।

তাই সে কণ্ঠস্বরে একটু নির্লিপ্তভাবের আমেজ এনে বল্‌ল, তাহলে কিইবা হোত বলুন না? আমার মধ্যে এমন কি পেলেন? প্রমথ উদ্দীপ্তকণ্ঠে বল্‌ল, "তাহলে কি হোত তা কি অনুমান করতে পারেন না? তাহলে আমার সৃষ্টির মূল সুরটাই বদলে যেত, সংসারে কত জিনিষই ত চোখে পড়ে কিন্তু এমন করে ক'টা চোখে পড়ে বলতে পারেন, যাতে জীবনের আগাগোড়া সব ওলটপালট হয়ে যায়?" তার স্বরের উত্তেজিত মূর্চ্ছনা সূর্য্যের শেষ স্তিমিত রক্তাভার সঙ্গে মিশিয়ে গেল। সে সন্ধ্যায় অরুণাবোসকে অত্যন্ত প্রদীপ্ত লাগ্‌ছিল, তার গানে, তার হাসিতে যেন নতুন এক সুর এসে লেগেছে। তার পানে চেয়ে চেয়ে তার মা কয়েকবার হাস্‌লেন, এবং তার বোন,—হাঁ তার বোন যেন কিছু ম্লান হয়ে ভাব্‌তে লাগল, দিদির জ্বালায় কারো চোখে পড়িনে, এমন দিদির বোন হওয়া বিপদ ছাড়া আর কিছু বল্‌তে ইচ্ছে করে না।

(৩)

হ্যারিসন রোডের মোড়ে বাসে উঠে প্রমথ সাম্‌নের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখ্‌লে বীরেন বসে আছে। আজ তাকে দেখে সে অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। কথাটা নানা জিনিষ নিয়ে হতে হতে নোয়েলকাওয়ার্ডে এসে ঠেক্‌ল, কারণ তখনকার লেটেষ্ট ছিল নোয়েলকাওয়ার্ড;

বীরেন বলল, র‍্যাট ট্রাপ পড়ে আমি একটা তথ্য আবিষ্কার করেচি, যাকে বিয়ে কর্‌তেই হবে সে যেন সমব্যবসায়ী না হয়। ধর তুমি লেখক, তোমার যদি বিয়ে হয় কোন লেখিকার সঙ্গে তোমার জীবনটা তেতো হয়ে যাবে। মেয়েরা যে ঝাঁকে ঝাঁকে ভোট নিতে, কাউন্সিলের উকীল ব্যারিষ্টার হতে লেগেচে, মনে করে মাঝে মাঝে আমার হৃৎকম্প হয়। ধরে নাও, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে উকীলের সাথে মেয়ে উকীলের বিয়ে হয়, সে কি দারুণ ট্র্যাজিডি কল্পনা কর্‌তে পারো? ভদ্রলোক কাছারীতে, মক্কেলখানায়, সর্ব্বশুদ্ধ সেই মোকদ্দমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে যখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে বাড়ী ফিরবেন, তখনও দু'টো লাউডাঁটা কুমড়াচচ্চরির গল্প শুন্‌তে পাবেন না।

প্রমথও শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমশঃ শুষ্ক হয়ে উঠ্‌ছিল, বল্‌ল কি যে আজগুবি কথা বল, আমার মত একেবারে উল্টো! fundamental ideas গুলো এক না হলে কোন বিবাহেই সুখ হয় না।

বীরেন বল্‌ল, রেখে দাও তোমার ফাণ্ডামেণ্টল, ওসব বড় বড় কথা ঢের শোনা আছে।

"আঃ বীরেনটা যে কি, সে যখন মনে মনে একটা দুঃসাধ্য আইডিয়ালকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করছে, তখনই কি ওর সময় হো'ল যত সত্য কথার পুঁজি উজাড় কর্‌বার!"

সেদিন বিকেলে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, অরুণা ইচ্ছে করে খোলাবাসের উপরে বসে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে বাড়ী এল। অবিশ্যি ম্যাকিনটোষ ছিলই, তবে খুচরো করে অনাবৃত হাতের খানিকটা এবং মাথার চুলগুলো ভিজিয়েচে। মনে করেছিল, এই সূত্রে বৃষ্টিপাতের গোপনতর রহস্য কিছু জেনে নেবে তাই দিয়ে চাই কি একটা কবিতা লেখাও হয়ে যেতে পারে কিন্তু বাড়ী এসে কবিতার মর্ম্মোদ্ঘাটনের চেয়ে এক পেয়ালা চায়ের দরকার বেশি হয়ে পড়্‌ল! মাথা মুছে একটা পাতলা আলোয়ানে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে সবেমাত্র চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েচে, এমন সময় প্রমথ ও বীরেন এসে পড়্‌ল। বীরেনকে আজ ইচ্ছে করেই প্রমথ সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। যথারীতি পরিচয়ের পালা শেষ হলে দু'একটা কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময় অকস্মাৎ মেঘও বর্ষণের সমস্ত স্নিগ্ধতাকে উড়িয়ে দিয়ে বাইরে আবার কড়া রোদ উঠ্‌ল।

হাতের ঘড়ীটার পানে চেয়ে অরুণা বল্‌ল, মোটে তিনটে পনের, আজ আমাদের কলেজের খুব সকাল সকাল ছুটি হয়েচে। আবার কি গরমই না কর্‌তে লাগল, কে বল্‌বে যে কিছু আগে বৃষ্টি হয়েচে।

প্রমথ উঠে বল্‌ল, ফ্যানটা খুলে দিতে পারি কি? এতে বোধহয় আপনার কষ্টের কিছু লাঘব হবে। অরুণা মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালে।

ইতিমধ্যে মিসেস বোস বেয়ারার হাতে এদের দু'জনের জন্যে চা পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এসেচেন। প্রমথ "ধূপছায়ার" খুব প্রশংসা কর্‌তে লাগ্‌ল। চাদরের অন্তরাল

থেকে একসংখ্যা "ইঙ্গিত" বার করে বল্‌লে, এই দেখুন কেমন সমালোচনা বেরিয়েচে। অরুণা না দেখার ভাণ করে বল্‌লে, কি-ইবা এমন লিখেচি। যা ভাব হয়ে মনে ফুটেছিল, তার কতটুকু অংশই বা প্রকাশ কর্‌তে পেরেচি। বলতে বল্‌তে আবার একটু এগিয়েও এল, 'ইঙ্গিত'খানা দেখার অদম্য কৌতুহলে।

মাথার ওপর ফ্যান চল্‌ছে, চিনেমাটির হাঙ্কারভীন পেয়ালায় সুবর্ণ এবং সুস্বাদু চায়ের অল্প অল্প ধোঁয়া উঠ্‌চে। অরুণার ফিকে নীলরঙের পাতলা শালজড়ান কৃশ এবং তন্বী দেহখানি চেয়ারের উপর অপূর্ব্ব সুষমাময় দেহরেখার সমাবেশ করেচে।

প্রমথ মনে মনে বল্‌ল "নাই বা তুমি কবিতা লেখার এত অদম্য চেষ্টা কর্‌লে অরুণা? কি হবে এ দুঃসাধ্য চেষ্টায়? এমন কবিতা ত কখনো লিখ্‌তে পারবে না, যা সময়কে সদম্ভে ছাড়িয়ে গিয়েও লোকের মনে জাগ্‌বে—লাইন মিলিয়ে, ছন্দ গেঁথে, প্রেমের শতপ্রকার বিনুনী নাইবা গাঁথ্‌লে কথায়? কথা নিয়ে কি করবে তুমি? তা নিয়ে সত্যি কি তোমার কোন দরকার আছে? তার চেয়ে এসো আমরা দু'জনে পরস্পরকে যা দেবার আছে দিতে চেষ্টা করি!"

প্রমথ মুখে কিন্তু একথার ধার দিয়েও গেল না 'ইঙ্গিত'খানা মিসেস বোসের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বল্‌ল, এই নিন দেখুন, একবার কি লিখেচে।

বেরিয়ে এসে বীরেন জিজ্ঞাসা কর্‌লে "প্রমথ, কি চা খাবে?" প্রমথ অবাক হয়ে বল্‌লে "এই মাত্র যে খেয়ে এলে!" "আরে যাঃ ওই গদাআঁটা আবহাওয়ায় প্রাণ বেরুতে বসেচে, চা ত চা। আস্তে কথা, মিহি হাসি, সুচারু কথার সুকুমার কবিতা, যেন জীবনের আঁটি ছোবড়া সব বাদ দিয়ে রস নিঙড়ে নিঙড়ে আমের জেলি বানাচ্চে? এত সেণ্টেড্‌ হাওয়াতে কি আর চা খাওয়া জমে। কি করে যে সহ্য করে থাক বাপু, তা আমি বুঝ্‌তে পারিনে। এদের যোগ্যতা কি? শুনতে পাই? পৃথিবীটাকে কার্পেট ঢাকা দিয়ে আর লেসের পর্দ্দা ঝুলিয়ে নরম করে দেখ্‌তে চায়, একটু কড়া আলো সহ্য হবে কি?

বীরেন উল্টোদিকের বাসে চড়্‌তে চড়্‌তে বল্‌ল, রাগ করোনা বন্ধু। রমলা-রজত আর উপন্যাসের পরে আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। চল্লুম, এখন চায়ের দোকানের তাজা আড্ডায় এবং সেখান থেকে ক্যার্ণিভালে, যেখানে জনতার মাদকতা আছে। এসেন্সের উগ্রগন্ধে মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে না।

(৪)

ইতিমধ্যে প্রায় মাস ছয়েক কেটেচে। প্রমথর সঙ্গে অরুণার বিয়ের আর বড় জোর সপ্তাহ-খানেক দেরী। কি করে এ ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, তার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে।

অরুণা বোসের দ্বিতীয় কবিতার বই "ফুল-রেণু" মাস ছয়েক আগে বের হয়েচে। প্রমথর উৎসাহ এবং আগ্রহ না পেলে বোধকরি অরুণার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি এ বই বার করা সম্ভব

হোতনা। এর প্রচ্ছদপটের ছবি এঁকে দেওয়া, প্রত্যেক কবিতার শেষে একখানা করে ইঙ্গিতপূর্ণ ললিত ছবির পরিকল্পনা দেওয়া, প্রুফ সংশোধন করে দেওয়া, কবিতার প্রেরণা জোগানো, এমন কি বইটির শেষের দিকের গুটিকতক পাতা নতুন কবিতা দিয়ে ভর্ত্তি করে দেওয়া অবধি সমস্ত কাজ একাধারে এবং একত্র প্রমথ করেছে। অরুণার মতে অসাধ্য-সাধন। যাক্, বই বার হোল এবং প্রমথের প্রতি নীরব কৃতজ্ঞতায় অরুণার মন ভরে উঠ্ল। কতরকম কল্পনা সে কর্লে বসে বসে। তারা দুজনে অনাদি কাল হতে পরস্পরের জন্যে সৃষ্টি হয়ে এসেচে। অরুণা রাত জেগে জেগে প্রমথের উপন্যাসের প্রুফ দেখে দেবে এবং প্রমথ লেখার ফাঁকে ওর রচিত বই-এর জন্য ছবি এঁকে রাখ্বে। এমন কি প্রমথর কোন কোন নায়িকার মুখে অরুণা মনের কথা বলার ছলে নিজের তৈরী কবিতা বসিয়ে দেবে।

হয়ত কোন সন্ধ্যায় সে "পর্টুগীজে'র সনেট" থেকে কবিতা পড়ে শোনাবে নারীর ভাষা এবং তার উত্তরে প্রমথ সুইনবর্ণ বা শেলীর মারফতে তাকে জানাবে আপন ভাষা।

সেদিন অরুণারা সকলে বায়োস্কোপে গেছিল, কিন্তু সেদিন ভারি একটা করুণরসাত্মক ব্যাপার ছিল। এমন ফিল্ম যে দেখ্তে দেখ্তে মন ত গলে যায়ই এবং সে গলার প্রভাব অনেকক্ষণ থাকে। এমনি আর্দ্র-মধুর মন নিয়ে বাড়ী এসে অরুণা তখনো কাপড় ছাড়েনি, তার নীলাম্বরী শাড়ী আর ব্লাউজ তার বিষাদবিধুর মুখশ্রীকে যেন আরও বিষণ্ণতর করে ঘিরে রেখেছে। এমন সময়ে দেখ্তে পেলে বস্বার ঘরে তার নবপ্রকাশিত "ফুল-রেণুর" একখানি এবং একটা প্রকাণ্ড গোলাপের তোড়া নিয়ে প্রমথ বসে রয়েচে। সেই রাত্রেই অরুণা মত দিয়ে ফেল্লে।

অনেকদিন সে আর তার বইয়ের আলমারী খোলে নি। সেখানে কত নতুন নতুন শক্ত বই তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েচে, কতদিন যে সে কোলের উপর একটি বালিস রেখে স্নানান্তে মাথার চুল এলোকরে দিয়ে গালের ওপর একটা হাত রেখে একমনে বই পড়েছে। তার চরিত্রের যা কিছু শক্ত অংশ তা চর্চ্চার অভাবে বিলোপ পেতে বসেচে। এই সব সেন্টিমেণ্টল সিনেমা দেখা—

আগে সন্ধ্যেটা শক্ত বই পড়ে না কাটিয়ে কি সে এই সব বই পড়্তো কিন্তু এখন ইনট্যালেক্-চুয়াল অরুণাকে কবি অরুণা এসে রাহুর মত গ্রাস করেচে। অরুণা বোস আজকাল "education" এর নানা রকম থিওরী নিয়ে মাথা ঘামানোর চাইতে অন্যদিকে ঢের সময় দিচ্ছে। আচ্ছা, থাক্ কি করে সময় কাটাবে তা অরুণার নিজেরই ইচ্ছাধীন, সে স্বাধীনতায় কে হাত দিতে যাবে বল? সব মানুষেরই একটা বিশেষ বয়সে প্রেম জাগে প্রেম আত্মাকেই উদ্বুদ্ধ করে জগতের নতুন রূপ উদ্ঘাটন করে দেখায়। সেই সাথে আত্মার অধিকারিণীর, আত্মার আধারখানাকেও নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়্তে হয় বই কি। বাহুদু'টি আলগোছে রাখার দুরূহতম সাধনা, গ্রীবার কয়েকটি সুবঙ্কিম রেখার যথাবিন্যাস। ভ্রূলতাকে আর একটু মেঘকজ্জল করা, এমনি শত কাজের ঝঞ্ঝাট সময়টাকে কোন্ দিক দিয়ে যে পার করে নিয়ে যায়।

(৫)

সম্প্রতি একটা বিশেষ দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। অরুণাদের বিবাহের মাস চারেক পরেই অরুণার পিতা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন। ওদের গৃহে সবাই শোকার্ত্ত। কিন্তু শোককে ছাপিয়েও একটা ঘটনা গুরুভারের মত সবারই মনকে চেয়ে রয়েচে। ইনি যে পরিমাণ ষ্টাইলে থাক্‌তেন সেই অনুপাতে টাকা রেখে যান নাই। অধিকন্তু বিশেষ কিছু ঋণ রেখে গেছেন।

অরুণার বোন বরুণা অবধি ভাব্‌লে, সে কবি খ্যাতি ও পেলেনা, তারওপরে তার সোসাইটিতে বার হওয়ার সময় সবই যেন দপ্‌ করে নিভে গেল। প্রমথ করপোরেশনে শত খানেক্‌ টাকার একটা কাজ করতো, অরুণার বিয়ের পরে তার বাবা ধরে প'ড়ে তিনশোটাকার পদোন্নতি করে দিয়ে গেছিলেন। এজন্য প্রমথ তাঁকে এখনও ধন্যবাদ দেয়।

বেলা প্রায় ন'টা বাজে প্রমথ তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে আলনা থেকে শার্ট নিয়েই পর্‌তে গেল, খেয়াল হোল, এতে বোতাম পরান নেই,—আঃ অরুণা যে কি করে। বিয়ে করেও যদি বোতামের খোঁজ রাখ্‌তে হবে, তবে তার এত উঠে পড়ে চেষ্টা করে বিয়ে কর্‌বারই বা দরকার কি ছিল? "অরুণা, অরুণা" সাড়া না পেয়ে শোবার ঘরের পাশের ছোট ঘরটিতে গিয়ে দেখে একখানা খাতাখুলে সে একমনে কি লিখ্‌ছে। সুপ্তোত্থিতের মত মুখ তুলে বল্‌ল "কি বল্‌চ?"

"আমার সোণার এনামেল করা বোতামের সেটটা কই? যেটা আমি সার্ট পাঞ্জবীতে ব্যবহার করি।"

"চল যাই দেখিগে। এমন সুন্দর আইডিয়া একটা মাথায় এসেছিল, তুমি এসে চেঁচামেচি না লাগালে কবিতাটা এখনই শেষ করে ফেল্‌তে পারতাম।"

প্রমথ মনে মনে বল্‌ল 'তোমার আইডিয়া এখন থাক, সারাদিন একটা কাজে নাই' যাক্‌, এ কথা সে মুখে বল্‌লে না, মোটে চার মাস বিয়ে করেছে হাজার হোক:

কিন্তু এরপরে যে কাণ্ডটা তাকে সইতে হো'লো তাতে বিধাতা তাকে এর চেয়ে শক্ত কথা বলিয়ে নিলে। বোতাম হাত্‌ড়াতে এ আলমারী সে আলমারী, এ ড্রয়ার সে ড্রয়ার খোজাখুঁজি করে অরুণা চিন্তিত হয়ে বল্‌লে, 'মনে ত পড়্‌ছে না।' এদিকে ঘড়ীতে সাড়ে ন'টা বাজে, দশটায় ওর অফিস।

প্রমথ হঠাৎ একটু ভেবে বল্‌লে, 'কাল সকালে আমি যে গ্রে রঙ্গের পাঞ্জাবী ছেড়েছিলাম সেটা কই! তাতেই আমার বোতাম ও ফাউন্টেন পেন ছিল যতদূর মনে পড়েচে।'

'সেটাত ধোপার বাড়ী দিয়েচি কাল দুপুরেই।' রাগে প্রমথের মুখ টক্‌টকে হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে "বেশ ভালই করেচ, ধোপার বাড়ী দেবার আগে জামাটা একটু চেয়ে দেখলে কি কবিতার রস উড়ে যেত? না কবিতা লেখার সময়ের বড্ডই অপব্যয় হোত।"

অরুণা নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল। বোধহয় তার এখনকার মনের কথা নিয়ে আর একটা নূতন কবিতার বই "অশ্রু-উৎস্‌" লেখা হয়ে যেতে পার্‌ত।

'তাও যদি বুঝ্‌তুম কোন দাম আছে! এইত দুটো বই বেরিয়েচে, তার সব গুলোইত পোকায় কাটে। বাজারে কাটে একখানা? বোতামটার দাম না হোক্ শ দুই টাকা দাম ছিল আর নতুন পার্কারটা। থাক্‌গে, ও সবতুচ্ছ কথা, যাও কবিতা লেখ গিয়ে'। বলে নিজেই একখানা আসন পেতে নিয়ে জোরে ডাক্‌লে, 'ঠাকুর ভাত দিয়ে যাও চট্ করে, অফিসের আর সময় নেই।'

রাত্রিতে প্রমথের পড়্‌বার ঘরেও অনেকরাত্রি অবধি লেখাপড়া করে। দিনে অফিসের কাজে সময় পায় না। রাত্রিতে তাই ওর উপন্যাস লেখার সময়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওর লেখা বাজারে কাটে খুব। গল্প সাহিত্যের মোঁপাসা, পাব্লিকে যা চায় ঠিক সেই জিনিষটি হাতে তুলে দিতে জানে।

পাশের শোবার ঘরে অরুণা অশ্রুহীন চোখে জানালার রেলধরে বাইরের আকাশের দিকে চেয়েছিল। চোখের সুমুখ দিয়ে বায়োস্কোপের ছবির মত ভেসে যাচ্ছিল ঘটনাপরম্পরা। বিয়ের আগে, এ বাড়ীতে নয় তাদের বালীগঞ্জের বাড়ীতে একদিন ছাদে বসে সে আর প্রমথ নতুনত্বের খাতিরে ছোলাভেজানো খাচ্ছিল, প্রমথ ঠাট্টা করে তাদের নতুন গৃহস্থালীর নানা সুচারু চিত্র আঁক্‌ছিল।

"একদিন হয়ত তুমি সখ করে মাংস রাঁধতে যাবে অরুণা, হয়ত একটু রেঁধেই একটা কবিতার ছায়া তোমার মনে উঁকি মার্‌বে, তাকে কি তুমি তুচ্ছ মাংস রান্নার জন্যে সরিয়ে রাখ্‌বে। না, তা রেখোনা, তবে বাঙ্‌লা দেশের পাঠকেরা মনে মনে প্রমথকে কি গালি পাড়্‌বে না। এবং সেই কবিতাটির অকালমৃত্যুর জন্য কি দায়ী হবে না আমার তুচ্ছ রসনা-স্বাদ। না, তা তুমি কোরোনা, তখনই তুমি উঠে যাবে, ওটা পুড়ে যাবে? যাক্ গে। এর মধ্যেও থাক্‌বে একটা নতুন-তরো মাধুরী..."

অরুণা তখন কি আনন্দে ঝরে পড়ছিল, কি বিপুল আবেশে ধূপের মত নিজেকে হাওয়ায় ছাড়িয়ে দিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল।

এত অকস্মাৎ এমন ছন্দঃপতন কেন? মনে কি হচ্চে না, যে একটি অশ্রুসিক্ত কথা বার বার ইসারায় জানিয়ে দিচ্ছে যে, প্রিয়া কবির যে সব তুচ্ছ ভুল ত্রুটি অপরূপ সুষমায় ভরে উঠ্‌তে পার্‌ত; সকল আচরণকে হাল্কা করে পাতলা রূপালিজালে ঢেকে দেবার সেই সখ যে আর মনে পড়্‌চে না। আজ অনেকদিন পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অরুণা মনে কর্‌লে, তার বাবা হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি কেন মারা গেলেন?

যাক্, এক পক্ষে ভালই হো'ল স্বপ্ন না হয় আর দুদিন বেশি-ই দেখ্‌ত। কিন্তু যা মিথ্যা তাকে যত তাড়াতাড়ি মিথ্যে বলে চেনা যায় ততই ভালো। যাক্, বাঁচা গেল।

আজ বহুদিন পরে কবি অরুণাকে ছাপিয়ে সেই তীক্ষ্ণধী, উজ্জ্বল চোখের তারা নিয়ে ইনট্যালেকচুয়াল অরুণা বেঁচে উঠ্‌ল। সে আর চোখের কাঁপন, ভ্রূলতার কজ্জল নিয়ে মাথ

ঘামাবে না। বৃথা অভিমান অকারণ অশ্রু কিছুই অনর্থক খরচ কর্‌বে না। জীবনে একটা স্বপ্ন কেটেচে ভালোই হোয়েচে, এত শীঘ্র ভাঙ্‌ল, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

এমনই হয়। কত আইডিয়ার নিহিত সত্য বার বার ভেঙ্গে পড়ে। কত educationএর থিওরী বাস্তবে খাটাতে যেয়ে তার ভিতরকার অসারতা ধরা পড়ে। কত সভ্যতার গর্ব্বিত সত্য ধোপে টেঁকেনা। তার আর এমনইবা কি।

যাক্, অরুণা যে নিজেকে ফিরে পেলে। তার "ধূপ-ছায়া" আর "ফুল-রেণুর" পর আর তৃতীয় কবিতার বই হয়ত বার হবেনা! কিন্তু এর পর সে তার জীবনের উত্তাপ দিয়ে যাদের সৃষ্টি করবে তাদের দিয়ে যাবার মত কিছু দিয়ে যেতে পার্‌বে।

সে দিন একটু বেশি রাত করে প্রমথ লেখাপড়া শেষ করে শোবার ঘরে এল। এসে দেখে, অরুণা জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু হেসে মনে করলে, সে এটা সেই কলম আর বোতাম হারানোর জের। এখনও তার মনটা খচ্ খচ্ করচে। যদিও অবিশ্যি এটা অরুণার বাবারই দেওয়া উপহার। কিন্তু এতগুলো জিনিষও গেল। যাক, মেয়েদের অভিমান যেমন অবুঝের মত হয় আবার একটু তোয়াজ করলে চট্ করে চলেও যায় তেমনি।

আস্তে আস্তে অরুণার কাছে সরে গিয়ে তার খোঁপায় হাত রেখে বল্‌ল "কি সুন্দর লাগ্‌ছে তোমায় অরু এমনি চমৎকার জাপানী ধরণের এলোখোঁপা বেঁধে"।

অরুণা মুখ ফিরিয়ে একটু হাস্‌লে। প্রমথ ভুল বুঝ্‌তে পার্‌লে অরুণা অভিমান করেনি, এমনই দাঁড়িয়েছিল হয়ত। তবুও তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে একটা তোড়া নিয়ে এসে বল্‌ল, "বিকেলে বীরেন এই ফুলের তোড়াটা দিয়ে গেছে। এর এই মার্শালনীল গোলাপটা দেখ, এ তোমার খোঁপাতেই মানায়।" সাবধানে ফুলটা খুলে নিয়ে অরুণার খোঁপায় অাটকে দিলে।

অরুণা বিছানার চাদরটা ঝাড়্‌লে, বালিশগুলো ভালো করে বিন্যস্ত করে দিলে। ছোট টুলের উপর রাখা কুঁজোথেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে প্রমথকে খেতে দিলে। পানের ডিবের থেকে সিক্ত সুগন্ধি দু'খিলি পান এনে সাম্‌নে ধরলে।

প্রমথ ভারি অবাক্ হয়ে চারদিকের ঝক্‌ঝকে গৃহিনীপনা দেখছিল। কাঁচের শার্সির আড়ালে কেরোসিনের হ্যারিকেনটা কমিয়ে রেখে, ইলেকট্রিকের বাতি নিবিয়ে দিয়ে (প্রমথ আবার ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে ঘুমোতে পারে না) অরুণা এবারে মাথার ফুলটা খুলে ফেলে টেবিলের উপর রেখে বল্‌লে "ফুলের গন্ধে বিছানায় পোকা মাকড় আস্‌তে পারে, এটা খুলে এবার শুয়েই পড়ি, রাত হয়েছে।"

শিশু-পালন ও শিশু-রক্ষণ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী

ভদ্র-মহিলা ও ভদ্র-মহোদয়গণ, আপনাদের কাছে উপস্থিত হওয়ার এই সুযোগ পাওয়ার জন্য "কলিকাতা স্বাস্থ্য-সপ্তাহ" ও "ভারতীয় বেতারসঙ্ঘের" কর্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। **"শিশু-সম্বন্ধে মাতার কি জানা প্রয়োজন"** এই বিষয়টী আজ আমাদের আলোচ্য।

শিশুর স্বাস্থ্য ও পরিণতি প্রধানতঃ তিনটী জিনিষের উপরে নির্ভর করে প্রথম, **বংশগত বৈশিষ্ট্য** দ্বিতীয়, **পারিপার্শিক অবস্থা,** ও তৃতীয়, **খাদ্য**। প্রথমটীকে পরিবর্ত্তন করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে কিন্তু দ্বিতীয়টী আংশিকরূপে এবং তৃতীয়টী সম্পূর্ণ ইচ্ছামতই বদলান যায়। শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা উপযোগী কর্‌তে গেলে, পিতামাতা বিশেষকরে মাতা ও চিকিৎসকদের মধ্যে সংযোগিতা থাকা দরকার। সন্তানকে দেহ ও মনে সুস্থ রাখ্‌তে হ'লে সন্তানবাৎসল্য ও অপত্যস্নেহই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে মায়েদের লালন-পালনের কাজটুকু চিকিৎসকদের কাছ থেকে শিখে নিতে হ'বে। এই লালন-পালনের নিয়ম কঠিন নয়। শিশুখাদ্য ও শিশুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটামুটি দু'চারটী বিজ্ঞান-সম্মত কথা জেনে নিলেই যথেষ্ট।

শিশুর স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রথম কথা হ'লো **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা**। জামা-কাপড়, বিছানাপত্র নোংরা হওয়া মাত্রই বদল করে দেওয়া উচিত এবং আপনারা তাহা করেও থাকেন কিন্তু এই সঙ্গে ধোয়াবার সময় সমুখ থেকে পেছনের দিকে ধোয়ানই শ্রেয়। কেন না এর ব্যতিক্রম হলে শিশুদের কঠিন ব্যারাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কানের পেছন, নখ, বগল ও উরুর ভাজ বেশ লক্ষ্য রেখে পরিষ্কার করা আবশ্যক। মা ও ধাত্রীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য। তাদের সর্দ্দি, কাশি বা অন্যকোন রোগ হ'লে শিশুকে ছোঁওয়া ত দূরের কথা, শিশুর ঘরে ঢোকাই নিষেধ। শিশুকে চুমো খাওয়া বা বুকে জড়িয়ে আদর করা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর।

পরিষ্কার রাখার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে শিশুকে নিয়মিত স্নান করান। জন্মের পর প্রথম স্নান পাশকরা ধাত্রী দিয়েই করান উচিত। নাভি পড়ে যাওয়ার পর স্নান করানই ঠিক—এ ক'দিন ঈষৎ গরম জলে গা মুছিয়ে দিলেই চল্‌বে। স্নান করাতে হবে এই ভাবে—প্রথমে দেখে নিতে হবে যে স্নানের পর পর্‌বার জামা-কাপড়, বিছানা, তোয়ালে ইত্যাদি ঠিক আছে, তারপরে স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে হ'বে, যাতে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে না লাগে। স্নানের পাত্রটী চীনে মাটী বা কলাই করা হলেই ভাল, তবে টিনের হলেও চল্‌তে পারে কিন্তু অতিশয় পরিষ্কার থাকা দরকার। পাত্রটীকে প্রথমে একটী মোটা চাদর বিছিয়ে ঢেকে নিয়ে জল ভর্‌বেন, জলের উত্তাপ হওয়া চাই ১০১ ডিগ্রী। চাদরটী দেওয়ার অর্থ এই যে ছেলের গা হাতপা শক্ত পাত্রটীতে ঠেকে গিয়ে যাতে ব্যথা না পায়। তারপর জামা-কাপড় খুলে গায়ে তেল মাখিয়ে জলে শোওয়াবেন। এক হাতে ছেলেকে ধরে, অন্য হাতে নরম গামছা ও মসৃণ সাবান দিয়ে গা পরিষ্কার কর্‌বেন। বেশী জোরে রগ্‌ড়ালে বা ঝাঁঝাল সাবান মাখ্‌লে ছোট শিশুর নরম গা ছড়ে যায় এবং চুলকানি বা নানারকম চর্ম্ম-রোগের সৃষ্টি হয়। এ গুলোকে সারানোর চেয়ে নিবারণ করা সহজ। স্নান শেষ হ'লে শিশুকে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে গামছা জড়িয়ে শুকিয়ে নিবেন, রগ্‌ড়াবেন না।

জন্মের পর **নাভির** গোড়া কিছুদিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ Bismuth বা Talcum মেখে তুলা দিয়ে ঢাক্‌বেন এবং তার উপরে একটী চওড়া কাপড় দিয়ে পেট জড়িয়ে রাখ্‌বেন। এই বাধনটী সর্ব্বদাই শুক্‌নো রাখবেন এবং

যথাসম্ভব কম নাড়াচাড়া করবেন্। রোজ খুলে পরিষ্কার কর্‌তে গেলে নাভি শুকাতে দেরী হয় এবং ঘা হয়ে যেতে পারে। পূর্ব্বেই বলেছি একদিন গরম জল দিয়ে গা মুছিয়ে দিবেন স্নান করাবেন না।

মুখে আঙ্গুল দিয়ে ভেতর **পরিষ্কার** করার মত খারাপ অভ্যাস আর নাই। ইহাতে শিশুর মুখের নরম চামড়াতে আঘাত লাগে এবং অসুখের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিশুর মুখ, দুধ খাওয়ার সময় আপনাথেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

জন্মের অব্যবহিত পরেই **চোখে** 2°/₀ Silver nitrate দেওয়া হয়। তারপরে ক'দিন Boric acid এর জলে চোখ ধুয়ে দেওয়া আবশ্যক। উজ্জ্বল আলো চোখে পড়্‌লে ক্ষতি হয়।

শিশুর **জামা কাপড়** হবে অল্প-সল্প, গরম, নরম ও ঢিলে যাতে সে হাত পা সহজে নাড়্‌তে পারে। নেংটি জোড়ে বাধা ঠিক নয়, তা'তে বুক ও পেটের সঞ্চালন বন্ধ হয় বা বাধা পায়। সব জামাতেই **বোতাম** থাক্‌বে, কোনরকম আলপিন ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

রাত্রে শিশুকে বারবার খাওয়াবার অতি খারাপ অভ্যাস। সংক্রামক রোগ বা আঘাতলাগার ভয় থেকে বাঁচাতে হ'লে শিশুর জন্য আলাদা বিছানা করা উচিত। বিছানাটা হবে নরম কিন্তু নড়্‌বে চড়্‌বে না। মশারী থাকা আবশ্যক। নবজাত শিশু জন্মের পরে ক'এক সপ্তাহ খুব গভীর ভাবে ২০।২২ ঘণ্টা ঘুমায়। দশ বছর বয়সে এই ঘুম ১০।১১ ঘণ্টায় এসে দাঁড়ায়। জেগে থাক্‌তেই ছেলেকে তার বিছানায় শোওয়ান অভ্যাস কর্‌বেন এবং দেখ্‌বেন যেন শুয়ে শুয়ে আপনা থেকেই ঘুমিয়ে পড়ে। দোলা দিয়ে ঘুম পাড়ান যতই আদরের চিহ্ন হোক্ না কেন, অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। ঘড়ি ধরে দিনের বেলা নিয়মমত তুলে খাওয়ালে তার ঘুম আর যখন তখন ভাঙ্গ্‌বে না। রাত্রিতে যত বেশী ঘুমায় ততই ভাল।

খোকা খুকুরা যে স্নানের সময় কাঁদে তাতেই এদের **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া** হয়। হাতপা ছোড়াটাও এরই সামিল। একটু বড় হ'লে অবশ্য তাদের উপযোগী ডন করান যেতে পারে।

এক মাস বয়স হ'লে ছেলেকে **বাইরে বের করা** যায় কিন্তু যা'তে মাথায় হাওয়া ও চোখে রোদ্দুর না লাগে তা'র ব্যবস্থা কর্‌তে হয়। বাইরে কিন্তু মিনিট পনেরর বেশী কিছুতেই রাখা ঠিক নয়। যে ঘরে ছোট ছেলেরা ঘুমায় সেখানে খুব জোরে হাওয়া না লাগাই ভাল তবে হাওয়া চলাচল অবশ্য থাকা চাই।

চারিদিকে হৈ চৈ করলে এবং উত্তেজিত কর্‌লে ছেলেরা অনেক সময় অনবরত কাঁদে কেবল ক্ষিদে পেলেই যে কাঁদে তা' নয়। প্রথম দুই বছরে ছেলেদের মগজ যতখানি বাড়ে, বাকী সারা জীবনে ততখানি বাড়ে না। সুতরাং গোলমাল করে ছেলেকে শান্ত থাক্‌তে না দিলে তা'র খোট মত চঞ্চল হয় এবং **মস্তিষ্কের বিকাশের** পথে গুরুতর বাধা দেয়। "ছোট শিশুকে নিয়ে মোটরগাড়ী চড়া, বড় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা কর্‌তে দেওয়া, জোর জবরদস্তি করে হাসান, কিম্বা নানারকম চক্‌চকে রং দেখিয়ে, আওয়াজ করে বা অন্য কোন রকমে খুসী করে তাকে চীৎকার করালে স্নেহবান্ বাপ-মা বা প্রশংসমান্ দর্শকের পক্ষে খুব আমোদের হ'লেও ছোট শিশুর অতিশয় ক্ষতি করে।" (হোল্‌ট্)

ছোট ছেলেমেয়েদের **নিয়মমত পাইখানায়** যাওয়ার অভ্যাস করা খুব শক্ত নয়। রোজ সকালে তা'দের 'পটে' বসিয়ে দিলে সে তা'রা চাক্ আর নাই চাক্ এ অভ্যাস সহজে হয়। বছর দেড়েক বয়স হ'লে তা'রা পরিষ্কার অপরিষ্কার বুঝ্‌তে পারে।

টিকে ছেলেপেলেদের দিতেই হ'বে ছ' মাস কিংবা তা'র আগে দিতে পার্‌লেই ভাল।

শিশুরা **সুস্থ এবং স্বাভাবিক আছে কি না** এবং ঠিকমত বাড়্‌ছে কিনা জান্‌তে হ'লে দিন কএক পরপর নিয়মমত ওজন করা প্রয়োজন। যেমন ভাবে রাখা দরকার তেমনভাবে শিশুকে রাখা হচ্ছে কি না এবং ঠিকমত খাওয়ান হচ্ছে কিনা বুঝ্‌বারও এই সবচেয়ে ভাল উপায়। ওজনে ঠিকমত বেড়ে না গেলেই বুঝ্‌তে, হ'বে গলদ আছে! সাধারণতঃ জন্মাবার সময় যে ওজন থাকে ছ' মাসে তা' দ্বিগুণ হয় এবং বারমাসে তিনগুণ। কিন্তু উঁচুতে অবশ্য এই বারমাসে, জন্মাবার সময় যতটুকু ছিল তা'র দেড়া হয়। এ ছাড়া এই স্বাস্থ্যের অন্যান্য লক্ষণ আছে। যেমন, তিনমাস বয়সে শিশু হাত পা লক্ষ্যহীন এদিক্ ওদিক্ না ছুড়ে একটা বিশেষ লক্ষ্যকে অনুসরণ করে এবং চোখের দৃষ্টি ইচ্ছামত এদিক ওদিক ফেল্‌তে পারে। ছয়মাসে উদ্দেশ্য নিয়ে জিনিষপত্র আক্‌ড়ে ধরে ও কথাবার্ত্তা অনুকরণ করে। এক বছর বয়সে ধরে চল্‌তে পারে এবং অনেক কিছু বুঝ্‌বার শক্তির বিকাশ হয়।

সাধারণ লোকের কেন, অনেক ডাক্তারদেরও ধারণা যে **দাঁত উঠ্‌বার** সময় ছেলেপেলের স্বভাবতঃই অসুখ হয়। এটা বড় ভুল। যদি এই সময়ে অসুখ হয়, তা'র কারণ হ'লো আসলে মায়ের দুধ ছাড়াবার সময় বাইরের জিনিষ খাওয়াবার নিয়মের ব্যতিক্রম এবং কখনও কখনও গ্রীষ্মকালের গরম। প্রথম দাঁত উঠে ছয় সাত মাস বয়সে সামনের দিকে নীচের দু'টো দাঁত। আড়াই বছরের মধ্যে ২০টী দুধের দাঁতই উঠে যায় এবং ছয় বছর বয়সে দুধের দাঁত পড়ে গিয়ে প্রথম স্থায়ী দাঁত উঠ্‌তে সুরু হয়।

এই ভাবে জন্মথেকে শিশুর বেড়ে উঠ্‌তে হ'লে তা'র খাওয়ার দিকে বেশ নজর রাখা উচিত। শরীরের পরিচালনা, দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়া ও পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য সরবরাহ না করলে ইহা হয় না। খাদ্য-বিষয়টী বিশেষ কিছু দুরূহ নয় এবং সে সম্বন্ধে বাদ-বিসম্বাদও বিশেষ নাই।

জীবনের প্রারম্ভে **মায়ের দুধই** হ'লো আদর্শ খাদ্য এবং স্তন্যপানই আদর্শ খাওয়ানের পদ্ধতি। নয়মাস বয়স হ'লে মায়ের দুধ একেবারেই খাবে না। অবশ্য এই সময়ে শিশু যদি রুগ্ন না হয় বা গ্রীষ্মকাল পড়ে না যায়। সাধারণতঃ শিশুকে চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান উচিত, সে বুকের দুধই হোক্ বা তোলা দুধই হোক্—ধরুন সকালে ৬টায়, দুপুরে ১০টায়, বিকালে ২টায়, সন্ধ্যা ৬টায় এবং রাত্রি ১০টায়। রাত্রি ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্য্যন্ত ৮ ঘণ্টা কোন কিছু খাবে না—কাঁদ্‌লে গরম জল দেওয়া যাইতে পারে। চার ঘণ্টার কম অন্তর খাওয়ান যে কেবল নিষ্প্রয়োজন তা' নয়, শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর। এতে মায়ের স্বাস্থ্যের হানি হয় এবং শিশুর পাকস্থলী খালি হ'তে না পেয়ে ব্যারাম হয়। নির্জ্জনে বসে দুধ খাওয়ানই উচিত। চারদিকে গোলমাল থাক্‌লে শিশু অন্যমনস্ক হয়, এদিক্ ওদিক্ চায় ও ভাল খায় না। ছেলেকে কোলে নিয়ে মাথার নীচে হাতে ভর দিয়ে মা বসে ছেলেকে স্তন্য দিবেন, দেখ্‌বেন যেন তা'র নাক বুকে গুজে না যায়। এই দুধ খাওয়ানোর ভঙ্গিটী ইতালি দেশের বিখ্যাত চিত্রকর Leonardo da Vinci তাঁর অঙ্কিত ম্যাডোনার চিত্রে অতিসুন্দর রূপে পরিস্ফুট করেছেন। শিশু প্রতিবারে একটী স্তন্যই পান করবে এবং অন্যটী তা'র পরের বারে। এইভাবে প্রত্যেকটী স্তন্য ৮ ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম পায়। মায়ের খাওয়া সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নাই, তিনি শুধু এমন জিনিষই খাবেন যা সহজে হজম কর্‌তে পারেন।

শিশু **তোলা দুধ** ছ' মাস বয়সে খেতে আরম্ভ করে তা' আগেই বলেছি। তোলা দুধ খাইয়ে ছেলে মানুষ কর্‌তে আমরা অল্পদিন কৃতকার্য্য হয়েছি কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই নয় যে নানা রকম "বিলাতি দুধ" খাওয়াতে হ'বে। ব্যবসাদারেরা এর যতই গুণগান করুন না কেন, তার দাম যেমন বেশী, তার চেয়েও বেশী ক্ষতিকর। এ গুলি সর্ব্বদাই সযত্নে বর্জ্জন করে চল্‌তে আপনাদের একান্ত অনুরোধ করি। মায়ের দুধের পরে শিশুর পক্ষে গরুর দুধই শ্রেষ্ঠ ও সহজলভ্য, অবশ্য যে গরুর দুধ খাবে তার কোন রোগ না থাকা চাই। কিন্তু

খাঁটী দুধে চিনি জাতীয় জিনিষ ও জল না মেশালে একেবারেই অনুপযুক্ত এবং শিশুর পুষ্টির হানি করে। ছাগলের দুধ বা গাধার দুধ যে গরুর দুধের চেয়ে ভাল ইহা একেবারেই সত্য নয়। বরং ছাগলের দুধ খেলে শিশুদের সাংঘাতিক রক্তহীনতা দেখা যায়। গরুর দুধের সঙ্গে যে কোন একটা রবিশস্যের জল যেমন চাল বা যবের জল এবং চিনি মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। জন্মের পর কএকদিন রবিশস্যের জলের বদলে শুধু জল ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু চিনি চাই-ই। রবি-শস্যের মধ্যে চালই সবচেয়ে ভাল ও অতি সহজে প্রাপ্য। পাঁচপোয়া জলে এক ছটাক চাল সিদ্ধ করে ফেন তৈয়ারী করা সকল ঘরেই চলতে পারে। বহুকালের পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, যে দুধের চিনি (Sugar of milk) আঁকের চিনি (Cane-sugar) এর চেয়ে বিশেষ গুণসম্পন্ন নয়। এ অবশ্য ঠিক বুকের দুধে (Milk-sugar) আছে কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে এই চিনি অন্য দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে সমানভাবে হজম হবে। সত্য কথা এই যে Milk sugar খেলে পাতলা পায়খানা হয় ও বায়ু বাড়ে। এও দেখা গেছে যে milk-sugar দেহের ওজনের প্রতি ১০০ গ্রাম (gramme) এ ০·২৬ গ্রাম, আঁকের চিনি ০·৭৬ গ্রাম এবং ৪ ভাগ maltose এ একভাগ dextrin মিশ্রিত এক বিশিষ্ট চিনি ১·৩২ গ্রাম শরীরে প্রবেশ করে। তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে এই dextrin-maltose ই সবচেয়ে ভাল কিন্তু এর দাম বেশী বলে আঁকের চিনির মারাত্মক কোন দোষ না থাকার দরুণ আঁকের চিনি নির্ব্বিবাদে দেওয়া যেতে পারে, তবে রুগ্ন শিশুদের জন্য dextrin maltoseই উপযোগী। গরুর দুধে যতখানি দুধ ততখানি ফেনের বেশী ফেন দিয়ে পাতলা কর্‌লে বা চিনি যোগ না দিলে একবারেই পুষ্টিকর হয় না। একসের দুধে ১½ ছটাক পর্য্যন্ত চিনি দেওয়া প্রয়োজন হয়।

শিশুরা তাদের ওজনের ১৬ অংশ **তরল জিনিষ খায়।** তরল জিনিষের মাত্রা দিনে এক সেরের বেশী কখনও হওয়া উচিত নয়। এই পরিমাণ খাদ্য তারা পাঁচবারে খাবে। এর বেশী খাওয়ালে বমি করে, বিছানা ভিজায়, এবং ভাল থাকে না। তোলা দুধ, ছ'মাস পর্য্যন্ত বোতল দিয়ে খাওয়ানই উচিত কিন্তু বোতল ও চুষনি খাওয়ার অব্যবহিত পরেই ধুয়ে পরিষ্কার কর্‌তে হ'বে। এর পরে চামচ দিয়ে খাবে। শাকসব্‌জী ফলের সার, নানারকমের ডাল ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিষে খনিজ পদার্থ, তৈল, মাংসজাতীয় জিনিষ ও খাদ্যপ্রাণ যথেষ্ট আছে এইরূপ জিনিষ ঘন করে রেঁধে চামচ দিয়ে খাওয়াতে হয়। এই রকমে খাওয়ালে শুধু যে খাদ্যপ্রাণের অভাবে যে সমস্ত ব্যারাম হয় তারই নিবারণ হয় তা' নয়, বরং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। "পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শিশুর অত্যন্ত ক্ষতি হয় এবং ছোট বয়সেই এর ভয় বেশী। বার্লি (barley), ডিমের জল, ও মাখনতোলা দুধ খেয়ে বহু জীবনের এরূপ অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে যে মনে হয় একমাত্র বীজাণু ছাড়া অন্য কোন কারণে এত শিশুমৃত্যু হয় নাই।"

ঠিক মত খাওয়ান হ'চ্ছে কি না বুঝ্‌তে হ'বে শরীর ও মনের বিকাশ দিয়ে। পায়খানার ধরণ বা সংখ্যা দেখে শিশুর খাদ্যের পরিমাপ হয় না এবং হল্‌দে না হ'লেও দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই —যদি শিশু তা' সত্ত্বেও বেড়ে উঠে।

পরিশেষে বক্তব্য এই ভারতে বিশেষ করে কলিকাতায় **শিশুমৃত্যুর** হার অন্য সমস্ত সভ্য দেশের চেয়ে অনেক বেশী। গত ৪০ বছর ধরে কলিকাতার শিশুমৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ২৮০ টীর উপরে, স্থানে স্থানে যেমন তালতলা অঞ্চলে ৫৩০। সেই জায়গায় ইংলণ্ডে হাজার করা ৬৩ ও নরওয়েতে ৫০। এর জন্য দায়ী আমাদের দেশের চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি সন্দেহ নাই। কেননা সেখানে শিশু-পালন ও শিশু-রক্ষণ সম্বন্ধে ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়ার বিন্দুমাত্র বন্দোবস্ত নাই। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এর জন্য ডাক্তারেরা ও জনসাধারণ কম দায়ী নন্। এ দেশের সর্ব্বসাধারণকে এ বিষয়ে সজাগ করা উচিত যে এই শিশুমৃত্যু নিবারণ করার পথ আছে। সকলের চেষ্টা সম্মিলিত হ'লে শিশুদের এই অপরিসীম দুর্গতির শেষ হয় এবং ইহা আরও আবশ্যক কেননা **এরাই দেশের ভবিষ্যৎ ও এরাই দেশের সম্পদ।**

প্রবন্ধটী ছাপার ভুল থাকাতে ও বিষয়টী প্রয়োজনীয় বোধে গত সংখ্যার 'ভাবধারা' হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল।

ক্রীতদাসী

শ্রীসীতা দেবী

বাংলাদেশের সমাজের উপর অধিপতি যাঁহারা, তাঁহারা নিতান্ত বাংলারই জিনিষ। কিন্তু বাংলাদেশের উপর বিধাতা যিনি, তিনি সকল দেশের, সকল কালের বিধাতা, তাঁহার নিয়ম সকল দেশেই এক।

বিধাতার নিয়মে বাংলাদেশের মেয়ের বয়স বাড়ে, কিন্তু সমাজের নিয়মে সে ছোটই থাকিয়া যায়। কারণ অবিবাহিতা মেয়ের যৌবনে পা দেওয়া মহা পাপ, এবং পুঁটলি বাঁধিয়া টাকা দিতে না পারিলে বরও জুটে না। কাজেই সরমার বয়স বহুকাল হইতে চৌদ্দ বৎসরে আসিয়া থামিয়া আছে। বয়স আসলে যে কুড়ি পার হইতে চলিল, আত্মীয় স্বজনে জানে, দেখা হইলে সরমার মা বাবাকে খোঁচা দিয়া দুইচার কথা শুনাইয়াও দেয়, তবে কলিকাতায় বাস, কাজেই ধোপা নাপিত বন্ধ হয় নাই, সমাজেও এখনও নিমন্ত্রণাদি হয়।

অতি গরীবের ঘর, তাঁহারা ছেলেমেয়েকে খাইতে পরিতেই দিতে পারেন না, তা লেখাপড়া শিখাইবেন কোথা হইতে? সরমা যতদিন ছোট ছিল, ততদিন মায়ের হাতের শেলাই করা দুইটা ছিটের সেমিজ ছিল, তাহার সদা সর্ব্বদার পরিধেয়, তাহা যতদিন না অঙ্গ হইতে টুকরা টুকরা হইয়া খসিয়া পড়িয়া যাইত, ততদিন সে দুটির বিশ্রামলাভ ঘটিত না। বাহিরে যাওয়া আসার আপদ বিশেষ ছিল না, তবে বছর আট নয় পর্য্যন্ত গলিতে খেলা করিতে, মায়ের জন্য চাল ডাল, নুন তেল, প্রভৃতি সামনের মুদীর দোকান হইতে কিনিয়া আনিতে কেহ তাহাকে বাধা দেয় নাই। ক্বচিৎ কদাচিৎ, দু একটা বিবাহাদিতে তাহার যাওয়া ঘটিয়াছে, তখন মায়ের বিবাহের বালুচরি শাড়ীখানা গায়ে পাঁচ পাক করিয়া জড়াইয়াই তাহার সাজসজ্জা সম্পন্ন হইয়াছে।

কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সরমার এক মাস্টার জুটিয়া গেল। সে এ পাড়ারই ছেলে শশধর। তাহাদের স্কুলের এক সমিতি ছিল, তাহাতে মধ্যে মধ্যে ছাত্রেরা বড় বড় প্রস্তাব উপস্থিত করিত, সেগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীতও হইত, তবে কার্য্যে পরিণত হইতে বড় একটা দেখা যাইত না! একবার প্রস্তাব হইল, প্রত্যেক ছাত্র এক একজন অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষকে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিবে, ইহাতে দেশের অভাবনীয় শিক্ষাভাব খানিকটা দূর হইতেও পারে।

এবারে একজন অন্ততঃ প্রতিজ্ঞাটা কার্য্যে পরিণত করিতে তখন তখনই লাগিয়া গেল। সকাল বেলা মুখ হাত ধুইয়াই শশধর সরমাদের বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। সরমা তখন ক্ষিপ্রহস্তে শাক বাছিতেছে, তাহার মা রান্নায় ব্যস্ত। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শশধর বলিল, "মাসিমা, আজ বিকেল থেকে সরিকে একঘণ্টা করে আমি পড়াব।"

সরমার মা খুন্তি চালাইতে চালাইতে চালাইতে বলিলেন, "তা বেশ ত বাবা। এত বড় মেয়ে হল, এখনও ক, খ পর্য্যন্ত শিখ্‌ল না। বড় হয়ে কি গতি হবে কে জানে? চিঠিপত্তরই বা লিখ্‌বে কি করে?"

শশধর ছাত্রী লাভ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সত্যই সেদিন সন্ধ্যাবেলা হইতে সরমার পড়া আরম্ভ হইয়া গেল। রাস্তার গ্যাসের বাতিটা সরমাদের সামনের ঘরে বিনা পয়সায় আলো বিতরণ করিত, সেখানে ছেঁড়া বই আর পুরাতন শ্লেট লইয়া মাস্টার এবং ছাত্রীর স্কুল বেশ জমিয়াই উঠিত। বুদ্ধিমতী মেয়ে, বয়সও খানিকটা হইয়াছে, কাজেই চট্‌পট্‌ শিখিতে লাগিল। নিজের শিক্ষকতার গর্ব্বে শশধরের বুক দশহাত হইয়া উঠিল।

সরমার বিদ্যা অনেকদিন শুধু চিঠিলেখার সীমানা ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু শশধরের শিক্ষকতার শেষ হয় নাই। সে এখন বাংলার বদলে ইংরেজী পড়ায়, এখান ওখান হইতে নানারকম বই মাসিক পত্রাদি জোগাড় করিয়া সরমাকে পড়িতে দিয়া যায়। এতবড় মেয়ের সঙ্গে অনাত্মীয় যুবকের এত মেশামিশি মা বাবার ভাল লাগে না, কিন্তু শশধরের কাছে এতদিকে এত উপকার তাঁহারা পান যে মুখ ফুটিয়া তাহাকে কিছু বলিতেও পারেন না। শশধর এখন মেডিক্যাল কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, সুতরাং এ বাড়ীর সব ডাক্তারী তাহার হাতে, এমনকি ঔষধও বিনামূল্যে সেই সরবরাহ করে। তাহা ছাড়া এটা আনিয়া দেওয়া, সেটা আনিয়া দেওয়া লাগিয়াই আছে। গরীবের ঘর অভাব অনন্ত, শশধর বড় মানুষ নয়, কিন্তু পাঁচটা টাকা ধার চাহিলে অন্ততঃ দুইটা না দিয়া সে কোনোদিনই ফিরাইয়া দেয় না।

মা বাবাতে মাঝে মাঝে পরামর্শ হয়। "শশধর ছেলেটা সকল দিক দিয়ে ভাল, সরমাকে খুব পছন্দও করে। নিজের মনের মত ক'রে গড়ে তুল্‌ছে। ওখানে হয় না?"

তাহার বাবা মেয়েলী কবিত্বকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, "ওগো এ নাটক নয়, নভেল নয়, এ সংসার বড় কঠিন ঠাঁই। আমরা আধ পয়সাও দিতে পারব না, আর ওদের কৃতী ছেলে, ওরা অম্‌নি আমার মেয়ে ঘরে নিয়ে নেবে?"

মা বলেন, "তা ছেলের যদি পছন্দ হয়ে থাকে—"

বাপ বলেন, "ছেলের পছন্দের আবার দাম কি? বিয়ের বেলা, বাপের সুপুত্তুর হয়ে, যেমনটি সবাই বল্‌বে, তেম্‌নি কর্‌বে। ঐ যে বুড়ো নটবরকে দেখ, ব'সে ব'সে দাওয়ায় ঝিমুচ্ছে, ওর মনে চরকির প্যাঁচ্‌। কত হাজারে ছেলে বেচ্‌বে, ব'সে ব'সে সেই ফন্দি করে খালি! সেদিন বল্‌ছিল, ছেলেকে বিলেত পাঠাবে, নইলে ছেলের পুরো দাম উঠ্‌বেনা।"

মায়ের মন, তবু হাল ছাড়িয়া দিতে চায় না। বলেন "চুপি চুপি একবার ছেলেটাকে ব'লে দেখ্‌ব? কুড়ি পার হয়ে একুশে পা দিল মেয়েটা, আর যে তার দিকে চাওয়া যায়না? ওর বয়সে আমি ত চার ছেলের মা হয়েছি!"

বাবা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বল্‌তে চাও বল, লাভ হবেনা কিছুই। নটবর বুড়ো শুন্‌তে পেলে ক্ষেপে আগুণ হয়ে যাবে। সরির জন্যে চেষ্টা ত কত জায়গায় কর্‌ছি, কিন্তু একেবারে কিছু দেবনা শুন্‌লে কোনো সম্বন্ধই আর এগোয় না। হাজার মেয়ে দেখ্‌তে ভাল হোক, আর লেখা পড়া জানুক, টাকাই সব আমাদের সমাজে। তাও রংটা আবার তেমন উজ্জ্বল নয়।"

মা বলেন, "ঐ ভাল খেতে মাখ্‌তে পেলে, দিব্যি উজ্জ্বল হত। বাঙালীর মেয়ে কি আবার মেম হবে না আর্ম্মানী বিবি হবে?"

শশধরকে বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। অনেক টাকার দরকার। নটবর বাবুর ইচ্ছা ছেলের কোনো ধনী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়া সমস্যাটার সমাধান করেন, কিন্তু ছেলে একেবারে বাঁকিয়া বসিল। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, উপার্জ্জনক্ষম হওয়ার আগে সে কিছুতেই বিবাহ করিবেনা, তা তাহার বিলাত যাওয়া হোক্ বা নাই হোক্। বাপ অত্যন্ত চটিলেন, কিন্তু আজকালকার ছেলেদের সঙ্গে পারিয়া উঠা দায়। তাহাদের লজ্জাসরম একেবারেই নাই, বিবাহের কথা লইয়া মা বাবার সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করিতে তাহাদের কিছুমাত্র আট্‌কায় না।

ধনীকন্যা তাঁহার একটি নজরে ছিল। গোপনে কন্যার পিতার সহিত নটবরবাবুর কথাবার্ত্তা ও হইয়াছে। এখনি বিবাহ দিতে তাঁহারা রাজী, শশধরের খরচও দিতে প্রস্তুত। তবে বিবাহ না করিয়া গেলে, শুধু কথার উপর নির্ভর করিয়া খরচপত্র তাহারা কিছু দিতে পারিবেন না। উঠ্‌তি বয়সের ছেলে, বিলাতে গিয়া দশরকম দেখিয়া শুনিয়া তাহার কি মতি হইবে, তাহা কে জানে? যদি মেমই বিবাহ করিয়া বসে? মাঝ হইতে তখন তাঁহাদের টাকা জলে যাইবে?

তাহা হইলে ছেলে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তাঁহারা মেয়ের বিবাহ স্থগিত রাখিতে পারেন কি? মেয়েটিকে নটবরবাবুর পছন্দ হইয়াছে, কিছুতেই হাতছাড়া করিতে চান না।

তাহাতে কন্যার পিতার আপত্তি নাই। মেয়ের বয়স এমন কিছুই নয়, না হয় আরও দু তিন বছর বসিয়াই থাকিবে? তাহারা বড় লোক, সামাজিক শাসনের ভাবনা নাই।

শশধরের বিলাতযাত্রা ঠিক হইয়া গেল। ক্ষুদ্র বাড়ীখানি বন্ধক দিয়া, মায়ের গায়ের স্বল্পাবশেষ গহনা কটি বিক্রয় করিয়া টাকা যোগাড় হইল। মায়ের মুখ ম্লান দেখিয়া শশধর বলিল, "মা কিছু ভেবোনা, যদি বেঁচে ফিরি তাহলে এই বাড়ীর দুগুণ বড় বাড়ী, আর তোমার এক গা গহনা আমি দুবছরের মধ্যে ক'রে দেব।"

মা জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন "তা কি আর জানি না বাবা? তুই আমার তেমন ছেলে নস্।"

সরমার মা দেখিলেন, আর সময় নাই। তবু যদি একটা কথাও আদায় করিয়া রাখিতে পারেন ও খানিকটা কাজ হয়। মেয়ের বয়স যথেষ্টই হইয়াছে, না হয় আর একটু হইবে। যায়

বাহান্ন, তায় তিপ্পান্ন, তাই বলিয়া মেয়েকে জলে ফেলিয়া দেওয়া যায়না। যদি এমন বর জোটে, তাহা হইলে, সকল কষ্ট সার্থক হইবে।

শশধরকে একদিন খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন রাত্রে। কোনমতে গোটাদুই টাকা সংগ্রহ করিয়া একটু ভাল করিয়া আয়োজন করিলেন। মা মেয়ে মিলিয়া রান্না বান্না সকাল সকাল সারিয়া ফেলিলেন, যাহাতে শশধর আসিলে দুইটা কথা বলিবার অবসর পওয়া যায়। মেয়েকে গা ধুইয়া পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে উপদেশ দিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, একখানা ঢাকাই শাড়ী কি একটা গহনা ও যদি থাকিত, মেয়েকে একটু সাজাইয়া দিতেন। কি কপাল করিয়াই আসিয়াছিল হতভাগী, সোমত্ত বয়স, কার না একটু সাজিতে গুঁজিতে ইচ্ছা করে? কিন্তু ছেঁড়া কাপড়পরা তাহার আর ঘুচিলনা।

শশধর সন্ধ্যা বেলাই আসিয়া উপস্থিত হইল। সরমা তখন ঘরে বসিয়া, মা রান্নাঘরেই। ঘরে ঢুকিয়া শশধর জিজ্ঞাসা করিল, "একলা আঁধায় ঘরে বসে আছ কেন সরমা?"

সরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই যে বাতিটা নিয়ে আসি।" তাহার গলাটা বড় ধরা ধরা।

শশধর বলিল, "থাক ব্যস্ত হতে হবেনা রাস্তার গ্যাসের আলো খানিকটা ত আস্ছে। জান্‌লাটা ভাল করে খুলে দাও।"

সরমা জান্‌লা খুলিয়া দিল। শশধর পিঠভাঙ্গা চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, "দেখ সরমা, আমিত বেশ কিছু দিনের জন্যে চল্‌লাম। পড়াশুনো সব যেন ছেড়ে দিওনা। আমি প্রতিমেলেই চিঠি লিখে খবর নেব। তোমাকে শুদ্ধ নিয়ে যেতে পার্‌লে ভারি ভাল হত। কিন্তু সে ক্ষমতা ত এখন নেই! ফিরে এসে সে ব্যবস্থা করব। লাইব্রেরীর চাঁদা দিয়ে গেলাম, মেম্বারশিপ্‌ তোমার নামে ক'রে দিয়েছি, যখন বই দরকার হবে পাবে। সরমা নতমস্তকে বসিয়া রহিল, কোনো উত্তর দিলনা। শশধরের কেমন যেন সন্দেহ হইল, সে নিকটে উঠিয়া আসিয়া তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যগ্রভাবে বলিল "ও কি তুমি কাঁদছ নাকি? কেন?"

সরমা মুখ ফিরাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কি করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে শশধর ভাবিয়াই পাইলনা! দুজনেরই মন ত দুজনে জানে, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার অবস্থা কাহারও ত নয়?

অবশেষে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শশধর বলিল, "তুমি কেঁদনা, লক্ষ্মীটি, যাবার আগে আমার মন ভেঙ্গে দিওনা। আমি এখনওত স্বাধীন নই, নইলে ব্যবস্থা অন্য রকম হত। ক'টা বছর একটু কষ্ট ক'রে থাক্‌তে পার্‌বে না?"

সরমা মাথা নাড়িয়া জানাইল সে পারিবে, তাহার পর চোখ মুখ মুছিয়া, মায়ের আহ্বানে সাড়া দিতে চলিল। খাওয়া দাওয়া হইয়া গেল। কি কি রান্না সরমা নিজের হাতে করিয়াছে,

তাহা বলিয়া দিতে মা ভুলিলেন না। সরমা মায়ের ইঙ্গিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। তখন তিনি কথা পাড়িলেন। "বাবা, সরমাকে তুমি নিজের হাতে গ'ড়ে তুলেছ, নিজের উপযুক্ত ক'রে। তাকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবে?"

এতখানি খোলাখুলি কথার জন্য শশধর প্রস্তুত ছিলনা, সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। সরমার মা আবার বলিলেন, "বল্‌বার ভরসা ত আমাদের নেই বাবা, কিন্তু মনে মনে তোমার আশায়ই আমরা পথ চেয়ে আছি।"

শশধর বলিল "জানেন ত মাসিমা, আমি স্বাধীন নই, আমার শিক্ষাও এখনও শেষ হয়নি। বিলেত যাচ্ছি, খানেক বোঝা মাথায় নিয়ে। ফিরে আসি, তারপর সব দিক্ দিয়ে ভাল হয় যাতে তাই করব।"

ইহার বেশী কিছু কথা আর সরমার মা তাহার কাছ হইতে আদায় করিতে পারিলেন না। আর দিন পাঁচ ছয় পরে শশধর চলিয়া গেল।

দিন কাটিতে লাগিল। সরমা ঘরের সব কাজই প্রায় একলা হাতে করে, খালি সন্ধ্যা-বেলা তাহাকে ছুটি দিতে হয়। গগনের আলোয় বসিয়া তাহার পড়াশুনা চলিতে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শশধর এখানে থাকিতে ইহার অর্দ্ধেক উৎসাহও তাহার দেখা যাইত না। মা মাঝে মাঝে বলেন, "বাবা পর্ব্বতপ্রমান বইয়ের রাশ ত শেষ কর্‌লি। মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে এতদিনে তুই একটা কিছু হতিস্। তা মেয়ের লেখাপড়ার ও আজকাল দাম আছে। দেখি।"

শশধরের চিঠি প্রায়ই আসে, কিন্তু মা সরমাকে চিঠির উত্তর দিতে দেননা, শেষে কি মেয়ের একটা বদ্‌নাম রটিয়া যাইবে? একে ত গরীবের মেয়ে। নিজে মাঝে মাঝে পোষ্টকার্ড লিখিয়া খবর দেন। তাহার ঠিকানায় শুধু সরমার হস্তাক্ষর থাকে।

বিকাল বেলা হঠাৎ একদিন সরমার বাবা সকাল সকাল অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। স্ত্রীকে ডাকিয়া হাতে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, কি কষ্টে যে যোগাড় করেছি, তা আমিই জানি। একটু জল খাবারের জোগার কর, আর মেয়েটাকে একটু পরিষ্কার ক'রে দাও দেখি। ওকে সন্ধ্যের সময় একজনরা দেখ্‌তে আস্‌বে।"

সরমার মা নিরুৎসাহভাবে বলিলেন, "আবার ও সব কেন? শশধর একরকম কথা দিয়ে গেছে, সে শুন্‌লে কি ভাব্‌বে?"

সরমার বাবা রাগিয়া বলিলেন, "রাখ তোমার কথা! ছেলের কথার মুল্য কি? এদিকে তার বাবা কেশব মল্লিকের মেয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা ক'রে ফেলেছে, তার খোঁজ রাখ?"

সরমার মা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা কোথায় যাব! আমাকে কেমন বোকা বুঝিয়ে গেল," তিনি মেয়ের সন্ধানে চলিলেন।

মেয়ে বাঁকিয়া বসিল। বলিল, "কেন তোমরা আমাকে এমন শাস্তি দিচ্ছ? আমি কাউকে দেখা দিতে যেতে পার্‌ব না।"

মা গালাগালি জুড়িয়া দিলেন। শশধর যে কতবড় জোচ্চোর তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিতেও ভুলিলেন না। মেয়েকে কুল মজাইতে নিষেধ করিয়া, হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া চুল বাঁধিতে বসিলেন। কিন্তু ধারকরা বেনারসী এবং গহনা তাহাকে কোনোমতেই পরাইতে পারিলেন না। দুই চারিটা চড় চাপড়ও তাহার পিঠে পড়িল, কিন্তু তাহাতেও ফল হইল না।

সন্ধ্যার সময় দুইটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া সরমাকে দেখিয়া গেলেন। দুই চারিটা প্রশ্ন যাহা করিলেন, তাহার উত্তর সরমার বাবাই দিলেন। মেয়ে কোনো কথা বলিল না। একজন ভদ্রলোক বলিলেন "বয়স ষোলো শুনেছিলাম, কিন্তু যেন বেশী বোধ হচ্ছে।"

আর একজন বলিলেন, "তা হতে পারে, যাক্, তাতে বেশী ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।" জলযোগ করিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। পরদিন খবর আসিল, সরমাকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে তাঁহারা রাজী আছেন।

সরমার বাবা গিয়া বর দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। গৃহিনী অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীর কাছ হইতে কোনো কথাই আদায় করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি হঠাৎ ভয়ানক গম্ভীর এবং গোপনচারী হইয়া উঠিয়াছেন। বর দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেই, তিনি ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা, কেমন দেখ্‌লে, বুড়ো হাবড়া নয় ত?

স্বামী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বুড়ো কেন হতে যাবে, এই বছর তিরিশ বয়স।"

স্ত্রী উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "তবে দোজবর নাকি? বড় লোকের ছেলে বল্‌ছ, বিনে পয়সায় মেয়ে নিচ্ছে আমার কেমন যেন সন্দ হচ্ছে বাপু। এর ভিতর বড় কিছু গলদ আছে।"

স্বামী বলিলেন, "একেবারে নিখুঁৎ হলে যেচে তোমার বুড়ো মেয়েকে বিনা পণে, বিনা গহনায় কে বিয়ে কর্‌তে আস্‌বে? একটু খুঁৎ কিছু থাক্‌বেই।"

"কি খুঁৎ তাই বলনা? মেয়ের মা আমি, আমার যে ভয়ে বুক কাঁপ্‌ছে?"

স্বামী উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, "সরমাকে আর নটবরদের বাড়ী অত ঘনঘন যেতে দিও না, এখন যেন একটা নিন্দে উঠে সব ফেঁসে না যায়।"

গৃহিনী বলিলেন, "শুধু শুধু ত যায় না। শশধরের মা বুড়ী ডেকে পাঠায়। মাগী ছেলে গিয়ে অবধি শয্যা নিয়েছে, আর বেশী দিন টিক্‌বেনা। চিকিচ্ছেও কিছু হচ্ছেনা। ছেলেকে বিলেত পাঠাতে ধারধোর করে ফেলেছে বিস্তর, এখন একেবারে ভরাডুবি হতে বসেছে।"

সরমার বাবা অর্দ্ধেক কথা না শুনিয়াই বাহির হইয়া গেলেন।

সরমার বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। গরীরের ঘরের বিবাহ, ধুমধাম কিছু হইল না, তবে পাড়া প্রতিবাসী আসিয়া কল কোলাহলে গৃহ মুখর করিয়া তুলিল। সরমা হাসেও না, কাঁদেও না সকলে তাহাকে কত যে ঠাট্টা তামাসা করিল, তাহার ঠিকানা নাই। সাজান হইয়া গেল। বর

আসিল, স্ত্রী আচারও হইয়া গেল। কণের মা বরের দিকে বারবার করিয়া আশঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, বিশেষ কিছু বুঝিলেন না। সাধারণ চেহারা, বয়স খুব বেশী নয়, তবে অতিরিক্ত গম্ভীর। মেয়েরা ঠাট্টা করিয়া বলিল, "বেশ মানিকজোড় হয়েছে, দুইটির-ই মুখ তোলা হাঁড়ি। এই কি নূতন ফ্যাশান্ বেরিয়েছে?"

বিবাহ হইয়া গেল, বরকন্যা বাসরে চলিল। সঙ্গে পাড়ার যত কিশোরী আর যুবতীর দল।

একজন বলিল, "আমাদের সরিকে কেমন সাজিয়েছে দেখ। সাজসজ্জা না হলে কি চেহারা খোলে?"

আর একজন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল "সত্যি ভাই, পাতাচাপা কপাল মেয়ের। বাপ মায়ে আধ পয়সা খরচ কর্‌লে না, অথচ গাভরা গহনা। সব বরপক্ষে দিয়েছে।"

প্রথমা বলিল, এমনটা কিন্তু আজকালকার দিনে দেখা যায়না।

বরের সঙ্গে রঙ্গরসের অনেক চেষ্টা হইল, সে কাহাকেও কিছু আমল দিল না। একজন জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁরে সরি, তোর বর কালা নাকিরে? না বিলেত থেকে এসেছে? বাংলা কথা বোঝে না।"

বর হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "ইটালি।"

মেয়ের দল ত হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। বর বলে কি? সে ইটালি হইতে আসিয়াছে? ইহা লইয়াও খানিক ঠাট্টা তামাসা চলিল, কিন্তু বরের কাছ হইতে আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। মেয়ের দল ক্রমে সরিয়া পড়িতে লাগিল, দুই চারজন এধার ওধার ফরাশের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িল। তৃতীয় প্রহর রাত্রি, বিবাহ বাড়ীর কোলাহল নিদ্রার কোলে নির্ব্বাণলাভ করিয়াছে। হঠাৎ বিকট চীৎকারে বাড়ীর সকলে জাগিয়া উঠিল। বাসর ঘর হইতে আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিয়া মেয়ের দল ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। সরমার মা-বাবা দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। এধার ওধারে আলো জ্বলিয়া উঠিল।

বাসর ঘরের মাঝে দাঁড়াইয়া বর পৈশাচিক অট্টহাস্য করিতেছে, ডান হাতখানা সাম্‌নে প্রসারিত। চীৎকার করিতেছে, "আমি মুসোলিনি, আমি মুসোলিনি! দেশ উদ্ধারে বেরিয়েছি, সবাই স্যালুউট কর।"

বাহিরের ঘর হইতে বরের বাড়ীর একজন চাকর আর দরোয়ান দৌড়িয়া ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। বরকে ধরিয়া নানা উপায়ে শোয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে পারিলনা। সৈনিকের মত দীর্ঘ পদবিক্ষেপে সাম্‌নের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। তাহার অনুচর দুজনও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভয়াকুলা মেয়ের দলকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টাও করিতে লাগিল, "আপনারা ভয় পাবেন না, এঁর মাঝে মাঝে এ রকম হয়। আমরা দুজন রয়েছি, ভাল ক'রে সাম্‌লে রাখব, যাতে কারো কোনো অনিষ্ট না করেন।"

সরমার মা মাটিতে মাথা কুটিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "ওগো, আমার সরির কপালে এই ছিল গো! সোণার প্রতিমা আমি জলে ভাসিয়ে দিলাম।"

সরমার বাবা ধীরে ধীরে নিজের শয়নকক্ষে গিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন, তাঁহায় মুখের রং পাংশুবর্ণ, বলিবার কথা আর কিছু তাঁহার জুটিল না।

ভয়ে বিস্ময়ে সকলে এমন অভিভূত ছিল, যে সরমার দিকে এতক্ষণ কেহই চাহিয়া দেখে নাই। বর বাহির হইয়া যাওয়াতে সকলের চোখ এখন তাহার উপর পড়িল। গাঁট ছড়ার বন্ধন খুলিয়া ফেলিয়া সে জানালার ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

একজন যুবতী তাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "ও মা গাঁটছড়া খুলে ফেলেছিস্ কেন লা? ওকি অলক্ষণ?

সরমা সমস্ত দিনের ভিতর এই প্রথম কথা বলিল, "ওর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা থাকলে সেটাই কি খুব সুলক্ষণ হত?"

যুবতী নিরুৎসাহিতভাবে বলিল, "তা বিয়ে একবার হয়ে গেলে আর ত ফেরান যায় না ভাই? যেমন তোর কপাল কি আর করবি?"

বরকে বাহিরে লইয়া গিয়া, ঔষধাদি সেবন করাইয়া মাথায় জল ঢালিয়া, তাহার ভৃত্যেরা খানিক পরে ঠাণ্ডা করিল। সে দরোয়ানের মাদুরের উপরেই লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। মেয়েরা আর কেহ শুইলনা, কতক্ষণে ভোর হইবে, এবং বাড়ী গিয়া সকলে কাছে এই অদ্ভুত ব্যাপারের বর্ণনা করিতে পারিবে, তাহারই আশায় পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সরমার মা মেয়ের কাছে আসিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মেয়ে এক ঝটকা মারিয়া সরিয়া গেল।

পরদিন কনে বিদায়ের সময় একটু বচসার লক্ষণ দেখা গেল। সরমার বাবা আস্ফালন করিতে লাগিলেন, "মেয়ে আমি দেব না ত, মিথ্যে কথা বলে ভাঁড়িয়ে, উন্মাদ ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলে? আমি পুলিশ কেস্ করব! নিয়ে যাক্, ওদের ছেলে।"

বরপক্ষীয় যাহারা কনেকে লইতে আসিয়াছিল তাহারাও দমিবার পাত্র নয়। "কেন মশাই এখন এত সাধু সাজ্ছেন? আপনাকে বলা হয়নি যে ছেলে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে?"

সরমার বাবা চেঁচাইয়া উঠিলেন, "একে নাকি অসুস্থ হওয়া বলে? এযে পাগলা গারদের পাগল মশাই? আমি ভেবেছিলাম, হাঁফানি টাফানি কিছু একটু আছে বুঝি।"

সরমা ঘরের ভিতর ক্ষিপ্রহস্তে সাজিয়া গুজিয়া ঠিক হইতেছিল। তাহার মুখ পাথরের প্রতিমার মত নির্ব্বিকার। সে হঠাৎ বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "বাবা, কেন মিছে তোমরা গোলমাল বাধাচ্ছ? আমাকে যখন টাকা নিয়ে বিক্রী করেছ, আমি ওদের সঙ্গেই যাব।" বলিয়া সেই সর্ব্বাগ্রে গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বরকে আনিয়া তাহার পাশে বসান হইল, লোকজন

যে যেখানের গিয়া ঠিক হইয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সরমার পিতামাতা বোকার মত শুধু চাহিয়া রহিলেন।

সাতটা দিন কাটিয়া গেল। এ বাড়ীতে কান্নাকাটির আর বিরাম নাই। মেয়ে যে কেমন আছে, তাহার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। দুই দিন দেখা করিতে গিয়াও সরমার বাবা তাহার দেখা পান নাই।

আট দিনের দিন জোড় ভাঙ্গিতে বরকনে ফিরিয়া আসিল! বরকে অবশ্য আর তাহার বাড়ীর লোকেরা রাখিয়া গেল না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। সে তেমনি অটল গম্ভীর, কথা একটাও বলিল না।

সরমার মা মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সোহাগ করিতে বসিলেন। মেয়ে একেবারে কাঠের মত হইয়া রহিল। আগের চেয়ে আরো বেশী সে সাজিয়া আসিয়াছে। গহনার আতিশয্যে তাহার সারা শরীর বোঝাই হইয়া গিয়াছে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো অন্যায় অত্যাচার করেনি ত মা?"

সরমা বলিল, "ন্যায় অন্যায় জ্ঞান যার থাকে, তাকে ত মানুষ পাগল বলেনা?"

মা একটু ক্ষণ থামিয়া বলিলেন, "তা তুই জেদ করে গেলি কেন? আমরা ত না পাঠাইতেই চেয়েছিলাম?"

সরমা বলিল, "জিনিষের দাম যখন নিয়েছ, তখন জিনিষ দিতেই হবে।" বলিয়া সে উঠিয়া গেল। প্রতিবেশিনীরা এক এক করিয়া আসিয়া জুটিল। সবাই মিলিয়া খালি আট হাজার টাকার গহনার আলোচনাই হইতে লাগিল, কারণ আর কিছু হইবার উপায় নাই। সরমা চুপ করিয়া সব শুনিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় বলিল, "মা, আমি একটু ও বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছি, মাসিমাকে দেখে আসি। তাঁর অবস্থা খারাপ শুন্‌ছি।"

মা রান্নাঘর হইতে বলিলেন, "যা, তবে বেশী দেরি করিস্ না।"

মেয়ে যখন ফিরিল, তখন রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মা শুইয়া পড়িয়াছেন, তবে জাগিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত কর্‌তে আছে? আমি যে ভেবে মরি, গায়ে অত টাকার গহনা।"

সরমা বলিল, "আরো দুচার বাড়ী দেখা করে এলাম। সবাই মিষ্টিমুখ করিয়েছে, আর আমি কিছু খাবনা," বলিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে বাড়ীতে হুলুস্থূল বাধিয়া গেল। সরমার গায়ে একখানি গহনা নাই। খালি শাঁখা আর লোহা।

গালাগালি, অবশেষে চড়চাপড়, কিছুতেই কোনো ফল হইলনা। আট হাজার টাকার গহনা রাতারাতি যে কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার খোঁজ কিছুতেই পাওয়া গেলনা।

"মা কাঁদিয়া বলিলেন, এখনও বল হতভাগী, দেখি যদি কোনো কিনারা হয়। নইলে তোকে যে ওরা কুটে ফেল্‌বে? মা, একি সামান্যি কথা! আট হাজার টাকার গহনা!"

সরমা বলিল, "কুটুক ছেঁচুক, সে আমি বুঝ্‌ব। তারা আট হাজার টাকা খরচ করে পাগল ছেলের জন্যে দাসী কিনেছে, মেরে ফেলে তাদের লাভ কি? কিন্তু টাকা ত আমার। আমি যা খুসি করেছি.

সরমার ইতিহাসে এই খানেই যবনিকা পতন।

* * * *

শশধর হঠাৎ মায়ের চিঠি পাইল। অনেকদিন রোগশয্যায় পড়িয়া ছিলেন বলিয়া চিঠি পত্র লিখিতে পারিতেন না।

"বাবা, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। আমারও পথে দাঁড়াবার জোগাড় হয়েছিল, বুড়োবুড়ীর মাথা গুঁজ্‌বার জায়গা ছিল না। হঠাৎ মহাজনের এমন সুমতি কে দিল জানিনা। বাড়ীর দখল সে ছেড়ে দিয়েছে! আরো যে টাকা তার কাছে ধার ছিল, তার খৎ খানাও ফিরে দিয়েছে। বলে, টাকা সে পেয়েছে। তবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে, কার কাছে পেয়েচে, সে নাম কিছুতেই কর্‌বে না। তুই হয়ত বিশ্বাস কর্‌বিনা বাবা, শুন্‌তে উপকথার মত শোনায়, কিন্তু সত্যিই এঘটনা ঘটেছে।

সরমা হতভাগী ক'দিন আগে আমায় দেখ্‌তে এসেছিল। বাপ তার সর্ব্বনাশ করেছে। টাকার লোভে এক ঘোর উন্মাদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।"

সমুদ্র

শ্রীরেণু দাম

হে সমুদ্র! শান্ত হও,
বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল;
বাজে যেন বুকে এসে
এত কোলাহল!
জন্ম তোরে দিয়েছিলো
কবে বসুন্ধরা?
এমন প্রলয়রূপে
চিরভয়ঙ্করা!
গরজিয়া গ্রাসিলি কি
ধরার ধূলিরে
লেলিহা জিহ্বা মেলি;—
চাহিল না ফিরে।
চক্ষু মেলি দেখি তবু
স্বপ্ন মনে আসে;
সীমাহীন অম্বুরাশি
উদাস বাতাসে।
মনে হয় বিধাতার
কোন্ ইসারায়;
আশীর্ব্বাদ মাখি' দেয়
ধরার ধূলায়।
কতকাল, কতদিন
কত যুগ ধ'রে;
চুম্বনের রেখা আঁকে
সিক্ত বেলা পরে'।
আবার লুকায়ে যায়
তরঙ্গ উল্লাসে;
শুভ্রফেণা পুঞ্জ যেন
পুষ্প সম হাসে।
আছাড়িয়া পড়ে এসে
ধরিত্রীর পায়;
নির্ম্মাল্যের ফুল পুনঃ
তরঙ্গে মিলায়।
কি উদাস, কি হতাশ
বেদনার ভারে;
কাঁদে বুঝি অম্বুনিধি
আকাশের পারে।
সে ক্রন্দন শুনি বুঝি
আলিঙ্গিয়া তোরে;
আকাশ-প্রহরী জাগে
ব্যথামুক্ত ক'রে?
কোন্ অভিমান ভরে
ফুলে ফুলে ওঠা!
দিশাহীন, সীমাহারা
পথপানে ছোটা!
চুপি, চুপি বন্ধুরূপী
রাত্রি নেমে আসে;
মুকের ভাষায় বুঝি
তোরে ভালবাসে?
শুক্লা চাঁদ হর্ষভরে
গরবিনী হায়;
ছায়ার মায়ায় ঘিরি
তরঙ্গে নাচায়।
সে মায়ার খেলা দেখি
আমি একা তীরে;
গুমরি' গুমরি' ঢেউ
কেঁদে যেন ফিরে।
মনে হয় মোর এই
ব্যথাতুরা হিয়া;
ওরি বুকে শান্ত করি
মুখ লুকাইয়া:

গ্রন্থ-পরিচয়

নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন—১ম ও ২য় ভাগ। শ্রীবিনয় কুমার সরকার প্রণীত। ১ম ভাগ, পৃঃ ৪৫৭+৬৭ মূল্য ২॥০। ২য় ভাগ, পৃঃ ৪৪৪ মূল্য ২৲। বোর্ড বাঁধাই। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বই দুইখানা খ্যাতনামা গ্রন্থকারের বর্ত্তমান রচনা সমূহের সংগ্রহ। ইহার প্রথম ভাগ তত্ত্বাংশ বা জ্ঞানকাণ্ড এবং দ্বিতীয় ভাগ কর্ম্মকৌশল। আমাদের জাতীয় জীবনের যে সমস্যাটি বিশেষ গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে ইহাতে তাহারই সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা ও পন্থানির্দ্দেশ। বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠ ও দৃঢ় করিতে হইলে যে সকল উপাদান ও মালমশলা দরকার তাহা অতি বিস্তৃতভাবে নানাদিক্ দিয়া আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে কোন বিষয়েরই গণ্ডীবদ্ধ সঙ্কীর্ণ আলোচনা নাই—সবগুলি লেখাতেই ব্যাপকতা উদারতা ও বহুদর্শিতার পরিচয় আছে। ইহাতে চিন্তাশীল গ্রন্থকারের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ভাবের এত বিচিত্র লেখার স্থান পাইয়াছে যে তাহাদের পরিচয় এখানে দেওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। আমরা শুধু এই বলিতে পারি, গ্রন্থখানি যুবক বাংলার প্রত্যেক ছেলেমেয়ে পড়িলে তাহাদের জীবনপথের সমস্যাগুলির একটা সমাধান পাইতে পারে। গ্রন্থখানির প্রতিটি পৃষ্ঠা বহু তথ্যবহুল জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। ভূমিকাটিতে গ্রন্থকারের আন্তর্জাতিক কর্ম্মক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলে। আর একটি বিনয়বাবুর ভাষা। তাঁহার ভাষায় সাধারণ চল্‌তি কথাগুলি অনেকসময়ই লেখাকে সুস্পষ্ট ও জোরালো করে, কিন্তু স্থানবিশেষে বড়ই বেখাপ্পা শোনায়। আশাকরি, এবিষয়ে অধ্যাপক সরকার একটু বিবেচনার সহিত বিশেষ প্রচলিত ও সুসঙ্গত শব্দেরই ব্যবহার করিবেন। আর একটী কথা এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি। অধ্যাপক সরকার অর্থনীতির সমস্ত পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করিবার যে মহৎ সংকল্প করিয়াছেন সেজন্য তিনি সমগ্র দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই। এই কাজ যতশীঘ্র ও সত্বর সুষ্ঠুরূপে করা যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় সেজন্য প্রবল প্রচেষ্টা আবশ্যক। আশাকরি অধ্যাপক সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন।

প্রবাসের কথা—শচীন সেন প্রণীত। পৃঃ ৯৬। কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। প্রকাশক—প্রমোদ সরকার, বাতায়ন পাব্লিশিং হাউস, ১৪৪ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

গ্রন্থখানি এক নিঃশ্বাসেই পড়িলাম। কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও মোটামুটি বলিতে গেলে বলিতে হয় বইখানি ভালই লাগিল। বিশেষতঃ তর্ক আলোচনার স্থান এ নয়, তাই সে বিষয়ে বিরত রহিলাম। গ্রন্থকার যে দৃষ্টি দিয়া পাশ্চাত্যকে দেখিয়াছেন এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তাহা সমালোচকের হইলেও তাহাতে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি দরদ আছে মনে হয়। ভাষায় জোর আছে, বলিবার ধরণ সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট। যুক্তির তীব্রতাও আছে। আমরা ইহা প্রত্যেক বয়স্ক ছেলেমেয়েকে পড়িতে অনুরোধ করি। চিন্তাশীল লেখা বাংলা সাহিত্যে বিরল। এরূপ বই তাই বড়ই উপভোগ্য।

ছোট গল্প—সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা। কথক সঙ্ঘ ২নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যা এক আনা।

সপ্তাহিক গল্পের পত্রিকা। আমরা নিয়মিত ভাবে ইহা পাইতেছি এবং পড়িয়া আসিতেছি। কিছুদিন যাবত ছোট গল্প যে উন্নত ও বিচিত্র হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। গল্পগুলি বর্ত্তমান খ্যাতনামা লেখকদের। তাহা প্রায়ই ভাল। সে বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রোয়োজন। নির্ব্বাচনে ভদ্র রুচি থাকাই বাঞ্ছনীয়। প্রতি সংখ্যায় এদেশের বড়লোকদের একটি ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকে। 'চিত্র ও চরিত্র'টি মামুলি ধরণের নয় বলিয়াই বেশ লাগে। সঙ্গে দু'একটা তথ্যমূলক সংক্ষিপ্ত নিবন্ধও থাকে। তাহাও মূল্যবান। আমরা ইহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই কামনা করি।

শিরণী—অধ্যাপক মহম্মদ মনসুরউদ্দিন এম, এ সংগৃহীত। প্রকাশক—এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৮০ আনা।

ইহা পাবনা জেলার মুসলমান চাষীদের মধ্যে প্রচলিত দরজীর শাস্তর নামে একটী গল্প। গ্রেট্ টাইপে ছাপা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২। পুঁথি বড় আকারে মুদ্রিত। ইহা খাঁটি প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এব তাহা 'ভাষাতত্ত্ববিদদের প্রার্থিত সুবিধার জন্য' মলাট হাতে-তৈরী গোলাপী রংএর দেশী আড়িয়লের কাগজে তৈরী। শিল্পী-গুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের আঁকা একখানি রেখা-চিত্র মলাটে আছে। বইখানি মুসলমানী ঢংএ ডানদিক্ হইতে ছাপা এবং সেইদিক্ হইতে পড়িতে হইবে।

লোক-সাহিত্য সংগ্রহের এই প্রচেষ্টাকে আমরা সানন্দে সাধুবাদ করি। বাংলাদেশের পাড়া-গাঁয়ে কত যে রসের খনি ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করার মত ধৈর্য্য ও প্রয়াস এদেশে এখনও দেখা দেয় নাই। হইলে আমাদের আনন্দের উৎস বাড়িত এবং এই সম্পদগুলো রক্ষা পাইত। শিরণীর মত সহস্র সহস্র পল্লী-কাহিনী বাংলা সাহিত্যের আসর জমাইয়া তুলুক ইহাই কামনা করি। এই উপলক্ষে একটা কথা মনে হয়। এই গল্পগুলি যদি বিশেষজ্ঞের গণ্ডীবিশেষে আবদ্ধ না রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের পঠনোপযোগী করিতে হয় তবে সাধারণ চলিত ভাষা ব্যবহারই করা উচিত এবং স্বদেশীর ধরণে বাম হইতে মুদ্রিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ছেলেদের গান—স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রণীত। ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা।

ভূমিকায় ঢাকাসহরের সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"স্বামিজী পনর ষোল বৎসর যাবৎ আসাম, বাঙ্গালা ও বিহার রামকৃষ্ণ মিশনের উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহে সঙ্গীত শিক্ষা নিয়ে এবং বাহিরের স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকে গান শেখাতে গিয়ে যে সুর ও ভাব তাহাদের উপযোগী মনে করেছেন, সেই সকল সুরে ও ভাবে এই পুস্তকের গানগুলি রচনা করেছেন। রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হয়েচে। প্রায় সব ক'টি গানই স্বামিজী আমায় অনুগ্রহ ক'রে গেয়ে শুনিয়েচেন। সুরগুলি আমার বড় ভাল লাগল্; আশা করি সকলেরই লাগ্‌বে।

ভগবানের মাতৃভাব ছেলেপিলেদের অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়, তাই, ঐ ভাবের গানই এই বইয়ে বেশী দেওয়া হয়েছে। মায়ের দয়াময়ী ও করালিনী এই দুইটি ভাব। মা'কে শুধু বরাভয়দায়িনীরূপে দেখ্‌লে চিত্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। তাকে ভয়ঙ্করীরূপে দেখ্‌তে শেখা বাল্যেই আরম্ভ হওয়া উচিত। ইহাতে চিত্ত দৃঢ় ও সবল হয়, সাহস বাড়ে—ভবিষ্যৎ জীবনে সংসারের ঝড় ঝঞ্ঝা পদতলে দলন ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি জন্মে তাই এই উভয় ভাবের এবং জীবন-যুদ্ধে উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক কয়েকটা সুন্দর গানের সমাবেশই এই পুস্তিকাখানির

বৈশিষ্ট্য।" এই পরিচয়ের ওপর আমাদের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহাদের এই শ্রেণীর গানের ওপর অনুরাগ আছে তাঁহারা ইহাতে আনন্দিত হইবেন। বইখানির কাগজ ও ছাপা খুব ভাল।

ঠাকুরমার চিঠি – শ্রীকামিনী রায় বিএ বিরচিত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, লিঃ কলিকাতা।

তিনটি কবিতা চিঠির ধরণে লেখা। নারীদের সত্ত্বাধিকার ও প্রগতি বিষয়ে তিনটি মতের উল্লেখ ইহাতে আছে। বৃদ্ধা পিতামহী, এই প্রগতির প্রতিবাদ করিতেছেন, শিক্ষিতা নাতনী উহা সমর্থন করিতেছেন, অল্প লেখাপড়া-জানা কূলবধূ নাত্-বৌ উভয়ের মধ্যে সাঁকো রচিয়াছেন। পড়িতে উপভোগ্য—বেশ আমোদ পাওয়া যায়।

হিন্দুধর্ম্মের ব্যাধি ও চিকিৎসা; জাতের খবর—শ্রীইন্দুপতি মুখোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থকার হর্ত্তৃক বাঁকীপুর পোঃ মোমড়া, হুগলী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ ও ৵০ আনা।

বই দুইখানা বর্ত্তমান সমাজসমস্যা লইয়াই রচিত। উচ্চ জাতির নিম্নজাতির ওপর নির্য্যাতন, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। 'জাতের খবরে' বাঙালী হিন্দুদের বিভিন্ন জাতের উৎপত্তি, সংস্কার ও পরিবর্ত্তনাদির ঐতিহাসিক তথ্য আছে। এই জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি পড়িলে সমাজের অনেক কিছু গলদ বুঝা যায়। বইগুলি সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি। সমাজের দূষিত গলিত আবর্জ্জনা দূর করিতে হইলে যে তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা আবশ্যক, লেখকের গ্রন্থে তাহা আছে।

সাঁঝের-প্রদীপ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এম্-এ, বি-এস্‌সি, এম্-বি-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকিঙ্কর মাধব সেনগুপ্ত, উখরা (বর্দ্ধমান)। ৩০৪ পৃঃ মূল্য ৷৷০। উৎকৃষ্ট অ্যান্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা।

ইহা কবিতার বই। গ্রন্থকারের বিভিন্ন বয়সের লেখা বিভিন্ন প্রকারের কবিতা সমষ্টি। কবিতাগুলি গ্রন্থকার তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ধূপ, দীপ ও আরাত্রিক এই তিন বিভাগে যথাক্রমে প্রকৃতি, প্রেম ও ভক্তি বিষয়ক কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি পড়িয়া খুশী হইয়াছি। ভাষা, ভাব ও কবিত্বে কবিতাগুলি সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অনেক কবিতা থেকে দুই চারি ছত্র তুলিয়া দেখাইবার মত। কিন্তু স্থানাভাবে তাহা পারিলাম না। শেষের বিভাগে কতকগুলি কবিতা বৈষ্ণব কবিদের অনুসরণে লিখিত হইলেও ধরণে সম্পূর্ণ নূতনত্ব আছে। সংস্কৃত হইতে মাঝে অনূদিত ছোট কবিতা কয়টি সুন্দরই হইয়াছে। কবিতাগুলি পড়িলে পাঠক-পাঠিকারা আনন্দ পাইবেন।

প্রাপ্তি সংবাদ—আমরা নিম্নলিখিত পত্রিকা ও বই সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ইহাদের কোন কোনটার পরে আলোচনা হবার সম্ভাবনা আছে।

হংস (হিন্দী) সম্পাদক শ্রীপ্রেমচন্দ। মাসিক পত্রিকা, মথুরা।

ভারতলক্ষ্মী—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত।

আলোচনী
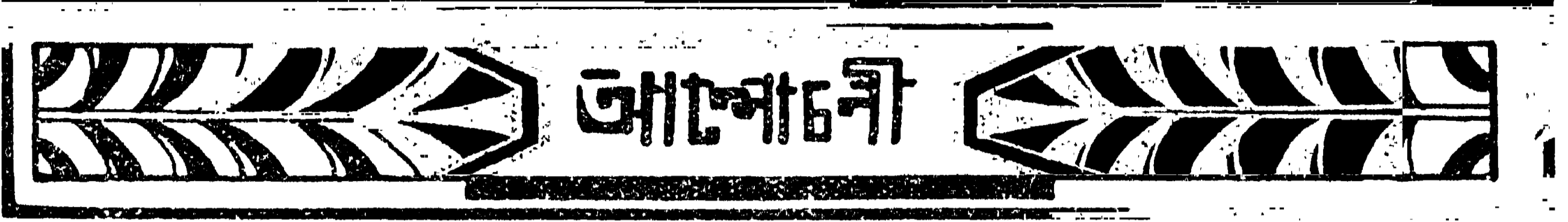
পরলোকে কিশোরী লাল ঘোষ

শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ঘোষ ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। মীরাট মামলা হইতে মুক্তি পাইবার কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন যাবত রোগ ভোগ করিয়া তিনি একটু ভালর দিকেই আসিতেছিলেন, পত্রিকায় এইরূপ দেখিতেছিলাম! অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইলাম। কিশোরীলালের বিয়োগে শ্রমিকেরা একজন নৈষ্ঠিক ও উপযুক্ত নেতা হারাইলেন, সংবাদ-পত্র-সেবীরা একজন বিচক্ষণ সহযোগী হারাইলেন। বয়স তাঁহার বেশী হয় নাই। এই ৩৭ বছর বয়সেই তিনি যে জ্ঞান ও কর্ম্ম ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই এদেশে দুর্লভ। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্তা সহধর্ম্মিণীকে আমাদের আন্তরিক বেদনা ও সহানুভূতি জানাইতেছি।

বাঙ্গালীর শরীর-চর্চ্চা

অল বেঙ্গল ফিজিকাল কালচার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া সংগঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের শরীরচর্চ্চার জন্য দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বিরাট তেতালা ব্যয়াম-ভবন প্রতিষ্ঠিত হইবে—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি (সভাপতি), শ্রীযুক্ত কে, কে, মিত্র, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখার্জি, ক্যাপ্টেন জে, এন, মুখার্জি এবং অধ্যাপক এইচ্, সি, রায়। এই ব্যায়াম-ভবন নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে ইহা ভারতে অদ্বিতীয় হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে ভূমি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এখানে সকল রকম ব্যায়াম, দেশী খেলাধূলা দৌড় ঝাঁপ সাঁতার প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিবে। ইহা ছাড়া রীতিমত ব্যায়ামচর্চ্চা শিক্ষাদানের ক্লাশ হইবে, কমনরুম, লাইব্রেরী প্রভৃতি থাকিবে। ডাক্তারী পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা থাকিবে। এজন্য একটি শিক্ষা-বিধি রচিত হইয়াছে। মেয়েদের ব্যায়াম চর্চ্চার এবং মহিলা শিক্ষয়িত্রীদের শরীরচর্চ্চা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও ইহাতে সংকল্পিত আছে।

বাঙ্গালীর এই ক্ষীয়মান স্বাস্থ্য ও ক্ষীণতম শরীরের দিকে তাকাইলে এরূপ একটি বাঁচিবার অবলম্বন বহুদিন পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। ইহা পরম আনন্দের বিষয় যে দেশের চিন্তাশীলগণ এই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন। বাঙ্গালীর জীবনগুলির দিকে তাকাও, চোখে জল আসিবে। না আছে তাদের স্বাস্থ্য, না আছে সৌষ্ঠব,

না আছে সৌন্দর্য্য, না আছে বাঁচিয়া থাকিবার আশা ও উৎসাহ। এই মরণপথের যাত্রীদের যাঁহারা বাঁচাইবার আয়োজন করেন, তাঁহারা জাতির আশীর্ব্বাদ চিরদিনই পাইবে।

রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উৎসব

আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর (১১ই আশ্বিন, ১৩৪০) রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু তিথির একশত বর্ষ পূর্ণ হইবে। এই দিনে সেই মহাপুরুষের স্মৃতিউৎসব সমগ্র দেশে অনুষ্ঠিত হইবে। সে জন্য কলিকাতার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এক সভা হইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কি ভাবে এই যুগগুরুর প্রকৃষ্ট মর্য্যাদা দেওয়া যায় কমিটি তাহাই স্থির করিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করিবেন।

রামমোহন বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক, বর্ত্তমান ভারতের স্রষ্টা। আজিকার বাঙ্গালী ত তাঁহারই মানস সৃষ্টি। যে দূরার্ত্তপ্রসারী দৃষ্টিতে তিনি বর্ত্তমান ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাই আজ সার্থকতার পথে। হিন্দু ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি, এটা তাঁর বড় কথা নয়। ব্রাহ্মসমাজসৃষ্টির প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন ইহাও তাঁর সত্য পরিচয় নয়। সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন যুগে সকল গণ্ডী ও সকল সংস্কারের ঊর্দ্ধে তিনি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয়। তাই আজ সকল জাতির সকল বর্ণের সকল ধর্ম্মের সকলে মিলিয়া সেই মহামনীষীর পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন। দেশের প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে প্রতি প্রতিষ্ঠানে সেই পুণ্যতিথির শুভ অনুষ্ঠান হোক্—জাতি গৌরবিত হোক্, উজ্জীবিত হোক্

নিখিল-বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলন

গত ১০ই-১২ই ফাল্গুন কলিকাতা এলবার্ট হলে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতায় উচ্চ শিক্ষার কতকগুলি প্রয়োজনীয় সমস্যার উত্থাপিত হয় এবং পরে এ সব বিষয়ে আলোচনাও হয়। দুইটি বিষয়ে আমরা বিশেষ আনন্দিত। একটি মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার প্রস্তাব, দ্বিতীয়টি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা। মাতৃভাষা প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষার বাহন। এ বিষয়ে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হইয়াছে। কয়েক বছরের মধ্যে তাহা প্রবর্ত্তিত হইবে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, মাতৃভাষাকে উচ্চ শিক্ষারও বাহন করা উচিত এবং তাহা অতি সত্বর। বাংলাভাষার মত এত সম্পদশালী ও এত জনবহুল ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে এমন ভাবে লাঞ্ছিত করা শুধু অমর্য্যাদার নয়, আত্মঘাতী ও। ভাষা মানুষকে গড়িয়া তোলে, জাতীয় জীবন সুপ্রতিষ্ঠ করে, এত বড় শক্তিকে উপেক্ষাও অবহেলার ধূলায় লুটাইয়া জাতিকে শক্তিহীন ও পঙ্গু করা আর কতদিন চলিবে?

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রীসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। হিসাব যথা—১৯২০ সালে ১১৬ জন বালিকা, ১৯২৬ সালে ১৮৩ এবং ১৯৩২ সালে ৬৭০ জন বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়। কিন্তু বছরে ২০।২২ হাজার ছেলে পরীক্ষার্থীদের তুলনায় ইহা কত নগণ্য তাহা ভাবিবার বিষয়! ইহার কারণ কোথায়? খুঁজিতে গিয়া সকলের আগে মনে পড়ে, মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা দেশে নাই। সেইজন্যই দ্বয়ীশিক্ষার (Co-education) জন্য এত চীৎকার করিতেছি। এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব দেখিতে পাইলাম শ্রীযুক্তা মীরা গুপ্তা উত্থাপিত করিয়াছেন! তাঁহার মতে বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত এবং সর্ববশেষ পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে ছেলেমেয়েদের একত্রই পড়িবার ব্যবস্থা সঙ্গত, মধ্যের আই-এ বা বি-এ ক্লাশে ইহা উচিত নয়। আমরা ইহা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। সর্ববত্রই শিক্ষার দ্বার মেয়েদের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে, ইহাই আমরা চাই। অস্বাভাবিকতার আমরা পরিপন্থী। শিক্ষা যত অল্পসময়ে ও অল্প আয়োজনে এ গরীব দেশের মেয়েদের মধ্যে বিপুল ও বহুল বিকীরিত হয়, ইহাই আমাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হওয়া উচিত। অধ্যাপক-সঙ্ঘের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করি। বিশেষভাবে মফস্বলের কলেজগুলিতে দ্বয়ী শিক্ষার ব্যবস্থা না হইলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কোন পন্থাই থাকে না। মেয়েদের শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় শিক্ষা-বিলাসীদের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া বহুব্যাপক ও সর্ব্ব সাধারণের গ্রহণীয় করিতে হইলেই বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাছাড়া দ্বিতীয় উপায় আর নাই। শিক্ষার আলো জ্বলিলে দুর্ভাবনার কারণগুলি মুহূর্ত্তে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

ঢাকায় মাতৃসদন প্রতিষ্ঠার সংকল্প

সুখদেবীর বিবরণ ও বৃত্তান্ত কাহারো অগোচর নাই। ইহাদের জন্য হিন্দুসমাজের দায়িত্ব খুবই বেশী। ঢাকায় তাই একটি মাতৃসদন স্থাপনের সংকল্প হইয়াছে। সুখদেবী সম্প্রতি অস্থায়ী ভাবেই সহরে স্থান পাইয়াছেন। এবিষয়ে পত্রিকায় এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের আবেদন ও সকলেই দেখিয়াছেন। আশা করি, এ বিষয় দেশবাসীদের অর্থানুকূল্য পাইয়া প্রতিষ্ঠানটির সত্বরই গড়িয়া উঠিবে। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনেকদিন হইতেই উলপব্ধি করিতেছিলাম। কয়েকটি নিগৃহীতা নারীকে লইয়া এককালে আমাদের ভাবনা যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু গঠনমূলক কোন-কিছুই এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। আমরা এই সদনুষ্ঠানের পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

রাজবন্দীদের প্রবাসী ও মর্ডার্ণ রিভিউ পড়িবার অনুমতি

পত্রিকা দুইখানি রাজবন্দীদের নিকট নিষিদ্ধ—তাঁহারা ইহা পড়িতে পান না। এ সম্বন্ধে আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে এই অনুরোধ জানাইতেছি। পত্রিকা দুইখানি এ দেশের শ্রেষ্ঠ মাসিক।

বিশেষতঃ প্রবাসী বাংলাদেশের সমস্ত চিন্তাশীলদের রচনার মিলনভূমি। উহার সহিত দীর্ঘ বৎসরের বিচ্ছিন্নতার অর্থ বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারার সহিত যোগ হারানো। ইহা যে শিক্ষিত মনের বুভুক্ষার পক্ষে কত কত নিদারুণ তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আমাদের পক্ষে উপলব্ধি সহজ নয়। ইহা কেন রাজবন্দীদিগকে পড়িতে দেওয়া হয় না জানি না। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে ইহার রাজনীতিক আলোচনা ('বিবিধ প্রসঙ্গ' নামক সম্পাদকীয় মন্তব্য সমূহ) কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষে দোষণীয় (অবশ্য ইহা আমাদের অনুমান), তবে এ অংশ ছিঁড়িয়া বাকীখানি বেচারীদিগকে দিতে আপত্তি কি, শুধু সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও ভারতীয় সংস্কৃতি ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাগুলিও কি তাঁহারা পড়িবার দাবী করিতে পারেন না? নির্ব্বিচারে শিক্ষিত মনকে এমনি বুভুক্ষু রাখিয়া ক্লিষ্ট করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কোনই লাভ নাই, বরং এই সকল হতভাগ্য যুবকদের মনের গতি এই দিকে মোড় ফিরাইতে পারিলে হয়ত বা ফল ভাল হইবার আশা করা যায়। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া সত্বরই এই কাগজ দুইখানি একটু কর্ত্তিত অবস্থায়ও উহাদের পড়িতে দিবেন, ইহাই আমাদের সানুনয় অনুরোধ। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এজন্য এবং জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান সকল এজন্য বিশেষভাবে সভায়ও এজন্য আন্দোলন আবশ্যক। পত্রিকা ও এই সব রকম ও সব বিষয়ের পড়িবার অধিকার ও অনুমতি রাজবন্দীদিগকে দেওয়া অনুগ্রহের কাজ নয়, দায়িত্বশীল সভ্য গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করি।

ঢাকায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নূতন হুকুম

নিম্নলিখিত নুটিশ ও তৎসঙ্গে একখানি ফারম সহরের প্রত্যেক হিন্দু অধিবাসীকে দেওয়া হইয়াছে। ফারমখানি যথারীতি লিপিবদ্ধ হইয়া গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্গীয় বিপ্লবী অত্যাচার দমন আইনের ১৮শ ধারার অন্তর্গত ৫ (ক) নিয়মানুসারে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ১৯৩২ সনের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের ২৫৯২৫ পি নম্বর ঘোষনা মতে ঢাকা জেলার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে আমি আপনাকে হুকুম দিতেছি যে (১) আপনার বাড়ীতে ১৪ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক কোন পুরুষ আসিয়া ২৪ ঘণ্টার অধিক সময় থাকিলে আপনি তৎসম্বন্ধে কোতওয়ালী সূত্রাপুর/লালবাগ থানার দারগার নিকট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিবেন। (২) আপনার বাড়ীর কোনও লোক (যাহার নাম তালিকাভুক্ত হইয়াছে আপনার বাড়ী হইতে এক মাসের উর্দ্ধকালের জন্য অনুপস্থিত থাকিবার সম্ভাবনা হইলে আপনি তাহাও উক্ত দারোগার নিকট রিপোর্ট করিবেন। এই আদেশ অমান্য করিলে ১৯৩২ সনের ১২ও আইনের ১৮ (২) ধারার ১৭ (১) নিয়মানুযায়ী আপনি জরিমানা অথবা ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ইতি সন ১৯৩৩। তাং ৩রা ফেব্রুয়ারী।

এ সম্বন্ধে শাসনকর্ত্তাদের একটা কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তাহা এই, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদিগকে অনর্থক উত্যক্ত করা বিচক্ষণ লোকের উচিত নয়। উহাতে ফল উল্টা ফলে। দেশের লোকের সহানুভূতি সরকারকে হারাইতে হয় এবং আইনের অযথা অপপ্রয়োগে উহার মর্য্যাদার হানি হয়। ঢাকা সহরের কথাই ধরা যাক্। সহরটিতে বিগত কতিপয় মাস কোনরকম অশান্তিজনক কিছুই ঘটে নাই। এ রকম নিস্পন্দ শান্তির ভাব বহুদিন সহর-বাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু এই ইস্তাহারে সহরের গৃহস্থদের যে কি রকম অসুবিধা ও অসোয়াস্তি ঘটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। আমরা এজন্য অনেক বিশিষ্টদের নিকটই অসন্তোষের কথা শুনিতেছি। একজন সংসারী লোকের পক্ষে এইরূপ বিধি মানিয়া চলা শুধু অসম্মানকর নয়, অসম্ভবও। ইহাকে যথাবিধি কার্য্যকারী করিতে হইলে উহা ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করিবে না, অনেক সময়ই দৈব ও আনুষাঙ্গিক ঘটনায় উহাকে চালিত করিবে। সে ক্ষেত্রে আইন রক্ষা কিরূপে চলিবে? অথচ অনিচ্ছাকৃত অমান্যেও শ্রীঘরের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে! এখন নিরীহ নাগরিকের উপায় কি? এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যদি সহরবাসী ভুক্তভোগীদের সহিত একটু আলাপ আলোচনা করেন এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া ভাবিয়া দেখেন, তবেই আমাদের কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট কি উদ্দেশ্যে যে ইহা জারি করিলেন তাহা আমাদের ধারণার বাইরে। শুধু ইহার ফলে নিরীহ অধিবাসীগণ ত্যক্ত হইতেছে মাত্র।

ভারতীয় ও বঙ্গীয় বজেট

এই উভয় বজেটই উভয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় বজেটে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে, বঙ্গীয় বজেটে ঘাট্তি পড়িয়াছে। ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিব স্যর জর্জ্জ সুষ্টার বজেটে উদ্বৃত্তি দেখাইয়া উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। পৃথিবীব্যাপী এই ঘাট্তির দিনে ভারত সরকারের এই বাড়্তি যে কতবড় আশাতীত অবস্থার পরিচায়ক তাহা বলিতে তিনি বিরত হন নাই। কিন্তু আমরা বলি, আমাদের পক্ষে এই বাড়্তি এবং বাংলা সরকারের ঘাট্তি উভয়ই সমতুল্য। ভারত সরকারের তহবিলে টাকা থাকায় ইহা প্রমাণিত হয় না যে দেশের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইয়াছে অথবা উক্ত উদ্বৃত্ত টাকা দ্বারা এই আর্থিক অনটন দূর করিবার কিছুমাত্র প্রয়াস হইয়াছে। বাস্তবিক আগামী বজেটেও জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পোন্নতি প্রভৃতি জাতিগঠন মূলক কোন নূতনতর পন্থা গৃহীত হয় নাই, পোষ্টালষ্ট্যাম্প ইত্যাদির মূল্য হ্রাস হয় নাই, দেশের স্বর্ণ বিদেশে অবাধ রপ্তানি বন্ধ করিবার সংকল্প নাই, এক কথায় জাতির বাঁচিবার এবং দৈন্য দূর করিবার কোন ব্যবস্থাই বজেটে করা হয় নাই। কাজেই এই বজেটে ভারত সরকারের উল্লাস হইতে পারে, বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহারা জোরগলায় এদেশের আর্থিক

স্থায়িত্বের কথা বলিতে পারিবেন, কিন্তু দুর্ভাগা দেশবাসী যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিল।" ভারতীয় বজেট এইরূপ।

	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
আয়	১২৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা	১২৪ কোটি ৫২ লক্ষ
ব্যয়	১২৪ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা	১২৪ কোটি ১০ লক্ষ
উদ্বৃত্ত	২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা	৪২ লক্ষ

এখন বঙ্গীয় বজেট। উহা এইরূপ—

	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
আয়	৯, ৪৫, ৫৭,০০০	৯, ৪৮, ৮৭,০০০
ব্যয়	১০, ৮৩, ০৬,০০০	১১, ৩২, ২৪,০০০
ঘাট্‌তি	১, ৩৭, ৪৯,০০০	১, ৮৩, ৩৭,০০০

কাজেই দেখা যায় আলোচ্য বর্ষের চেয়ে আগামী বর্ষে ঘাট্‌তি আরও বাড়িয়াই যাইবে। বজেট উপস্থাপিত করিতে যাইয়া রাজস্ব-সচিব মিঃ উড্‌হেড্‌ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, টেররিষ্ট দমনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ১ কোটি ২২½ লক্ষ টাকা বেশী খরচ করিতে হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় যখন টেররিজম ছিল না তখনও সরকারের আর্থিক অবস্থা মন্দা ছিল কেন? অবশ্য দেশে এই টাকাটা হয়ত জাতির গঠন মূলক কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিত ইহা আশা করা সর্ব্বদা সমীচীন না হইলেও বরং আপাততঃ তর্কচ্ছলে তাহাই ধরিয়া লইলাম। কিন্তু বাংলার এই ঘাট্‌তি বজেটের মূলে ত শুধু এই সাময়িক আন্দোলন নয়। বাংলার আয়ের অনেকখানি অংশ যথা আয়কর পাটের শুল্ক ইত্যাদি ভারত গবর্ণমেণ্টের তহবিলে যায়। কাজেই বেচারা বাংলাদেশকে আয়-ব্যয় মিটাইতে প্রতি বছরই বিষম মুস্কিলে পড়িতে হয়। ফলে দেশের শাসনযন্ত্রকে সচল রাখিতেই অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়, জাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে ছিটেফোটাও মিলে না। অথচ অন্যান্য প্রদেশের বেলায় ভারত-সরকার এত টানেন না। বাংলা কামধেনু কিনা, তাই সকলেরই অনুকম্পা ইহার প্রতি কিছু বেশী। একথা বঙ্গীয় ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটিও স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে লিখিত আছে, ১৯২১-২২ সালে ভারত সরকারের মোট খরচ হয় ৬৪, ৫২, ৬৬,০০০ টাকা। তন্মধ্যে বাংলা থেকেই আদায় হয় ২৩, ১১, ৯৮,০০০ টাকা। পরবর্ত্তী বৎসর গুলিতেও ভারত সরকার এমনিভাবেই বাংলার রাজস্বের মোটা অংশ লইয়াছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত মডার্ণ রিভিউ দিয়াছেন, আমরা তাহা উল্লেখ করিতেছি।

	লোক সংখ্যা	আয়	ব্যয়
বাংলা	৫০১২২৫৫০	৯, ৪৮, ৮৭,০০০ টাকা	১১, ৩২, ২৪,০০০
বোম্বাই	২২২৫৯৯৭৭	১৪, ৮৬,০০,০০০ টাকা	১৫, ২১,০০,০০০

কাজেই, দেখা যায় বোম্বাইতে ২ কোটি অধিবাসীর জন্য পনর কোটি টাকা খরচ হয়। আর বাংলার পাঁচ কোটি লোকের জন্য ১১২/৩ কোটি টাকা এরূপ অবস্থায় বাংলার জাতি গঠন মূলক বিভাগগুলি যে ক্লিষ্ট হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? শাসিতের আর্ত্তনাদে দেশ গুমরিয়া মরিতেছে, কিন্তু শাসনের রথচক্র সচল রহিয়াছে ত।

গবর্ণরের বক্তৃতা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার লাট স্যর জন এ্যাণ্ডারসন যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কিছুই নাই আছে, দৃঢ়মুষ্টি শাসক শক্তির ক্ষমতার প্রকাশ মাত্র। প্রথমেই তিনি দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া পরে বলিয়াছেন—"বিশৃঙ্খলার বহ্নি প্রকাশকে সকল সময়ই দমন নীতি দ্বারা শাসন করা প্রয়োজন এবং যে গবর্মেণ্ট এই দমননীতি চালাইতে ভয় পান অথবা দমননীতি পরিচালিত করিতে অবহেলা করেন, সে গবর্মেণ্ট নিজের সর্ব্বনাশ সাধন নিজে করেন। তথাপি আমার গবর্ণমেণ্ট সকল সময়েই উপলব্ধি করেন যে, দেশব্যাপী এই অসন্তোষের কতকগুলি মৌলিক ও অন্তর্নিহিত কারণ বিদ্যমান আছে। দেশে প্রকৃত শান্তি আনয়ন করিতে হইলে এই কারণগুলি দূর করা দরকার। শক্তিকে শক্তিদ্বারা এবং বিশৃঙ্খলাকে আইনের জবরদস্তি দ্বারা জয় করাই যথেষ্ট নয়। প্রকৃত শান্তিমূলক আবহাওয়া সৃষ্টি করাই সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ প্রবলভাবে মাথা তুলিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।" —বঙ্গবাণীর অনুবাদ

তবে দেশব্যাপী এ অসন্তোষেরও অন্তর্নিহিত মৌলিক কারণ কি? ইহার কারণ খুঁজিতেও বেশীদূর যাইতে হইবে না এলাহাবাদের অবাঙ্গালী কাগজ 'লীডারের' ভাষায় বলি,

"For years and years Bengal was one of the most law abiding provinces. Why has the position deteriorated? For years it has been governed with the aid of special laws of exceptional severity, and yet the problem of law and order has become progressively difficult. Politico-economic causes are at the root of the trouble, and they are intimately connected with the system of Government which has been breeding political extremism. The causes cannot be removed without a change in the system. The highly developed political consciousness of Bengal has been finidng it increasingly intolerable. A study of the history of the national movement make it abundantly clear that the remedy for its political ills is to be found in the grant of free and democratic institutions.

অনুবাদ—দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া বাংলাপ্রদেশ আইন মানিয়া চলিয়া আসিয়াছে তবে এ অবস্থার বিপর্য্যয় হইল কেন? দীর্ঘ বৎসর যাবৎ ইহা বিশেষ বিশেষ আইনের কঠোরতা সহকারে শাসিত হইয়াছে, তথাপি 'আইন ও শৃঙ্খলা' বজায় রাখা দিন দিনই কষ্টকর হইয়াছে কেন? রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ সমূহই এই অশান্তির মূলে এবং ইহা শাসনপ্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। কারণ বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীই রাজনৈতিক চরমপন্থা নির্দ্দেশে সহায়তা করিতেছে। এই শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তন না হইলে এই সকল কারণও দূরীভূত হইবার নয়। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক চেতনা অত্যন্ত পুষ্ট ও বর্দ্ধিত কাজেই এই শাসনপ্রণালী তাহাদের নিকট অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই প্রদেশের জাতীয় আন্দোলন আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইহার রাজনৈতিক ব্যাধির প্রতিকারের একমাত্র পন্থা স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রদানেই সম্ভব।"

এই আসল পন্থাটী প্রবর্ত্তন করিয়া দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিলে শাসক ও শাসিত উভয়েরই কল্যাণ।

রাজবন্দীদের মুক্তি।

এই শান্তিময় অবস্থা দেশে আনিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সকলপ্রকার রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া আবশ্যক। বিনাবিচারে অর্ডিনান্সে বন্দী যাহারা তাহাদের মুক্তি দিতে হইবে, আইন অমান্য আন্দোলনে ও অন্যান্য রাজনৈতিক অপরাধে যাহারা বন্দী তাহাদিগেরও মুক্তি চাই। তবেই দেশে আবার পূর্ণ শান্তির স্থায়িত্ব আশাকরা যায়। একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এদেশের পত্রিকা এবং প্রধানগণ সকলেই একবাক্যে ইহা বলিয়া আসিতেছেন।

আমরা স্বভাবতঃই শান্তিবাদী। সমগ্র পৃথিবীর শান্তি, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বে আমরা আস্থা রাখি। আমরা স্বদেশে তাই সর্ব্বাগ্রে শান্তি ও প্রতিষ্ঠা চাই। এবং সেজন্য বিশ্বাস করি, দেশের যে সকল পুরুষ ও মহিলা বন্দী আছেন তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলে, দেশের অশান্তভাব থাকিবে না। সকলেই গঠনমূলক কার্য্যদ্বারা দেশোন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিবার সুবিধা পাইবে। বিশেষতঃ আগামী নব্য শাসনতন্ত্রে যদি জাতীয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি পায়, তবে উহাকে কার্য্যকরী করিতে হইলেও রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দিয়া দেশে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টিকরা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, শীঘ্রই আরো পাঁচশত রাজবন্দীর দেওলীতে থাকিবার জন্য নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। ইহা যেমন দুঃখের, তেমনি আশঙ্কার। যখন দেশবাসী শান্তির প্রতীক্ষায় উন্মুখ, নবশাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের প্রাক্কালে, এই কঠোরতর ব্যবস্থার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তবে ইহাদ্বারা যদি বুঝিতে হয়, এই সকল হতভাগা যুবক ও যুবতীদের আরো অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াই পচিতে হইবে, তবে বলিব, জাতিরও যেমন দুর্ভাগ্য সরকারেরও তাই। দুর্ভাবনা ভুগিতে কাহারো কম হইবেনা। বঙ্গীয় গবর্ণর যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির দ্বারা শান্তিময় মিলনের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছেন সে পথ শাসকবর্গের দৃঢ়মুষ্টিতেই চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল।

সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের নব প্রচেষ্টা

ডাঃ আলমের নেতৃত্বে দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার জন্য একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। ইহা লাহোরে স্থাপিত হইয়াছে এবং পাঞ্জাবেই ইহার কর্ম্মক্ষেত্র। আমরা এই পুণ্য সংকল্পের পূর্ণ সমর্থন করি এবং আশা করি অতি সত্বরই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। যতদিন এই ব্যাধি ভারতীয় জীবনে আঁকড়িয়া থাকিবে, জাতির প্রগতি-পথ রুদ্ধই রহিবে। ইহারই ফলে জাতি যে পঙ্গু ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং জগতের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইতেছে, তাহা কি বিমূঢ় দেশবাসী দেখিয়াও দেখিবে না?

ঢাকা কোন্ পথে?

সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি ও অবমাননার একটি নূতন দৃষ্টান্ত এবার হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঢাকায় মিউনিসিপালিটি। নূতন মিউনিসিপাল আইনের বলে ঢাকার পৌরসভার ২১টি সদস্যদের মধ্যে ১৪টি সদস্যপদের জন্য হিন্দু মুসলমান সকলেই প্রার্থী হইয়াছেন। এতকাল কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা হয়

নাই। সহরের একলক্ষ চল্লিশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে পৌনে এক লক্ষেরও অনেক ওপরে হিন্দুর সংখ্যা। আগেও হিন্দুর সংখ্যা বেশীই ছিল। জাতীয় কল্যাণ প্রয়াসী দায়িত্বশীল পৌরজনের পথে এরূপ বিশেষ বিধির আশ্রয়ে পুষ্টিলাভ কত বড় অমর্য্যাদাকর ও আত্মধ্বংসী তাহা এদেশের সংকীর্ণ মনোবৃত্তিকে কে বুঝাইবে? সান্ত্বনা এই, ঢাকার অধিবাসীরা এবার নবাবী আমলে ফিরিয়া যাইবার আশা করিতে পারেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনে মহিলা সভ্য

আগামী ২৯শে মার্চ্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের সভ্য নির্ব্বাচন হইবে। এবার এই নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়া দুইজন খ্যাতনামা মহিলা দাঁড়াইয়াছেন। ইঁহাদের একজন শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী এম্-এ এবং অপরজন শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু বি-এ। ইহার পূর্ব্বে বাংলাদেশের কোন মিউনিসিপালিটিতে কোন মহিলা সদস্য পদপ্রার্থী হন নাই। আমরা এই প্রচেষ্টায় খুবই আনন্দিত ও উৎসাহিত। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, এই যশস্বিনী মহিলাদ্বয় নির্ব্বাচিত হইয়া বাংলার নারীদের জীবনপথ প্রশস্ততর করিয়া তুলুন। নারীর মঙ্গলপরশে পৌরসভার সকল মলিনতা ও পঙ্কিলতা বিদূরিত ও পরিশোধিত হইবে, জাতীর জীবন ও সুন্দর ও সহজ হইবে।

কলিকাতা কংগ্রেস

এবার আগামী এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হওয়ার কথা, অস্থায়ী সভাপতি মহাশয় প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় এসম্বন্ধে জানা যায়, গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস সম্বন্ধে গতবার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবারও তাহাই করিবেন। অর্থাৎ কংগ্রেসকে প্রকাশ্যে জাকজমকসহকারে হইতে দিবেন না। অথচ ভারতীয় কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই।

অবশ্য শিবহীন যজ্ঞের মত নেতৃশূন্য কংগ্রেসে যদিও বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপিত হইতে পারে না, তবু জাতির মত প্রকাশের এই একমাত্র প্রতিষ্ঠানকে দাবাইয়া রাখার সার্থকতা নাই। কংগ্রেসকে বর্ত্তমান সমস্যাসমূহ আলোচনা করিবার সুযোগ দিলে সরকারও লাভবান্ হইতেন না কি?

অক্সফোর্ড ছাত্রদের শান্তিবাদ

বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইউনিয়নের এক বিতর্ক সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; This House will in no circumstances fight for its King and Country." অর্থাৎ এই সভার মত এই যে, ইহা কোন অবস্থাতেই রাজা এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করিবে না। লিবার্টি পত্রিকায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা লইয়া নাকি পত্রিকা-মহলে এবং চার্চ্চিল প্রমুখ রাজনৈতিকগণের মধ্যে তুমুল আলোড়ন চলিয়াছে।

যুদ্ধবিতৃষ্ণা আজ পৃথিবীব্যাপী। যে জার্ম্মাণীতে বর্ত্তমানে প্রবল নিপীড়ন চলিতেছে, সেখানেও একদল যুবকের মনে এই ভাব খুব প্রবল। যুবকগণই জাতির ও জগতের ভাগ্য বিপর্য্যয় করে। তাহাদের এই মনোবৃত্তি সত্যই প্রশংসনীয়। গোঁড়া ইংলণ্ডেও এ হেন বাণী ঠাঁই পাইয়াছে, ইহা আনন্দেরই কথা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ

আটানব্বই বছর আগে বাংলার এক অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। আজ বাংলা জুড়িয়া তাঁহারই পবিত্র জন্মতিথিতে উৎসবের কত অনুষ্ঠান হইয়া গেল। সেদিন যিনি জাতির মরণসন্ধ্যায় কাণ্ডারীর মত আসিয়া এক নববার্ত্তা শুনাইয়া গেলেন, আজ এমনিতর শক্তিধর পুরুষের আগমনী প্রতীক্ষায় সারা জাতি উন্মুখ হইয়া আছে। এই ভেদ, বিরোধ, সঙ্কীর্ণতা, মলিনতা সকল কিছু দূর করিয়া এদেশের মানুষগুলিকে সত্যিকার মানুষ করিয়া তোলো, ঠাকুরের জন্মতিথিতে বার বার এই প্রার্থনাই করি।

চীনজাপানের সমর

চীনের জিহোল লইয়া এই দুই জাতিতে যুদ্ধ বাঁধিয়া গেছে। জাতি সংঘের লিটন রিপোর্ট, উনিশ জনের কমিটি সব অগ্রাহ্য করিয়া জাপান যুদ্ধে নামিয়াছে। যুদ্ধের রণরণি প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পার হইয়া জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অথচ জাতিসংঘের প্রবল শক্তির কিছুমাত্র সবলতা থাকিলে ইহা সংঘটিত হইতে পারিত না। কিন্তু স্বার্থে স্বার্থে যোগ সকলেরই। কে কাহাকে উপদেশ দিবে এবং কোন মুখে? ওদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার যে টুক্‌রা খবর মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাদেরও সমরায়োজনের আভাষ মিলে। কোথাকার জল কোথায় গড়াইবে কে জানে?

জর্ম্মনীর রিষ্ট্যাগ ধ্বংস

জর্ম্মনীর পার্লামেণ্ট রিস্ট্যাগ গৃহ কমিউনিষ্টরা নাকি আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দিয়াছে। ইহার ফলে দেশময় কমিউনিষ্টদের ওপর নিপীড়ন চলিতেছে। কমিউনিষ্টদের ডেপুটীরা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। হিট্‌লার ও হিণ্ডেনবার্গের জরুরী কঠোর আইনে সর্ব্বত্রই দমননীতি চলিতেছে। শাসক-সম্প্রদায়ের গোত্র সব দেশেই এক।

আর্মানীটোলা বালিকা বিদ্যালয়

নবপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার স্বর্গগত সহধর্ম্মিনী শ্রীযুক্তা আনন্দময়ী রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহারই স্মৃতিরক্ষার্থ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যালয়টি আনন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত। আমরা এই মহৎ দানের প্রশংসা করি।

গত আদমসুমারি নির্ভুল কিনা

এ বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য হিসাব সহ মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় কিছুদিন যাবত আলোচনা চলিতেছে। বাস্তবিক এসব ভুল শুধু অমার্জ্জনীয় নয়, দায়িত্বশীলতার অভাবেরও মস্ত পরিচায়ক। আমরা কর্ত্তৃপক্ষ ও দেশবাসীর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিতেছি।

বর্ষ-বিদায়

আবার একটি বছর ঘুরিয়া আসিল। সুখে হোক্ দুঃখে হোক্ বছর শেষ হইয়া চলিল। জয়শ্রীর দ্বিতীয় বর্ষের জীবন উহার সাফল্যের জীবন, উহার ব্যথা ও সংশয়ের জীবন। আজিকার

দিনে কত লাঞ্ছনা ও বেদনা লইয়া পত্রিকা পরিচালনা করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝিবে ? একটা নূতন বার্ত্তা, একটা নব সংকল্প, এক নব আদর্শ লইয়াই জয়শ্রী বাংলার মায়েদের বোনেদের কাছে দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহা কি আমরা সম্যকভাবে সকলের সামনে ধরিতে পারিয়াছি ? আমাদের যে বিরাট্ আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প তাহার তুলনায় যাহা এই বারটি মাস ধরিয়া পরিবেশন করিলাম, তাহা অতি সামান্যই তবু আশা হয়, এবার আমরা আমাদের পাঠকপাঠিকাদের তৃপ্তি হয়ত খানিকটা দিতে পারিয়াছি।

আসছে বৈশাখেই ত জয়শ্রী তৃতীয়বর্ষে পড়িবে। কাগজখানি যাহাতে অধিকতর সমৃদ্ধ হয় এবং বৃহত্তর আকারে প্রকাশিত হয় তাহারই আয়োজন করিতেছি। কিন্তু ইহার জন্য নির্ভর করে বাংলার মহিলাসমাজের একান্তভাবে আত্মনিয়োগ। সমবেত শক্তি ও সহায়তা ছাড়া এ অনুষ্ঠান সফল হইতে পারে না, অথচ গেল বছরে কি-ই বা সাহায্য পাইয়াছি ? তবু চলিয়াছি অটুট নিষ্ঠা আর ভবিষ্যতের আশা বুকে লইয়া। যদি জয়শ্রী আজ সহানুভূতির অভাবে মুষড়িয়া পড়ে, তাহা অর্দ্ধবঙ্গের প্রতিনিধির পক্ষে কি কম গ্লানি ও পরিতাপের কথা ? সেদিন বাংলার নারীর আঁচলে মুখ ঢাকিবার পথটিও যে থাকিবে না।

ভবিষ্যতে আস্থা রাখি বলিয়াই চলিয়াছি। ভবিষ্যতের বুক ছানিয়া বাংলার নারীর মহিমাময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিবে, সংকল্পের সে সাহস ও স্পর্দ্ধা আছে বৈ কি। যে রুদ্রদেবতা কত ভাঙ্গাগড়ার মধ্যদিয়া আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহারই শিবময় মঙ্গলপরশ আমাদিগকে কল্যাণের পথে অগ্রণী করিয়া দিক্। দেশের ভাইবোনেরা আমাদের এই কল্যাণব্রতে সহযাত্রী হোন্, এই কামনা।

আর একটি কথা। গত বছর সংকল্প করিয়াছিলাম, এবার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিব। কিন্তু অনেক অসুবিধা হয় বলিয়াই তাহা করি নাই। তবে এ বছরে প্রতিমাসেই পত্রিকা খানি বড় করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। আশাকরি উহার অভাব ইহাতেই পূরিত হইয়াছে।

বিদায়ের পূর্ব্বে একবার আমাদের পৃষ্ঠপোষকগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। যাঁহারা লেখা চিত্র বিজ্ঞাপন দিয়া, এবং গ্রাহক-গ্রাহিকা হইয়া, এবং আরোও দশরকম কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা চিরদিনই রহিবে। আশাকরি আগামী বছরও তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভে বঞ্চিত হইব না। আবার দ্বিতীয় বর্ষের শেষ নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইতেছি পুনরাগমনায় চ—আবার আসিব বলিয়াই।